প্রবন্ধসংগ্রহ ১

সুকুমারী ভট্টাচার্য

গা ঙ চি ল

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০২

প্রকাশক
অণিমা বিশ্বাস
গাঙচিল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার
কলকাতা ৭০০ ১১১

বিক্রয়কেন্দ্র
৪এফ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯
৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
বর্ণনা ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা ৭০০ ০৩২

প্রচ্ছদচিত্র: ঋগ্বেদ-এর লিপি। ভারত, ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ

পরিকল্পনা ও রূপায়ণ
বিপুল গুহ

আমার স্বামী
অমল ভট্টাচার্য-র স্মৃতিতে

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত অধীর বিশ্বাসকে আগে চিনতাম না। তিনি নিজেই একদিন এসে, আলাপ করে প্রস্তাব করেন, আমার রচিত অন্যত্র প্রকাশিত বইগুলি দু-চারখানি একত্র বাঁধিয়ে কয়েকটি খণ্ডে সমগ্র প্রকাশ করবেন। সম্মতি দিলাম। বেছে তিনটি বই বাঁধিয়ে প্রথম খণ্ডের প্রকাশ করছেন।

এই বইগুলিতে যে প্রচুর ছাপার ভুল ছিল, শ্রীমান কুমার রাণা তা সযত্নে পরিহার করে এবং প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে পড়বার উপযুক্ত করে তুলছেন। এ যে কী যত্ন ও পরিশ্রমের ফল তা আমিই জানি।

পরিশেষে, নানা রকম দায়িত্বের মধ্যে থেকেও অধীর শেষ পর্যন্ত খণ্ডে খণ্ডে এর সমগ্রতা রক্ষা করছেন এবং এই কাজে যে কী নৈপুণ্য ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তা প্রথম খণ্ড দেখলেই বোঝা যাবে।

আমার সৌভাগ্য যে এঁরা দু'জন গন্ধমাদনটি স্বেচ্ছায় স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না যে, আমি কী পরিমাণ অভিভূত বোধ করছি।

কামনা করি এঁদের সকল প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

প্রাচীন ভারত

সূ চি

প্রাগার্য সভ্যতা ১৩
আর্যরা: সাহিত্যযুগ ১৫
'ব্রাহ্মণ' সাহিত্যে সমাজ ও ধর্ম ২৫
আরণ্যক উপনিষদযুগ ৩১
বেদবিরোধী ধর্মধারা: জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ৩৩
মগধের অভ্যুত্থান ৩৬
মৌর্যযুগ ৪০
মৌর্যবংশের পরে ৪৮
কুষাণ সাম্রাজ্য ৫০
সাতবাহন যুগ ৫৭
গুপ্তযুগ ৬৪
গ্রন্থপঞ্জি ৭৬
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ৭৮

প্রাগার্য সভ্যতা

পৃথিবীর সভ্যতার বয়স অনেক। সাড়ে ছ'লক্ষ বছর আগেকার আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের মধ্যেও মানুষের তৈরি জিনিস পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব উনিশ হাজার বছর আগে মানুষ আগুন ব্যবহার করতে শিখেছে; মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এটি একটি বিশেষ ধাপ। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কী রকম ছিল?

মেহেরগড়ের প্রত্নখননে (মাটি খুঁড়ে ইতিহাসের সন্ধানে) ৭৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে নব্য প্রস্তর যুগের মাটির জিনিস পাওয়া গেছে, চাষেরও কিছু কিছু প্রমাণ মিলেছে। এবং বহু দূর দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল তা-ও জানা যায় (সে সময়ে রাশিয়ার তুর্কমেনিস্তান ছাড়া অন্য কোথাও টার্কয়েজ পাথর পাওয়া যেত না, সে পাথর মেহেরগড়ে পাওয়া যাওয়াতে বোঝা যায় যে, তখনকার ভারতবর্ষের বাণিজ্য অন্তত তুর্কমেনিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল)।

অধিকাংশ পণ্ডিতই এখন স্বীকার করেন যে, আর্যরা এখনকার ভারতবর্ষের যে ভৌগোলিক সীমা তার বাইরে থেকেই এ দেশে এসেছিলেন। তবে এর মধ্যে অনেক কথা আছে: আজকের ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা বা ১৯৪৭-এ দেশ 'স্বাধীন' হওয়ার আগে যে সীমা ছিল, তার বহু পূর্বে ভারতবর্ষের সীমা মধ্যপ্রাচ্যের দিকে অনেক বেশি বিস্তৃত ছিল। শুধু বাণিজ্য সীমায় নয়, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ভিত্তিতে জাতিগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠী হিসেবে এক না হলেও অনেক বিস্তৃত এক ভূখণ্ডে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়িয়েও ছিল এর বিস্তৃতি। এ অঞ্চলটা হয়তো কেন্দ্রীয় কোনও শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিংবা বলা যায়, শতাব্দীর পর শতাব্দীতে, এমনকী সহস্রাব্দেরও ওপারে, ওই অঞ্চলের শাসনব্যবস্থাগুলোর বারেবারে হাতবদল হয়েছে। কিন্তু ওই অঞ্চলের মানুষের মনে ভারতবর্ষ বলতে অনেক বিস্তৃত, অনেক বহুজাতিক বহুভাষিক এক জনগোষ্ঠীর ধারণা ছিল। এটা কোনও নিশ্চিত বা স্থায়ী বা বরাবরের জন্য স্থিরীকৃত কোনও অঞ্চলের কথা নয়; এর মধ্যে দিয়ে মিশর, ভূমধ্যসাগরের প্রান্তের দেশগুলি, মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশ, দক্ষিণ ইয়োরোপ ও চিনের কিছু অঞ্চলের মানুষের আনাগোনা বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে অব্যাহত ছিল। এই অঞ্চলে অন্যান্য জাতি ও ভাষাগোষ্ঠী ছাড়াও অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী লোকেরাও বাস করত। কাজেই সে কালে বহুদূর পর্যন্ত ও স্থানে বহু দেশের সীমানা ছাড়িয়ে যে একটি সংস্কৃতি বর্তমান ছিল, তার মধ্যে বহু ভাষা ও জাতিগোষ্ঠী ছিল।

এখনকার ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল থেকে মধ্যভারতের উত্তরভাগ পর্যন্ত যে জনগোষ্ঠীর বাস ছিল সেই প্রাগার্যরা সিন্ধু সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল। এ সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ থেকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, সিন্ধু, পঞ্জাব, গুজরাট ও রাজস্থানের কিছু অংশে বিস্তৃত ছিল। মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, কালিবাঙ্গান, লোঠাল— এগুলি ছিল এই সভ্যতার বড় বড় শহর। প্রাগার্য এই সভ্যতাটি বেশ উঁচুমানের ছিল: চওড়া রাস্তা, দুর্গ, প্রাচীরঘেরা শহর, বড় দোতলা বাস্তুবাড়ি, দোকান, কারখানা, জলাধার, মজুরদের এক কামরার বস্তি— মাটি খুঁড়ে এ সব পাওয়া গেছে। শহরের ঠিক মাঝখানে বড় বড় বাড়িগুলি সম্ভবত প্রশাসনের কাজের জন্যই ছিল। বন্যা ঠেকাবার জন্যে নদীর পাড়ে উঁচু বাঁধ দেওয়া ছিল। আর ছিল সাধারণের স্নানের জায়গা, বাড়িতে উঠোনের কোণে রান্নাঘর, নিজস্ব কুয়ো, বারান্দা, রাস্তার পাশে বড় বড় পাথরের ঢাকা দেওয়া জলনিকাশের নর্দমা যার ওপরের পাথরগুলো তুলে নিয়ে নালী পরিষ্কার করা যেত। ফলে নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক ব্যবস্থা ভাল ছিল। একটি বাড়িতে শস্যভাণ্ডার পাওয়া গেছে। অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়নি, তাই মনে হয় শান্তিপূর্ণ কেন্দ্রীয় শাসন ছিল, হয়তো বা পুরোহিত শাসিত ব্যবস্থা। মধ্যপ্রাচ্য ও মিশরের সঙ্গে এদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল; এখানকার সীলমোহর, মৃৎশিল্পের নিদর্শন, যেমন মাটির গাড়ি, খেলনা, ইত্যাদি ওই সব অঞ্চলে মাটির নীচে পাওয়া গেছে। সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলে যে মাটির ভাঁড়, জালা, গামলা পাওয়া গেছে, সেগুলির গায়ে রঙিন চিত্র করা। এ ছাড়া একটি যোগী মূর্তি পাওয়া গেছে, তার চার দিকে হাতি, গণ্ডার, বাঘ ও ষাঁড়। একটি দাড়িওয়ালা মানুষের মূর্তি ও একটি নর্তকীর মূর্তিও বেরিয়েছে। যোগী মূর্তিটিকে পণ্ডিতেরা পশুপতি শিবের মূর্তি বলে মনে করেন; যা যা পাওয়া গেছে তা থেকে সিন্ধুসভ্যতার ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণ সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছুই জানা যায় না। সিন্ধুসভ্যতার মানুষ লিখতে পড়তে জানত, সীলামোহরের ওপরের লেখায় তার প্রমাণ আছে। কিন্তু সে লিপি এখনও পড়া যায়নি, এবং পড়া গেলেও সম্ভবত এদের জীবন, বিশ্বাস, ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যেত না, কারণ মনে হয়, সীলমোহরগুলি বাণিজ্যে ব্যবহারের কাজেই লাগত। এদের মধ্যে মৃতদেহের দাহ ও সমাধি দুয়েরই প্রমাণ মেলে। সমাজটি মনে হয় শ্রেণিবিভক্ত ছিল এবং হয়তো দু শ্রেণির জন্যে দু রকমের অন্ত্যেষ্টি হত। এ সমাজ অত্যন্ত স্থিতিশীল ছিল। অন্তত এক হাজার বছর ধরে সমাজব্যবস্থা একই রকম ছিল। কেন্দ্রীয় শাসন সম্ভবত খুব শক্তিশালী ছিল। এই বিস্তৃত এলাকায় শুধু নগর পরিকল্পনা যে একই রকমের ছিল তাই নয়, ওজনের বাটখারাগুলো পর্যন্ত একই ওজনের ছিল।

আর্যরা: সংহিতাযুগ

তথ্যসূত্র

সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে আর্যরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে দু-তিনবার দু-তিন দলে ভারতবর্ষে আসে। যারা বেদ নিয়ে এসেছিল তারা হয়তো খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি কোনও সময়ে এখানে পৌঁছয়, তবে তাদের আগেও এখানে অন্য আর্য দল এসেছিল। আর্যরা যখন মধ্যপ্রাচ্য বা ইরান থেকে আসে তখন চাষের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় থাকলেও ওই দীর্ঘ পথ তারা পশুচারী যাযাবর হিসেবেই আসে। ওই পথে বহু মানুষ গুরু-মোষ ভেড়া-ছাগল নিয়ে আসছিল। তখন তাদের খাদ্য ছিল মাংস, দুধ, দই, ঘি, ছানা, ছাতু, মধু, ইত্যাদি। ভারতবর্ষে পৌঁছতে তাদের অনেক সময় লেগেছিল এবং সে সময়টা কাটে যাযাবার ভাবেই। পথের মধ্যে কোথাও কোথাও কিছু দিন ধরে বাস করলেও স্থায়ী জীবনযাত্রার সুযোগ তো ছিল না, ফলে বীজ বুনে ফসল তোলবার মতো সময় তাদের হাতে থাকত না।

আর্যদের সম্বন্ধে জানবার প্রধান ও প্রায় একমাএ সূত্র হল বেদ: আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক, যাঁরা মাটি খুঁড়ে পুরনো সভ্যতার অবশেষ বের করেন, তাঁদের পাওয়া বস্তুগুলি থেকেও খানিকটা জানা যায়। বেদের সময়কার উৎখননে প্রায় তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। ফলে আর্যদের প্রথম দিকের জীবন সম্বন্ধে খবর বৈদিক সাহিত্যই আমাদের কাছে খুব বড় উৎস।

বেদ চারটি: *ঋক্, সাম, যজুঃ* ও *অথর্ব*। এগুলির প্রত্যেকটির আবার চারটি অংশ: *সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক* ও *উপনিষদ*। *ঋকসংহিতা* ছন্দে রচিত, এর সূক্ত অর্থাৎ পুরো কবিতাগুলি আবৃত্তি ও গান করা হত (সু+উক্ত=সূক্ত, ভাল করে বলা কথা)। সূক্তগুলি অনেক ঋক বা মন্ত্র দিয়ে রচিত। *যজুর্বেদ* সংহিতায় মন্ত্র ছাড়াও কিছু কিছু গদ্য অংশ আছে। *সামবেদ* গান করা হত এবং এর মন্ত্রগুলি সবই *ঋকসংহিতা* থেকে নেওয়া; *অথর্ববেদ*-এ অনেক অংশ *ঋকসংহিতা* থেকে, তা ছাড়াও এতে অন্যান্য বহু মন্ত্র ও কিছু কিছু গদ্য মন্ত্র আছে।

ব্রাহ্মণ সাহিত্য সম্পূর্ণ ভাবেই গদ্যে রচনা, যজ্ঞ কেন ও কী ভাবে করতে হবে তাই এতে বলা আছে। ব্রাহ্মণগুলি খুব সংক্ষিপ্ত গদ্যে রচনা। *আরণ্যক উপনিষদ*-এর অনেকটাই প্রশ্ন-উত্তর আকারে রচিত, আবার গদ্যে বা ছন্দে একটানা কিছু কিছু রচনাও আছে। *অথর্বসংহিতা*-য় *ঋগ্বেদ*-এর সূক্ত ছাড়াও বেশ কিছু লোকায়ত বিশ্বাসের ও ধর্মাচরণের কথাও আছে, যেমন কবচ, মাদুলি, ঝাড়ফুঁক। একটি বড় অংশ হল রোগ (যেমন তক্মন অর্থাৎ ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কৃমি, শোথ, গলগণ্ড, গর্ভস্রাব, ন্যাবা, দৃষ্টিহীনতা, ইত্যাদি) সারানো, আয়ুবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা, শত্রু ও সতীনের ক্ষতির জন্যে প্রার্থনা। রোগ সারানোর সঙ্গে উদ্ভিদ ও

ধাতুর মাদুলি ও কবচের কথা শুনি। এর সবটাই জাদুমন্ত্র নয়, অনেকটাই প্রাথমিক বিজ্ঞান। ভারতবর্ষের চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রথম সূচনা *অথর্ববেদ*-এই। *অথর্ববেদ*-এর শেষ পর্যায়ের সূক্তগুলি যখন রচনা হচ্ছিন তখন আর্যরা বিহারের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চল পেরিয়ে বাংলার উত্তরপূর্ব অঞ্চলে পৌঁছেছিল। তাই, এখানকার জলাজমিতে সহজেই হয় এমন সব রোগের নাম পাওয়া যায়। সে দিক থেকে *অথর্ববেদ সংহিতা* সাহিত্যের শেষতম অংশের ভূগোল, সমাজ, ধর্মবোধ ও আচরণের একটি দামি সামাজিক দলিলও বটে, সে দিক থেকে এর বিশেষ একটি তাৎপর্য ও মূল্য আছে। *অথর্ববেদ* সংকলনের কিছু আগে থেকেই ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্যের উদ্ভব হয়; তাই এখানে রাজা ও সৈন্যদের সম্বন্ধে অনেক মন্ত্র আছে। বিষাক্ত বাণ থেকে, অস্ত্রক্ষত থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা আছে; যুদ্ধ জয়ের জন্যেও রাজপুরোহিতকে *অথর্ববেদ*-এ পণ্ডিত হতে হত।

যজ্ঞ ছাড়া *অথর্ববেদ*-এ তপস্যার কথাও শুনি, মুনি, ঋষি তো *ঋগ্বেদ*-এও ছিল; *অথর্ববেদ*-এ তপস্যার উল্লেখ সমাজের এই অংশটির ওপরে আলো ফেলে। বেদ যখন রচনা হয় তখন আর্যরা লিখতে পড়তে জানত না, তাই সম্ভবত একেবারে শেষের দিকের সামান্য কিছু আগে পর্যন্ত সবটাই মুখে মুখে রচনা; লোকেরা গুরু শিষ্যপরম্পরায় শুনে মুখস্থ করে রাখত।

ধর্মাচরণ

ঋগ্বেদ-এর অধিকাংশ মণ্ডলই এক একটি ঋষিবংশের কবিরা রচনা করেছিলেন। *ঋগ্বেদ*-এর দশটি অধ্যায় মণ্ডল নামে বিখ্যাত; প্রত্যেক মণ্ডলেই অনেকগুলি করে সূক্ত যা আবৃত্তি বা গান করা যেত, এই সূক্তগুলি অনেক 'ঋক' বা পদের সমাহার। সূক্তগুলিকে মোটামুটি চারটি রচনাংশে ভাগ করা যায়: ১. স্তব, যাতে দেবতার আকৃতি, বেশবাস, অলংকার, অস্ত্রশস্ত্র, রথ ও অশ্বের বর্ণনা; ২. দেবতার কাছে ভক্তদের প্রার্থনা— আয়ু, যশ, সন্তান, পশুপাল, যুদ্ধ জয়, শত্রুনাশ, স্বাস্থ্য, ধন, অন্ন ইত্যাদির জন্য; ৩. ওই দেবতা আগে কোন ভক্তকে কী কী দিয়েছেন তারও বর্ণনা আছে কোথাও কোথাও; ৪. (ক) দেবতার বরের বিনিময়ে ভক্ত তাঁকে যা যা দিচ্ছেন, যেমন পুরোডাশ (যবের রুটি), গো-মহিষের মাংস, দুধ, দই, ছানা, চরু (ক্ষীর), ঘোল, মধু, সুরা ও সোমরস, ইত্যাদি; এ ছাড়া (খ) দেবতাকে প্রীত করবার জন্যে নতুন করে রচিত কোনও স্তোত্র, অথবা যে স্তোত্র আগে শুনে দেবতা প্রীত হয়ে বরদান করেছেন এমন পুরোনো পরীক্ষিত শক্তিমান স্তোত্র। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কবিবংশগুলির মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ভাব আছে; যার গান বেশি ভাল বলে প্রমাণিত, তার ভাগ্যে যশ ও পুরস্কার জুটত। দেবতা ও ভক্তের সম্পর্কটা মোটা দাগে আঁকলে সেটা একটা দেনাপাওনার সম্পর্কেই দাঁড়ায়: দেবতা যাতে খুশি হন এমন খাদ্যপানীয় স্তব আপ্যায়ন ভক্ত তাঁকে দেয়, আর ভক্ত যা চায়— ইহজীবনকে সুখী সমৃদ্ধ, বিজয়ী ও দীর্ঘায়ত করে তোলার জন্য যা যা প্রয়োজন তারই তালিকা এই সব প্রার্থনায়।

জীবনযাত্রা

সংহিতা-ব্রাহ্মণযুগের কর্মকাণ্ডে জীবনযাত্রার যে দিকটা চোখে পড়ে তাতে পশুপালের বৃদ্ধি, নিরাপত্তা, মানুষের পরমায়ু, স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং পশুপাল ও সন্তানের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে বহু প্রার্থনা। এর থেকে বোঝা যায় যে, পশুপালনই তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার একটা বড় উপায় ছিল; বহু সন্তান থাকলে শত্রুর সামনে লোকবলের জোর হত। তাই পশুর বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, ইত্যাদির জন্যে বিভিন্ন দেবতার দ্বারস্থ হত ভক্তরা। এ ছাড়া ভূমিকম্প, খরা, বন্যা, সংক্রামক ব্যাধি, ইত্যাদিতে আকস্মিক ভাবে পশুকুলের এবং মানুষের বিপদ যাতে না আসে তার জন্যে বিস্তর প্রার্থনা আছে। সংহিতার প্রার্থনার মূল কথা হল নীরোগ, স্বাস্থ্যবান ধনবান বিজয়ী ও পশুমান হয়ে যাতে মানুষ দীর্ঘকাল পৃথিবীতে বেঁচে থাকে।

আর্যরা এ দেশে আসবার পরে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সমাজগঠন কী রকম ছিল তা জানবার মতো উপাদান আমাদের হাতে বেশি নেই। সিন্ধুসভ্যতার জনপদগুলি থেকে প্রাগার্য অধিবাসীদের যুদ্ধে হারিয়ে বা হটিয়ে দিয়ে আর্যরা যখন উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে প্রথম বসবাস করতে শুরু করল, তখনও তাদের জীবনযাত্রা প্রধানত পশুচারণের ওপরে নির্ভর করত। প্রাগার্যদের কাছে হয়তো তারা চাষের কাজ অল্প সময়েই শিখে নিয়েছিল। কিংবা জুলুম করে প্রাগার্যদের ফসল কেড়ে নিয়ে ভোগ করত। মাংস, দুধ, দুই, ছানা, ঘোল, ঘি, মধু, রুটি, সুরা, এগুলিই নিত্য খাদ্য ছিল এ সবের সঙ্গে তারা সোমরস যজ্ঞে দেবতাকে হব্য হিসেবে নিবেদন করত।

যজ্ঞ

যজ্ঞ হত বেদিতে, বেদি হল পরিষ্কার করা কতকটা জমি। কোনও মন্দির বা মূর্তি ছিল না; বেদির ওপরে হব্য দিয়ে আগুনে ঘি ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করে দেবতাদের উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ বা গান করা হত। বেদি তিন রকমের হত: আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণা। মোটের ওপর এই ছিল যজ্ঞ। যজ্ঞ ছিল প্রধানত দু রকমের: নিত্য ও নৈমিত্তিক। অগ্নিহোত্র, ইত্যাদি কয়েকটি ছোটখাটো দৈনন্দিন যজ্ঞ ছিল নিত্য, নেহাৎ সংক্ষিপ্ত রকমের। আগুন জ্বেলে মন্ত্র পড়ে তাতে দুধ ঢেলে দিলেই হয়ে যেত অগ্নিহোত্র। বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত তা হল নৈমিত্তিক। প্রথম দিকের যজ্ঞে আড়ম্বর বিশেষ ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না, কারণ পশুচারী যাযাবর আর্যরা পশুচারণের মধ্যেই একটা সময়ে সংক্ষেপে যজ্ঞ করত। ভারতবর্ষে পৌঁছেও প্রথম দিকে যুদ্ধ করে পায়ের নীচের মাটিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ও তার পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত একটি জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির পাশাপাশি বাস করে ক্রমে তাদের তরুণ-তরুণীদের বিয়ে করে মিশ্র একটি জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করা— এ সবে আর্যদের বিস্তর সময় লেগেছিল। নিজেদের দুধ-মাংস প্রধান খাদ্যভোগের সঙ্গে প্রাগার্যদের মাছ সবজি রুটির অভ্যাস মিলল। তেমনই এখানকার হাতি ও নিজেদের ঘোড়া, এখানকার দ্রাবিড় অস্ট্রিক ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা,

এদের ধর্মাচরণ ও নিজেদের যজ্ঞ, ইত্যাদি দিয়ে জীবনযাত্রার নতুন প্রণালী রচনা করা সময় সাপেক্ষ হয়ে থাকবে।

সংস্কৃতি

আর্যদের সমাজ মূলত পুরুষতান্ত্রিক ছিল, পুরুষ দেবতারা সংখ্যায় বেশি ও প্রধান ছিল এবং সমাজেও পুরুষেরই প্রাধান্য ছিল। পশুপালন, শিকার, এ সবে পুরুষের কাজই বেশি ছিল। চাষ শিখবার পরে মেয়েরা ক্ষেত-পাহারা দেওয়া, কাপড় বোনা, রান্না, শিশু, বৃদ্ধ ও পুরুষদের সেবায় দিন কাটাত; হয়তো কিছু সবজি ও ফসলের চাষও করত। খুব অল্পকালের মধ্যেই আর্যরা দক্ষিণপূর্ব দিকে এগোতে লাগল, নতুন নতুন অঞ্চলের লোকের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনযাত্রা, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচরণ, সামাজিক রীতিনীতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিল; *যজুর্বেদ*-এর যুগ থেকেই এই পরিবর্তন চোখে পড়ে। বীজ বোনা থেকে ফসল তোলার মধ্যে সময়টাতে কিছু শিল্পকর্ম— ধাতুর, মাটির, কাঠের, চামড়ার, পুঁতির কাজ, চালু হল; পেশার সংখ্যা বাড়তে লাগল, বেশবাসে পরিবর্তন এল, ক্রমে নারীর স্বাধীনতা কমতে লাগল। পরাজিত আদিবাসীরা দাসে পরিণত হল; তার জন্যে ভারী কাজের বোঝা এবং *যজুর্বেদ*-এর যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দাসত্ব নির্দিষ্ট হয়ে গেল। যেমন নারীর কাজ ঠিক হয়ে গেল স্বামী সন্তান ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের সেবা এবং বাড়ির কাজ।

এরই মধ্যে ছিল লৌকিক উৎসব, নাচ, গান, হয়তো বা খুব প্রাথমিক রকমের নাটকও। ঘরের বাইরে মেয়েরা খানিকটা স্বাধীনতা পেলেও ঘরের মধ্যে দাদাশ্বশুর বা শ্বশুর যিনিই বয়োজ্যেষ্ঠ হতেন, তাঁরই প্রতিপত্তি ছিল বেশি; তারপরে হয়তো শাশুড়ির, হয়তো বা অন্য বয়স্ক পুরুষের। পারিবারিক বন্ধন মোটের ওপর দৃঢ় ছিল— বহু মন্ত্রে মা-বাবার সন্তানবাৎসল্যের, ভাইদের সৌভ্রাত্র্যের সন্ধান পাই। আবার পরিবারের ভেতরে বাইরে তথাকথিত অবৈধ প্রণয়েরও বেশ কিছু নিদর্শন আছে; ভাই-বোন, বাপ-মেয়ের মধ্যে দু-একটি ব্যতিক্রমী হলেও অবৈধ সম্পর্কের কথা শোনা যায়। 'জারো ন' অর্থাৎ 'অবৈধ প্রেমিকের মতো' এ উপমা বারে বারে ব্যবহার করা হয়েছে। তা ছাড়া *ঋগ্বেদ*-এই গণিকার বহু প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। কাজেই সমাজে গণিকাবৃত্তি তখনই বেশ পরিচিত ছিল। সব দেশে সব কালে যে সব অপরাধ চলে এসেছে তার অনেকগুলিরই *ঋগ্বেদ*-এ উল্লেখ করা হয়েছে। হিংসা স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, শঠতা, আতিথ্যের ও আশ্রিতবাৎসল্যের অভাব, চুরি ডাকাতি, খুন সবই তখনও ছিল। স্তবের মধ্যেই দেবতাকে বারবার বলা হয়েছে, 'আমাদের শত্রুদের ছেলেপিলে ও গরুবাছুরগুলো ফেল।' 'কীকট দেশের ওরা যে যজ্ঞ করে না, কী করবে ওরা গাভী নিয়ে? ওগুলো কেড়ে আমাদের জন্যে এনে দাও।' কিংবা 'রাত্রে অমুকের বাড়ির মেয়েটিকে হরণ করতে যাচ্ছি, দেখো, ওর ভাইরা যেন না জেগে ওঠে, বাড়ির কুকুরগুলো যেন না চেঁচায়।' এ ছাড়াও শুনি, বুড়ো বাপের সম্পত্তি ছেলেরা কেড়ে নিচ্ছে, অযোগ্য বর কন্যাপণ দিয়ে বিয়ে করছে। গায়ে লোম থাকায় যে-মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে না

তার বিলাপ, দুঃখী দরিদ্রের করুণ অবস্থা, দু-দলের মধ্যে রেষারেষি, মারামারি, হিংসে করে শত্রুকে কুয়োয় ফেলে দেওয়া— বহু ধরনের অপরাধ, মানবিক দুর্বলতা ও দুর্নীতির নজির পাওয়া যায়। আমাদের প্রথমতম সাহিত্য *ঋগ্বেদ*-এই বহুপত্নীকতা থাকার ফলে সতীনকে মেরে ফেলার প্রার্থনাও বেশ কিছু আছে এবং সহজেই অনুমান করা যায় এ ব্যাপারে প্রার্থনার সঙ্গে সক্রিয় প্রয়াসও ছিল। কাজেই *ঋগ্বেদ*-এর সমাজে যেমন সাধারণ হৃদয়বৃত্তি, মহানুভবতা ছিল, তেমনই হৃদয়হীনতা, নীচতা, শঠতা সবই ছিল। অর্থাৎ মানুষের সমাজ যেমন ভালমন্দ দুই নিয়েই হয় ঠিক তেমনটিই ছিল।

বৈদিক যুগের মাঝামাঝি সময়েই সমাজে অল্প কিছু ধনী ও বিস্তর গরিব ছিল। গরুই ছিল প্রধান সম্পত্তি এবং গরু চুরি করে নিয়ে যাওয়ার কথা প্রায়ই পাওয়া যায়। গরুর বদলে মানুষ অন্য জিনিসও সংগ্রহ করত, তাই যার অনেক গরু সেই ধনী। ধনীরা সংখ্যায় কম ছিল বলে সাধারণ লোক তাদের ঈর্ষা করত। দেবতার কাছে ধনের জন্য প্রার্থনা তাই সংখ্যায় এত বেশি। দেবতাদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে 'আগে তোমার অমুক ভক্তকে এত ধন-সম্পত্তি দিয়েছ, তা এখন আমাদেরও দাও।' সূক্তগুলির এই অংশকে বলে দানস্তুতি।

নতুন দেশ দখল করে আর্যরা যখন দেখল যে পশুপালন এবং চাষ করলেই সংসার ভাল ভাবে চলে যায়, তখন অন্তত ঋষিরা (যাঁরা সূক্ত রচনা করতেন) জীবনে খুশি হয়েছিলেন এবং এই পৃথিবীতে দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে যেন প্রত্যহ নতুন করে সূর্যোদয় দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেন, সে কথা বারবার নানা সূক্তে বলেছেন। *ঋগ্বেদ*-এ ব্রাহ্মণে স্বর্গ, নরক, পরলোকের কথা নেই বললেই চলে। জীবন সুখেরই; যে হতভাগ্যের মৃত্যু হল সে এক অন্ধকারময় দেশে গেল, তার জন্যে রইল সমবেদনা। মৃত্যু নিয়ে কোনও বাড়াবাড়ি রকমের দুশ্চিন্তা ছিল না, কিন্তু মৃত্যুর পরে অজানা দেশে গিয়ে মানুষটার কী দশা হবে সে নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। তাই যমকে মৃতদের দেবতা বলে কল্পনা করা হল (মৃত্যুর দেবতা একেবারেই নয়) এবং তাঁকে উদ্দেশ করে, একগুচ্ছ প্রার্থনা নিবেদন হল: 'যম যেন ওই অজানা দেশে প্রয়াত প্রিয়জনটিকে সেখানকার পথঘাট সব চিনিয়ে দেন, তার দেখাশোনা করেন, তার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে তাকে আনন্দে রাখেন।' এ সব সূক্তগুলি *ঋগ্বেদ*-এর শেষতম সংযোজন যে দশম মণ্ডল, তাতেই পাওয়া যায়।

মৃতের সঙ্গে তার স্ত্রীর সহমরণের রীতি ছিল না, বরং সদ্যোবিধবাকে এক জায়গায় বলা হচ্ছে যেন সে জীবিতদের মধ্যে অন্য একজনকে বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করে। মৃতের অন্ত্যেষ্টি ছিল শবদাহ, কোথাও কোথাও সমাধিও চালু ছিল। শ্রাদ্ধের কথা সংহিতা সাহিত্যে নেই, যদিও হয়তো তেমন কোনও অনুষ্ঠান ছিল। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের পরের সাহিত্যে শ্রাদ্ধ দেখা দেয় এবং দু-তিনশো বছরের মধ্যে বেশ প্রাধান্য পায়। যারা মারা গেছে সেই পিতৃপুরুষদের বলা হত 'পিতরঃ', এঁদের জন্যেও কিছু কিছু অনুষ্ঠান হত। এখন যেমন বিবাহ, ইত্যাদি শুভকাজের আগে পিতৃশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে পিতৃপুরুষদের প্রথমে প্রসন্ন করা হয়, তখনও তেমনই হত। 'পিতরঃ' ক্রমে ক্রমে দেবতা হয়ে ওঠেন, পিতৃক্রিয়াও বেশ প্রয়োজনীয় একটি

অনুষ্ঠান। বৈদিক সমাজে সবচেয়ে ওপরে দেবতারা, তার ঠিক নিচেই 'পিতরঃ', যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও অপ্সরারা; তার পরে মানুষ। তারও পরে রাক্ষস, অসুর, পিশাচ, দৈত্য দানবরা— এরা মানুষের চেয়ে শক্তিমান, কিন্তু এরা মন্দশক্তি। খুব সম্ভব প্রথম পর্যায়ে আর্যরা যুদ্ধে পরাজিত প্রাগার্য অধিবাসীদের অসুর নাম দিয়ে হীন প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। পিশাচরাও মন্দশক্তি, মাংসাশী; রাক্ষস হচ্ছে যাদের থেকে রক্ষা পেতে হবে। দনু আর দিতি বলে দুটি অশুভ জননীকে কল্পনা করা হয়েছিল। তাদেরই সন্তান দানব ও দৈত্য।

পরবর্তী সাহিত্যে দেখা দিল প্রেতাত্মা, এরা অতৃপ্ত মৃতের আত্মা, মানুষের ক্ষতি করাই এদের কাজ; কত তাদের নাম, কত রকম বিপদের আশঙ্কা তাদের কাছ থেকে। *অথর্ববেদ*-এ দেখি বহু রোগব্যাধি প্রেতাত্মা বা মন্দ আত্মার দ্বারাই ঘটে; তবে এ সবের জন্যে নানা প্রতিকারও বলে দেওয়া আছে— কবচ; মাদুলি, মন্ত্র অনুষ্ঠান। এ সবের সঙ্গে এমন সব শেকড়বাকড় ও ধাতুর যোগ আছে যার সত্যকার ভেষজ গুণও আছে। মনে রাখতে হবে যে, পুরোহিতরা যেমন গোষ্ঠীর সামূহিক বিপদ কাটানোর জন্যে যজ্ঞ করতেন, সুখশান্তি পাওয়ার জন্যে ঠিক তেমনই তার পাশাপাশি ছিল ওঝারা (যেমন আজও আছে)। ঝাড়ফুঁক, কবচ, মাদুলি, শান্তি স্বস্ত্যয়ন নিয়েই ছিল তাদের কারবার। মানুষের ইতিহাসে ওঝারাই হয়তো পুরোহিতের চেয়ে বেশি প্রাচীন। ওঝার সঙ্গে পুরোহিতের তফাৎ হল, পুরোহিত দেবতাকে আহ্বান করে সমাজের বিপদ উদ্ধারের বা সুখশান্তি বিধানের জন্যে প্রার্থনা করেন, আর ওঝারা কোনও দেবতার মধ্যস্থতা ছাড়াই অর্থহীন কিছু শব্দ উচ্চারণ করে সরাসরি অতিপ্রাকৃত শক্তির সাহায্যে ওই একই চেষ্টা করে। সমাজে মাঝেমাঝেই দেখা দিত নানা উৎপাত ও বিপদ: মহামারী, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, শত্রুর আক্রমণ; বিপদের কি আর লেখাজোখা আছে? কাজেই দেবতার সংখ্যা বাড়তেই থাকে, সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল হতে থাকে যজ্ঞ, আর সেই অনুপাতে চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে থাকে যজ্ঞের দক্ষিণা। দক্ষিণায় দেওয়ার সামগ্রীর ফর্দও ক্রমে দীর্ঘতর হয়, পরিমাণ ও সংখ্যাও সমানে বেড়ে চলে; ফলে পুরোহিতের লোভ এমন দুর্বার হয়ে উঠল যে যজ্ঞ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

এই ছিল বৈদিক সংহিতা যুগের সমাজের ছবি। শীর্ষে ছিলেন দেবতারা, তার নিচে 'পিতরঃ', তার নিচে উপদেবতা (যক্ষ, গন্ধর্ব, ইত্যাদি), তার পরে মানুষ, এবং সব নিচে অপদেবতা (প্রেতাত্মা, রাক্ষস, অসুর, ইত্যাদি)। এই ছকে মানুষের বস্তুজগতের ও কল্পনাজগতের যা কিছু প্রার্থিত তা পাওয়ার বিধান ছিল এবং যা কিছু অবাঞ্ছিত তাকে ঠেকাবার প্রণালীরও হদিশ মেলে। ধর্ম মানেই ছিল যজ্ঞ বা ঝাড়ফুঁক। ধর্মের একটি উৎস হল ভয়— রোগব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয়জনবিনাশ, শত্রুর আক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি সম্বন্ধে আতঙ্ক, পৃথিবী ও জীবনের অজানা দিকগুলি নিয়ে একটা আতঙ্ক থেকে নিরাপত্তার জন্য আকুলতা। ধর্মের অন্য উৎস ছিল বিস্ময়: প্রকৃতির প্রাচুর্য, সৌন্দর্য, সূর্যচন্দ্রগ্রহমণ্ডলীর অবস্থান, ঋতুর নিয়মিত আবর্তন, দিনরাত্রির আনাগোনা, মানুষের জীবনে নানা পরিবর্তন, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ জগতের নানা বিস্ময়কর বস্তুর সমাবেশ, যার কার্যকারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সে সব নিয়ে অপার

বিস্ময়। সৃষ্টি, জীবন, মৃত্যু সবই তো রহস্যে আবৃত, তাই সে সবই মানুষকে অভিভূত করত। বহু সূত্রে এই ভয় ও বিস্ময়ের প্রকাশ দেখা যায়। পৃথিবীর সব দেশেই ধর্মের আদিমতম উৎস এই দুটি অনুভূতিতে। দেবতা কল্পনা করে বেদের যুগের মানুষ তার ভয় ও বিস্ময় দুই-ই নিবেদন করেছে দেবতার কাছে; নিজে দায়িত্ব নিয়েছে নিয়মিত যাগযজ্ঞ করে দেবতাদের প্রসন্ন রাখার, যাতে তাঁরা তাদের মঙ্গল বিধান করেন।

ঋগ্বেদ-এর আর্যদের সম্পত্তি ছিল পশু, অর্থাৎ ঘোড়া, গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল; পেশা ছিল প্রধানত পশু পালন। খাদ্যের জন্য শিকারও করত তারা, পরাজিত শত্রুর সম্পত্তি লুঠতরাজ করত। ছোটখাট কুটিরশিল্পের মধ্যে গেরস্থালির দরকারি বাসনপত্র ছাড়াও ছিল রথ তৈরি, মোটামুটি রকমের ছুতোরের কাজ, চামড়ার কাজ, কাপড় বোনা, পশম বোনা আর কিছু গয়না ও খেলনা তৈরি। আর্যরা প্রথম দিকে রোদে শুকনো ইঁটের বাড়িতে থাকত, পোড়া ইঁট তৈরি করতে শিখেছিল অনেক পরে।

ঋগ্বেদ-যজুর্বেদ-এর যুগে সেনাপতি, দলপতি, গোষ্ঠীপতিই শাসন চালাত; গোষ্ঠীগুলি ছোট ছোট কৌমে বিভক্ত ছিল। শাসনকাজের জন্যে ছিল সভা ও সমিতি, এগুলি কেবলমাত্র পুরুষের সমাবেশ, এখানে নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, গোষ্ঠীর সমস্ত পুরুষ আসত সমিতিতে আর সভা ছিল গোষ্ঠীর মধ্যে বয়স্ক, অভিজ্ঞ, প্রতিষ্ঠিত পুরুষদের সমাবেশ। গোষ্ঠীর ভাগ্য-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়াই এ দুটির দায়িত্ব ছিল। ঠিক কী ভাবে কী কাজ কোনটিতে হত তার কিছু জানা যায় না।

যজুর্বেদ-এর আমলে সমাজে যে-চারটি বর্ণের উল্লেখ পাই— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— প্রথম যুগে এগুলি জন্মগত ছিল না, বরং এদের মধ্যে সম্পর্ক বেশ খানিকটা সঞ্চারী ছিল, অর্থাৎ নিজের রুচিপ্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অনুসারে এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণে যাওয়া যেত। এর কিছু কিছু নিদর্শন বেদে আছে। পরে অবশ্য ক্রমশই বর্ণগুলি জন্মগত, বংশগত হয়ে ওঠে।

সমাজ

বড় পরিবারকে বলা হত কুল, সেখানে একই বাড়িতে তিন-চার প্রজন্মের পুরো যৌথ পরিবার বাস করত। গ্রামে বাড়িগুলি কাছাকাছি থাকত, তার পরে পরিবার পিছু কতকটা নির্দিষ্ট জমি পরিবারের পশুগুলির চারণভূমি, তার ওপারে সারা গ্রামের জন্যে নির্দিষ্ট সমবেত চারণভূমি এবং তারও ও-পারে জঙ্গল। পাশে অন্য গ্রাম। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, বাসের অধিকারই ছিল একমাত্র অধিকার। পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুরুষই গৃহস্বামী, যদিও বাড়ির কর্তৃত্ব একেবারেই প্রথম যুগে ছিল স্বামী-স্ত্রী দু'জনের। তখন মেয়েদের খানিকটা স্বাধীনতা ছিল, কন্যা নিজে বর পছন্দ করে বিয়ে করত। হয়তো-বা পরিবারের মধ্যেও নারী-পুরুষের এক ধরনের সাম্য ছিল। অন্য এক ধরনের স্বাধীনতারও কিছু কিছু নজির পাওয়া যায়। বুদ্ধিমতী নারী হয়েও যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এমন কথা শুনি। যুদ্ধে বিশ্‌পলার একটি পা কাটা গেছে, দেবতা অশ্বিনরা তাকে কাঠের পা গড়ে দিছেন তাও বলা আছে। যখন প্রাগার্য ও অন্যান্য

গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ চলছে তখন নারী হয়তো সমাজে কতকটা সমান অধিকার পেত, পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধও কত। যে কুমারীরা বাপের বাড়িতেই বুড়ো হয়ে যেত তাদের 'কুলপা' কন্যা, 'অমাজু' বা 'অমাজুরা' (অমা=বাড়ি, সেখানে যে জীর্ণ হচ্ছে) বলা হত। সমাজে হয়তো পুরো সম্মান তারা পেত না, কিন্তু বিয়ে যে বাধ্যতামূলক হয়ে যায়নি তখনও, যেমনটা পরবর্তীকালে হয়েছিল, তার প্রমাণ রয়ে গেছে। সম্ভবত, বেশ অল্পকালের মধ্যেই নারীর এই স্বাধীনতা চলে যায়। প্রথমদিকের আর্যদের দেবমণ্ডলীর মধ্যে কিছু দেবী ছিল— ঊষা, ইলা, ভারতী, সরস্বতী, বাক্, ইত্যাদি পরে ক্রমে পুরুষ দেবতাদের সংখ্যাই বাড়তে থাকে। অর্থাৎ সমাজে তখন পুরুষ প্রধান হয়ে উঠেছে।

এখনও যেমন তখনও তেমনই সমাজে বিবাহের বাইরেও নারীপুরুষের সম্পর্ক ঘটত; বেদে তার বিস্তর নজির মেলে এবং এ নিয়ে সমাজ মোটেই শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিল না। বিধবা বিবাহ হয়তো খানিকটা প্রচলিত ছিল, সতী প্রথা অর্থাৎ সহমরণ ছিল না। শত্রুর ক্ষতি করার জন্যে বহু প্রার্থনা আছে, প্রার্থনাগুলিতে পরাজিত শত্রু ও ভিন্ন গোষ্ঠীর সম্বন্ধে হিংসার বহু নজির পাওয়া যায়।

সাধারণ ভাবে মানুষ দীর্ঘজীবন কামনা করত এবং প্রথম পর্যায়ে লোকে জীবন সুখের বলেই মনে করত। মৃত্যুর পরে স্বর্গনরকের কল্পনা তখনও নেই, মৃত্যুকে অন্ধকারময় দুঃখের অবস্থা মনে করা হত। দীর্ঘকাল ধরে সূর্য দেখবার প্রার্থনা বারেবারেই শোনা যায়। জীবনটা দুঃখের, তার থেকে বেরিয়ে পড়াই ভাল, এমন কথা ব্রাহ্মণসাহিত্যেও শোনা যায় না।

'সূর্যের স্ত্রী ঊষা যাচ্ছে'— লক্ষ করি যে ঊষা সূর্যের আগে আগে যায়, কাজেই স্ত্রী সর্বদাই স্বামীর পিছনে থাকত না। 'ঊষা নিজের সৌন্দর্য সকলের সামনে প্রকাশ করছে', 'মা যাকে স্নান করিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে তেমনই সুন্দরী কন্যা ঊষা।' অগ্নি কেমন শুচি? 'স্বামীর আদরের বধূর মতো।' লক্ষ করি, দেবতার শুচিতার উপমান মর্ত বরবধূর প্রেমে। 'স্বামীকে কামনা করে যে বধূ তার মতো স্মিত হাসি ঊষার।' নরনারীর সম্পর্কের বর্ণনায় একটা সতেজ সৌন্দর্য বারেবারেই চোখে পড়ে।

দেবকুল

দেবতারা সংখ্যায় অনেক। এঁদের মধ্যে প্রথম দিকের দেবতারা প্রাকৃতিক শক্তি দেবরূপে কল্পিত, যেমন সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, নদী, অপঃ (জল), পর্জন্য (ঝড়), ইত্যাদি। দ্বিতীয় এক গোষ্ঠীর দেবতা ছিলেন যাঁদের নিয়ে বহুকাল আগে আর্যরা যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং যাদের যথার্থ পরিচয় ঋগ্বেদের যুগেই লোকে ভুলে গেছে; কারও কারও সম্বন্ধে আবছা একটা স্মৃতিমাত্র আছে, যেমন, ভগ, অংশ, দক্ষ, অর্যমন, বিবস্বৎ, ইলা, ভারতী, ইত্যাদি। তৃতীয় ছোট একটি গোষ্ঠীর মধ্যে সেই সব দেবতারা যাঁরা পূর্বে মানুষ ছিলেন, বিশেষ কীর্তি বা যোগ্যতার জন্যে দেবতায় পরিণত হয়েছেন; যেমন, ঋভুরা, অশ্বিনরা ও ইন্দ্র। একেবারে শেষ পর্যায়ে কিছু বিমূর্ত বা প্রায়-বিমূর্ত শক্তিকে দেবতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে: যেমন,

প্রজাপতি, পুরুষ, ব্রহ্মণ, কাল, হিরণ্যগর্ভ, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, ইত্যাদি।

পশুপালন থেকে আর্যরা যখন চাষ শিখল, তখন বীজ বোনা থেকে ফসল তোলার মধ্যেকার সময়টায় অবসর ছিল এবং চাষের জন্যে জমির কাছাকাছি স্থায়ী ভাবে বাস করতে হত। ওই অবসরে পুরোহিতরা যজ্ঞ ব্যাপারটাকে বিস্তৃত ও জটিল করে তুলতে লাগল। পুরোহিতের সংখ্যা বাড়তে লাগল; তাদের কাজেও ভাগ হতে লাগল, তাদের সহকারীর সংখ্যাও বাড়ল, অতএব দক্ষিণার পরিমাণও চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে লাগল। এটা ঘটেছিল সংহিতার শেষ যুগে।

আর্থিক অবস্থা

যজুর্বেদ-এর আমল থেকেই সমাজের চারটি বর্ণ মোটামুটি কর্মভিত্তিক ছিল। ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা ও শাস্ত্রচর্চা করত, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করত। তা ছাড়া যে সব ক্ষত্রিয়রা রাজার কাছাকাছি থাকত তাদের বলত রাজন্য; প্রধানত এদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সমাজে প্রতিপত্তি নিয়ে একটা রেষারেষি ছিল। বৈশ্য চাষবাস ও পশুপালন করত; শূদ্র ছিল উচ্চ তিন বর্ণের দাস। এ যুগের মাঝামাঝি বৈশ্যের আর্থিক উন্নতি হতে লাগল; পশুপালন ও চাষ ছাড়াও সে বাণিজ্য করে ধনী হয়ে উঠল।

ব্যবসা চলত বিনিময় প্রথায়, যেমন গরুর বদলে কাপড় বা রথ, গরুই ছিল ধনের আদিম একক, তাই ধরে, অর্থাৎ জিনিসের দাম ঠিক হত 'এক গরু' বা 'দু গরু' হিসেবে। যার যে উৎপন্ন দ্রব্যটা বেশি সে তার বাড়তির বদলে দরকারি জিনিস কিনত। এ ভাবে সমাজে নানা বস্তুর উৎপাদকরা দরকার অনুসারে নিজেদের বাড়তি দিয়ে কেনাবেচা করত। সারা পৃথিবীতেই প্রথম অর্থনৈতিক লেনদেন এ ভাবে বস্তুর আদানপ্রদানেই ঘটত। এ দেশে এটা দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল, কারণ, গ্রামকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় এইটিই সবচেয়ে সুবিধাজনক ব্যবস্থা। এই বিনিময়-ভিত্তিক ব্যবসাতেই শ্রেণি-বিভাজনের বীজ আছে; কেউ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেকটা উৎপাদন হয়, বিশেষত এমন জিনিস যার চাহিদা খুব বেশি, তা হলে সে চড়া দামে চাহিদার জোগান দিতে পারে। ফলে ধনী দরিদ্র বিভেদ হবেই। তবে আদিম উৎপাদনব্যবস্থা স্বভাবতই এত অনুন্নত ছিল যে, অবস্থার মধ্যে ফারাক খুব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। দুঃখী মজুরের কথা ঋগ্বেদেই পাই: 'পাথর-কাটার মজুর অনেকক্ষণ পরিশ্রমের পরে মাঝেমাঝে যেমন হাই তুলে পিঠটা টানটান করে নেয়, তেমনই, হে দেবতা আমরা ঘাড় তুলে তোমার দিকে চাইছি।' এখানে ক্লান্ত গরিব মজুরের ছবিটি রয়ে গেছে বহু মজুরের প্রতিনিধি হয়ে।

স্তবের মধ্যে মাঝেমাঝে ধনী বলে আলাদা উল্লেখ থেকে বুঝতে পারি যে, সমাজে প্রাথমিক এক রকম শ্রেণিভেদ ছিল। 'মরুৎরা (বিদ্যুতে) সাজছে যেমন ধনী বর সোনার গয়নায় সাজে।' 'অশ্বিন্‌রা রেভকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করেছেন, যেমন করে মানুষ (কুয়ো থেকে) সোনার কলসি তোলে।' অযোগ্য বর কনের বাড়িতে দামি উপহার দেয়। 'দেবতা

পূষা জানেন কোথায় গুপ্তধন, যেমন ডাকাতরা জানে।' এ সব থেকে ধনীর সঞ্চিত ধনের, লুকোনো সোনার কলসির, গুপ্তধনের খবর জানতে পারি; ঠিক তেমনই কিছু কিছু মন্ত্রে দারিদ্র্যের খবরও পাই: 'অভাবে কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খাচ্ছে গরিব বামদেব, এমন কথাও আছে। সে কী অভাব! কুকুরের মাংসও নয়, নাড়িভুঁড়ি রান্না করছে। অন্য কোনও মাংস জোগাড় করতে পারত না বলে সমাজের সবচেয়ে নিচুতলার মানুষ কুকুরের মাংস খেত, তাই তাদের বলা হত 'শ্বপচ' বা 'শ্বপাক' (চণ্ডাল, যারা শ্বন্ অর্থাৎ কুকুর পাক করে)— অন্য মাংস কেনার সংগতি তাদের দেয়নি যে সমাজ, সেই সমাজই তাচ্ছিল্য করে তাদের 'শ্বপাক' বলেছে।

অভাব থাকলে, ধনী দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য থাকলে চোর থাকবেই। *ঋগ্বেদ*-এ বেশ কয়েকবার চোরের উল্লেখ আছে। 'যে গরু চোর গরুদের নিয়ে গুহায় ঢুকেছে তাকে ধরবার জন্যে যেমন তার পায়ের ছাপ ধরে ধরে লোক খোঁজে।' অর্থাৎ গরু চুরি একটি পরিচিত ঘটনা ছিল। অন্যান্য জায়গাতেও চোরের উল্লেখ আছে। ঠকানোর একটা করুণ উল্লেখ দেখি, 'বুড়ো বাপের সম্পত্তি যেমন ছেলেরা কেড়ে নেয়।' নিষ্ঠুর প্রতারণাও তা হলে সমাজে বিরল ছিল না। রাজারা তো সর্বদাই শত্রু দমন করে থাকে; এক জায়গায় পড়ি, 'রাজা যেমন দুর্বল শত্রুকে দমন করেন যক্ষ্মা তেমনই (দমন) করে সুস্থ মানুষকে।' শত্রু সম্বন্ধে ঈর্ষার বহু বর্ণনা আছে, শত্রুপীড়নেরও। সমাজ তখন গ্রামপ্রধান, গ্রাম গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। প্রত্যেক গ্রামেই মানুষের জীবনধারণের জন্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনের জন্যে যে সব পেশার দরকার ছিল তার সবই থাকত।

যৌথ পরিবার বা কুলে সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষটিই ছিল প্রধান, তারপরে অন্যান্য পুরুষ সদস্যরা বয়স এবং সম্পর্ক অনুক্রমে; তারপরে মেয়েরা, সে-ও বয়সের ক্রম অনুসারে। যদিও বিয়ের কনেকে আশীর্বাদ করে বলা হত: 'শ্বশুর শাশুড়ি, ননদ, দেওরদের ওপরে সাম্রাজ্ঞী হয়ো', তবু সেটা নেহাৎ ইচ্ছাপ্রকাশ মাত্র। বাস্তবের ছবি অন্য রকম। *অথর্ববেদ*-এ পড়ি, সূর্যোদয়ে প্রেতরা যেমন ছুটে পালায়, তেমনই শ্বশুরের সামনে থেকে ছুটে পালায় পুত্রবধূ।' এটাতে আর যাই হোক, সাম্রাজ্ঞী আর প্রজার সম্পর্ক বোঝায় না। অথর্ববেদে আছে, যে বধূ স্বামীর গৃহে ছেড়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে এনে বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মন্ত্র। এক নারীর দুটি এবং দশটি বিবাহের উল্লেখও পাই। এগুলি বহুলপ্রচলিত না হলেও কদাচিৎ নিশ্চয়ই ঘটত। *অথর্ববেদ*-এ সতীদাহের দুটি উল্লেখ আছে, 'এই জীবিত মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃতের বধূ হতে' আর 'এ নারী (সহমরণে) প্রাচীন রীতির অনুসরণ করছে।'

'ব্রাহ্মণ' সাহিত্যে সমাজ ও ধর্ম

মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব নবম শতকের শেষ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে প্রধান ব্রাহ্মণগুলির রচনা। *ঋগ্বেদ*-এর দুটি, *যজুর্বেদ* ও *সামবেদ*-এর অনেক ও *অথর্ববেদ*-এর একটি ব্রাহ্মণ। এগুলিতে আছে যজ্ঞ করার প্রণালী, কোন যজ্ঞে কখন কোন মন্ত্রী কী ভাবে আবৃত্তি করতে হবে, যজ্ঞ করলে লাভ কী, না করলে ক্ষতি কী— এরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ব্রাহ্মণসাহিত্য খুব সংক্ষিপ্ত গদ্যে রচনা। তখনো লেখার প্রচলন হয়নি। সবই মুখে মুখে রচনা এবং সংহিতা ছন্দে রচনা বলে তা কণ্ঠস্থ করা সহজ ছিল। কিন্তু গদ্যে রচিত ব্রাহ্মণ কণ্ঠস্থ করা অসুবিধেজনক ছিল, তাই এই সংক্ষিপ্ত রচনার পদ্ধতি। ব্রাহ্মণের দুটি অংশ: বিধি ও অর্থবাদ; যজ্ঞ সম্বন্ধে নির্দেশকে বলে বিধি। আর যজ্ঞ করলে কী ফল, না করলে কী ক্ষতি তা নিয়ে নানা কাহিনিকে বলে অর্থবাদ'। দেবতারা কী রকম 'বিপদে পড়ে কী কী যজ্ঞ উদ্ভাবন করে' অসুরদের পরাজিত করেন, তারই নানা গল্প এ অংশে। এর ফলে নানা নতুন নতুন যজ্ঞের উদ্ভাবনের ইতিহাস এতে ধরা আছে।

সাধারণ ভাবে সমাজে ব্রাহ্মণ বর্ণের আধিপত্য ছিল, বর্ণগুলির মধ্যে তখনও কিছু সঞ্চরণশীলতা ছিল। এক জায়গায় পড়ি শ্যাপর্ণ সত্যকামের কয়েকটি ছেলে ব্রাহ্মণ, কয়েকটি ক্ষত্রিয়, কয়েকটি বৈশ্য। তখনও ব্রাহ্মণের ছেলে জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হত না এবং ব্রাহ্মণ ছেলের অন্য বর্ণে যেতে সংকোচ ছিল না। যোগ্যতা, রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণে যেতে পারত। ব্রাহ্মণ তিনটি ঋণ নিয়ে জন্মাত; বেদপাঠ করে সে পিতৃকুলের ঋণ শোধ করত, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ঋষিদের এবং সন্তান ও পরিবার উৎপাদন করে দেবতাদের ঋণ শোধ করত। আচার্যের সম্মান খুব উঁচুতে ছিল। এ সময়ে জাতিভেদ প্রথা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। তবু এমন কথাও শুনি যে, পণ্ডিতের জাত নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়। অভিজ্ঞতায় বর্ধিষ্ঠ 'তুথ' জ্ঞানী ছিলেন, দেবতাদের অংশ তিনিই ভাগ করে নিতেন। ব্রাহ্মণত্ব জ্যেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানের পাশাপাশি আর এক রকম আভিজাত্যের কথা *যজুর্বেদ*-এই শুনি: 'অতিথিদের মধ্যে যার শকট বা রথ আছে সেই শ্রেষ্ঠ।' গুণ যে সব সময়ে খাতির পেত তা নয়, যেমন গায়ককে দান করতে নিষেধ করা হয়েছে; দেবতাদের মধ্যে অশ্বিনদের সোমরসের ভাগ দেওয়া নিয়ে আপত্তি ছিল, যদিও সংহিতায় তাঁদের সোমপানের উল্লেখ আছে।

সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল পশুপালন ও চাষ। খাদ্য উৎপাদনের কাজে খুব বড় একটা অংশ নিযুক্ত থাকত। অন্নের প্রশংসা অথর্ববেদ থেকেই শোনা যায়। 'উষ্ণ, সোনালি, পুষ্টিকর, অন্ন, সে-অন্নের প্রতীকী পাত্র সূর্য; প্রাণ অন্নে প্রতিষ্ঠিত।' চাষের প্রসঙ্গে বিভিন্ন

কথা শুনি: বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা, ক্ষেতে হাল-চালানো যেন ভাল ভাবে হয়, জল যেন শুদ্ধ হয়, বীজ বোনা ও রোওয়া যেন ঠিক ভাবে হয়। বীজ পড়া, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ফসলের মড়ক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে প্রার্থনা ও কবচের কথা আছে।

গ্রিস, রোম, মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে বহির্বাণিজ্য আর্যরা এ দেশে আসবার পরই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ব্রাহ্মণের যুগেই তা আবার চালু হয়। লোহার ফলার লাঙলের সাহায্যে সহজে বেশি চাষ করা সম্ভব হয়েছিল। আফগানিস্তান, সিন্ধু, পঞ্জাব থেকে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তর-পশ্চিম বিহারে আর্যরা ছড়িয়ে পড়ে। বিহার ও ছোটনাগপুরে লোহা ও অন্যান্য ধাতুর খনি থাকায় ধাতুশিল্পের উৎপাদনও বাড়ছিল। বনভূমি পুড়িয়ে ফেলে চাষের জমি হাসিল করা চলছিল। উদ্বৃত্ত ফসল ও কুটিরশিল্প উৎপন্ন পণ্য বস্তুর বাণিজ্য দেশের ভেতরে ও বাইরে বাড়বার ফলে সমাজের ওপরের দিকে কিছু লোকের হাতে সম্পত্তি জমা হতে লাগল, আর অধিকাংশ চাষি মজুর সামান্য মজুরি বা পেটভাতায় কাজ করে অতি গরিব অবস্থায় দিন কাটাত।

যজুর্বেদ-এর সময়ে বহুল ভাবে আর্য-প্রাগার্য সংমিশ্রণের ফলে যে সমাজের উদ্ভব হয় তারই বিবর্তন ঘটতে থাকে ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদ যুগে। যজ্ঞের বিস্তার, দীর্ঘস্থায়িতা, প্রকারভেদ, নতুন নতুন যজ্ঞের উদ্ভাবন, এ সবের ফলে সমাজে পুরোহিতের প্রাধান্য বাড়ে এবং সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তিও বাড়ে। ব্রাহ্মণের কর্তব্য বলে নির্ধারিত হল শিক্ষাদানের দ্বারা অন্য বর্ণের 'পরিপাক', মানে জ্ঞানের পরিণতি ঘটানো ও ব্রাহ্মণের নিজের জন্য যশ অর্জন করা। মানুষ এ-ও বিশ্বাস করত যে ব্রাহ্মণরা জাদুবিদ্যা জানত। তাই, বেদ জানে, যজ্ঞ করে, জাদু জানে যে পুরোহিতরা, সাধারণ মানুষ সহজেই তার বশ্যতা স্বীকার করত। এমন কথাও বলা আছে যে 'বেদ ও ব্রাহ্মণ হল মানুষের মধ্যে দেবতা।' যজ্ঞে উৎসর্গ করা হব্য গ্রহণ করে শুধু ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কাছ থেকে হব্য পালিয়ে যায়।' ব্রাহ্মণ দক্ষিণায় তুষ্ট হলে যজ্ঞ স্বয়ং তুষ্ট হয়। আবার শুনি, ব্রাহ্মণ পুরোহিত হল শ্রেষ্ঠ, অগ্নির প্রতীক; যদিও অন্যত্র এমন কথাও আছে যে ক্ষত্রিয় হল ইন্দ্র ও অগ্নি। ক্ষত্রিয়, যোদ্ধা, তেজস্বী, তাই তাকে বিজয়ী সেনাপতি ইন্দ্রের প্রতীক ভাবা যেতে পারে, তেজ ও শক্তির জন্য অগ্নিকেও।

উত্তর পশ্চিম দিক থেকে গঙ্গা যমুনার অববাহিকা হয়ে দক্ষিণ পশ্চিম বিহার পর্যন্ত পৌঁছে যখন আর্যরা প্রাগার্যদের হটিয়ে পুড়িয়ে জঙ্গল সাফ করে ক্রমে ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করে এবং লোহার লাঙলের ফলার ব্যবহার করে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক থেকে যখন চাষের উৎপাদন বাড়াল, তখন সেই সব ছোটখাট রাজ্যের রাজারা ব্রাহ্মণদের ধনরত্ন, পশু, দাসদাসীর সঙ্গে জমিও দান করে নতুন নতুন জনপদ প্রতিষ্ঠা করে আর্যসংস্কৃতির বিস্তার ঘটাচ্ছিল। এ সব জনপদে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বসতি তৈরি হচ্ছিল। এদের মধ্যে সর্বদা সুসম্পর্ক থাকত না, মাঝেমাঝে রেষারেষিও থাকত। 'বিশ্বন্তর সৌসদ্মন শ্যাপর্ণকে দেখতে পারত না। যজ্ঞে তাকে বাদ দেয়। শ্যাপর্ণ যজ্ঞভূমিতে এসে জোর করে বসে; তখন দু'জনের মধ্যে

রাগারাগি গালাগালি চলতে থাকে।' এমন উদাহরণ আরও আছে। কাজেই তখনকার সমাজেও এখনকার মতোই হিংসা ঝগড়া সবই ছিল। সমাজে 'ভাল বামুন, খারাপ বামুন' তখন থেকেই ছিল। কিছু পুরোহিত ব্রাহ্মণের সমৃদ্ধি ও সমাজে প্রতিষ্ঠা বাড়ছিল। যজ্ঞের দক্ষিণা ব্রাহ্মণসাহিত্যের যুগে দ্রুত বেড়ে উঠছিল। হয়তো দক্ষিণা নেওয়া নিয়ে একটা সংকোচও ছিল; এক জায়গায় বলা আছে 'পিছন ফিরে দক্ষিণা নেবে।' যজ্ঞের সংখ্যা ও প্রকারভেদ বাড়ছিল, দক্ষিণাও। শাস্ত্র বলছে, 'দক্ষিণা যজমানকে (যে যজ্ঞ করায়, তাকে) শুচি করে,' এতে যজমান বেশি বেশি দক্ষিণা দিতে উৎসুক হবে। আর সে কী সব দক্ষিণা! অশ্বমেধ যজ্ঞে চারশো গাভী, চার হাজার সোনার টুকরো (মুদ্রা), চারটি বিবাহিতা নারী, একটি কুমারী, চারশো দাসী ও প্রচুর খাবার জিনিস। এত পেতে পেতে পুরোহিতের লোভ সহজেই বেড়ে যাচ্ছিল, বহু ব্রাহ্মণ লোভী হয়ে উঠছিল। তাই ব্রাহ্মণের শেষাংশের একটি উপনিষদের (*ঈশোপনিষদ*) শুরুই হচ্ছে, 'কারও ধনে লোভ কোরো না।' নির্লোভ ব্রাহ্মণও নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু লোভী ব্রাহ্মণ সমাজে উপদ্রবের আকারে দেখা দিয়েছিল বলে বোঝা যায়। ফলে, পরবর্তী শাস্ত্রে 'অকামহত শ্রোত্রিয়'র (নির্লোভ বেদজ্ঞ 'ব্রাহ্মণ') কথা প্রায়ই শোনা যায়। সম্ভবত সেই জন্যেই উপনিষদে দান, দয়া ও সংযমের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে।

সমাজ

ধর্মাচরণ তখনও প্রধানত যজ্ঞ; যজ্ঞের উদ্দেশ্য ঐহিক সুখ, স্বাস্থ্য, আয়ু, বিজয়, পশু, ফসল, শত্রুনাশ, ইত্যাদি। আর যথেষ্ট অন্ন উৎপাদন। 'অশনায়পিপাসে' (ক্ষুধা, তৃষ্ণা) বিষয়ে বারবার নানা কথা বলা আছে। যজ্ঞের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক জায়গায় পড়ি, 'যখন খাবার মাংস না ফুরোয়।' অন্যত্র শুনি, 'যেন পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত অন্নভোজী হই।' 'কেউ যদি জিজ্ঞেস করে— 'যজমান কী করছে?' তা হলে যেন বলতে পারা যায় সে অন্ন আহার করছে।' 'গৃহিণী যেন পুত্রপৌত্রের জন্যে সুস্বাদু অন্ন পাক করেন।'

উপনিষদে আছে স্রষ্টা প্রজাপতি মানুষ সৃষ্টির পরেই খাদ্য সৃষ্টি করলেন। সাধারণ মানুষের জীবনে অন্নাভাব একটা নিত্যকার ব্যাপার ছিল। যথেষ্ট খেটেও সকলে খেতে পেত না বলে ধনীরা মাঝেমাঝে অন্নসত্র করতেন। জনশ্রুতি পৌত্রায়ণের এমন একটি অন্নসত্রের কথা *ছান্দোগ্য উপনিষদ*-এ পড়ি। অন্নদান এ দেশে চিরদিনই পুণ্যকাজ। দুর্ভিক্ষের দিনে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ চণ্ডালের কাছে চেয়ে তার এঁটো মাষকলাই খেয়ে খিদে মেটাচ্ছেন— এমন ঘটনার উল্লেখ আছে। দুর্ভিক্ষ ছাড়া অন্য সময়েও প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য কমই ছিল। *ছান্দোগ্য*-র শৌব উপনিষদে পড়ি ক্ষুধার্ত মানুষের দেখাদেখি কুকুরেরা যজ্ঞের নকল করে বলছে, যেন অন্নভোজী হই। বাড়িতে প্রচুর খাদ্য থাকলে সমাজে একটা প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, এ কথাও বলা আছে। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ শুনি, গরিব ব্রাহ্মণ অজীগর্ত নিজের ছেলে শুনঃশেপকে বিক্রি করতে রাজি, এবং আরও কিছু টাকার বিনিময়ে নিজে হাতে তাকে হত্যা করতেও রাজি। পরে বাবা ছেলের সঙ্গে মিটিয়ে নিতে চাইলে ছেলে রাজি হয় না, বলে, 'তুমি শূদ্রের মতো আচরণ

করেছ।' এর থেকে মনে হয় অভাবে পড়ে শূদ্ররা কখনও কখনও ছেলেমেয়ে বেচতে বাধ্য হত। গোমাংস তখন যজ্ঞে হব্য হিসেবে দেওয়া হত, খাওয়াও হত। যজ্ঞে বেশি সংখ্যায় বলদ বলিদান হচ্ছিল বলে হালের বলদে টান পড়ছিল, তখন মাংস খাওয়ার ওপরে নিষেধ জারি করলেন যাজ্ঞবল্ক্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বললেন, 'আমি কিন্তু (গোমাংস) খাব যদি রান্নাটা ভাল হয়।' সুরাপানও প্রচলিত ছিল এবং কোনও কোনও যজ্ঞে সুরাও দেওয়া হত। ধনীরা দামি সুরা পান করতেন; সেটা ঐশ্বর্যের চিহ্ন বলে ধরা হত। এক জায়গায় পড়ি, 'জনমেজয়ের বাড়িতে সুরাকলস ভরা আছে।' ইন্দ্রকে ত্রিশ কলস সুরা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যজ্ঞে আহ্বান করা হয়েছে; অন্যত্র ইন্দ্রকে সুরা ও মহিষমাংস দেওয়ার কথা আছে। সহজেই অনুমান করা যায়, সাধারণ মানুষও পরিশ্রমের ক্লান্তি ঘোচাতে সস্তার মদ চোলাই করে খেত, নেশাও করত; কিন্তু ব্রাহ্মণ সাহিত্যে এই গরিবদের কথা নেই।

আতিথ্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। অতিথি খুব সম্মানিত ব্যক্তি। তার খাওয়ার আগে যে খায় তার যজ্ঞ ও পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়। অতিথিকে দান করতে হবে চাদর, তোশক, বালিশ, তেল, খাবার, শিলনোড়া, ছাঁকনি, হাতা, কলসি, ভাঁড় ও অন্যান্য তৈজসপত্র। অন্য জায়গায় পড়ি ব্রাত্যদের (এঁরা সম্ভবত বৈদিক আর্যদের আগে-আসা কোনও আর্যগোষ্ঠী) দিতে হবে জামা, ছাতা, বাসন ও অন্যান্য দরকারি জিনিস। অতিথির বিশ্বাস রক্ষা করতে হবে; আশ্রিতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ।

যজুর্বেদ-এর সময় থেকেই দেখি, পুরুষ বহুপত্নীক। একে শাস্ত্রীয় সমর্থন দিয়ে বলা হয়েছে, 'একটি যজ্ঞে যেমন একটা লাঠির গায়ে দু খণ্ড কাপড় জড়ানো থাকে তেমনই একটি পুরুষকে দুটি নারী অবলম্বন করে থাকবে', কিন্তু কোনও নারী দু'জন পুরুষকে অবলম্বন করতে পারবে না। অন্য একটি যাগে কিছু যজ্ঞপত্রকে তুলে ধরা হয়, আর কিছু পাত্রকে নামিয়ে রাখা হয় 'তেমনই সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে তুলে ধরা হবে আর কন্যাসন্তানকে মাটিতে নামিয়ে রাখা হবে।' একটি যজ্ঞে লাঠি দিয়ে ঘিকে মারা হয়। 'নারীকেও তেমনই লাঠি দিয়ে মেরে বশীভূত রাখতে হবে, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তিতে নারীর কোনও অধিকার না থাকে।' 'পুত্র জীবনে আশীর্বাদ, কন্যা অভিশাপ।' নারী ও শূদ্রের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়েছে বারবার; আসলে এ দুজনই ভরণপোষণের জন্যে গৃহস্বামীর ওপরে নির্ভর করে, তাই স্ত্রী হল 'ভার্যা', আর শূদ্র দাস হল 'ভৃত্য' অর্থাৎ 'যাদের ভরণ করতে হয়।' সমাজ নারীর জন্যে স্বাধীন কোনও জীবিকার পথ খোলা রাখেনি; স্বামী, সন্তান ও শ্বশুরবাড়ির সেবাই তার একমাত্র কাজ। শূদ্র গৃহকর্ম করত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সব রকম সেবা করাই তার একমাত্র কর্তব্য ছিল। 'সভা', 'সমিতি', যেখানে গোষ্ঠীর ভাগ ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত সেখানে নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। যজ্ঞে যজমানকে স্ত্রীকে যজ্ঞের পশ্চাতের অর্ধ বলা হয়েছে। যজমানপত্নীকে যজ্ঞকালে স্বামীর পাশে বসতে হত; কিন্তু ওই পর্যন্তই, কোনও মন্ত্র সে উচ্চারণ করতে পারত না। খেটেখুটে যজ্ঞের যা সাহায্য করা তা সে করতে পারত। গৃহ্য যাগে তার সম্বন্ধে কোনও মন্ত্র বা কোনও যাগ নেই। সন্তানসম্ভাবনার পরে প্রথম তাকে

কেন্দ্র করে যে সীমান্তোন্নয়ন বা পুংসবন যাগ হয় তাতে ভাবী সন্তানেরই কল্যাণকামনা, এবং সন্তানটি যেন পুরুষ সন্তান হয় এমন প্রার্থনা থাকে। ওই নারীটির মঙ্গলকামনায় কোনও মন্ত্র নেই। বিবাহের সময় থেকেই তাই, সব মন্ত্রেই বরের পরমায়ু, সমৃদ্ধি, দাস কামনা করা হচ্ছে, এমনকী সদ্যোবিবাহিতা বধূর সামনে তার সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়, 'যেন স্বামীর বহু পত্নী হয়।' বধূ স্বামীর বশীভূত হোক, শ্বশুরবাড়ির কল্যাণ করুক এ সব কথা থাকলেও তার নিজের স্বাস্থ্য, কল্যাণ, পরমায়ু বা সুখের জন্যে কোনও প্রার্থনাই নেই। 'স্ত্রীলাভের আগে সন্তান আসে না, তাই স্ত্রী দরকার।' 'মন্ত্র উচ্চারণের সময়ে শেষের অংশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করতে হবে যাতে স্ত্রীর মন না উন্নত হয়', এ কথা *কৌষীতকি ব্রাহ্মণ*-এ আছে; অর্থাৎ স্ত্রীর মানসিক উন্নতি সমাজ চায়নি। 'বহু স্ত্রীর পক্ষে এক স্বামীই যথেষ্ট', হরিশ্চন্দ্রের একশোটি স্ত্রী ছিল। *শতপথ ব্রাহ্মণ* বলে 'সমৃদ্ধ লোকের চারটি স্ত্রী থাকবে।' রাজারও তাই থাকত, মহিষী, বাবাতা, পরিবৃত্তি ও পালাগলী— এ ছাড়াও একটি কুমারী ও চারশোটি দাসীও থাকবে। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ পড়ি অঙ্গরাজ তাঁর পুরোহিত আত্রেয়কে দশ হাজার দাসী দিয়েছিলেন। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, যজ্ঞ-করা পুরোহিত অত দাসী নিয়ে কী করতেন? কোনও উত্তরই পুরোহিতের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগায় না। যে স্ত্রী পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে পারল না শাস্ত্র তাকে ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে, কাজেই সমাজে নারীর স্থান পুত্রের জননী হিসেবেই। তার নিজের কোনও মূল্য নেই। এই কারণে বিধবার স্থানও সম্মানের ছিল না মনে হয়, তাই প্রার্থনা আছে, 'যেন ইন্দ্রাণীর মতো অবিধবা হই।' 'নারী, শূদ্র, কালো পাখি ও কুকুর মিথ্যা। এদের দেখা উচিত নয়।' 'ছুঁচো, বেজি, নারী, শূদ্র ও কালসাপ মারলে একই প্রায়শ্চিত্ত।' এ সবের মধ্যে প্রকাশ পায় সমাজে নারীর স্থান কোথায় ছিল।

শূদ্র সম্বন্ধেও তাই। গৃহ্যসূত্র বলে, 'কোনও দেবতা থেকেই শূদ্রের উৎপত্তি হয়নি,' যদিও *ঋগ্বেদ*-এ ব্রহ্মার পা থেকে তার সৃষ্টি, এমন কথা শুনি। শূদ্রের কোনও গৃহ্যযাগ (দশকর্ম) নেই; তার উপনয়ন নেই, অর্থাৎ বেদপাঠ নেই। বেদ যদি সে কানেও শোনে তাহলে সীসে গলিয়ে তার কানে ঢেলে দিতে হবে, বেদ উচ্চারণ করলে তার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। শাস্ত্র বহুবার বলে, শূদ্রের একমাত্র কাজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সেবা করা। একটি জায়গায় পড়ি, কেউ যদি বেশি খরচের যজ্ঞ শুরু করার পর দেখে তার অর্থে কুলোচ্ছে না তখন সে অনায়াসে শূদ্রের ধন কেড়ে নিতে পারে, এতে কোনও পাপ হয় না। অন্য এক জায়গায় শুনি, 'শূদ্রের স্ত্রীকে অন্য বর্গের পুরুষ যথেচ্ছ ভোগ করতে পারে।' এই সব শাস্ত্রই তখনকার আইন এবং এ আইনে শূদ্র ও নারীকে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর প্রথম পরিণতি কুষাণ যুগের রচনা *মনুসংহিতা*-য়, সেখানে শূদ্র উনমানব। অথচ ব্রাহ্মণ মনীষীরা যেমন সমাজকে শাস্ত্র, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, গণিত, ইত্যাদি দিয়েছে, তেমনই দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যায় অনেক কিছুই নিশ্চয়ই শূদ্রেরই উদ্ভাবন। গাড়ির চাকা, কুমোরের চাক, তাঁতির তাঁত, রাজমিস্ত্রির মাপজোকের নকসা ও যন্ত্র, চাষের সেচপদ্ধতি, ঘর ছাওয়ার কৌশল, মাছ ধরার নানা ধরনের জাল, শিকারির

ফাঁদ-গুলতি, তীর-ধনুক, ধাতু গলানোর কৌশল, পাথর কাটা ঘষা, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি, প্রাসাদ, বাগান, বিহার, গুহা তৈরি— এ সব নিশ্চয়ই শূদ্রেরই উদ্ভাবন ও সৃষ্টি। তার নিজস্ব রচনা নাচগানও নিশ্চয়ই ঘুরপথে সমাজে পৌঁছে উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু শাস্ত্র, পুরোহিত ও উচ্চবর্ণের কাছে নারী বা শূদ্র কেউ পুরোপুরি মানুষ নয়।

এই সময়ে তখনকার আর্য-প্রাগার্য মিশ্র গোষ্ঠীতে প্রথম শ্রেণিবিভাজন দেখা দেয় খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ষষ্ঠ শতকে। এর ফলে সমাজে দেখা দিল মুষ্টিমেয় ধনী ও অসংখ্য দরিদ্র। কিছু ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণ, রাজন্য ক্ষত্রিয়, নব্যধনী বৈশ্যরা সমাজে বিত্তকৌলীন্য ভোগ করত। এই সময়ে ব্রাহ্মণের পেশা ছিল অধ্যাপনা, ধর্মশাস্ত্র রচনা ও যজ্ঞ করা। রাজন্য ক্ষত্রিয় রাজকার্যে ও দেশের সুরক্ষার দায়িত্বে ছিল। এরা ক্ষমতাশালী রাজপরিষদ। মানুষের কাম্য বস্তু পাওয়ার জন্যে যজ্ঞ করত ব্রাহ্মণ এবং এইটেই ছিল তার ক্ষমতার উৎস। ক্ষত্রিয় ছিল রাজার প্রসাদপুষ্ট, তার জোর এখানেই। এই দুই শ্রেণিই উৎপাদনের পরিশ্রম থেকে রেহাই পেয়েছিল এবং যারা গায়ে গতরে খাটত তাদের নিচু চোখে দেখত। শ্রমের বিভাজনই সমাজে উঁচু নিচু বিভেদ সৃষ্টি করল; চাষি মজুর কুটিরশিল্পী কারিগর ও দাস সমাজের নিচুতলায় নেমে এল।

আরণ্যক উপনিষদ যুগ

যজুর্বেদ-এ আর্য-প্রাগার্য সংমিশ্রণের ফলে যে সমাজ তৈরি হয় তারই বিবর্তন ঘটতে থাকে আরণ্যক উপনিষদ যুগে। যজ্ঞের বিস্তার, দীর্ঘস্থায়িতা, প্রকারভেদ ও জটিলতা এবং নানা নতুন যজ্ঞের উদ্ভাবনের ফলে সমাজে পুরোহিতের প্রাধান্য বাড়ে এবং সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তিও বাড়ে। যজ্ঞের বৃদ্ধি ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের দক্ষিণার পরিমাণও বাড়ছিল। ক্ষত্রিয় রাজা ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মধ্যে প্রাধান্য নিয়ে সংঘাতের কিছু প্রমাণ শাস্ত্রে আছে।

আরণ্যক ও উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। আরণ্যক সংখ্যায় দু-তিনটি। প্রধান উপনিষদ চোদ্দটি: *ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য* ও *বৃহদারণ্যক* এ দশটিই বেশি পরিচিত। এ ছাড়া অন্য প্রধান উপনিষদ হল, *মহানারায়ণীয়, মৈত্রায়ণীয়, শ্বেতাশ্বতর* ও *কৌষীতক*। আরণ্যকে যজ্ঞ থেকে জ্ঞানের দিকে সরে যাচ্ছে শাস্ত্র; যজ্ঞকে রূপক হিসেবে ব্যাখ্যা করছে। উপনিষদে গুরুশিষ্য সংলাপে, কাহিনিতে এবং নানা আলোচনায় সৃষ্টি ও জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি আলোচনা আছে। প্রথম দিকের উপনিষদ গদ্যে রচনা, পরে ছন্দে কিংবা ছন্দ-গদ্য মিশিয়ে। উপনিষদ মানে এমন বিদ্যা, যা আচার্যের কাছে (উপ) বসে (নি+সদ=বসা) শিখতে হয়। অনেকগুলি উপনিষদই রচিত হয়েছে গুরুশিষ্য সংলাপের ভঙ্গিতে। যেন শিষ্য প্রশ্ন করছে, আচার্য উত্তর দিচ্ছেন। এ ছাড়াও উপনিষদে মাঝেমাঝে উপাখ্যান, তত্ত্ব-আলোচনা, বংশাবলী, ইত্যাদি আছে।

উপনিষদের প্রধান প্রবক্তা যাজ্ঞবল্ক্য এবং তাঁর প্রধান বক্তব্য হল, মানুষের মধ্যে যে আত্মা তাই ব্রহ্ম এবং সৃষ্টির মধ্যে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য পদার্থ। বাকি যা তা যথার্থ সত্য নয়। অবশ্য সব উপনিষদে ঠিক এ কথা বলা নেই, এমন ভাবেও নয়। যেহেতু উপনিষদগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন অঞ্চলে নানা দ্রষ্টার দেখার বা উপলব্ধির বিবরণ, তাই এগুলি এক ছাঁচে ঢালা নয়। অন্ধের হাতি দেখার মতো শুঁড় দাঁত পা পিঠ সবই সত্য, অথচ কোনওটাই পুরো সত্য নয়। উপনিষদে বিভিন্ন ঋষির দৃষ্টিতে দেখা জীবনের তত্ত্ব পাই। সৃষ্টি সম্বন্ধে কেউ বলেন, 'তিনি তপস্যা করলেন, পরে সৃষ্টি করলেন', আবার কেউ বা বললেন, 'প্রথমে জল সৃষ্টি করলেন, পরে জল থেকেই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি'।' এর মধ্যে সমতা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। যার যা মনে হয়েছে অসংকোচে বলেছেন। 'আত্মাই ব্রহ্ম' এই কথা ছাড়াও উপনিষদে আরও অনেক কথা আছে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল জন্মান্তরবাদ, অর্থাৎ মানুষ মৃত্যুতে শেষ হয় না, নানা রূপে বারেবারে জন্মায়। জন্মান্তর ঘটবেই। তখনকার দুঃখী মানুষের কাছে জীবন

এত দুর্বহ মনে হত যে, আবার পরের জন্মে দারিদ্র, রোগব্যাধি, ঋণ, ঋণশোধ অক্ষমতা তার দরুন শাস্তি, প্রবলের নানা উৎপীড়ন, ইত্যাদির মধ্যে ফিরে ফিরে জন্মাবার সম্ভাবনা সাধারণ মানুষের কাছে বুঝি-বা একটুও আকর্ষণীয় মনে হত না। সমাজপতি ও শাস্ত্রকাররা উপনিষদে প্রচার করলেন যে, কেউ যদি 'আত্মা-ই ব্রহ্ম' এই কথাটা বুঝে উপলব্ধি করতে পারে, তা হলে তার মোক্ষ হয়, অর্থাৎ আর জন্মাতে হয় না। এখানে দেখি সংহিতা আমলের প্রার্থনা, দীর্ঘকাল পৃথিবীতে বাস করে জীবনকে উপভোগ করার আশা থেকে মানুষ কতটাই সরে এসেছে। মোক্ষ পাওয়ার উপায় কী? জ্ঞান, আত্মাই ব্রহ্ম এই কথাটা জানা পৃথিবীকে সত্য মনে না করা। জীবনের লক্ষ্য ও তার উপায়, দুই-ই পুরোপুরি বদলে গেছে। লক্ষ্য এখন আর পৃথিবীতে দীর্ঘকাল সুখী জীবনযাপন করা নয় বরং পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসার সম্ভাবনাটাকেই নষ্ট করা। উপায়ও এখন আর কর্ম অর্থাৎ যজ্ঞ নয়। যজ্ঞে যা পাওয়া যায়, তা হল সব রকম দৈহিক সুখ; কোনও কোনও জায়গায় স্বর্গের উল্লেখও আছে। কিন্তু নতুন পর্বে জ্ঞান যা দেয় তা হল ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে মোক্ষ। বলা বাহুল্য, অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে জ্ঞানের মাধ্যমে 'আমিই ব্রহ্ম' এ বোধে পৌঁছনো সহজ ছিল না। ফলে তারা যে তিমিরে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। না পারল খরচ করে যজ্ঞ করে ঐহিক সুখ অর্জন করতে, না পারল আত্ম-ব্রহ্ম চেতনা অর্জন করে দুঃখময় জীবনের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থেকে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতে।

সামাজিক বিন্যাস এ যুগে ব্রাহ্মণসাহিত্যের যুগের মতোই ছিল। অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতিও উপনিষদের যুগে ক্ষত্রিয় জ্ঞানের জগতে অন্য এক ধরনের প্রাধান্য পাচ্ছে। ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণ জৈবলি ব্রাহ্মণ আরুণির কাছে যেমন জ্ঞানলাভের জন্যে যাচ্ছেন তেমনই ক্ষত্রিয় রাজা অশ্বপতির কাছে পাঁচজন ব্রাহ্মণ যাচ্ছেন এমন কথাও শুনি। জন্মান্তরতত্ত্ব এ সময়ে নতুন, এ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় রাজা জনক ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে বলছেন, 'এর আগে এ জ্ঞান (জন্মান্তরবাদ) কখনওই ব্রাহ্মণে বাস করেনি।' তার মানে, ক্ষত্রিয়ই প্রথম ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী ছিল, ব্রাহ্মণ তার কাছ থেকেই তা পায় ও পরে এ জ্ঞানের একাধিপত্য লাভ করে। উপনিষদে যে ব্রহ্মজ্ঞানচর্চার কথা পড়ি তার জন্যে পণ্ডিত চিন্তাশীল মানুষের দার্শনিক বিষয়ে তর্কসভা হত, তার নাম ব্রহ্মোদ্য অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনাসভা। প্রায়ই সভা বসত কোনও রাজদরবারে এবং বেশ কিছু রাজা এ সব সভায় যোগ দিতেন এমন উল্লেখ আছে। কর্মকাণ্ডে যেমন প্রধান অধিকারী ছিল ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও ধনী যজমান পুরুষ, উপনিষদে সেটা আমূল পালটে গেল। তখনও ব্রাহ্মণের একটা মুখ্য ভূমিকা ছিল, কিন্তু বেশ কয়েকজন ক্ষত্রিয় রাজা ব্রহ্মবিষয় আলোচনা করেছেন। ক্ষত্রিয় পুরুষ ছাড়াও মৈত্রেয়ী ও গার্গী— এ দুজন নারীও ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, যদিও যাজ্ঞবল্ক্য প্রকাশ্য সভায় গার্গীকে অপমান করেছেন, যেমন জনক রাজা সুলভাকে অসম্মান করে কথা বলেছেন। বোঝা যায় নারীর ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা পণ্ডিত সমাজ ভাল চোখে দেখত না।

বেদবিরোধী ধর্মধারা: জৈন ও বৌদ্ধধর্ম

নানা ব্যাপার উপনিষদের ধারাকে প্রভাবিত করেছিল। সম্ভবত ঋগ্বেদের সময় থেকেই, হয়তো বা প্রাগার্য সমাজের অংশবিশেষেই, কিছু মানুষ সন্ন্যাস সাধন করত। মনে পড়ে, সিন্ধুসভ্যতার উৎখননে পাওয়া যোগী মূর্তি, মনে পড়ে *ঋগ্বেদ*-এর 'ইন্দ্র' 'যতি'দের ছেড়ে দিচ্ছেন শলাবৃক (হিংস্র প্রাণী) দের কাছে। অথবা, 'রুদ্র মুনির সঙ্গে বিষপান করছেন।' আবার খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধ তাঁর সাধনার পথে আরাড় কালাম, রুদ্রক রামপুত্র, নির্গ্রন্থ জ্ঞাতপুত্র, অজিত কেশকম্বলী, পূরণ কাশ্যপ, মস্করী গোশাল, প্রভৃতি নানা সন্ন্যাসীর দেখা পেয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই বেশ কিছু শিষ্য ছিল। অর্থাৎ, ভারতবর্ষে অন্তত খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতক থেকেই নানা সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছিল। এরা কেউ বেদ বা যজ্ঞে বিশ্বাস করত না, কেউ কেউ জন্মান্তরে বিশ্বাস করত।

সাধারণ মানুষ দেখত, এরা দুরাচার নয়, যজ্ঞ ও বেদচর্চা না করেও এরা দিব্যি খেয়ে পরে বেঁচে আছে, কাজেই বেদ না মেনেও সৎ ও সুখী জীবনযাপন করা যায়। মানুষ এও দেখত যে, যে-উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হত তা সব সময়ে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া যারা নিজেরা দরিদ্র বলে যজ্ঞ করাতে পারে না, পুরোহিত নয় বলে নিজেরা যজ্ঞ করতে পারছে না, ব্রাহ্মণ নয় বলে যাদের উপনয়ন হয়নি, অতএব প্রত্যক্ষ ভাবে যারা বৈদিক যজ্ঞধর্মে অনধিকারী, তারা দেখল একটা বিকল্প জীবনের ধারা আছে, বিকল্প ধর্মাচরণেরও। এরা বিভিন্ন বেদবিরোধী দলে যোগ দিল।

বেদবিরোধী প্রস্থানের মধ্যে প্রধান হল জৈন, বৌদ্ধ ও আজীবিক। এদের মধ্যে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের আগেকার। মহাবীর সিদ্ধার্থের কিছু আগে থেকেই তাঁর ধর্ম প্রচার শুরু করেন। জৈনধর্মই প্রথম বর্ণবিভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এ ধর্মে কয়েকটি নীতি আছে: অহিংসা, চুরি না করা, মিথ্যা না বলা, সম্পত্তি অর্জন না করা ও ব্রহ্মচর্য পালন করা। প্রথম চারটি আগে থেকেই ছিল, পঞ্চমটি মহাবীর যোগ করেন। জৈনধর্মে দেবতাদের স্থান জিন এর নিচে, ধর্মে যে সিদ্ধি লাভ করেছে সেই জিন। এ ধর্মে অনুষ্ঠান নেই বললেই চলে, নিজের সাধনায় চিত্তকে বন্ধনমুক্ত করাই এর লক্ষ্য; এটা ঘটে জ্ঞান, বিশ্বাস ও নীতিসঙ্গত কর্মের দ্বারা। এই তিনটিকে বলে ত্রিরত্ন।

জৈনধর্ম

জৈনরা শিক্ষিত লোকের ভাষা সংস্কৃতের বদলে শাস্ত্র ও কাব্য রচনায় অর্ধমাগধী প্রাকৃত

ব্যবহার করেন। এতে সাধারণ লোকের বুঝতে সুবিধে হত, কারণ এ ভাষা তাদের কথ্য ভাষার কাছাকাছি। এঁরা বেশ বড় একটি সাহিত্যসম্ভার রচনা করেন এবং ভারতবর্ষের বহু জায়গায় উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য ও স্থাপত্য সৃষ্টি করেন। অহিংসা নীতির জন্যে এঁরা যুদ্ধবিরোধী, এমনকী কীটপতঙ্গ মেরে ফেলার ভয়ে এঁরা মাটি কুপিয়ে চাষও করেন না; ফলে ব্যবসাবাণিজ্যেই এঁরা প্রতিষ্ঠিত। জৈনধর্ম উত্তর ভারতে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে; দক্ষিণে কলিঙ্গ, অন্ধ্র ও কর্ণাটকেও।

বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্মের মূল কথা হল, মানুষের পাপ ও দুঃখের মূলে তৃষ্ণা; অন্তর থেকে বাসনাকে উপড়ে ফেলতে পারলেই আর পুনর্জন্ম হবে না, নির্বাণ লাভ করা যাবে। এর জন্যে অষ্টাঙ্গ মার্গ বা আটটি নীতি হল: সত্য দর্শন, সত্য সংকল্প, সত্য বাক্য, সত্য ক্রিয়া, সত্য জীবিকা, সত্য অনুশীলন, সত্য স্মৃতি ও সত্য ধ্যান। বুদ্ধের নির্দেশ প্রধানত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের জন্যেই, তবে নীতিগুলি গৃহীরাও মেনে চলতে পারে। বিস্তর মঠ, স্তূপ, চৈত্য ও সঙ্ঘারামে বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শন আছে। এ ধর্ম একদা ভারতবর্ষের বাইরে শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, জাপান, চিনে ও তুরস্কে প্রচুর বিস্তারলাভ করে। এখনও ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের সংখ্যা সামান্যই, ওই সব দেশেই বেশি। ফলে আড়াই হাজার বছর ধরে বহু বিভিন্ন ভাষায় বৃহৎ এক বৌদ্ধ সাহিত্যসম্ভার রচিত হয়েছে। বুদ্ধের অনেক পরে এ ধর্মের দুটি ভাগ হয়, পরবর্তীরা আগের পন্থাকে হীনযান ও নিজেদের মহাযান বলে। মহাযানের সাহিত্য বিপুল। এশিয়ার বিস্তৃত এক অঞ্চলে বৃহৎ এক বৌদ্ধ সাহিত্যসম্ভার রচিত হয় এবং বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রচুর নিদর্শন মেলে। সহিংস ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রবল এক অহিংসার প্লাবন আনে এবং যজ্ঞ ও জাতিভেদের মূলে কুঠার হানে। এর প্রভাব স্থানে ও কালে বহু বিস্তৃত।

সংখ্যায় বৌদ্ধ ও জৈনরা যতই বাড়ছিল, মূল ব্রাহ্মণ্য ধর্মধারার আতঙ্কও ততই বাড়ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বেদবিরোধীদের নিজেদের গণ্ডির মধ্যে ধরে রাখবার একটা উপায় বের করল। বলল, আগে যেমন বাল্য-কৈশোরের জন্যে ব্রহ্মচর্য, যৌবন-প্রৌঢ়ত্বের জন্যে গার্হস্থ্যের বিধান ছিল, এখন তেমনই প্রৌঢ়ত্বের জন্যে বানপ্রস্থ ও বার্ধক্যের জন্যে যতি বা সন্ন্যাস বলে অন্য দুটি আশ্রম স্বীকার করা হল। বয়স অনুসারে ধর্মাচরণের ব্যবস্থা হল। বানপ্রস্থে বনে থাকবার সময়ে খুব সাধারণ অগ্নিহোত্র ইত্যাদি যাগের বিধান রইল, যা নেহাৎ স্বল্প উপকরণে এবং অল্প সময়ে সেরে ফেলা যায়। সন্ন্যাস বা যতিতে তাও নেই, সন্ন্যাসী যেমন ইচ্ছা ঘুরে বেড়াতে পারে। বলা বাহুল্য, ওই সময়কার সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলি যজ্ঞ করার অনিচ্ছা ও বনে বনে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা এখন ব্রাহ্মণসমাজ গৃহীর জীবনে শেষ দুটি আশ্রম হিসেবে মেনে নিল, এতে ওই সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ খানিকটা খাদে নেমে এল।

যজ্ঞে অনাস্থার আর এক প্রকাশ ব্রাহ্মণ্যধর্মও এখন কর্মকাণ্ড বা যজ্ঞ থেকে সরে এসে জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করল, এই ভাবে যজ্ঞে অনীহা সমাজে স্বীকৃতি পেল, যদিও ধনী প্রভাবশালী লোকেরা এর পরেও বহুকাল ধরেই যজ্ঞ করে চলেছিল। উপনিষদ, বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক কালটা অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ত, সারা পৃথিবীতেই— গ্রিস, রোম, চিন, মিশর, ইরান, সর্বত্রই— ব্যাপক ও গভীর ভাবে ধর্ম-আন্দোলনের যুগ ছিল। ভারতবর্ষেও এর অভিঘাত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। বুদ্ধের সময়েই সমাজে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ভেঙে 'কুল' বা বৃহৎ যৌথ পরিবার এখন সমাজের ন্যূনতম একক হয়ে উঠেছে। বৈশ্য প্রাধান্য পাচ্ছে, কারণ অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য তখন তাদেরই হাতে এবং জৈন ও বৌদ্ধদের প্রতি তাদের বিশেষ আনুকূল্য। ভাস্কর্যে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এ সময়ে। বুদ্ধের জীবনী ও অন্যান্য সামাজিক কাহিনির চিত্রণ বেশ উঁচু মানে পৌঁছয়। জৈন বৌদ্ধ স্তূপ, বিহার, চৈত্য, সঙ্ঘারাম বণিকদের অর্থসাহায্য পেত। সমাজে বৈশ্য বণিক বিত্ত-কৌলীন্যে যেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। ষষ্ঠ শতকেই মুদ্রা ও লিপির (খরোষ্ঠি ও ব্রাহ্মীর) প্রবর্তন হয়। কোশল ও মগধে ছাপচিহ্নিত রুপোর মুদ্রা পাওয়া যায়। প্রধানত শ্রেষ্ঠীদের বাণিজ্যেই এর ব্যবহার। রাজস্ব, বেতন, জরিমানা এতেও ব্যবহার হত। ব্রহ্মত্র এবং দেবত্র সম্পত্তির পরিমাণ বাড়ছিল, এগুলি নিষ্কর ছিল। ব্রাহ্মণ ও যোদ্ধা ক্ষত্রিয়কে রাজকর দিতে হত না, ফলে বৈশ্যের ওপরে করের বোঝা বাড়ছিল। বৈশ্য ধীরে ধীরে চাষ ও পশুপালন ছেড়ে বাণিজ্যে আসে; চাষ, পশুপালন চলে যায় শূদ্রের হাতে। এ ছাড়া সমস্ত কুটিরশিল্প গোষ্ঠীবিভক্ত শূদ্রদের হাতে আসে; তাঁতি, কামার, কুমোর, রথকার, রাজমিস্ত্রি, নানা ধাতুশিল্পী, প্রভৃতিদের পেশা শূদ্রেরই একচেটিয়া হয়ে গেল।

মগধের অভ্যুত্থান

এই সময়ে আর্যাবর্তে ষোড়শ (ষোলোটি) মহাজনপদের উদ্ভব হয়: মগধ, কোশল, বৎস, অবন্তী, বজ্জি, লিচ্ছবি, কাশী, মল্ল, কুরু, পাঞ্চাল, অঙ্গ, চেদি, গান্ধার, অশ্মক, শূরসেন ও কম্বোজ। এগুলির মধ্যে ক্ষমতা ও প্রতাপ মাঝেমাঝেই এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে গেছে, কিন্তু শ তিনেক বছর ধরে এগুলি আর্যাবর্তে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিল। রেশম (বাণিজ্য) পথে উটের কাফিলায় ও বড় জাহাজে এদের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাইরের বহু রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ছিল।

ষোড়শ জনপদের মধ্যে ক্রমে মগধ প্রধান হয়ে ওঠে। অন্য দু-একটি জনপদকে মগধ যুদ্ধে ও অন্য ভাবে আত্মসাৎ করে নেয়। ফলে মগধের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। প্রথম রাজধানী রাজগৃহ, প্রথম বিখ্যাত রাজা বিম্বিসার (৫৪৪-৪৯২ খ্রি.পূ.); ইনি বুদ্ধভক্ত ছিলেন। এঁর ছেলে অজাতশত্রু (৪৯২-৪৬০ খ্রি.পূ.) বুদ্ধবিদ্বেষী; বাবাকে হত্যা করে সিংহাসন পান। অজাতশত্রুর পরে উদয়ী (৪৬০-৪৪০ খ্রি.পূ.); এঁর আমলে গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে একটি দুর্গ নির্মিত হয়। উদয়ীর পরে মগধের ক্ষমতায় আসে শিশুনাগ বংশ, রাজধানী যায় বৈশালীতে। এঁদের যুগে অবন্তীর শক্তিক্ষয় হয় ও অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী ধ্বংস হয়। এতে মগধ ও বৈশালীর মধ্যে একশো বছরের শত্রুতার অবসান ঘটে। শিশুনাগদের পরে সিংহাসনে আসে নন্দরা, এরা মগধের খুব শক্তিশালী রাজবংশ। নন্দরা অসম্ভব ধনী ও শক্তিশালী ছিল। সেই কারণে আলেকজান্ডার যখন মধ্যপ্রাচ্য, ইরান, কাবুল হয়ে এসে পঞ্জাব আক্রমণ করেন, তখন নন্দদের প্রতাপের খবর পেয়ে পঞ্জাব থেকেই ফিরে যান, মগধ আক্রমণ করেননি। আলোকজান্ডারের আক্রমণের সময়ে উত্তর ভারতে অনেকগুলি খণ্ডরাজ্য ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ সালে আলেকজান্ডার তক্ষশিলা জয় করে বিপাশা নদীর কাছে পৌঁছন। ছোট রাজা পুরুর আত্মমর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারে সম্ভ্রম বোধ করে আলোকজান্ডার তাঁকে নিজের রাজ্য ফিরিয়ে দেন। গ্রিক সৈন্যরা বহুদিন ধরে যুদ্ধ করে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত বোধ করছিল, এমন সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধজয় করা যায় না বলে আলেকজান্ডার ফিরে যান। তিনি উত্তর পশ্চিম ভারতের একটা বড় অংশ জয় করেছিলেন, এ রাজ্যও অল্পকালের মধ্যেই গ্রিকদের খাস দখলের বাইরে চলে যায়। কাবুল ও সিন্ধুদেশে আলেকজান্ডারের নামে দুটি শহর ও ঝিলমের ধারে বুকিফেলা বলে একটি শহর রয়ে যায়। আলেকজান্ডারের সহযাত্রীরা

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা তথ্য লিখে রাখেন। যেমন এখানকার অর্থনীতি, সমাজনীতি, সতীদাহ, বাজারে মেয়ে বিক্রি, এখানকার ভাল জাতের ষাঁড়, ভাল রথ, জাহাজ ও নৌকা তৈরির খবর আমরা ওই গ্রিক ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে পাই। ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোকে ধ্বংস করে আলেকজান্ডার পরবর্তীকালে বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তুললেন।

নন্দবংশ ক্রমে শক্তিহীন হয়ে আসে এবং শেষ পর্বে এত হীনবল হয়ে যায় যে, পরে মৌর্যরা তাদের সিংহাসন দখল করে নেয়। মগধের প্রধান রাষ্ট্রশক্তি হওয়ার মূলে একটি কারণ তার ধাতুর খনিগুলি। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই লোহা গলিয়ে লাঙলের ফলা ও যুদ্ধের অস্ত্র তৈরি হত। প্রথম রাজধানী রাজগৃহ, পাহাড়ে ঘেরা। প্রকৃতিই রাজগৃহকে রক্ষা করতে বাইরের আক্রমণ থেকে। পঞ্চম শতকে রাজধানী উঠে আসে পাটলিপুত্রে, সে-ও গঙ্গা, শোণ, ঘর্ঘরা ও পুনপুনের সঙ্গমস্থলে, কাজেই শত্রুর পক্ষে আক্রমণ করা দুঃসাধ্য। গাঙ্গেয় উপত্যকার ঠিক মাঝখানে পড়ে পাটলিপুত্র (এর চারপাশে পলিমাটি ও অরণ্যভূমি, চাষ ও কাঠের সুবিধে ছিল)। বাকি ভারতে যখন ঘোড়া আর রথ নিয়ে যুদ্ধ চলছিল তখন মগধ প্রথম হাতি ব্যবহার করে এই সুবিধে পেল যে, হাতি যে সব দুর্গম জায়গায় যেতে পারে ঘোড়া তা পারে না।

মগধে মগধ ও কিরাত জাতির অনেক লোক ছিল, অভিজাত ব্রাহ্মণ সমাজ এদের নিচু চোখে দেখত। উত্তরের আর্যরা মগধে পৌঁছল অনেক দেরিতে, ফলে আর্যদের সঙ্গে মগধ ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের কিরাতদের একটা সংমিশ্রণ ঘটল। দেরিতে আর্যায়ণের ফলে এখানকার অধিবাসীদের একটা উৎসাহ জাগল রাষ্ট্রশক্তির ব্যাপ্তি ঘটানোর জন্যে। মগধ হয়ে উঠল অপরাজেয়। চাষে উন্নতি, কুটিরশিল্পের উৎপাদন, বহির্বাণিজ্য, ইত্যাদির পিছনে আছে বিপুল পরিসরে নগরায়ণ (গ্রামগুলোকে শহর তৈরি করা)। মহেঞ্জোদরো হরপ্পার পতন ঘটে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের কাছাকাছি, তারপরে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগে সেই আয়তনের শহর আর তৈরি হয়নি। ষোড়শ মহাজনপদের যুগে নতুন শহরে মোটের ওপরে শিল্প-শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও প্রশাসনিক লোকেরা থাকত, তাদের খাবার জোগান দিত চারপাশের গ্রামগুলো। শহরে রাজপরিবার, রাজন্যবর্গ, বণিক, শিল্পপতি ও পুরোহিতরা থাকত। এদের খাবার সংস্থান করা সম্ভব হত না যদি না রাজ্যে যথেষ্ট পরিমাণ খাজনা উঠত। টাকা যাদের হাতে জমছিল, তারা নানা ব্যাপারে ক্রমে বেশি বেশি টাকা খাটিয়ে বড় রকমের ধনীতে পরিণত হচ্ছিল। এই সময়ের অস্ত্র মাটির নীচে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে; মনে হয়, দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রাখতে প্রশাসনকে বলপ্রয়োগ করতে হত, অবাধ্য প্রজা বা বিদ্রোহী প্রতিবেশী রাজ্যকে শাসনে রাখতেই অস্ত্রের প্রয়োজন হত। এই সময়ে লেখারও চল হয় এবং মুদ্রার চল হয়—অর্থাৎ আমরা শহর বলতে যা বুঝি তার অনেক কিছুরই উৎপত্তি হয় এই সময়ে। মুদ্রা চালু হলে পর নানা পেশার লোকের মজুরি বা মাইনে টাকায় দেওয়া সম্ভব হল। পেশাদার সৈনিকদের বহু সংখ্যায় চাকরি দেওয়া সম্ভব হতে লাগল এবং টাকায় মাইনে পাওয়ার ফলে

তারা যখন শ্রেষ্ঠী (বণিক)দের কাফেলার রক্ষী হিসেবে দূর দূর দেশে যেত তখন টাকা ভাঙিয়ে খাবার ও দরকারি জিনিস কিনতে পারত। বাণিজ্যের প্রসার হওয়ার ফলে নানা রকমের বিলাসদ্রব্য বাজারে দেখা গেল।

বহু গ্রামের নাম এ সময়ে পাওয়া যায়, এগুলি মোটামুটি তিন শ্রেণির। প্রথমত বিভিন্ন পেশার লোকের বসতি যে গ্রামে সেখানকার প্রধানের নাম 'ভোজক', দ্বিতীয়ত একই পেশার লোকের বাস যে গ্রামে, এগুলি পণ্যবিপণন (মাল কেনাবেচার) কেন্দ্র বা বাজার হয়ে উঠত, শহর ও গ্রামের যোগসূত্র ছিল এই গ্রামগুলি। তৃতীয়ত প্রান্তিক গ্রাম যেগুলি একটি জনপদের প্রান্তে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই শিকারী ও ফলমূল সংগ্রহকারী; এ গ্রামগুলি জঙ্গলের কাছাকাছি থাকত। শিল্পে নিযুক্ত মানুষদের 'পূগ' বা 'শ্রেণি'ও এই সময়কার; কোনও বিশিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের সমবেত অর্থ ও স্বার্থরক্ষার জন্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি। এদের ইংরেজিতে 'গিল্ড' বলে; এখনকার ইউনিয়নের কিছু কিছু দায়িত্ব এরা পালন করত, অন্য ধরনের কাজও করত।

গ্রামগুলিতে অনেক কিছুই সমবেত স্বার্থের জন্যে তৈরি হত, যেমন পুকুর, বেড়া, সেচের খাল, সাঁকো, ইত্যাদি। প্রত্যেক পরিবার তার আয়ের ছ'ভাগের একভাগ খাজনা দিত, কিন্তু দেবত্র বা ব্রহ্মত্র জমি নিষ্কর ছিল। বৈশ্যদের একটা অংশ সম্পন্ন চাষি, তাদের নাম ছিল গৃহপতি। চাষ এবং প্রযুক্তি (কারিগরি) বিদ্যায় এ সময়ে বিপুল উন্নতি দেখা যায়। যারা গায়ে গতরে খাটে না এমন নানা বৃত্তির বিস্তর লোকের অন্নসংস্থান করবার মতো প্রাচুর্য তখন সমাজে এসেছিল, তাই বড় সৈন্যদলের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া এবং জনহিতকর স্থাপত্য ও অন্যান্য সংগঠন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল।

শাসনব্যবস্থায় নানা কাজের নানা আধিকারিক ছিল, সবচেয়ে ওপরে মহামাত্র, মন্ত্রী, তারপরে থাকত সেনানায়ক, বিচারক ও আযুক্ত। বড় পদের কর্মচারী, সেনানায়ক বাদে সম্ভবত ব্রাহ্মণরাই এ পদগুলি পেত, এগুলি বংশানুক্রমিক ছিল না। গ্রামের প্রধান ছিল গ্রাণী, গ্রামিণী, গ্রামিক বা গ্রামভোজক। রাজধানীতে রাজা ও অন্যান্য শহরে রাজকর্মচারী ও শ্রেষ্ঠীরাই ছিল প্রধান। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রজারা ফসল দিয়েও খাজনা দিতে পারত। চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণরা রয়ে গেল, বাকিরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে পেশাগত জাতিতে পরিণত হল। লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আগেকার মতো আর সভা বা সমিতি দিয়ে শাসন বড় শহর বা গ্রামে সম্ভব ছিল না। ফলে ব্রাহ্মণদের নিয়ে গঠিত ছোট একটি সভা— পরিষদই স্থানীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করত। বুদ্ধের সময় থেকেই পূর্বাঞ্চলে কিছু গণতন্ত্র ছিল। রাজতন্ত্রে যেমন সমস্ত রাজস্ব রাজারই, গণতন্ত্রে সে অধিকার ছিল গোষ্ঠীপতিদের; এরা অর্থভাণ্ডার, শস্যভাণ্ডার ও অস্ত্রভাণ্ডারের মালিক ছিল। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব সৈন্যদল ছিল। রাজতন্ত্রে ব্রাহ্মণের যে প্রতাপ ছিল, এখানে তা ছিল না; এদের সমাজে ধনী নেতারাই হর্তা-কর্তা-বিধাতা ছিল। মৌর্যযুগে গণতন্ত্র ক্ষীণ হয়ে আসে, রাজতন্ত্র একমাত্র হয়ে ওঠে।

সমাজ

এই সময়ে আর্যাবর্তের সমাজে শূদ্রের স্থান ক্রমশ নিচু হতে থাকে। ব্রাহ্মণের মর্যাদা তো ছিলই, বৈশ্যও বিত্তকৌলীন্যে প্রধান হয়ে ওঠে, শূদ্র ক্রমে নীচে নামতে থাকে। এদের অনেকেই প্রায় অস্পৃশ্য হয়ে ওঠে; তিন বর্ণের সেবা করা ও গৃহদাস হওয়া ছাড়া হাতের কাজ করা ও জনমজুর খাটাই ছিল এদের সমাজনির্দিষ্ট পেশা। জৈন ও বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ নেই। তবু এ যুগে শূদ্রের প্রতি অত্যাচার ও অসম্মান আগের মতোই ছিল, বরং বাড়ছিল।

দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন অনুসারে শাসন করত রাজপ্রতিনিধি এবং গ্রাম বা শহরের প্রতিনিধি। শাসন ছিল বর্ণভিত্তিক, অর্থাৎ উঁচু জাতের লোকের সাজা কম হত, একই দোষে নীচু জাতের লোকের বেশি সাজা হত। সাজা ছিল জরিমানা থেকে আরম্ভ করে, জেল খাটা এবং নানা নিষ্ঠুর অত্যাচার— হাত, পা, নাক, কান কেটে নেওয়া, চোখ, জিভ উপড়ে নেওয়া, নির্দয় ভাবে বেত মারা থেকে অন্যান্য অত্যাচারে মেরে ফেলা পর্যন্ত।

এই সময়ে বেদের শেষতম অংশ বেদাঙ্গ রচনা হচ্ছিল। এর মধ্যে ছিল শিক্ষা (ঠিক ভাবে শব্দ উচ্চারণের নিয়ম), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বেদের শব্দের উৎপত্তি) ছন্দ, জ্যোতিষ এবং কল্প। কল্পের মধ্যে সমবেত যাগের জন্যে শ্রৌতসূত্র, গার্হস্থ্য, দশকর্মের জন্যে গৃহ্যসূত্র, চারবর্ণের ও চার আশ্রমের জন্যে নিয়ম ধর্মসূত্র ও বেদি নির্মাণের জ্যামিতির হিসেব শুল্বসূত্র। বেদাঙ্গের দরকার হচ্ছিল প্রধানত দুটো কারণে। আর্যরা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় ব্রাহ্মণসাহিত্যের শেষ যুগেই, ফলে আর্যাবর্তের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলছিল। এ সব অঞ্চলে যারা আগে থাকত তারা ব্রাহ্মণ্য প্রভাব থেকে অনেক দূরে নিজস্ব ধর্ম অনুষ্ঠান সংস্কৃতি নিয়ে বাস করছিল; যজ্ঞ আরম্ভ করতেই নানা সমস্যা দেখা দিল: উচ্চারণপ্রণালী, ছন্দ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত— এ সব তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। যজ্ঞ যাতে আবৃত্তি, গানে, ছন্দে, সুরে ও অনুষ্ঠানে নিয়ম মতো নিষ্পন্ন হয় তা ঠিক করবার জন্যে তত্ত্বগুলোও জানতে হবে; বেদাঙ্গ তারই শাস্ত্র। বেদাঙ্গের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিজগতে একটা বড় পরিবর্তন এল: ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, ইত্যাদি যজ্ঞের জন্যে শুরু হলেও বেদাঙ্গ রচনার মধ্য দিয়েই যজ্ঞের সঙ্গে এদের নাড়ির বাঁধন ছিঁড়ল; ধীরে ধীরে এগুলি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হয়ে উঠল, যার সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস বা অনুষ্ঠানের আর কোনও যোগ রইল না। এই আলাদা চর্চার ফল দেখি, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম চতুর্থ শতকে পাণিনির ব্যাকরণ রচনায়, এতে ছোট একটি 'বৈদিক প্রকরণ' থাকলেও আসলে এটি সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষারই ব্যাকরণ। এটি পৃথিবীর মধ্যে একটি অসাধারণ ব্যাকরণ, তখনও অন্য কোনও দেশে এমন ব্যাকরণ রচনা হয়নি।

মৌর্যযুগ

রাষ্ট্র

যে রাজবংশ মৌর্য বলে পরিচিত তা 'মুরা' নামে কোনও দাসীর ছেলের নাম থেকেই সৃষ্টি এমন কথা চলিত আছে; কিন্তু বৌদ্ধসাহিত্যে 'মোরিয়' (=মৌর্য) নামের একটি ক্ষত্রিয় কৌমের (গোষ্ঠীর অংশ) নাম পাওয়া যায়। এরা বিহার-নেপাল সীমান্তে বাস করত। খুব সম্ভব প্রথম মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এই বংশেরই লোক। নন্দবংশের শেষ দুর্বল রাজাকে উচ্ছেদ করে উনি কূটবুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রী চাণক্য বা কৌটিল্যের পরামর্শে মৌর্যশক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন আলোকজান্ডারের গ্রিক প্রতিনিধি সেলিউকাস উত্তর পশ্চিম ভারতে শাসন করতেন। বিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে রাজ্যের কিছু অংশ ও পাঁচশ' হাতির বদলে পঞ্জাব থেকে বিহার, ওড়িশা, বঙ্গদেশ, অন্ধ্র, কর্ণাটক পর্যন্ত দখল করেন ও এই বিশাল ভূভাগের একচ্ছত্র সম্রাট হন। এর আগে ভারতবর্ষে এত বড় বা এমন কোনও সাম্রাজ্য ছিল না।

মৌর্যযুগ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের প্রধান একটা সূত্র গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিসের লেখা বিবরণ এবং কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* (যা মৌর্যযুগের কাছাকাছি কোনও সময়ের রচনা)। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২৪-৩০০ খ্রি.পূ.) প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। বহু বিচক্ষণ মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীর সাহায্যে তিনি সুবিস্তৃত রাজ্যটি পরিচালনা করতেন। প্রত্যেক প্রদেশের অধিকর্তা বিবাহসূত্রে যথাসম্ভব রাজপরিবারের সদস্য হতেন। প্রথমে পাটলিপুত্র, পরে কৌশাম্বী, তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনীও একে একে মৌর্যযুগের রাজধানী হয়েছিল। রাজ্য পরিচালনার ভার ছ'টি সমিতির অধীনে; এরা জনস্বাস্থ্য, বিদেশি আগন্তুকদের দায়িত্ব, জন্মমৃত্যু নথিভুক্ত করা, ওজন-বাটখারার সাম্যরক্ষা ও অন্যান্য বিষয় পরিদর্শন করত। রাজ্যে অশ্বারোহী, গজারোহী, রথারূঢ় ও পদাতিক সৈনিক, নৌসেনা ও ভারবাহীদের নিয়ে বৃহৎ একটি সৈন্যবিভাগ ছিল। প্রত্যেকটির দায়িত্বে থাকত পৃথক কর্মচারী।

সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে রাজ্যের আয়তন বাড়ছিল। সমস্ত অর্থনৈতিক বিষয়ই রাজ্যের অধীনে থাকত: যেমন চাষের আয় বাড়ছিল, অতএব ফসল থেকে বাড়তি খাজনা জমছিল রাজকোষে, বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য গ্রাম থেকে শহরে আসার পথে পথকর ছিল এবং ফসল, শিল্প, বাণিজ্য, অপরাধীর দেওয়া জরিমানা এ সব নিয়ে রাজকোষ স্ফীত হয়ে উঠছিল। চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠু ও কার্যকরী ছিল। শাসনের যে কাঠামো তখন তৈরি হয় তা বহুকাল পর্যন্ত চালু ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের পরে রাজা হন বিন্দুসার (৩০০-২৭৩ খ্রি.পূ.)। এঁর সঙ্গে গ্রিক রাজাদের যোগাযোগ ছিল। বিন্দুসারের পুত্র অশোকই (২৭৩-২৩৬ খ্রি.পূ.) মৌর্যসাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা, হয়তো সারা পৃথিবীরই একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। বৌদ্ধ সাহিত্য বলে, যৌবনে ইনি চণ্ডস্বভাবের ছিলেন—এটা অবশ্য কিংবদন্তীও হতে পারে। কলিঙ্গ জয় করতে গিয়ে, হতাহতের বিপুল সংখ্যা ও যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা দেখে ইনি খুব ক্লিষ্ট ও অনুতপ্ত হন এবং আর কখনও যুদ্ধ করেননি। এরপর অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন এবং প্রজার সুখ ও ধর্মাচরণের জন্য নানা ব্যবস্থা নেন। বিস্তর শিলালিপিতে অশোক প্রজাদের ধর্ম-উপদেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকেও তিনি সদুপদেশ দিয়েছেন: প্রজাদের বলেছেন, রাজাকে পিতার মতো দেখতে, কারণ তিনি তাদের সন্তানজ্ঞান করেন। 'ধম্ম' (ধর্ম) হল নৈতিক জীবনযাপনের মানদণ্ড। এ সম্বন্ধে নানা নীতি তিনি দিকে দিকে শিলালিপিতে প্রচার করেছেন। অশোক রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন দূরদূরান্তের নানা দেশের সঙ্গে। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার গ্রিক রাজ্যগুলি থেকে ভারতবর্ষের উত্তরে, দক্ষিণে ও শ্রীলঙ্কায় ধর্মপ্রচারের জন্যে প্রচারক ও রাষ্ট্রদূত পাঠান। বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে জানা যায়, অশোক তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসভা আহ্বান করেন, এবং এখান থেকে দূতরা শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্ম দেশে ধর্মপ্রচার করতে যান। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতকের ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা শিলালেখ শ্রীলঙ্কায় পাওয়া গেছে। অশোকের সময়ে সম্ভবত একবারই নীতি ও রাষ্ট্রনীতি পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং এ দুয়ের মধ্যে একটা সমঝোতাও হয়। রাজ্যশাসন যথেচ্ছচারী ছিল না বা কেবলমাত্র রাজা বা রাজ্যের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্যে শাসনব্যবস্থা প্রয়োগ করা হত না। প্রজাদের চরিত্রের উন্নতির জন্যে রাষ্ট্রশক্তি সচেষ্ট ও তৎপর ছিল; সম্রাট হিসেবে এটা অশোকের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল।

রাজ্যশাসনে যথাসম্ভব কম নিষ্ঠুরতা ছিল এবং রাজা নিজে যা পালন করতেন সেই ধর্মোপদেশ প্রজাদের জন্যে শিলালিপিতে উৎকীর্ণ করতেন। অশোকের 'ধম্ম' কোনও সংকীর্ণ অর্থের ধর্ম নয়, এ ধর্মের মানে অহিংসা, মৈত্রী, সর্বজীবে করুণা, অন্যায়ের প্রতিরোধে সহিষ্ণুতা। এ ধর্ম নৈতিক, যা মানুষের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে দেশে হিংসাদ্বেষের প্রভাব কমায়।

এত অহিংসার বাণী সত্ত্বেও অশোকের রাজত্ব কিন্তু দুর্বল ছিল না। বিরাট পরিসরে পরিব্যাপ্ত রাজ্যটি শাসনের দিক থেকেই সংহতই ছিল। পালিভাষায় ধর্মপ্রচার, ধর্মসাহিত্য রচনা, ব্রাহ্মীলিপির ব্যাপক ব্যবহারেও আর এক ধরনের সংহতি এসেছিল। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণ (সন্ন্যাসী) রাজার কাছে সমান ন্যায় ব্যবহার পেতেন, তাঁর বাণীতে তিনি উভয়কেই সম্মান করতে শিক্ষা দিতেন।

মৌর্যযুগে শাসনব্যবস্থার উন্নত ধরণ ছিল। রাজকর্মচারীর সংখ্যা ছিল অনেক, যার মধ্যে ছিল প্রধানমন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ, প্রভৃতি পদ। এদের অধীনে বিস্তর কর্মচারী নিযুক্ত

থাকত। এত বেশি সংখ্যায় প্রশাসনিক কর্মচারী ভারতবর্ষে কম রাজত্বেই থেকেছে। এই কর্মচারীদের উপরতলার সঙ্গে নিচের তলার মাইনের পার্থক্য ছিল অনেক। এত কর্মচারীকে মাইনে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, কারণ মগধসাম্রাজ্য তখন অঙ্গ, বৈশালী, কাশী, কোসল, অবন্তী, কলিঙ্গ জনপদ জয় করে সাম্রাজ্যের প্রচুর বিস্তার ঘটিয়েছিল। এই বিস্তৃত রাজ্য থেকে রাজস্ব, পণ্য, ফসল, জরিমানা ও উপঢৌকন বাবদ বিস্তর টাকা রাজকোষে নিয়মিত ভাবে আসত। কৌটিল্য বলেন, চাষি, কুটিরশিল্পী, ব্যবসায়ী এরা সকলেই খাজনা দিত, টাকায়, ফসলে ও উৎপন্ন দ্রব্যে। কেবলমাত্র সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল বলে সে সব সংগ্রহ করে রাজকোষ ও ভাণ্ডার ভাল ভাবে রাখার ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল। সারা রাজ্যে বাটখারাগুলো যেন ঠিক ওজনের থাকে তা দেখারও কর্মচারী ছিল, তেমনই তাঁত, পশমবোনা, ইত্যাদি পেশার তদারকি করবার পৃথক কর্মচারী ছিল। জমি জরিপের, পয়ঃপ্রণালী ও সেচ ব্যবস্থার তদারকির ভার থাকত ভিন্ন ভিন্ন কর্মচারীর ওপরে। এই সময়কার ছাপ দেওয়া মুদ্রায় পাহাড়, ষাঁড় ও অর্ধচন্দ্রের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

মৌর্যযুগে সমাজ

ভারতবর্ষে গ্রিস বা রোমের মতো রাষ্ট্রের কাজে নিযুক্ত ক্রীতদাস ছিল না; পরিবারের মধ্যে গৃহদাস হিসেবে তারা কাজ করত, মনিবের জমিতেও খাটত। মৌর্য সাম্রাজ্যেই প্রথমবার রাষ্ট্র পরিচালিত ক্ষেতে যুদ্ধের বন্দি দেড় লাখ ক্রীতদাসের কাজ করার খবর পাই। কেন্দ্রীয় শাসন বেশ সক্রিয় ছিল; একটা কারণ হল, পাটলিপুত্রের অবস্থান। চারিদিকে নদী থাকায় নৌ-বাণিজ্যের সুবিধে ছিল। একটি প্রশস্ত রাজপথ পাটলিপুত্র থেকে নেপাল হয়ে বৈশালী, চম্পারণে পৌঁছেছিল; আর একটি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বৈশালী চম্পারণ কপিলাবস্তু হয়ে দেরাদুনের কালসি পর্যন্ত গিয়েছিল। কলিঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, কর্ণাটক পর্যন্তও রাস্তা ছিল। অশোকের শিলালিপি থেকে বোঝা যায় কত বিস্তৃত ভূভাগের ওপরে রাজপথগুলি প্রসারিত ছিল। জনসংখ্যা খুব বেশি ছিল না; মনে হয়, অশোকের সময়ে রাজ্যে পঁয়ষট্টি লাখের মতো লোক ছিল। স্বভাবতই কেন্দ্র থেকে বেশি দূরে শাসনব্যবস্থা কিছু শিথিল ছিল।

সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বহু দেশের বাণিজ্য সম্পর্কে স্থাপিত হওয়ার ফলে শিল্প সাহিত্যে একটা অভূতপূর্ব স্ফূরণ লক্ষ করা যায়। এর কিছু আগে থেকেই বিহার, ছোটনাগপুর অঞ্চলের খনি থেকে লোহার ব্যবহার শুরু হয়, কিন্তু লোহা গলিয়ে তার থেকে ইস্পাত তৈরি করা, এই যুগেরই কৃতিত্ব। মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র চাষের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি, ধাতুর তৈরি জিনিসে, ধাতু ঢালাই ও পালিশের কাজে খুব উন্নতি চোখে পড়ে। পোড়া মাটির কাজ, যাকে বলে 'উত্তর অঞ্চলের কৃষ্ণমসৃণ মৃৎশিল্প', তা-ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। মৌর্যসাম্রাজ্যের অনেক দূর দূর অঞ্চলে অত্যন্ত উঁচু মানের পালিশ করা পাথরের থাম পাওয়া গেছে। থামগুলির মাথায় সিংহ বা ষাঁড়ের ভাস্কর্যও খুব নিপুণ শিল্পকৃতি। বিখ্যাত অশোকস্তম্ভটি এই উৎকর্ষের

একটি নিদর্শন। 'বরাবর' পাহাড়ে 'লোমশ ঋষির গুহা' বলে বিখ্যাত গুহাটির দ্বারে পাথরে খোদাই একটি উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম মৌর্য সাম্রাজ্যের এক প্রসিদ্ধ শিল্প নিদর্শন। উত্তর ভারতের 'চিক্কণ কৃষ্ণ কৌলাল' (মৃৎশিল্প)-এর যুগ এটা।

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-তে নানা রকম খাজনার উল্লেখ পাই। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এত রকম খাজনা দেওয়ার পর সাধারণ লোকের হাতে সামান্যই টাকা থাকত। কাজেই সমাজের স্পষ্ট বিভাজন ছিল, স্বল্পসংখ্যক ধনী আর অগণ্য দরিদ্র। এই সময়কার বৌদ্ধ সাহিত্যে বহু কাহিনিতে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য দেখি। উপনিষদ, বৌদ্ধ, জৈন সাহিত্য একবাক্যে এই সাক্ষ্যই দেয়। সমাজে জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরের এই সাহিত্যে বারেবারেই দেখি এক জন্মে সৎ জীবনযাপন করলে, উঁচু তিনটি বর্ণের সেবা করলে শূদ্র ও নারীও পরজন্মে সদ্বংশে ধনী, সুস্থ, প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ হয়ে জন্মাতে পারে। প্রধান পুণ্য হল দয়া, ক্ষমা অহিংসা, মৈত্রী ও দান। সদাচারিণী নারী পরজন্মে পুরুষ হয়ে জন্মাতে পারে এমন কথা অনেক কাহিনিতে আছে। সদগুণ, যেমন সত্যবাদিতা, আশ্রিতবাৎসল্য, তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা), দয়া, অহিংসা এ সব আচরণ করলে ভাল বংশে সুস্থ ধনী পুরুষ হয়ে জন্মানো যায়। ছোটখাট দেবতা হয়েও জন্মানো যায়, কিন্তু তারা যে সৎ নৈতিক ভাবে উজ্জ্বল জীবন পরজন্মে পায়, এমন কথা কাহিনিতে কদাচিৎ মেলে। তবু মহাযানে বোধিসত্ত্বরা অন্য দুর্বল সাধকদের নির্বাণের পথে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে স্বেচ্ছায় নিজেদের নির্বাণ বিলম্বিত করেন— এতে একটি যথার্থ নীতিবোধের পরিচয় আছে। অর্হৎ বোধিসত্ত্বরা ক্রমে ক্রমে নির্বাণের দিকে এগোতে থাকেন। বৌদ্ধমতে নির্বাণই হল প্রায় উপনিষদের মোক্ষের মতো। মোক্ষ বা নির্বাণ দুই-ই নিজের স্বার্থের চিন্তা, প্রায় সব ধর্মেই এইটিই লক্ষ্য। এ কথা উচ্চারিত হচ্ছে সেই সমাজে যেখানে সাধারণ মানুষের জীবন ক্রমেই রাজশাসনের চাপে ও দারিদ্র্যে কঠোর ভাবে পিষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থাই অবশ্য সাধারণ মানুষকে একাগ্র করে তুলবে যাতে এ দুঃখময় জীবনের আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই চেষ্টা করতে। এতে সমাজের উচ্চপদস্থ ধনী ও রাজন্যের সমূহ সুবিধা, কারণ পরজন্মে ভাল বংশে সুস্থ ধনী সুখী পুরুষ হয়ে জন্মানোর লোভ দেখিয়ে ওই দুঃখী মানুষগুলোর একান্ত সেবা ও আনুগত্য তারা এ জন্মে আদায় করে নিতে পেরেছিল। আর বাড়তি লোভও দেখানো হত অন্তিমে মোক্ষের।

একটু ভেবে দেখলে অবশ্য মোক্ষ বা নির্বাণ খুব লোভনীয় অবস্থা নয়। পরবর্তী সাহিত্যে ব্রহ্মের সংজ্ঞা দিয়েছে 'সৎ, চিৎ ও আনন্দ' বলে। সৎ অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে, চিৎ অর্থাৎ যে চেতনা স্বরূপ আর 'আনন্দ' অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ। এই ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাওয়াই মোক্ষ। কিন্তু ব্রহ্ম যেহেতু নির্গুণ তাই এ আনন্দ মানুষের চিত্তবৃত্তি দিয়ে অনুভব করা যাবে না, কারণ সগুণ সত্তাই শুধু অনুভব করতে পারে। ফলে ব্রহ্মে 'বিলীন হয়ে' যাওয়াটা বোধের বাইরেই থাকবে। বৌদ্ধমতে 'নির্বাণ' মানে নিভে যাওয়া। আত্মা যদি দীপশিখার মতো হয় তো নির্বাণে সে এমনই নিভে যায় যে, তার থেকে আর প্রদীপ জ্বালানো যাবে না, অর্থাৎ পুনর্জন্ম আর হবে না। দুই অবস্থাতেই জন্ম বা জীবনবাসনা ফুরিয়ে যায় বলে পুনর্জন্ম আর হয় না।

ঋগ্বেদ-এর কয়েকশো বছর পরে সাধারণ লোকের কাছে জীবনের মানে এমন পালটে গেছে যে সেই 'একশো শরৎ দেখা'র বাসনা মিলিয়ে গিয়ে এখনকার কামনা হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জীবন থেকে ছুটি পাওয়া। কর্মফলের জন্যে যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ যেন পরজন্মটা এই দুঃখী জীবনের পুনরাবৃত্তি না হয়, তাই নারী বা শূদ্র বা দুঃখীদরিদ্র মানুষের কাজ হবে মুখ বুজে এ জন্মে শক্তিমানদের সেবা করে লাথিঝাঁটা খেয়ে চলা।

অশোকের পরে বেশ তাড়াতাড়ি মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। প্রথমত, কলিঙ্গ বিজয়ের পরে নতুন কোনও রাজ্য মৌর্যরা আর জয় করেনি। উত্তর আফগানিস্তানে গ্রিকরা ব্যাকট্রিয়া রাজ্য স্থাপন করেছিল; কিন্তু শকরা যখন পারস্য থেকে চিন ও ভারতবর্ষের দিকে ঠেলে আসছিল তখন চিন সম্রাট চিনের সুরক্ষার জন্যে প্রকাণ্ড এক প্রাচীর তৈরি করান। মৌর্যরা তেমন কোনও সুরক্ষার ব্যবস্থা করেনি, ফলে পার্থীয়রা ও শকরা ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে এল। অহিংসার প্রভাবে যুদ্ধ আর হচ্ছিল না, বৌদ্ধ প্রভাবে নির্যাতন প্রায় বন্ধ ছিল; কিন্তু এ শুধু মৌর্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের কাছাকাছি, প্রত্যন্ত অঞ্চলে নানা ধরনের অত্যাচার বাড়ছিল। মৌর্যদের নানা ধরনের খাজনার চাপে প্রজারা পিষ্ট হচ্ছিল। বহু রকমের প্রশাসনিক পদ তৈরি হওয়ায় মাইনের খাতে খরচ বাড়ছিল, এর চাপটা প্রকারান্তরে প্রজাদের ওপরেই এসে পড়ছিল, কাজেই সাধারণ মানুষের দৈন্যদশা বাড়ছিলই। অশোক ও তাঁর পারিষদরা বৌদ্ধ হলেও সাধারণ লোক তখনও ব্রাহ্মণ্য ধর্মেই ছিল এবং এরা চেষ্টা করছিল যাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার প্রধান হয়ে ওঠে। ফলে শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে প্রকাশ্যে খুন করে তাঁর শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী পুষ্যমিত্র। সেটা ১৮০ খ্রিস্টাপূর্বাব্দ, মগধের সিংহাসনে শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা তখন।

মৌর্যযুগের সমাজ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থাবলী এবং *রামায়ণ* ও *মহাভারত* থেকে খানিকটা জানা যায়। *রামায়ণ*, *মহাভারত* থেকে জানতে পারি সামাজিক মূল্যবোধের খবর এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে পাই সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার একটি ছবি। বৈদিক যুগের শেষ পর্বে যে সব মূল্যবোধের ও বিধিনিষেধের সূত্রপাত হয় এ যুগে তাই আরও দৃঢ়মূল হচ্ছিল। রাজা এখন সমাজের শীর্ষে এবং রাজা ক্রমশ দেবতাঁয় পরিণত হচ্ছিল। তার পাশাপাশি শক্তিমান ছিল পুরোহিত, শাস্ত্রকার ও মন্ত্রীরা; এরা ব্রাহ্মণ। যেমন রাজার বিরুদ্ধে গেলেই ভয়াবহ রকমের শাস্তির বিধান ছিল, তেমনই পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে গেলেও রাজদণ্ড, শাপশাপান্ত, একঘরে হওয়া, ইত্যাদির সঙ্গে পরজন্মে আরও দুর্দশার হুমকি। তাছাড়া বহু পূর্ব ও উত্তর পুরুষের দুর্গতির সম্ভাবনা। ফলে সাধারণ মানুষকে রাজা ও পুরোহিতদের ভয় করেই চলতে হত।

পরিবারের মধ্যে সকলের চেয়ে শক্তিমান ছিল গৃহস্বামী অর্থাৎ বয়স্কতম পুরুষটি, যার হুকুম বাকি সকলকে বেদবাক্যের মতো মেনে চলতে হত; তার সপক্ষে সমস্ত শাস্ত্র, ফলে পরিবারে সে একচ্ছত্র সম্রাট। তার নিচে অন্যান্য পুরুষ সদস্যরা বয়স ও সম্পর্কের মান অনুসারে। তারপর শাশুড়ি-ননদরা, পুত্রবধূরা যারা বাড়ির বাকি সকলের সেবিকা। সাধারণ ভাবে বৈদিক যুগের প্রথম পর্যায় থেকে সমাজে ক্রমান্বয়ে নারীর স্থান যে নেমেই যাচ্ছিল

তার অনেক নিদর্শন আছে। ধনসম্পত্তিতে তার অধিকার ছিল না, এমনকী নিজের দেহের ওপরেও তার কর্তৃত্ব বা অধিকার ছিল না। বৈদিক যুগের উত্তরপর্বে যখন প্রাগার্যরা যুদ্ধে বন্দি হয়ে, দাস রূপে আর্যদের খেতে খামারে বা কারখানায়, ভারী কাজগুলো করছে তখন থেকেই প্রত্যক্ষ উৎপাদনের সঙ্গে নারীর যোগ চলে যায়। তখন সমাজে তার নির্দিষ্ট জায়গা হল পরিবারের সেবা এবং সন্তান— মুখ্যত পুত্র উৎপাদনে। তার উপনয়ন ছিল না, ফলে কোনও বিদ্যা অর্জন করে, জীবিকা অর্জন করার উপায় ছিল না। শূদ্র ও নারী ছিল ভৃত্য ও ভার্যা, অর্থাৎ যাকে ভরণ করতে হয়। এই ভরণের বিনিময়ে সব রকমের স্বাধীনতা গচ্ছিত রেখে নারীকে বাঁচতে হত। নিশ্চয়ই কিছু কিছু সদাশয় পুরুষ নারীর সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করত, কিন্তু যে করত না শাস্ত্র তারই পক্ষে। ফলে ভাল ব্যবহারটা প্রধানত ব্যতিক্রমীই ছিল মনে করলে ভুল হবে না। সমাজে কুমারী, বিধবা, স্বামীপরিত্যক্তা ও সন্তানহীনের সম্মানের জায়গা ছিল না। শাস্ত্রের লক্ষ্য অনিবার্য ভাবেই নারীর অবনমনের দিকে। নিয়ম বেড়ে চলেছে এবং নারীর বঞ্চনা সে নিয়মে শাস্ত্রীয় সমর্থনই পেয়েছে।

পরিবারে ও সমাজে ব্রাহ্মণ দেবতার মতো পূজা পেত, রাজন্যক্ষত্রিয় পেত ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম। বৈশ্য বিত্তকৌলীন্যের জোরে, গরিব ব্রাহ্মণও সাধারণ ক্ষত্রিয়ের ওপরে স্থান পেত। সমাজের সবচেয়ে নিচে যে শূদ্র, তার কাজ মুখ বুজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সেবা করা, ক্ষেতে মজুরি করা ও বিভিন্ন শিল্পে— যেমন ধাতু, মাটি, চামড়া, কাঠের কাজ ও অন্যান্য কারিগরি কাজে ভারী পরিশ্রমের কাজগুলো করা। বেশির ভাগই পেটভাতায়। এদেরও নিচে, বলতে গেলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের বাইরেই ছিল চণ্ডাল, পুল্কস, শ্বপাক ও ম্লেচ্ছ। অথচ চণ্ডাল ও শ্বপাক উচ্চ ত্রিবর্ণের বিবাহে সাহায্য করত। কাজেই সমাজে তাদের সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। শ্বপাক বা শ্বপচ মানে যে কুকুরের মাংস খায়, এটাই তাদের প্রতি আর্যদের ঘৃণার কারণ। শখ করে কেউ কুকুরের মাংস খাবে কেন? ঋগ্বেদে পড়ি, 'অর্বত্যা শুন আঘ্রাণি পেচে', অর্থাৎ অভাবে পড়ে কুকুরের নাড়িভুড়ি রান্না করেছিল এক ব্রাহ্মণ। অভাবে পড়ে যারা কুকুর মেরে রেঁধে খেত তারা শ্বপাক, এই অভাব যে-সমাজ সৃষ্টি করেছিল তার মধ্যে শ্বপাকের ঠাঁই হয়নি।

আর্যসমাজের গণ্ডির বাইরে ছিল নিষাদ। পেশায় এরা শিকারি এবং জঙ্গলে থাকত বলে আর্য ব্রাহ্মণ্য শাসনের আওতার বাইরে ছিল। তবে ব্রাহ্মণ্য সমাজকে কিছু পরিমাণে এদের ওপরে নির্ভর করতে হত বলে এদের বৃত্তিগত স্বাধীনতার জোরে এরা এক সময়ে ব্রাহ্মণ্য সমাজের এক কোণে ঠাঁই পায়। পাণিনি ব্যাকরণে পড়ি, 'নিষাদপঞ্চমাঃ পঞ্চ জনাঃ', অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদকে ধরে সমাজের পাঁচজন; এই পাঁচজনই তখন সমাজের প্রতিনিধি। এখন আমরা যে পঞ্চায়েৎ (পঞ্চায়ত থেকে) বলি তার 'পঞ্চ' এরাই, এর থেকেই গ্রামের পাঁচজনের কথাই সমাজের বিধান। চারটি আর্যবর্ণ নিষাদকে চণ্ডাল সাহিত্যে দেখতে পাই। যারা মধু, কাঠ জোগাড় করতে জঙ্গলে যায়, পাখিশিকারি, জেলে, মালো, যারা নৌকা বায় এমনই বহু পেশার নাম সাহিত্যে দেখি। এদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ হয়ে এবং পেশাগুলো

নানা ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে সমাজে জাতির সংখ্যা বেড়েই চলে। শাস্ত্রকাররা জাতিগুলোকে দু ভাগে ভাগ করেন, 'জল-চল' ও 'জল-অচল'। চারটি আর্যবর্ণের মধ্যে বিয়েতে বর কনের চেয়ে উঁচু জাতের হলে 'অনুলোম' অর্থাৎ সমাজে সম্মত হয়, উল্টোটা 'প্রতিলোম' যা সমাজে অস্বীকৃত। বিভিন্ন পেশা ও আর্য-প্রাগার্য বিভিন্ন বর্গের বিয়ের ফলে জাত সংখ্যায় ক্রমশ বাড়তে থাকে।

মৌর্য যুগে দেশে শিল্প বাণিজ্য ও প্রশাসন ভাল থাকলেও সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা কমেনি, বরং বাড়ছিলই। সুনিয়ন্ত্রিত শাসনে খাজনা, ঋণভার, জরিমানা, ইত্যাদির চাপ গরিব চাষি মজুরের ওপরে এসে পড়ছিল। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম জাতিভেদ স্বীকার না করলেও সমাজে তখনও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য, অতএব জাতিভেদ বিশেষ ভাবেই বর্তমান। এই সময়ে *মহাভারত* রচনা চলছে, তাতেই প্রথমবার দেখি, জন্মান্তরবাদের সঙ্গে জুড়েছে কর্মবাদ। এই দুটি মিলে শাসনযন্ত্র ও ধর্মশক্তি মানুষের ওপরে অত্যাচার, দুঃখ ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিল যে, আগের জন্মের পাপের ফলে এ জন্মে তার এই দুর্দশা। এ জন্মটা দুটো জন্মের মধ্যেকার অবস্থা। আগেরটাও অদৃশ্য অবস্থা, পরেরটাও তাই। শাস্ত্রকাররা ফতোয়া দিয়ে দুটোকেই বাস্তব সত্য করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। দুঃখী, হতাশ, বিভ্রান্ত মানুষের সামনে যেহেতু এ জন্মে দুঃখমোচনের কোনও বাস্তব আশা নেই তাই সে বেচারা আগামী জন্মে কাল্পনিক দুঃখের অবসানের আশাটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকছে। ব্যাপক একটা হতাশা সাধারণ মানুষকে চেপে ধরেছিল, এবং এ জন্মে তার থেকে মুক্তির কোনও পথ কেউই দেখায়নি। শাস্ত্র ও পুরোহিত পূর্বজন্মের পাপের দোহাই দিয়ে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে এবং সমাজে যারা প্রতিষ্ঠিত, মুখ বুজে তাদের সেবা করেই পরজন্মে সুখের উপায় এই রকম প্রমাণহীন, যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক একটা ফতোয়া দিয়ে এ জন্মে তার কাছ থেকে অক্লান্ত সেবাটা আদায় করে নিয়েছে। পৃথিবীতে প্রায় সব ধর্মেই ধর্মশাস্ত্র ও পুরোহিতের বিধান এই ভাবে বিশেষ একটি শ্রেণির সুবিধের ব্যবস্থা করেছে।

সম্রাট অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জৈনধর্ম গ্রহণ করেন; তাঁর মা ছিলেন আজীবিক মতের, অশোক নিজে বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু রাজ্যে বৌদ্ধ জৈন আজীবিক ব্রাহ্মণ্য সব মতেরই সম্মানের জায়গা ছিল; ধর্মবিদ্বেষের কোনও খবর পাওয়া যায় না। ধর্ম ও মতের যে সুস্থ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াটা আমরা এখন কামনা করি সেইটেই যেন কতকটা ছিল অশোকের সময়ে। শিল্পেও তাই বৌদ্ধ জাতকের কাহিনি যেমন চিত্রিত হত, তেমনই হত ব্রাহ্মণ্য দেবতা ইন্দ্র, শ্রী, সূর্য, নাগ যক্ষযক্ষীও; মূল ধর্মধারার সঙ্গে লৌকিক ধর্মের দেবতারও মূর্তি তৈরি হত। তান্ত্রিক বুদ্ধের 'মহামায়ূরীর' সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের মানিকীয় ধর্মে কেন্দ্রদেবতা 'মণি'র নাম জুড়ে তৈরি হচ্ছে মন্ত্র। 'ওম মণিপদ্মে হুম': এর 'ওম' বৈদিক, 'মণি' মানিকীয়, 'পদ্ম' বুদ্ধের চরণপদ্মের প্রতীক, 'হুম' তন্ত্রের। কতকগুলি মতের সহাবস্থান এ মন্ত্রে। ধর্মে এই সময়ে শৈব ও বৈষ্ণব দুটি সম্প্রদায়ের কালিক ও আঞ্চলিক রূপ দেখা দিয়েছিল। পাশুপত, লকুলীশ, শৈবসিদ্ধান্ত, সাত্বত, পাঞ্চরাত্র, নারায়নীয় ও ভাগবত— এই সব সাম্প্রদায়িক উপাসনার

শুরু হয় এই সময়েই। আবার এই সময়ে যজ্ঞের কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি জ্ঞানমার্গের চর্চা, সন্ন্যাস আচরণ এবং পূজা চলতে থাকে। পূজা হয়তো প্রাগার্যকালের চলতি উপাসনা ছিল। একই পরিবারে নানা মতের ধর্মাচরণ স্থান পেত। সাধারণ মানুষের কাছে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই-ই অন্ধকারময় ছিল বলে সর্বকালের মতো মানুষ অন্ধকারে হাতড়ে বেরিয়েছে, বহু বিকল্পের মধ্যে পথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেছে।

মৌর্যবংশের পরে

খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালের কাছাকাছি বৃহৎ সুসংহত মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটার পরে ভারতবর্ষে এমন কোনও কেন্দ্রীয় রাজশক্তি রইল না যা অত বড় অঞ্চলের উপর ওই রকম আধিপত্য বিস্তার করতে পারত। এই সময়ে শুরু হল বিদেশি আক্রমণ, যার প্রথম সূত্রপাত অবশ্য শ'খানেক বছর আগে গ্রিক আক্রমণে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, মধ্য এশিয়ার সঙ্গে নতুন এক সংযোগ ঘটল। পূর্ব ভারত, মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যে মৌর্য প্রভাব সরে যাওয়ার পরে দেখা দিল শুঙ্গ, কাণ্ব ও সাতবাহন রাজারা।

আফগানিস্তানের গ্রিক রাজ্য ব্যাকট্রিয়া থেকে বারেবারে ভারতবর্ষে আক্রমণ চলে। পারস্যে গ্রিক রাজশক্তির প্রতিনিধি সেলিউকাসের শক্তি ক্রমে ক্ষয় হয়। শকরা ব্যাকট্রিয়া ও পার্থীয় রাজ্যে হানা দেয়। শকদের চাপে পড়ে ব্যাকট্রিয়ানরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। অশোকের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের কোনও আক্রমণ ঠেকাবারই শক্তি ছিল না। ব্যাকট্রিয়ানরা আসে পাটলিপুত্রে; এরা কিন্তু কোনও সুসংহত রাজ্য স্থাপন করতে পারেনি। মিনাণ্ডার— ওই দেশের সাহিত্যে মিলিন্দ— (১৩৫-১৪৫ খ্রি.পূ.) গঙ্গা যমুনার দোয়াবে রাজ্য স্থাপন করেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগসেন (মতান্তরে নাগার্জুন) তাঁকে বহু প্রশ্নোত্তরের পরে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। এগুলি সংকলিত আছে *মিলিন্দপঞ্হ* নামক গ্রন্থে। এই ইন্দো-গ্রিক সাম্রাজ্যটি ছোট ও স্বল্পস্থায়ী হলেও এর একটা গুরুত্ব আছে; এই সময়েই প্রথমে টাকশালে রাজার নামে মুদ্রা তৈরি হল; এর আগের মুদ্রা ছিল বাণিজ্যের জন্যে, কোনও রাজবংশের জন্যে নয়। দ্বিতীয়ত, গ্রিক শিল্পের একটি লক্ষণীয় প্রভাব দেখা গেল বিজিত রাজ্যগুলির শিল্পের ওপরে। এই প্রভাবে ভারতবর্ষে যে শিল্প রীতি জন্ম নিল তার নাম 'গান্ধার শিল্প', এই রীতির ভাস্কর্যে আমরা বুদ্ধের মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পকর্মের নিদর্শন পাই। শুধু মুদ্রা ও শিল্পেই এ প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল না; দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগের ফলে নাটকে সাহিত্যেও কিছু কিছু গ্রিক প্রভাব দেখা গেল।

গ্রিকদের পরে আসে শকরা। এরা যদিও গ্রিকদের তুলনায় ভারতবর্ষের অনেক বেশি অঞ্চল দখল করে তবু এদের রাজশক্তির কোনও একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র ছিল না। একদল রইল আফগানিস্তানে আর একদল এল পঞ্জাবে, এই দ্বিতীয়দের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা। মথুরায় যারা পৌঁছল তারা প্রায় দুশো বছর ধরে রাজত্ব করেছিল। চতুর্থ দলটি পশ্চিম ভারতে দীর্ঘকাল রাজত্ব করে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত। পঞ্চম দলটির রাজ্য ছিল উত্তর দাক্ষিণাত্যে। শকদের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা খুব বেশি বা খুব সফল প্রতিরোধ করতে পারেনি। শুধু খ্রিস্টপূর্ব

৫৮ সালে উজ্জয়িনীর এক রাজা বিক্রমাদিত্য শকদের তাড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন, তাই খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ সাল থেকে তাঁর নামেই 'বিক্রম সংবৎ' প্রবর্তিত হয় এবং পরের বিজয়ী রাজারা 'বিক্রমাদিত্য' নামটি গৌরবের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করেন; ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মোট চোদ্দটি 'বিক্রমাদিত্য' পাওয়া যায়।

শকরা যদিও ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে রাজত্ব করেছিল, তবু পশ্চিম ভারতেই এরা সবচেয়ে বেশি দিন, প্রায় চার দশক ধরে রাজত্ব করে। এখানকার রাজাদের মধ্যে রুদ্রদামা (১৩০-১৫০ খ্রিস্টাব্দ) সবচেয়ে বিখ্যাত। ইনি সিন্ধু গুজরাত, মালব, কাঠিয়াবাড় ও নর্মদা উপত্যকা জুড়ে বিস্তৃত ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন। এঁর একটি শিলালিপিতে পড়ি আশপাশের অনুর্বর জমিকে উর্বর করবার জন্যে ইনি মৌর্য আমলের 'সুদর্শন' হ্রদটির সংস্কার করেন। রুদ্রাদামা সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিজে বিদেশি হলেও এঁর দীর্ঘ শিলালিপিটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত, এটিই এ দেশে প্রথম সংস্কৃত শিলালিপি।

শকদের পরে খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে ইরানের আর এক গোষ্ঠী পহ্লবরা (পার্থীয়) উত্তর পশ্চিম অঞ্চল দখল করে। শক ও পহ্লব দু' দলই ইরান থেকে আসে এবং ভারতীয় সাহিত্যে মাঝেমাঝেই এদের শক-পহ্লব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পহ্লবদের প্রধান রাজার নাম গন্ডোফার্নেস। শকদের মতো এরাও ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের জনসমাজে নিশ্চিহ্ন ভাবে মিশে যায়।

কুষাণ সাম্রাজ্য

পহ্লবদের পরে ইউয়েহ চিহ বা তুষার (তোখারিয়) নামে একটি গোষ্ঠী মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি থেকে আসে, এদের পরিচয় কুষাণ নামে। এদের আদি বাসভূমি ছিল চিনের কাছাকাছি। কুষাণরা প্রথমে ব্যাকট্রিয়া দখল করে শকদের সেখান থেকে হটিয়ে দেয় ও পরে কাবুল গান্ধার হয়ে হিন্দুকুশ পার হয়ে সিলিউকিড ও পহ্লবদের তাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে সিন্ধু নদীর দক্ষিণে গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিকাংশ ভূভাগ দখল করে। এরা যে অঞ্চল অধিকার করেছিল তার পরিধি অক্সাস (বেদে উল্লিখিত বক্ষু নদী) থেকে গঙ্গা ও মধ্য এশিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত, আজকের পুরো পাকিস্তান ও পুরো উত্তর ভারত। এই ব্যাপ্তির ফলে একটি বৃহৎ অঞ্চলে নানা গোষ্ঠীর মানুষের পরস্পরের মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত, শিল্পগত, সংস্কৃতিগত অন্তর্মিশ্রণ ঘটে, এই সমস্ত অঞ্চল জুড়ে একটি বৃহৎ সভ্যতা গড়ে ওঠে।

রাষ্ট্র

কুষাণদের দুটি রাজবংশ পরপর রাজত্ব করে। প্রথমটির নাম কাদফিসেস, এঁরা খ্রিস্টিয় ২৮ সাল থেকে ৭৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রথম রাজা কাদফিসেস হিন্দুকুশের দক্ষিণে তামার মুদ্রা চালু করেন। দ্বিতীয় রাজা দ্বিতীয় কাদফিসেসের সময়ে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে ও সোনার মুদ্রার প্রচলন হয়। এই বংশের পরে অন্য একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন কণিষ্ক। এ বংশ সিন্ধুনদের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার করেন। এঁরা বিস্তর খাঁটি সোনার মুদ্রা চালু করেন। এগুলি তৈরি হত প্রধানত পশ্চিম ভারতে ও সিন্ধুপ্রদেশে, কিন্তু মথুরা, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, বারাণসী এবং অন্যত্রও এঁদের মুদ্রা পাওয়া যায়। মথুরায় পাওয়া মুদ্রাসঞ্চয় ও ভাস্কর্য থেকে মনে হয়, মথুরাই এঁদের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল; প্রথমটি ছিল পুরুষপুর অর্থাৎ পেশোয়ারে; সেখানে কণিষ্ক এক প্রকাণ্ড বৌদ্ধ স্তূপ ও একটি মঠ নির্মাণ করেন যা পাশ্চাত্য পর্যটকদেরও বিস্ময় উদ্রেক করে।

কুষাণদের সর্ব প্রধান রাজা কণিষ্ক। যদিও চিনাদের হাতে এঁর পরাজয় ঘটে তবুও ইতিহাসে এঁর প্রাধান্য দুটি কারণে। প্রথমত, এঁর সিংহাসনে আরোহণের বৎসর ৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে শকাব্দ গণনা শুরু হয়; দ্বিতীয়ত, কণিষ্কের একান্ত চেষ্টায় এই বৃহৎ ভূখণ্ডে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। কাশ্মীরে তিনি যে বৌদ্ধ মহাসভার আয়োজন করেন সেখানেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম তা, পরিচিত রূপটি লাভ করে। কণিষ্ক নিজে শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; তাঁর আমলে সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। কণিষ্কের বংশধররা ২৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তরপশ্চিম ভারতে

রাজত্ব করেন, এঁরা ততদিনে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন মিশে গেছেন যে কারও কারও ভারতীয় নামও ছিল, যেমন এঁদের এক রাজার নাম ছিল 'বাসুদেব'। ভারতীয় সমাজ এদের ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ক্ষত্রিয়, কারণ এঁরা যোদ্ধা ছিলেন।

কুষাণ সাম্রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল বলে নানা দেশের সংস্কৃতির উপাদান এখানে এসে মেশে। কুষাণদের নিজস্ব লিপি বা লিখিত ভাষা ছিল না বলে এখানকার লিপিই এরা ব্যবহার করত, তেমনই নিজস্ব কোনও সুসংহত ধর্ম ছিল না বলে এখানকার বিভিন্ন ধর্মের নানা উপাদান এরা গ্রহণ করে। এরা এনেছিল ঘোড়ায় চড়ার (শুধু রথে নয়) অভ্যাস এবং এরা খুব উঁচুদরের ঘোড়সওয়ার ছিল।, যুদ্ধক্ষেত্রে এরা খুব তাড়াতাড়ি যাতায়াত করতে পারত বলে যুদ্ধে এদের সামনে কেউই দাঁড়াতে পারত না। এদের পোশাক লম্বা আচকান, পায়জামা ও টুপির প্রভাব রয়ে গেছে এখানকার উত্তরপশ্চিম ভারতের শেরওয়ানি, কামিজ ও টুপির ওপরে। এই সময়কার মাটির তৈরি বহু ঘোড়সওয়ার মূর্তি পাওয়া গেছে আফগানিস্তানের নানা অঞ্চলে। ঘোড়ায় চড়া ও তার উপযুক্ত পোশাকের জন্যে যুদ্ধে এদের চলাফেরা সহজ ছিল বলে দক্ষ ভাবে যুদ্ধ করে এরা উত্তর পশ্চিম ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জয় করেছিল। কুষাণরা এ দেশের জনসমাজে সম্পূর্ণ ভাবে মিশে গিয়েছিল বলে অল্পকাল পর থেকেই তাদের আর কোনও আলাদা সত্তা ছিল না।

মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক থাকায় কুষাণরা আলতাই অঞ্চলের বিস্তর সোনার খনির মালিক ছিল, রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে সেখান থেকেও প্রচুর সোনা পেত। বিখ্যাত রেশম পথটি (যে পথে বহু পূর্ব থেকে রেশম বাণিজ্য চলত) এদের দখলে ছিল। এটি চিন থেকে মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, ইরান হয়ে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দীর্ঘ পথের যাত্রী বণিকদের কাছে পথকর আদায় করার ফলে এদের সমৃদ্ধি খুব বাড়ে। ভারতবর্ষের সোনার মুদ্রা প্রথম চালু করে কুষাণরা নিজেদের সমৃদ্ধির পরিচয় রেখে গেছে।

যে বিস্তৃত ভূখণ্ডে কুষাণদের সাম্রাজ্য ছিল তার অনেক অংশই আগে ছোট ছোট রাজার অধীনে ছিল; এরা পরে কুষাণদের করদ রাজ্যে (যারা খাজনা দিত) পরিণত হয়। ফলে এত বড় অঞ্চলে কোনও কেন্দ্রীয় রাজ্য সুসংহত ভাবে স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। গ্রিকরা যেমন তাদের সাম্রাজ্য ছোট ছোট অংশে ভাগ করে প্রত্যেকটিতে একজন রাজপ্রতিনিধির শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল, কুষাণরাও সে রকম প্রত্যেক ছোট ছোট রাজ্যে দুজন করে সামন্তরাজার শাসনে রেখেছিল। ছোট ছোট অংশ ভাগ করার দরুন কেন্দ্রীয় শাসন সব রাজ্যে সমান ভাবে পৌঁছত না, দূরের প্রত্যন্ত অংশে খানিকটা ঢিলেঢালা হয়ে পড়ত। কেন্দ্রের রাজধানীতে কুষাণ সম্রাট অসম্ভব জাঁকজমক ও বিলাসের জীবনযাপন করতেন। সম্রাট তখন শুধু রাজাধিরাজ ছিলেন না, তাঁকে দেবতার অংশ বলে মনে করা হত। পরেও এ দেশের রাজাকে দেবতার অংশে নির্মিত বলে শাস্ত্রকাররা ঘোষণা করেছিলেন; 'অষ্টানাং লোকপালানং মাত্রাভির্নির্মিতো নৃপঃ', অর্থাৎ আটটি লোকপালের অংশ নিয়ে (দেবতারা) রাজাকে নির্মাণ

করেন। এ ধারণা কুষাণ আমলেই প্রথম বার আসে, রাজার দেবত্ব প্রমাণের জন্যে মূর্তিতে ও চিত্রে রাজার মাথায় জ্যোতির্বলয় থাকত।

ধর্ম

কুষাণরা ভারতবর্ষে আসবার আগে কোন ধর্মে বিশ্বাস করত, কী তাদের ধর্মাচরণ ছিল তা আজ আর জানা যায় না। মৌর্যযুগের পর থেকে ভারতবর্ষে নানা দেবতাকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, আগন্তুক বিদেশিরা এদের কোনও এক বা একাধিক দেবতা ও উপাসনা গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে গ্রিক রাষ্ট্রদূত হেলিওডোরাস মধ্যপ্রদেশের বিদিশায় একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন, এর ওপর লিপিতে তিনি নিজেকে 'ভাগবত' বা বিষ্ণুভক্ত বলে বর্ণনা করেন। স্তম্ভটি বাসুদেব-কৃষ্ণের উদ্দেশে সমর্পিত। গ্রিক শাসনকর্তা মিনান্ডার বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হন। শক-পহ্লব-কুষাণরা ভারতবর্ষের তখনকার নানা উপাসনা সম্প্রদায়ের কোনও কোনওটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

মৌর্যযুগের পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের যজ্ঞ, এবং পরে প্রতিবাদী নানা সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান, উপনিষদীয় জ্ঞানমার্গের সাধনা, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম এ সবই একই সঙ্গে সমাজে বর্তমান ছিল। যতদূর জানা যায়, বৈষ্ণব, সাত্বত, পাঞ্চরাত্র, শৈব, পাশুপত, লকুলীশ ও আরও বহু ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় প্রাচীন যজ্ঞধারার বিভিন্ন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক মত ও আচরণের সঙ্গে সহাবস্থান করত। মতের পার্থক্য থাকলেও তা নিয়ে বিদ্বেষ কখনও উগ্র হয়ে ওঠেনি। বৌদ্ধ মঠ, বিহার, চৈত্য, স্তূপ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কিছু কিছু ধ্বংস করেছিল বটে, কিন্তু এ ধ্বংস স্থানে ও কালে সীমিত ছিল। মোটামুটি ভাবে ভিন্নমত সম্বন্ধে কতকটা সহিষ্ণুতা ছিল। জিজ্ঞাসা, তর্ক, আলোচনার আবহাওয়াই ব্যাপ্ত ছিল দেশে।

জ্ঞানবিজ্ঞান

তখনও সমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবই সবচেয়ে বেশি ছিল। শিক্ষিত মানুষ বেদ, বেদাঙ্গ, উপাঙ্গ, মনুসংহিতা, কণাদের বৈশেষিক দর্শন, পতঞ্জলির যোগ, মেধাতিথির ন্যায়, প্রচেতার শ্রাদ্ধতত্ত্ব— এ সবের চর্চা করত। এর থেকে বোঝা যায় বৈদিক ধর্মাচরণের সঙ্গে অনেক লৌকিক বিশ্বাস ও আচরণ ক্রমেই মিশে যাচ্ছিল; অন্য দিকে দুরূহ দার্শনিক চর্চারও সূত্রপাতও এই সময়েই বীজাকারে শুরু হয়, হয়তো সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু কিছু দর্শনসূত্রও রচিত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবক্ষয়ের বেশ কিছু লক্ষণ এখনই চোখে পড়ে; নিয়তিবাদ মাথা তুলেছে সমাজে, শ্রেণিবিভাজনও বেশ স্পষ্ট। সাহিত্যে দেখি, দুঃখী মানুষও বেশ সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করে। এ সময়ে ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের চর্চা যে বিশেষ ভাবে চলছিল তার নজির গির্নার শিলালিপিতেই লক্ষ করা যায়; এটি অলংকৃত ধ্রুপদী সংস্কৃতে রচিত। ব্যাকরণচর্চা বহু আগেই শুরু হয়, তবুও এ যুগের সাহিত্যের মহাকাব্যের ভাষা প্রায়ই পাণিনির অনুশাসন মানে না; অশ্ব ঘোষের *বুদ্ধচরিত* ও *সৌন্দরনন্দ* কাব্য দুটিতেও অপাণিনীয় (অর্থাৎ পাণিনিক ব্যাকরণের

নির্দেশের বাইরে) প্রয়োগ চোখে পড়ে। বেশ একটা মার্জিত কথ্য ভাষা নাটকগুলিতে পাই; এতে শিক্ষিত সমাজের কথ্য ভাষারই প্রতিফলন। মহাবিশ্ব সম্বন্ধে তখন একটা আবছা ধারণা গড়ে উঠেছে, যা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া সম্ভব ছিল না। তবুও একটা নিটোল বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ তখনই তৈরি হয়ে গেছে। সমাজে শ্রেণিগুলির মধ্যে প্রচুর বৈষম্য বেড়ে চলেছে এবং নিম্নবর্গের মানুষের সমস্যার সমাধানের বিশেষ কোনও চেষ্টা শাস্ত্রে বা সাহিত্যে চোখে পড়ে না। ভাসের *অবিমারক* নাটকে দেখি কুসংস্কার ও জাতিভেদ প্রেমের মিলনে বাধা। সমাজের এ সব অসঙ্গতির প্রতিবাদ যদি নিচু জাত ও গরিব মানুষ করেও থাকে, তার কোনও চিহ্ন বিশেষ কোথাও নেই। জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ এ ধরনের প্রতিবাদকে ঠেকাবার দুটি মারাত্মক অস্ত্র। বৈপরীত্য এ যুগের এক বড় বৈশিষ্ট্য।

এই সময়ে বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিকাশ এই সময়েই প্রথম ঘটে। যজ্ঞের জন্যে ঋতুর পরিবর্তন ও গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান আগেই জ্যোতির্বিদরা লক্ষ করতেন এবং সেই অনুসারে যজ্ঞের তিথি ঠিক করতেন। সংস্কৃত জ্যোতিষের পরিভাষায় কিছু কিছু গ্রিক প্রভাব যেমন দেখা যায়, তেমনই ভারতীয় 'হোরাশাস্ত্র' (জ্যোতিষ) থেকে গ্রিক 'হরস্কোপ' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। কিছু গ্রিক মুদ্রায় ভারতীয় অতিকথা— মিথ— (প্রধানত দেবকাহিনি) থেকে কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। গ্রিসের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে-বাণিজ্য ছিল তাতে গ্রিকরা গাভী, কুকুর, মশাল, হাতির দাঁতের জিনিস এখান থেকে রফতানি করত। চিকিৎসাশাস্ত্রে ভারতবর্ষ স্বনির্ভর ছিল; *চরকসংহিতা*-য় রোগনির্ণয়, শবব্যবচ্ছেদ, ভেষজনির্বাচন এবং নানা ধরনের ওষুধ ও পথ্য তৈরির প্রক্রিয়া বিশদ ভাবে আলোচনা করা আছে। চরকের দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থ বৈদ্যের মতো বৈজ্ঞানিক। রসায়নবিদ্যায় প্রাচীন ভারত যে কত অগ্রসর ছিল তার বিশেষ প্রমাণ আছে *চরকসংহিতা*-য়। ওষধি, ধাতু ও নানা প্রাকৃতিক দ্রব্য নিয়ে ওষুধ তৈরি হত। সুশ্রুত ছিলেন শল্যচিকিৎসক, *সুশ্রুতসংহিতা*-য় বিভিন্ন রোগে অস্ত্রচিকিৎসার বিধান ও নির্দেশ দেওয়া আছে, আর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরির প্রণালী বলা আছে।

বিদেশি প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা দলগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ও সামাজিক সম্পর্কের ফলে ভারতবর্ষ নানা নতুন প্রযুক্তির চর্চা শুরু করে, সম্ভবত, জুতোর জন্যে চর্মশিল্প তার মধ্যে একটি। কণিষ্ক'র জুতো-পরা মূর্তি থেকে অনুমান করা হয় যে এই সময়ে পাদুকা বা চটি ছাড়া জুতোও পরা হত। ধাতু গলিয়ে নানা উন্নতমানের শিল্প দ্রব্যও তৈরি হত। কাচ তৈরির কৃৎকৌশলও সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যের কোনও দেশের প্রভাব এসেছিল। কাচের বাসন, পুঁতি ও অলংকার তখন প্রচুর পরিমাণে তৈরি হত। রোমের সম্রাট অগাস্টাসের সময়ে (২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে) ও সম্রাট ট্রাজানের দরবারে (১১০-২০ খ্রিস্টাব্দে) ভারতীয় রাজদূত গিয়েছিল। ভারতীয় মনীষা রোমের উন্নত প্রযুক্তি ও রোম-মারফৎ গ্রিসের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার সংস্পর্শে আসে। সব দেশেই সমাজের অবসংগঠন (infrastructure) নির্মাণে, কারিগরি বিদ্যার চর্চায় সমাজের মূল কাঠামোকে ধরে রাখার জন্যে চেষ্টা চলে, তারই ওপরে নির্ভর করে সমাজের প্রাথমিক শ্রীবৃদ্ধি। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান অবসংগঠনকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়।

এই উন্নতির মানের ওপরে অনেকটাই নির্ভর করে চিন্তা ও শিল্পের উন্নতি; সেগুলো কোনও নির্বাত মণ্ডলে সৃষ্টি হয় না। শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রেরণা ও শক্তির মূল অবশ্যই আছে, কিন্তু শিল্পীর জীবনযাপনের পরিবেশের ওপরে তার সৃষ্টিশীলতা অনেকটাই নির্ভর করে। সমস্ত সমাজের চিন্তা, উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্পসাহিত্যের যে অধিসংগঠন (superstructure) তার মান পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই অবসংগঠন (infrastructure)-এর সঙ্গে আনুপাতিক, যদিও সমান্তরাল নয়। এই অবসংগঠনে যেমন, অধিসংগঠনেও তেমনই ভারতবর্ষ বারেবারেই বিদেশি প্রভাব আত্মস্থ করেছে। ভারতীয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিদেশের বাণিজ্যিক আমদানির এবং চিন্তা ও সৃষ্টিগত আমদানির বিস্তর প্রভাব রয়েছে। সব দেশেই এ ধরনের আদানপ্রদানের দ্বন্দ্বসংঘাতে চিন্তা ও সৃষ্টির উন্নতিই হয়। যতদিন ভারতবর্ষ বাইরে থেকে এ সব নিতে পেরেছে ততদিন সে নতুন নতুন সৃষ্টির দ্বারা বহির্জগৎকে দিতেও পেরেছে। যে দিন দ্বৈপায়ন কুনো মনোবৃত্তির ফলে বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিল, সে দিন থেকে পৃথিবীকে কিছু দেওয়ার সামর্থ্যও তার সংকুচিত হয়ে এল।

মৌর্য যুগের পরে কৃষি বাণিজ্য, কারখানা ও কুটিরশিল্প হঠাৎ অনেকটা বেড়ে ওঠায় ব্যবসায়ীদের হাতে অর্থ, অতএব ক্ষমতাও জমে ওঠে। তারা মঠে মন্দিরে অর্থ সাহায্য করে। ব্রাহ্মণ শ্রমণকে জমি, টাকা ও অন্যান্য জিনিস দান করতে থাকে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে বৌদ্ধধর্মে। বুদ্ধের নির্দেশে সন্ন্যাসীদের সাদাসিধে জীবনযাপন করার কথা, তাই করছিলও তারা। কিন্তু হঠাৎ-ধনী বৈশ্যদের এবং কোনও কোনও রাজার দানে সন্ন্যাসীরা অশনে-বসনে শৌখিন হয়ে ওঠে, আরামে থাকার অভ্যাস মঠেও দেখা দিল। সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রার নীতি শিথিল হতে লাগল, ভোগের প্রবণতা বেড়ে উঠল, গৃহীর সঙ্গে পার্থক্য কমে গেল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে বুদ্ধ পথিকৃৎ থেকে দেবতা হয়ে উঠলেন। আগে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হত প্রতীকী চিহ্নে— যেমন ছত্র, পদচিহ্ন, পাদপদ্ম, ধর্মচক্র, ইত্যাদি। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হতে লাগল এবং রীতিমতো পূজা শুরু হয়ে গেল। এই সময়ে বৌদ্ধরা দুটি সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গেল। যারা আগের মতো চলতে চাইল, পরবর্তীকালের পরিবর্তিত জীবনধারার অনুগামীরা তাদের মতের নাম দিল হীনযান, নিজেদের মতকে বলল, মহাযান। মহাযানে বুদ্ধ আর সন্ন্যাসী রইলেন না, হলেন দেবতা, রাজপুত্র অথবা রাজা। ভক্তদের আরাধনায় সন্ন্যাসের সঙ্গে জুড়ল বুদ্ধপুজা, নানা জাঁকজমক। অন্ধ্রে নাগার্জুনকোণ্ডার বৌদ্ধবিহারগুলিতে প্রচুর মুদ্রা পাওয়া গেছে, অন্যান্য মহাযান বিহারেও নানা শৌখিন জিনিস ও মুদ্রা পাওয়া গেছে। কণিষ্ক বৌদ্ধদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, অগাধ ধনী এই রাজা দু' হাতে অর্থ, জমি দান করেন মঠ, বিহার, চৈত্য, ও সঙ্ঘারাম নির্মাণের জন্যে। কাশ্মীরে কণিষ্ক যে বৌদ্ধ মহাসভা আহ্বান করেন সেখানে মূল বৌদ্ধগ্রন্থ *ত্রিপিটক* (*সূত্র*, *বিনয়* ও *অভিধর্ম*— এই তিনটি) তিন লক্ষ শব্দে সংকলিত হয়। সেগুলি নাকি লাল তামার পাতে খোদাই করে পাথরের সিন্দুকে রেখে তার ওপরে একটি স্তূপ গেঁধে দেওয়া হয়।

কুষাণ রাজারা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে অনেক ভাস্কর, স্থপতি ও অন্যান্য শিল্পী এ দেশে আনিয়েছিলেন। এঁদের সংস্রবে ভারতীয় শিল্পে তিনটি মুখ্য ধারার সৃষ্টি হল: মধ্য এশীয়, গান্ধার ও মথুরা। বৌদ্ধ প্রভাব মধ্য এশিয়াতে বেশি ছিল, সেখানে পাওয়া কিছু কিছু শিল্পকৃতির মধ্যে ভারতীয় ও মধ্য এশীয় আঙ্গিকের সংমিশ্রণ বেশ বোঝা যায়। গান্ধারে প্রধানত গ্রিক প্রভাবে রচিত ভারতীয় ভাস্কর্য দেখা যায়। বুদ্ধমূর্তিতে এই প্রভাবের ফলে কোঁকড়া চুলের বিন্যাস, মুখে গোঁফ, কাপড়ে পরতে-পরতে ভাঁজ— এ সবই ভারতীয় শিল্পে নতুন। এই প্রভাব মথুরা শিল্পরীতিতেও দেখা যায়, তবু মথুরায় ভারতীয় স্বকীয়তা সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট। লাল বেলেপাথরে বুদ্ধ ছাড়াও মহাবীরের মূর্তিও এখানে গড়া হত। আর পাওয়া গেছে কণিষ্কের মুণ্ডহীন মূর্তি, তার নিচে কণিষ্কের পরিচয় দেওয়া আছে। মথুরা কৃষ্ণকাহিনির পীঠস্থান, তবু ওই সময়ের কৃষ্ণের কোনও মূর্তি এখানে পাওয়া যায়নি। খ্রিস্টিয় প্রথম তিনটি শতকেই মথুরা শিল্পের বিকাশ। মথুরা রীতির শিল্প নিদর্শন মথুরার বাইরেও অনেক জায়গায় পাওয়া যায়, বোঝা যায় ওই ধরনের ভাস্কর্যের চাহিদা ও সমাদর ছিল। অন্ধ্রে ও মহারাষ্ট্রে নাগার্জুনকোণ্ডা ও অমরাবতীতে যে বৌদ্ধ শিল্পের স্বতন্ত্র কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল তা বোঝা যায় ওই সব জায়গা থেকে পাওয়া শিল্পকর্মে। আর্যাবর্তে বৌদ্ধ শিল্পকলার সমধিক বিকাশ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে সাঁচি। ভারহুত ও বুদ্ধগয়ার বিস্তৃত স্তূপ, প্রাচীন তোরণ ও মঠের নির্মাণে সমকালীন জীবনযাত্রাও সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়ে রয়েছে।

শুধু স্থাপত্যে ভাস্কর্যে নয়, সংস্কৃত সাহিত্যেও এ যুগের শিল্পের উৎকর্ষ দেখা যায়। নাট্যকার ভাস তেরোটি নাটক রচনা করেন, সংস্কৃতে এগুলিই প্রথম নাটক। ভাব, ভাষা, অলংকার ও রচনার উৎকর্ষে ভাসের নাটকগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ অশ্বঘোষের রচনা *বুদ্ধচরিত* ও *সৌন্দরনন্দ* কাব্য দুটি প্রথম ধ্রুপদী রীতির কাব্য। এ ছাড়া অশ্বঘোষের দুটি খণ্ড নাট্য পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটির প্রভাব পরবর্তী সাহিত্যে বিশেষ লক্ষণীয়। ভাস ও অশ্বঘোষে তখনকার, সমাজচিত্রও রয়ে গেছে।

মহাযানের বিপুল 'অবদান' সাহিত্য *মহাবস্তু*এবং 'দিব্যাবদান' মিশ্র বৌদ্ধ সংস্কৃতে (অর্থাৎ সংস্কৃত, পালি ও আঞ্চলিক প্রাকৃতে নির্মিত এক ভাষায়) রচিত। কিছু পরে *ললিতবিস্তার* শুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত, এ গুলিতে সে যুগের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের চেয়েও বেশি করে সমাজ প্রতিফলিত। গরিব দুঃখী খেটে-খাওয়া মানুষ, দাসদাসী, —এদের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নসাধনা খুব স্পষ্ট করে আঁকা এ সাহিত্যে। এ যুগ থেকে মানুষ শিল্প সাহিত্যে ও ভাস্কর্যে জীবনের অভিজ্ঞতার চিত্র এঁকে চলল।

প্রথমে যজ্ঞকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্য পরে বৌদ্ধ জৈন, ইত্যাদি প্রতিবাদী ধর্মের অভ্যুত্থান হয়; আরও পরে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিলোপের পরে যবন-পহ্লব আক্রমণের পরে কুষাণরা যখন বৃহৎ ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল যাবৎ রাজত্ব করে তখন বহু অভারতীয় অব্রাহ্মণ্য চিন্তা-আচরণ ভারতবর্ষে আসে। জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে একটা অস্থিরতা দেখা দেয়। এ সময়ে নানা

ধরনের ধর্ম একই সঙ্গে ভারতবর্ষে ছিল; তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু সংঘাত-সংঘর্ষ ছিল; প্রত্যেকেই নিজের মতকে যাচাই করে দিচ্ছিল। ফলে পরস্পরের প্রভাবে মতগুলিও একটু আধটু বদলাচ্ছিল। এমন একটা অবস্থাতেই ধর্ম সম্বন্ধে নতুন দিগদর্শন করায় ভৃগুবংশের কিছু শাস্ত্রকার যাঁদের রচনাই মহাভারতের শেষতম প্রক্ষেপ (অর্থাৎ পরবর্তী সংযোজন)। ধীরে ধীরে এঁদের মতই প্রবল হতে থাকে এবং অভি-পৌরাণিক একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় যার বর্তমান নাম 'হিন্দু', তখন অবশ্য এ নাম ছিল না। তবে ওই সময়ে— যেমন— এখনও, নানা পরস্পর-বিরোধী পরস্পর-পরিপূরক মত একই সঙ্গে সমাজে বর্তমান ছিল।

মহাভারত ও *রামায়ণ*-এর রচনা বেদাঙ্গ রচনার যুগেই শুরু হয়; *রামায়ণ* সম্ভবত আগেই, খ্রিস্টিয় তৃতীয় (বা চতুর্থ) শতকে শেষ হয়, *মহাভারত* আরও শ' দেড়েক বছর পরে। এই সময়ে এই রচনাগুলি বিশেষ এক ধরনের জীবনবোধ প্রকাশ করছিল যা পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়। আগেকার কিছু গৌণ দেবদেবী এখন মুখ্য হয়ে উঠল, আবার আগেকার বেশ কিছু প্রধান দেবদেবী গৌণ হয়ে গেল। আঞ্চলিক কিছু নতুন দেবদেবী দেবমণ্ডলীতে স্থান পেল। যজ্ঞ তো চলছিলই, পাশাপাশি পূজাও। ওঝাদের তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, কবচ-মাদুলি, মানত, তীর্থ, দানধ্যান, জপতপ— এ সব নতুন করে প্রাধান্য পেল। এদের মধ্যে শুধু ভারতবর্ষে নির্মিত ধর্মবোধই নয়, তারই সঙ্গে মিশেছিল গ্রিক, পহ্লব, শক, কুষাণ, প্রভৃতি আগন্তুক আক্রমণকারীদের ধর্মচিন্তা ও অনুষ্ঠানের পদ্ধতিও। আগন্তুকরা নিঃশেষে জনসমাজে মিশে যাওয়ার ফলে আর আলাদা করে কোনও তন্তুকে বের করা যাবে না, কিন্তু এদের চিন্তা আচরণ যে ভারতীয় ধর্মধারার একটি উপাদান তা অস্বীকার করা যায় না। যজ্ঞ থেকে ঝাড়ফুঁক, তীর্থমানত অনেকটা পথ: এর মধ্যে কোথায় যে আগন্তুকের ধর্মচেতনার কতটা প্রভাব ফেলেছে তা আজ নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় কে করবে? কিন্তু এই সব অযজ্ঞীয় বিশ্বাস-আচরণ নিশ্চয়ই বেশ কিছুকাল ধরেই সমাজচেতনায় সুপ্ত ছিল, তাই এক সময়ে এ ভাবে এদের প্রত্যক্ষ করা গেল। প্রগার্য ও আর্যদের মধ্যে বেশ কিছুকাল ধরেই কিছু মানুষ জাদুর চর্চা করে এসেছে, শাস্ত্রে সেগুলির জায়গা হয়নি, কিন্তু জীবনে তা আচরিত হত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যখন ক্ষীণ হয়ে এল তখন আবার প্রকাশ্যেই তার চর্চা হতে লাগল। *রামায়ণ*-এর প্রক্ষিপ্ত অংশে, অর্থাৎ আদি ও উত্তরকাণ্ডে এবং *মহাভারত*-এর শেষতম ভার্গব প্রক্ষেপে এ সব আবার প্রাধান্য পেল। দুটি মহাকাব্যেই তাই তীর্থস্থানের তালিকা আছে। তীর্থে স্নান, দান-দক্ষিণা, জপ-তপ, ধ্যান এ সব বেশ স্পষ্ট ভাবেই আলোচিত ও বর্ণিত হয়েছে। এ ধর্মের এক প্রান্তে যজ্ঞ, যা তখন বেশ অপ্রচলিত হয়ে আসছে; অন্য প্রান্তে পূজা, যা তখনও সর্বত্র চলিত হয়নি, কিন্তু হওয়ার মুখে। এ ধর্মের ওপরে অভিঘাত আসছে জ্ঞানকাণ্ডের নানা প্রস্থান, উপনিষদ, বৌদ্ধজৈনধর্মের মোক্ষ ও নির্বাণতত্ত্ব থেকে; এবং এ ধর্মের বড় একটি উপাদান হল লোকায়ত ধর্ম যা অন্তত তিন হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে অন্তঃস্রোতা ভাবে কিন্তু একটানাই আচরিত হচ্ছিল। এর কোনও সংহত শাস্ত্র ছিল, কিন্তু এবার *রামায়ণ*-এর ও *মহাভারত*-এর ভার্গব প্রক্ষেপে শুরু হল, পরবর্তীকালে পুরাণে বিপুল এক শাস্ত্র সৃষ্টি।

সাতবাহন যুগ

রাষ্ট্র

মৌর্য যুগের পর পরপর শুঙ্গ ও কাণ্বরা রাজত্ব করে। মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যে মৌর্য প্রভাব খুব কমই ছিল। মৌর্যরাজত্বের শ'খানেক বছর পরে মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্র বা সাতবাহন রাজবংশ ক্ষমতায় আসে। এদের আগে এ অঞ্চলে যে সভ্যতা ছিল। তার পরিচয় রক্তাভ, লালকালো এবং মরা লাল রঙের মাটির পাত্র থেকে পাওয়া যায়। এরা লোহার ব্যবহার জানত, বড় পাথরের চাঁই দিয়ে স্থাপত্য তৈরি করত; আর্যাবর্তের মানুষের সংস্পর্শে এসে এরা লোহার ফলা-ওয়ালা লাঙল দিয়ে চাষ করতে ও ফসল রোওয়ার কাজ করতে শিখল। তা ছাড়া মাটি পুড়িয়ে ইঁট তৈরি করে সেই ইঁটের ঘাট-ওয়ালা কুয়ো, পোড়া মাটির চ্যাপটা টালি, মাটির নীচে ওপরে টালির ঢাকা দেওয়া নর্দমা তৈরি করাও আর্যাবর্তের প্রভাবে এ সময়ে দাক্ষিণাত্য শিখে নিয়েছিল। এ ধরনের উন্নতমানের স্বাস্থ্যসম্মত পরিকল্পনায় তৈরি ত্রিশটি শহর এ অঞ্চলে ছিল— এ কথা প্লিনির ভ্রমণ কাহিনিতে পাওয়া যায়। শহর গড়ে ওঠার পরে লেখার চল হল, সব মিলে একটা রাষ্ট্র তৈরি হওয়ার আয়োজন যেন সম্পূর্ণ হল— এই হল সাতবাহন রাজ্য, যে রাজবংশ শ'তিনেক বছর রাজত্ব করে। শুঙ্গদের পরে যে কাণ্ব বংশ সিংহাসনে আসে তাদের হারিয়ে দিয়ে এরা সে কথা যে শিলালিপিতে লিখে রাখে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে সেইটিই প্রথম সাতবাহন শিলালিপি। মহারাষ্ট্রেই সাতবাহনরা তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। সেইখানেই তাদের বেশির ভাগ শিলালিপি পাওয়া যায়। গোদাবরীর উত্তরে উপত্যকা খুব উর্বর ছিল, ধান ছাড়াও নানা রকম ফসল ফলত। এখানেই সাতবাহনদের প্রথম অধিষ্ঠান। এখান থেকে ক্রমে কর্ণাটক ও অন্ধ্রে এরা ক্ষমতা বিস্তার করে। এরা আগে উত্তর দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, ফলে এদের সঙ্গেই সংঘাত বাধে সাতবাহনদের। সাতবাহনরা জেতে এবং তাদের রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী (১০৬-১৩০ খ্রিস্টাব্দ) বংশের প্রভাব পুনরুদ্ধার করেন। ইনি নিজেকে 'একমাত্র ব্রাহ্মণ' বলে অভিহিত করতেন। শুধু শকদের নয়, অন্যান্য নানা ক্ষত্রিয় বংশকেও ইনি ধ্বংস করেন। যে ক্ষহরাত বংশে এঁর শত্রু নহপান জন্মান, সাতকর্ণী সেই বংশকেই সমূলে উৎখাত করেন বলে দাবি করেন। তিনি সত্যিই তা করেছিলেন, কারণ নাসিকে নহপানের যে আট হাজার সোনার টাকা পাওয়া যায় সেগুলির ওপরে সাতবাহনদের ছাপ দেওয়া আছে। শকরাজ্যের এক বৃহৎ অংশ এই প্রভাবশালী রাজবংশের অধীনে চলে আসে, উত্তরে মালব থেকে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত সম্ভবত অন্ধ্রও এদের অধিকারভুক্ত ছিল।

খ্রিস্টিয় ২২০ সাল পর্যন্ত গৌতমীপুত্রের বংশধররা রাজত্ব করেন। এঁর ঠিক পরের রাজা বশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ি (১৩০-১৫৪ খ্রিস্টাব্দ)-এর শিলালিপি ও মুদ্রা যা অন্ধ্রে পাওয়া গেছে, তার থেকে মনে হয় এ অঞ্চল সাতবাহনদের বিস্তৃত রাজ্যেরই অংশ ছিল। রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান, গোদাবরী নদীর ধারে ঔরঙ্গাবাদ জেলায়। কোস্কান ও মালব অঞ্চল খুব সমৃদ্ধ ছিল বলে শকরা সেগুলো ফিরে পাওয়ার জন্যে সাতবাহনদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ করে। সৌরাষ্ট্রের শক রাজা প্রথম রুদ্রদামা (১৩০-১৫০ খ্রিস্টাব্দ) দু' বার যুদ্ধে সাতবাহনদের হারিয়ে দেন; কিন্তু দুই রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল বলে একেবারে ধ্বংস করেননি। সাতবাহনদের শেষ দিকের এক রাজা যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী (১৬৫-১৯৪) উত্তর কোস্কন ও মালব শকদের কাছ থেকে যুদ্ধে জিতে নেন। অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটে এঁর মুদ্রা পাওয়া যায়; সে সব মুদ্রায় জাহাজের ছবি থেকে এঁদের নৌযাত্রা ও নৌবাণিজ্যে আগ্রহ বোঝা যায়।

সমাজ

আদিতে সাতবাহনরা দাক্ষিণাত্যের একটি জনগোষ্ঠী ছিল, পরে কোনও উপায়ে এরা ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। এরা এতটাই বর্ণসচেতন ছিল যে রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী তাঁর রাজ্যে চারটি বর্ণে বিভাজন আবার দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন, কারণ, সেটা নাকি তাঁর আগে শিথিল হয়ে গিয়েছিল। কঠোর নিয়ম চালু করে বর্ণগুলির মধ্যে অন্তর্বিবাহ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়; মনে হয় শকদের প্রভাবে এ ধরনের অন্তর্বিবাহ চালু হয়েছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জমি দিয়ে সাতবাহনরা রাজ্যে তাঁদের বসতি করান। প্রথম দিকের বৌদ্ধগুহাগুলি বাণিজ্যপথের ওপরেই তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয়; সে বণিকরাও বৌদ্ধদের পৃষ্ঠপোষক ছিল। সাতবাহনরা বৌদ্ধদের অনেক বেশি জমি দিলেও ব্রাহ্মণদেরও বেশ কিছু জমি দেন।

নিজেরা ব্রাহ্মণ বলে গর্ব করলেও সাতবাহনদের আর্যাবর্তের লোকেরা নিচু চোখে দেখত। রাজারা ব্রাহ্মণ হলেও সাতবাহন রাজ্যে বণিকদের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল, বিশেষত গন্ধবণিকদের (গন্ধিক, 'গান্ধী' শব্দটি এর থেকে এসেছে); তখন সব বণিককেই সাধারণ ভাবে গন্ধিক বলা হত, এরা বৌদ্ধদের দান করত এবং ছোট ছোট পাথরে সে-দানের কথা খোদাই করে রাখত।

সাতবাহনদের পরিবারে সম্ভবত নারীর স্থান খানিকটা উঁচুতেই ছিল, 'গৌতমীপুত্র' 'বাশিষ্ঠীপুত্র' এ সব মায়ের নামে ছেলের নাম দেখে তাই মনে হয়। ওই বংশের কিছু কিছু রানিরা নিজেরাই দান করত এমন নজির আছে। তথাপি সাধারণ ভাবে এদের পরিবার পুরুষতান্ত্রিকই ছিল এবং ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব সেখানে বেশ লক্ষণীয়। হয়তো ব্রাহ্মণ হওয়ার আগে গোষ্ঠীজীবনে মায়ের পরিচয়ে ছেলে পরিচিত হত, সেই চিহ্নই রয়ে গেছে ওই নামগুলিতে।

রাজার অপ্রতিহত প্রতাপ ছিল এবং রাজাকে দেবতার প্রতিনিধি মনে করা হত। মৌর্য আমলের মতো অমাত্য মহামাত্রদের হাতে শাসনের ভার ছিল। সেনাবাহিনীরও বিশেষ প্রতাপ ছিল, সেনাপতিই ছিল প্রদেশের শাসনকর্তা। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত অঞ্চলই তো হিন্দু হয়ে

যায়নি, অহিন্দু অধিবাসীদের শাসনের অধীনে রাখবার জন্যে হয়তো সেনাবাহিনীকে প্রধান্য দেওয়ার দরকারও ছিল। 'কটক', 'স্কন্ধাবার' (সেনানিবাস), 'গৌল্মিক' (একটি মাঝারি সেনাদলের নেতা), এ সব শব্দে সাতবাহন রাজ্যে সৈন্যদলের প্রাধান্য বোঝা যায়।

বৌদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণরা খাজনা থেকে ছাড় পেতেন; রাজার দানে-পাওয়া গ্রামগুলির পুরো স্বত্ব এঁরা ভোগ করতেন। 'রাজা', 'মহাভোজ' ও 'সেনাপতি'— শাসনকর্তাদের এই তিনটি ভাগ ছিল। ব্রাহ্মণত্বের গর্বে সাতবাহনরা সাড়ম্বরে অশ্বমেধ, বাজপেয় এ সব বড় বড় যজ্ঞও করেছিলেন ও পুরোহিতদের প্রচুর দক্ষিণাও দিয়েছিলেন। ধর্মমতে এঁরা কৃষ্ণ-বাসুদেবের ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তা সত্ত্বেও এঁদের সময়ে যে-মহাযান বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই মতের অনুগামী শ্রমণদের এবং মঠ চৈত্য বিহারেও এঁরা প্রচুর দান করতেন। অন্ধ্রে নাগার্জুনকোণ্ডা, অমরাবতী এবং মহারাষ্ট্রে জুনাগড় ও নাসিকেও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলিতে সম্ভবত বণিকদের প্রচুর অনুদান ছিল।

ধর্মীয় চৈত্যবিহার নির্মাণেও রাজা ও ধনী বণিকদের অনুদান ছিল। বুদ্ধের নামে যে ধর্মমন্দির তৈরি হত তার নাম চৈত্য। দাক্ষিণাত্যের উত্তর পশ্চিম দিকে ও মহারাষ্ট্রে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে যে সব চৈত্যনির্মাণ শুরু হয়, সাতবাহন আমলে সেগুলি সংখ্যায় বাড়তে থাকে। পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে কার্লের চৈত্যটি আকারেও যেমন বড় এর পাথরের ভাস্কর্যও তেমনই উন্নতমানের। বিহার হল চৈত্যমন্দিরের কাছাকাছি শ্রমণদের বাসস্থান। নাসিকের তিনটি বিহারে সাতবাহন রাজা নহপান ও গৌতমীপুত্রের শিলালিপি পাওয়া যায়; এগুলি খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকের। স্তূপ হল পাথরের একটি উঁচু গোলাকৃতি গঠন, বুদ্ধের দেহাবশেষের কোনও অংশ ভেতরে রেখে এটি গাঁথা হয়। সাতবাহন আমলে বেশ কয়েকটি স্তূপ পাওয়া যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত অমরাবতীরটি। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে নির্মিত হওয়ার কিছুকাল পরে এটি ভেঙে পড়ে ও পরে এটিকে নতুন করে নির্মাণ করা হয়। আকারে এটি প্রকাণ্ড এবং গায়ের পাথরে ভাস্কর্যগুলি খুবই সুন্দর। নাগার্জুনকোণ্ডার নির্মাণ খ্রিস্টিয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে এবং এতে শুধু বৌদ্ধ নয়, প্রথম দিকের কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্য মন্দিরও আছে। এগুলি পোড়া ইঁটের তৈরি। চব্বিশটির মতো বৌদ্ধ মঠ, একটি মহাচৈত্য ও বিহার ছাড়াও ভাস্কর্যে স্থাপত্যে এটি বোধহয় খ্রিস্টিয় প্রথম দু-তিন শতকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্প নিদর্শন।

সাতবাহনের শিলালিপিগুলি সবই ব্রাহ্মীলিপিতে ও প্রাকৃত ভাষায় রচনা— অশোকের শিলালিপির মতোই। এ সময়কার হাল নামে এক রাজার লেখা খণ্ডকাব্য *গাহাসত্তসঈ* (গাথাসপ্তশতী) সাতশো প্রাকৃত শ্লোকে রচিত। এর অনেকগুলি শ্লোকই ভাল কাব্য।

সাতবাহনরা হিন্দু হলেও এক সময়ে দাক্ষিণাত্যের প্রজাদের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু দুই-ই ছিল। সাধারণ গৃহস্থ মানুষ যজ্ঞ করতে পারত না। রাজা বা ধনী বণিকরা যজ্ঞ করত। সাধারণ লোক গৃহ্যকর্ম (অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, ইত্যাদি দশকর্ম) করত, কিন্তু সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব আসবার আগে তাদের সমাজে যে ধরনের লৌকিক অনুষ্ঠানের

চল ছিল তাই মেনে চলত। যারা বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারাও গার্হস্থ্য জীবনে পুরোনো অনুষ্ঠানই করত, ধর্মাচরণে চৈত্য-মঠ-স্তূপ-বিহারে ফুল, ধূপ-দীপ দিয়ে বুদ্ধমূর্তির পূজা করত। ততদিনে মহাযান মত সমাজে এসে গেছে, বুদ্ধ শুধু পথপ্রদর্শক নন, স্বয়ং ভগবান; তাই আগের পন্থায় (পরে লোকে যার নাম দিয়েছিল হীনযান) যেমন শুধু পদচিহ্ন প্রতীকী ছত্র, পাদপদ্ম, চক্র, ইত্যাদির পূজা হত এখন তেমন নয়। মহাযান মতাবলম্বীরা বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে রীতিমত ব্রাহ্মণ্য রীতিতে পূজা করত। এই সময়ে আর্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের নজিরের জোরে প্রাগার্য সমাজে মূর্তিপূজা যেমন প্রচলতি ছিল, তেমনই অন্যান্য পুরোনো নানা দেবতা আবার দেখা দিল, ক্রমে ধর্মাচরণের পদ্ধতিতে অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠল পূজা।

দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণ নদীর দক্ষিণে প্রাচীনকালে তিনটি বিখ্যাত রাজ্য ছিল, চের (কেরল), চোল (তামিলনাড়ু) ও পাণ্ড্য (তামিলনাড়ুর দক্ষিণ থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত)। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে চোল রাজ্যের প্রতাপ এত বেড়েছিল যে তখন এরা তাম্রপর্ণী (শ্রীলঙ্কা) জয় করে পঞ্চাশ বছর সেখানে রাজত্ব করেছিল। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে রাজা কারিকলের আমলে এদের শক্তি আরও বাড়ে। পুহার (কাবেরীপত্তনম) ছিল চোল রাজধানী; শিল্প বাণিজ্য থেকে চোলদের সমৃদ্ধি খুবই বেড়েছিল। কারিকলের পরে চোল প্রতাপ কমে যায়, চের ও পাণ্ড্যের প্রভাব তখন বাড়ে। খ্রিস্টিয় প্রথম কয়েকটি শতকের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তিতে কেরল রোমের সমকক্ষ ছিল; সুদূর মিশর ও আরবদেশ ও রোমের সঙ্গে এদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। চের ও চোলের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত, যুদ্ধ হত প্রায়ই এবং খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকের পর থেকে চের রাজশক্তি ক্রমে ক্ষীণ হতে থাকে। তা সত্ত্বেও সে কয়েক শতক কোনও রকমে টিকে থাকে, অষ্টম শতকের পর এর আর বিশেষ কিছু শক্তি অবশিষ্ট রইল না। দক্ষিণপূর্বের পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী ছিল মাদুরাই। প্রথম শতক থেকে এ অঞ্চলে যে-সাহিত্য গড়ে ওঠে তা 'সঙ্গম' সাহিত্য বলে পরিচিত; এতে পাণ্ড্য রাজশক্তিই বেশি করে প্রতিফলিত।

তিনটি রাজ্যের সঙ্গেই বহির্বাণিজ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইয়োরোপ এবং চিন, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার। এদের নিজস্ব সমৃদ্ধি খুব উঁচুমানের ছিল; কৃষি ও শিল্পের উদ্বৃত্ত নিয়ে বাণিজ্যের যথেষ্ট রমরমা ছিল। বিশেষত হাতি, চন্দনকাঠ, চাল, রেশমি কাপড়, হাতির দাঁতের তৈরি শিল্পবস্তু, সোনা, মুক্তা, দামি পাথর ও মশলা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হত। শিল্পের উন্নতি খুব বেশি ছিল, সুতোর কাপড় এরা এত মিহি বুনতে পারত যে সাপের খোলসের মতো দেখতে হত। চাল ও মশলা রফতানিতে এত প্রতিপত্তি ছিল যে চাল, আদা, দারচিনি, ইত্যাদি কয়েকটি বস্তুর গ্রিক নাম তামিল থেকেই নেওয়া। খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে যখন মৌসুমি বাতাস সম্বন্ধে মানুষ যথার্থ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করল তখন নৌবাণিজ্য অনেক নিরাপদ হল এবং জাহাজগুলি ঘনঘন যাতায়াত করতে পারল। ফলে এ দেশি বণিকরা ক্রমেই ধনী হয়ে উঠতে লাগল, রাজারা বেশি রাজস্ব পেতে লাগল।

সমৃদ্ধি যখন বাড়ল তখন রাজকোষে যে অর্থ যেত তা ছাড়া বাকিটা জমত মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে, গরিব গরিবই থেকে গেল। এই মুষ্টিমেয় ধনীরা কড়া হাতে শাসন করত গরিবদের, শ্রেণিভেদ ক্রমেই কঠোর হচ্ছিল। উদ্বৃত্ত ঐশ্বর্যের অনেকটাই যেত ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও শাস্ত্রকারদের হাতে, রাজার দেওয়া দান ও দক্ষিণা হিসেবে। অতএব শাস্ত্রকার ও পুরোহিতরা রাজা ও বণিকের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকত। গরিবের কোনও স্পর্ধা বা প্রতিবাদ সহ্য করা হত না বলাই বাহুল্য। তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মানুষ, বিশেষত, চাষিদের বলা হত 'পারিয়ার', যে শব্দটা আজও নিচু বর্গের মানুষের প্রতি উচ্চবর্গের মানুষের তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা বোঝায়। এরা জীবনযাত্রার মান, জাতি ও অবস্থায় সমাজের নিচুতলায় থাকত, কোনও রকম রাজপ্রসাদই এই খেটে-খাওয়া দুঃখী মানুষগুলির কাছে পৌঁছত না। রাজার সঞ্চিত ধনের আর এক অংশ যেত গুণী, শিল্পী, কবিদের কাছে, রাজার দেওয়া শিরোপা বা ইনাম হিসেবে। সমাজ তো শুধু শ্রেণিবিভক্তই ছিল না বহুবর্ণেও বিভক্ত ছিল। কাজেই রাজার কাছে যারা পুরস্কার বা বৃত্তি পেতেন তাঁরাও চাইতেন রাজারা বর্ণবিভাগ ও শ্রেণিবিভাগ যেন ঠিকঠাক মেনে চলেন।

পাকা বাড়িতে থাকত ধনীরা, গরিবরা কুঁড়েঘরে। পরের যুগে বর্ণবিভেদ যত কট্টর হয়েছিল এখন ততটা না হলেও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে নিচু জাতের মানুষের কোনও মানবিক মর্যাদা ছিল না। রাজরাজড়া ও ধনী বণিকরাই যাগযজ্ঞ করাতেন। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের পুরোনো দেবতা মুরুগান সাধারণ মানুষের পুজো পেতেন, পরে এঁর ব্রাহ্মণ্য নাম হয় সুব্রহ্মণ্য। বিষ্ণুর উপাসনা সম্ভবত কিছু দেরিতে আসে। শবের অন্ত্যেষ্টি সম্বন্ধে লোকে পুরনো রীতিই মেনে চলত; অর্থাৎ জিনিসপত্র সুদ্ধ শবের সমাধি দিত। পরে অবশ্য ব্রাহ্মণ্যরীতিতে শবদাহ চলিত হয়, যদিও পাশাপাশি সমাধিও চলতে থাকে।

শিল্প সাহিত্য

তামিলনাড়ুতে লেখার প্রচলন অন্তত খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের আগে থেকেই ছিল। মাদুরাইয়ের এক গুহায় ব্রাহ্মীলিপিতে পঁচাত্তরটির মতো শিলালেখ পাওয়া যায়। তামিল ও প্রাকৃতের মিশ্র সংস্করণ 'মণিপ্রবাল' ভাষার আদিমতম নিদর্শন এগুলি, এর সূত্রপাত খুব সম্ভব খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতক থেকে; ওই সময়েই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকরা দাক্ষিণাত্যে আসেন। মাটির খাপরাতে কিছু লেখা সম্প্রতি প্রত্নখননে পাওয়া গেছে, কাজেই তামিল লিখিত সাহিত্য খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের কিছু আগে থেকেই সম্ভবত ছিল। মাদুরাইয়ে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গম সাহিত্য পুষ্টি ও প্রসার লাভ করে, খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের পর এ সাহিত্য আর রচিত হয়নি। এর থেকেই আমরা প্রাচীন তামিল জীবনযাত্রার খবর পাই। এখন যে সঙ্গমসাহিত্য পাওয়া যায় তার সম্পাদনা হয় খ্রিস্টিয় তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের শেষের মধ্যে। এতে আঠারোটি 'মহারচনা' (মেলকন্নকু), তার মধ্যে আটটি কাব্য সংকলন ও দশটি কল্পকাহিনি।

অধিকাংশ রচয়িতা প্রাকৃত ও সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। এ রচনাগুলিতে রাজা ও প্রজার আচরণবিধি সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া আছে। এ সাহিত্য থেকে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য, সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচরণ, শিল্পকর্ম ও সাহিত্যরচনার কথাও জানতে পারি; নগরপত্তন, নগরশাসন ও গ্রামজীবনের কথাও পাই। সূর্য-চন্দ্র বংশ থেকে রাজাদের উৎপত্তি, ধর্মযাজক ও শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে মুক্তহস্তে রাজার দান, এ সবই বিবৃত আছে সঙ্গমসাহিত্যে। এর বিখ্যাত বই হল *তালকাপ্পিয়ম*, এটিতে পাই ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের বিধি। মহাকাব্যগুলির মধ্যে বিখ্যাত *তিরুক্কুরাল*, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের সংকলন। *শিলপ্পদিকরম* ও *মণিমেকলাই*— দুটিই কাব্যগুণে সমৃদ্ধ, হৃদয়স্পর্শী বিরহমিলনের কাহিনি, সাহিত্যমূল্যে মূল্যবান। *শিলপ্পদিকরম* এ মাধবী ও কোবলম নামের নায়ক-নায়িকার কাহিনি, তাদেরই কন্যা *মণিমেকলাই*-এর নায়িকা, এতে আবেগ ভক্তির স্তরে পৌঁছেছে।

মৌর্যযুগের পর থেকে সাতবাহনের যুগ পর্যন্ত এবং দাক্ষিণাত্যে চের, চোল ও পাণ্ড্য রাজ্যের বিকাশের কালে ভারতবর্ষের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের যে বিকাশ হয় তা তার আগে বা পরে বহুদিন হয়নি, এর মধ্যেও শ্রেষ্ঠ অবশ্য কুষাণ যুগ। *দীর্ঘনিকায়*-তে অনেক পেশার নাম আছে; পরবর্তী কালের *মিলিন্দপঞহ*-তে প্রায় তিনগুণ বেশি পেশার উল্লেখ আছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনের খাদ্যবস্ত্র, মন্দির, বাসস্থান, যানবাহন, তৈজসপত্র, আসবাব বাদেও বিস্তর শৌখিন জিনিস তৈরির কথা আছে। সোনারুপো ও মণিমুক্তোর গহনা, বিলাসের ছোট ছোট সুন্দর উপকরণ, গন্ধদ্রব্য, হাতির দাঁতের শিল্পদ্রব্য, চন্দনকাঠের, পুঁতির ও হাড়ের কাজ, রেশমি কাপড়, নানা ধরনের খোদাই, মুদ্রানির্মাণ, ইত্যাদির উল্লেখ আছে।

এ সব সম্ভব হয়েছিল কারণ, জনপদের বিস্তার ঘটছিল, শহর বাড়ছিল। গ্রামে ছিল খাদ্যবস্ত্র উৎপাদন ও ছোট ছোট শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের কারখানা। শহরে প্রশাসন ছাড়াও কিছু কিছু শিল্পচর্চার অবকাশ ছিল। কাজেই বোঝা যায়, বহু প্রকারের পণ্য উৎপাদনের জন্যে যে ধরনের বিজ্ঞান প্রযুক্তিজ্ঞানের দরকার ছিল তা তখন ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের অধিগত ছিল। এ ধরনের পণ্যের চাহিদা বেড়েছিল, কারণ ফসল, মশলা, পশু, পশুজাত দ্রব্য থেকে নির্মিত শিল্পবস্তু, বিভিন্ন ধাতু ও দামি পাথরের অলংকার, রেশমি কাপড়, ইত্যাদির জন্যে গ্রিস, রোম, চিন, মিশর, সিরিয়া, আরব, পারস্য এবং দূরপ্রাচ্যের ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, যবদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের সঙ্গে বর্ধিষ্ণু এক বহির্বাণিজ্যের দীর্ঘ ইতিহাস ছিল। দুটি রেশমপথের একটি চিন থেকে উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে তক্ষশিলা পেরিয়ে ভৃগুকচ্ছে, অন্যটি ইয়োরোপ, মধ্যপ্রাচ্য হয়ে মধ্যভারতে পৌঁছত। মথুরা ও উজ্জয়িনী ছিল দুটি উন্নত শহর। গুপ্তযুগে কালিদাস ও শূদ্রক উজ্জয়িনীর ঐশ্বর্য, শিল্পচর্চা ও বিলাসবহুল জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। উজ্জয়িনী থেকে বহুমূল্য রত্ন রফতানি হত দূর বিদেশে, বিনিময়ে আসত বিলাসের নানা উপকরণ। পশ্চিমে ভৃগুকচ্ছ ও সোপর এবং পূর্বে তাম্রলিপ্ত ও আরিকামেডুতে বিদেশগামী বণিকদের জাহাজ এসে ভিড়ত।

এই ধরনের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার ঐশ্বর্যের ইতিহাস একটানা চলে খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত। ওই সময়ে রোম সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করে। ফলে নগরগুলি আর করিগর ও বণিকদের আর্থিক দায়িত্ব বহন করতে পারল না। শহরের শ্রীবৃদ্ধি কমে গেল: শুধু আর্যাবর্তে নয়, দাক্ষিণাত্যেও একটা পর্বের নাগরিক ঐশ্বর্য ক্রমে ক্ষীণ হতে লাগল।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এ দেশেও প্রথমে বিনিময় প্রথা চালু ছিল, গরুর বদলে গম বা কাপড়। পরে ষোড়শ মহাজনপদের যুগে কড়ি, স্বর্ণরেণু ও মুদ্রার চল হয়। তবে বেশির ভাগ আদানপ্রদান হত বণিকদের মধ্যে, সাধারণ মানুষের বিনিময়প্রথা ও কড়ি দিয়েই কাজ চলে যেত। শক-পহ্লব-কুষাণ যুগেই প্রথম মুদ্রার চল বাড়ে। তখনকার বহু গ্রাম ও শহরে বড় বড় মুদ্রার সঞ্চয় বেরিয়েছে; মনে হয়, রাজা বা বড় বণিক ছাড়াও গ্রামীণ শিল্পীদের যে 'পূগ' বা 'শ্রেণি' (যারা শিল্পীদের স্বার্থ দেখত), তাদের হাতেও বেশ বেশি পরিমাণে মুদ্রা জমত। দেশের বেশ বড় একটা অংশের কেনার ক্ষমতা যে বেড়েছিল তাও খানিকটা বোঝা যায়। তবে এ অংশটা আগের তুলনায় বড় হলেও সারা দেশের তুলনায় ছোটই। এ সময়কার অধিকাংশ চাষি বা কারিগর বা ছোটখাট পেশায় নিযুক্ত কর্মীরা খুবই গরিব ছিল। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দুই সাহিত্যেই তার প্রচুর নিদর্শন আছে। দাসদাসীদের নির্যাতন, সাধারণ মানুষের অভাব, রোগব্যাধি, হতাশা নেহাৎ ছোটখাট প্রয়োজন অপূর্ণ থাকা, খেতে, পরতে না পাওয়া, ক্রীতদাসপ্রথা, অত্যাচার, ধর্মীয় অধিকর্তাদের নিপীড়ন সব মিলে অধিকাংশ লোকের কাছেই দুর্বহ বোধ হত।

বৌদ্ধধর্ম শেখাচ্ছিল সৎ ভাবে জীবনযাপন করলে, সাধ্যমতো দান ধ্যান ও মুখ বুজে উচ্চবর্ণের ধনীদের সেবা করলে অর্হৎ থেকে নির্বাণ পর্যন্ত একটা বড় রাস্তা খোলা আছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বলেছিল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের যথাবিধি দাসত্ব ও সেবা করলে শূদ্র বহুজন্ম পরে মোক্ষে পৌঁছতে পারে। দুই ধর্মই শেখাচ্ছিল দুঃখী দরিদ্রের দুঃখ, এ জন্মের কোনও কাজের ফল নয়, বিগত কোনও এক জন্মের পাপের ফল। এবং এ ফল আরও কিছু জন্ম ধরে তাকে পীড়ন করতে পারে। তবে পুরোহিতদের নির্দেশ মেনে চললে কোনও সুদূর ভবিষ্যতে জন্মান্তরের ভয়াবহ চক্র থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে নানা রকম কষ্ট, আতঙ্ক, পীড়ন এবং মনের জগতে অতীত ও ভবিষ্যৎ জন্ম সম্বন্ধে অনির্দেশ্য আতঙ্ক— এই ছিল সাধারণ মানুষের জীবন।

গুপ্ত যুগ

রাষ্ট্র

উত্তরে আর্যাবর্তে কুষাণ সাম্রাজ্য ও দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজত্বের অবসান ঘটে প্রায় একই সময়ে— খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে। এই সময়ে আর্যাবর্তে যে বড় সাম্রাজ্যটি ক্ষমতায় আসে তা হল গুপ্ত সাম্রাজ্য। এই রাজবংশটি ক্ষত্রিয় ছিল না, সম্ভবত বৈশ্য ছিল। গুপ্ত সময়ের বিস্তার মৌর্য সাম্রাজ্যের মতো ছিল না; প্রধানত বিহার ও উত্তরপ্রদেশেই তৃতীয় শতকের শেষ দিকে এরা ক্ষমতায় আসে। উত্তরপ্রদেশেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল বলে মনে হয়, কারণ এদের মুদ্রা ও শিলালিপি অন্তত রাজত্বের প্রথম দিকে উত্তর প্রদেশেই বেশি পাওয়া যায়। এখান থেকেই গুপ্ত রাজারা অন্যান্য দিকে ক্ষমতা বিস্তার করে। প্রয়াগে (বর্তমান এলাহাবাদে) এদের ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল। এ অঞ্চলে প্রথম দিকের গুপ্ত রাজারা সম্ভবত কুষাণদের বশ্যতা স্বীকার করে কর দিত এবং কুষাণ ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে গেলে গুপ্তরা হয়তো বিনা বাধাতেই এ অঞ্চলের নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। কুষাণ রাজত্ব শেষ হওয়ার পরে তাদেরই আত্মীয়বংশ মুরুণ্ডরা ২৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে। এর প্রায় পঁচিশ বছর পরে ২৭৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গুপ্তবংশের সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ক্ষমতায় আসেন। ইনি সম্ভবত নেপালের লিচ্ছবি বংশীয়া এক রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। এতে নেপালের রাজবংশের সঙ্গে কুটুম্বিতা হওয়ার ফলে তাঁর সাম্রাজ্য আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ, বৈশ্য বর্ণের গুপ্ত সম্রাট এই বিয়েতে খানিকটা জাতে ওঠেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ওই সময় থেকে গুপ্ত যুগের পত্তন করেন। পরের যুগের অনেক শিলালিপিতে এই সময় গুপ্ত যুগের কাল নির্ণয় করে উল্লেখ করা আছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের যুগ নানা দিক থেকেই সমৃদ্ধ ও এর ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। এঁর মৃত্যু হয় ৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল (৩৩৫ থেকে ৩৮০ খ্রিস্টাব্দ) দীর্ঘ ও প্রসিদ্ধ। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* যে রাজার প্রশংসা করেছে তাকে বলেছে:— বিজিগীষু, অর্থাৎ যে আশপাশের রাজ্যগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করে সেগুলো নিজের দখলে আনতে পারে। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন এমনই এক বিজিগীষু রাজা যিনি অনেক রাজার ও অনেক জাতের মানুষের সঙ্গে অনেক দিন ধরে যুদ্ধ করেন ও জয়লাভ করেন। সেই কাহিনি এলাহাবাদের একটি প্রকাণ্ড পাথরের থামে তিনি খোদাই করিয়ে রাখেন। সেটি আজও আছে। সমুদ্রগুপ্ত যে সব রাজ্য জয় করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম অংশ হল তাঁর রাজ্যের আশপাশে গঙ্গাযমুনা মধ্যবর্তী দেশগুলো। এগুলো সম্পূর্ণ জয় করে সমুদ্রগুপ্ত নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। দ্বিতীয়

অংশ হল, যে সব অঞ্চল তাঁর রাজধানী থেকে অনেক দূরে, যেমন, নেপাল, আসাম, বঙ্গদেশ অর্থাৎ পূর্ব দিকের দেশগুলো। সমুদ্রগুপ্ত এগুলোও জয় করলেও তাদের সরাসরি নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেননি, নিজের অধীন আনেন। তবে এ সব রাজ্যের শাসন আগের মতোই চলতে লাগল। যে গণরাজ্যগুলি তখনও কোনও রকমে টিকে ছিল সেগুলো সমুদ্রগুপ্তের সময়ে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পরিশেষে বিন্ধ্যের কাছে যে আটবিক রাজ অর্থাৎ দুর্ভেদ্য জঙ্গল প্রদেশ ছিল সেগুলো এবং দাক্ষিণাত্যের পূর্বাঞ্চলের কিছু রাজত্ব জয় করে আবার তাদের প্রশাসনিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন সমুদ্রগুপ্ত। দক্ষিণে তামিলনাড়ুর কাঞ্চী অঞ্চল পর্যন্ত সমুদ্রগুপ্তের বিজয়যাত্রা পৌঁছেছিল। সেখানকার পল্লব রাজারা সমুদ্রগুপ্তের আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য হন। সুদূর আফগানিস্তানে যে শক ও কুষাণ রাজারা রাজত্ব করছিলেন সমুদ্রগুপ্ত তাদেরকে দিয়েও বশ্যতা স্বীকার করান। চিনা সূত্র বলে যে, শ্রীলঙ্কার রাজা মেঘবর্মা নাকি সমুদ্রগুপ্তের কাছে গয়াতে একটি বৌদ্ধ নির্মাণ করবার অনুমতি চান। এর থেকে বোঝা যায় সমুদ্রগুপ্তের রাজপ্রতাপ কত সুদূরপ্রসারী ছিল। সমুদ্রগুপ্ত দুর্জয় পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, যেখানেই যুদ্ধ করেছেন সেখানেই বিজয়ী হয়েছেন।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১২ খ্রিস্টাব্দ) গুপ্তবংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা। ইনি সরাসরি যুদ্ধ না করে বরং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের রাজপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করেন। নিজের মেয়ে প্রভাবতীর বিয়ে দেন মধ্যভারতের ব্রাহ্মণ বাকাটক রাজপুত্রের সঙ্গে, এতে জাতে ওঠাও হল আবার বাকাটকদের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তার করাও হল। বাকাটক রাজপুত্রের মৃত্যুর পরে প্রভাবতীই বাকাটক মহিষী হয়ে রাজত্ব করেন।

বাকাটক অঞ্চলে এ ভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করার ফলে চন্দ্রগুপ্ত শক ক্ষত্রপদের অধীনে পশ্চিম মালব ও গুজরাট জয় করে নেন। উজ্জয়িনী ছিল মালবের রাজধানী। গুজরাট দখল করে গুপ্তরা পশ্চিমে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের পথটির অধিকার পান। এতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে বহির্বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হল এবং রাজধানী উজ্জয়িনীর ঐশ্বর্য গৌরব বাড়ল। এ শহরটিই বোধহয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় রাজধানী। এই চন্দ্রগুপ্তের সময়ই চিনা পরিব্রাজক ফাক্ শিয়েন ভারত ভ্রমণে আসেন (৩৯৯-৪১৬ খ্রিস্টাব্দে) চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। উজ্জয়িনীতেই খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ সালে এক রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভায় বহু গুণী পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। *অমরকোষ*-এর অভিধানকার অমরসিংহই শুধু নন, ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিখ্যাত সংস্কৃত কবি কালিদাসও এঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন। শোনা যায়, এঁর সভায় ন'জন শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন তাঁদের বলা হত 'নবরত্ন'। খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকের শেষ দিকে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়। এক দিকে হূন আক্রমণ, অন্য দিকে গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীন রাজারা একে একে প্রাধান্য ও শক্তি অর্জন করে গুপ্তসাম্রাজ্য থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে স্বাধীন হয়ে যান। উত্তর প্রদেশের থানেশ্বর রাজারাও স্বাধীন হয়ে স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বিহার ও উত্তর প্রদেশে মৌখরিদের রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, গুজরাট ও পশ্চিম মালবে বলভীদের। খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকের

দ্বিতীয়ার্ধে স্কন্দগুপ্তর রাজত্বের পরে গুপ্ত মুদ্রার মূল্যমান নেমে যেতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ওই রাজবংশের পতন ঘটে।

অর্থনীতি

চিনা পরিব্রাজ ফাক্ শিয়েনের বিবরণ এবং এই সময়ে নির্মিত স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিলালিপি ও সাহিত্য থেকে আমরা গুপ্তযুগের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বেশ কিছু কথা জানতে পারি। কেন্দ্রীয় শাসন সারা রাজ্যে সমান ছিল না। রাজধানী থেকে যে অঞ্চল যত দূরে, শাসনব্যবস্থা সেখানে ততই শিথিল। রাজস্ব আদায় বিধিবদ্ধ ভাবে হত। খুব সম্ভব আয়ের এক চতুর্থাংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশ রাজস্ব বলে আদায় করা হত। করের বোঝা ধনীদের ওপর যত বেশি ছিল গরিবদের ওপর ততটা ছিল না। সৈন্যদল খুব শক্তিশালী ছিল, রাজকোষ থেকে প্রতিরক্ষা খাতে বিস্তর খরচ হত। যুদ্ধে রথ ক্রমে অপ্রচলিত হয়ে পড়ছিল, তার বদলে অশ্বারোহী সৈন্যই প্রাধান্য পাচ্ছিল। ঘোড়সওয়ার তীরন্দাজরাই এ সময়ে সৈন্যদলে যোদ্ধা ছিল। রাজার সৈন্যদল রাজ্যের যে অঞ্চল দিয়ে যাত্রা করত, সেই সব স্থানীয় লোকজনদের সৈন্যদল এবং ঘোড়াদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হত। সেনাপতি এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের খাওয়াদাওয়া, বিশ্রাম ও বিলাসের সব ব্যবস্থাই করতে হত সাধারণ গ্রামবাসীদের। মধ্য ও পশ্চিম ভারতের চাষিদের বিষ্টি বা বেগার দেওয়ার রেওয়াজ ছিল, রাজার সৈন্যদল ও কর্মচারীদের পরিচর্যা করতে হত, এই চাষিদের প্রভুর ক্ষেতখামারে কাজ করতে হত বাধ্যতামূলক ভাবে এবং বিনা পারিশ্রমিক বা যৎসামান্য বেতনে, ফলে নিজেদের ক্ষেতের কাজ পড়ে থাকত।

শাসন

গুপ্ত রাজত্বকালে অনেকগুলি নীতিশাস্ত্র বা আইনের বই রচিত ও সংকলিত হয়েছিল। এগুলিতেই প্রথমবার দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের বিভাগ দেখা যায়। চুরি ও ব্যভিচার তখন ফৌজদারি আইনের আওতায় এল। সম্পত্তির নানা ধরনের স্বত্বাধিকার নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা দেওয়ানি আইনের আওতায় এল। অধিকাংশ আইনই বর্ণভিত্তিক, অর্থাৎ একই অপরাধে বিভিন্ন জাতের লোকের ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি, এর ফলে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের ওপরে শাস্তির বোঝা বেশি ভারি হত। ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সাহায্যে রাজা বিচার করত। কিন্তু নানা পেশার যে পূগ বা শ্রেণি ছিল তারা নিজের নিজের পেশায় নিযুক্ত মানুষগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব অভিযোগের বিচার নিজেরাই করত। এলাহাবাদের কাছে ভিটা এবং বৈশালীতে পাওয়া শিলালিপি থেকে বোঝা যায় ওই সব বৃত্তিভিত্তিক পূগ সংস্থাগুলি গুপ্ত আমলে স্বাধীন ও বেশ প্রভাবশালী ছিল। যেহেতু সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির পক্ষে উৎপাদন, শিল্প ও কারিগরি, বিদ্যার চর্চা অত্যাবশ্যক ছিল, তাই এই শ্রেণি বা পূগগুলি যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান পেত। গুপ্তযুগে রাজ্যের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বলা হত কুমারমাত্য। তখন সমস্ত রাজ্যটাকে বেশ কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম ভাগ ভুক্তি; প্রত্যেক ভুক্তির শাসনভার থাকত

একজন 'উপরিকের' ওপরে। ভুক্তিগুলি বিভক্ত ছিল 'বিষয়'-এ এবং বিষয়ের শাসনকর্তাকে বলা হত বিষয়পতি। পূর্ব ভারতে বিষয়গুলিকে ভাগ করা হত 'বীথি'-তে এবং সেগুলির মধ্যে থাকত গ্রামগুলি। অর্থাৎ গুপ্ত আমলে সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে নিম্নতম একক ছিল গ্রাম। যে বিভাগ কার্যত এখনও চালু আছে। গুপ্ত যুগে গ্রামের মোড়লের আধিপত্য বাড়ে। শাসন ব্যাপারে গ্রামের মতামত ও গ্রাহ্য করা হত। শহরের শিল্পের কারিগরির ভিত্তিতে একটা সংগঠন তৈরি হত। শাসনের ব্যাপারেও তাদের কিছু অধিকার ছিল। শিলালিপিতে দেখি কারিগর, বণিক ও লেখক বা লিপিকের। একই প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত এরা সকলে মিলে শহরের শাসনব্যবস্থা চালাত। জমি কেনাবেচা বা হস্তান্তরের ব্যাপারে এদের সম্মতি দরকার হত। বৈশালী, ভিটা ও মান্দাসোর-এ শ্রেণির কথা শুনি, মান্দাসোরের শিলালিপিতে রেশম শিল্পীদের একটি সমবায়ের উল্লেখ পাই। এই সমবায়গুলি কিছু কিছু বিশেষ সুবিধাও পেত। নিজেদের প্রতিষ্ঠানের শাসন, বিচার, শাস্তি সব এদের নিজেদের হাতেই থাকত। এই ধরনের শাসন বিহার, উত্তরবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের উত্তরপ্রদেশ-ঘেঁষা কিছু অঞ্চলে চালু ছিল। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শাসন বিশেষ পৌঁছত না। অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিরা গুপ্তরাজাদের রাজসভায় গিয়ে রাজাকে সম্মান দেখাতেন, রাজস্ব দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রাজবধূ হওয়ার জন্য নিজেদের মেয়েদের সম্প্রদান করতেন। এর বিনিময়ে তাঁরা নিরাপদে নিজেদের রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে রাজত্ব করতে পারতেন। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী গুপ্ত রাজারা করদ রাজাদের যে সনদ দিতেন তাতে গরুড় চিহ্ন মুদ্রিত থাকত। রাজারা রাজকর্মচারীদের ভূমিদান করতেন কিনা জানা যায় না, তবে গুপ্ত আমলের মুদ্রার যে বিপুল সম্ভার পাওয়া গেছে তার থেকে মনে হয় নগদ বেতনই দেওয়া হত। রাজকর্মচারী ও পুরোহিতদের খাজনায় কিছু কিছু ছাড় দেওয়া হত। পুরোহিতদের নিষ্কর জমি ব্রহ্মত্র দেওয়া হত, তারা ওই জমির প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত তারা তাদের প্রজাদের বিচার করত ও শাস্তিও দিত। কাজেই পুরোহিতদের ভূমিদান মানে রাজা তাঁর পাওনা খাজনা থেকে বঞ্চিত হতেন, ফলে ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি বাড়ছিল।

সমাজ

এ যুগের আগে থেকে সমাজে বহিরাগত জনগোষ্ঠীগুলিকে ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত করার একটা প্রক্রিয়া চলছিল। এ যুগে নতুন যাদের নিয়ে এ সমস্যা দেখা দিত তারা হল বহিরাগত শক্র হূণ। বিজয়ী আগন্তুক হিসাবে সমাজে এরা রাজপুতদের ছত্রিশ গোষ্ঠীর একটি বলে স্বীকৃতি পেল; এখনও বেশ কিছু রাজপুত হূণ উপাধি বহন করে। বহু বিভিন্ন বৃত্তির চল হওয়াতে বৃত্তিভিত্তিক নতুন জাতির সৃষ্টি হল। আবার গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদিবাসীরা ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল, এদেরও নানা জাতির পরিচয় সৃষ্টি করছিলেন সমাজপতি, শাস্ত্রকাররা। ফলে গুপ্তযুগে বিস্তর নতুন জাতি সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই জন্য পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রগুলি প্রয়োজনমত বিভিন্ন জাতির

উৎপত্তির কাল্পনিক বিবরণ তৈরি করছিল, যেন বহু প্রাচীনকালে দেবতারা কোনও কারণে তাদের সৃষ্টি করেছিলেন যাতে সমাজে তাঁদের ওই জাতিগুলিকে মেনে নেওয়া হয়। বোঝাই যায়, আগন্তুক গোষ্ঠী বিজয়ী হলে যেমন সমাজে 'ক্ষত্রিয়' পরিচয় পাচ্ছিল, তেমনই প্রান্তিক আদিবাসীরা ব্রাহ্মণ্য সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষ হিসাবে ঠাঁই পেয়েছিল। এই প্রক্রিয়া এখনও চলছে, জাতি-উপজাতির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এদের মধ্যে নতুন নতুন গোষ্ঠীকে অচ্ছুত বা অস্পৃশ্য নাম দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ ভাবে এদের চণ্ডাল বলা হয়। পঞ্চম শতকে ফাক্ শিয়েন এ দেশের সমাজে বিপুল সংখ্যক চণ্ডাল দেখেছিলেন। এরা মাছ মাংস বিক্রি করত, অন্যান্য নিচু কাজ করত এবং সমাজে এদের ঠাঁই ছিল না; তাই এদের গ্রামের বাইরে থাকতে হত। শহরে এলে উচ্চবর্ণের মানুষ এদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে রাস্তায় হাঁটত, যাতে এদের অশুচিতা কোনও ভাবেই তাদের স্পর্শ না করে।

সমাজে রাজা ও রাজন্যদের প্রসাদে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য প্রবল ছিল, দানে পাওয়া নিষ্কর জমিতে নিচু বর্ণের প্রজাদের কাছে খাজনা আদায় করে তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে ব্রাহ্মণরা নিজেদের প্রতিপত্তি ঘোষণা করত। বণিকদের সুরক্ষার জন্য বাণিজ্য সার্থবাহের অনুচর হিসাবে এবং সৈন্যদলে ক্ষত্রিয় হিসাবে এদের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। দেশে এবং বিদেশে বাণিজ্যের দরুণ বৈশ্যদের হাতে বিস্তর টাকা জমত। ফলে সমাজে তাদের প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। এ সময়ে শূদ্ররা চাষ ও কারিগরিতে স্বাধীন ভাবে নিযুক্ত থেকে আগের চেয়ে সামাজিক অবস্থানে কিছু উন্নতি লাভ করেছিল। তবে নারী ও শূদ্রদের বেদে কোনও অধিকার ছিল না বটে, কিন্তু এ সময়ে *রামায়ণ, মহাভারত* ও যে অল্প কিছু পুরাণ রচিত হয় সেগুলি পাঠ করার সময় শূদ্র ও নারীরা শুনতে পেত, তাতে পাপ হত না; ফলে কোনও এক ধরনের ধর্মশাস্ত্র শুনতে নারী ও শূদ্রের অধিকার জন্মেছিল। আগে দরিদ্র বৈশ্য ও শূদ্র নারীরা বাড়ির বাইরে রোজগার করতে যেত, চাষের কাজেও হাত লাগত। এ ছাড়াও উচ্চবর্ণের ধনীদের বাড়িতে দাসীর কাজ করে কিছু স্বাধীনতা পেত। কিন্তু গুপ্ত যুগে সমাজ ক্রমশই রক্ষণশীল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নারী ও শূদ্রের স্বাধীনতা ক্রমে সংকুচিত হয়ে এল। কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক উপাসনার চল হওয়াতে আগে শূদ্র সম্প্রদায় বৈষ্ণব ধর্মে ধর্মাচরণে একটা অধিকার পেল, কিন্তু তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণে শাস্ত্রকার পুরোহিতের নির্দেশ অনুসারে তাদের অধিকার নির্ধারিত হত। সংখ্যায় অর্ধেক হলেও নারীর অধিকার, সমস্ত শাস্ত্রে ক্রমশই খর্ব করার চেষ্টা চলতে থাকল। নানা কাহিনি ও তত্ত্বকথা শোনানো হল সাধারণ মানুষকে, যাতে দেখানো হয়েছে নারী স্বভাবত পাপিষ্ঠা, পুরুষের অধঃপতনের হেতু, তার প্রকৃতিই হীন, তার একমাত্র কর্তব্য স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির দাস্য। এই সময়ে রচিত নাটক *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এ পড়ি, দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে অকারণে পরিত্যাগ করবার পর কণ্বের শিষ্য শার্ঙ্গরব রাজাকে বলছে: 'এ তোমার স্ত্রী, একে ত্যাগ কর বা গ্রহণ কর (যা তোমার ইচ্ছা), কারণ স্ত্রীর ওপরে স্বামীর সর্বতোমুখী প্রভুত্ব আছে।'

এই প্রভুত্বের একটা কারণ হল, ভৃত্যের মতোই নারী তখন ভরণপোষণের জন্যে সব রকমে স্বামীর ওপরে নির্ভরশীল। বস্তুত, আগেই বলেছি ভৃত্য ও ভার্যা, দুটি শব্দই 'ভরণ করা'

অর্থে 'ভৃ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন; মানে যাকে ভরণ করতে হবে। অর্থাৎ স্ত্রীর খাওয়া পরার বিনিময়ে স্বামী তার ওপরে যথেচ্ছ প্রভুত্ব করতে পারে। নারীর উপনয়ন হত না ফলে বেদ পড়ার অর্থাৎ লেখাপড়ার অধিকার ছিল না। দু'চারটি বিরল ব্যতিক্রম বাদে নারীর শিক্ষার কোনও পথ ছিল না। অন্তত সদর রাস্তায় ছিল না, খিড়কির রাস্তা দিয়ে কিছু নারী নিশ্চয়ই শিক্ষা পেত। কিন্তু কোনও বৃত্তির অর্থাৎ অর্থকরী কাজ করার মতো শিক্ষা সে পেত না। একেবারে নিচুতলার মেয়েরা কিছু কিছু জিনিস হাতে তৈরি করত, কোনও কোনও কারখানায় বা কুটিরশিল্পে যুক্ত থাকত; গরুবাছুর চরানো, ক্ষেতের কাজে সাহায্য করা, সবজি চাষ করে বা হাতে তৈরি জিনিস বিক্রি করে কিছু রোজগার করত; কখনও বা অন্যের বাড়িতে বেতন এবং খাওয়া-পরার বদলে কিছু কিছু কাজ করে কিছু টাকা হাতে পেত। এই সব মেয়েদের ওপরে স্বামীর ও শ্বশুরবাড়ির কর্তৃত্ব হয়তো বা কিছু শিথিল ছিল; সামান্য পরিমাণে হলেও রোজগারের অনুপাতে তাদের হয়তো কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। একেবারে ওপরতলার মেয়েরা অলংকার, সম্পত্তি ও জমির মালিকানা পেত; শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সজ্জন হলে স্ত্রীধন, যৌতুক ও অন্যান্য সম্পত্তিতেও নারীরা অধিকারও পেত। কিন্তু শাস্ত্র বলেছে, দেহ বা ধনের ওপরে নারীর কোনও অধিকার থাকবে না। ফলে নারীর নিগ্রহ শাস্ত্রসম্মত, পুরোপুরি মানুষের মর্যাদা না পাওয়াই এ সমাজে নারীর অবস্থানের যথার্থ চিত্র।

শিল্প সংস্কৃতি

উচ্চবর্ণের অবস্থাপন্ন পুরুষদের হাতে জমি বেশি আসতে লাগল। বাণিজ্যের সম্পত্তি জমত তাদেরই হাতে; ফলে এ সময়ে বহুবিবাহের চলও বাড়ল। দেবতাদের প্রায় সকলের (শিব ছাড়া) একাধিক স্ত্রী ছিল— কৃষ্ণের সবচেয়ে বেশি, পঞ্চপাণ্ডবেরও তাই। এর মধ্যে সমাজে পুরুষের বহুবিবাহের প্রচলন প্রতিফলিত হয়েছে। নারীর বহু বিবাহ অচল ছিল; দ্রৌপদীর বহু বিবাহ তাঁর ইচ্ছাক্রমে ঘটেনি। আর সব রাজপুত্রের (*রামায়ণ*-এ সীতা, ঊর্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি বাদ দিলে) একাধিক সপত্নী ছিল। প্রথম সতীদাহের নজির পাই খ্রিস্টিয় ৫৪০ সালে, গুপ্তযুগে। এই গুপ্তযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করেছেন— এমন একটি ভাস্কর্যও পাওয়া যায়। সতীত্ব সাংঘাতিক কঠোর ব্রতের মতো সব শাস্ত্রে ও সাহিত্যে প্রচলিত হচ্ছিল, অসতীর দণ্ডও অমানবিক এবং বীভৎস, অথচ 'সতী' শব্দটির ওই অর্থে কোনও পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ নেই, অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিশ্বস্ততা সমাজে অপেক্ষিত ছিল না। বিরল কিছু শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের নির্দেশ থাকলেও ইতিহাসে কাব্যে সাহিত্যে মহাকাব্যে ও পুরাণে কোথাও এর কোনও উল্লেখ নেই।

বিজ্ঞান, গণিত ও প্রযুক্তিবিদ্যাতেও গুপ্ত যুগে বেশ উন্নতি হয়েছিল। জ্যোতিষচর্চায় পাটলিপুত্রের পণ্ডিত আর্যভটের *আর্যভটীয়* একট যুগান্তকারী গ্রন্থ। নানা ধরনের গাণিতিক হিসেব তিনি নিজে উদ্ভাবন করেন। *রোমক সিদ্ধান্ত* নামে যে জ্যোতিষের গ্রন্থটি এ সময়ে সংকলিত হয় তাতে গ্রিক জ্যোতিষের প্রভাব আছে। এলাহাবাদে ৪৪৮ খ্রিস্টাব্দের একটি

গুপ্ত শিলালেখে দশমিক পদ্ধতির গণনার উল্লেখ পাওয়া যায়। রসায়ন ও ধাতুবিদ্যাও এ যুগে খুব উন্নতি লাভ করে। লোহা ও ব্রোঞ্জের তৈরি বুদ্ধ ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিগুলির পিছনে এ সব চর্চার প্রভাব আছে। হাজারেরও বেশি বছরে এগুলিতে একটুও মরচে পড়েনি। এমন ভাবে লোহার রঙকে স্থায়ী রেখে লোহার কাজ পাশ্চাত্য জগৎ প্রথম পেরেছিল মাত্র শ'খানেক বছর আগে। গুপ্ত যুগের সমাজে বিজ্ঞান ও প্রয়োগগত অবসংগঠনটি খুব মজবুত ও উঁচুদরের ছিল। গুপ্তযুগকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়। দরিদ্রতম চাষি বা মজুরের ক্ষেত্রে হয়তো এ কথার কোনও সার্থকতাই নেই, কিন্তু সাম্রাজ্যের ওপরতলায় সমৃদ্ধির নানা লক্ষণ ছিল। এ যুগে সোনা ছিল প্রচুর, মোহর ছাপা হত বিস্তর। এই ঐশ্বর্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল শিল্প সাহিত্যে রাজা ও ধনী রাজন্য বা বৈশ্য বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতা। এঁরা শিল্পীদের অর্থ, পুরস্কার ও বৃত্তির ব্যবস্থা করে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় ন'জন বিখ্যাত গুণী ছিলেন, তাঁদের বলা হত নবরত্ন। মহাকবি কালিদাস এঁদের একজন এবং আরও অনেক গুণী শিল্পীও এদের মধ্যে ছিলেন। কাব্য নাটকের মান খুব উঁচু ছিল, নাচগানের চর্চা হত রাজার পৃষ্ঠপোষকতায়। কালিদাসের নাটক *মালবিকাগ্নিমিত্র*-তে দেখি দু'জন নৃত্যশিক্ষকের ছাত্রী দুটি নর্তকী রাজসভায় নাচের উৎকর্ষের পরীক্ষা দিচ্ছে। কালিদাসের *বিক্রমোর্বশীয়* নাটকের পুরো চতুর্থ অঙ্কটি রচিত হয়েছে নাচে গানে; নাচগানের মান খুব উন্নত না হলে শুধু নাচ ও গান দিয়ে পুরো একটি অঙ্কে দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখা যেত না। এখানে বিভিন্ন রকমের নাচের ও গানের নাম পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রাতে দেখি রাজা বীণা বাজাচ্ছেন। *মেঘদূত*-এ ও যক্ষবধূ ও অন্যত্র অন্যান্য নায়িকাদের বীণা বাজানো ও গান গাওয়ার কথা শুনি। অর্থাৎ সমাজের ওপরতলায় নাচ, গান ও কবিতার রীতিমতো চর্চা ছিল। *কামশাস্ত্র* নাগরিকের জীবনের যে চিত্র দেয় তাতেও শিল্পকলার রীতিমতো চর্চার কথা শুনি।

সাহিত্যসঙ্গীতের উচ্চমানের সঙ্গে তুলনা করা যায় এ যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের। দিল্লিতে গুপ্ত যুগের যে লৌহস্তম্ভ পাওয়া যায় তাতে লোহা যেমন উঁচুদরের, স্তম্ভটির গঠন ও মসৃণতাও তেমনই। কানপুরে ভিটারগাঁওয়ের পোড়া ইঁটের মন্দির, ঝাঁসিতে দেওগড়ে ও গাজিপুরে ভিটারির স্থাপত্য উৎকর্ষে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নালন্দার বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পোড়া ইঁটের স্থাপত্য অংশটি পঞ্চম শতকের। স্থাপত্যে পাহাড়পুর, উদয়গিরি ও বাদামির প্রাসাদগুলি গুপ্ত যুগের শিল্পের সুন্দর নিদর্শন। জ্যামিতি, বিজ্ঞান ও গঠনসৌষ্ঠবে এগুলির মান বেশ উঁচু। চতুর্দ্বার মন্দিরের পারিভাষিক নাম সর্বতোভদ্র, সেগুলিও এই সময়ে নির্মিত হচ্ছিল। স্থাপত্যের চেয়ে গুপ্তযুগের ভাস্কর্য যেন বেশি উন্নত স্তরের ছিল। ভাগলপুরের কাছে সুলতানগঞ্জে দু মিটার উঁচু ব্রোঞ্জের সুন্দর বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। কিন্তু এ যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যে বিষ্ণু, নটরাজ, শিব, সূর্য, গণেশ, লক্ষ্মী, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দিনী, কার্তিক, ইত্যাদি বেশ কিছু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। খোটান থেকে বিকানীর হয়ে, মথুরা, পাটলিপুত্র পর্যন্ত বাণিজ্যপথের ধারে ধারে গড়ে ওঠা শহরগুলিতে শিল্পচর্চা গুপ্ত যুগে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। এই অঞ্চলে

বাসুদেবের মূর্তিও দেখা যায়, তবে এখনও পর্যন্ত বিষ্ণুর সঙ্গে এঁর তেমন যোগ নেই। বরং চতুর্ব্যূহের বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সাম্ব, যাঁরা বিষ্ণুর অংশ কিন্তু অবতার নন, তাঁদের বেশি যোগ। এ সব মূর্তি শুধু যে দেহ-সৌষ্ঠবেই সুন্দর তা নয়, অধিকাংশ মূর্তি সুঠাম ক্ষীণতনু এবং বেশ কিছু দেবতার মুখে একটি অনতিস্ফুট স্মিতহাস্য দেখা যায়, যা গুপ্ত যুগের আগে বা পরে কখনও ভারতীয় শিল্পে দেখা যায়নি। মহাযান বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হচ্ছিল, তাতে গান্ধার শিল্পরীতি মারফৎ গ্রিক প্রভাব কিছু কিছু এসে পড়েছিল; এমনকী গ্রিক অতিকথার চিত্রও কখনও কখনও চোখে পড়ে অমরাবতীর ও অন্য কিছু ভাস্কর্যে। যক্ষী, অপ্সরা ও নাগদের মূর্তি গড়ার পিছনেও গ্রিক উপদেবতা গড়ার প্রভাব থাকতে পারে। সূর্য, চন্দ্র, বায়ু এবং অর্ধনারীশ্বর মূর্তিও গড়া হত। শেষটির উল্লেখ পাই ষষ্ঠ শতকের গ্রিক স্টোবায়েউস-এর লেখায়। ষাঁড়ের ওপরে চড়া শিব, গিরি-গোবর্ধনধারী কৃষ্ণও ভাস্কর্যে দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ মহাভারতের শেষ দিকে ও পুরাণে দেবতাদের নিয়ে যে-সব অতিকথা নির্মিত হচ্ছে, তার প্রকাশ ঘটেছে ভাস্কর্যে। দেবতাদের মূর্তি মানুষের মতো করেই গড়া হয়েছে, অবয়বসংস্থান বসন ও অলংকার বিন্যাস অতি নিপুণ: মেদবর্জিত সুঠাম গড়ন, ভাস্কর্যে এটি সূক্ষ্ম পরিমিতিবোধ দেখা যায়। এর মধ্যে গ্রিক, মধ্যপ্রাচ্য, পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও, এ শিল্প স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর, কারণ সমস্ত প্রভাবকেই ভারতীয় শিল্পী আত্মস্থ করে নতুন একটি শৈলী সৃষ্টি করেছে। চিত্রশিল্পের অজন্তায় রঙের ব্যবহার নিপুণ। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এ দেখি দুষ্যন্ত ছবি আঁকছেন। অন্যত্রও এমন উল্লেখ আছে যেমন, *প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ* নাটকেও। কবিতায় ও গানে সংস্কৃত ছাড়া মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ব্যবহার হত। শিক্ষিত মেয়েরা ও অশিক্ষিত পুরুষ শৌরসেনী প্রাকৃত বলত। আরও নিচুতলার মানুষ মাগধী প্রাকৃত এবং একেবারে নীচে শাকারী। অর্থাৎ ভাষার ব্যবহার মোটের ওপর শ্রেণিভিত্তিক, কতকটা হয়তো লিঙ্গভিত্তিকও ছিল। ভাষা সম্বন্ধে সচেতনতা লক্ষ করি কোষগ্রন্থ, অভিধান, ছন্দ, ব্যাকরণ, ইত্যাদি রচনায়। এই সময়ে মিশ্র বৌদ্ধ সংস্কৃতে কিছু গ্রন্থ এবং সংস্কৃতেও কিছু বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয়। সংস্কৃত হল সাহিত্যের ও শাস্ত্রের ভাষা। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে সংস্কৃত শিক্ষিত লোকের ভাষা হয়ে উঠেছিল। আর্যরা সিন্ধু পঞ্জাবের অঞ্চল থেকে বিহার উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত ছাড়িয়ে পড়ায় এই বিস্তৃত অঞ্চলের বহু আঞ্চলিক ভাষা ছাড়াও এমন একটা ভাষার দরকার হয়েছিল যা পঞ্জাব থেকে পূর্ণিয়ার সব শিক্ষিত লোক বুঝতে ও ব্যবহার করতে পারবে। বৈদিক সাহিত্যের পরে পালি ও প্রাকৃত আর ধর্মপ্রচারের ভাষা রইল না, দুটি মহাকাব্যের পরে পুরাণ রচনার শুরু থেকেই সংস্কৃত ধর্ম এবং সংস্কৃতির মার্গ-সংস্কৃতি বা ধ্রুপদী সংস্কৃতির বাহন হয়ে উঠল।

এ যুগের কাব্য নাটকের নায়ক প্রায়ই হত রাজা বা বণিক, রস শৃঙ্গার বা বীর, নায়িকা রাজকন্যা এবং রাজার সহচর, বিদূষক বা বিট হত ব্রাহ্মণ। সাধারণ সারির মানুষের জীবনও একটু আধটু প্রতিফলিত হত কাব্যনাটকে; ভাস্কর্যেও সাধারণ মানুষের জীবন চিত্রিত হত। কিন্তু সাহিত্য এ সময়ে সাধারণ গড়পড়তা মানুষের জীবনের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল। সাহিত্যে ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর অলংকারের প্রয়োগ

বাড়ছিল, সাধারণ লোকের পক্ষে কাব্য পড়ে বোঝা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল। অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারে এবং শ্লেষ, যমক, ইত্যাদি দুর্বোধ্য অলংকারের প্রয়োগে সাহিত্য, বিশেষত কাব্য, জটিল হয়ে উঠছিল। শ'খানেক বছর পরে ভট্টি তাঁর *রাবণবধ* কাব্যে স্পষ্ট উচ্চারণ করেই বলছেন, 'আমার এই কাব্য ভাষা ছাড়া বোঝা যাবে না, এতে পণ্ডিতদের উৎসব; আমি বিদ্বানদের পছন্দ করি বলে (এ কাব্যে) অবিদ্বান মূর্খদের বধ করেছি, অর্থাৎ অবিদ্বানরা এ-কাব্যে দাঁত ফোটাতে পারবে না।' বাস্তবিক, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও শব্দপ্রয়োগে অনাবশ্যক জটিলতার আমদানি করে ভট্টি তাঁর কাব্যকে সাধারণ শিক্ষিত লোকেরও নাগালের বাইরে নিয়ে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্য জটিলতা ও দুর্বোধ্যতার সাধনা করে চলছিল বললেও ভুল হয় না। সাহিত্যে এ দর্লক্ষণের সূত্রপাত গুপ্ত যুগের শেষ দিকেই হয়েছিল। নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের সহ্যবোধ্য রচনাও ছিল, কিন্তু সংস্কৃতির কোষাধ্যক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তা সংরক্ষণ করবেন কেন? তাই সে সব কিছুই আমাদের কাছে পৌঁছয়নি; যেমন নাটকের শাস্ত্রে আমরা যে সব নাটকের নাম পাই তার অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। এগুলির রচয়িতা ও দর্শক ছিল নিম্নবর্গের মানুষ, নাট্যবস্তুও ছিল সাধারণ মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে। কাজেই, রাজদরবারে তার অভিনয় হত না এবং সে যুগে তো লেখার ব্যাপক ব্যবহার ছিল না, তাই সে সব লোকায়ত নাটকের কোনও নমুনা আমাদের হাতে আসেনি।

রাজা বা বণিক বা রাজন্য নায়কের জীবনযাত্রার কিছু নির্দেশ পাই খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় (বা তৃতীয়) শতকের গ্রন্থ বাৎসায়নের *কামসূত্র*-তে। এখানে অবস্থাপন্ন শিক্ষিত 'নাগরিক'-এর জীবনযাত্রার একটা বিবরণ আছে। তা বিলাস-ব্যসন, কাব্যনাটক রচনা-আলোচনা, প্রহেলিকা, ইত্যাদি তৈরি করে সময় কাটানো; বাগানে নদীর ধারে কুঞ্জবনে অরণ্যে, নৌকায় গণিকা ও পারিষদদের নিয়ে ফূর্তি করা, খাওয়া-শোওয়া এ সবই বর্ণনা করেছেন বাৎস্যায়ন। আমরা দেখি সেই সব ধনীদের যাদের জীবিকার জন্য পরিশ্রম করার কোনও প্রয়োজন ছিল না, সঞ্চিত ধন দিয়ে যারা বহু বন্ধুবান্ধব ও গণিকা নিয়ে নাচ গান শিল্পচর্চা, নৌকা-বাগান-বিহারে সময় কাটাতে পারতেন। বহু অল্পবিত্ত মানুষ এদের ফূর্তির জন্য নিযুক্ত থাকত নানা রকম সেবার পেশায়। কালিদাস, শূদ্রকের কাব্যনাটকের নায়করা মোটামুটি বাৎস্যায়নের নাগরকের আদলেই তৈরি। কাব্যনাটক যে ধনী বিলাসী মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যই রচিত হত, তার একটা প্রমাণ হল সাহিত্য কোথাও দুঃখান্ত পরিণতিকে স্বীকার করেনি। যেহেতু অধিকাংশ মানুষের জীবনে দুঃখ একটা জীবন্ত সত্য, তাই দুঃখান্ত পরিণামকে এড়িয়ে যে সাহিত্য তা জীবন থেকে এক অর্থে দূরে সরে যাচ্ছিল।

ধর্ম

গুপ্ত যুগের শাস্ত্রে ও সাহিত্যে আবার নতুন করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুজ্জীবনের এক সক্রিয় চেষ্টা চোখে পড়ে। যাগযজ্ঞ নতুন করে বিস্তর জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক প্রভাবে বৈদিক ধর্ম যেটুকু প্রতিহত হয়েছিল সেই সব ক্ষতিপূরণ করে যজ্ঞ

নতুন করে সমাজে এল। এর একটা কারণ হল রাজা ও ধনীদের হাতে বিস্তর সম্পত্তি জমেছিল যাতে তাদের এ সব খরচ বহন করবার সামর্থ্য হয়েছিল। এরই সঙ্গে বৈদিক যুগেরও আগেকার সমাজে যে সব আঞ্চলিক পূজা প্রচলিত ছিল সেগুলো এখন মাথা তুলল। এর সঙ্গে যুক্ত হল নানা আঞ্চলিক প্রাগার্য দেবতার উপাসনার পদ্ধতি, তৈরি হতে লাগল বিভিন্ন পুরাণ। বিভিন্ন দেবতাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন দেবতার অভ্যুত্থান ঘটল, পূজার বিস্তার হল বৃহৎ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরিসরে।

সমাজে জন্মান্তরবাদ খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতক থেকে শাস্ত্রে দেখা দিয়েছিল। জন্মান্তরবাদ সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকে রচিত পালিজাতকগুলিতেই প্রথমবার অর্থাৎ দেবতারা অবতাররূপে এবং জাতকগুলিতে বারবার মর্তে জন্মগ্রহণ করেন। মানুষের জন্মান্তর জাতকগুলিতে বুদ্ধে আরোপিত হয়, বুদ্ধ নানা রূপে বারবার জন্মগ্রহণ করে নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে মানুষকে পুণ্যপথে চলবার প্রবৃত্তি দেবেন। এর শ'দুই বছরের মধ্যে ঠিক জন্মান্তরবাদ না হলেও কৃষ্ণের চারটি অভিপ্রকাশ উপাসনার কেন্দ্র করে ওঠে। চতুর্ব্যূহে বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সাম্ব। অর্থাৎ কৃষ্ণ পরিবারের তিন পুরুষের মধ্যে চারজন বৃষ্ণিবীরকে (এই নামেই এদের পরিচয় শিলালেখে) অবলম্বন করে ব্যূহ পূজার সূচনা হয়। এরা দেবতার অবতার না হলেও কৃষ্ণের শৌর্য ও দেবত্বের চারটি প্রকাশ। এই ব্যূহ কল্পনা বৌদ্ধ জাতকের অবতারবাদ থেকে ব্রাহ্মণ্য অবতারবাদের মধ্যে একটি স্তর। এরপরে দেখি গুপ্ত যুগেই নারায়ণের দশটি অবতারের কথা (মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি)— কোথাও বা তেইশটি পর্যন্ত। স্পষ্টত, নানা অঞ্চলে প্রাচীন অর্বাচীন নানা রকম দেবতার পুজো চালু ছিল। সেগুলো একসূত্রে গাঁথবার জন্যে এবং বিষ্ণুকে সর্বপ্রধান দেবতা হিসেবে তুঙ্গে তোলবার প্রয়োজনে বিষ্ণুই যেন বারেবারে নানা জন্মে জাতকের বুদ্ধের মতো নানা নামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন— এই রকম কাহিনি তৈরি হতে লাগল। অবতারদের তালিকা বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রকম এবং সব মিলে এদের সংখ্যা বিস্তর। মনে রাখতে হবে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাজশক্তির সহায়তা পেলেও তখনও বৌদ্ধধর্ম একটি জীবিত ধর্ম, বহু মানুষ তা বিশ্বাস ও আচরণ করে। দুটি ধর্মগ্রন্থেই দেবতাদের ব্যাপারে মাত্রা ছাড়ানো গৌরবকীর্তন আছে, অতিশয়োক্তি ও অত্যন্ত বেশি। এ ছাড়াও সাহিত্যে ও সময়ে জন্মান্তর ও কর্মবাদের স্বর্গনরক এবং অতিলৌকিক ঘটনার বর্ণনা খুব প্রচলিত। এ সব লক্ষণ প্রাচীন সাহিত্যের। এর দ্বারা শ্রোতাকে সহজেই আকর্ষণ করা যায় বলেই হয়তো সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মপ্রচারের জন্য এর এত প্রচলন ছিল। সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য বেড়েই চলেছিল, শাস্ত্রকার পুরোহিতরা গরিব দুঃখীদের বোঝাচ্ছিলেন যে তাদের পূর্বজন্মের পাপের ফলে তাদের এ দুর্গতি, অতএব ব্রাহ্মণের সেবা ও পূজা ঠিকমতো করলে দেবতা অলৌকিক উপায়ে তাদের দুঃখমোচন করবেন। সাহিত্য ও শাস্ত্রে তাই এ সব অলৌকিক জাদু কাহিনির এত ছড়াছড়ি।

এই যুগেই ছ'টি প্রধান ব্রাহ্মণ্য দর্শনপ্রস্থানের (মীমাংসা, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত) গ্রন্থগুলি রচনা এবং আগে রচিত কিছু গ্রন্থের টীকা-ভাষ্য রচনা হতে থাকে। এগুলি

সাধারণ মানুষের বোধের বাইরে এবং এই সব চর্চার মধ্যে স্বাধীন চিন্তার যথেষ্ট উন্নতি হয়।

একদিকে শাস্ত্রে অবতারবাদের প্রবর্তনের দ্বারা আঞ্চলিক লোকদেবতাকে যেমন পূজার মণ্ডপে হাজির করা হল, অন্যদিকে তেমনই মানুষের জীবনে পুনর্জন্ম একটি স্বীকৃত তথ্য হয়ে উঠল। মাঝেমাঝেই দেবতারা কারও না কারও অভিশাপে মানুষ হয়ে মর্তে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হন— এমন কথা বহু পুরাণে আছে। এর দ্বারা সাধারণ লোকের মনে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের অভিশাপের আতঙ্ক ভাল ভাবেই সঞ্চায়িত করা গেল। তেমন তেমন লোকের দেওয়া শাপ ও বর সম্বন্ধে মানুষের ভয় ও লোভও জন্মায়। সব মিশে যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল তাতে উচ্চবর্ণ এবং অবস্থাপন্ন পুরুষের কর্তৃত্ব যেমন কায়েম হল, তেমনই নিম্নবর্ণের দরিদ্র, চণ্ডাল ও অস্পৃশ্য পুরুষ এবং সমস্ত নারীর স্থান ক্রমেই নেমে যেতে লাগল।

গুপ্ত যুগে যে আর্থিক প্রাচুর্য ওপরতলার মানুষের হাতে এসেছিল তার ফলে শুধু উৎপাদন ও বাণিজ্যে নয়, শিল্পে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, সংগীতে, বিজ্ঞানে, গণিতে, জ্যোতিষে, প্রযুক্তিবিদ্যায় একটা প্রেরণা বিপুল ও ব্যাপক ভাবে কাজ করে; নানা দিকে বিদ্যা ও শিল্পচর্চায় বিশেষ ভাবে স্ফূরণ হয়। বলাই বাহুল্য, এগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করছিল রাজা, রাজন্য ও বিত্তবান লোকেরা। লোকায়ত শিল্প সাহিত্যের স্ফূরণ হয়ে থাকলেও তার নজির আমাদের হাতে পৌঁছয়নি; শুধু ভাস্কর্যে ও সাহিত্যের সামান্য কোথাও কোথাও জনজীবনের চিত্র রয়ে গেছে।

ধর্মজগতে এ যুগে পরস্পরবিরোধী নানা মত ও পথ সহাবস্থান করছিল, যজ্ঞ ও পূজা, বৈদান্তিকতা ও নানা সাম্প্রদায়িক উপাসনা ঝাড়ফুঁক, কবচ, মাদুলি ও দুরূহ দর্শনচর্চা এবং তারই সঙ্গে নানা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মত ও প্রস্থান— এ সব মিলে একটি মিশ্র ও জীবনবোধ সমাজে প্রচলিত ছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অনিবার্য ভাবে সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠছিল অভিপৌরাণিক ধর্মের অগ্রগতি, অর্থাৎ যা পরে পুরাণের ধর্ম হয়ে উঠল। এরই আজকের নাম 'হিন্দুধর্ম'। এর মধ্যে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য, এই পাঁচটি প্রধান মত ছাড়াও বহু গৌণ ছোট ছোট আঞ্চলিক, গ্রামীণ, সাম্প্রদায়িক ধর্মচর্চার চল ছিল। গণ্ডগ্রামের ধর্মাচরণ গ্রাম ছাড়িয়ে গ্রামান্তরে ও শহরে এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে সঞ্চারিত হচ্ছিল। বহু প্রাচীন গ্রাম-দেবতা এখন স্বীকৃতিও পূজা পেল এবং ক্রমে ক্রমে প্রাধান্য পেয়ে নতুন নতুন উপাসক সম্প্রদায় সৃষ্টি করে সাধারণ দেবমণ্ডলীতে স্থান পেল। এদের নিয়ে কল্পকাহিনি রচনা করলেন পুরাণকাররা। আগেকার, প্রধান দেবতাদের সঙ্গে আত্মীয়তা বা কীর্তির সূত্রে এদের যুক্ত করলেন, যাতে এদের অভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজে। এই বহু বিভিন্ন ধরনের দেবতাদের নিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে নতুন রূপটি দেখা গেল, তার অনেক সামাজিক অনুষঙ্গ ছিল। এ ধর্মে ব্রাহ্মণের মর্যাদা তুঙ্গে, রাজা দেবতার প্রতিনিধি, পুরুষ পরিবারের সর্বময় কর্তা, শূদ্রের কর্তব্য মুখ বুজে উচ্চত্রিবর্গের সেবা করা এবং নারীর কর্তব্য স্বামী সন্তান ও শ্বশুরবাড়ির নিঃশর্ত সেবা করে চলা।

নতুন যে দার্শনিক বোধটি এখন প্রবল হয় উঠেছিল তা হল নিয়তিবাদ। এর অর্থ হল যে শক্তি জীবনের সুখদুঃখকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই নিয়তি; মানুষের শক্তি নেই সেই অদৃশ্য অজ্ঞেয় শক্তিকে স্বরূপে চেনা বা তাকে প্রতিরোধ করা। শাস্ত্রকার ও পুরোহিতরা যেমন নির্দেশ দেবে অন্ধভাবে সেইগুলো মেনে চললে ইহ-পরকালে কিছু মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। এই নিটোল সামাজিক ছকটিকে দৃঢ় ভাবে রক্ষা করছিল মহাকাব্য দুটির শেষতম সংযোজন ও পুরাণগুলি, শাস্ত্রকার-পুরোহিতরা। তাদের উদ্ভাবিত জন্মান্তর ও কর্মবাদ, শাপ ও বরের ভয় ও লোভ তীর্থ-মাহাত্ম্য, দান-দক্ষিণা ধ্যান-জপ এবং ব্রত-প্রায়শ্চিত্তে পাপক্ষয়ের প্রলোভন। এই সবই ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে গুপ্ত যুগে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে; এরই বর্তমান নাম 'হিন্দুধর্ম'। গুপ্ত যুগে এ ধর্ম যে রূপ পরিগ্রহ করে সেই কাঠামোয় মৌলিক কোনও পরিবর্তন গত দেড় হাজার বছরে হয়নি, ইতস্তত সামান্য কিছু আঞ্চলিক বিবর্তন হয়েছে। তাছাড়া হিন্দুধর্ম একই পথে অনিবার্য গতিতে চলে এসে বর্তমানের চেহারাটিতে পৌঁছেছে। এদেশে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত ধর্মধারার তিনটি মুখ্য পর্ব: প্রথম, যজ্ঞ-নির্ভর বৈদিক কর্মকাণ্ডের ধর্ম; দ্বিতীয়, জ্ঞান-নির্ভর বৌদ্ধ, জৈন ও উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডের ধর্ম, তৃতীয় নিয়তিবাদ। প্রথম দুটি গৌণ, কালিক ও আঞ্চলিক, কিন্তু এগুলির সঙ্গে মিশেছে পূজা তীর্থমানত ইত্যাদি। তত্ত্বের দিকে দ্বিতীয় পর্বে এসেছে জন্মান্তবাদ, তার শ' দুই বছর পরে তার সঙ্গে মিশেছে কর্মবাদ এবং তার অল্প কিছুকালের মধ্যেই দেখা দিয়েছে নিয়তিবাদ। তৃতীয় মিশ্র পর্বের সঙ্গে নিয়তিবাদ জুড়ে যুক্তিতত্ত্বের কাঠামোকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ধর্মধারার যে ছকটি বহু কুসংস্কারকে আশ্রয় দিয়ে গড়ে উঠেছে, বর্তমানেও সেই ধারাটিই অব্যাহত আছে। এই দিক থেকে গুপ্ত যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে এই যুগেই প্রথম হিন্দুধর্ম তার বর্তমান রূপ অর্জন করে এবং ইতিপূর্বে এক জন্মে ভাল কাজ করলে পরজন্মে তার ফল প্রাপ্তির আশা থাকায় দেবতাদের কাছে যে বশ্যতার নীতি প্রচলিত ছিল, তার পরিবর্তে নতুন এক দেবী সৃষ্টি করা হল, যার নাম নিয়তি এবং যিনি কোনও স্তুবস্তুতি বা পূজায় তৃপ্ত হন না।

গুপ্ত যুগের পরবর্তী সমস্ত ধর্ম-সাহিত্যে নিয়তি অত্যন্ত প্রধান শক্তিরূপে বর্তমান। অথচ পূর্বের জন্মান্তরবাদ, পূজা, ধ্যান, জপ, মানত, তীর্থ, ইত্যাদি পরলোকে সদগতি পাওয়ার যত কিছু পথ ছিল, নিয়তির সঙ্গে তার সব কটিরই এমনকী দেবতাদেরও বিরোধ আছে; কারণ এগুলো পরস্পরকে খণ্ডন করে এবং সব কটিকেই নিয়তি খণ্ডন করে। তবু এ সবই নিয়তির সঙ্গে পাশাপাশি থেকে গেল। তত্ত্বের দিকের এই জগাখিচুড়িকেই মেনে নিল গুপ্ত যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত যুগেরই ধর্মবোধ। সাধারণ মানুষের অসহায়তার বোধই শুধু বাড়ল না তার ইহ-পরলোকের মঙ্গলের জন্যে তার ঠিক কী দরকার সে সম্বন্ধে তাকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করে রাখল এই মিশ্র ধর্ম— যাতে দেবতাদের পাশাপাশি দুর্বোধ্য, এমন এক শক্তি নিয়তির চেহারায় দেখা দিল যেখানে মানুষের পুরুষকার সম্পূর্ণ পরাজিত। মানুষ অবশ্য হার মানেনি, কিন্তু সমাজপতি ও শাস্ত্রকাররা তাকে পদানত রাখবার জন্যে, তার আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ চূর্ণ করে দেওয়ার জন্যে যে কাঠামোটি তৈরি করে তার মধ্যে নিয়তির একটা প্রধান ভূমিকা রয়ে গেল।

গ্রন্থপঞ্জি

অতুল সুর — *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, সাহিত্যলোক, ১৯৮৮।

অনির্বাণ (শ্রীমৎ) — *বেদমীমাংসা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৫।

উদয় বন্দ্যোপাধ্যায় — *বেদ সংকলন* (২ খণ্ড), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৪।

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস — *ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের পুরাবৃত্ত*, বি. সরকার অ্যান্ড কোং, ১৩৫৭।

কালিপদ ভট্টাচার্য — *বেদস্তুতি*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৬।

কোসাম্বী ধর্মানন্দ — *ভগবান বুদ্ধ*, কলিকাতা, ১৯৮০।

গোপাল হালদার — *সংস্কৃতির বিশ্বরূপ*, মনীষা, ১৯৮৩।

গোপেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় — *বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, *সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার*, ১৯৮৮।

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় — *সাংস্কৃতিকী*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৪।

গৌতমকুমার সরকার — *ভারতের কৃষিপ্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ*, পশ্চিমবাংলা আকাদেমি, ১৯৯২।

গৌরী ধর্মপাল — *বেদের কবিতা*, নবপত্র প্রকাশন, ১৩৯১।

দুর্গা কিংকর — *সভ্যতা ও ধর্মে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস*, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৩৭৭।

দেব কুমাব দাস — *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, সারস্বত লাইব্রেরি, ১৪০৩।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — *ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা* (২ খণ্ড), ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৪, ১৯৮০।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৩৮৪।

নৃপেন্দ্র গোস্বামী — *বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা, ১৩৭৫।

পরিতোষ ঠাকুর (সম্পাদিত) — *বেদ গ্রন্থমালা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭১।

প্রভাতকুমার ঘোষ — *গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি* জে. এস. প্রকাশনী, ১৯৮৮।

বাসুদেবশরণ আগরওয়ালা — *পাণিনিকালীন ভারতবর্ষ*, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬৯।

বিমানবিহারী ভট্টাচার্য — *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা*, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, ১৯৮০।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় — *বৈদিক ভাবনায় সোম*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৬।

ভরতকুমার রায় — *প্রাচীন ভারতের লোকসাহিত্য*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৮।

মিতা চট্টোপাধ্যায় — *ভারতের দেবভাবনা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭১।

যোগীরাজ বসু — *বেদের পরিচয়*, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৩৮৬।

যোগীন্দ্রনাথ বসু — *বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্ত্ব*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৬৫।

যোগীন্দ্রনাথ বাগচি — *বেদের মন্ত্রভাগে অধ্যাত্মবিদ্যা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭১।

রণবীর চক্রবর্তী — *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৮।

রামশরণ শর্মা — *প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাস*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯৬।

রামশরণ শর্মা — *প্রাচীন ভারতে শূদ্র* (অনুবাদ), কে. পি. বাগচী, ১৯৮৯।

শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় — *বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৮।

শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় — *বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩।

শ্যামা দাস — *ঋগ্বেদের শক্তিসাধনা*, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ১৩৭৬।

সমরেন রায় — *বেদ বিচার*, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৩৯১।

সুকুমারী ভট্টাচার্য — *প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৮। (বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত)

সুকুমারী ভট্টাচার্য — *নিয়তিবাদ* (২য় সংস্করণ), ক্যাম্প, ১৯৯৭।

সুকুমারী ভট্টাচার্য — *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১।

সুকোমল সেন — *ভারতের সভ্যতা ও সমাজবিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯২।

সুজিৎ চৌধুরী — *প্রাচীন ভারতের মাতৃপ্রাধান্য*, প্যাপিরাস, ১৯৯০।

হেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় — *সমাজ সাহিত্য ও দর্শন*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৩।

Allchin, B & R — *The Birth of Indian Civilization*, Penguin, 1968

Basham, A L — *The Wonder that was India*, Bombay, 1963

Basu, Jogiraj — *India of the Age of Brahmans*, Calcutta, 1969

Bhattacharji, S — *Literature in the Vedic Age*, (2 vols), K P Bagchi & Co., 1980, 1982.

সুকুমারী ভট্টাচার্য — *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ* (বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত)

Chakladar, H C — *Social Life in Ancient India*, Calcutta, 1920

Chattopadhyaya, D P — *History of Science and Technology in Ancient India*, (Vol II), Calcutta, 1986, 1991

Cosambi D D — *An Introduction to the Study of Indian History*, Popular Prakashan, 1975

Majumdar, R C — *The Vedic Age*, London, 1951

Majumdar, R C — *The Classical Age*, Bombay, 1954

Mukherjee B N — *Genesis of Buddhism - Its Social Content*, Calcutta, 1976

Renon, L — *Vedic India*, (Tr by P Spratt), Calcutta, 1952

Sharma, R.S — *Ancient India*, NCERT, Delhi

Shastri, K A N. — *A Comprehensive History of India*, (Vol 2) The Mauryas and the Satavahanas, Calcutta 1957

প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৯৮
প্রকাশক: সলিল কুমার গাঙ্গুলি, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
উৎসর্গ: প্রয়াত শ্রীসুধী প্রধান অগ্রজপ্রতিমেষু

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রাচীন ভারত স্কুলপাঠ্য বই নয়। এটি প্রধানত প্রাগ্‌বৈদিক কাল থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সমাজ ও ধর্মের বিবর্তনের বিবরণ। স্বভাবতই এটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তথ্যের দিকে বেশ কিছু বর্জন করতে হয়েছে, নইলে জটিল ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। পুস্তিকাটির উদ্দিষ্ট পাঠক তাঁরা, যাঁরা বিদ্যালয়ে হয়তো কোনো স্তরে পাঠ্য হিসেবে এ সবই এককালে তথ্যবহুল পাঠ্যপুস্তকে পড়েছেন, কিম্বা তাঁরাও, যাঁরা সে সুযোগ হয়তো পাননি, অথচ মনে করেন যে সহজ করে ব্যাপারটা বলে দিলে তাঁদের জ্ঞানের একটা ফাঁক হয়তো ভরবে। সংক্ষেপে ইতিহাসের কাঠামোটা দিয়ে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পরিবার, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের একটা সহজ বিবরণ এ বইতে দেওয়া গেল।

যাঁর নির্দেশে এই বইটির রচনা, বহু চেষ্টায় তাড়াতাড়ি শেষ করেও এটি সেই সুধীদার হাতে দেওয়া গেল না; এ ক্ষোভ যাবার নয়।

ত্রুটি-অপূর্ণতার দায় অবশ্যই আমার। তবু এ সামান্য চেষ্টার ফসল কেউ যদি খামারে তোলেন তো তাকেই সার্থকতা মনে করব।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ

Women and Society in Ancient India

থেকে ভাষান্তর

বিজয়া গোস্বামী

নীলাঞ্জনা শিকদার দত্ত

করুণাসিন্ধু দাস

সূ চি

বৈদিক যুগে নারী ৮৩
প্রাচীন ভারতে মাতৃত্ব ৯৭
প্রাচীন ভারতে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ১২০
শাস্ত্রে পণপ্রথা ও স্ত্রীধন ১৩৮
তনয়া ১৪৪
মহাভারতে ভার্গব-প্রক্ষেপণের সামাজিক কারণ ১৪৭
নারী সমাজের উপর হিংসাত্মক উপদ্রব ১৬২
নারী ও নীরবতা ১৬৯
সতী ১৭৫
প্রাচীন ভারতবর্ষে 'শাস্তি'র সংজ্ঞা ১৮৯
শম্বুক ও মায়াতি: সমাজে শূদ্রের অবস্থান বিষয়ে একটি বিচার ১৯৮
নিয়তিবাদ— এর কারণ ও প্রভাব ২০৩
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ২২৪

('প্রাচীন ভারতে গণিকা', 'মহাকাব্য মহাভারত' ও 'সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্র ও নারীর চরিত্র: পঞ্চম থেকে একাদশ শতক' প্রবন্ধ তিনটি আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত *প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য* বই-তেও অন্তর্ভুক্ত। সেই বইটি এ সংকলনের অংশ, এবং প্রবন্ধ তিনটি সেখানেই রাখা হল।)

বৈদিক যুগে নারী

'বৈদিক যুগ' বলতে যদি আমরা *ঋগ্বেদ* ও *বেদাঙ্গসূত্র*-এর মধ্যবর্তী সময়কাল বুঝি, এবং যথাযথ বৈদিক যুগের সময়সীমা যদি সেটাই হয় তাহলে তার ব্যাপ্তি সতেরো থেকে আঠারোটি শতক।[১] অবশ্যই এই সময়ে নারীর অবস্থান আগাগোড়া এক ছিল না। *ঋগ্বেদ*-এর প্রাচীন অংশে আমরা দেখি, গ্রামকেন্দ্রিক যাযাবর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যতটুকু প্রত্যাশা করা যায়, নারী সেই মাত্রাতেই স্বাধীনতা ভোগ করছে।[২] নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নানা চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ঊষস অর্থাৎ ভোর এক রূপসী, সুসজ্জিতা রমণী; তাঁকে সম্পূর্ণ বাধাহীন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: 'শুচি ও সুন্দর ঊষস, রক্তবস্ত্রে সজ্জিতা যেন সদ্যস্নাতা, মায়ের হাতে স্নেহভরে প্রসাধিতা এক কন্যা।'[৩] 'হাস্যমুখী বধূ যেমন স্বামীর সামনে নিজের রূপ উন্মোচিত করে তেমনি ঊষা তার রূপ উন্মোচিত করেন।'[৪] এ ছাড়া তাঁকে নির্লজ্জাও বলা হয়েছে।[৫] এর থেকেই নারীর স্বাধীন বিচরণ বিষয়ে সমাজের বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু এই অংশটি *ঋগ্বেদ* রচনার অর্বাচীন সময়কার। 'অগ্নি মানুষের স্তুতি তেমন ভাবেই উপভোগ করেন, যেমন ভাবে প্রেমিক পতি স্ত্রীকে উপভোগ করেন।'[৬] 'আমাদের স্তুতি তোমাকে তেমনি ভাবে স্পর্শ করুক, যেমন ভাবে স্বামীর স্পর্শে স্ত্রীর কামনা জেগে ওঠে।'[৭] 'অগ্নি স্বামীর দ্বারা সম্মানিতা স্ত্রীর মতোই পবিত্র।'[৮] লক্ষ্য করা যেতে পারে, দেবতার পবিত্রতা মর্ত্য নারীর পবিত্রতার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। একের পর এক চিত্রকল্পে নারীর প্রতি প্রেম নিবেদনকারী পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে ভক্তের ইষ্টদেবতার প্রতি আবেদনের।[৯] সূর্য ঊষার পিছনে পিছনে যান, যেমন পুরুষ যায় নারীর পিছনে। এমনকী পুরুষের প্রতি নারীর কামনাকেও খোলাখুলি ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১০] সূর্য ঊষার উপপতি; 'জারোন'— বারে বারে ব্যবহৃত এই অংশটির মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের চিত্র বহুবার পাওয়া গেছে। পিতা ও কন্যার মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক নাভানেদিষ্ঠ সূক্তের বিষয়।[১১] ভাইবোনের মধ্যে এই সম্পর্ক বিখ্যাত যম-যমী সংবাদ সূক্তের বিষয়।[১২] 'নদীগুলি বিশ্বামিত্রের দিকে যায়, যেমন নারী নত হয় চুম্বনোদ্যত পুরুষের দিকে।'[১৩] 'যেমন প্রিয়া পত্নী প্রেমিক স্বামীর মধ্যে আনন্দ পায়, হে ভক্ত, তুমিও যেন আমার মধ্যে সেই আনন্দ পাও।'[১৪] আবার ভক্ত ও ইষ্ট দেবতার তুলনা করা হচ্ছে মনুষ্যমিথুনের সঙ্গে। 'ঘৃতের ধারা সোমের দিকে যায়, যেমন সুসজ্জিতা সুন্দরী তরুণী যায় স্বামীর কাছে।'[১৫] অবিবাহিতা নারী তার স্বামী বেছে নিতে পারে।[১৬] গৃহে তার কী কর্তব্য সে সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে স্পষ্ট ভাবে কিছু বলা নেই, শুধু বলা হয়েছে সে জল আনত এবং ক্ষেতের দেখাশোনা করত।[১৭] *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ বলা

হয়েছে, সে পশম পাকাত (এবং হয়তো বুনতও)।[১৮] অবশ্যই বাড়িতে আরও অনেক কাজ তাকে করতে হত। *ঋগ্বেদ*-এ নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করারও সাক্ষ্য আছে। তাই আমরা শুনি, মুদ্-গলিনীর যুদ্ধ জয়ের বৃত্তান্ত।[১৯] বিশ্‌পলা যুদ্ধে একটি পা এবং বধ্রিমতী একটি হাত হারান। বধ্রিমতী এবং শশীয়সী তাঁদের বীরত্বের জন্যও উল্লিখিত হয়েছেন। এর থেকে প্রাচীন বৈদিক যুগে নারীর কিছুটা সাম্য ভোগ করার সাক্ষ্য মেলে। দেবগণ ও পিতৃগণকে দৈনন্দিন জল দেওয়ার প্রসঙ্গে এমন তিন নারীর নাম পাই যাঁদের উদ্দেশ্যেও জল দেওয়া হত। তাঁরা হলেন গার্গী বাচক্নবী, বাড়বা আত্রেয়ী এবং সুলভা মৈত্রেয়ী।[২০] তাছাড়া বেদের ছয় অধ্যয়নের অন্তে উৎসর্গ দিবসে একটি অনুষ্ঠান হত; অন্যান্য শ্রদ্ধার্হদের মধ্যে বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীকে আসন দেওয়া হত।

বিবাহের সময়ে বধূর মধ্যে পাঁচটি আকাঙ্ক্ষিত গুণ ছিল: বিত্ত, রূপ, শিক্ষা, বুদ্ধি এবং সদ্বংশ।[২১] কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার অধিকার এক বিতর্কিত বিষয়। বহু অর্বাচীন একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে, প্রাচীন কালে নারীর যজ্ঞোপবীত দিয়ে দীক্ষা হত; তাঁর বাবা, কাকা বা দাদা তাঁকে বেদাধ্যাপনা করাতেন; তিনি গৃহেই আনুষ্ঠানিক ভিক্ষা করতেন এবং মৃগাজিন, বল্কল বা জটা ধারণ করতেন না।[২২] কিন্তু এই গ্রন্থ অনেক পরবর্তীকালের, এবং অনুমান হয় দ্বিতীয় প্রকারের নারী অর্থাৎ ব্রহ্মবাদিনীদের জন্য *যমসংহিতা*-র নিয়মের উপর ভিত্তি করে রচিত। অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য ধারণা বলে যা মনে হয়, তা হল, আর্য বসবাসের প্রথম কয়েকটি দশকে নারী তার উপনয়ন ও স্বাধ্যায়ের অধিকার হারায়নি, কিন্তু আর্যরা যখন অনার্য পত্নী গ্রহণ করতে শুরু করল, তখন সমাজ নারীর উপনয়ন ও স্বাধ্যায়ের অধিকার কেড়ে নিল। অতএব সাধারণ ভাবে নারী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হল। তবে এর ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল: দয়াল পিতারা বালবিধবা কন্যাদের শিক্ষা দিতেন; বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত কুমারীদেরও শিক্ষা দিতেন। এই ব্যতিক্রমগুলির কথাই আমরা মাঝে মাঝে শুনি; তাদের মধ্যে আছেন বিশ্ববারা, ঘোষা, গোধা, অপালা। যাজ্ঞবল্ক্য বিদুষী কন্যা লাভের জন্যও একটি অনুষ্ঠানের নিয়ম বলেছেন।[২৩] *ঋগ্বেদ* একাধিক ঋষিকার বিষয়ে অবহিত; আমরা অম্ভৃণের কন্যা বাক্-এর কথা জানি, যিনি বিখ্যাত 'সোহহম' তত্ত্বের ঋষি, যে তত্ত্ব উপনিষদের শিক্ষা ও বেদান্তের বীজ। গার্গী এবং মৈত্রেয়ীও এর নিদর্শন। কিন্তু যে নারী যুক্তিসঙ্গত ভাবে তর্ক করতে পারে ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঋষিকে তর্কে কোণঠাসা করে ফেলতে পারে, তার বিষয়ে সমাজের রক্ষণশীলতা প্রতিফলিত হয় গার্গীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের অযাচিত তিরস্কারে: 'আর প্রশ্ন কোরো না তোমার মাথা খসে পড়ে যাবে।'[২৪]

পরবর্তীকালে ব্যাকরণ গ্রন্থে একটি স্ত্রী প্রত্যয় যোগ করার নিয়ম করা হয়েছে যার ফলে শিক্ষয়িত্রীকে শিক্ষকের স্ত্রীর থেকে ভিন্ন করা যায়। ফলে আমরা কাশাকৃৎস্না আপিশলার সঙ্গে পরিচিত হই, যিনি মীমাংসা ও ব্যাকরণে পারদর্শী ছিলেন। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কবে শিক্ষার অধিকার এমন ভাবেই কেড়ে নেওয়া হল যে নারীর শিক্ষার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেল; কেন এবং কবে উপনয়নের অধিকার কেড়ে নেওয়া হল, স্বাধ্যায় নারীর

কাছে অগম্য হয়ে গেল এবং যে ব্যতিক্রম পাওয়া যায় তা প্রাদেশিক বংশগত মাত্র।[২৫] আমরা শুনতে পাই যে শিক্ষিতা নারী আসলে পুরুষই, যদিও শিক্ষিতা বধূর আকাঙ্ক্ষা ছিল। এ থেকে স্পষ্টই নারীর শিক্ষা বিষয়ে সমাজের দৃঢ় আপত্তির প্রতিফলন পাওয়া যায়।

ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত ভাবেই নারীর নির্বাসন হচ্ছিল গৃহকর্মে; সে বন্দি হচ্ছিল অন্তঃপুরে। যদিও *ঋগ্বেদ*-এর একটি সূত্রে নববধূকে আশীর্বাদ করা হয়েছে 'তোমার শ্বশুর কুলের সবার সম্রাজ্ঞী হও।'[২৬] তা সত্ত্বেও *অথর্ববেদ*-এ বলা হয়েছে, 'সূর্যোদয়ের সময়ে তেমনি ভাবেই প্রেতেরা পালায়, যেমন ভাবে পুত্রবধূ শ্বশুরের কাছ থেকে পালায়।'[২৭] *ঋগ্বেদ*-এর আশীর্বাদ সদিচ্ছামাত্র, বাস্তবতার বিরোধী বলেই তাকে এ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে; বাস্তব জীবনে নারী তার স্বাধীনতা আগেই হারিয়েছে এবং অথর্ববেদের পরিস্থিতির দিকে চলেছে। এও আবার এক প্রহেলিকা; কেমন করে, কেন এবং কবে এই বিবর্তন ঘটল; এর পিছনে সামাজিক-অর্থনৈতিক, ধার্মিক-সাংস্কৃতিক কী কী শক্তি কাজ করছিল তা অনুসন্ধানের বিষয়।

শোনা গেছে, নারীর স্থান গৃহে। বাইরের জীবন বলতে যা কিছু সে এক সময়ে ভোগ করেছে, ভারতীয় মাটিতে আর্যেরা বসতি করার পর আনুমানিক দুই শতক অবধি সেই স্বাধীনতাটুকু তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সব অধিকারের সঙ্গেই সে হারিয়েছে। তার মনের উপর কোনও অধিকার নেই, এমনকী নিজের শরীরের উপরেও না।[২৮] সে যেহেতু শিক্ষার অধিকার হারিয়েছে, তার জীবন দুটি ভাবে বিভক্ত: প্রথম, পিতৃগৃহে কয়েক বছর, এবং দ্বিতীয়, বয়ঃসন্ধির পর (পরবর্তীকালে বয়ঃসন্ধির পূর্বেই) যখন তাকে সম্প্রদান করা হত এবং বাকি জীবনটা শ্বশুরালয়ে কাটত। বিবাহিতা নারী কোনও অবস্থাতেই পিতৃগৃহে ফিরে সেখানে থাকতে পারত না, কারণ তাতে কলঙ্ক হয়। বেদাঙ্গের গ্রন্থকাররা কঠোর ভাবে তার ফিরে আসার নিন্দা করেছেন।[২৯] অবিবাহিতা নারীদেরও নিচু চোখে দেখা হত, সম্ভবত সামাজিক ভাবে তাদের একঘরে করে রাখা হত। এমনকী *ঋগ্বেদ*-এও বয়স্কা কুমারীদের উল্লেখ আছে, যারা 'পিতৃগৃহে বৃদ্ধা হয়ে যায়।'[৩০] এর সাক্ষ্য বহন করে 'কুলপা'— গৃহে পালিতা, 'অমাজু', 'অমাজুরা'— যে গৃহে বৃদ্ধা হয়ে যায়, 'বৃদ্ধকুমারী' এবং 'জরৎকুমারী'— আইবুড়ি, ইত্যাদি। সুতরাং পরে বিবাহ যেমন আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল, ততটা তখন ছিল না। মেয়েদের শরীরে কোনও খুঁত থাকলে যৌতুকের প্রয়োজন হত।[৩১] এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, নারী এর মধ্যেই এক দায় বলে গণ্য হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সী কুমারীত্ব যুগের সঙ্গে অপ্রচলিত হয়ে পড়ে।

ঋগ্বেদ-এর যুগে সম্ভবত বিধবারা বেঁচে থাকত, কখনও কখনও তাদের দেবরের সঙ্গে বিবাহ হত। একটি সূক্ত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেখানে স্বামীর মৃত্যুর পর এক নারী তার পাশে শুয়ে থাকে, তখন এক পুরুষ (সম্ভবত দেবর, ভাষ্যে বলা হয় গুরু বা প্রাচীন দাস) তার হাত ধরে জীবিতের রাজ্যে প্রবেশ করে বংশবৃদ্ধি করতে অনুরোধ করে।[৩২] এখানে দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, স্বামীর চিতায় মত্যুর ইচ্ছা অনুকরণ করে তাকে সেখান থেকে আবার জীবনে ফিরিয়ে আনা। গ্রন্থের পটভূমিকা থেকে মনে হয়, সতীদাহের রেওয়াজ জানা ছিল এবং

সম্ভবত কোথাও কোথাও তা অনুষ্ঠিতও হত। অথর্ববেদের একটি সূত্রে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়: 'জীবিতা নারী মৃতের বধূরূপে গৃহীত হচ্ছে,' অথবা 'এই নারী তার স্বামীর দেশে চলেছে, সে প্রাচীন রীতিই অনুসরণ করছে।'[৩৩] এই রীতি কত প্রাচীন ছিল? কোথায় কখন এবং কেন তা প্রচলিত ছিল? দেওরালার ঘটনা যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় সে কথা বোঝার আগে এ বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন। ইন্দো-ইউরোপীয়রা সতীদাহ করত না; হোমার, ভার্জিল, নিবেলুঙ্গলিয়েড ও বীরগাথা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। একি তবে দেশীয় রীতি, সিন্ধুসভ্যতার রীতি? কিন্তু বিধবা বেঁচে থাকলেও তার জীবন খুব সুখের ছিল না; একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, 'আমি যেন ইন্দ্রাণীর মতো অবিধবা থাকতে পারি।'[৩৪] এ শুধু তার পতি প্রেমের অভিব্যক্তি নয়; কিন্তু কোনও পুরুষের বিপত্নীক না হওয়ার প্রার্থনার নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় না।

নারীর বহুবিবাহও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না; অথর্ববেদে বলা হয়, 'যে নারীর পূর্বে স্বামী ছিল, সে যদি দ্বিতীয় পরিগ্রহ করে, তাহলে তাকে পঞ্চোদন অর্থদান করতে হয়।'[৩৫] অথবা, 'যে নারীর দশ স্বামী আছে, সেও যখন ব্রাহ্মণ স্বামী গ্রহণ করে, সেই ব্রাহ্মণই তখন তার প্রকৃত স্বামী, রাজন্য ও বৈশ্য স্বামীরা নয়।'[৩৬] গ্রন্থগুলিতে বিধবা বিবাহের বিকল্প অর্থ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নারীর বহু বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ— দুটি ক্ষেত্রেই এই অংশগুলিতে নারীর যে অধিকারের ইঙ্গিত আছে, তা সে পরে হারিয়েছিল। তা কবে এবং কেন?

গণিকাবৃত্তিকে বলা হয় পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন পেশা এবং বেদে নানা নামে গণিকার পরিচয় মেলে: হস্ত্রা, অগ্রু,[৩৭] সাধারণী ও সামান্যা,[৩৮] পুংশ্চলী,[৩৯] রজয়িত্রী,[৪০] অতিস্কন্দরী, অপস্কন্দরী।[৪১] পরে নামগুলির সংখ্যা আরও বেড়েছে, এবং এদের অধিকার, কর্তব্য এবং সামাজিক অবস্থান আরও স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত হয়েছে।[৪২]

নারীহরণের উল্লেখও পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের একটি সূত্রে জনৈক পুরুষ তার প্রেমিকার আত্মীয়দের মতের বিরুদ্ধে-- তবে অনুমান করা যায় তার নিজের মতানুসারে— প্রেমিকাকে অপহরণ করার সময়ে প্রার্থনা করে যেন সমস্ত পরিবার প্রেমিকার ভাইয়েরা, তার আত্মীয়েরা এমনকী কুকুরগুলো পর্যন্ত গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে, যাতে সে নির্বিঘ্নে প্রেমিকাকে নিয়ে পালাতে পারে।[৪৩] পুরুমিত্রের কন্যাকে নিয়ে বিমদের পালানোর কথা জানা যায়।[৪৪] নারীর বহুবিবাহ যদিও সংখ্যায় কম এবং ব্যতিক্রমী চরিত্রের— অন্তত লিখিত নিদর্শন যেটুকু পাওয়া যায়— কিন্তু পুরুষের বহুবিবাহ সাধারণ ব্যাপার। পুরুষের দুটি বিবাহের সমর্থনে এক যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের ছদ্মযুক্তি পাওয়া যায়: 'যেহেতু দুটি বস্ত্রখণ্ড একটি দণ্ডকে বেষ্টন করে থাকে, বিপরীতটি হয় না, অতএব নারীর দুই স্বামী থাকতে পারে না, কিন্তু পুরুষের দুই স্ত্রী হয়।'[৪৫] রাজা বৈধ ভাবেই চারটি মহিষী রাখতে পারতেন।[৪৬] তার পরেও যত খুশি বিবাহ করতে পারতেন এবং তাঁর অন্তঃপুরে নানা প্রকৃতির উপপত্নীও রাখতে পারতেন। 'ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে দ্বিতীয় পত্নীকে ভোগ করা যায়— তাই প্রত্যেক পুরুষের দুটি করে পত্নী ভোগ করার ক্ষমতা আছে।'[৪৭] 'যদিও পুরুষের একাধিক পত্নী থাকে, এক নারীর পক্ষে এক স্বামীই যথেষ্ট।'[৪৮]

একটি অত্যন্ত ইঙ্গিতবহ অংশে বলা হয়, 'সমৃদ্ধি সেই পুরুষেরই যার পশুপালের চেয়ে স্ত্রীরা সংখ্যায় কম।'[৪৯] লক্ষণীয় যে, ধনের অর্থে পশুপাল ও স্ত্রীর কথা এক নিঃশ্বাসে বলা হয়েছে। ধনীর পশুপালের সঙ্গে যখন তুলনা হচ্ছে, তখন তার স্ত্রীর সংখ্যা যে কত তা কল্পনাতীত। এক পুরুষের অনেক স্ত্রী থাকত।[৫০] এমনকী ঋগ্বেদেও পুরুষের বহুবিবাহের কথা শুনি।[৫১] *মৈত্রায়ণী সংহিতা*-য় মনুর দশ পত্নীর উল্লেখ আছে। *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-য় সাতাশ পত্নীর স্বামী চন্দ্রের রোহিণীর প্রতি পক্ষপাতের জন্য শাস্তির বিবরণ আছে।[৫২] বলা বাহুল্য, সাতাশটি পত্নীর বিবরণ সমাজের অতি পরিচিত বাস্তব চিত্রের একটি পৌরাণিক প্রতিফলন মাত্র। সাধারণ ভাবে নারীর তপস্যা করার কথা নয়; একমাত্র স্বামীলাভের জন্য তপস্যা তার ব্যতিক্রম।[৫৩]

বিবাহ অধিকাংশ নারীর পক্ষে আবশ্যিক; এক বিবাহে নারীকে শুধু এক ব্যক্তির হাতে দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় 'পরিবারকে',[৫৪] ফলে গোটা পরিবারেরই তার উপর অধিকার জন্মায়। বিবাহে বধূ বরের তুলনায় নিকৃষ্ট; স্বামীর পরিবারের প্রতি তার প্রচুর কর্তব্য; কিন্তু তার পরিবারের প্রতি স্বামীর কোনও কতর্ব্য নেই। সে শুধু স্বামী ও সন্তানদের সেবা করে না, শ্বশুরবাড়ির সব আত্মীয়দেরই সেবা করে। 'তাকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকতে হবে, না হলে তার শক্তিক্ষয় হয়।'[৫৫] প্রশ্ন করার বাসনা হয়, এ কোন শক্তি যা শুধুমাত্র অবরোধে থাকলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়? 'সতী স্ত্রী সে-ই যে স্বামীকে তুষ্ট করে, পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর মুখের উপর জবাব দেয় না।'[৫৬] 'পুরুষের সম্মুখে স্ত্রীর ভোজন উচিত নয়।'[৫৭] শোনা যায়, স্ত্রী যজ্ঞের উত্তরার্ধ,[৫৮] কিন্তু ধর্মাচরণে 'স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য নেই',[৫৯] স্ত্রী মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারে না। তার উপস্থিতি যজ্ঞে আবশ্যক, কিন্তু সে সেখানে পুতুলমাত্র।[৬০] 'সে যজ্ঞে আহুতি দিতে পারবে না।'[৬১] সে সভায় উপস্থিত থাকতে পারত না,[৬২] মধুপান করতে পারত না। 'সে মধু খায় না, বলে— আমি আমার পুত্রদের জন্য এই ব্রতপালন করলাম।'[৬৩] তার প্রধান কর্তব্য পুত্রের জন্ম দেওয়া[৬৪] এবং সে যদি তা না পারে তবে তাকে ত্যাগ করা যায়।[৬৫] অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়, স্ত্রী কলহপরায়ণা, অশুচি, ধর্ষিতা বা চৌর গৃহীতা হলেও 'তাকে ত্যাগ করা যাবে না।'[৬৬] 'যে স্ত্রী ভ্রষ্টা, সেও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পবিত্র হতে পারে।'[৬৭] 'যে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করে তার কঠোর দণ্ড হতে পারে, কিন্তু যে স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তার শুদ্ধি হয়।'[৬৮] 'যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি কটুভাষণ করে, তাকে উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।'[৬৯] বন্ধ্যা নারী দশ বছর পরে আইনত পরিত্যাজ্য হত, যে নারী মৃতবৎসা বা শুধু কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়, সে বারো বছর পর পরিত্যাজ্য হত, এবং কলহপরায়ণা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাজ্য।[৭০] লক্ষণীয় যে *বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র* অনুসারে কলহপরায়ণা স্ত্রীও অপরিত্যাজ্য।[৭১] সেখানে যে স্বামী ধর্ষিতা স্ত্রীকেও ত্যাগ করে, তার জন্য কঠোর দণ্ডের বিধান আছে। কিন্তু মহাকাব্য বা পুরাণে যে রকম নিদর্শন পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, স্ত্রীর কোনও রকম চারিত্রিক বিচ্যুতি থাকলে, বা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও তাকে অবশ্যই ত্যাগ করা হত। সমাজে কন্যাসন্তানের পরিস্থিতি অতিরিক্ত প্রকট হয়ে পড়ে, শুধুমাত্র কন্যাসন্তানের জননীর

কঠিন শাস্তি পাওয়ার বিষয়ে নিয়মগুলি থেকে। একটি সোমযাগে কয়েকটি যজ্ঞপাত্র মাটিতে রাখা হয়, কয়েকটি উপরে তুলে ধরা হয়: 'সুতরাং সদ্যোজাত কন্যাসন্তান মাটিতে রাখা হয়, পুত্রসন্তান উপরে তুলে ধরতে হয়।'[৭২] অতএব নারীকে সামাজিক ভাবে নিচু করে দেখার যে সহজাত প্রবণতা, সেটা জন্মক্ষণ থেকেই পরিস্ফুট এবং একটি কু-তর্কের সাহায্যে তার একটি ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। বিবাহেও সে তার দাম্পত্যজীবন শুরু করে নিচু হয়েছে; পরিচিত বিবাহের মন্ত্রে স্বামী বলেন, 'তোমার হৃদয় আমার ব্রতে নিহিত হোক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তকে অনুসরণ করুক।'[৭৩] লক্ষণীয় যে, তাকে তার ব্যক্তিত্ব স্বামীর ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দিতে হতে। 'স্বর্গ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব... স্ত্রী যেন স্বামীর পরিবারে ধ্রুব হয়।'[৭৪] যে জিনিসটা খুব প্রকট ভাবে অনুপস্থিত, তা হল তার প্রতি ধ্রুব হওয়ার, তার মানসিক ভাবগত প্রয়োজনগুলি মেটাবার বিষয়ে তার স্বামীর কোনও প্রতিশ্রুতি। তাকে ব্যবহার করা হয় একটি অসাড়, চিত্তহীন পদার্থ হিসেবে, যার অস্তিত্বে একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তার স্বামীর তুষ্টিসাধন করা। 'স্ত্রী স্বামীর অনুগামী হবে।'[৭৫] 'নারী তার স্বামীর পথে চলবে।'[৭৬] 'নারীকে শৈশবে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনে স্বামী রক্ষা করে, বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে; স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকার নেই।'[৭৭] অগ্নিপত্নীবৎ— অনুষ্ঠানে যেমন হবিকে লাঠি দিয়ে পেটানো হয়, 'ঠিক তেমন ভাবেই পত্নীকে প্রহার করা উচিত, যাতে তার নিজের শরীরের উপর বা সম্পত্তির উপর কোনও অধিকার না থাকে।'[৭৮] তার যে সম্পত্তির অধিকার ছিল না, অন্য অনেক গ্রন্থ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়— এবং এখান থেকে এবং অন্য আরও গ্রন্থ থেকে— পরিষ্কার হয় যে, তার নিজের দেহ তার নিজের নয়। মান্যবর যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, 'স্ত্রী যদি স্বামীর সম্ভোগ কামনা চরিতার্থ করতে অস্বীকার করে, তাহলে স্বামী প্রথমে কোমল ভাবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করবে, তার পরে উপহার দিয়ে তাকে কিনে নিতে চেষ্টা করবে (অবক্রীণীয়াৎ) এবং তারও পরে স্ত্রী রাজি না হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে বশ করবে।'[৭৯]

বরুণপ্রঘাস যজ্ঞে যজমানের পত্নীকেই প্রকাশ্য ভাবে তার ব্যভিচারের বৃত্তান্ত স্বীকার করতে হত।[৮০] যজমান নিজে যজ্ঞের জন্য দায়ী হলেও তাকে কোনও লজ্জাকর প্রশ্ন করা হত না। বস্তুত যজমানকে দীক্ষার দিনটুকুই শুধু গণিকার সঙ্গে এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। পরের দিন তাকে পরস্ত্রীর সঙ্গ এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে, এবং যজ্ঞের দিন তার নিজের স্ত্রীর সঙ্গ তাকে এড়াতে বলা হয়েছে।[৮১] পুরুষের যৌনজীবনে বিচ্যুতিগুলির বিষয়ে সমাজের ক্ষমাশীল মনোভাব লক্ষ্য না করে উপায় নেই। কিন্তু সেই সমাজ বিবাহিত নারীর বিচ্যুতির বিষয়ে অবিশ্বাস্যরকম নিষ্ঠুর; তার জন্য বিহিত শাস্তি অত্যন্ত বীভৎস, জুগুপ্সাজনক এবং তা উচ্চারণ করার পক্ষে বড় বেশি নির্মম।[৮২] এবং এটি যে প্রয়োগ করা হত না, এ রকম মনে করার আমাদের কোনও কারণ নেই, সাহিত্যে এর অনুল্লেখের কারণ, স্পষ্টতই এর মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে আছে যে কুৎসিত অত্যাচার স্পৃহা, তাই। গৃহে স্ত্রীর স্থান স্বামীর নিচে,[৮৩] সে সব সময়ে স্বামীর অনুগামিনী হবে।[৮৪] স্বামীকে বলা হয়েছে, খাবার পরে স্ত্রীকে উচ্ছিষ্টটি

দিতে।[৮৫] এই স্পষ্ট উক্তির কোনও ভাষ্য প্রয়োজন হয় না, এবং তার মধ্যে দিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। পুংসবন নামে গর্ভধারণের যে অনুষ্ঠানটি আছে, তার উদ্দেশ্য পুত্রসন্তান লাভ করা। অথর্ববেদে পুত্রসন্তানের জন্মের জন্য একটি মন্ত্র আছে।[৮৬] স্পষ্টতই সমাজ সম্পূর্ণ গুরুত্ব দিত পুত্রসন্তানের উপর। 'স্ত্রী সঙ্গিনী, কন্যা অভিশাপ, পুত্র স্বর্গে আলো।'[৮৭] প্রথম অংশটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর, এর ফলে আমাদের বিশ্বাস করতে স্পৃহা হয় যে স্ত্রীকে সঙ্গী হিসেবে দেখা হত। অপর একটি অনুরূপ অংশে আছে, 'স্ত্রী পুরুষের অপরার্ধ।' এটিও সমাজের নারী সম্বন্ধে মনোভাবের বিষয়ে আমাদের আশঙ্কাকে শান্ত করে, কিন্তু এর পরে বলা হয়েছে, 'সুতরাং যতদিন কারও স্ত্রী সংগ্রহ না হয়, তার সন্তান আসে না।'[৮৮] অতএব পুত্রসন্তান লাভের প্রয়োজনেই স্ত্রীর মূল্য। একের পর এক গ্রন্থে তার মানবিক অধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উপরন্তু 'যার স্ত্রী নেই সে যজ্ঞে অনধিকারী।'[৮৯] পুরুষের অধিকার আছে একাধিক পত্নীকে বিবাহ করার, অসংখ্য উপপত্নী রাখার এবং গণিকার কাছে যাওয়ার, স্ত্রীর কিন্তু উপপতি রাখার অধিকার নেই; স্ত্রীর উপপতিকে ধ্বংস করার জন্য উপচার ক্রিয়ার বিধান আছে।[৯০] কিছু কিছু গ্রন্থে অবশ্য স্ত্রীকে প্রতারণা করে অপর রমণীর কাছে যাওয়ার জন্য স্বামীর নিন্দা করা হয়েছে: 'সে গর্দভের চামড়া দিয়ে নিজেকে ঢেকে ভিক্ষা করবে এবং নিজের অপরাধের কথা ঘোষণা করে ঘুরে বেড়াবে।'[৯১] কিন্তু সাহিত্যে এ রকম প্রায়শ্চিত্তের একটি ঘটনাও বর্ণনা করা হয়নি, যদিও অসতী বা আপাত অসতীর কঠোর— কখনও নির্মম— ভাবে শাস্তি পাওয়ার নিদর্শন আছে।

নারী নিজেই পাপ। কতটা? 'অনৃতকে দেখবে না, অর্থাৎ নারী, কুকুর ও কালো পাখি দেখবে না; অন্যথায় পুণ্য ও পাপ জ্যোতি ও অন্ধকার সত্য ও মিথ্যা মিশে যাবে।'[৯২] 'স্ত্রীলোক রাত্রে তার স্বামীকে মুগ্ধ করে নিজের ইষ্ট সিদ্ধি করে নেয়।'[৯৩]

এমনকী *যজুর্বেদ*-এর সময়েও শুনি, 'নারী মিথ্যা, দুর্ভাগ্য, সে মদ বা জুয়ার মতো ব্যসন মাত্র।'[৯৪] গর্ভাবস্থার পূর্বে নারীর জন্য কোনও যজ্ঞকর্মের বিধান নেই, এখনও পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য এবং তার জন্মের পূর্বে ও পরে তার মঙ্গল কামনায় পুংসবন অনুষ্ঠান। যে যজ্ঞে তার উপস্থিতি থাকে, সেখানেও মন্ত্র ছাড়াই তার কাজ অনুষ্ঠিত হয়। বৈদিক সমাজের নারীর প্রতি মনোভাব সবচেয়ে পরিস্ফুট ভাবে প্রমাণিত হয় একটি বেদাঙ্গ সূত্রে '(মাত্র একদিনের কৃচ্ছ্রসাধন) কালো পাখি, শকুনি, নেউল, ছুঁচো, কুকুর, শূদ্র ও নারী হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত।'[৯৫] সামগ্রিক ছবিটা ঊনমানব এবং সম্পূর্ণ ভাবে পাপের। তাই তাকে যে নিম্নশ্রেণির জীব বলে গণ্য করা হয় তা কিছু বিচিত্র নয়। অতএব, 'সর্বগুণসমন্বিতা নারীও অপকৃষ্টতম পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট।'[৯৬]

সমাজে নারীর স্থান ঊনমানবীর, তাকে শুধু ভোগের সামগ্রীরূপে দেখা হত। তার দেহ, তার শ্রম তার প্রভুর ভোগের জন্য। তাই তাকে বন্ধক রাখা যেত, কেনা যেত, বিক্রি করা যেত; যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে, যৌতুক হিসাবে বা অতিথির উপহার হিসাবে দানও করা যেত। শাস্ত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে, 'নারী সম্ভোগ আনে।'[৯৭] তাছাড়া, পশু, ভূমি ও নারীর

অতিভোগ নয়।[৯৮] সারস্বতস্বস্তয়ন নামক যজ্ঞের দক্ষিণা একটি ঘোটকী এবং একটি সন্তানবতী দাসী।[৯৯] অন্য অনেক যজ্ঞেই নারী দক্ষিণা হত, মহাকাব্যে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নারীদের শ্রেণিভাগ ছিল কুমারী, সধবা, সন্তানবতী বা নিঃসন্তানরূপে। কারা পেত তাদের? পুরোহিতেরা। তারা এত নারী নিয়ে কি করত? তাদের মধ্যে কারওকে গ্রহণকর্তা ভোগ করত, বাকিদের মধ্যে কারওকে দান করত, কারওকে বিক্রি। কেউ কেউ আবার সমাজের নানা অন্ধকার এলাকায় আঁকাবাঁকা পথে ঘুরে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হত বেশ্যালয়ে।

এর থেকে নারীর যে দ্ব্যর্থহীন চিত্র বেরোয় তাতে নারীকে মূলত ঊনমানবী হিসাবে দেখা হয়, যার জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে তার যৌবন, রূপ, লাস্য এবং গৃহকর্মে তার শ্রম দিয়ে তুষ্ট করা। সেই পুরুষ ও তার আত্মীয়স্বজনকে তার নম্র হয়ে সেবা করতে হবে, কাজে বা কথায় তাদের কোনও প্রতিবাদ না করে। নিজের শরীরের উপরে তার কোনও অধিকার নেই; তার সম্পত্তি অর্জন বা ভোগ করার অধিকার নেই, এমন কি স্বামীর সম্পত্তিতেও অধিকার নেই।[১০০] সে তো নিজেই একটি সম্পত্তি, কি করে সে কোনও রকমের সম্পত্তি অর্জন বা ভোগ করবে? অবশ্যই কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছিল। অবশ্যই এমন স্বামী ছিল যারা স্ত্রীকে সম্মান করে, ভালবাসে, তার যত্ন নেয়।[১০১] কিন্তু তা তো ব্যতিক্রম; এবং ব্যতিক্রমই নিয়মকে প্রমাণ করে। এবং এই নিয়ম পূর্ণমাত্রায় নারীর মানুষ হিসাবে গণ্য হওয়া ও মানবিক অধিকার পাওয়ার বিরোধী।

বলা হয়েছে, 'সুন্দরী নারী স্বামীর প্রিয় হয়।'[১০২] প্রথমত সব নারী সুন্দর নয়; সাধারণ চেহারার নারী কি স্বামীর প্রেম পেত না? আবার সুন্দরী বধূ যখন বয়স, বহু-প্রসব এবং সাংসারিক শ্রমের ফলে তার রূপ হারিয়ে ফেলত, তখন কী হত? এর উত্তরের ইঙ্গিত আছে বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের উচ্চারিত একটি মন্ত্রে: 'এস আমরা মিলিত হই, যেন পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়, যে সন্তানদ্বারা সম্পত্তিবৃদ্ধি হবে।'[১০৩] এই মন্ত্রেই বলা হয়েছে, 'আমি যেন পুত্র, পৌত্র, দাস, শিষ্য, বস্ত্র, কম্বল, ধাতু, বহু ভার্যা, রাজা, অন্ন ও নিরাপত্তা লাভ করি।' যখন চিন্তা করি যে, এই মন্ত্র দম্পতির নতুন জীবন শুরুর প্রতীক, এবং নববধূর উপস্থিতিতেই তা উচ্চারিত হচ্ছে, তখন 'বহু ভার্যার' জন্য এই প্রার্থনা প্রয়োজনে বিনিময়যোগ্য ভোগ্যবস্তু হিসাবে নববধূর স্থান খুব প্রকট করেই তোলে। পরিস্থিতির চাপে যখন তার রূপ বা প্রয়োজনীয়তার অভাব ঘটত, তখন সহজেই তার জায়গায় অন্য কাউকে আনা যেত। তার সন্তানেরা বড় হয়ে যাওয়ার পরও তা ঘটতে পারত; তাদের পিতা একটি তরুণী ও অধিকতর সুন্দরী সপত্নীকে এনে তাদের মা-কে অপমান করতে পারত। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে আমরা সপত্নী বশ করার মন্ত্র পাই। পুরুষের সামাজিক সমৃদ্ধি বিচার হত তার পত্নীর সংখ্যা দিয়ে, যেমন তার পশু বা দাস তার সমৃদ্ধির প্রতীক। যে পুরুষেরা বহু পত্নী রাখার মতো সমৃদ্ধ ছিল না তারা বেশ্যালয়ে যেত; প্রাচীনতম যুগ থেকে সমাজে বেশ্যার উপস্থিতির প্রমাণ সাহিত্যে মেলে। পরিত্যক্তা পত্নী, ধর্ষিতা কুমারী, ক্রীতদাসী এবং লুণ্ঠিতা মেয়েরা তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছিল। প্রাচীন ভারতে তারাই ছিল নারী সমাজের একটিমাত্র শ্রেণি যারা সরকারি খরচে

শিক্ষালাভ করত। নানা সুকুমার কলায় শিক্ষালাভ করে তারা তাদের খদ্দেরদের এমন ভাবে আনন্দ দিত যা তাদের শিক্ষা-বঞ্চিতা পত্নীরা পারত না। নিজের বাড়ির বাইরে পুরুষদের আনন্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করে সমাজ পত্নীকে এমন এক অন্ধকার কোণে ঠেলে দিয়েছিল, যেখানে সে তার কর্তব্য পালন করত বিনা কৃতজ্ঞতায়, এবং যেখানে তার সামান্যতম ত্রুটির কঠোর শাস্তি মিলত। কখনওই ভুলে গেলে চলবে না যে, 'সতী' শব্দটির বিশিষ্ট অর্থে কখনও পুংলিঙ্গ পর্যায় শব্দ নেই। সতীত্ব পুরুষের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হত না; তা শুধু নারীর একার বিশেষ কর্তব্যকর্ম।

যে প্রশ্নগুলি উত্তর দাবি করে, তা হল: কবে, কেমন ভাবে এবং কেন নারী তার মানবিক অধিকার ও সামাজিক সম্মান হারাল? কারণ বৈদিক যুগের প্রারম্ভে তার কিছুটা সম্মান ছিল। ঋগ্বেদে ঊষসকে সূর্যের পত্নী বলা হয়েছে, সে স্বামীর আগে আগে যায়।[১০৪] এ নিশ্চিত ভাবে বাস্তব সমাজের প্রতিবিম্ব। তবে কি করে সে স্বামীর ছায়ারূপে তার অনুসরণ করে, কোনও রকম ব্যক্তিত্বের লেশমাত্র রহিত হয়ে? এর উত্তর দিতে হলে বৈদিক মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে। তারা যাযাবর ও পশুপালক জাতি থেকে কৃষিতান্ত্রিক জীবনে স্থিতিলাভ করল, সেখানে উন্নততর প্রযুক্তি ও লোহার লাঙলের ব্যাপক ব্যবহার— যা অর্বাচীন বৈদিক যুগে দেখা যায়— তার ফলে, এবং মধ্যপ্রাচ্য, গ্রিস ও রোমের সঙ্গে নৌবাণিজ্য সূত্র পুনর্ভুক্ত হওয়ার ফলে সংখ্যালঘু এক শ্রেণির হাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত ধন সংগৃহীত হল। এই সংখ্যালঘু শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা ছিল এই উদ্বৃত্ত তার প্রকৃত সন্তান-সন্ততির হাতে, অর্থাৎ যে পুত্রদের সে তার পত্নীর গর্ভে উৎপন্ন করেছে, তাদের হাতে দিয়ে যাওয়ার। সন্তানপরম্পরা নির্দিষ্ট করতে এবং পুত্রদের তার উরসপুত্র বলে চিহ্নিত করতে স্ত্রীর অন্য পুরুষ সঙ্গ নিবৃত্ত করা আবশ্যক ছিল। এটি সুনিশ্চিত করা যেত শুধুমাত্র আত্মীয় পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করে। একটি আনুষ্ঠানিক আপাতযুক্তি অবরোধের কারণস্বরূপ দেখানো হয়েছে: 'পত্নীকে পুরুষসঙ্গ করা থেকে নিরুদ্ধ করতে হবে, কারণ পরলোকে শুধুমাত্র জন্মদাতাই পিণ্ড-তর্পণাদি লাভ করে, স্বামী নয়।' আসল কারণ অবশ্যই ইহলৌকিক। পিতা পুত্রকে সম্পত্তি দান করার আগে অবশ্যই নিঃসন্দেহে জানবে, সে তার নিজেরই পুত্র, অপর কারও নয়। এরই ফলে নারী বন্দি হল অবরোধে, যেখানে অনাত্মীয় পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

এই সব ঘটার আগেই নারী তার শিক্ষার অধিকার, জীবিকার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, এমনকী নিজের শরীরকে আপন বলার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। নারী হয়ে দাঁড়িয়েছে তার স্বামীর সম্পত্তি। আহার বেশভূষা এবং আচ্ছাদনের বিষয়ে সে তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে। মনে রাখতে হবে, 'ভার্যা' ও 'ভৃত্য' শব্দ দুটি একই 'ভৃ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন (অর্থাৎ ভরণ করা), এবং মূলগত ভাবে তাদের বিষয়ে একই ধারণা। নিছক জীবিকার প্রয়োজনে স্বামীর উপর নির্ভরশীল নারীর অর্থনৈতিক মূল্য এখন কোনও ভাবেই আর্থিক দিক থেকে নির্ধারণ করা যায় না, কারণ অর্থনৈতিক দিকে তার গৃহকর্ম কোনও উপার্জন

আনে না, তার ভূমিকা এখন শুধুই প্রজননমূলক ও সহায়কের। এর ফলে তাদের অবনমন তাদের নিজের কাছে এবং সাধারণ ভাবে সমাজের কাছে যুক্তিসিদ্ধ হয়েছে। উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে নারীকে সরিয়ে দেওয়ার ফলে তাকে সহজেই বোঝানো যেত যে, তার স্বামীই তার ভরণপোষণ যোগায়। তার গৃহকর্ম প্রচলিত অর্থে 'কাজ' নয়, যদিও তা পুরুষের বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যক। বিবাহের সময়ে যেহেতু তাকে দান করা হয়েছে 'সমগ্র পরিবারের' হাতে, সে সমগ্র পরিবারের দয়ায় আছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে, কারণ প্রায়ই তাকে আরও কমবয়সি, আরও সুন্দরী সপত্নীর সঙ্গে বাস করতে হয়েছে।

দাম্পত্য জীবনে আনুগত্যের একপেশে ব্যাখ্যা ছিল; স্ত্রী বিবাহের শপথের প্রতি অনুগত থাকবে, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে পুরুষ তা বিনা শাস্তিতে অবহেলা করতে পারে। নারীর বিবাহের কর্তব্যের অংশবিশেষ হচ্ছে পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া, এবং সে যদি এই কর্তব্য পালন করতে না পারে তবে সমাজের অনুমোদন নিয়েই তাকে ত্যাগ করা যায়— শাস্ত্রের অনুশাসন মতে। ধর্মগ্রন্থে এমনও বলা হয়েছে, অসতী স্ত্রীকেও ত্যাগ করা উচিত নয়। অন্যান্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে, স্বামী পরিত্যক্তা মায়ের জন্যও পুত্র তর্পণাদি করবে। এখানে এবং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রগ্রন্থে স্বামী পরিত্যক্তা নারীর বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। অশিক্ষিতা, স্বামী পরিত্যক্তা নারীর একমাত্র গতি দাসী বৃত্তি করা অথবা বেশ্যা হওয়া; কোনও ক্ষেত্রেই সম্মান বা সামাজিক নিরাপত্তার কোনও অবকাশ নেই। যদিও স্বামী বা পিতার উদারতায় কিছু কিছু নারী শিক্ষা পেয়েছে, সাধারণ ভাবে তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিতই ছিল। অতএব তারা স্বাধীন ভাবে উপার্জন করার মতো জীবিকা থেকেও বঞ্চিত ছিল। তাছাড়া দক্ষিণ ও পূর্বদিকে আর্যদের আক্রমণের ফলে বিস্তার ঘটায় অনেক বন্দি দাস হয়ে এসেছিল— তারাই অধিকাংশ গৃহকর্মের ভার নেয় এবং চাষবাস ও পশুপালনে সাহায্য করে। এখন আমরা দুটি মাত্র শ্রেণি পাচ্ছি, 'অজ্জবন্ন' এবং 'পেস্‌সবন্ন', হেরেনভোক ও হেলট, প্রভু ও ভৃত্য। এর প্রমাণ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের জৈন গ্রন্থ *অংগবজ্জা* তে পাওয়া যায়। সুতরাং উচ্চতর শ্রেণির নারীরা খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকেই উৎপাদনমূলক শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, যে শ্রম ধনমূল্যে পরিণত করা যায়। এতে তাদের এক অবনমনের অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। তারা তখন পুরুষের অধীন: পিতা, ভ্রাতা, স্বামী বা পুত্র, যে আহার্য সংগ্রহ করে, যাকে তাদের তুষ্ট রাখতে হয়। নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ছিল, কিন্তু ব্যতিক্রমই নিয়মের প্রমাণ। অর্থনৈতিক অবনমন, যা শিক্ষাগত বিভেদের সঙ্গে যুক্ত, একাধারে নারীর সামাজিক অবস্থানকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করেছিল।

পত্নী যখন স্বামীর আগে চলত, তার থেকে সমাজ অনেক দূরে চলে এসেছে। মনে পড়ে, কার্টিয়ামা ভারতবর্ষে নারীযোদ্ধার উল্লেখ করেছেন (আনুমানিক ৩২৭ খ্রি.পূ.); এটি অর্বাচীন বৈদিক বা সূত্র যুগের সঙ্গে খাপ খায়। এর কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই নারী সম্পূর্ণ ভাবে তার মানবিক সম্মান হারিয়েছে। যদিও ভান করা হয় যে তার সম্মান ছিল, লিখিত তথ্য অন্য রকম প্রমাণ দেয়। সে কুমারী হিসাবে সাহিত্যে উপস্থিত নেই, বিধবা হিসাবে তাকে এক বিষণ্ণ অন্ধকার অস্তিত্বে ঠেলে দেওয়া হয়, তাকে নাগরিক বা সমাজের দায়িত্বশীল

অংশ হিসাবে দেখা যায় না; কন্যা বা ভগ্নি হিসাবেও তাকে তত দেখা যায় না। তাকে একটি মাত্র ভূমিকাই দেওয়া হয়, পত্নী ও মাতা রূপে, বিশেষ পুত্রসন্তানের মাতা। সেখানেও তার অস্তিত্ব না থাকারই মতো, কারণ তার ব্যক্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, তার চিন্তা ও অনুভূতি, তার আশা ও স্বপ্ন সমাজ সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করে। সে বেঁচে আছে শুধু তার স্বামীকে তুষ্ট করতে এবং তার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সেবা করতে। আমাদের সামনে এই পরিণতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক পটভূমিকা অনুসন্ধান করার কাজ রয়েছে। নিঃসন্দেহে খ্রিস্টপূর্ব শেষ সাহস্রাব্দের শেষ কয়েকটি শতক এবং খ্রিস্টিয় প্রথম সাহস্রাব্দের প্রথম কয়েকটি শতাব্দীতে বিদেশি অক্রমণে এ বিষয়ে কিছুটা অবদান আছে। জাতিগত সংকর এবং বর্ণপ্রথার বেড়ে ওঠা জটিলতাও বৈদিক ভারতে নারীর অবস্থার অবনমন ঘটাতে সাহায্য করেছে। আমাদের প্রয়োজন সার্বিক ভাবে প্রত্যেকটি গঠনমূলক বিষয়ে গবেষণা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, যাতে ছবিটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

সূত্রাবলি

১. ভারতের মাটিতে ঋগ্বেদেব রচনা শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীব আশপাশে, এবং সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন বেদাঙ্গসূত্রের কাল আনুমানিক খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দী।
২. আর্যমণ্ডলে, ২য় থেকে ৭ম মণ্ডল।
৩. *ঋগ্বেদ* ১২৩:১,
৪. ঐ ১:১২৪·৭,
৫. ঐ ১.৪৬.৪,
৬ ঐ ৩·৬২:৮,
৭. ঐ ১.৬২·১,
৮. ঐ ১·৭৩:৩,
৯. আদর্শ উদাহরণের জন্য *ঋগ্বেদ* ১:১১৫ ২ দ্রষ্টব্য।
১০ দ্রষ্টব্য· মর্যো ন যোষামভোতি পশ্চাৎ— একটি সাধাবণ উপমা অন্যতম, ঋগ্বেদ ৭:৮০ ২ দ্রষ্টব্য।
১১ *ঋগ্বেদ* ১০:৬১:৫,৭।
১২. ঐ ১০:১০।
১৩. ঐ ৩.৪৫:১।
১৪. *তৈত্তেরীয় ব্রাহ্মণ* ২:৪:৫:৫৬।
১৫. *ঋগ্বেদ* ৪:৫৮:৯।
১৬. দ্র. স্বয়ং সা মিত্রং বুনতে জনে চিৎ; *ঋগ্বেদ* ১০ ২৭ ১২।
১৭. ঐ ৪·৫:৫।
১৮. *শতপথ ব্রাহ্মণ* ১২:৭:২:১।
১৯. *ঋগ্বেদ* ১০:১০২.২।
২০. *সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র* ৪:১০:৩; *আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র* ৩ ৪ ৪; *কৌষীতকী গৃহ্যসূত্র* ১ ২৮.২২।
২১. *মানব গৃহ্যসূত্র* ১·৭৬; *বরাহ গৃহ্যসূত্র* ১০.৫।
২২. *স্মৃতিচন্দ্রিকা*, মাইসোব জি আই এস সংস্কবণ, পৃ. ৬২।
২৩. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ* ৬:৪·১৩।

২৪ ঐ ৩·৬:১।
২৫. *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* ১:১১:৪।
২৬. *ঋগ্বেদ* ১০:৮৫:৪৬।
২৭. *অথর্ববেদ* ৮:৬.২৪।
২৮. *মনুসংহিতা* ১:১০, ১১, ৩.৬, ৪·৬।
২৯. *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* ১-৫; ২-৩১; *ভরদ্বাজগৃহ্যসূত্র* ১.২২, *আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র* ১ ৩:৩।
৩০ *ঋগ্বেদ* ১;১১৭ ৭; ১-০ ৩৯·৩; ৪০·৫।
৩১. ঐ ৬;২৮:৫; ১০:২৭:১২।
৩২. দ্র. উদীর্ধ নার্যভি জীবলোকম্ ইত্যাদি, *ঋগ্বেদ* ১৫:১৮:৮।
৩৩. *অথর্ববেদ* (০. ১৮·৩.৩.১)।
৩৪. *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* ৩.৪ ১১ ১।
৩৫. *অথর্ববেদ* ৯ ৫.২৭।
৩৬. ঐ ৫.১৭·৮·৯।
৩৭. *ঋগ্বেদ* ৪.১৬:১৯, ৩০, ৪·১৯·৯।
৩৮ ঐ ১;১৬৭:৪; ২:১২·১২, ১৫, ১৬।
৩৯. *অথর্ববেদ* ১৫·১·৩৬; ২০:১৩৬ ৫.
৪০. *বশিষ্ঠ সংহিতা* ৩·১।
৪১. *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* ৩·৪ ১১ ১।
৪২ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'প্রাচীন ভাবতে গণিকা' দ্রষ্টব্য।
৪৩. *ঋগ্বেদ* ৭.৫৫:৫-৮।
৪৪. ঐ ১·২১২·৭; এবং ১ ১১৬ ১।
৪৫. *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ৬:৬:৪ ৩, *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* ১:৩·১০ ৫৮।
৪৬ মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তি (বা পবিবৃত্তি) এবং পালাগণী
৪৭. *তৈত্তিবীয় ব্রাহ্মণ* ১·৩ ১০ ৫৮।
৪৮ ঐ ৩ ৫·৩ ৪৭।
৪৯. *শতপথ ব্রাহ্মণ* ২·৩ ২.৮।
৫০. ঐ ৯·৪·১·৬।
৫১. *ঋগ্বেদ* ৭.২৬:৩।
৫২. *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ২ ৩ ৫ ১৩।
৫৩ *অথর্ববেদ* ১১ ৫:১৮।
৫৪. দ্র. কুলায় হি স্ত্রী প্রদীয়তে— *ধর্মসূত্র* ২ ১০:২৭ ৩।
৫৫. বা. ব্রা. ১৪.১:১৩১।
৫৬ ঐ ৩.২৫·২৭; *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ১ ১০:৫১-৫৩।
৫৭. *শতপথ ব্রাহ্মণ* ১ ০ ২:২; ৩·৪:২২, ৫·২:১-১০।
৫৮ *গৌতম ধর্মসূত্র* ১৮.১।
৫৯. সীতাব হিরণ্ময় প্রতিকৃতিই মাত্র রামের যজ্ঞের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, এই তথ্যই এর সমর্থন করে।
৬০. *মনুসংহিতা*, ৪·৭:৪।
৬১. *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ২ ৭.১৫·১৭।
৬২. *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ১.১০·৫১-৫৩।

৬৩. *শতপথ ব্রাহ্মণ* ৫:২ ৩:১৩।

৬৪. *বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র* ২৮:২-৩।

৬৫. ঐ ২১:৮·১০।

৬৬ *বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র* ২১ ৮-১০।

৬৭. *বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র* ২·২:৬৩, ৬৪ এগুলি যে সাধাবণ সদিচ্ছামূলক উক্তি প্রমাণিত হয রামের আচবণে এগুলির প্রতি সামগ্রিক অবহেলা, অহল্যাব প্রতি গৌতমের এবং রেণুকাব জমাগ্নির আচরণ থেকে এই মানবিক রীতিগুলি যে অনুসরণ করা হত না তাব অসংখ্য প্রমাণ পাওযা যায়।

৬৮. *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ১·১০-১৯, ২৮।

৬৯. *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* ২·২:৬৩, ৬৪

৭০ *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* ২·৪·৬, *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ২ ৫·১৪; সমর্থন কবে *মনুসংহিতা* ৯:৪।

৭১. *বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র* ২১·৮-১০।

৭২. *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ৬·৫·১০:৩।

৭৩ ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনু চিত্তং তে...

৭৪ ধ্রুবো দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী.. ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্।

৭৫. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ* ১ ৯:২ ১৪।

৭৬ *শতপথ ব্রাহ্মণ* ১৩:২.২৪ *বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র* ৫·১-২, ২ ২, ৩, ৪৪, ৪৫।

৭৭. *মৈত্রায়নী সংহিতা* ১·১০:১১; ৩:৬ ৩।
তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬:৫:৮:৭।

৭৮. *শতপথ ব্রাহ্মণ* ৪·৪.২:১৩।

৭৯. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ* ৬:৪.৭।

৮০. *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ২.৫.২.২০।

৮১. ওই ৬·৬:৮.৫।

৮২ *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ২৩ ৪; *হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র* ১·৪·১৪·২।

৮৩. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ* ১.৯:২:১৪।

৮৪. *শতপথ ব্রাহ্মণ* ১৩ ২:২৪।

৮৫. ভুক্তোচ্ছিষ্টং উবেব দদ্যাৎ খাদির গৃহ্যসূত্র ১ ৪ ১১. ক্রিযাপদে বিধিলিঙ্ লক্ষণীয়।

৮৬ *অথর্ববেদ* ৬·৩ ৭:১৩।

৮৭. *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ৬.৫·১০·৩; মৈ সং. ৪ ৬·৪।

৮৮. ঐ ৬·১:৮:৫।

৮৯. *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ১:১০.২৮:২৯।

৯০. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ* ৪:৪:১২, ১৩; *হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র* ১:৪ ১৪ ৭।

৯১. *কৃষ্ণক সংহিতা* ১:১০.১১:৩·৬:৩।

৯২. *শতপথ ব্রাহ্মণ* ১৪.১:১:৩১।

৯৩. *কৃষ্ণক সংহিতা* ৩১:১।

৯৪. *মৈত্রায়ণী সংহিতা* ১.১০.১১; ৩·৬.৩।

৯৫. *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ১:৯:২৩, ৪৫।

৯৬. *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ৬.৫:৮:২।

৯৭. ঐ ২.৩:১০·৭।

৯৮. *গৌতম ধর্মসূত্র* ১২.৩৯।

৯৯ *শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র* ১২:২৯:২১।
১০০ *মনুসংহিতা* ৩ ৬·৩, ৪·৬·৭; ৪.৭·৪।
১০১. ১০:১; *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ৬:৫.৮.২।
১০২. *শতপথ ব্রাহ্মণ* ১৩:১:৯:৬।
১০৩. *হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র* ১.৬:১২.১৪।
১০৪. উষো যাতি স্ব সবস্য পতনী; *ঋগ্বেদ*

প্রাচীন ভারতে মাতৃত্ব

আল্তেকার লিখেছেন, 'মাতৃত্বের উপরে দেবত্বের আরোপ ভারতবর্ষে যেমন উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, এমন আর কোথাও নয়।'[১] কিন্তু দেবত্বের আরোপ সমাজে নারীর অবস্থানের বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত না-ও করতে পারে— তা হয়তো কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণ, মায়ের প্রতি সমাজের নিস্পৃহতার ক্ষতিপূরণ। তবে প্রাচীন ভারতের সমাজজীবনে মাতৃত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। মাতৃত্ব ছিল আবশ্যিক; একটি মেয়েকে শেখানো হত ভাল স্ত্রী, ভাল মা হতে। তাকে 'একাধিক পুত্রের জননী' হওয়ার জন্য আশীর্বাদ করা হত। মনে পড়ে *অভিজ্ঞানশকুন্তলম* নাটকের চতুর্থ অঙ্কে গর্ভবতী মেয়েটিকে তপস্বিনীরা আশীর্বাদ করছেন, সে যেন বীরপ্রসবিনী এই দুর্লভ সম্মান লাভ করে। গর্ভাধান, গর্ভধারণ, প্রসব এবং প্রসব উত্তর অবস্থাগুলির আনুষ্ঠানিক দিক দেখা যাক।

বিবাহ অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরে নবদম্পতি প্রার্থনা করত, অর্থাৎ বধূ নীরবে সমর্থন করত স্বামীর উক্তি: 'এস, আমরা মিলিত হই, যাতে আমরা পুত্রসন্তান লাভ করতে পারি, সম্পত্তির বৃদ্ধির প্রয়োজনে পুত্রলাভ করতে পারি।' বর আরও প্রার্থনা করত, 'পুত্র, পৌত্র, দাস, শিষ্য, বস্ত্র, কম্বল, ধাতু, পত্নী, রাজা, অন্ন, নিরাপত্তা'।[২] বিবাহের সময়ে বধূর পক্ষ থেকে প্রার্থনা হত, সে যেন কখনও শূন্য কোলে না থাকে (অশূন্যোপস্থা), অর্থাৎ তার কোলে যেন সব সময়ে সন্তান থাকে। অতএব বিবাহ মূলত পুত্রসন্তানের প্রয়োজনে এবং যেহেতু একটি মাত্র পত্নী যে পুত্রসন্তানই প্রসব করবে তার স্থিরতা নেই, তাই বর কোনও ঝুঁকি নেয় না। সে বহু পত্নীর প্রার্থনা করে— তার নববিবাহিত বধূর উপস্থিতিতেই— যে বধূর সামাজিক ভাবে প্রস্তুতি ছিল এ রকম প্রার্থনা মেনে নেওয়ার, কারণ পুত্র তো বংশরক্ষা এবং সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

গর্ভাধান নামক অনুষ্ঠানে পুত্রসন্তানের জন্য প্রার্থনা আছে; *অথর্ববেদ*-এ[৩] পুত্রসন্তানের জন্য প্রার্থনা। পরবর্তীকালের এক উপনিষদে বিভিন্ন রকম সন্তান— জ্ঞানী পুত্র, পণ্ডিতা বুদ্ধিমতী কন্যা, ইত্যাদি লাভের জন্য স্বামী তার স্ত্রীকে কি কি খাওয়াবে তার নির্দেশ আছে।[৪] প্রার্থনার শুরু: 'এস আমরা দু'জনে মিলে পুত্রসন্তান লাভের জন্য চেষ্টা করি।' স্ত্রী এখানে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চেষ্ট গ্রহীতা; তার কোনও কথা নেই। তারপরে স্ত্রী গর্ভবতী হলে তার দুটি অনুষ্ঠান করতে হয়: পুত্রসন্তান প্রসবের জন্য পুংসবন এবং সিঁথি ভাগ করার জন্য সীমন্তোন্নয়ন। পুংসবন নামটি থেকেই বোঝা যায় এটা পরিস্ফুট ভাবেই পুত্রসন্তানের জন্মের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। সব প্রার্থনাগুলিই অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাবে কন্যাসন্তানের জন্মে বাধা দেয়, যাতে

শুধুমাত্র পুত্রসন্তানই জন্মায়।[৫] সীমান্তোন্নয়ন আরও জটিল একটি অনুষ্ঠান। যে নারীর স্বামী ও সন্তান বেঁচে আছে তারা গর্ভিণীর সামনে বীণা বাজাবে, গান গাইবে ও নাচবে। রান্না করা ভাতের একটি পিণ্ড তার সামনে ধরা হবে এবং তার স্বামী জিজ্ঞাসা করবে: 'কি দেখছ?' উত্তর, 'সন্তান'। আশীর্বাদ, 'বীরপ্রসবিনী হও, অবিধবা হও।'[৬] *ভরদ্বাজ গৃহ্যসূত্র*-তে পড়ি, রান্না করা ভাতের তিনটি পাত্র তার সামনে রেখে জিজ্ঞাসা করা হয়: 'কী দেখছ?' সে উত্তর দেয়: 'পুত্র ও পশু।'[৭] আর একটি বৈচিত্র্য পাওয়া যায় *জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র*-তে, যেখানে একটি কাঁসার পাত্রে জল ভরে তাতে এক টুকরো সোনা রাখা হয়। বধূকে প্রশ্ন করা হয়: 'কী দেখছ?' সে বলে: 'সন্তান, পশু, আমার জন্য সৌভাগ্য ও আমার স্বামীর জন্য দীর্ঘ জীবন।'[৮] শাস্ত্রে কোথাও বধূর বা ভাবী মায়ের দীর্ঘ জীবনের জন্য কোনও প্রার্থনা নেই। এবং এই সময়ে প্রসবোত্তর মৃত্যুর হার এখনকার তুলনায় অনেক বেশি ছিল। শুধু স্বামীর দীর্ঘ জীবনের কামনাই শুনি। এর ব্যাখ্যা হয়তো প্রার্থনায় পত্নীশব্দের বহুবচনে পাওয়া যায়; যদি সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে পত্নীর মৃত্যু হয়, তবে আর একটি বিবাহ করা চলবে, কারণ শাস্ত্রে নির্দেশ আছে, স্ত্রী সৎকারের পরদিনই স্বামী বিবাহ করবে।[৯] *সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র* নির্দেশ দেয়, যে নারীর স্বামী-সন্তান বেঁচে আছে সে নববধূকে নিরামিষ খাদ্য ও মদ দেবে এবং তারপরে তারা গান গাইবে, বীণা বাজাবে ও নাচবে। এ সবই পুত্রসন্তানের জন্মের প্রত্যাশায়।[১০] *ঋগ্বেদ*-এ গর্ভধারণের বিষয়টিকে নাম দেওয়া হয়েছে উদরমাময়ং। গর্ভের চতুর্থ মাসে স্বামী শজারুর কাঁটা দিয়ে তার চুল আঁচড়ে দেয়— ভূমিতে হলকর্ষণের প্রতীক এবং জোড় সংখ্যার একগুচ্ছ কাঁচা ফল দেয়, যা অসম্পূর্ণ ভ্রূণের প্রতীক। তারপর বীণা বাদন ও নাচ হয়, যার ফলে আশ্বলায়ন বলেছেন, ভ্রূণ ধ্বংসকারিণী কিছু রাক্ষসীকে তাড়ানো হয়। তারপর তাকে ঘৃতের দিকে তাকাতে বলে প্রশ্ন করা হয়: 'কী দেখছ?' সে উত্তর করে: 'সন্তান।'[১২]

অপর গুরুত্বপূর্ণ গর্ভাধানের অনুষ্ঠান হল পুংসবন। তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় *অথর্ববেদ*-এ।[১৩] পরবর্তী সাহিত্যে অনুষ্ঠানের অনুপুঙ্খগুলি পাওয়া যায়। সেখানে আমরা জানতে পারি, গর্ভের তৃতীয় মাসে গর্ভবতী একদিন উপবাস করে থাকলে তারপর তার স্বামী তাকে খাবার দেয়: ভাত, দুটি সিম, এক দানা যব, এক এক গ্রাস দইয়ের সঙ্গে। তারপরে সে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে: 'তুমি কী পান করবে?' সে উত্তর দেয়: পুংসবন।[১৪] কখনও কখনও গর্ভাবস্থায় অনবলোভন নামে একটি ছোট অনুষ্ঠান করা হয়; তার উদ্দেশ্য গর্ভপাত নিরোধ করা। *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র*-তে এর বর্ণনা আছে।[১৫]

প্রসবের সময় যখন এগিয়ে আসে, জন্মের ঠিক পূর্বে শোষ্যন্তীকর্ম নামে একটি অন্তিম অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। এটি মনে হয় অত্যন্ত প্রাচীন অনুষ্ঠান, এবং নবাগতের আগমনের সময়ে পরিবার ও সমাজের মধ্যে যে নাটকীয় টান টান ভাব, তার চিহ্ন বহন করে। প্রসবের অব্যবহিত পূর্বে স্বামী স্ত্রীর উপরে জল ছেটাতো, এবং প্রসব হওয়া পর্যন্ত তা ক্রমান্বয়ে চালিয়ে যেত।[১৬]

শিশুর জন্মের পরে পরিবারের প্রধান লক্ষ্য মনে হয় দুষ্ট প্রেতদের দূরে রাখা: তারা

নবজাতকের ক্ষতি করে বা তাকে নষ্ট করে। জাতকর্ম অনুষ্ঠানে সূতিকাগ্নি অর্থাৎ জন্মসংস্কারের জন্য বিশেষ ভাবে আহিত অগ্নিতে সর্ষে ও তুষ আহুতি দেওয়া হত। এই আহুতি এগারো বার দিতে হত।[১৭] তখন পিতা হোম করত এবং শিশুর সেই গোপন নাম অস্ফুট ভাবে উচ্চারণ করত, যা শুধু পিতামাতাই জানে।[১৮] তার পরে পিতা সুবর্ণ ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়ে শিশুর মুখ ছুঁত এবং তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে ঘি ও মধু খাওয়াত। তার পরেই কেবল শিশুকে স্তন দেওয়া যেত।

গর্ভিণী নারীর খাদ্যের প্রয়োজন বিষয়ে কিছুটা সচেতনতা ছিল, কারণ আমরা শুনতে পাই, 'নববধূ, কুমারী কন্যা, রোগী ও গর্ভবতী নারীকে অতিথিরও আগে খেতে দেবে।'

পুত্রের জন্ম থেকে তার শিক্ষালাভের উপনয়ন পর্যন্ত বহু ছোট ছোট অনুষ্ঠান থাকত। প্রথম ছিল বিষ্ণুবলি, তার পরে মেধাজনন তার পরে নামকরণ। এর পরে পিতা পুত্রকে ধরে গৃহের বাইরে নিয়ে আসে (নিষ্ক্রমণ); এর ফলে যেন তার বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সংস্রব ঘটে। শিশুর প্রথম ভাত খাবার অনুষ্ঠান অন্নপ্রাশন; বর্ষবর্ধন তার দীর্ঘায়ু কামনা করে। প্রথমবার ন্যাড়া হওয়া চৌল এবং শিশু শিক্ষা শুরু করলে বিদ্যারম্ভ। এই সব অনুষ্ঠানেই পিতা অনুষ্ঠান পরিচালনা করে, মাতা শুধুমাত্র পটভূমিকায় থাকে। সে কোনও অনুষ্ঠানেই কিছু করেও না, বলেও না।

শিশুকে মানুষ করার ব্যাপারে তার ভূমিকা কী? কিছুই প্রায় শোনা যায় না, শুধু তির্যক ভাবে বলা হয়, 'চাতুর্মাস্যের বরুণপ্রঘাস যজ্ঞে পুরোহিত যজমানের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, কার সঙ্গে ব্যভিচার করেছ?'[১৯] 'সেই স্ত্রী বরুণের শাসনীয়া, যে এক পুরুষের হয়েও অপর পুরুষের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়। পাছে সে হৃদয়ে শূল নিয়ে যাগ করে... সে যা স্বীকার করে না তা তার আত্মীয়দের ক্ষতি করে।'[২০] সুতরাং সন্তানের মাতা সর্বসমক্ষে নিজের ব্যভিচার স্বীকার করে, যাতে তার স্বামী ও সন্তানদের ক্ষতি না হয়। 'সে মদ্যপান করে না; তার পুত্রদের জন্য এই তার ব্রত।'[২১] শিশুর লালন-পালনে মায়ের আনুষ্ঠানিক ছাড়া কোনও ভূমিকা যে ছিল তার কোনও ইঙ্গিত আমরা পাই না। আসলে শিক্ষা, শাসন, তদারক এবং পেশাগত বিদ্যা সম্পূর্ণ ভাবে পিতার অধীন। মায়ের একমাত্র অবদান কিছু ব্রত ও অনুষ্ঠান যা পরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে গর্ভধারণ, প্রসব এবং কিছু প্রসবোত্তর অনুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়— সবই পিতার কর্তব্য। তারপর উপনয়ন হলে পুত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে পিতার— যদি পিতা পেশাদার শিক্ষক হন— না হলে গুরুর শিষ্য হয়ে যায়।

বৈদিক সাহিত্যেও পুত্রসন্তানের প্রতি সমাজের পক্ষপাত অত্যন্ত প্রকট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'বন্ধ্যা নারীকে পরিত্যাগ করা যায় (পরিবৃত্তি বা পুরিবৃক্তি), কারণ নিঋতি তাতে ভর করেছে।'[২২] প্রজনন বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্ব প্রমাণের ফলে একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে— এক অশুভ ধারণা যা কিনা অত্যন্ত কুৎসিত ও সম্পূর্ণ অশুভ, যার বিশেষ কাজ হল সমস্ত রকম শুভ বিষয়কে ধ্বংস করা।[২৩] বন্ধ্যা নারীকে দশ বছর পরে পরিত্যাগ করা যেত; শুধু কন্যার যে জন্ম দেয় সেই নারীকে বারো বছর পরে, এবং মৃতবৎসা মাকে পনেরো বছর

পরে।[২৪] পুত্রহীন পত্নীর স্বামীর আবার বিবাহ করা উচিত।[২৫] ভাল নারীর লক্ষণ, 'যে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্রের জন্ম দেয় এবং কখনও স্বামীর কথার উত্তর করে না।'[২৬]

পরবর্তী ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে সন্তানকামী নারীর জন্য বহু ব্রতের কথা বলা হয়েছে। ততদিনে নারীর সন্তানদাত্রী এক সম্পূর্ণ দেবীমূর্তির পরিকল্পনা করা হয়েছে— তিনি ষষ্ঠী।[২৭] নারীদের ষষ্ঠী বিষয়ক ব্রতের উদ্দেশ্য তাদের গর্ভধারণের ক্ষমতা বাড়ানো, কারণ তিনি শিশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ দিনে সূচিকাগৃহে তাঁর পূজা হয়। তিনি সন্তান দেন এবং তাদের রক্ষা করেন।[২৮] তাঁকে তুষ্ট করতে নানা অনুষ্ঠানের নির্দেশ আছে, যাতে তিনি ক্ষুদ্র শিশুদের মঙ্গল করেন, কারণ শিশু যত ছোট হবে অন্তরিক্ষচারী অসংখ্য বুভুক্ষু প্রেত তাকে গ্রাস করার সম্ভাবনা ততই বেশি।[২৯] গর্ভস্থ শিশু সবচেয়ে ছোট, ভ্রূণাকারে আছে তাই তার বিপদের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। *মানব গৃহ্যসূত্র*-তে ষষ্ঠীকল্প (৩:১৩:৬) এবং বিনায়ককল্প (২:১৪) এই প্রেতগুলিকে দূর করে শিশুর মঙ্গল বিধান করে।

গর্ভধারণ, নির্বিঘ্নে পুত্র প্রসব ও তার নিরাপত্তা ও দীর্ঘায়ুর জন্য অনেকগুলি ব্রতের নির্দেশ আছে। তাই সেখানে মহাষষ্ঠী ব্রত আছে, সন্তানের জন্য কৃষ্ণাষ্টমী, আট পুত্রের জন্য লোকেশ্বরী বা কোটীশ্বরী, জীবিত পুত্রের জন্য জীবৎ পুত্রিকাষ্টমী। বারো বছর ধরে পালনীয় জ্যেষ্ঠা ব্রত আছে; জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের সময়ে মেয়েরা সারা রাত জেগে জ্যেষ্ঠা দেবীর মূর্তিকে পূজা করে। যে নারীর সন্তান মারা যায় অথবা যার দরিদ্র পুরুষের ঔরসে একটিমাত্র পুত্র আছে, এই ব্রত তারই জন্য।[২৯] হেমাদ্রি পুত্রলাভের জন্য দূর্বাষ্টমীর নির্দেশ দেয়।[৩০] হেমাদ্রিতে পুত্রলাভের জন্য নাগব্রত আছে।[৩১] পিতৃব্রতে পুত্রের পিতৃত্বই পুরস্কার।[৩২] আরও পরিস্ফুট পুত্রকাম,[৩৩] পুত্রবিধি, পুত্রপাপ্তি,[৩৪] পুত্রীয়।[৩৫] এছাড়া ছোটখাট আরও অনুষ্ঠান আছে, যেমন কৌমব্রত, মরুদ্‌ব্রত, মঙ্গলগৌরী, রুক্মিন্যাষ্টমী, বরাহদ্বাদশী, বিষ্ণু, দেবকী, ব্রতরাজতৃতীয়া, শনি-প্রদোষ, সর্ষপসপ্তমী, সূর্য— সূর্যনাকৎ— সপ্তমী সবই ওই একই উদ্দেশ্যে।[৩৬] মাতৃব্রতে মৃতবৎসা বা একটি সন্তান আছে যার এ রকম নারীর মাতৃকার পূজার বিধান আছে; শ্রাবণকৃত্যা এমন নারীর যার সন্তান শৈশবে মারা যায়। সংঘাতক ব্রত স্বামী ও পুত্রদের সঙ্গে বিচ্ছেদ রোধ করার জন্য। এগুলি এবং সহস্র সংখ্যক আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ষষ্ঠীপূজার জনপ্রিয়তার সাক্ষ্যবহন করে।

বন্ধ্যাত্বের অপবাদ এড়াবার যে তীব্র বাসনা, সেটি সর্বজনীন ঘটনা। সারা পৃথিবীতে এবং যুগ থেকে যুগান্তরে মেয়েরা পুত্র কামনা করেছে এবং অবন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার জন্য তপস্যা করেছে; ব্রত পালন করেছে, পূজা করেছে, প্রার্থনা করেছে। ভারতবর্ষে এই ব্রতগুলি সময়ের সঙ্গে সংখ্যায় বেড়েছে; পরবর্তী শাস্ত্রগ্রন্থে পুত্রসন্তান ধারণ করা ও প্রসব করার জন্য আরও অধিকসংখ্যক বিধান আছে।

যে কোনও আদিম জাতির মানুষের মতো ভারতীয়রাও মনে করত যে জগৎটা বিশেষ করে অন্তরীক্ষ ও পাতাল ভূত-প্রেত-পিশাচাদিতে পরিপূর্ণ— তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে জীবিত প্রাণীদের ক্ষতি করা। কিন্তু তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ভ্রূণ ও নবজাত শিশু; এই প্রেতগুলির

অনেকেই এদের ভক্ষণ করে পুষ্ট হয়। যাতে তারা ভ্রূণ ও নবজাতকের ক্ষতি করতে না পারে, তাই সহস্র সংখ্যক বিচিত্র ব্রত আবিষ্কার করা হয়েড়ছিল; ওষধি, ফল, মূল, ধাতু, প্রভৃতি নানা কার্যকর পদার্থ এই সব ব্রতে ব্যবহার করা হত; 'শামান'রা গোপন মন্ত্র আওড়াত। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও যখন মা মৃতসন্তান প্রসব করত অথবা গর্ভধারণই করতে পারত না, তখন তাকে বন্ধ্যা বা গর্ভধারণের পক্ষে অত্যন্ত অশুচি বলে অপরাধী করা হত। বোঝাই যায়, নির্বিঘ্ন প্রসবের পর এই কবচ প্রভৃতি এবং ব্রতগুলি মায়ের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও যে মায়ের সন্তানেরা দীর্ঘায়ু হত, তাকে সম্মান করা হত।

প্রেতে বিশ্বাস তার যুক্তিযুক্ত অন্ত পর্যন্ত টেনে নেওয়া হত না, যার ফলে অভাগিনী বন্ধ্যা নারী বা যার সন্তান শৈশবে মারা যায় যে দোষমুক্ত হতে পারে। পুরুষের বন্ধ্যাত্ব আবছা ভাবে জানা ছিল, নিয়োগ প্রথা থেকে যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু 'বন্ধ্যা' পুরুষ কখনও দোষের ভাগী হত না। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্যে নিঃসন্তান রাজাদের কথা শোনা যায়, কিন্তু অশুভতার কোনও ইঙ্গিত সেখানে নেই। কৃষিকেন্দ্রিক মানুষ হিসাবে প্রাচীন ভারতীয়রা জানত যে মরা বীজ উর্বর ক্ষেতে ফলবে না; কিন্তু তারা সন্তানহীনতার এই দিকটা সম্বন্ধে রহস্যময় নীরবতা পালন করেছিল। সব সময়েই অপ্রসবের জন্য নারীকেই দায়ী করা হত। অবশ্যই প্রেত-পিশাচদের— ধ্বংসকারী অতিপ্রাকৃত শক্তির আবিষ্কারের ফলে কিছুটা দোষ স্খালন হত এবং তাদের কাছ থেকে বিপদ এড়াতে ব্রতের বিধান করা হত।

যদিও অবন্ধ্যাত্ব প্রধান ভাবে কাম্য ছিল, কিন্তু সেটাই শুধু এখানে যথেষ্ট নয়। পুত্র কন্যার চেয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। সোমযোগের সেই প্রাচীন যুগেও একটি অনুষ্ঠানে কিছু যজ্ঞের বাসন তুলে ধরা হত, কতগুলি আবার নীচে রাখা হত। তেমনই জন্মের সময়ে পুত্রদের উঁচুতে তুলে ধরা হবে, কন্যাদের মাটিতে শোয়ানো হবে। বলাই বাহুল্য, এটি সামাজিক বাস্তবের আনুষ্ঠানিক প্রতিফলন। তাই শুধু কন্যার মায়েদের যে সামাজিক ভাবে পুত্রের মায়ের চেয়ে নিচু চোখে দেখা হবে, তা বিচিত্র নয়।

কিন্তু মাতৃত্বলাভের পরই মা-কে ঠেলে দেওয়া হত পিছনে, অন্তত পরের প্রসব পর্যন্ত। সে পূজা করতে পারে, আহুতি দিতে পারে, সন্তানদের স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং মঙ্গলের কামনায় ব্রতপালন করতে পারে, কিছু কিছু স্বাদু খাদ্য পানীয় পরিত্যাগ করতে পারে।[৩৭] কিন্তু এ ধরনের নেতিবাচক এবং আপাত নিষ্ক্রিয় আচরণ ছাড়া মা হিসাবে তার ভূমিকা ধর্মগ্রন্থে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। বাড়ির গৃহিণী হিসাবে নিঃসন্দেহে সে আহার্যের তদারকি করত এবং সম্ভবত স্বামী, শ্বশুরকুলের আত্মীয় ও সন্তানদের পরিবেশনও করত। কোনও কোনও মা পরিবারের জন্য রান্নাও করত এবং সেই ভাবে সন্তানদের পুষ্টির বিষয়ে সরাসরি যুক্ত ছিল। সে সম্ভবত সন্তানদের পোশাক-আশাক, খেলনা, গহনা ও অন্যান্য সম্পত্তির দায়িত্বে ছিল। রোগের সময়ে পিতা নয়, সে-ই তাদের সেবা করত এবং তাদের আরামের ব্যবস্থা করত। কিন্তু এ সবই অনুমান, কারণ শাস্ত্র এ বিষয়ে নীরব। যদিও সব শাস্ত্রই শুধু পুত্রের কথাই বলে, মা অবশ্যই নিরপেক্ষ ভাবে সব সন্তানের প্রয়োজনই মেটাত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা স্পষ্ট যে সে পুত্রের প্রতি সামাজিক পক্ষপাতের শরিক ছিল। তার সমস্ত সামাজিক সম্মান নির্ভর করত পুত্রের জননী হওয়ার উপরে।

এতৎসত্ত্বেও পিতার তুলনায় মাতার কন্যার চেয়ে পুত্রকে পছন্দ করার কারণ কমই ছিল, যদি না এমন হত যে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগত না হয়ে সামাজিক এবং এই কারণে নিয়ন্ত্রিত এবং প্রথাগত। পিতার সম্পত্তির মালিকানা ছিল। সে চাইত তার নিজের (অর্থাৎ ঔরস) পুত্রকে সম্পত্তি এবং সম্ভবত কাজ, ব্যবসা বা পেশা দান করে যেতে। মায়ের সম্পত্তির মালিকানা ছিল না, এবং মনে করতে ভাল লাগে যে অনুভূতির দিক দিয়ে তার পছন্দ ছিল মেয়ে— খুব অল্পদিন, বিবাহ পর্যন্ত, যার সঙ্গ সে উপভোগ করতে পারবে। তাছাড়া তার অনুভূতি ও কল্পনা দিয়ে সে কন্যার মধ্যেই নিজেকে দেখতে পাবে। পরবর্তী সাহিত্যে আমরা মাঝে মাঝে দেখি মেয়ের সুখের জন্য মা বাবাকে অনুনয় করছে। কিন্তু মূলত সমাজ কন্যাকে দেখত অভিশাপরূপে। 'পত্নী বন্ধু, কন্যা দুঃখের আধার, পুত্র স্বর্গের আলো',[৩৮] অথবা 'পুত্র নিজস্বরূপ, পত্নী বন্ধু, কন্যা পুরুষের দুঃখমাত্র।'[৩৯]

যেহেতু রুচির ব্যতিক্রম ঘটে, কোনও কোনও পিতা কখনও কখনও বুদ্ধিমতী এবং পণ্ডিত কন্যার কামনা করত। তাই আমরা একটি অনুষ্ঠানের কথা পড়ি: 'যে চায় তার কন্যা পণ্ডিতা হোক, সে তিল দিয়ে ভাত রাঁধবে এবং দু'জনে তা খাবে।'[৪০] মনে করলে মজা লাগে যে, শঙ্করাচার্যের টীকায় পণ্ডিতা শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে 'গৃহকর্মের ব্যাপারে নিপুণা'। ফলে কন্যাদের শাস্ত্রাধ্যয়ন বিষয়ে প্রচলিত নিয়মের পোষকতা করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাখ্যাটি মিথ্যা, পক্ষপাতদুষ্ট এবং ভ্রান্ত; পণ্ডিতা শব্দটি গৃহকর্ম বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়নি।

মায়ের পুত্র সম্বন্ধে মনোভাব বা সম্বন্ধ বিষয়ে কোনও বিবরণই তাই আমরা পাই না। সব শাস্ত্রই কিন্তু 'পুত্র প্রিয়ের চেয়েও প্রিয়তর'[৪১] নিয়েই ব্যাপৃত। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'পুত্র পুরুষের ধন।'[৪২] শাস্ত্রগুলি একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুত্রের উপকারিতার প্রশংসা করেছে। 'পুত্র দিয়ে পৃথিবী জয় করা যায়, পৌত্র দিয়ে অমৃতত্বলাভ করা যায়।'[৪৩] 'পুত্র জন্মালেই পিতা পূর্বপুরুষের ঋণ থেকে মুক্ত হয়।'[৪৪] পুত্র মাতার কাছে কতখানি তা স্পষ্ট হয় যখন কুন্তী পুত্রদের অনুপস্থিতির জন্য আক্ষেপ করেন: 'মাধব! বৈধব্য, সম্পদহানি বা শত্রুতা কিছুই আমাকে তত দুঃখ দেয় না যা দেয় পুত্রগণের বিরহ।'[৪৫]

পিতামাতা সন্তানদের ভালবাসে, কিন্তু বিপদের সময়ে যখন তাদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না তখন তাদের দত্তক নেওয়ার জন্য অপরকে বিলিয়ে দেয়। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পিতামাতা দু'জনে অথবা তাদের মধ্যে একজন এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।[৪৬] অপর এক গ্রন্থে বলা হয়েছে পিতা অথবা মাতা পুত্র দত্তক নিতে পারে।[৪৭] অতএব পুত্রের ভাগ্যবিষয়ে অত্যন্ত গুরুতর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুঁথিগত ভাবে মায়ের কিছু বলার আছে। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে দেখা যায়, একা পিতাই এ রকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পুত্রের কাছ থেকে সম্মান মাতার প্রাপ্য। 'অধ্যাপক দশ শিক্ষকের সমান, পিতা অধ্যাপকের সমান এবং মাতা সম্মানে সহস্র পিতার অধিক।'[৪৮] 'মাতাকে শ্রদ্ধা করলে পৃথিবী জয় করা

যায়, পিতাকে শ্রদ্ধা করলে অন্তরীক্ষ জয় করা যায় এবং গুরুকে শ্রদ্ধা করলে ব্রহ্মলোক জয় করা যায়।'[৪৯] 'পুত্র মাতার সেবা করবে, যদি মাতা সমাজ পরিত্যক্তা হয় তাহলেও, কারণ তারই জন্যে মাতা বহু কষ্ট সহ্য করে।'[৫০] 'পুত্র মাতাকে ভরণপোষণ করবে, সমাজপরিত্যক্তা হলেও, তবে তার সঙ্গে কথা বলবে না।'[৫১] 'সমাজপরিত্যক্ত পিতাকে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু মাতাকে নয়। মাতা কখনও পুত্রের পরিত্যাজ্যা নয়।'[৫২] এখানেই শঙ্খ ও লিখিত বলেছেন, 'পুত্র পিতামাতার বিবাদে কোনও পক্ষ অবলম্বন করবে না, যদি করে, তবে মাতার পক্ষই নেবে, কারণ মাতাই তাকে গর্ভে ধারণ, প্রসব ও লালন-পালন করেছে।'[৫৩] পুত্র মাতার ঋণ থেকে কখনওই মুক্তি পায় না, একমাত্র মুক্তি পায় যদি সে (জটিল ও প্রচুর অর্থসাপেক্ষ) সৌত্রামণি যাগ করে।' 'কোনও গুরুই মাতার চেয়ে উচ্চ নয়।'[৫৪] পাণ্ডবেরা বলেন 'অন্য সব অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, মাতার অভিশাপের থেকে মুক্তি নেই।'[৫৫] 'তখনই কেবল তার বার্ধক্য আসে, তখনই কেবল তার শোক হয়, তখনই কেবল তার জগৎ শূন্য হয়ে যায়, যখন কেউ তার মাকে হারায়।'[৫৬] অজাতশত্রু তাঁর পিতাকে তাঁর আদেশ অমান্য করে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাঁর মাতাকে হত্যা করতে চাইলে তাঁর মন্ত্রীরা তাঁকে বলেন: 'এমন আঠারো হাজার মন্দ রাজার বিবরণ পাওয়া যায় যাঁরা পিতৃহন্তা। কিন্তু মাতৃহন্তার কোনও বিবরণ মেলে না।'[৫৭] কিন্তু পরশুরাম তাঁর পিতার আদেশে মাতাকে হত্যা করেছিলেন, যদিও পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রথম বরে তিনি মাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

মাতা যদি যৌন ব্যভিচারের দোষে দোষী হয়, পুত্রের উপর নির্দেশ আছে, শ্রাদ্ধের সময়ে তার জন্য প্রার্থনা করতে: 'যদি আমার মাতা কোনও পাপ করে থাকেন, কর্তব্যে অবহেলা করে থাকেন, পিতা যেন সেই বীজ নিজের বলে গ্রহণ করেন।'[৫৮] পুত্রের কর্তব্য মায়ের প্রতি সম্মান দেখানো[৫৯] এবং কখনও মাকে শাস্তি বিধান না করা। যদি তা করে তবে তাকে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে।[৬০]

পুত্র নানা শ্রেণির হতে পারত। তার মধ্যে মাতার সাক্ষাৎ যোগ ছিল ঔরস (স্বামীর থেকে জাত), কানীন (বিবাহের পূর্বে গর্ভধৃত), সহোঢ় (বিবাহের সময়ে গর্ভধৃত), পুত্রিকাপুত্র (কন্যার পুত্র, যাকে কন্যার পিতা নিজের পুত্র বলে গ্রহণ করতেন), গূঢ়োৎপন্ন (গোপনে পরপুরুষের দ্বারা উৎপন্ন) এবং নিয়োগ। এর মধ্যে কানীন, সহোঢ় এবং গূঢ়োৎপন্ন বিষয়ে সমাজের আপত্তি ছিল। অন্য দুটি প্রকট ভাবেই সমাজ দ্বারা অনুষ্ঠিত হত। দত্তক নেওয়ার সময়ে পুঁথিগত ভাবে পিতামাতা উভয়েরই সম্মতির প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অনুমান হয়, পুরুষশাসিত সমাজে মায়ের অনুমতি আছে এটা গ্রহণ করেই নেওয়া হত। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে দুস্থ ব্যক্তিরা সন্তান বিক্রয় করত; এ রকম 'ক্রীত' পুত্র পিতামাতা দু'জনেরই হত, কিন্তু বিক্রয় বা ক্রয়ের মূল সিদ্ধান্ত পুরুষেরই— মহাকাব্য, পুরাণ ও বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত ঘটনাগুলি তারই প্রমাণ দেয়।

মাতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত জটিলতাগুলি সাহিত্যে প্রকাশ পায়। সব কিছু যে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সহজ সরল ছিল না তা মহাকাব্য, পুরাণ, বৌদ্ধ সাহিত্য এবং প্রাচীন মধ্যযুগের

সাহিত্য থেকে উদঘাটিত হয়। এমনকী বৈদিক সাহিত্যেও পিতা এবং কন্যার মধ্যে (ব্রহ্মা ও বাক্) অবৈধ সম্পর্ক দেখতে পাই। বৌদ্ধ সাহিত্যে মাতা-পুত্রের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের একটি নিদর্শন পাওয়া যায়।

বিশ্বান্তর জাতকে পিতা পুত্রকন্যাকে বিলিয়ে দেয় মাতার অনুমতি ছাড়াই। যদিও শাস্ত্রে নির্দেশ আছে, পুত্রেরা বার্ধক্যে মায়ের দেশাশোনা করবে তবু কুন্তী পুত্রদের ছেড়ে বনে গিয়েছিলেন। গর্ভবতী স্ত্রী স্বামীর কাছে বিশেষ দায়িত্ব ও যত্নের বিষয়, কিন্তু গর্ভবতী অবস্থায় সীতা পরিত্যক্তা হয়েছিলেন বিনা শাস্তিতে। শাস্ত্রে প্রায়ই বলা হয়, 'ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ— স্ত্রী উপপতির দ্বারা দূষিত হয় না'।[৬১] কিন্তু সীতাকে এ বিষয়ে শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। এই অপরাধে অহল্যা অভিশাপ পেয়ে পাষাণমূর্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। বিবাহিতা রমণী ব্যভিচার করলে এক মাসের পর তাকে শুদ্ধ বলে গণ্য করতে হবে।[৬২] কিন্তু রামচন্দ্র বা গৌতম কেউই এই বিধি মানেননি। আরও অসংখ্য এ রকম নিদর্শন মহাকাব্যে ও পুরাণে পাওয়া যায়, যেখানে, যে নারীর পদস্খলন ঘটেছে তাকে কঠোর শাস্তির দ্বারা দণ্ডিত করা হয়। তার মধ্যে কয়েকটি এত বীভৎস যে সেগুলি উচ্চারণ করা যায় না। যাই হোক, বিবাহিতা রমণী শুধু তার স্বামীর থেকেই গর্ভধারণ করবে এবং স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর জন্ম দেবে, এটাই প্রত্যাশিত ছিল।

মাতৃত্বের বিষয়ে বা পুত্রের সম্বন্ধে মাতার মনোভাব বিষয়ে কতকগুলি বিচিত্র নিদর্শন পাওয়া যায়। গঙ্গা তাঁর সাত পুত্রকে জলে বিসর্জন দেন। অবশ্য এরা ছিল বসু (স্বর্গবাসী), অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল। এবং, তাদের শাপ কিছুটা হ্রাস করার একমাত্র উপায় ছিল সদ্য মৃত্যু, যাতে তারা অবিলম্বে স্বর্গে ফিরে আসতে পারে, এবং গঙ্গা তাই করতে অঙ্গীকৃতা ছিলেন। কিন্তু পিতা যখন সদ্যোজাত পুত্রদের তাৎক্ষণিক মৃত্যুতে শোকাবিষ্ট, তখন যে মা তাদের গর্ভে ধারণ করেছেন, প্রসব করেছেন এবং স্বয়ং ডুবিয়ে মেরেছেন, তাঁর দিক থেকে কোনও অনুশোচনা বা বেদনার কথা শুনতে পাই না। দিব্যাঙ্গনা মেনকাও তাঁর সদ্যোজাত শিশু কন্যা শকুন্তলাকে তাঁর ঋষি স্বামীর সঙ্গেই পরিত্যাগ করেছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে, যে তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছিল। মেনকা ঋষির সঙ্গে বাস করলেন একটি সুন্দরী কন্যার জন্ম পর্যন্ত। তারপরেই তিনি স্বর্গে চলে গেলেন, কারণ তাঁর কার্য সমাধা হয়েছে। *হর্ষচরিত*-এ সরস্বতীও সারস্বতের জন্ম দিয়ে তৎক্ষণাৎ স্বর্গে প্রস্থান করেছিলেন। এমনকী হর্ষের মাতা যশোমতীও আসন্ন বৈধব্যের আশঙ্কায় পুত্র হর্ষের করুণ মিনতি অবহেলা করে চিতারোহণ করলেন। সীতাও দুই শিশুপুত্র ফেলে তাঁর মায়ের কাছে চলে গেলেন। মাদ্রী দুই পুত্রকে কুন্তীর কাছে রেখে স্বামীর চিতারোহণ করলেন, কুন্তীও পুত্রদের ফেলে চলে গেলেন। পুরুরবার প্রতি উর্বশীর কামনা এতই তীব্র এবং যে কোনও রকম বাধার প্রতি এতই অসহিষ্ণু যে, তিনি নবজাত শিশুকে আশ্রমে লালিত হতে পাঠিয়ে দিলেন। মর্ত্য গণিকার প্রতীক হিসাবে উর্বশী স্বাভাবিক ভাবেই কামসর্বস্বতা এবং অপত্যস্নেহহীনতার প্রতিনিধি।

এমনকী গণিকাদেরও কোনও কোনও সময়ে সন্তান জন্মাত। ছেলেদের বলা হত বন্ধুল এবং তাদের গীতবাদ্য ও নৃত্যশিক্ষা দেওয়া হত, যাতে তারা গণিকাদের রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ে যোগ দিতে পারে। মেয়েদের গান, বাজনা, অভিনয় ও অন্যান্য সুকুমার কলা শেখানো হত, কিন্তু অধিকাংশই তাদের মায়ের জীবিকাই অবলম্বন করত, যদি না কোনও সদয় পৃষ্ঠপোষক তাদের নিষ্ক্রয় করে নিতেন। তখন সেই পুরুষেরা তাদের রক্ষিতা রাখত অথবা বিবাহ করত। যাই হোক, এই সন্তানেরা মায়ের কাছেই মানুষ হত, এবং যুক্তিসঙ্গত ভাবে ধরে নেওয়া যায়, মায়ের সঙ্গে তাদের ভাবগত যোগ থাকত।

অনেক সময়েই অনিচ্ছুক নারীদের উপর মাতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া হত। *মহাভারত*-এ অম্বিকা ও অম্বালিকা ব্যাসকে দেখে শিউরে উঠেছিলেন, কিন্তু ব্যাসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এবং তাঁর সন্তান ধারণ করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন। কোনও কোনও যাগে কুমারী, নিঃসন্তান বধূ ও সন্তানবতী রমণী— এই তিন প্রকারের দক্ষিণা ছিল; তিন শ্রেণিই গ্রহীতার সন্তান ধারণ করত। কুলজাতকে নির্বীর্য ইক্ষাকু রাজার পাঁচশো মহিষীকে প্রতি মাসে তিন রাত্রি করে যে কেউই দাবি করত তার অধীন হতে হত; এই সব রাত্রে রাজার আদেশে প্রাসাদের তোরণদ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হত। অবশ্যই অনেক অনিচ্ছুক নারীর উপরে গর্ভধারণ আরোপিত হত, গল্পে আছে, তারা বিলাপ করেছিল, বাধা দিয়েছিল এবং অবশেষে অসহায় ভাবে বশ্যতা স্বীকার করেছিল। মহাকাব্য ও পুরাণে এমন বহু কাহিনি আছে যেখানে বহু অনিচ্ছুক রমণীর উপরে মাতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতিথিদের আমোদের জন্য গৃহিণীকে দান করা হত, কখনও বা কুমারী কন্যাদের দান করা হত এবং যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলা যায়, তাদের সকলেই সেই সঙ্গীর জন্য আগ্রহী ছিল না। কোনও কোনও গল্পে বলা হয়েছে, তারা ঘৃণা করেছে, কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

মাতৃত্বের জন্য যে সরল কামনা, তা কুমারী কুন্তীর নবপ্রাপ্ত বর নিয়ে খেলা করার মধ্যে প্রকাশ পায়। তিনি যে কোনও দেবতাকে আহ্বান করতে পারতেন, এবং তাঁর আহ্বানে দেবতা আসতেন। সূর্য এসে তাঁকে একটি পুত্র দিলেন। কিন্তু বিবাহের পরে তাঁর নির্বীর্য স্বামী পাণ্ডুই তাঁকে প্ররোচিত করেন তিন ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীর কাছ থেকে প্রথম তিন পাণ্ডবকে লাভ করতে। মাদ্রীও প্ররোচিত হয়েছিলেন এবং কুন্তীর কাছ থেকে মন্ত্র শিখেছিলেন। তিনিও এই একই উপায়ে দুই পুত্র লাভ করেন। সমাজ পুত্রের উপর এতটাই গুরুত্ব দিত যে, যে ভাবেই হোক পুত্রলাভ করতে হত। সেই পুত্রেরা যে শুধু আইনসঙ্গত ছিল তা নয়, তার জন্য তাদের কোনও কলঙ্ক ছিল না, এবং উরসপুত্রের সমান অধিকারই তাদের ছিল। নিয়োগ প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। মৃত বা নির্বীর্য পুরুষের সম্পত্তির জন্য পুত্ররূপ উত্তরাধিকারী লাভের কামনাই ছিল এই প্রথার মূলে।

জরৎকারু মুনিকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা বলেছিলেন, তিনি পুত্রের জন্ম না দিলে স্বর্গে যেতে পারবেন না। তিনি তা করলেন, কিন্তু পত্নীর সঙ্গে মিলনের পূর্বে তিনি শর্ত রাখলেন যে, সামান্যতম ছল ধরে তিনি পুত্র ও মাতাকে ত্যাগ করে চলে যাবেন। অতএব পুত্র সম্পূর্ণ

ভাবে মায়েরই দায় হয়ে দাঁড়াল। পিতা পুত্রের ভরণপোষণের পর্যন্ত ব্যবস্থা করলেন না। অনুরূপ পরিস্থিতিতে শকুন্তলা তাঁর ছেলেকে নিয়ে দুষ্যন্তের সভায় গিয়ে রাজাকে পিতৃ-কর্তব্যে অবহেলার জন্য তিরস্কার করলেন। দুই রাজকুমারের মা সীতা তাদের তপোবনে প্রসব করলেন এবং ভিক্ষুকরূপে লালন করলেন, কেননা তাদের পিতা পুত্রদেরও তাদের মাতার কোনও উদ্দেশ্যই করলেন না।

সুখী পরিবারের প্রতীক শিব, পার্বতী, গণেশ ও কার্ত্তিকেয়, পরে যেখানে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে যোগ করা হয়েছে। কিন্তু পরিবারের শুরু কার্ত্তিকেয়ের জন্ম দিয়ে। শিব ও পার্বতীর মিলনের কাহিনির ভূমিকায় বলা হয়েছে, তারকাসুর দেবতাদের উত্ত্যক্ত করছিল; তখন দেবতারা ব্রহ্মার কাছে দল বেঁধে যান উপায় জানতে। ব্রহ্মা তাঁদের বলেন, কেবলমাত্র শিব-পার্বতীর পুত্রই অসুরদের বিরুদ্ধে দেবতাদের উপযুক্ত সেনাপতি। কিছু দৈব ষড়যন্ত্রের পর মহাদেব ও পার্বতীর মিলন ঘটল।

এই কাহিনির একটি অন্য রূপ হল 'রুদ্র অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে স্কন্দকে সৃষ্টি করলেন।'[৬৩] আর একটিতে বলা হয়েছে কার্ত্তিকেয়কে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের জন্য উমা অগ্নির স্ত্রী স্বাহাতে প্রবেশ করেছিলেন।[৬৪] আবারও একটিতে বলা হয়েছে, শিবের বীজ অগ্নিতে পড়েছিল, তিনি তা ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে তা গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন এবং গঙ্গাও অসহ্য তেজ সহ্য করতে না পেরে কুশের মধ্যে নিক্ষেপ করেন এবং সেখানে কৃত্তিকা ভগ্নিগণ তা লালন করেন।[৬৫] এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপের সমান ধর্ম দুটি; অগ্নি যদিও পৌরাণিক মতে শিবের অপর স্বরূপ, বীজের উৎস শিবের থেকেই। কিন্তু পার্বতীর মাতৃত্ব নিশ্চিত ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। এই কাহিনিতে এবং এর অন্যান্য রূপে যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে, তা হল কোথাও পার্বতীকে কার্ত্তিকেয়ের মাতা বলে স্বীকার করা হয়নি। আমরা যে ভাবে জানি গণেশ আংশিক ভাবে হস্তী— তাই পার্বতী যাকে জন্ম দিয়েছিলেন, ঠিক সেই পুত্র নন। সরস্বতী এথেনার মতো ব্রহ্মার মস্তক থেকে এবং লক্ষ্মী ভিনাসের মতো মথিত সাগর বেরিয়েছেন। তাই আমাদের সামনে এই বিস্ময়কর তথ্য থাকে— পার্বতী তাঁর সন্তানদের কারওরই সম্পূর্ণ ভাবে মা নন। এই ইতস্তত ভাব কেন, কেন এই ব্যাখ্যাতীত দ্বিধা? বীজ যখন শিবের, তখন কার্ত্তিকেয়ের ক্ষেত্রে তাঁর পিতৃত্ব অবিসংবাদিত— যে কার্ত্তিকেয় সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান, মহাসুর তারকের নিহন্তা, দেবসেনার সেনাপতি। কিন্তু বীজের পিতৃত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলেও তা কোনও নারীর গর্ভে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি। সোজা কথায় বলতে গেলে, কার্ত্তিকেয়ের মা হওয়ার গৌরব কোনও নারীই লাভ করেনি। লোক পরম্পরা পার্বতীকে কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে যুক্ত করলেও পুরাণ তা করেনি। মনে রাখতে হবে, ইন্দ্র-শচী ও জয়ন্ত, কৃষ্ণরুক্মিণী এবং তাঁদের পুত্রেরা— এই সব দৈব পরিবারগুলিও শিব, পার্বতী ও তাঁদের সন্তানদের তুলনায় নিতান্তই ফিকে। কিন্তু জীববিদ্যাগত দিক দিয়ে এটি যথার্থ পরিবার নয়।

মনে হয়, এর কারণ নিহিত আছে প্রজননে যৌনসঙ্গীর ভূমিকা বিষয়ে সমাজের অবচেতন ধারণায়। বৈদিক আর্যেরা যখন ভারতবর্ষে এসেছিল, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে,

তখন তারা নিজেরা পশুপালক যাযাবর মানুষ ছিল। তারা তাদের পশুপালের মধ্যে প্রজনন ক্রিয়া দেখত এবং জীবতত্ত্বগত প্রজননের মৌলিক জ্ঞান তাদের ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে দেশীয় কৃষিজীবী মানুষেরা ছিল। আর্যেরা তাদের কাছ থেকে কৃষিশিক্ষা করেছিল, যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করেছিল এবং শিকার ও পশুপালন আহার্য সংগ্রহের একটি পরিপূরক উৎস হিসাবে বজায় রেখেছিল। পশুপালক সমাজে সমগ্র পশুপালক, তা পুরুষই হোক বা স্ত্রী, প্রভুর সম্পত্তি এবং নবজাত বৎসগুলিও স্বাভাবিক ভাবে তারই হত। কৃষিতে যৌথ প্রভুত্ব আছে; ভূমির প্রভু সব সময়ে বীজের প্রভু নয়। তাছাড়া ভূস্বামী সব সময় নিজের জমি চাষ করে ফসল তোলে না। সমাজের অর্থনীতির নানা স্তরে ভূমির, বীজের এবং শ্রমের ভিন্ন ভিন্ন প্রভু ছিল। *মহাভারত*-এ একটি উপাখ্যান আছে, এখানে পৃথিবী চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঈশ্বরের কাছে আসেন, বিক্রয় এবং হস্তান্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে। মনে হয় প্রাচীন যুগে ভূমির প্রভুত্ব অপরিচিত ধারণা ছিল; ভূমি কর্ষিত হত মানুষের খাদ্য যোগাতে।[৬৬]

পার্বতীকে কার্ত্তিকেয়ের মাতৃত্ব প্রদান করার বিষয়ে পুরাণবিদের অনীহা হল কার্ত্তিকেয়ের একমাত্র পৌরাণিক জনক হিসাবে শিবকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি পন্থা। যে বীজ পার্বতীর গর্ভে আগুন ছিল তা তিনি ছুঁড়ে ফেলতে সোনা হয়ে গেল; তা গঙ্গাকে তীব্র ভাবে দহন করল যতক্ষণ না তিনি তা কুলের ঘাসের উপর ছুঁড়ে ফেললেন, এবং দেবমাতা কৃত্তিকারা তা লালন করলেন। ভাষার ইঙ্গিত ভেঙে বোঝা যায়, শিবের বীজের উন্নততম শক্তি, অসহনীয় সৃষ্টির উত্তাপ, পার্বতী, গঙ্গা— এমনকী কৃত্তিকারা, যাঁরা ধারণ করেনি— এঁদের নিষ্ফল প্রয়াস। অবশেষে তা প্রায় স্বকীয় ভাবেই কুশের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, যদিও দেবমাতারা প্রায় দাসীর মতোই তাকে লালন পালন করেছিলেন। এই উপাখ্যান পিতা-মাতার ক্রমিক অবস্থান সম্বন্ধে সমাজের মনোভাবের বিষয়টিকে আমাদের কাছে সরাসরি নিয়ে আসে। বীজটি যদিও অবিসংবাদিত ভাবে শিবের, গর্ভ পার্বতীর নয়, অন্য কোনও নারীরও নয়। পার্বতী বীজটিকে নিক্ষেপ করেন; গঙ্গা, যিনি পৌরাণিক মতে মহাদেবের অপর ভার্যা, তা ধারণ করতে পারেননি, এবং কৃত্তিকারা ধাত্রীমাত্র।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে আর্যেরা কৃষিজীবী হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাদের জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি কৃষিজীবীরই দৃষ্টিভঙ্গি। পিতামাতা বিষয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত ভাবেই পুরুষতান্ত্রিক। নারী ক্ষেত্র, পুরুষ তার মধ্যে বীজ বপন করে। এই দৃষ্টি প্রধান ভাবে পিতৃতান্ত্রিক, যেহেতু ক্ষেত্র ও বীজ উভয়েই পুরুষের, অতএব পুত্র প্রধানত পিতারই। মনু এ ব্যাপারে নিষ্ঠুর ভাবে স্পষ্টবাদী: 'বীজ এবং গর্ভের মধ্যে বীজই উৎকৃষ্ট। সব প্রাণী বীজের ধর্ম গ্রহণ করে।'[৬৭] 'গর্ভের ধর্ম বীজের হয় না।'[৬৮] তবে সন্তান কার? এ ব্যাপারেও মনু স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন: 'যেমন গবাদি পশু, অশ্ব, উট, দাসী, মহিষ, ছাগ ও মেয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ সঙ্গীরা বৎসের অধিকারী হয় না, নারীর ক্ষেত্রেও তাই।'[৬৯] 'স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষ যদি পুত্রের জন্ম দেয়, তখন ক্ষেত্র বীজের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং পুত্র তখন স্বামীর, জন্মদাতার নয়।'[৭০] এখানে অবশ্য জন্মদাতা না স্বামী, কে পুত্রের অধিকারী সে বিষয়ে মতভেদ আছে।[৭১] 'নারী ক্ষেত্র,

পুরুষ বীজ।'[৭২] পত্নী থাকার উদ্দেশ্য কী? 'পুত্রের জন্ম, শিশুর লালন-পালন, দৈনন্দিন সেবা, সব কিছুই পত্নীর উপর নির্ভর করে।'[৭৩] আর সবচেয়ে বড় কথা, মনু স্পষ্ট ভাবে বলেছেন: 'নারীর সৃষ্টি কেবলমাত্র জন্ম দেওয়া, তাই তারা পূজ্যা, গৃহের আলো।'[৭৪] সুতরাং নারীর সৃষ্টি জন্ম দিতে, পুরুষের সৃষ্টি বংশ রক্ষা করতে।

এই সব ধারণাগুলো যেহেতু সমাজ চেতনায় গভীর ভাবে প্রোথিত ছিল, অতএব মাতৃত্বের ভাবনা কয়েকটি বিশেষ ব্যঞ্জনার অধিগ্রহণ করে: শিশুর জন্মবিষয়ে, কেবলমাত্র প্রসবের সময় ছাড়া, নারীর ভূমিকা কৃষিক্ষেত্রের মতোই নিষ্ক্রিয়। যেমন কর্ষণের পর উপ্ত বীজ আপনা থেকেই বৃদ্ধিলাভ করে ক্ষেত্রের দৃষ্ট ও সক্রিয় প্রচেষ্টা ছাড়াই, তেমনই মাতাও নিষ্ক্রিয় ভাবে বীজ ধারণ করত।[৭৫] ভ্রূণ নিজে নিজেই বাড়ত। ফসল কাটার সময়ে যেমন ক্ষেতের মালিক, যে সম্ভবত বীজ বপনকারীও বটে, এসে ফসল সংগ্রহ করে নিয়ে যায়, তেমনই স্বামী শিশুকে দাবি করে। ক্ষেত্রের মূল্যবোধও এই ধারণায় সমর্থন পায়: গোবৎস, মহিষ, উট, ঘোড়া, ছাগ, মেষ, এদের বৎসরা তাদের জন্মদাতার নয়, পালের মালিকের। এই তালিকায় দাসীর অন্তর্ভুক্তি সমাজে তার যৌন অবস্থান সম্বন্ধে যে মনোভাব তা মর্মন্তুদ ভাবে পরিস্ফুট করে। সে তার প্রভুর পরিবারের সব পুরুষ সদস্যের সহজ ভোগ্যা। তার পুত্র যদি তার স্বামীর সন্তানও হয়, সে তারও নয়, তার স্বামীরও নয়, তার প্রভুর— ক্ষেতে বা কারুকর্মে উৎপাদনমূলক শ্রমে বাড়তি বাহুবল হিসেবে।

মানুষের উৎপাদনের উপায় নিয়ন্ত্রিত করতে এবং তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সেই উপায়গুলি নিবেদন করতে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছিল তার (নারীর) শরীরের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার বিস্তৃত করতে। তাই সে তার নিজের শরীরের উপর প্রভুত্ব হারিয়েছে।[৭৬] নারীর নিজের দেহের উপর অধিকার হারানোর যুগ্ম প্রমাণ হল, দাসীই হোক আর পত্নীই হোক, তাকে তার প্রভু বা স্বামীর যৌন দাবি মেটাতে হত এবং তার গর্ভের ফলের প্রভু হত সে নয়, তার স্বামী বা প্রভু। তাকে প্রায়ই যৌন সংসর্গে বাধ্য হওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করতে হত, দীর্ঘ মাসের পর মাসব্যাপী গর্ভধারণের কষ্ট সহ্য করতে হত, তীব্র গর্ভযন্ত্রণা, লালন-পালন, উদ্বেগ, শিশুকে স্তন্যপান করানো, অসুস্থতায় ও আঘাতে তার সেবা করা সবই করতে হত। কিন্তু শেষ পর্বে শিশু তার নয়, তার স্বামী অথবা প্রভুর।

তা সত্ত্বেও কিন্তু মাতৃত্বের মহিমা উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে লাগল; যে বাস্তবকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হত, এ তারই ভাবগত এবং মানসিক ক্ষতিপূরণ। এখানে, ভারতবর্ষে, মাতৃত্বকে ততটাই মর্যাদা দেওয়া হত, যত পরিমাণে সমাজে নারীর অবস্থার অবনতি ঘটছে। *ঋগ্বেদ*-এর দেবমণ্ডলী প্রধানত পুরুষবহুল।[৭৭] ক্রমশ পরবর্তী শতাব্দীগুলি ধরে দেবতাদের বিবাহিত রূপে দেখানো হতে লাগল, যেহেতু ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের সময় থেকেই সমাজে বিবাহ আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু মহাকাব্য ও পুরাণ-সাহিত্যে তাঁদের পুত্রসন্তান জন্মাতে লাগল। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সমাজে সর্বব্যাপী প্রয়োজন হয়ে উঠল, যে সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পুত্রদের নানা প্রকারভেদ স্বীকার করা হত।

তখন দেবী মাতারাও তাঁদের স্বামীদের নামে পরিচিত হতে লাগলেন। সামাজিক বাস্তব তত দিনে নারীকে সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ জননীর ভূমিকায় ঠেলে দিয়েছে। নারী হিসেবে, সামাজিক জীব হিসেবে, স্বাধীন চিন্তা, কর্ম ও ভাবনা বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে তার যে নিজ সত্তা, তা সে খুইয়েছে। যদি সামগ্রিক ভাবে নাও হয়, অন্তত প্রধান ভাবে সে শুধুই মা, পুত্রসন্তানের জন্মদাত্রী।

ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দীর আশপাশে তন্ত্রের প্রভাব ভারতে অনুভূত হতে লাগল। তন্ত্রে আবার নারীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই সপ্তম শতাব্দীর এক প্রধান গদ্য কবি বাণভট্ট যে দেবী চণ্ডীর উদ্দেশে গদ্যে স্তুতি রচনা করেছেন, তা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। অন্যেরাও তাঁর অনুসরণ করলেন এবং একটি সম্পূর্ণ স্তোত্রসাহিত্য সৃষ্টি হল, যা দেবীদের স্তুতি করে। সপ্তমাতৃকাকে মূর্তিতে পূজা করা হত। তাঁদের কীর্তিকলাপ সৃষ্টি করা হল এবং এই দেবীদের যে সাম্প্রদায়িক পূজা, তার উদ্দেশ্যে গুচ্ছ গুচ্ছ উপকথা তৈরি হল। এই ভাবে মাতৃকারা কেমন ভাবে তাঁদের সন্তানদের লালন-পালন ও উদ্ধার করেন, তারই গুরুত্বহীন কিছু উপকাহিনি সৃষ্টি হল। দৈবস্তরে মাতৃত্বের এই উন্নয়নের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলেছিল মানবিক স্তরে। নারীর অস্তিত্বের একমাত্র হেতু ছিল মাতৃত্ব। 'নারীদের পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ভূমিকায় এবং তারই মাধ্যমে জীবন কাটাতে অনুপ্রেরিত করা হত এবং মাতা হিসেবেই সর্বাগ্রে তাদের স্তুতি করা হত।'[৭৮] এই ব্যাপার অন্যত্রও ঘটেছিল। 'ভিক্টোরীয়রা অশান্তি বোধ করে অনেক সময়ে এই অনুভূত শক্তিকে যুক্তিসম্মত করত— মাতৃত্বের আত্মত্যাগমূলক ও লঘু পাক পূজনীয়তায় নারীত্বকে গুলে।'[৭৯]

শুধু যে নারীর উপর অনেক সময়ে মাতৃত্ব আরোপিত হত, তাই নয়, নারীরা বাধ্য হত মাতৃত্বকে তাদের জীবনের মূল তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে; তারা বন্ধ্যাত্বের নিন্দা করত এবং গর্ভকে ফলপ্রদ করার জন্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করত। পুরুষের বীর্যহীনতা আবছা ভাবে মাত্র জানা ছিল, নারীরাই সব সময়ে সন্তানহীনতার জন্য সামাজিক ভাবে ও মানসিক ভাবে মূল্য দিত। নারীরাই আবার দুর্ভাগিনী বন্ধ্যা রমণীকে দোষ দিত ও ব্যঙ্গ করত, কারণ নারীরা পুত্রধারণের গুণ বিষয়ে পুরুষের সামাজিক মূল্যবোধ অন্তঃসার করেছিল। তাই প্রতিটি বালিকাকে দেখা হত পুত্রসন্তানের ভাবী মাতা হিসেবে, তাকে এই দৈব কর্তব্য পালন করার জন্য শিক্ষা দেওয়া হত এবং তৈরি করা হত এবং যদি সে এ কাজ সম্পন্ন করতে না পারত, তবে সেটা তারই দুর্ভাগ্য; সে নিজে এবং সমাজ তাকে মনে করত সম্পূর্ণ রূপে অশুভ, অসম্পূর্ণ এবং নিষ্ফল জীব। 'নারীর মাতৃত্ব ছিল লিঙ্গগত কর্ম বিভাগের প্রধান হেতু এবং নারীর উপর পুরুষের শাসনেরও প্রধান হেতু।'[৮০]

নারীর প্রতি এবং মাতা হিসেবে তার ভূমিকার প্রতি যে মনোভাব, সেটা যে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত, তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। যখন কৃষিপ্রধান সমাজে কৃষিকর্মের জন্য আদিম যন্ত্রাদি ব্যবহার করা হয় এবং কৃষিকর্মের নানা প্রাকৃতিক বিপাকের কারণে ভাল ফসল হওয়ার কোনও স্থিরতা থাকে না, তখন সেই সমাজে চাষবাসের জন্য অনেকগুলি

জাতের প্রয়োজন হয়। সেখানে সম্পত্তি রেখে যাওয়ার জন্য পুত্রেরও প্রয়োজন হয়। প্রাসঙ্গিক ভাবে, সেখানে কন্যাসন্তানেরও প্রয়োজন আছে, যে কন্যারা বিবাহ করে সন্তানের জন্ম দেবে। তাই মূলত নারীর উর্বরতার উপরে বিশাল গুরুত্ব দেওয়া হত এবং এ কথা অনুমান করলে ভুল হবে না যে, নারীরা নিজেরাই প্রথম পর্বে উর্বরতাকে শক্তিরূপে ব্যবহার করেছিল। বহুবিবাহের পরিবারে সন্তানের মাতা তার বন্ধ্যা বা নিঃসন্তান সপত্নীর তুলনায় সামাজিক উৎকর্ষ ভোগ করত এবং তার গর্ব করত। বহু অনুষ্ঠানে যে নারীর স্বামী-সন্তান বেঁচে আছে, তারই শুধু অধিকার ছিল। সন্তানবতী নারী কিছু কিছু সুবিধা ভোগ করত, যা থেকে নিঃসন্তান নারী বঞ্চিত হত। মহাকাব্য ও পুরাণ সাহিত্যে অনেক পুরুষই তার মায়ের নামে পরিচিত। কিন্তু যে সমাজে বহুবিবাহ আছে, সেখানে মাতৃনামের ব্যবহার পুত্রের স্পষ্ট পরিচয়ের একটি পদ্ধতি। তাহলেও তা মায়ের সঙ্গে পুত্রের যোগ নির্দিষ্ট করত এবং অন্তত বুদ্ধিগত ভাবেও তাদের ও মাতৃত্বের সামাজিক স্বীকৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করত। কিন্তু মায়ের সামাজিক বন্দিত্ব তার শক্তিকে হরণ করে নিয়েছিল এবং স্বার্থসাধনে তার উর্বরতাকে ব্যবহার করেছিল। তাই এর পক্ষে মাতৃত্ব মানে সহজ সরল যন্ত্রণাভোগ, কারণ সে শেষ পর্যন্ত তার গর্ভের সন্তানকে নিজের বলে দাবি করতে পারত না। এই প্রক্রিয়ায় সে কষ্ট পেত, কিন্তু অবশ্যই ভাবগত ভাবে কিছু সুখ পেত, তার উর্বরতা এবং তার থেকে উদ্ভূত তার পবিত্রতার সামাজিক স্বীকৃতি রূপে।

'নারীর মাতৃত্ব এবং তার থেকে সুখ পাওয়ার ক্ষমতা প্রবল ভাবে অন্তঃসারকৃত হয়েছে এবং মনস্তাত্ত্বিক ভাবে চাপানো হয়েছে ও বিবর্তনমূলক ভাবে নারীর মনস্তাত্ত্বিক গঠনে গ্রথিত হয়েছে।'[৮১] এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি মায়ের ব্যবহারের কাঠামো গঠিত করে। নারীর উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক অনুরপ্রেরণা পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, গ্রহণ করেছিল এবং নিজেদের অজান্তে অন্তঃকৃত করেছিল নারীরাই। এই অন্তঃকৃত করার আর একটি সহায়ক ছিল। বিবাহিতা নারীর শিক্ষার সুযোগ অস্বীকার করা হয়েছিল। নিজস্ব কোনও পেশা, স্বাধীন সামাজিক বা রাজনৈতিক অস্তিত্ব অধিকাংশ সুকুমার কলা এবং বহু বিনোদন থেকে সে বঞ্চিত ছিল। গর্ভধারণই একমাত্র পথ যা তার কাছে খোলা ছিল, যার মাধ্যমে সে তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে পারে এবং পারিবারিক ও সামজিক আবেষ্টনে কিছু সম্মান পেতে পারে। জীবিকা উপার্জনের সুযোগ থেকে নারীকে বঞ্চিত করে তাকে অবদমিত করে রাখা সম্ভব হয়েছিল। তার স্বামী তার প্রভু।[৮২] তাই তারা তাদের রুটি-রোজগারকারীর উপর নির্ভরশীল ছিল, মনে করত, স্বামীর সন্তান ধারণ করে তারা প্রভুর কিছুটা ঋণ শোধ করছে।

আর্যরা যখন উত্তর ভারত জয় করেছিল, সেই দেশের কিছু মানুষকে দমন করা বা ক্রীতদাস বানানো হয়েছিল, বাকিরা বিন্ধ্য অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিল। যারা পালিয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়ে দাসে পরিণত হয়। নবোদ্ভূত সমৃদ্ধ শ্রেণিতে দাসেদের ব্যবহার করা হত গৃহে কর্মে, গ্রিস ও রোমের মতো সামাজিক উৎপাদনমূলক কাজে নয়।

গৃহকর্মের অনেকটা অংশ দাসেদের হাতে যাওয়ায় এই সব গৃহের নারীরা সমস্ত উৎপাদনমূলক কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং কিছুটা নিষ্প্রয়োজন হল, ফলে তাদের একমাত্র সামাজিক প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়াল সন্তানের জন্ম দেওয়া, যা কোনও প্রাচীন কালে সামাজিক উৎপাদনমূলক ছিল। কারণ, আমরা দেখেছি, সমাজে এই পর্বে অর্থনীতি চালু রাখার জন্য বেশি সংখ্যক হাতের প্রয়োজন হত এবং উদ্বৃত্ত তৈরি করার জন্যও তার প্রয়োজন ছিল।

পুরুষ সমাজ শাসন করত, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের ভূমিকা নির্ধারণ করত। নারীর প্রধান কাজ যখন হয়ে দাঁড়াল সন্তানধারণ, তখন তারা যন্ত্রণারই ভাজন হল এবং পরিবর্তে সম্মান বা ক্ষতিপূরণ সামান্যই পেল। 'পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অধিকাংশ নারীর কাছে মাতৃত্ব ছিল যন্ত্রণা ও বঞ্চনা।' বস্তুত মাতৃত্ব ছিল 'পুরুষের নিয়ন্ত্রণের যে সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তারই ভিত্তিপ্রস্তর... নারীর বন্দিত্বের তথ্য শুধু নয়... কিন্তু যে পদ্ধতিতে এই তথ্য অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল নারীর ওপর পুরুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যবস্থায়।'[৮৩]

প্রাচীন ভারতে মাতৃত্বের ট্রাজেডি ছিল, বিকল্পহীন যে জোর নারীর উপর খাটানো হয়েছিল সেইটা। আর এই জোর ছিল সমাজে সেই সব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির ফল যে শক্তিগুলির উপরে নারীর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পুরুষ উত্তরোত্তর লাভবান হচ্ছিল এবং তার প্রত্যক্ষ সহকারী হিসেবে নারীর তদনুযায়ী ক্ষতি হচ্ছিল। মাতৃত্ব যে আনন্দময় হতে পারে, যখন নারী নিজে তা চায় এবং গর্ভধারণ ও প্রসবের কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হয় এই আশায় যে দম্পতির কিছুটা যৌথ নিয়ন্ত্রণ থাকবে সন্তানের উপর, কন্যাসন্তান যে পুত্রের মতোই সুখকর এবং আনন্দদায়ক হতে পারে, মা যে নিজের ইচ্ছায় কষ্ট সহ্য করেছে একটি জীবনকে পৃথিবীতে আনার জন্য, তাই কিছু সম্মান তার প্রাপ্য— এ সব কথা প্রাচীন ভারতে কোনও মা ভাবতেই পারত না। সে শুধু তার উর্বরতার গর্ব করত— যে শক্তি মানবেতর প্রাণীরও আছে— কিন্তু তার কষ্টের জন্য কোনও স্বীকৃতি প্রত্যাশা করত না। তার আনন্দ, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার স্বপ্ন, সবই শিশুর মধ্যে বদ্ধ যতদিন সে সাবালক হয়ে না ওঠে এবং তার পরেও ভিন্ন স্তরে। সন্তানকে আনার 'ইচ্ছা' থেকে সে বঞ্চিত, শিশুর মানসিক লালন-পালন ও শিক্ষাদান থেকে সে বঞ্চিত, সে শুধুমাত্র গর্ভধারণের যন্ত্রে পর্যবসিত। যাজ্ঞবল্ক্য-র স্ত্রী শাসনের বিধানের কথা আগেই বলেছি। এই পুরুষেরাই সমাজের চরিত্র গঠন করে। এই ধরনের শাস্ত্র যৌন সংসর্গে নারীর স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, তাকে স্বামীর যেমন খুশি ব্যবহারের যন্ত্র করে তোলে। তাই গর্ভাবস্থা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সে কি এমন গর্ভাবস্থা উপভোগ করতে পারে, সে কি সামান্যতম আনন্দের সঙ্গে সন্তানের জন্মের প্রতীক্ষা করতে পারে? সত্য কথা, সব গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে এটা ঠিক নয়, কিন্তু মহাকাব্য ও পুরাণে বহু অংশে অনিচ্ছুক নারীকে পুরুষের যথেচ্ছ ব্যবহারের কথা বলা হয়। এ রকম মাতৃত্ব আপনা থেকেই বোঝা হয়ে উঠত, অত্যাচার হয়ে উঠত। যুগ্ম ভাবে প্রাণ সৃষ্টি করা

সন্তানকে লালন-পালন করা, সমস্যা ভাগ করে নেওয়া, দু'জনে মিলে বাধা ডিঙোনো, এ সব গ্রন্থে নেই। মায়েরা শৈশবে শিশুর কাছাকাছি আসতে ও থাকতে বাধ্য হত যেহেতু পিতারা তাদের বাইরের জীবিকা ও দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকত। তাই সন্তানেরা স্বভাবতই মাকে বেশি ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনত। 'সন্তান পালনের ব্যাপারে নারীর সামগ্রিক অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে পিতা অনেক পরে উল্লেখযোগ্য এবং পরিচিত একটি সত্তা হয়ে উঠত।'[৮৪]

তা সত্ত্বেও কিন্তু যে মুহূর্তে পুত্রের দৈনন্দিন শারীরিক প্রয়োজনে মায়ের উপর নির্ভরশীলতা শেষ হত, তখন থেকেই সে তার পিতার উত্তরাধিকারী এবং কন্যা যখন শারীরিক ভাবে মায়ের উপর নির্ভরশীল থাকত না, তার অল্প পরেই তাকে বিবাহ দেওয়া হত। তখন মা একা হয়ে যেত, যদি না সে একটি গর্ভ থেকে আর একটি গর্ভে চলে যেত— যা প্রায়ই ঘটত। তারপর একটা সময় আসত যখন পরস্পর সন্তান ধারণ এবং গৃহকর্মের ফলে তার যৌবন ও রূপ চলে যেত; তখনই তার স্বামী আরও তরুণী, আরও সুন্দরী এক নারীকে ঘরে আনত, যে স্বামীকে খুশি করবে এবং তার সন্তান ধারণ এবং রক্ষা করবে। পূর্ব স্ত্রীর কোনও কোনও সন্তান, বিশেষ করে পুত্রসন্তান, ঘরে থাকবে এবং পিতার আচরণ থেকে দাম্পত্য জীবনের একটি ছক অন্তঃস্থ করবে। তারা বুঝবে এবং তাদের বৃদ্ধা মা বুঝবে, যে মা হওয়ায় মানসিক কোনও নিরাপত্তা আসে না, সে শুধুমাত্র সন্তান জন্মের যন্ত্র, যাকে অনায়াসে ত্যাগ করা যায়, যখন তার প্রধান উৎপাদনমূলক কাজে সে ব্যর্থ হয়। তাই মাতৃত্বের মধ্যে ছিল সংশয়, উদ্বেগ, অনিরাপত্তা এবং শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, তার পরিবর্তে সামান্যই ক্ষতিপূরণের সুখ। এ কথা সত্য যে তাকে খেতে পরতে দেওয়া হত আশ্রয় দেওয়া হত, এমনকী যৌন বিষয়ে তার স্খলন হলেও তার পুত্র তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করত এবং তার জন্য প্রার্থনা করত। স্বামীর মৃত্যু হলে পুত্রেরা ধর্মগত ভাবে মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিত। কিন্তু তার স্বামীর জীবদ্দশাতেও যেহেতু সে সামাজিক সম্মান অল্পই পেত, তাই পুত্রেরা যে তাকে সম্মান দেখাতে বাধ্য ছিল না, এমন অনুমান কিছু উদ্ভট নয়। এটাই প্রাচীন ভারতে মাতৃত্বের প্রধান ব্যঙ্গাত্মক দিক। নারীকে মানুষ করা হত এই ভাবনায় যা তাকে শিক্ষা দিত, সে ভাবী মাতা। বালিকা কাল থেকে তাকে এই সামাজিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করা হত।

তা সত্ত্বেও, যেমন কৃষিকর্মে থাকে, তেমনই ক্ষেত্র কর্ষনের জন্য অনুষ্ঠান থাকত— পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, ইত্যাদি। কিন্তু কোনওটিতেই গর্ভবতী নারীর সুস্বাস্থ্য, সুখ বা দীর্ঘজীবনের জন্য কোনও প্রার্থনা নেই। এ রকম প্রার্থনা করা হয় পিতার জন্য, যার এ সবের প্রয়োজন নেই, এবং ভ্রূণের জন্য, যার অবশ্য প্রয়োজন আছে। কিন্তু মাতা, ক্ষেত্র, তার পরে অবজ্ঞাত হয়, যত দিন না তার প্রসব হয়। মা শুধু গর্ভধারণের যন্ত্র, বেশিও নয়, কমও নয়। শিশুর আবির্ভাবের জন্য সে অত্যাবশ্যক, কিন্তু শিশু তার পিতার, যার একটি প্রার্থনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'আমার থেকে জন্ম, অঙ্গ থেকে অঙ্গ, তুমি আমার হৃদয় থেকে জন্মেছ, পুত্র, তুমি আমারই স্বরূপ।' এখানে ভ্রূণের বৃদ্ধির ব্যাপারে মায়ের অবদান সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত এবং

শিশুর মানসিক বৃদ্ধির বিষয়ে তার ভূমিকার কোনও স্থানই নেই। এতে তার সঙ্গে শিশুর মানসিক যোগসূত্রও ছিন্ন করা হয়, অন্তত ভাবগত ভাবে। নবজাতকের হৃদয় শুধু তার পিতার এটাই দাবি। ক্ষেত্র যেমন ফসল উৎপাদন করে, কিন্তু তার উপর তার অধিকার নেই, তা ভোগ করতেও পারে না, তেমনই মাকে দেখা হত তেমনই অসার। তাই ফসল তোলার পর অনায়াসে তাকে ভুলে যাওয়া যেত।

দুটি ভাবগত অসাধারণ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। প্রথমটা হল 'মাতা সহস্র পিতার সমান' এই ধরনের বক্তব্য। যে শারীরিক জনন ছাড়া পিতা তাঁর সম্পত্তি হিসেবে পুত্রকে পান না, এ সেই তথ্যেরই উদ্দেশ্যে স্তুতি। কতকটা ক্ষতিপূরণও বটে, কারণ আরও উক্তি আছে, 'মাতৃভক্তির দ্বারা পুত্র পৃথিবী লাভ করে, পিতৃভক্তির দ্বারা স্বর্গলাভ করে।' এর মধ্যে পিতা-মাতার ভিতরে সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য পরিস্ফুট হয়। তাছাড়া মায়ের তুলনায় বাবাকে উচ্চাসনে বসাবার সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রয়োজন সত্ত্বেও বাস্তবজীবনে মায়ের নিঃস্বার্থ সেবা নিঃসন্দেহে তাকে তার সন্তানদের কয়েকজনের কাছে অন্তত অনেক উঁচুতে তুলে দিতে বাধ্য এবং এরই প্রকাশ ঘটেছে মাকে সম্মান দেওয়ার বিধানে।

দ্বিতীয় পার্থক্য হল মাতৃকাদের অস্তিত্ব, যা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজ মাতৃগণের সামাজিক বিড়ম্বনার ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করেছে। এই মাতৃকাদের অধিকাংশের সন্তান আছে, কিন্তু উপকাহিনিতে মাতা ও শিশুর রূপ বিশেষ দেখানো হয়নি, কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গিতে ছবি ও মূর্তিতে ছাড়া। এই মাতৃকারা সর্বশক্তিময়ী, অসুর হননে শ্রেষ্ঠ; অন্তত যে অশুভ শক্তি ক্ষতি করে বলে ভাবা হয়, তাঁরা তাকে খর্ব করেন। স্তোত্রে তাদের স্তুতি করা হয় সন্তানদের রক্ষা করার জন্য। যখন আর্ত তাঁদের কাছে আসে, তাঁরা বর দেন এবং আর্তি দূর হয়। অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের মর্ত্য সন্তানদের কাছে সাক্ষাৎ কর্ত্রীর চেয়ে বরং ঘটয়িত্রী। তাঁরা বর ও শাপের মাধ্যমে কাজ করেন, অর্থাৎ ইচ্ছামূলক উক্তির দ্বারা। এ দিক দিয়ে তাঁরা মর্ত্য মায়েদের থেকে ভিন্ন, যে মায়েদের ইচ্ছা ও উক্তি সাধারণত সম্পূর্ণ নিষ্ফল। তাঁরা তাঁদের সন্তানদের জন্য যা চান তা ঘটে না, যখন মায়েরা সক্রিয় ভাবে সন্তানের মঙ্গল চেষ্টা করছেন, তখনও না। প্রধান পার্থক্য অবশ্যই এই মাতৃকারা পুরোপুরি মুক্ত, স্বাধীন কর্তা, কিন্তু মর্ত্য মায়েরা স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি ও অন্যান্য গুরুজনের অধীন, এমনকী বার্ধক্যে পুত্রেরও অধীন। এছাড়া এবং এরই ফলে, মর্ত্য মায়েরা মাতৃকাদের অতিলৌকিক শক্তির অধিকারী নন, এমনকী লৌকিক শক্তিরও অধিকারী নন। স্বামী ও গুরুজনের অধীন, প্রত্যক্ষ কর্ত্রী হিসেবে সম্পূর্ণ শক্তিহীন মর্ত্য মায়েরা ক্ষমতাহীনতার বেদনা ভোগ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাতৃকা পূজকেরা দেখান, তাঁরা ভাবগত ভাবে মাকে কত উচ্চে তুলেছেন। যা তাঁরা সত্যি সত্যি তুলেছেন, তা হল 'মাতৃত্বের ভাবনা'। একে সেই স্তরে তুলেছেন যেখানে তাঁরা অসুরদমন করেন, প্রলয় রোধ করেন, যেমন পূর্বে পুরুষ দেবতারা করেছেন।

অভাগিনী মর্ত্য মায়েরা কি মাতৃকার মূর্তি ও উপকাহিনি থেকে কোনও সান্ত্বনা বা মানসিক পুষ্টি পেতে পারেন, যে মূর্তি পুরুষ দেবতাদের শক্তিরূপে সৃষ্টি করেছেন। মূল কল্পনাটি

আসে সাংখ্যদর্শন থেকে, যেখানে পুরুষ নিষ্ক্রিয় ভাবে তার সঙ্গিনী প্রকৃতিকে দিয়ে কাজ করায়। তন্ত্র এই দর্শনকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে, যখন শক্তি একাই উল্লেখযোগ্য এবং শক্তিময়ী দেবী হয়ে উঠেছে। ইতিহাসে মাতৃকাদের উন্নয়ন ও মর্ত্য-মায়ের অবস্থার ক্রমিক অবনমনের মতো বিরাট পার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠে। এই দু'টি ঘটনা কুড়িটি ধর্মশাস্ত্র এবং শাস্ত্রগ্রন্থ নিবন্ধের মাঝখানে ঘটেছে। সমাজে নারী হিসেবে, স্বাধীনচেতা কর্ত্রী হিসেবে সামাজিক সত্তা হিসেবে, মুক্ত যৌনসঙ্গী হিসেবে, শিশু পালনে সম-দায়িত্বশীল মাতা হিসেবে, সন্তানের গড়ে-ওঠা ও বৃদ্ধিতে সব সিদ্ধান্তে সহযোগী হিসেবে তার অবস্থান সমানেই নেমে গেছে। মর্ত্য-মা সন্তানের জন্য যা করে দেবী তা করে না: মর্ত্য-মা ন'টি কষ্টদায়ক মাস ধরে ভ্রূণকে গর্ভে ধারণ করে এবং প্রবল যন্ত্রণায় তাকে প্রসব করে; সে শিশুকে স্তন্য দান করে, খাওয়ায়, তার কাপড় বদলায়, তাকে ঘুম পাড়ায়, তার সব শারীরিক প্রয়োজন দেখাশোনা করে, রোগে সেবা করে। অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ এই শারীরিক কাজগুলি থেকে মাতৃকারা দেবী হিসেবে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত। কিছুদিন পরে যখন পিতা দায়িত্ব নেয়, মা তখন নীরব ও কতকটা সুদূর দর্শক হয়ে থাকে, পরিবর্তে খুব কমই দাবি করে: ক্বচিৎ আনুষ্ঠানিক সম্মান, বার্ধক্যে ভরণপোষণ এবং প্রয়োজন মতো পৌত্রপৌত্রীদের দেখাশোনা। মাতৃকা কিন্তু ভাবগত ও মানসিক স্তরে তার সন্তানদের সঙ্গে যুক্ত হয়, প্রায়ই সম্মান ও পূজা পায় এবং বিপদের সময়ে তারা বিপদ দূর করতে শক্তিময়ী বররূপা বাণী উচ্চারণ করে। অপর দিকে তারা দৈবস্তরেও সক্রিয়। যেখানে পুরুষ দেবতারা প্রলয় রুখতে নিষ্ফল হয়। মাতৃকারা সেখানে সফল। এই মহতী মূর্তিগুলির সঙ্গে কি কোনও মর্ত্য মাতা সম অনুভূতি বোধ করতে পারে, না নিজেকে এই দেবী রূপে প্রকাশ করতে পারে?

এদের স্থান দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিতে: একজন তার গুরুতর রূপে সীমিত সাংসারিক প্রদেশে, যেখানে সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পিতার আয়ত্তে বলে তার সন্তানদের মঙ্গলের জন্যও নিজের ইচ্ছা খাটাবার স্থান নেই; তাকে কোনও পর্যায়ে তার মত জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করা হয় না, কিন্তু দেবী মায়ের ইচ্ছা মহাবিশ্বের স্তরে সৃজনশীল। মাতৃকা তার কাজ করে কোনও ব্যথা ছাড়াই, দৈব আনন্দে; মর্ত্য মাতা মাতৃত্ব শুরু ও শেষ করে ব্যথার মধ্যে। পুত্র তার শিক্ষা ও জীবিকা শুরু করলে, কন্যার বিবাহ হয়ে গেলে, মা ফিরে যায় তার একাকিত্বের বাঁধা গুটিতে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আবার গর্ভধারণ না করে। তার মাতৃত্ব তাকে কয়েক মাস আনন্দ দেয়, যতদিন তার শিশু খুব ছোট আছে, তার প্রতি নির্ভরশীল আছে। কিন্তু শীঘ্রই— বড়বেশি শীঘ্র, এই সংক্ষিপ্ত মুক্তির কাল শেষ হয়ে যায় এবং মাতৃত্বের উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে নিশ্চিত ভাবে মিলিয়ে যায়।

সূত্রাবলি

১. আলতেকার ১৯৫৬: ১০১
২. *হিরণ্যকেশিন গৃহ্যসূত্র* ১:৬:২২:১৪
৩. স্তোত্র তৃতীয়: ২৩; পঞ্চম: ২৫; এবং ষষ্ঠ: ১১

৪. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ* ষষ্ঠ: ৪ষ৪; ১৩। ১৯-২২

৫. *হিরণ্যকেশিন গৃহ্যসূত্র* দ্বিতীয়: ১:২

৬. *গোভিলা গৃহ্যসূত্র* দ্বিতীয়: ৭:১-১২; *খাদিরা গৃহ্যসূত্র* দ্বিতীয়: ২:২৪-২৮

৭. *ভরদ্বাজ গৃহ্যসূত্র* ১:২:১

৮. ঐ ১:১৭

৯ *সামবর্ত সমহিতা* ২০; ৪

১০. ১.১১.৪

১১. দশম: ৮৬; ২৩

১২. এই শাস্ত্রীয় আচারটি সামান্য কিছু পরিবর্তিত হয়ে *অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র* ১; ১৪, ১-৯, *আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র* চতুর্দশ: ১-৮; *হিরণ্যকেশিন গৃহ্যসূত্র* দ্বিতীয়: ১; *বৌদ্ধায়ন গৃহ্যসূত্র* প্রথম ১:১০; *পরাশর গৃহ্যসূত্র* প্রথম ১:১৫; *ভৈখানাসা গৃহ্যসূত্র* তৃতীয়: ১২; এবং *কথক গৃহ্যসূত্র* একত্রিশতম: ১-৫, এ-অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৩. ষষ্ঠ: ১১:১

১৪. সমস্ত প্রকার গর্ভধারণ সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল পুত্র সন্তানের জন্মদান নিশ্চিত করা। এখানে সামাজিক চাহিদার ব্যাখ্যা করে সেই অনুসারে ব্যাখ্যায়িত করা হয়েছে।

১৫. আচার অনুষ্ঠানের নামটি গুরুত্বপূর্ণ; শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল অজ্ঞাত কাউকে লোভী না করা।

১৬. *আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র* চতুর্দশ: ১৩-১৫; *হিরণ্যকেশিন গৃহ্যসূত্র* দ্বিতীয়. ২:৮-১১· ৩:১; *ভরদ্বাজ গৃহ্যসূত্র* ১·২২, *গোভিলা গৃহ্যসূত্র* ১১:৭:১৩-১৪, *খাদিরা গৃহ্যসূত্র* ১১ ২·২৯, ৩০; *পরাশর। গৃহ্যসূত্র* ১:১৬; *কথক গৃহ্যসূত্র*-তে ত্রিশতম· ১-৩, *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*-এর চতুর্থ ভাগের: ৪:২৩ অংশে এর উল্লেখ আছে।

১৭. *পরাশর গৃহ্যসূত্র* প্রথম: ১৬; *আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র* দ্বিতীয়: ১৩:৭-১৪ এবং *ভরদ্বাজ গৃহ্যসূত্র* প্রথম. ২৩।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এগারো সংখ্যাটি যা হল রুদ্রদের সংখ্যা। যে সকল দেবতারা যারা সাধারণত ভ্রূণ এবং সদ্যজাত শিশুদের ক্ষতিসাধন কবে থাকে। মহাভারতের ত্রয়োদশ খণ্ডে রুদ্র শিবের সঙ্গী সাথীদের বিবরণ দেওয়া আছে। এদের কেউ কেউ ভ্রূণের মাংস খায়। অন্যরা সদ্যজাত শিশুদের খেয়ে থাকে।

১৮. প্রাচীন মিশরীয় এবং ব্যাবেলনীয় ধর্মীয় আচার এ ধরনের বিশ্বাসের ধারণা বিদ্যমান। অভিভাবকের কাছে।

১৯. কার্তুমাস্য থেকে

২০. *শতপথ ব্রাহ্মণ* দ্বিতীয়: ৫:২.২০

২১. *জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ* সপ্তদশ, ৩:১

২২. *শতপথ ব্রাহ্মণ* ষষ্ঠ: ২:৩:১৩; পঞ্চম: ৩:১:১৩

প্রজনন বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্বপ্রদানের ফলে একটি ধারণা সৃষ্ট হয়েছে যে একজন মহিলা নিঋতি তাতে ভর করেছে। আত্মায় এক অশুভ ধারণা যা কিনা অত্যন্ত কুৎসিত, শত্রুপরায়ণ। যার বিশেষ কাজই হল সমস্ত রকম শুভ বিষয়কে ধ্বংস করা। নিঋতি-ব ধারণা সম্পর্কে জানতে আমার *দ্য ইন্ডিয়ান থিওগনি*, পৃষ্ঠা ৮০-৯২, ১২৯, ১৬২-১৬৩ দেখুন। বন্ধ্যা মহিলাকে নিঋতি কর্তৃক নিদান এমন একটি কথা সামাজিক অবগুণ্ঠিত মানসিকতা থেকে সৃষ্টি হযেছে যে মহিলাদের সমাজের প্রাথমিক দায়িত্ব হল সন্তান ধারণ করা। আমরা পববর্তীকালে বিষয়টিতে আসব।

২৩. আমাদের এই জরুরি বিষয়টি থেকে দৃষ্টি ফেরালে চলবে না যে এই অংশটিতে সমস্ত আচাব-অনুষ্ঠানের লক্ষ্যই হল পুত্র সন্তান লাভ। সম্পূরক পাঠ্যে বলা হয়েছে একই আচাব বাল্য সন্তানরে জন্য পালন

করা যেতে পাবে, তবে মন্ত্রোচারণ চলবে না। অর্থাৎ, আচার পালনের সময় কোনও রকম পবিত্র পাঠ্যসমূহ উচ্চাবণ করা যাবে না।

২৪. *বৌদ্ধায়ন ধর্মসূত্র* দ্বিতীয়: ৪-৬; *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* দ্বিতীয়; ৫:১১-১৪; *যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা* প্রথম: ৭৩-৮১; *মনুসংহিতা* নবম· ৪

২৫. *বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র* আঠাশতম. ২-৩

২৬. *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* তৃতীয় ২৪ ২৭, *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* প্রথম ১০.৫১-৫৩।

২৭. ষষ্ঠী হল ছয কৃত্তিকার অন্যতম দেবতা। দুলা, নিতাতনি, কুপুনিকা, অভ্রবন্তি, মেঘবন্তী এবং বর্ষাবন্তী। এব মধ্যে কোন তিনটি প্রত্যক্ষ ভাবে বৃষ্টিব সঙ্গে সংযুক্ত তা তাদের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়। প্রথম তিনটি সম্ভবত প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের পৌরাণিক কাহিনি থেকে গৃহীত এবং তা অনেকখানি একই অর্থে। উদাহবণস্বরূপ, আরবি ক্রিয়াপদ 'দিলি' বা ভর্তি করা থেকে গৃহীত। অন্য দুটির এখনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি, যাই হোক, কৃত্তিকার সঙ্গে ষষ্ঠীর সম্পর্কটি তার প্রজনন প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরে। যেখানে বৃষ্টিপাত হল পৌরাণিক প্রতীক।

২৮ আগ্রহেব বিষয হল তাব নাম দেবসেনা, স্বর্গীয সেনা। স্কন্ধেব স্ত্রী। স্কন্ধ হল ছয় মুখ বিশিষ্ট স্বর্গীয সেনাপতি যাব সৃষ্টি হযেছিল তারকা রাক্ষসীকে বধ কবতে। সুতবাং ষষ্ঠী সন্তানসম্ভবা বা বাস্তবিক মাযেদের সঙ্গে গভীব ভাবে সম্পর্কিত। ষষ্ঠী ব্রত (ষষ্ঠীর উপাসনা) মাযেরা পালন করেন পঞ্চম দিনে এবং সূর্যের উপাসনা কবা হয পরবর্তী দু' দিনব্যাপী। *মৎস্যপুবাণ* একশত একতম· ১-৮৩।

২৯. *ভবিষ্যপুরাণ*, উত্তরাখণ্ড

৩০. ব্রতখণ্ড দ্বিতীয ৩১৫-১৮

৩১ *ভবিষ্যপুবাণ* পঞ্চম ৩১৩

৩২ ধাবণাব সৃষ্টি হযেছে এই ভাবে যে যেহেতু দুর্বা প্রভূত পবিমাণে উৎপন্ন হয সুতবাং মহিলাদেব বহু পুত্রলাভ সম্ভব হবে।

৩৩. ব্রতখণ্ড প্রথম ৫৭২

৩৪. *মৎস্য পুরাণ* একশত একতম. ২৯-৩০, বিষ্ণুধর্মোত্ত পুবাণ তৃতীয়· ১৮৯:১-৫

৩৫. হিমাদ্রি ব্রতখণ্ড দ্বিতীয় ১৭১-৭২, কর্তকল্পতরু, ৩৭৪-৭৫

৩৬ হিমাদ্রি, বচনায় উল্লিখিত, দ্বিতীয় ২৩১-৩৩

৩৭. *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ* দ্বিতীয় ৫৫: ১-১২, পুত্রিযাসপ্তমী (রচনায় উল্লেখিত, ব্রতখণ্ড প্রথম: ৭৮৯৮-৯০)

৩৮. *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ষষ্ঠ. ৫·১০.৩; মৈত্রযানী সংহিতা: চতুর্থ:৬.৪

৩৯. মাযেদের পানীয় আচার সম্পর্কে উপবের অংশটি দেখুন

৪০. *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* সপ্তম ৩:৭ ১৩

৪১. *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*. ১৭৩:১০

পরবর্তীকালে এই প্রবণতা অন্য পুস্তিকাতেও লক্ষণীয। বিষয়টি আংশিক ব্যাখ্যা করা যেতে পাবে দেশে প্রচলিত পণপ্রথার মাধ্যমে, যা অভিভাবকদেরকে আর্থিক সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেয। যদিও মহাভারতেব এক জায়গায় বলা হয়েছে যে লক্ষ্মী কন্যাসন্তানদেব মধ্যেই বিরাজ করে (দ্বাদশ: ১১:১৪; এছাড়া *বিষ্ণুস্মৃতি* ৯৯.৪,) কিন্তু তা কোনও ভাবেই সাধারণ সামাজিক প্রবণতাকে বোঝায় না।

৪২. *মহাভারত* চতুর্থ. ২২:১৭

৪৩. *সংযুক্ত নিকায়* প্রথম ৬.৪

৪৪. *বশিষ্ঠ সংহিতা* সপ্তদশ. ৩

৪৫. বচনায় উল্লেখিত, পদ্য ৫৫; *মহাভারত* পঞ্চম ৮৮ ৬৮

৪৬. *মনুসংহিতা* নবম: ১৬৮

৪৭. দশম: ১৭১
৪৮. *মনুসংহিতা* দ্বিতীয়: বচনায় উল্লেখিত ১৪৫
৪৯. রচনায় উল্লেখিত, দ্বিতীয়. ২৩৩
৫০. *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* প্রথম. ১০:২৮:৯
৫১. *বৌদ্ধায়ন ধর্মসূত্র* দ্বিতীয়· ২.৪৮
৫২. *বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র* একাদশ· ১০, ত্রযোদশ ৪৭; *বিষ্ণু ধর্মসূত্র* সাতান্নতম ১-৫
৫৩ ৫৭তম ১-৫
৫৪. *অত্রি সংহিতা* ১৫১
৫৫. *মহাভারত* প্রথম ৩৭:৪
৫৬ *মহাভারত* ত্রয়োদশ ২৬৮:৩০
৫৭. *অমিতায়ুর্ধ্যানসূত্র*
৫৮. *হিরণ্যকেশিন গৃহ্যসূত্র* দ্বিতীয. ৪:১০·৭, *মনুসংহিতা* নবম ১৮
৫৯ *বিষ্ণুসংহিতা* একত্রিশতম ১·৩
৬০ রচনায উল্লেখিত পঞ্চম ৩৪
৬১ *অত্রিসংহিতা* ১৮৬ এবং অন্যত্র
৬২. *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি* প্রথম: ৭২
৬৩ *মহাভারত* তৃতীয ২২৮· ৩০-৩১
৬৪. বচনায উল্লেখিত, তৃতীয় ২৩০· ৯-১১
৬৫. *মহাভারত*-এর লাতিন সংস্করণ নবম ৪৪। যখন অগ্নি গঙ্গাব কাছে বীজ প্রদান কবে, তখন গঙ্গ অজ্ঞান হযে পড়ে। জলেব অন্য জীবেবা গভীব আর্তনাদ কবে ওঠে এবাব সে সেই বীজ ধাবণ কবতে অস্বীকাব কবে। (লাতিন সংস্কবণ ত্রযোদশ ৮৫ ৫৫-৮২)
৬৬ স্তোত্র ত্রযোদশ. *অথর্ববেদ*-এর প্রথম সংখ্যা। প্রাচীন কিন্তু ইতোমধ্যে জমিব পরিবর্তিত চিত্র।
৬৭ নবম ৩৫
৬৮. নবম ৩৭
৬৯. নবম ৪৮
৭০ নবম ৫২
৭১. দশম ৩২
৭২. নবম· ৩২
৭৩ নবম. ২৭
৭৪. নবম ২৬
৭৫. নবম. ৯৬
৭৬. সাদবি ১৯৮০· পৃ ৬৩
৭৭. চার্বাক ৮২ ৬১
৭৮ রচনায় উল্লেখিত, পৃ ২১৯
৭৯. চোদরভ· ১৯৭৮· ৯৪
৮০. চোদবভ: ১৯৭৮: ৩৯
৮১. আইনস্টাইন. ১৯৮৮:৭১
৮২. ইংবাজি lord কথাটি এসেছে half (loaf) + ward থেকে— যার অর্থ কটি জোগায় যে।
৮৩ *বৃহদারণ্যকোপনিষদ* ষষ্ঠ ৪:৭
৮৪. ১৯৮৮:৮১

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস

(ক) বৈদিক গ্রন্থ

ঋগ্বেদ সংহিতা
তৈত্তিরীয় সংহিতা
মৈত্রায়ণী সংহিতা
অথর্ববেদ সংহিতা
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ
শতপথ ব্রাহ্মণ
বৃহদারণ্যকোপনিষদ
গোভিল গৃহ্যসূত্র
ভরদ্বাজ গৃহ্যসূত্র
জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র
শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র
আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র
হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র
বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র
পরাশর গৃহ্যসূত্র
বৈখানস গৃহ্যসূত্র
কাঠক গৃহ্যসূত্র
আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র
বিষ্ণু ধর্মসূত্র
আপস্তম্ব ধর্মসূত্র
বৌধায়ন ধর্মসূত্র
বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র

(খ) মহাকাব্য ও বৌদ্ধ গ্রন্থ

মহাভারত (পুণা ক্রিটিকাল এডিশন)
সংযুত্ত নিকায় (পালি টেক্সট সোসাইটি সংস্করণ)
অমিতায়ুর্ধ্যানসূত্র

(গ) পুরাণ

মৎস্য পুরাণ
ভবিষ্য পুরাণ
বিষ্ণু ধর্মোত্তরপুরাণ

(ঘ) ধর্মশাস্ত্র

বিষ্ণু সংহিতা
বিষ্ণুস্মৃতিকা বা বিষ্ণু ধর্মসূত্র
বশিষ্ঠসংহিতা
সংবর্ত্ত সংহিতা

(ঙ) পরবর্তী গ্রন্থ

ধর্মক্রিয়াকৌমুদী

কৃত্যাকল্পতরু

অভিজ্ঞানশকুন্তলম (সম্পাদনা: আর বসু)

নীলমত পুরাণ

বাণভট্টের *হর্ষচরিত* (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংস্করণ)

গৌণ উৎস

আন্তেকর, এ. এস ১৯৫৬: *The Position of Women in Hindu Civilisation*, দিল্লি।

আর্ডনার, ই. ১৯৮০: *Perceiving Women*; লন্ডন।

অযেববাখ, এন. ১৯৮২: *Women and the Demon*; হার্ভার্ড যুনিভার্সিটি প্রেস।

বোভয়া, এস ডি, ১৯৫৩: *The second sex*; নিউইয়র্ক।

বার্নাল, এস. ১৯৮৭. *The Afro-Asiatic Roots of Classical Civilisation*, প্রথম খণ্ড, লন্ডন ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন বুকস।

ব্রিফল, আর ১৯৫৯: *The Mother*, জি আর টেলরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ম্যাকমিলান।

চোদোরভ, এন ১৯৭৮ *The Reproduction of Mothering Psychoanalysis and the Sociology of Gender*, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।

আইজেনস্টাইন, এইচ. *Contemporary Feminist Thought*; আরউইন পেপার ব্যাকস, প্রথম খণ্ড, ১৯৮৪, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৮।

ফক, এন. এ. ১৯৮০ *Unspoken Worlds Women, Religious Lives in North Western Cultures*, সান ফ্রানসিসকো।

গৌর, এ. ১৯৭৫: *Women in India*, লন্ডন।

হল, ই টি ১৯৬৬: *The Hiden Dimension*, নিউইয়র্ক।

লাজার, জে ১৯৭৬: *The Mother Knot*, নিউইয়র্ক।

লিখট, এইচ. ১৯৬৩. *Sexual Life in Ancient Greece*.

লুহান ও মার্শাল, ১৯৬৭. *The Mechanical Bride*, বস্টন।

প্লেটো *Laws*

রিখটার, ডি ১৯৭১: "The Position of Women" in *Classical Journal*, ৬৭নং।

রাডিক, এস ১৯৮০: ৩৪২-৬৭: Maternal Thinking in Feminist Studies, ৬নং, ২নং গ্রীষ্ম।

সাদর্বি, এন. ও অন্যান্যরা, ১৯৮০: *The Hidden Face of Eve*, জেড প্রেস।

সেন্টমান, সি. ১৯৫৬: *Women in Antiquity*, লন্ডন।

প্রাচীন ভারতে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

বৈদিক সাহিত্য (বিশেষ করে ঋগ্বেদ সংহিতা) সাধারণ ভাবে সে যুগে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে নীরব। যদিও পুরুষের অর্থনৈতিক অবস্থান, তাদের জীবিকা ও সম্পদ সম্বন্ধে কিছু তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু নারীর সম্বন্ধে অল্পই জানা যায়। আমরা জানি বৈদিক নারীরা পশম পাকাত ও সম্ভবত বুনত, জল আনত, পশুপালন করত, কিন্তু কেবলমাত্র খোরপোষ বাদে তারা এই সব কাজের জন্য কিছু উপার্জন করত কি না তা জানতে পারি না। নিঃসন্দেহে নারীরা গৃহকর্ম করত; রান্নাঘর ও শিশুপালন তাদেরই এক্তিয়ারে ছিল, কিন্তু এখনও যেমন হয় তখনও সেই কাজগুলির অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোনও হিসেব হত না, ফলে কোনও মাইনে দেওয়া হত না। কুমারীর কোনও পৃথক সত্তা ছিল না; সে তা এক ভাবে পেত কেবল বিবাহের পরে। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে স্পষ্ট ভাবে পুত্রকে বর এবং কন্যাসন্তানকে অভিশাপ বলে অভিহিত করা হয়। তাই স্নেহশীল পিতামাতা বাদে অন্য সকলে কন্যাকে, খুব কম করে বললেও, উৎপাত মনে করত। বিবাহের সময়ে দান করে দেওয়ার আগে পর্যন্ত গৃহে তার উপস্থিতি কোনও রকমে সহ্য করা হত।

পরবর্তী এক সংহিতায় কিন্তু অত্রি বলেছেন, পিতার, ভ্রাতার বা পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তিতে কুমারীর অধিকার আছে।[১] এই সম্পত্তি বিক্রি করার, বাঁধা দেওয়ার বা নিজের বলে ভোগ করার সম্পূর্ণ অধিকার তার ছিল। অবশ্যই আমরা এখানে প্রৌঢ়া কুমারী— কুলপা কুমারী, অমাজু বা অমাজুরার কথা চিন্তা করছি। 'সাংকৃত্যায়নী' বা 'পণ্ডিত কৌশিকী', উপনিষদের ব্রহ্মবাদিনীর আধ্যাত্মিক মানসকন্যা, যাদের কাছে সম্পত্তির অধিকার, বিক্রয় বা বন্ধকের কোনও গুরুত্ব ছিল না তাঁরা সাহিত্যে উল্লিখিত। হয়তো আরও কোনও কোনও প্রৌঢ়া কুমারী থাকত, যারা না ছিল পণ্ডিত, না করত ধ্যান, যাদের অর্থের প্রয়োজন ছিল জীবনধারণের জন্য, হয়তো ভাল ভাবে ও স্বাধীন ভাবে জীবনধারণের জন্য। এমনও হতে পারে যে কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের সম্পত্তির উপর অধিকার ছিল। কিন্তু অত্রিও সম্পত্তি দান করার অধিকারের কথা কিছু বলেন না। আমরা পরে এই বিষয়ে আসব।

'যে কুমারীকে বিক্রি করা বা কেনা হয়েছে, তাকে কখনও স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা যায় না।'[২] এর থেকে প্রমাণ হয়, কুমারীদের বেচা-কেনা চলত। কিছু শাস্ত্রগ্রন্থের মতে, অত্যন্ত দুর্গতির অবস্থায় পিতামাতা উভয়ের সম্মতিতে তা সম্ভব হত। কুমারী হিসেবে যে স্ত্রী কেনা হয়েছে, তার গর্ভস্থ পুত্রসন্তান পিতার শ্রাদ্ধাদিকর্মের অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হত। বিবাহের কারণে কুমারীর সতীত্ব, অর্থাৎ সামাজিক দৃষ্টিতে তার কৌমার্যের অক্ষমতা, যথেচ্ছ ভাবে কলুষিত

করা যেত না। যে ঈর্ষাবশত তা করে তাকে ২২৫ পণ দণ্ড দিতে হয়।[৩] অতএব তার সামাজিক মর্যাদার অর্থমূল্য ছিল। যে দোষযুক্ত কন্যার দোষগুলি ঢাকা দিয়ে বিবাহ দেয়, তার বরকে ৯৬ পণ দণ্ড দিতে হত।[৪]

'যে দ্বিজ তার পত্নীর বান্ধবীকে (মনে হয় কুমারী) জানে... তাকে সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করতে হবে এবং একটি দুগ্ধবতী ধেনু দান করতে হবে।'[৫]

মনু অনুজ্ঞা দিয়েছেন, ব্রাহ্মণ ভাইয়েরা তাদের পৈতৃক সম্পত্তির তাদের যে ভাগ তার এক চতুর্থাংশ করে পৃথক পৃথক ভাবে তাদের অবিবাহিতা ভগ্নিকে দেবে। তা না করলে তাদের সর্বনাশ হবে।[৬] গৌতম বলেছেন, অবিবাহিতা কন্যারা যদি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় তবে তারা মায়ের মৃত স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।[৭] অবিবাহিতা কন্যার ভাইয়েরা মাতার মৃত্যুর পূর্বে না পরে তার স্ত্রীধন দেবে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* এবং তাঁর বহু পূর্বে *তৈত্তিরীয় সংহিতা* (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী) অনুসারে: 'স্ত্রিয়ো নিরিন্দ্রিয়া অদায়াদীঃ'[৮], অর্থাৎ সাধারণ ভাবে নারীরা (বিশেষ করে ভগ্নিরা) পারিবারিক সম্পত্তির ভাগে অনধিকারী।[৯]

কুমারীর বাগ্‌দত্ত পতি মারা গেলে সে শুধু তার পিতারই। কুমারী যদি বলপূর্বক অপহৃতা হয় এবং অপহরণকারী তাকে বিবাহ না করে, তবে আইনত অপরেব সঙ্গে তার বিবাহ হতে পারে।[১০] 'নববধূ কুমারী কন্যা, রুগ্না অন্তঃপুরিকা, গর্ভিণী-গৃহস্থ অতিথিকে ভোজন করাবার পূর্বে এদের ভোজন করাতে পারে।'[১১] কন্যাদের কখনও কখনও কিছু শিক্ষা দেওয়া হত, যদিও বৈদিক শিক্ষা থেকে তারা বঞ্চিত ছিল; *ভরদ্বাজ গৃহ্য সূত্র*-তে কোনও কন্যাকে বিবাহ করার বিষয়ে চারটি আগ্রহের কারণ দেখানো হয়েছে— ধন, রূপ, বুদ্ধি ও বংশ।[১২] বুদ্ধির পরিবর্তে মানব গৃহসূত্রে বিদ্যা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*-এ পণ্ডিতা কন্যালাভের জন্য অনুষ্ঠানের নিয়ম আজ।[১৩] এই সব শাস্ত্রগ্রন্থের থেকেই গার্গী, সুলভা, প্রমুখ বিদুষী নারীদের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু যদিও বৈয়াকরণ শিক্ষয়িত্রী নারী বোঝাতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ তৈরি করার নিয়ম করেছেন,[১৪] তাঁরা শিক্ষার দ্বারা উপার্জন করতে পারতেন কি না তা জানবার আমাদের কোনও উপায় নেই। খুব সম্ভব না, কিন্তু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। একটি অত্যন্ত অর্বাচীন তান্ত্রিক গ্রন্থ বলে, 'গৃহস্থের উচিত পুত্রের মতো কন্যাদেরও সমান শিক্ষা দেওয়া।'[১৫]

আট ধরনের বিবাহের কয়েকটিতে বধূর পিতা বরের আত্মীয়দের অর্থ দিত; কেবলমাত্র আসুর বিবাহে বরের পিতা মাতা পণ দিত। আসুর বিবাহে বর নিজের কামনা চরিতার্থ করতে বধূর পিতাকে এবং বধূকেও পণ দেয়।[১৬] ব্রাহ্ম, দৈব ও আর্য বিবাহে বধূর পিতা নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী ধন, অলংকার, একজোড়া বলদ এবং অন্যান্য উপহার দেবে। ব্রাহ্ম বিবাহে প্রসাধিতা ও সুসজ্জিতা কন্যাকে দান করা হত, আর্য বিবাহে বধূকে সম্প্রদান করা হত বরকে একটি বলদ ও একটি গরু বা দুটি বলদ ও দুটি গরু দান করার পরে।[১৭] এই প্রথার প্রতি তৎকালীন সামাজিক জুগুপ্সার প্রকাশ হয় আসুর নামটায়। কিন্তু বিবাহের সময়ে

যখন অর্থদান হত তখন বধূ বা তার পিতামাতাই তার সুযোগ পেত। যাকে স্ত্রীধন বলে, তা তিন প্রকারের: পণ, যা দিয়ে বধূকে কেনা হত; যৌতুক, অর্থাৎ বিবাহের সময়ে আত্মীয়-বন্ধুরা বধূকে যে উপহার দিত এবং সৌদায়িক অর্থাৎ বধূ বা বরের গৃহে আত্মীয় বন্ধুদের বধূকে বা দম্পতিকে দেওয়া উপহার। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন: নারীকে তার বন্ধু, মাতা, স্বামী বা ভ্রাতা যা দেয়, তা হল স্ত্রীধন।[১৮] তার আত্মীয়স্বজন (অর্থাৎ তার পিতামাতার সঙ্গে সম্বন্ধীয় ব্যক্তিরা) এবং তার স্বামী অথবা পিতার পরিবার তাকে বিবাহের পর শুল্ক স্বরূপ যা দেয়, তাও স্ত্রীধন।[১৯] স্পষ্টতই সে সময়ের সমাজ বরের কাছ থেকে বধূর পিতা যে অর্থ নেবে এটা পছন্দ করত না। মনু বলেছেন, জ্ঞানী পিতা কখনওই কন্যাশুল্ক নেবে না, কারণ লোভবশত কন্যাশুল্ক নিলে সে তার সন্তানকে বিক্রি করছে।[২০] এমনকী গোমিথুন বা বলীবর্দযুগল (কন্যার পিতা বরের কাছ থেকে গ্রহণ করলে) তাও কোনও কোনও শাস্ত্রগ্রন্থে পণ বলে গণ্য হয় ('পণ গ্রহণ করা, তা বহুমূল্যই হোক বা অল্প মূল্যই হোক কন্যা বিক্রয়ের সমান')। লক্ষ্য করা যায়, বরকে পণ দেওয়ার প্রথা ছিল— স্পষ্ট ভাবেই হোক বা গূঢ় ভাবেই হোক; কিন্তু বরের পিতার পণ নেওয়ার বিরুদ্ধে কোনও শাস্ত্র নেই, কেউ এই আদান-প্রদানকে বিক্রি বলে না, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা বিক্রয়ই।

'কন্যাশুল্কের বিরুদ্ধে এই যে নির্দেশ, তার দ্বারা সূচিত হয় বরপণের সপক্ষে পুরোমাত্রায় ঝোঁক। এটা কুষাণ যুগের সংস্কৃতায়নের একটি অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ— যে সময়ে মনুসংহিতার প্রথম সংস্করণ রচিত হয়েছিল। আধুনিক পণ সম্পূর্ণ ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কর্তৃক শৃঙ্খলমুক্ত শক্তিগুলির কার্য।'[২১] 'পণপ্রথা অসাম্য, অনিশ্চয়তা ও আকস্মিকতার দ্বারা নিরূপিত।'[২২] বরের জন্য পণ হল hypergamy (উচ্চতর বিবাহ প্রথা), 'যা ক্রমিক স্তর বিশিষ্ট বর্ণগুলির মধ্যে ব্যাপক; উচ্চতর শ্রেণিগুলিতে প্রধানত পণ এবং নিম্নতর শ্রেণিগুলিতে প্রধানত কন্যাশুল্ক এবং পণ ও কন্যাশুল্ক দুটিই সামাজিক প্রতিষ্ঠাকামী মধ্যস্তরের পরিবারগুলিতে ব্যাপক।'[২৩]

পণই হোক বা কন্যাশুল্কই হোক— তা সমাজে সম্পন্নতার পরিচায়ক, কিন্তু বরপণ কন্যাশুল্কের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু কন্যাশুল্ক গ্রহণের এই যে অনিচ্ছা, তা মনে হয় অনেকগুলি সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। সম্পন্নতা যার ফলে বধূর পরিবার পণ দিতে পারে, তা তো বটেই, এটি ইঙ্গিত দিতে পারে ব্যাপক যুদ্ধের অবসানের, যে যুদ্ধ পুরুষের সংখ্যা হ্রাস করছিল, উচ্চতর বিবাহ প্রথার কামনা, সম্পদ দিয়ে সামাজিক সিঁড়িতে উপরে ওঠা এবং শেষ পর্যন্ত এর ভিত্তি হয়তো এমন কোনও ধারণা, যাতে বধূর পিতা বুঝতে পারছিল যে সে যা পণ হিসেবে খরচ করেছে তা তার পুত্রের বিবাহের সময়ে আদায় করতে পারবে। এই প্রথা অবশ্যই ইঙ্গিত করে নারীর সামাজিক অবনমনের, কারণ যখন একজন পুরুষ একটি কুমারীকে বিবাহ করে এবং তাকে চিরকৌমার্যের লজ্জা থেকে উদ্ধার করে, তখন কন্যার পিতার তাকে কিছু মূল্য দিতে হয় এই উপকারটুকুর জন্য। আড়ম্বর এবং জাঁকজমক দেখাবার বাসনাও এখানে ছিল। খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীগুলির সময়ে সমাজের উপর যাঁর প্রভাব ভগবদগীতা এবং বাৎস্যায়নের সঙ্গে সমান ভাবে প্রবল ছিল সেই মধু দুই

সহস্র বছর ধরে সমাজ নিয়ন্ত্রিত করেছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিবাহের বিবরণ দিয়েছেন, যার প্রথম তিনটিতে কন্যার পিতা পণ দেয়, বরকে উপহার দেয়; কেবলমাত্র আসুর বিবাহে এর বিপরীতটাই ঘটে। এর নিচ অর্থে ব্যবহৃত নাম 'আসুর' হয়তো দ্রাবিড় অঞ্চলে এর উদ্ভবের সূচনা করে— যেখানে দুশো বছর পূর্ব পর্যন্তও এটি ব্যাপক প্রচলিত প্রথা ছিল।

কিন্তু 'কন্যাশুল্ক' অর্বাচীন বৈদিক যুগ থেকে নিয়মিত প্রথা হিসেবে গৃহীত হয়ে এসেছে। আমরা শুনি, 'ইন্দ্র তুমি ঈষৎ ত্রুটিগ্রস্ত জামাতা বা শ্যালকের তুলনায় অনেক বড় দাতা।'[২৪] অতএব ত্রুটিযুক্ত বরেরা অর্থমূল্য ক্ষতিপূরণ দিত। কন্যাশুল্কের সঙ্গে পণকে মেলানোর এক প্রচেষ্টা দেখা যায় আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে (২:৬:১৩:১০:১১)। সেখানে বলা হয়েছে, 'এ বিষয়ে ক্রয়-বিক্রয় বলে কিছু নেই। বিবাহকালে একশত মহারথী দিতে হবে, এবং তারপর তাদের দাতার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।' এখানে ক্রয় শুধুমাত্র প্রশংসার উক্তি; সম্বন্ধের মূল ধর্ম। কৌটিল্য বলেছেন, 'ম্লেচ্ছদের পক্ষে কন্যাবিক্রয় নিন্দনীয় নয়।'[২৫] যাজ্ঞবল্ক্য খুব যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলেছেন, পুত্র বা কন্যা, কাউকেই বিক্রয় করা যায় না।[২৬] এই অংশের উপর মিতাক্ষরা টীকায় বলা হয়েছে 'যদিও কেউ তার পত্নী বা কন্যাকে বিক্রয় করতে পারে না, তবুও সে তাদের প্রভু।' মনে পড়ে, পুত্র শুনঃশেফকে পিতা বিক্রয় করতে পেরেছিলেন, কিন্তু কন্যা বিক্রয়েরও উদাহরণ আছে।

পণের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বধূর ভরণপোষণের মূল্য হিসেবে। এই মত যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ বধূ তার সংসারের কাজকর্মে সাহায্য করে এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও উৎপাদন করে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটি কন্যাদানের দক্ষিণা। এ কথাও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তথাকথিত দক্ষিণা সামাজিক অস্তিত্বহীন নারীর দানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। এসথার বোসরাপ বলেন যে, বাইরের জগতের উৎপাদনশীল শ্রমশক্তির থেকে নারীকে সরিয়ে নেওয়ার পর পণ এল ক্ষতিপূরণ হিসেবে, কারণ তাদের জায়গায় পুরুষদের পারিশ্রমিক দিয়ে আনতে হল।[২৭] এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের কিছুটা উপাদান থাকতে পারে। পণ স্ত্রীধন নয়, কারণ এটি বরের পিতার প্ররোচনায় দেওয়া হয়। এম এস শ্রীনিবাস বলেন, 'ভারতীয় উপদ্বীপ ছিল ব্রাহ্মণদের নিয়ে কন্যাশুল্ক এলাকা; সেখান থেকে তা উচ্চতর বিবাহ প্রথার প্রতি এবং সামাজিক উন্নতির প্রতি আকাঙ্ক্ষাবশত উত্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।'[২৮]

এখন বধূর পিতা যে পণ দিত তা বর ও তার পিতাকে দেওয়া হত, ফলে তা স্ত্রীধনের অংশ কোনও মতেই হত না; তার ব্যবহার বা অপব্যবহার সম্বন্ধে স্ত্রী কোনও কথাই বলতে পারত না। যদি বর কন্যাশুল্ক দেওয়ার পরে ভাবী বধূ মারা যেত, তাহলে সে যা দিয়েছে তা ফিরিয়ে নিত।[২৯] অপরার্কের একটি অর্বাচীন গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলা হয়েছে 'সৌদায়িকের উপর স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকার'— এমনকী স্থাবর সম্পত্তি হলেও সে তা বেচতে বা দান করতে পারে। সে তা অবিকৃত রাখতে পারে; তার স্বামী, পুত্রেরা, তার বা তার স্বামীর ভাইয়েরা তা গ্রহণ করতে বা দান করতে পারে না; তার উপর নারীর সম্পূর্ণ অধিকার। কিন্তু তার আত্মীয়-বন্ধুরা বিবাহের সময়ে তার পিতৃগৃহে যা দেয় তা নির্বাচিত ভাবে যৌতুক, এক

শ্রেণির স্ত্রীধন, এবং যা দম্পতিকে বধূ বা বরের গৃহে দেওয়া হয় তা সৌদায়িক এবং তার অন্তত অর্ধেকের উপর বধূর অধিকার। মনু আরও বলেছেন, 'যে নারীর স্বামী দ্বিতীয় বার বিবাহ করে, তার সমান পরিমাণ ধন (প্রথমা স্ত্রীকে) উচ্ছিন্ন করার জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হবে, যদি তাকে স্ত্রীধন না দেওয়া হয়ে থাকে। যদি দেওয়া হয়ে থাকে, তবে অর্ধেক দিতে হবে।'[৩০] কিন্তু 'পুত্রহীনা পুত্রিকার মৃত্যুর পরে তার স্বামী তার সমস্ত সম্পত্তি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবে।'[৩১] বিষ্ণু কিন্তু বলেছেন যে অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি তার স্ত্রীগামী হয়, তারপর তার কন্যারা, তারপর তার ভ্রাতারা এবং তারপর তার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তা পায়।[৩২]

এই সব গ্রন্থে আমরা সামাজিক নিয়ম ও মনোভাবের নানা স্থানীয়, আঞ্চলিক ও কালিক ব্যতিক্রম পাই। কোনও কোনও শাস্ত্রকার অপরদের চেয়ে একটু বেশি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। কিন্তু সাধারণ চিত্রটা স্ত্রীদের পক্ষে আশাহীন ও নির্মম। স্বামী তার পরবর্তী বিবাহের সময়ে তাকে যা দেয় তা সম্পূর্ণ ভাবে তার নিজস্ব। নারদ বলেন, দ্বিতীয় বিবাহের সময়ে স্বামী তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ তার স্ত্রীকে দেবে এবং সেই সম্পত্তি তার নিজের মতো ব্যবহার করার স্বাধীনতা স্ত্রীর আছে— অন্তত পুঁথিগত ভাবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, দুর্ভিক্ষ, অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, রোগ বা তা নিজের কারারুদ্ধ থাকার সময়ে ছাড়া স্বামীর স্ত্রীধন স্পর্শ করার অধিকার নেই।[৩৩] যদিও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিগুলি যথেষ্ট নিরীহ শোনায়, সেগুলি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বামীর সুবিধা মতো ব্যাখ্যা করার অনেক ফাঁকফোকর রেখে দেয়। আর এক জায়গায় যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, 'স্বামী দুর্ভিক্ষের কালে, কর্তব্যপালনের জন্য, রোগে অথবা বন্দিদশায় যদি স্ত্রীধন ব্যবহার করে তবে তা ফেরত দিতে সে বাধ্য হবে না।'[৩৪] অপর এক গ্রন্থে তিনি বলেছেন, 'ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য বা প্রজাপত্য বিবাহে নিঃসন্তান নারীর স্ত্রীধন তার স্বামী পায়।' তাই নারী তার নিজস্ব সম্পত্তি ব্যবহার করবে, সমাজ এটা দেখতে পারত না বা মেনে নিতে পারত না। বশিষ্ঠ খুব স্পষ্ট ভাবেই তা প্রকাশ করেছেন: 'স্বামীর পুনর্বিবাহের সময়ে তাকে যা দেওয়া হয়েছে, যা তাকে তার আত্মীয়স্বজন দিয়েছে (সৌদায়িক বা যৌতুক হিসাবে) এবং তার শুল্ক অর্থাৎ যা তাকে বিবাহের পর দেওয়া হয়েছে, তা নারীর সম্পত্তি, তার স্ত্রীধন।'[৩৫] মনু বলেন 'মাতার স্ত্রীধন কন্যার প্রাপ্য এবং কন্যার পুত্র অপুত্রক পুরুষের সমস্ত সম্পত্তি নেবে।'[৩৬] কিন্তু মনু আরও বলেছেন, 'কোনও নারীর বন্ধু বা আত্মীয়েরা মূঢ়তা বা লোভবশত যদি তার সম্পত্তি ভোগ করে, বা সে সব পাপীরা তার নিজের সম্পত্তি বস্ত্রাদির ভোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করে, তাহলে তারা নরকে যায়।'[৩৭] প্রথমত, পুঁথিগত ভাবে নারীর সম্পত্তি 'বস্ত্রাদি' ছাড়াও আরও অনেক বেশি কিছু বোঝাতে পারে। কেননা, গ্রন্থে যেমন বলা হয়েছে এ সম্পত্তি এমন হতে পারে, যা 'বন্ধু এবং আত্মীয়েরা লোভবশত ভোগ করতে পারে।' একটি খুব প্রাচীন গ্রন্থ, *মৈত্রায়ণী সংহিতা*, যা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর বৈদিক গ্রন্থ, সেখানে বলা হয়েছে, 'নারীর যে আত্মীয়েরা তার স্ত্রীধন গাড়ি, কাপড়-চোপড় এবং স্বর্ণালংকার বিক্রি করে জীবিকানির্বাহ করে, তারা পাপ করছে এবং পরলোকে তারা আরও দুর্ভাগ্যের অধিকারী হবে।'[৩৮] সুতরাং 'বস্ত্রাদি' কেবলমাত্র

চোখে ধুলো দেওয়া; শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কখনও কখনও, খুব সম্ভব প্রায়শই নির্লজ্জ ভাবে নারী যে সম্পত্তি নিয়ে এসেছে তা ভোগ করত। তাই ধনী পিতার কন্যাও— যা তার স্ত্রীধন থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়— শ্বশুরবাড়িতে সত্যকার কোনও নিরাপত্তা পেত না। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং সেই কারণে অর্থকরী জীবিকা থেকে বঞ্চিত, অসহায়, শ্বশুরবাড়ির প্রবল ভাবে সংখ্যাগুরু লোভী মানুষগুলির মধ্যে আশাহীন সংখ্যালঘু নারীর তার নিজত্বের যা কিছু তা রক্ষা করার সত্যিকারের কোনও উপায় ছিল না— তা ভোগ করা তো দূরস্থান। সুতরাং এ ধরনের ঘটনা ঘটত— শাস্ত্রকার শূন্য কল্পনা করছেন না, নিষ্পাপ মস্তিষ্কে কুবুদ্ধিও ঢোকাচ্ছেন না। নরকে যাওয়ার বা পরকালে গুরুতর দুর্ভাগ্য ভোগের ভয় সেই বেচারি মেয়েটির স্ত্রীধন ভোগ করা থেকে তাদের কতটা বাধা দিত সেটাই চিন্তনীয়। অনুপার্জিত ধন ভোগ করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বেশ লোভনীয়। দেবল অবশ্য দাবি করেছেন যে, কন্যাশুল্ক এবং সুদ থেকে পাওয়া লভ্যাংশ নারীর নিজস্ব সম্পত্তি, স্বামীর তার উপরে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। জৈমিনিও বলেছেন, নারী বিশেষ কোনও কোনও ধরনের সম্পত্তির অধিকারিণী। কিন্তু কাত্যায়ন বলেন, নারী তার শিল্পকর্মের দ্বারা যা উপার্জন করে এবং যা অপরে ভালবেসে তাকে দেয়, স্বামী তার অধিকারী। বাকি যা থাকে, তা স্ত্রীধন।[৩৯] এটা পরিষ্কার যে, বিশেষ কিছুই আর বাকি থাকে না, কারণ কাত্যায়নের নির্দেশ নারীর উপার্জন এবং উপহার স্বামীর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। অন্য কোনও রকম স্ত্রীধন কল্পনা করা দুষ্কর।

গৃহস্থালির অর্থ এবং সম্পত্তি ব্যবহারে স্ত্রীর ভূমিকা কী? আপস্তম্ব বলেছেন, 'দম্পতি পারিবারিক ধন ব্যবহার করত।'[৪০] এমনকী দার্শনিক গ্রন্থ *পূর্বমীমাংসাও* বলেছে: 'দম্পতি যৌথ ভাবে সম্পত্তির অধিকারী।'[৪১] মনে পড়ে সংস্কৃত 'দম্পতি' শব্দের ইন্দো-ইউরোপীয় মূল শব্দটি এসেছে দোমোস+পতি— গৃহস্বামী থেকে। স্পষ্টতই *আপস্তম্ব* এবং *পূর্বমীমাংসা* দুইয়েই শব্দের মূল অর্থের সূচনা আছে।

'স্বামী যদি কাজের জন্য বাড়ি ছেড়ে যায়, তাকে আগে স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে রেখে যেতে হবে।'[৪২] 'তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী যদি মদ্যপান করে বা প্রকাশ্য নৃত্যানুষ্ঠানে যায়, তাকে ছয় কৃষ্ণল দণ্ড দিতে হবে।'[৪৩] কিন্তু স্বামী বা পুত্রের ঋণ শোধ করতে নারী বাধ্য নয়।[৪৪] গোয়ালা, সুরাবিক্রেতা, অভিনেতা, রজক ও শিকারীর স্ত্রী যে ঋণ করবে তা তাদের স্বামীরা শোধ করবে, কারণ তাদের জীবিকা তাদের স্ত্রীর উপার্জনের উপর নির্ভর করে। যে ঋণ সে নিজে শোধ করবে বলে প্রতিশ্রুত, যে ঋণ সে তার স্বামীর সঙ্গে করেছে এবং যা সে নিজে নিয়েছে, এ সবই নারীকে শোধ করতে হবে: অন্য কিছু শোধ করতে সে বাধ্য নয়। 'ঋণী ব্যক্তির স্ত্রীকে নিলে তার স্বামীর ঋণ শোধ করতে হবে।'[৪৫] ঋণ শোধের প্রশ্নটিই নারীর শোধ করার ক্ষমতা উত্থাপিত করে। কিন্তু সে রকম ক্ষেত্রে শোধ করা হয় যৌথ পারিবারিক কোষ থেকে এবং যদি নারীর অধিকার না থাকে তাকে সম্ভবত তার নিজস্ব স্ত্রীধন থেকে। এই ধারণার পিছনে এই অনুমান কাজ করে যে, নারীর সম্পত্তিতে অধিকার থাকা উচিত নয়, তাই তা নেই। মেধাতিথি বলেন, নারী যা উপার্জন করে তা তার স্বামীর।[৪৬]

আপস্তম্ব বলেন, 'কোনও কোনও পূর্বাচার্য মনে করেন, অলংকারগুলি স্ত্রীর নিজস্ব এবং যে সম্পত্তি তার পিতৃকুল থেকে লব্ধ তাও তার নিজস্ব।'[৪৭] মনে হয় স্ত্রীর অলংকারের উপরেও তার স্বত্ব বিষয়ে মতভেদ ছিল— যে অলংকার সে তার পিতৃগৃহ থেকে এনেছে! বৌধায়ন বলেছেন, 'কন্যা মাতার অলংকার ও আর যা নিয়মসঙ্গত, তা পেয়ে থাকে।'[৪৮] মনু স্ত্রীধনের একটি ঊর্ধ্বসীমা ধার্য করেছেন— ২০০০ পণ পর্যন্ত।[৪৯] কিন্তু ভূমি বা গৃহ স্ত্রীধন হতে পারে না এই শাস্ত্রকাররা এটা বলেন, সম্ভবত এই কারণে যে, সেগুলি শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। জৈমিনি এ বিষয়ে একমত যে নারী কিছু কিছু সম্পত্তির অধিকারিণী হতে পারে এবং হয়ও। মনু বলেছেন স্ত্রীধনের উৎস দুটি: বিবাহের সময়ে, যাত্রার সময়ে, প্রীতির কারণে দান, ভ্রাতা ও পিতামাতার দান। কাত্যায়ন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যোগ করেছেন: যা সে শিল্পকার্য দ্বারা উপার্জন করে এবং যা তাকে ভালবেসে দেওয়া হয় তা তার স্বামীর অধীন, বাকিটুকু স্ত্রীধন।[৫০] এক নিষ্ঠুর উপলব্ধি হয় যে, তার নিজস্ব উপার্জন তার নিজের নয়। 'যৌতুক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, যা একত্র উপবিষ্ট যুগলকে (যুতক) দেওয়া হয়।[৫১] 'দুষ্টা অমিতব্যয়িনী স্ত্রীর স্ত্রীধনের উপর অধিকার নেই।'[৫২] দুষ্ট ও লোভী শ্বশুরবাড়ির লোকেদের পক্ষে স্ত্রী যে অমিতব্যয়িনী এ কথা প্রমাণ করা এবং যা আইনত তার নিজের তা কেড়ে নেওয়া খুব কঠিন ছিল না। 'স্বামীর প্রতিশ্রুত স্ত্রীধন স্ত্রীকে অবশ্যই দিতে হবে'[৫৩]— এ কথা বলার পরও আইনের ফাঁক খুঁজে নেওয়াটা সমস্যা ছিল না।

কন্যাশুল্ক দেওয়া স্ত্রীর উপরে একটা বোঝা চাপানো, কারণ সে এবং অন্য সকলে তাকে পণ্যদ্রব্য বলে মনে করত। প্রাচীন গ্রন্থ *মৈত্রায়ণী সংহিতায়* বলা হয়েছে, 'স্বামী যে স্ত্রীকে ক্রয় করেছে, সে যখন অপরের সঙ্গে ব্যভিচার করে, তা মিথ্যাচার।' কিন্তু মনে রাখতে হবে, যখন পণপ্রথার প্রচলন ঘটল, তখন বর কখনওই নিজেকে পণ্যদ্রব্য মনে করত না, যদিও সে স্ত্রীর তুলনায় অনেক বেশি পণ্যদ্রব্য কারণ পণের তুলনায় কন্যাশুল্ক প্রায় কিছুই না, পণ হল সামাজিক প্রতিষ্ঠার লক্ষণ ও অন্যায্য এবং নির্লজ্জ ভাবে অর্থ আদায়।

মনু বলেন, 'স্ত্রীকে জোর করে বশে রাখা যায় না; নিম্নোক্ত উপায়গুলি প্রয়োগ করে তাকে বশে রাখতে হয়। স্ত্রীদের নিযুক্ত করতে হবে অর্থ সঞ্চয় ও ব্যয় করার কাজে (অর্থাৎ পরিবারের অর্থ রক্ষণাবেক্ষণে) এবং নিজেদের দেহ, গৃহ, বিছানাপত্র, বস্ত্র, আসবাবপত্র পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে। গৃহে বন্দি থাকলে এবং পুরুষ আত্মীয়দের পাহারায় থাকলেও (দুষ্ট) নারী যথেষ্ট রক্ষিত নয়।'[৫৪] তাহলে স্ত্রীকে বশে রাখা, যা কি না বৈধ পুত্রসন্তান লাভে আবশ্যিক, তার একটি উপায় হল, তাকে নানা রকম গৃহকর্মে নিযুক্ত রাখা, যেগুলি আর্থিক মূল্যে কখনওই রূপান্তরিত করা যায় না, যার ফলে সর্বদাই তার নিজেকে পরিবারের আর্থিক বোঝা বলে মনে হত।

স্বামী হারাবার পর সমাজ তাকে দেখতে শুরু করত আর্থিক বিপদ এবং ভার হিসেবে। কৃষিপ্রধান সমাজে যৌথ পরিবার ছিল মূল, সেখানে পরিবারের সম্পত্তি কর্ষণীয় ভূমি ভাগ করার আশঙ্কা খুবই বাস্তব ছিল। এ ব্যাপার ঘটতে পারত যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ভূমি

পেত এবং সে পুনর্বিবাহ করলে তার নতুন স্বামী তার ভূমির ভাগ পেত। দুটি ধারণাই অন্য ভাইদের কাছে নিশ্চয়ই জুগুপ্সাজনক ছিল। দু-একজন বাদে পরবর্তী বৈদিক স্মৃতিকারেরা নিয়ম করলেন যে, বিধবাকে স্বামীর শবদেহের সঙ্গে দাহ করা হবে। অথবা তাকে যদি আদৌ বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়, তাহলে স্মৃতিকারেরা তার জীবনকে জীবনমৃত্যুতে পরিণত করেছিলেন— তার যে কোনও অর্থনৈতিক আশ্রয় নেই এ বিষয়ে তার দৈনন্দিন জীবনে সহস্র খোঁচা দিয়ে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, 'যে নারীর স্বামী নেই তার দেখাশোনা করবে তার পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশুর বা শাশুড়ি; না হলে সে নিন্দার ভাজন হবে।'[৫৫] তার অভিভাবকের তালিকায় শেষ দু'জন বাদে বাকি সকলে তার নিজের পরিবারেরই সদস্য, যারা তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। আপস্তম্ব, মনু এবং নারদ একমত যে অপুত্রক স্বামীর বিধবা স্ত্রী সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় না। কিন্তু গৌতম বলেছেন, সে তার সপিণ্ড ও সগোত্রদের সঙ্গে সমান ভাবে উত্তরাধিকারী।[৫৬] অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য নিয়ম করেছেন যে, অপুত্রক ব্যক্তির বিধবা প্রথম উত্তরাধিকারিণী।[৫৭] এ ব্যাপারে বিষ্ণু ও কাত্যায়নও যোগ দিয়েছেন। কোনও নারীর স্বামীর যদি আট থেকে দশ বছর কোনও সংবাদ না পাওয়া যায় তবে সে পুনর্বিবাহ করতে পারে।[৫৮] স্বামীর যদি পৃথক ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে এবং এক বা একাধিক পুত্র থাকে তাহলে বিধবার শুধু ভরণপোষণের অধিকার আছে। নিয়োগ প্রথায় পরপুরুষের বিধবা নারীতে পুত্রোৎপাদন বিষয়ে মনু খুব স্পষ্ট নন। তিনি এর নিন্দা করেন।[৫৯] বিধবা, এমনকী সাধারণ ভাবে নারী নিজে সন্তান পোষ্য নিতে পারে না, কারণ তারা প্রয়োজনীয় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে না। তাই তারা স্বাধীন ভাবে এমন সন্তান পোষ্য নিতে পারত না। যার উপরে তারা অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভর করতে পারত।

নারদ বিধবার যে সাত রকম ব্যবস্থার কথা কল্পনা করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম বিদেশির দ্বার ক্রীত হওয়া।[৬০] পরাশর নারীর বিষয়ে যে পুনর্বিবাহের বিধান করেছেন তার ফলে সে পুনর্ভূব হয় এবং স্বামীর সম্পত্তির অধিকার হারায়। স্মরণ করা যেতে পারে, দায়ভাগ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বিধবা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত, যা মিতাক্ষরা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে সম্ভব ছিল না। ফলে দায়ভাগ নিয়ন্ত্রিত বাংলায় ১৮১৫ থেকে ১৮৮০-র মধ্যে সামগ্রিক ভাবে ২৩৬৬ জন বিধবাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, যার মধ্যে শুধু কলকাতাতেই এ রকম নৃশংসতা ঘটে ১,৮৫৮টি। ঋগ্বেদের সময়েও বিধবা করুণার পাত্রীই ছিল, নচেৎ আমরা অবৈধব্যের প্রার্থনা পেতাম না। কিন্তু মহাকাব্যে এবং এমনকী মনুও তাদের মৃত্যুর বিধান দেননি। কুন্তী ও গান্ধারী এবং দশরথের তিন মহিষী এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে বিধবারা বেঁচেই ছিল এবং সম্মানের সঙ্গেই বেঁচে ছিল। নিম্নতর শ্রেণির মধ্যে, যতদিন না সংস্কৃতায়নের দুর্ভাগ্যজনক মিশ্রণ ঘটেছিল, ততদিন পর্যন্ত সতীদাহ ছিল না; তা শুরু হয় সংস্কৃতায়নের সঙ্গে সঙ্গেই। তথাকথিত নিম্নতর শ্রেণিতে বিধবাদের উদাহরণ সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

বিধবাদের অর্থনৈতিক সমস্যা আরও জটিল হয়েছিল বহু বিবাহ এবং পুত্রের মাতার

বিষয়ে সামাজিক গুরুত্বের কারণে। শুধু কন্যা আছে যার এ রকম বা নিঃসন্তান বিধবারা অর্থনৈতিক ভাবে উৎপীড়িত ছিল এবং সাধারণ ভাবে তাদের পিতামাতা বা ভ্রাতার উপর নির্ভরশীল ছিল। শ্বশুরবাড়িতে তাদের আরোপিত দায়িত্ব হিসেবে দেখা হত। তাছাড়া যে পুরুষের বিভিন্ন বর্ণের পত্নী থাকত, সে তার বিষয় সম্পত্তি আরও জটিল পরিস্থিতিতে রেখে যেত, কারণ বিধবাদের ভাগ্য বিষয়ে স্মৃতিকারদের পরস্পর মতভেদ ছিল। কেউ ভরণপোষণে বিধবার দাবি সমর্থন করতেন, কেউ আবার নামমাত্র ভৃতির পক্ষপাতী ছিলেন। কখনও কখনও আবার শাস্ত্রের বিধি এবং সমাজব্যবহার, যা সাহিত্যে পাওয়া যায়, এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। গৌতম বলেছেন, 'নিঃসন্তান ব্যক্তির সম্পত্তি তার স্ত্রীগামী।'[৬১] কিন্তু *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এ আমরা শুনি এ রকম একটি বিষয় দুষ্যন্তের কাছে বিজ্ঞাপিত হলে তিনি বলেন যে, শাস্ত্রমতে এই সম্পত্তি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হবে।[৬২] সম্ভবত অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ বা আঞ্চলিক ব্যবহার দ্বারা তিনি উপদিষ্ট ছিলেন।

বিবাহ বিচ্ছেদ পাশ্চাত্য অর্থে স্বীকৃত ছিল না। যদিও এমন শাস্ত্রগ্রন্থও আছে, যেখানে নিয়ম আছে যে, প্রতিকূল পত্নীকেও ত্যাগ করা যাবে না। কিন্তু পারস্পরিক দ্বেষ থাকলে দম্পতি বিচ্ছিন্ন হতে পারে। *অর্থশাস্ত্র*-তে আছে 'স্বামী যদি স্ত্রীর দোষে বিচ্ছেদ চায়, তবে সে স্ত্রীর কাছ থেকে যা পেয়েছে তা ফেরত দেবে। যদি অনুরূপ কারণে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে মুক্তি চায় তবে স্বামী তার কাছ থেকে যা পেয়েছে তা ফেরত দেবে না। ধর্মবিবাহে বিবাহ বিচ্ছেদ নেই।'[৬৩] এই গ্রন্থে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদ্বেষের কারণে উভয়পক্ষকে বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে, কিন্তু বিচ্ছেদের বিষয়ে পুরুষের স্বাধীনতা সম্মান পেলেও নারীকে অর্থনৈতিক দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে, কারণ সে তার স্ত্রীধন হারাচ্ছে।

সব সমাজেই সাধারণ ধর্ষণ কতকটা ক্ষমার চোখে দেখা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন দাসীকে ধর্ষণ করলে পুরুষের দশ পণ দণ্ড হবে।[৬৪] সে যদি ভিক্ষুণীকে ধর্ষণ করে তবে তার দণ্ড ২৪ পণ।[৬৫] প্রভু দাসীকে ধর্ষণ করার বিষয়ে প্রথমেই যে প্রশ্ন মনে আসে, তা হল, সে কি করে পুরুষকে দণ্ড দিতে বাধ্য করবে? কে তাকে বিশ্বাস করবে, কে তার পক্ষ নেবে? বরং ভিক্ষুণীর কথা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য এবং সে হয়তো জোর করলে অর্থ পাবে, কিন্তু গোটা বাস্তবটাই কতকটা অবাস্তব শোনায়।

সাহিত্যে ধর্ষণকারীর বেকসুর খালাস পাওয়ার অসংখ্য উদাহরণ আছে। তাছাড়া আইন ও সামাজিক প্রথা উচ্চবর্ণের পুরুষের প্রতি এতটাই ক্ষমাশীল ছিল যে, তথাকথিত নিম্নবর্ণের নারীরা তাদের কাছে বিনা মূল্যেই সহজলভ্য ছিল। সুতরাং শাস্ত্র বাধা দেবে এমন প্রত্যাশা ছিল না। সমাজে নারীর অতি নিম্নস্তরের অবস্থানের কারণে সে পুরুষের লালসার কাছে অত্যন্ত অসহায় ছিল এবং সেই পুরুষেরা ধর্মশাস্ত্রকারদের সাহায্যে সামাজিক স্বীকৃতি নিয়ে বিনা শাস্তিতে এই আচরণ করত।

অসতী স্ত্রীদের ভয়াবহ রকম নিষ্ঠুর ভাবে শাস্তি দেওয়া হত; যে সব ধর্মশাস্ত্রে এই শাস্তির বিধান আছে, সেগুলি ধর্ষকাম লেখকদের রচনার মতো লাগে। অন্যান্য শাস্ত্রে বিধান

আছে: 'অসতী স্ত্রীকে তার সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হবে এবং তাকে কষ্টে থাকতে বাধ্য করতে হবে, এক গ্রাস মাত্র অন্ন দিয়ে। তাকে সব সময়ে তিরস্কার করতে হবে, মাটিতে শুতে হবে, কিন্তু তার স্বামীর বাড়িতেই থাকতে হবে। (যাতে সে তার পাপকর্ম থেকে বিরত হয়)।'[৬৬]

এখন প্রশ্ন হল, সে যখন তার কার্যকলাপ সংশোধন করবে, তখন কী হবে? তখন কি তাকে ভরপেট খেতে ও স্বামীর শয্যায় শুতে অনুমতি দেওয়া হবে? 'যদি স্বামী তার আজ্ঞানুবর্তিনী স্ত্রীকে ত্যাগ করে, যে স্ত্রী কর্মপটু এবং বীর পুত্রের জননী, তাহলে সেই স্ত্রীকে (স্বামীর) সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ এবং ভরণপোষণ দিতে হবে।'[৬৭] স্ত্রীর জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ঘটায় এই নিয়মে নির্দোষ স্ত্রীকেও শুধুমাত্র স্বামীর সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দিয়ে ত্যাগ করা যায়। সমাজে শুধু পুরুষ ও নারীর জন্য দ্বিমুখী বিচারব্যবস্থা ছিল তাই নয়, যে স্ত্রী তার স্বামীর অপ্রিয়, তার পক্ষে তার আইনত যে অধিকার তা পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায় না। 'অসতী স্ত্রীকে দৈনন্দিন আহার্যটুকু দিয়ে ঘরে বন্দি করে রাখতে হবে। সতীত্বের কর্তব্য যে লঙ্ঘন করেছে, সেই স্ত্রীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাকে বন্দি করে রাখতে হবে এবং খেতে দিতে হবে।'[৬৮] 'ব্যভিচারিণী নারীকে তার অধিকার (ভৃত্যাদির উপরে) থেকে বঞ্চিত করতে হবে, ময়লা কাপড় পরতে দিতে হবে, নামমাত্র খেতে দিতে হবে। যদি সে পরপুরুষের দ্বারা গর্ভবতী হয়, তবে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে।'[৬৯] বশিষ্ঠ বলেন, 'উচ্চতর তিন বর্ণের স্ত্রীরা শূদ্রের সঙ্গে ব্যভিচার করলে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। স্ত্রী যদি স্বামী বা গুরুকে হত্যা করতে চেষ্টা করে, তবে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে।'[৭০] গৌতম বলেছেন, 'যদি উচ্চতর তিন বর্ণের স্ত্রী নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করে তবে তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে।'[৭১]

অপর দিকে আপস্তম্ব ও বৌধায়ন দুজনেই বলেন মা যদি গুরুতর অপরাধের জন্য সমাজে একঘরে হয়, তাহলেও পুত্র তার সঙ্গে কথা না বলে তার সেবা করবে।[৭২] একঘরে পিতাকে ত্যাগ করা যায়, সম্ভবত সে নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে পারে এবং সে-ই পরিবারের সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে বলে, কিন্তু মায়ের পতন ঘটলেও পুত্র তাকে কখনওই ত্যাগ করতে পারে না। অসতী স্ত্রীর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান এবং পুত্রের মাকে ত্যাগ না করার মধ্যে মৌলিক ও ন্যূনতম মানবিকতার নিষ্কর্ষ, এই শাস্ত্রবিধানের মধ্যে স্বাভাবিক স্ববিরোধিতা আছে। সাহিত্যে কিন্তু ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়, 'পতিতা' নারীদের অভিশাপ দেওয়া হয়, শাস্তি দেওয়া হয় এমনকী মেরেও ফেলা হয় (যথা, সীতা, অহল্যা ও রেণুকা)।

বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে গণিকাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নানা প্রতিশব্দ সম্ভবত নন শ্রেণি বা স্তর বোঝায়, তার মধ্যে সর্বোচ্চ গণিকা, যাকে সরকারি ব্যয়ে নানা কলায় শিক্ষা দেওয়া হত; তার মূল্যও সর্বাপেক্ষা অধিক। বৌদ্ধগ্রন্থে বলা হয়েছে, রাজগৃহে সালাবতী প্রতি রাত্রে একশত কার্যাপণ দাবি করত, এবং আম্রপালীর দক্ষিণা নিয়ে রাজগৃহ ও বৈশালীর মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। *মৃচ্ছকটিক* নাটকে *ঋগ্বেদ*-এর গণিকার অনুগ্রহের জন্য সহস্র সুবর্ণমুদ্রা

পাঠানোর বিবরণ পাই; অর্ধকাশীর কাহিনি তো সুপরিচিত। গণিকা থাকত প্রাসাদে প্রাচুর্যের মধ্যে, তার বহু দাসদাসী, কুট্টনি, বিট, পীঠমর্দ, পুরুষ সেবক ও সঙ্গীতকারী থাকত। কৌটিল্য বলেন, গণিকা রাজকোষ থেকে মাসোহারা পেত এবং তার প্রতিনিধি প্রতিগণিকা তার অর্ধেক বেতন পেত। 'সম্ভবত গণিকার প্রাসাদ, দাসদাসী, সংসার সবই ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি।'[৭৩] এর অর্থ হল, গণিকার যে শুধু স্বত্ব ছিল না তাই নয়, তা বেচবার, বাঁধা দেওয়ার বা দান করারও তার অধিকার ছিল না। এই নিয়ম গণিকালয়ে যারা থাকত তাদের জন্য কার্যকর। কিন্তু অবরুদ্ধা, অর্থাৎ যারা কিছু সময়ের জন্য পুরুষের রক্ষিতা হত, এবং নিজেই গৃহ পরিচালনা করত, আমরা অনুমান করতে পারি— এই নারীরা যা উপার্জন করত, তা রাজকোষে প্রয়োজনীয় কর দেওয়ার পরে তাদের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে যেত।

রাজকোষ থেকে গণিকাদের ১৫০০ থেকে ২০০০ পণ বার্ষিক বেতন দেওয়া হত। যদি কেউ কোনও গণিকার নিষ্ক্রয় দিয়ে তাকে মুক্ত করতে চাইত বা বিবাহ করতে চাইত, তার রাজকোষে ২৪০০০ পণ নিষ্ক্রয় মূল্য দিতে হত। এ অনেক টাকা, কিন্তু গণিকার বেতনও অনেক টাকা। রাষ্ট্র যে গণিকার শিক্ষার ভার নিত, তার একটা কারণ হল, রাজা এবং তাঁর সভাসদরা অনেক সময়েই বিনোদনের জন্য যুবতী ও সুন্দরী গণিকাদের ডাকতেন। আর একটা কারণ হল, গণিকারা সুকৌশলে তাদের খদ্দেরদের কাছ থেকে নানান রাজনৈতিক ভাবে প্রাসঙ্গিক সংবাদ আদায় করত। সেগুলি সংগ্রহ করার জন্যই অধিকাংশ সময়ে গণিকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হত।

কিন্তু গণিকারা প্রায় স্বাধীন ভাবেই ধনী হত; অধিকাংশ নগরে তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তাদের নগরশোভিনী বলা হত এবং তারা ধনী নাগরদের আকর্ষণ করতে পারত। ধম্মপদের টীকায় সালাবতীর কন্যা সিরিমার প্রতি রাত্রে ১০০০ পণ উপার্জন করার বিবরণ পাই। গণিকার তুলনায় সামাজিক ও পরিশীলনের দিক থেকে নিকৃষ্ট রূপাজীবা, যে সাধারণত মদ মাংস ব্যবসায়ীর সঙ্গে বাস করত। তার উপার্জন ছিল মাত্র ৪৮ পণ। কোনও পুরুষ গণিকার কন্যার উপরে বলাৎকার করলে তার ৫৪ পণ দণ্ড হত এবং মায়ের প্রাপ্যের ১৬ গুণ দণ্ডও দিতে হত, হয়তো তার বিবাহের সময়ে মুখবন্ধ করার উপায় হিসাবে। পুংশ্চলী ছিল এই উপজীবিকার শেষ ধাপে, তার কোনও বাঁধা প্রাপ্য ছিল না। কৌটিল্য বলেছেন, বৃদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্তা বেশ্যাদের রাঁধুনি, ভাণ্ডারী, পশম ও তসর বয়নকারিণীরূপে এবং অন্যান্য কায়িক শ্রমের কাজে নিয়োগ করতে হবে। তাদের ধাত্রী বা মাতৃকারূপে বেশ্যালয়ে অথবা বেশ্যাদের শিক্ষা দেওয়া কাজেও নিযুক্ত করা যেত, যাতে তারা কিছু উপার্জন করতে পারে। কিন্তু কৌটিল্য *অর্থশাস্ত্র*-তে তাদের যে অবসর ভাতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অন্য ভাবে অসহায় এই নারীদের খুব অল্পই নিরাপত্তার আশ্বাস দিত। বেশ্যাকে তার আয়-ব্যয় বিষয়ে বেশ্যালয়ের রক্ষককে জানাতে হত।[৭৪]

দেবদাসী বা মন্দিরের গণিকাদের শস্যে বেতন দেওয়া হত— অন্যান্য কিছু রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর মতো। দেবদাসীদের উপার্জন কোথাও স্পষ্ট ভাবে বলা হয়নি এবং তাদের বিশেষ কর্তব্যও

উল্লিখিত হয়নি। যে সব ধনী পৃষ্ঠপোষক পরলোকে পুণ্য অর্জনের জন্য মন্দিরে দাসী কিনতেন, তাঁদের সদিচ্ছাতেই এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ্যালয়েই হোক বা মন্দিরেই হোক, কোনও বারাঙ্গনাই নিজস্ব নিরাপত্তা পায়নি; *গৌতম ধর্মসূত্র*-তে স্পষ্টই বলা হয়েছে, 'বেশ্যার হত্যা অপরাধ নয়।'[৭৫]

আমরা দেখেছি, সাধারণ ভাবে নারীর উপার্জন বা সম্পত্তির অধিকার ছিল না। প্রাচীন গ্রন্থ *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ (সম্ভবত অষ্টম-সপ্তম খ্রিস্টপূর্ব শতক) বলা হয়েছে পত্নীর সম্পত্তির উপরে কোনও অধিকার নেই, এমনকী নিজের শরীরের উপরেও নয় (৪:৪:২:১৩)। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ এর আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যজ্ঞে লাঠি দিয়ে হবিকে পেটানো হয় যেমন তেমনি স্বামীও স্ত্রীকে পেটাবে, যাতে তার নিজের শরীর বা সম্পত্তির উপরে কোনও অধিকার না থাকে।'[৭৬] কিন্তু সমাজে দানকর্ত্রীর বহু নিদর্শন পাই: শুধু রানিরা নয়, শ্রদ্ধেয় জয়সেনের জৈন শিষ্যা, অথবা সীহমিত্রের জৈনধর্মাবলম্বনকারিণী শিষ্যা, সথিসিহ ও পুষ্যমিত্রের শিষ্যা, ইত্যাদি উদাহরণ আছে।[৭৭] সার্থবাহপত্নী ধর্মসোমা বা শ্রমণদের গৃহস্থ শিষ্যা কোচ্ছা ধার্মিক জৈন ভ্রাতৃগণকে নানা উপহার দিয়েছিলেন। *বৃহৎকল্পভাষ্যসূত্র*-তে গণিকা আম্রপালীর উদ্যান দানের কথা আছে। অনাথপিণ্ডদের কন্যা বুদ্ধ ও তাঁর হাজার শিষ্যকে আহার দিয়েছিলেন। এ ছাড়া গণিকা ও অন্যান্য বৌদ্ধ নারীদের মঠ, চৈত্য, বিহার, উদ্যান, সেতু, কূপ, জলাধার ও অর্থ দানের কথা শুনি। খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা মহিষী প্রভাবতী নানা মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন। ওড়িশার ভৌমক রাজবংশে সতেরো জন রাজার মধ্যে ছ' জন মহিষীর বিবরণ পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিনীতে দিদ্দা খেমা প্রথমে রাজপ্রতিভু হিসেবে এবং পরে স্বয়ং রানি হিসেবে রাজত্ব করেন। একই গ্রন্থে মহিষী চুদ্দা ও ডামরী যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এই মহিষীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাও ছিল। কিন্তু এর অধিকাংশই তন্ত্র পরবর্তী কালের প্রমাণ, যখন ব্যাপক ভাবে নারীকে দেবী ভাবে দেখা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে রানিদের মান্য করা হত, অতিমানবিক শক্তির নিয়ন্তা হিসেবে, যেমন রাজাদেরও মনে করা হত— তাঁরাও ইতিহাসে আগাগোড়াই সম্মানিত হয়েছেন।[৭৮] তেমনি ভাবে যে রানি তাঁর নিজ ক্ষমতায় অর্থের নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তিনিও সম্মানিতা।

প্রথম যে প্রশ্নটা আমাদের মনে জাগে, তা হল: নারীর যদি অর্থ না থাকে, তবে তারা এমন মূল্যবান দান করতে কি করে পারত? একটি উত্তর হল, যে সব ধনী গণিকা নিজেদের গৃহ পরিচালনা করত, তাদের রাজকোষে কর দিয়ে বাকি উপার্জনের অর্থের উপর স্বত্ব ছিল। অনেক সময়েই পাপবোধের কারণে তারা তাদের অর্থের একটা বড় অংশ ধর্মকর্মে ব্যয় করত। দ্বিতীয়ত, সমাজে সবাই শাস্ত্রের অনুশাসন হুবহু পালন করত না, কিছু নারীর স্ত্রীধনের উপর অধিকার ছিলই। বিশেষ করে যদি তারা রাজ পরিবার বা সম্ভ্রান্ত পরিবার বা বণিক পরিবারের নারী হত, তাহলে তা বেশ ভাল পরিমাণ হতে পারত, এবং প্রায়ই তার নিন্দা বা তিরস্কারকে নীরব করিয়ে দেওয়ার অবস্থায় থাকত, কারণ টাকা কথা বলে। তাই

তারা দান করতে পারত এবং করতও। তৃতীয়ত, পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন অনুশাসনের আইন সমান্তরাল ভাবে থাকত, বিশেষ করে মাতৃতান্ত্রিক অঞ্চলগুলিতে। চতুর্থত, নারী, সন্ন্যাসী, পত্নী, বিধবা অথবা গণিকার দান বলে যেগুলি লিপিবদ্ধ আছে, তা সব সময়ে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয়, প্রায়ই ভক্ত বা শিষ্যেরা ধার্মিক, ক্ষমতাশালিনী বা খ্যাতনামা নারীর নামে দান করত। তাছাড়া দাতা স্বামীরাও এ রকম দানে উৎসাহ দিত, যদিও আপস্তম্ব বলেছেন, 'স্বামী গৃহে না থাকলে স্ত্রী সাধারণ ব্যয়াদি করবে; তা চৌর্য বলে গণ্য হবে না।'[৭৯] এর থেকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় যে, সে যদি অসাধারণ ব্যয় করে তবে সে স্বামীর অর্থ চুরি করছে বলে মনে করতে হবে! কিন্তু সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে ফাঁক রেখেছিল যার সাহায্যে অসাধারণ পরিস্থিতিতে নারীরা তাদের নিজের ধন দান করতে বা ব্যয় করতে পারত।

তৃতীয়-চতুর্থ খ্রিস্টপূর্ব শতকে স্পার্টার সম্বন্ধে শুনতে পাই যে, 'সমগ্র দেশের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ নারীদের অধীন; এটা এই জন্য যে অনেক ধনী উত্তরাধিকারিণী আছেন, এবং প্রচুর যৌতুক দেওয়া হয়।'[৮০] এথেন্সে যৌতুক দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনে বলত যে, বিবাহ শেষ হয়ে গেলে সেটা ফেরত দিতে হবে।[৮১] রোমান আইনে বধূ কেনা যেত।[৮২] স্বামী যদি (ব্যভিচার ছাড়া) অন্য কোনও কারণে স্ত্রীকে ত্যাগ করত, তাহলে তাকে তার সম্পত্তির অর্ধাংশ দিতে হত, বাকিটা দেবী সেরেস-এর কাছে বাজেয়াপ্ত হত। এই 'পিকিউলিয়াম' তারা নিজেদের মতো ব্যবহার করতে পারত, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা পিতার সম্পত্তি।[৮৩] ভোকোনিয়ান আইন অনুসারে আদমসুমারির প্রথম শ্রেণিতে যে ব্যক্তি আসে, অর্থাৎ যে সম্পন্নতম, সে নারী উত্তরাধিকারিণী নিয়োগ করতে পারে না।[৮৪] ক্রীট-এ 'পিতার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করেই কন্যাকে তার ভাগ দেওয়া যাবে।'[৮৫] পুত্রহীন পিতার সম্পত্তি কন্যাগামী হত, তার নাম প্যাট্রিওখস (অথবা এপিক্লেরস)।[৮৬] তাই দেখা যায়, ভোকোনিয়ান আইন, যা সমাজের সর্বাপেক্ষা ধনী অংশের জন্য নিয়ম করেছে, তা বাদে গ্রিস ও রোমে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আইন অনুসারে নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতে পারত এবং পেতও।

গর্তিন আইন অনুযায়ী 'বিবাহিতা ক্রীতদাসীর নিজস্ব সম্পত্তি থাকতে পারে, কারণ বিবাহ বিচ্ছেদের নিয়মে বলা হয়, সে তার অস্থাবর সম্পত্তি (সম্ভবত নিজের জিনিসপত্র) এবং ছোটখাটো প্রাণী সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে।'[৮৭] ফলে উদার গর্তিন আইন অনুসারে দাসেরও সম্পত্তির অধিকার ছিল। কিন্তু গ্রিস ও রোমেও সাধারণ চিত্রটা খুবই হতাশাব্যঞ্জক— পুরুষের সম্পত্তির স্বত্ব ও ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে, যদিও ভারতবর্ষের তুলনায় আইন অনেক বেশি উদার। নারীর সম্পত্তির উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ তার উপরে সার্বিক নিয়ন্ত্রণের একটা অঙ্গ। 'মানুষের প্রজননের উপায় নিয়ন্ত্রণ করতে এবং এই উপায়গুলি তৎকালে কার্যকরী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বার্থে প্রয়োগ করতে রাষ্ট্র বাধ্য হয় তার নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার নারীর নিজের দেহের উপরে বিস্তৃত করতে। সুতরাং, সে তার দেহের উপর সত্যকার স্বত্ব হারায়।'[৮৮] মনে পড়ে যজ্ঞের ঘি-কে লাঠি দিয়ে মারার যে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণে দেওয়া হয়েছে, তা হল 'এই ভাবে মারলে স্ত্রী তার নিজের দেহ ও সম্পত্তির উপর অধিকার হারায়।' দেহ ও সম্পত্তির

পারস্পরিক স্থানপরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ: দেহও সম্পত্তির অংশ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, দ্রৌপদীকে সর্বসমক্ষে অপমান করতে সভায় টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ে দুঃশাসনের প্রতি তাঁর প্রশ্ন: 'রাজা যুধিষ্ঠির কি আমাকে জুয়ায় বাজি রেখে হেরে যাওয়ার আগে নিজেকে বাজি রেখেছিলেন?' প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি ইঙ্গিত করছেন যে, যুধিষ্ঠির যদি আগে নিজেকে হারিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর দ্রৌপদীকে বাজি রাখার কোনও অধিকার নেই। অর্থাৎ তিনি মুখে না বলেও স্বীকার করছেন, তিনি কৌরবদের অধিকারভুক্ত, তার মানে, তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বামীর সম্পত্তি, এবং স্বামী তাঁকে বাজি রাখতে পারেন। এর বহু পূর্বে ঋগ্বেদের জুয়াড়ি আক্ষেপ করে যে, সে তার স্ত্রীকে বাজিতে হেরেছে। সুতরাং স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি হিসেবেই ব্যবহৃত হত। শর্মিষ্ঠা দেবযানীর যৌতুকের অংশবিশেষ ছিলেন; কিন্তু যযাতি দেবযানীকে বিবাহ করে গোপনে শর্মিষ্ঠাকে উপভোগ করেন এবং তাঁর গর্ভে অনু, পুরু ও দ্রুহুর জন্ম দেন। সুতরাং যৌতুকের অচেতন অংশ যেমন স্বামী দখল করতে পারত তেমনই বধূর মানুষ সহচরদেরও সে তা করতে পারত।

নারী যে পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারত, মাধবীর কাহিনি তার প্রমাণ:

> গালব যখন গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করতে না পেরে রাজা যযাতির কাছে যাচ্ঞা করলেন, তখন যযাতি শূন্য রাজকোষের অজুহাত দিলেন। কিন্তু তিনি গালবকে একটি অন্য সুযোগ দিলেন. রাজার সুন্দরী তরুণী কুমারী কন্যাকে ধার নিয়ে এক বছর রাজাদের কাছে ভাড়া দেওয়া যাবে, যতদিন না সেই রাজাদের একটি করে পুত্র হয় এবং তাঁরা কৃতজ্ঞতাবশত গালবকে কিছু অর্থ দেন। গালব মাধবীকে পরপর তিনজন রাজার কাছে ভাড়া দিলেন এক এক বছর করে, যতদিন না তাঁর গুরুদক্ষিণার খরচ উঠল। যযাতি, গালব বা এই রাজারা, কেউই এই ব্যবস্থাকে নোংরা বা ঘৃণ্য মনে করলেন না এবং গুরুও দক্ষিণা গ্রহণ করলেন— মনে হয় সানন্দেই। একমাত্র মাধবীই এই সমস্ত ব্যাপারের প্রতি গভীর জুগুপ্সা প্রকাশ করলেন এবং পরে দৃঢ় ভাবে বিবাহ করতে অস্বীকার করলেন। তাঁকে একটি অর্থকরী পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তাঁর অন্তরাত্মা এতে ঘৃণা বোধ করেছিল। তিনি তপস্যা করতে গেলেন।

প্রাচীন ভারতের নারীদের অর্থ উপার্জন, অধিকার বা ব্যয় করার থেকে এবং অর্থ বা অন্য সম্পত্তি বিক্রি, বাধা দেওয়া, গচ্ছিত রাখা বা দান করা থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি কারণ দেখতে পাই। আর্যরা উত্তর ভারতীয় ভূখণ্ডের অধিকাংশ দখল করে নেওয়ার পর তাদের অল্প মূল্যের দাসের এক সরবরাহ ছিল। পূর্বে পরিবারের মেয়েরা বাইরের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে পুরুষের সহায়তা করত এবং তাই তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে স্বীকৃত হত। তারা উপার্জনকারী বা উপার্জনকারীর সহায়ক হিসেবে কিছুটা মানবিক সম্মান পেত। কিন্তু যখন বিশাল এক দাস শ্রেণি আর্যদের ব্যবহারে লাগল তখন নারীদের আর বাইরের শ্রমসাধ্য কাজে যোগ দিতে হত না। তত দিনে দেশের ভিতরে এবং সাগরপারে উৎপাদন ও বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত সঞ্চিত হয়েছে শ্রেণিবিভক্ত এক সমাজে অল্পসংখ্যক সুবিধাভোগীর হাতে। ব্রাহ্মণ সাহিত্য থেকে শুরু করে আমরা সমাজের উপরের

স্তরে মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারের পরিস্ফুট ভোগের উল্লেখ পাই। সেই সময়ে আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীর হাতে সম্পত্তি রেখে যাওয়ার উৎকণ্ঠায় অন্তঃপুরেও পুরুষের আরও সজাগ পাহারায় নারীর আরও কঠিন বন্দিত্ব উপস্থিত হল। তাছাড়া এই ভাবে ঘরে থাকায় নারীর রূপের সৌকুমার্য বজায় রইল, যা সম্পত্তির পুরুষ অধিকারীদের কাছে প্রিয়। তখন এ কথা স্পষ্ট হল যে নারীরা, যাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে নিরক্ষর এবং কেবলমাত্র গৃহকর্মে নিপুণা, তারা অর্থনৈতিক ভাবে তাদের স্বামীদের উপর বোঝা এবং এই থেকেই তাদের ভোগ্যবস্তু হিসেবে গণ্য করার পদ্ধতি সহজ হল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বাৎস্যায়ন নারীর সম্বন্ধে দুই পরিপ্রেক্ষিতে— কুমারী হিসেবে ও গণিকা হিসেবে— পরিষ্কার বলেছেন, 'তাদের সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় ভাবে সাজগোজ করতে হবে, কারণ নারী পণ্য।'[৮৯]

এখন নারীদেরই যদি পণ্য বলে মনে করা হয়, সম্পত্তি বা পদার্থ হিসেবে, তাহলে তাদের সম্পত্তি বা ঐশ্বর্য ব্যবহার করার স্বাধীনতা কেউ আশা করে না। সমাজ তাদের ব্যক্তি মানব হিসেবে স্বীকার করতে ভয় পেত।

গৃহকর্মে নারীর অবদান কখনও অর্থের নিরিখে পরিমাপ করা হয়নি, তাই যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই অনেক গৃহকর্ম করত, তাদের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য পুরুষের উপরে অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীল বলেই মনে করা হত। উৎপাদনের কাজে যুক্ত থাকলেও তা যথেষ্ট নয়, তাকে তবুও বোঝা বলেই গণ্য করা হয় এবং প্রত্যাশা করা হয় সে তার পিতা, ভ্রাতা, স্বামী বা পুত্রের অধীনে থাকবে। যখন তার হাতে টাকা এবং সত্যকারের সম্পত্তি আছে, যা সে নিজের ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারবে, তখনই তার অর্থনৈতিক সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। আইনেই স্বীকৃতি এবং ব্যয়, সঞ্চয় বা যথেচ্ছ ভাবে নিজের অর্থ ব্যবহার করার সচেতন স্বাধীনতাই তাকে সম্পন্ন নারীর স্থান দিয়েছে। স্ত্রীধন বা সৌদায়িক বা যৌতুক পুঁথিগত ভাবে একান্তই তার নিজস্ব; কিন্তু সমাজের অনুভূতি ও তার নিজের অনুভূতি হল যে, সে 'ভার্যা' বা 'ভরণীয়া', অর্থাৎ যাকে ভরণ করতে হয় এবং সেই কারণেই ভরণপোষণের জন্য স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের অধীন, যেমন 'ভৃত্য', দাস, তেমনই এবং এতে স্ত্রীধন লুঠ করায় শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সুবিধা হয়। কেবলমাত্র খুব ধনী নারীরা, যেমন রানি, যাদের ঐশ্বর্য রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত, তারাই সত্যি করে নিজেদের অর্থের উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখত। অথবা যে গণিকা তার নিজের অর্থ 'উপার্জন' করে কর দেয় এবং কখনও এতই সম্পন্ন হয় যে রাজা এবং বণিকরাও তার ক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সে-ই সময়বিশেষে সমাজে অর্থবল প্রয়োগ করার স্বাধীনতা পায়। তাছাড়া সর্বত্রই ধনী দাতারা সম্মানিত হয় এবং লোভী প্রার্থীদের কাছে অর্থে কোনও কলঙ্ক নেই। ধর্মকর্ম সর্বত্র এবং সর্বকালে অর্থের পাপ স্খলন করে।

কিন্তু এই ব্যতিক্রমগুলি বাদ দিলে সাধারণ ভাবে দাসী, গৃহবধূ বা বিধবারা পুরুষ ও তার পরিবারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকত, কারণ গৃহে তাদের শ্রম যতই গুরুতর হোক না কেন, উৎপাদনমূলক বলে গণ্য হত না। তাদর একমাত্র মূল্য তাদের প্রজননের ভূমিকায়। কিন্তু

সেখানেও তাদের ক্ষেত্র হিসাবে দেখা হত, ফসল হল বপনকারীর নিজের। দীর্ঘ শতাব্দী ধরে সমাজ ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে নারীর পায়ের তলা থেকে তার আত্মসম্মানের শেষ অবলম্বনটুকু সরিয়ে নিয়েছে, তাকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে এবং গৃহে তাকে এমন এক নিশ্চেতন ভূমিকা দিয়ে যাতে তার সাধারণ বুদ্ধি সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং পুরুষ ঘোষণা করতে পারে যে, নারীর অর্থের প্রয়োজন নেই এবং অর্থ পেলেও তার উপরে নির্ভর করা যায় না।

সূত্রাবলি

১. ৫.৫ ৩৮০
২ ঐ
৩. *মনুসংহিতা* ৮
৪. ঐ ৮·২৪৪
৫. *সংবর্ত* ১৬২
৬. *মনুসংহিতা* ৯·১১৮
৭. *গৌতম ধর্মসূত্র* ২৯ ১১
৮ ৫ ৫ ৮ ২
৯ নিবিন্দ্রিয়া অদাযাদা স্ত্রিযো ইতিশ্চ মতাঃ/অদাযাদা ভগিন্যোতি।
১০ *বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র* ১৫
১১. *বিষ্ণু ধর্মসূত্র* ৬৭ ৩০
১২ ১ ১১
১৩. ৬ ৪ ১৭
১৪. আচার্যা ও উপাধ্যাযা
১৫ *মহানির্বাণতন্ত্র* ৮ ৩৫, ৪৭
১৬. *মনুসংহিতা* ৩.৩১৭
১৭ প্রাগুক্ত ১০ ১৯
১৮ *ধর্মসূত্র* ২
১৯. *যাজ্ঞবল্ক্য ধর্মসূত্র* ২ ১৪৫, ১৪৭
২০ ৩ ৫১
২১. এম এন শ্রীনিবাস, ১৯৮৯, *The Cohesive Role of Sanstitsection*, Oxford University Press
২২. ঐ পৃ ১৬
২৩. ঐ পৃ. ১২১, টীকা ৫
২৪. *ঋগ্বেদ* ১·১০৯·২
২৫. ৩·৭৩
২৬ ২ ১৭৫
২৭. George Sllen and Union, 1970 Womens Role in Economic Development
২৮. শ্রীনিবাস, পূর্ববৎ, ১৯৮০, পৃ. ১০০
২৯. *যাজ্ঞবল্ক্য ধর্মসূত্র* ২ ১৪৬
৩০. ৩:৫২

৩১. *ব্যাস ধর্মসূত্র* ৪.৩০
৩২. *বিষ্ণু ধর্মসূত্র* ৮:৪, ৫
৩৩. ৫:৯৫
৩৪. ২.১৫১
৩৫ ১৫·১১ ১৮
৩৬ ৯ ১৩১
৩৭. ৩:৫২
৩৮. *মৈত্রেয় সংহিতা* ১.১১
৩৯. ৫:৯০৪
৪০. ২:৬·১৩ ১৭-১৮
৪১. ৬ ১·১৭-২১
৪২. *মনুসংহিতা* ৯ ৭৪
৪৩. ঐ
৪৪ ঋণেব পবিশোধ
৪৫. *সংহিতা* ২ ৪৯-৫২
৪৬ *মনুসংহিতা* ৮.৪১৬-এব উপবে টীকা।
৪৭ *ধর্মসূত্র* ২ ৬·১৪ ৯
৪৮. *ধর্মসূত্র* ২ ২:৪৯
৪৯ ৮·৪১৬; এবং *কাত্যায়ন ধর্মসূত্র* ৯০২
৫০. ঐ ৯০৪
৫১. *কাত্যায়ন ধর্মসূএ* ৯০৫, ৯০৭, ৯১১
৫২ ঐ ৯১৪
৫৩. ঐ ৯১৬
৫৪. *মনুসংহিতা* ৯ ১০, ১১
৫৫. ১·৮৬
৫৬. ১৮·১৯
৫৭ ২ ১৩৫
৫৮. *নারদ ধর্মসূএ*, স্ত্রীপুরুষৌ অধ্যায় ৫৫:৯৮-১০১
৫৯. ৯:৬৪-৬৮
৬০. ৫:৪৫
৬১. *ধর্মসূত্র* ২৯ ৯
৬২ ষষ্ঠ অঙ্ক
৬৩. *অর্থশাস্ত্র*; ধর্মস্থীয় ৩:১৬
৬৪. ঐ ২, ২২:২৯৪
৬৫. ঐ ২, পূর্ববৎ/২৯৬
৬৬. *যাজ্ঞবল্ক্য ধর্মসূত্র* ১.৭০
৬৭. ঐ ১·৭৬
৬৮. *গৌতম ধর্মসূত্র* ২৩শ শ্লোক
৬৯. *যাজ্ঞবল্ক্য ধর্মসূত্র* ১·৭০, ৭২

৭০. *ধর্মসূত্র* ২১:১২
৭১. ঐ ২৪
৭২. *ধর্মসূত্র* ১১:১০:২৮, ২৯, ২.২:৪৮
৭৩. মতি চন্দ্র, *দি ওয়ার্ল্ড অফ কার্টিসনস*, বিকাশ ১৯৭৩, পাতা ৪৮
৭৪. আমার লেখা, 'প্রাচীন ভারতে গণিকা' এই বইযে অন্তর্ভুক্ত।
৭৫. ২২:২
৭৬. ৪:৪.৩:১৩
৭৭. *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা* চতুর্থ খণ্ড, পাতা ১৯৯
৭৮. অষ্টনাম, লোকপালনম মাত্রাভিবনিমিত্ত নপাহ
৭৯. ২:৬:২০
৮০. *সিভিলাইজেসন অফ দি এনসিয়েন্ট মেডিটেরিয়ান* 'গ্রিস অ্যান্ড রোম' প্রথম খণ্ড, পাতা ৫৯৪
৮১. ঐ পূর্ববৎ, ৫৯৬
৮২. ঐ ৬১২
৮৩. স্ত্রী ও দাসদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি
৮৪. ঐ ৩১৪
৮৫. ঐ ৬২০
৮৬ ঐ ৫৯২
৮৭ সারাহ বি পমেরয় ১৯৭৫, *গডেস, হোরস, ওয়াইভস অ্যান্ড স্লেভস*, নিউইয়র্ক, পাতা ৪১।
৮৮. নওয়াল এল সাদবি ১৯৮০, *দি হিডেন ফেস অফ ইভ*, ডেড প্রেস, পাতা ৬৩
৮৯. ২.১:১৩, ৪:১:১

শাস্ত্রে পণপ্রথা ও স্ত্রীধন

বধূদাহন ও অন্যান্য নানা প্রকার পণপ্রথার কারণে হত্যা আজকাল সংবাদপত্রে এতই দৈনন্দিন ব্যাপার যে শাস্ত্রে তার মূল খোঁজার এবং এই সব দুষ্ট ধারণা ও কার্যকলাপের অবসান ঘটানোর তাগিদ বাড়ে। এই সব হত্যার প্রধান কারণ অসন্তুষ্ট শ্বশুর-শাশুড়ি, তাদের অপূরণীয় অর্থলিপ্সা, যা প্রাথমিক ভাবে বর ও তার পরিবারকে বিবাহের সময়ে দেওয়া পণের দ্বারা উদ্দীপিত হয় কিন্তু পরিতুষ্ট হয় না। এর বৃদ্ধি ঘটে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও লোভকে কেন্দ্র করে এবং এর অবসান নির্ভর করে পুরুষের আত্মমর্যাদার উপরে, যা অনুপার্জিত যে কোনও রকম অর্থ গ্রহণ করে নিজেকে বিকিয়ে দিতে অস্বীকার করে।

সর্ব প্রাচীন *ঋগ্বেদ*-এর সংহিতায় বধূ বা বরের কারও পক্ষ থেকেই অর্থ বা অন্য কোনও রকম ধনের আদান-প্রদানের উল্লেখ নেই। বিবাহের সর্বপ্রথম উল্লেখ হচ্ছে 'কুমারী নিজের সঙ্গী বেছে নেয়।' (*ঋগ্বেদ সংহিতা* ১০:২৭:১২) বোঝাই যায়, পুরুষ ও তার সঙ্গী বেছে নিত; কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এটা স্বাধীন নির্বাচন, কোনও পক্ষের কোনও অর্থদানের উপর নির্ভর করে না। এক জায়গায় *ঋগ্বেদ*-এ অবশ্য দোষযুক্ত বরের বধূর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা আছে। (১:১০৯:২) *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডল থেকে শুরু করে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বিবাহের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে, যেমন সূর্যকে বলদের গাড়িতে করে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়া। এই সূক্তে বলা হয়েছে, বধূর পিতা বরের গৃহে উপহার পাঠিয়েছিলেন (প্রাগুক্ত ১:৮৫:১৩)। এই উপহার স্পষ্টতই কন্যার উদ্দেশ্যে পিতামাতার স্নেহোপহার। এটা প্রকৃতপক্ষে পণ নয়।

পরবর্তীকালের একটি বৈদিক গ্রন্থ, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর আশপাশে সংকলিত *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-য় বলা হয়েছে, নবদম্পতি যখন বরের গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, তখন বধূ 'ধরে থাকে' (শকটাট), কারণ বধূ সব 'গৃহ সম্পত্তির' কর্ত্রী। (৬:২:১:১) মনু গৃহসম্পত্তির অর্থে 'পরিনাহ্য' শব্দটি ব্যবহার করছেন এবং এই মন্ত্রটি ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, বলেছেন, 'বধূ সম্পত্তির তদারকের দায়িত্ব পেয়েছে।' (*মনু সংহিতা* ৯:১) এই ভাবে সাংসারিক সম্পত্তির উপর স্ত্রীর স্বত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। যদিও জৈমিনি বলেছেন নারীদের কোনও কোনও বিশেষ সম্পত্তির অধিকার থাকতে পারে ও থাকে, *মনু সংহিতা* (৮:৪১৬)-র উপরে টীকা করতে গিয়ে মেধাতিথি বলেছেন, নারী যা উপার্জন করে তা সবই তার স্বামীর। স্পষ্টতই সামাজিক মনোভাব হল নারীর নিজস্ব ধন-সম্পত্তিতে অধিকার নেই। দুঃখের বিষয়, আধুনিক ভারতবর্ষেও বহু পরিবারে এমন মনোভাব এখনও দেখা যায়। পুরুষের যেমন সম্পত্তির

উপর সম্পূর্ণ অধিকার, নারীর তা নয়।

তা সত্ত্বেও বিবাহের সময়ে নারীকে তার পরিবার ও বন্ধুবর্গ উপহার দিত এবং পরে তার স্বামীর পরিবারও দিত। পারিভাষিক ভাবে বিবাহের সময়ে অগ্নির সামনে তাকে যা দেওয়া হত (অধ্যগ্নি) এবং স্বামীগৃহে যাওয়ার সময়ে পথে তাকে যা দেওয়া হত (অধ্যাহবনিক)— যা স্নেহবশত (অপরে) তাকে দিত বা তার ভাই বা মাতা পিতা তাকে যা দিত— এই দুটি হল স্ত্রীধন, নারীর ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি। (*মনু সংহিতা* ৯:১৯৫) মনু যে কেবল বধূর নিজস্ব সম্পত্তি স্বীকার করেন তা নয়, তিনি বলেছেন, কন্যাপণ শুধুমাত্র সর্বনিকৃষ্ট আসুর বিবাহেই গ্রহণযোগ্য (প্রাগুক্ত ৩:৩৯)। অন্যান্য আচার্যদের মতো উদ্ধৃত করে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে আর্য বিবাহে কন্যার পিতা বাধ্য হয় বরকে একটি গরু এবং ষাঁড় দিতে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিকে নিন্দা করে তিনি বলেছেন, এটি মিথ্যা, 'কারণ ছোট হোক বা বিশাল হোক, পণ হল আনুষ্ঠানিক ভাবে বরের বিক্রয়।' (প্রাগুক্ত ৩:৫৩) এর উপর জোর দিতে মনু আরও বলেছেন 'যে সব বিবাহে কন্যার ক্ষতিপূরণ মূল্য গ্রহণ করা হয়, সেখানে (বরের) বিক্রয় হয় না, সেখানে কন্যা সম্মানিতা হয় এবং তার প্রতি সদয় আচরণ করা হয়।' (প্রাগুক্ত ৩:৫৪)

যদি কোনও কারণে স্বামী বধূকে কোনও স্ত্রীধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার জীবদ্দশায় তা পূরণ করতে না পারে, তার পুত্রদের তখন তা তাদের মাকে দিতে হয়। অপরার্ক নামে এক টীকাকার বলেছেন, স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, এমনকী পিতারও স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়ার বা দান করার অধিকার নেই। কেবলমাত্র দুষ্টা ও অপব্যয়ী পত্নী স্ত্রীধনের উপর অধিকার হারাতে পারে। তবে এখানে একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, কারণ স্বামী এবং/অথবা তার পরিবার স্ত্রীকে অপব্যয়ের অপবাদ দিলেই স্ত্রীধন থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারে। এই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা মনে করি যে জুয়া খেলে, সুরা ও নারীতে, এমনকী কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্যকলাপে সম্পত্তি উড়িয়ে দিলে স্বামীকে নিয়ন্ত্রিত করার স্ত্রীর কোনও আইনগত অধিকার নেই। পরাশর তাঁর *গৃহ্যসূত্র*-এ পরিষ্কার বলেছেন, মাতার মৃত্যুর পর স্ত্রীধন কন্যাদের কাছে যায়। কেবলমাত্র কন্যা না থাকলেই পুত্র তা পেতে পারে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, এখানে উদ্দেশ্য হল স্ত্রীধনের সঙ্গে একক ভাবে বধূকে এবং সাধারণ ভাবে তার আত্মীয়াদের যুক্ত করা, বোধহয় এই কারণে যে স্ত্রীধনই নারীর একমাত্র সম্পত্তি। কাত্যায়ন স্ত্রীধনের উপরে আরও পরিস্ফুট: সাতাশটি কারিকায় তিনি বধূর এই একমাত্র সম্পত্তির লক্ষণ করেছেন। বিবাহে যা সে তার পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নি, অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুর কাছ থেকে পায়, যা সে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের কাছ থেকে লাভ করে, প্রথমবার পিত্রালয়ে ফেরার সময়ে তাকে তার পরিবার থেকে যা দেওয়া হয়, তা সবই তার নিজস্ব। কাত্যায়ন বলেন, শুল্ক হল মূল্য, যা বর বধূকে দেয়, বিবাহের সময়ে বা তার গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময়ে। *স্মৃতিচন্দ্রিকা* বা *ব্যবহারময়ূখ*-এর মতো পরবর্তী গ্রন্থে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করা হয়েছে। বরদরাজ কিন্তু তাঁর ব্যবহার নির্ণয়ে বলেছেন, শুল্ক দুই প্রকার হতে পারে: (১)

বধূর শ্বশুর-শাশুড়ি তার পিতামাতাকে যা দেন, যা তার মৃত্যুর পরে তার মা এবং/অথবা ভাইয়েরা পায়; এবং (২) তাকে অলংকার বা গৃহস্থালীর সামগ্রীর মূল্য বাবদে বর যা দেয়। কাত্যায়ন যোগ করেছেন যে, তার 'শিল্প' দিয়ে সে যা উপার্জন করে এবং অপরের কাছ থেকে যা পায় তা তার স্বামীর প্রাপ্য, কিন্তু অবশিষ্ট সবই স্ত্রীধন। এতে করে বধূকে প্রায় সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু আর এক স্মৃতিকার দেবল বলেন, ভরণপোষণ, শুল্ক এবং সুদ থেকে যে লাভ হয় তা পুরোপুরি স্ত্রীধন, যার উপরে বধূর সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে। মনুর প্রখ্যাত টীকাকার মেধাতিথি বলেছেন অলংকার যদিও সাক্ষাৎ ভাবে বধূকে দেওয়া হয়নি, কিন্তু সে স্বামীর অনুমতি নিয়ে তা পরে, তাই তাও স্ত্রীধনেরই অন্তর্ভুক্ত।

আর এক ধরনের স্ত্রীধনকে বলা হয় সৌদায়িক। যা কিছু যে কেউ দেয়, তা সে তার নিজের পরিবারের হোক, বন্ধু লোক, স্বামীও তার পরিবার বা তাদের বন্ধু হোক— তা সৌদায়িক। (*দায়ভাগ* ৪:১:২১) অপরার্ক বলেছেন, এই সম্পত্তি সম্পূর্ণ ভাবে বধূর; সে তা দান করতে পারে, বন্ধক রাখতে পারে, যদি তা ভূসম্পত্তি হয়, তাহলেও।

পরবর্তী গ্রন্থ *স্মৃতিচন্দ্রিকা* স্ত্রীধন হিসেবে বধূ কত দূর পেতে পারে তার সীমা নির্দেশ করে। সব রকম উৎস এক করলে সে দু'হাজার পণ পর্যন্ত পেতে পারে, কিন্তু সে ভূমির অনুদানও পৃথক ভাবে পেতে পারে। (২:২৮১) *ব্যবহারময়ূখ*-এ কিন্তু বলা হয়েছে, সে বাৎসরিক দু হাজার পণ উপার্জন হয় এ রকম সম্পত্তির অধিকার পেতে পারে। কিন্তু এককালীন উপহার হিসেবে তার আরও বেশি অধিকার ছিল। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, পূর্বাচার্যগণ বলেছেন অলংকার এবং অন্যান্য যা ধন তার আত্মীয়রা উপহার হিসেবে দেয় তা পত্নীর নিজস্ব। (২:৬১৪:৯) বৌধায়নের মতো কন্যা মায়ের অলংকার এবং অন্যান্য প্রথাগত উত্তরাধিকার পায়। (*ধর্মসূত্র* ২:২:৪৯) বশিষ্ঠও বলেছেন, যা মায়ের স্ত্রীধন ছিল, তা তার কন্যাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, তা তখন তাদের নিজস্ব স্বাধীন সম্পত্তি (১৭:৪৬)।

ভিন্ন ধরনের বিবাহের উপহার হল যৌতুক। ব্যুৎপত্তিগত ভাবে তার অর্থ বিবাহের সময় দম্পতি (যুতক)কে যা দেওয়া হয়। (*কাত্যায়ন ধর্মসূত্র*; ৯০৫, ৯০৭, ৯১১) এই বিশেষ উপহারটিতে সম্ভবত দম্পতির যৌথ অধিকার ছিল। পুঁথিগত ভাবে অন্তত এই সম্পত্তির উপর পুরুষের নারীর মতোই অধিকার ছিল।

মনু স্ত্রীধনের একটি রক্ষাকবচের কথা উল্লেখ করেছেন: যে আত্মীয়েরা মূর্খতাবশত (বধূর) দাসী, রথ বা বস্ত্র ব্যবহার করে, তাদের সর্বনাশ হয়। (৩:৫২) তাই বোঝা যায়, নারীর স্ত্রীধনকে বেআইনি ভাবে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের ব্যবহার করার ঘটনা ঘটত, এবং তাকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। বধূ মনে হয় সম্পূর্ণ ভাবে অসহায় এবং নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারত না। এ নিয়ম কিন্তু শুধু ধনী মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (দাসী ও রথের উল্লেখ দ্রষ্টব্য); অপেক্ষাকৃত দরিদ্র যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং যাদের অনেক কম সম্পত্তি ছিল, তারা তাদের যৎসামান্য সম্পত্তির উপরে শ্বশুরবাড়ির লোভী হস্তক্ষেপে নিঃস্ব হয়ে পড়ত।

প্রাচীন ও পূর্ব মধ্যযুগীয় সমাজের দুটি গুরুতর বৈশিষ্ট্য উপরের এই বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথমত, পুঁথিগত ভাবে নারীর সম্পত্তির, এমনকী ভূমির, উপরেও অধিকারের ধারণা ছিল। যেহেতু তাকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হত না এবং তথাকথিত নিম্ন অর্থাৎ শ্রমজীবী বা কৃষিজীবী শ্রেণি ছাড়া তার অর্থকরী জীবিকাও ছিল না, সে অন্ন বস্ত্র আশ্রয় ও জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য তার স্বামী ও তার পরিবারের পোষ্যই ছিল। তাই তারা তার ধন খুশি মতো খরচ করে দাবি করতে পারত, তার ভরণপোষণের জন্য তা ব্যবহার হয়েছে। সেও তাদের যুক্তি খণ্ডন করতে সফল হত না। রানি বা ধনী নারী, যাদের পিতা বা ভ্রাতা সামাজিক ভাবে তার শ্বশুরবাড়ির চেয়ে বেশি শক্তিশালী, তারা ছাড়া আর সকলের সৌদায়িক স্ত্রীধন বা যৌতুক, সবই স্বামী এবং তার পরিবারের হাতে যেত। যেমন এখনও যায়।

দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য আমাদের প্রবল ভাবে নাড়া দেয় তা হল, খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীগুলির কালেও, এমনকী মনুর সময় পর্যন্ত, বধূর পরিবারের পক্ষ থেকে বরের পরিবারকে পণ দেওয়ার ধারণা স্বীকৃত ছিল না, অনুমোদিতও নয়। *রামায়ণ-মহাভারত*-এ সমাজের যে প্রতিফলন ঘটেছে, সেখানে বধূ ও বরের পরিবারের মধ্যে উপহার বিনিময়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। মনু খুব পরিস্ফুট ভাবেই বলেছেন যে, বধূর পরিবার যদি পণ দেয় তবে বিক্রয়ের প্রসঙ্গ আসে। 'পণ' শব্দটির অর্থ 'মূল্য', এবং বধূর পরিবার যদি মূল্য দেয় তবে তারা কী কিনছে? অবশ্যই বরকে, যে তখন 'পণ' হয়ে দাঁড়ায়। স্পষ্টতই এ ধারণা সমাজে জুগুপ্সাজনক। এতে বরের সামাজিক সম্মান ও আত্মমর্যাদাও হ্রাস করে, কেননা এতে সে তার শ্বশুরকুলের কাছ থেকে পণ মূল্য গ্রহণ করার লজ্জা অনুভব করে না, ফলে তার দাম্পত্যজীবন ব্যবসায়িক বেচাকেনার উপরে নির্ভর করছে। তার সম্মানবোধের সম্পূর্ণ নিঃস্বতাই প্রমাণ করে। মনুর যুগেও সে সাধারণ ভাবে সমাজ এবং বিশেষ ভাবে তার শ্বশুরবাড়ির দ্বারা স্বীকৃত, তা সে মনে করত না। আবার এই স্বীকৃতি যে শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে সে যে পরিমাণ পণ আদায় করতে পারে তার দ্বারা নির্ধারিত, এমনও সে মনে করত না। পরে পণ দেওয়া নেওয়ার এই ঘৃণ্য প্রথায় লজ্জার লেশমাত্র রইল না। কন্যার পিতামাতা যে মুহূর্তে বর কেনার জন্য মূল্য দিতে সম্মত হল, তখনই তারা বধূর পরিবারকে চাপ দিয়ে আরও বেশি আদায় করার জন্য শ্বশুরকুলের লোভকে আরও শান দিল। এই লোভের যথার্থ খাদ্য যোগাতে না পারার ফল হত— এখনও হয়— বধূর সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার। সে যদি এই যন্ত্রণার জীবন মেনে নিত তাহলে তাকে জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকতে হত। যদি সে তা না পারত— বা এখনও যদি না পারে— সে আত্মহত্যা করে তার অবসান ঘটায়। যদি তার মধ্যে সেই মরিয়া 'সাহস' না আসে, তাহলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তা নিজেদের হাতে তুলে নেয়; বিষ, আগুন, অথবা উঁচু জায়গা থেকে সফল একটি ঠেলা দেওয়া। যে অবাঞ্ছিত বধূর পিতামাতা প্রত্যাশিত কামধেনুর ভূমিকা পালন করতে চায় না বা আর পারে না, তাকে সরিয়ে দেওয়ার কত রাস্তাই না আছে। তা ছাড়া, প্রবাদে বলে, 'ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার গরু মরে।' শাস্ত্র

বিপত্নীককে খোঁচায়— আবার এবং যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ করতে। তারপরে, যদি ভাগ্য ভাল হয় তবে তৃতীয়বার, চতুর্থবার যতবার হয়— নির্লজ্জ ভাবে, বারে বারে। তার বয়স কোনও বাধা নয়, কারণ নারী তো সস্তা পণ্যদ্রব্য, আর কুমারী মেয়ে মা-বাবার লজ্জা। তাই পুনঃ পুনঃ বিবাহ অর্থোপার্জনের একটি বর্ধমান উপায় হয়ে দাঁড়াল এবং এই প্রথা এখন চেতনাকে এত লজ্জাহীন ও অনুভূতিহীন করে তুলেছে যে কোনও পক্ষই আর কোনও লজ্জা অনুভব করে না।

কিন্তু তবু এটি একটি সম্পূর্ণরূপে দুষ্ট ও লজ্জাকর নিয়ম। দরিদ্র পরিবারের বধূ সংসারে কায়িক শ্রম দেয় এবং ধনী ঘরের বধূ ভাল পণ নিয়ে আসে। সুতরাং দ্বিতীয়টি বরকে কিনে নেয়, কিন্তু সে এই প্রথায় লজ্জাবোধ করার পরিবর্তে নিজের বাজার দর নিয়ে বড়াই করে, তাই সহজেই মেনে নেয় সে পণ্যদ্রব্য ছাড়া আর কিছু নয়। এই কুপ্রথা আমাদের সমাজজীবনে এতটাই ওতপ্রোত এবং ব্যাপক যে শিক্ষিত ছেলেরাও কোনও রকম বিবেকের দংশন ছাড়াই এই জঘন্য প্রথাকে মেনে নেয়। প্রায়ই তারা সুবোধ সন্তান হওয়ার ভান করে, নোংরা কাজটা পিতামাতার হাতে ছেড়ে দেয়। শাস্ত্রে বলে, 'কন্যা একটি পরিবারকে দান করা হয়', অতএব সমগ্র পরিবার তার কাছ থেকে সেবা আদায় করতে পারে, ইচ্ছামতো তার উপরে অত্যাচার করতে পারে, আরও বেশি টাকা আদায়ের জন্য তার বাবা-মাকে চাপ দিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত আর পণ না দিলে তাকে মেরে ফেলতেও পারে। তারপরে সে আবার স্ত্রী ঘরে আনে— সমস্ত পদ্ধতিটার পুনরাবৃত্তি করে।

এ কথা সত্য যে পাশ্চাত্য দেশেও পণপ্রথা ছিল— অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের আগে পর্যন্ত নারীকে নিকৃষ্ট জীব ও দাসী হিসেবে দেখা হত। কিন্তু গত দুই শতাব্দীতে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, পশ্চিমে পণের নির্লজ্জ আদানপ্রদান পশ্চিমে লোপ পেয়েছে। শিক্ষা এবং স্ত্রী পুরুষের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থানের ফলে উন্নততর আলোকপ্রাপ্তি ঘটেছে যা এই প্রথার অবসান এনেছে। কিন্তু শিক্ষা সত্ত্বেও, এমনকী নারীশিক্ষা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে বরের পরিবারের এই লোভ কমেনি, মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যে ছাড়া। বরং নানাপথে কালো টাকা ও সহজলভ্য টাকার আবির্ভাবের ফলে এই পণের লোভটা আরও বেড়ে উঠেছে। গোপন পণ, অর্থাৎ মনস্তুষ্টি ঘটানোর উপহার অনুপার্জিত ধনের জন্য লিপ্সা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং সেই ভাবে এই নির্লজ্জ প্রথা চলতেই থাকে। এখন বধূর পরিবার কখনও কখনও হঠাৎ বড়লোক, উপযুক্ত বরের জন্য অর্থ ও অন্যান্য বস্তুতে যে অসীম পরিমাণ খরচ করেছে সে বিষয়ে বড়াই করে বেড়ায়, ভুলে যায় যে এই ভাবে তারা বরের পরিবারকে এই ধারণা দেয় যে এখানে সোনার খনি আছে, অনির্দিষ্টকাল ধরে যা থেকে লাভ করা যায়।

পণ, স্ত্রীধন এবং সৌদায়িক— এই সব উপহারের প্রধান প্রাপক বধূ। শুধু যৌতুকের ক্ষেত্রে দম্পতি তার যৌথ প্রাপক। কিন্তু বেশির ভাগ পরিবারেই শ্বশুর-শাশুড়ি নিজেদের মেয়ের বিয়ে দেয় অথবা বরকে বিদেশ পাঠায় বধূর বাড়ি থেকে পাওয়া অর্থে। তারা সহজে

এবং বিনা লজ্জায় বধূর পরিবারের কাছ থেকে আদায় করা ধন ভোগ করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের আরও বেশি অর্থলিপ্সা বধূর পিতামাতাকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। সত্য কথা, পরবর্তী শাস্ত্রে অনুচ্চারিত ভাবে, কখনও স্পষ্ট ভাবে এই প্রথা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের কি ভুলে যাওয়া উচিত, এমন কি মনু, যিনি এমনিতেই প্রাচীন পন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল, তিনিও এমন পরিস্ফুট ভাবে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে কেবলমাত্র আসুর বিবাহেই পণ স্বীকৃত? তিনি এবং আরও কয়েকজন ধর্মশাস্ত্রকার বলেছেন যে এই প্রথার অর্থ হল পণের টাকা নিয়ে নিজের পুত্রকে বিক্রি করা এবং এমন ইঙ্গিত দেন যে, কোনও আত্মসম্মান বিশিষ্ট পুরুষের এই বিক্রয়ে সায় দেওয়া উচিত নয়। পণ দেয় বা নেয় যারা, তাদের সামাজিক ভাবে একঘরে করে রাখা অথবা মাইক্রোফোনে বা পোস্টারে এই ঘৃণ্য কাজ ঘোষণা করা, এই সব হয়তো এই প্রথার বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করবে। মেয়েদের উচিত, যে বর পণ চায় তাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করা, তাদের নিজেদের বিবাহের সময়ে পিতামাতার থেকে আদায় করা আরামের সামগ্রীর উপর এই নিকৃষ্ট লোভ ত্যাগ করা উচিত। ছেলেদের উচিত, যেখানে অর্থ বা সামগ্রী— যেমন আসবাব, গহনা, গাড়ি, ফ্রিজ, ইত্যাদি— বধূর সঙ্গে দেওয়া হয়, সেখানে বিবাহ করতে অসম্মত হয়ে তাদের পিতামাতা, পরিবার ও আশপাশের সামাজিক পরিবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, তাদের বধূ ছাড়া আক্ষরিক ভাবে কোনও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করার সংকল্পে স্থির থাকা উচিত, কারণ তা মানবিক সম্মানের পরিপন্থী এবং প্রাচীন গ্রন্থকারেরাও নিম্নতম স্তরের বিবাহই কেবল স্বীকার করেছেন। ছেলেদের উচিত অনুপার্জিত অর্থ গ্রহণ করা যে শুধু অপরাধ তা নয়, তাদের নিজেদের উপার্জনক্ষমতার বিরুদ্ধে অপমান, এ কথা ঘোষণা করা; এই প্রথা তাদের মানবিক সম্মানের অবমাননা এবং তাদের আত্মসম্মানের পরিপন্থী।

তনয়া

প্রাচীন ভারতবর্ষে পুত্র জন্মালে শাঁখ বাজত, কন্যা জন্মালে নয়। তা ছাড়া ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠী, সবই পুরুষকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান। জন্মদিনও ছেলেদেরই বেশি হয়। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ বলা হয়েছে: যে নারী পুত্রের জন্ম দেয় সেই শ্রেষ্ঠ নারী। যে নারী কন্যার জন্ম দেয় তাকে বারো বছর পরে ত্যাগ করা যায় (৬:৩:১৭:১৩)। *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* (২:৪:৬) ও *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* (১:১০:৫১-৫৩; ২:৫:১১,১৪) অনুযায়ী প্রাচীন সমাজ কন্যার জন্মে হতাশ হত। *মনুসংহিতা*-য় বলা হয়েছে, পুৎ নামক নরক থেকে উদ্ধার করে বলে 'পুত্র' বলা হয়; শাস্ত্রকারেরা কল্পনাশক্তি দিয়ে এমন একটি নরক সৃষ্টি করার প্রয়োজন মনে করেননি, যেখান থেকে কন্যা তার পিতামাতাকে রক্ষা করতে পারে। পিতার মুখাগ্নি করার মৌলিক অধিকার পুত্রেরই আছে, মৃত পিতাকে পিণ্ডদান ও পিতামাতার শ্রাদ্ধেরও অধিকার আছে। কারণ সমাজে বাল্যবিবাহের অনুপ্রবেশ ঘটার পর বিবাহের সময়ে বালিকা কন্যার গোত্রান্তর হত, তাই ভিন্ন গোত্রের পিতামাতার জন্য তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করার অধিকার ছিল না। কিন্তু পিতামাতার সঙ্গে একই গোত্র হওয়ায় পুত্রের সেই অধিকার ছিল। পিতা যেহেতু পরলোকে তার মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করার বিষয়ে পুত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল, পুত্রের সামাজিক মূল্য কন্যার চেয়ে বেশি, কন্যা সেই অনুপাতে উপেক্ষিত।

তৈত্তিরীয় সংহিতা য় আমরা দেখি, সোমযাগের একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে কতগুলি যজ্ঞীয় পাত্র মাটিতে রাখা হত, কতগুলি আবার উপরে রাখা হত। 'সেইজন্য শিশুকন্যাদের জন্মের পর মাটিতে রাখা হয়, শিশুপুত্রদের তুলে ধরা হয়।' (৬:৫:১০:৩) রোমে শিশুকে জন্মের পর মাটিতে রাখা হত এবং পিতাকে ডাকা হত। পিতা যদি শিশুকে দেখে বেঁচে থাকার যোগ্য মনে করত, সে তাকে মাটি থেকে তুলে নিত। এখান থেকেই আমরা ইংরেজি 'rearing up the child' বাক্যাংশটি পেয়েছি। কিন্তু লক্ষণীয় যে এই 'তুলে ধরা'য় ছেলে-মেয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হত না। এ দেশে কন্যাসন্তান জন্ম থেকেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।

গর্ভাবস্থায় 'পুংসবন' অনুষ্ঠান করা হত, যাতে নলজাতক পুত্রসন্তানই হয়, কন্যা নয়। সমাজ নানা মন্ত্র ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটাই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে— সদ্যোজাত সন্তানটি যেন সব সময়ে পুত্রই হয়। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর আশপাশে রচিত *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ বলা হয়েছে, 'নারী অমঙ্গলজনক, কন্যা অভিশাপ।' (৬:৩:৭:৩) *মহাভারত*-এও দেখি কন্যা শোকের কারণ। (১:৫৯:১)

আমরা শুনতে পাই পূর্বজন্মের পুণ্যফল পুরুষ হয়ে জন্মানো যায়। *মহাভারত*-এ স্পষ্টই বলা হয়েছে, পূর্বজন্মের পাপের ফলে নারী হয়ে জন্মাতে হয়। (৬:৩৩:৩২) এক নারীর আত্মত্যাগে সন্তুষ্ট হয়ে বুদ্ধ এক সময়ে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, সে যেন পরজন্মে পুরুষ হয়ে জন্মায়। সোজা কথায়, এই গল্পটি সেই ধারণাই সমর্থন করে যে নারী হিসেবে জন্ম ঘৃণ্য, কিন্তু পুরুষ হয়ে জন্মানো শুভ, কারণ তা পূর্বজন্মের পুণ্যকর্মের ফল। তাই কন্যার জন্মে পরিবারের বা সমাজের সব সদস্যরা তৎক্ষণাৎ মনে করত, সে নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে কোনও পাপ করেছে, তাই কন্যা হয়ে জন্মেছে।

সমাজ সাধারণ ভাবে কন্যাদের শিক্ষার অধিকার দেয়নি, কারণ উপনয়ন না হলে কেউ বেদ পড়তে পারে না এবং কন্যাদের উপনয়ন হতে পারে না। কিন্তু কয়েকটি সম্মানজনক ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল; *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*-এ বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি পণ্ডিতা ও দীর্ঘায়ু কন্যা কামনা করে, তার উচিত তার পত্নীকে তিল ও ঘি দিয়ে অন্ন খাওয়ানো।' (৬:৪:১৭)

অতএব কিছু মানুষ নিশ্চয়ই শিক্ষিত কন্যা চাইত এবং কন্যাদের শিক্ষা দেওয়ার কোনও উপায় খুঁজে পেয়েছিল, এগুলি যদি ব্যতিক্রমও হয়। সারা পৃথিবীতেই কিছু দিন আগে পর্যন্ত নারীর শিক্ষার অধিকার স্বীকার করা হত না। এখানেও ঠিক তাই। মনু বলেছেন, 'বিবাহ হল নারীর উপনয়ন, স্বামীর গৃহে জীবন কাটানো গুরুগৃহবাস এবং স্বামীসেবা বেদপাঠ।' (মনু সংহিতা ২:৬৭)

সাহিত্যে কন্যার শৈশবের কোনও বর্ণনা নেই। কালিদাসের *কুমারসম্ভব*-এ দু' একটি শ্লোকে গৌরীর শৈশবের বর্ণনা আছে, যদিও গৌরী পূর্ণ দেবী। কৃষ্ণের শৈশব সম্বন্ধে কিন্তু শুধু যে বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি আছে তাই নয়, সঙ্গীতে, চিত্রে, মূর্তিতে, যাত্রাভিনয়ে তার অসংখ্য বর্ণনা আছে। কোনও দেবীর বা কোনও নারীর শৈশবের এ রকম বর্ণনা কিন্তু কখনও মেলে না।

পুরুষকেন্দ্রিক সমাজে কন্যা অবাঞ্ছিত অতিথি। রাজস্থানে জন্মের পরেই কন্যা হত্যার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এখনও ওই রাজ্যে এমন কিছু গ্রাম আছে যেখানে কোনও কন্যাসন্তান নেই; গ্রামবাসীরা প্রতিবেশী গ্রাম থেকে স্ত্রী জোগাড় করে। এ দেশে অন্তত ২৫০০ বছর ধরে দৃঢ়মূল ধারণা আছে যে কন্যা অমঙ্গল। কন্যাপণ যখন ধীরে ধীরে অথচ সাধারণ ভাবে যৌতুকে পরিণত হল, যা আবশ্যিক এবং আকাশচুম্বী, যাতে পিতামাতা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়, সমাজ যে তখন এই যন্ত্রণার মূল কন্যাকে দৈব নিষ্ঠুরতা হিসেবে দেখেছিল, তা আশ্চর্য নয়। তাই পণপ্রথা প্রচলিত হওয়ার পর এই বিশ্বাস, যা জনমানসে আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা অর্থনৈতিক স্বীকৃতি পেল।

তার মানে সব কন্যাসন্তান সব সময়েই পিতামাতার কাছে অবাঞ্ছিত ছিল বা তাদের স্নেহ পেত না, তা নয়; সমাজে নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ছিল। অনেক পরিবার ও ব্যক্তির উদারনৈতিক মতবাদ কন্যার আগমনকে উষ্ণ ভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, কিন্তু আগে যা বলা হল তা হল সাধারণ চিত্র। পরিবারে পুত্র ও কন্যার প্রতি যত্ন ও স্নেহের তারতম্য এখনও অনেক

ক্ষেত্রেই চমকে দেয়। সমাজতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসকদের গবেষণা দেখিয়েছে যে অপুষ্টির অনুপাত ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে অনেক বেশি। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অবহেলা অনেক বেশি হয় এবং অনেক বেশি দিন ধরে হয়। যে মায়ের শুধু মেয়ে আছে, সে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে, অপরাধবোধে ভোগে। সে যে উত্তরাধিকারী ও শ্রাদ্ধাদিকারী না হতে পারার অপরাধবোধ। পুত্র ও কন্যার মধ্যে সাম্যভাবের অভাবে অনেক পরিবারে মেয়েরা সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। শাস্ত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যার ফলে বহু শতাব্দী ধরে তাকে কোথাও জন্মের পরেই হত্যা করা হয়েছে, কোথাও অবহেলা করা হয়েছে এবং সারা দেশেই পরিবারে ও সমাজে নীচু চোখে দেখা হয়েছে। সে অস্বাস্থ্যে ভোগে, রোগের সময়ে অবহেলিত হয় এবং অবহেলা ও অপুষ্টির কারণে তার ক্ষেত্রে মৃত্যুর আনুপাতিক হার অনেক বেশি।

আধুনিক যুগে এর আর একটি প্রকাশ হল, গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য পিতামাতার অশোভন, উগ্র আগ্রহ, যাতে চিকিৎসকেরা সহায়তা করেন। এগুলি একত্র হয়ে দিবালোক দেখতে পাওয়ার পূর্বেই কন্যাসন্তানকে হত্যা করে। আজকেও কী আমরা শুধু কথায় নয়, কাজেও স্বীকার করতে পারি না, যে পুত্র এবং কন্যার দু'জনকেই সমান স্থান দেওয়া পিতামাতা ও সমাজের আবশ্যিক মানবিক কর্তব্য? এর ব্যতিক্রমকে মহাপাপ বলে গণ্য করার সময় হয়েছে? এবং সেই ব্যতিক্রমকে আইনত দণ্ডনীয় করতে এখন আইন তৈরি করা উচিত। জন্মসূত্রে যে অধিকার এবং পারিবারিক ও সামাজিক অভ্যর্থনা কন্যাসন্তানের প্রাপ্য যা এতদিন তাকে অস্বীকার করা হয়েছে, তাই এখন তাকে দেওয়া উচিত? তা না হলে মানবিক মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন ঘটবে; তা না হলে আমাদের সব শিক্ষা লজ্জা পাবে এবং কুটিল বলে গণ্য হবে।

মহাভারত-এ ভার্গব-প্রক্ষেপণের সামাজিক কারণ

পণ্ডিতদের মতে *মহাভারত* মহাকাব্যের সূচনা এবং চূড়ান্ত রূপায়ণ এই দুই পর্বের মধ্যে প্রায় আট শতাব্দী সময় কেটে গেছে— মূল বীর গাথা যা এই মহাকাব্যের বীজ এবং তার পরে প্রক্ষিপ্ত ভাবে এবং কখনও বা ধীরে ধীরে, এই কাব্যের সৃষ্টি নিরন্তর ভাবে এই দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল। এই আট শতাব্দী ধরে উত্তর ভারতে অন্যান্য সাহিত্যও রচিত হয়েছিল— এর মধ্যে ছিল *মহাবস্তু* ও *ললিত বিস্তার*, কিছু কিছু জৈন গ্রন্থ, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*, *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*, পতঞ্জলির *মহাভাষ্য*, বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*; *রামায়ণ* ও *মনুসংহিতা*। এই সময়ের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী স্তরে অর্থাৎ খ্রিস্টিয় যুগের প্রারম্ভিক শতাব্দীগুলিতে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলিতে দেখা যায় বহু উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত অথচ সুসংহত সামাজিক ধ্যান ধারণা মিলে গেছে।

মধ্যপ্রদেশের খোহ গ্রামে একটি লেখে (৫৩৬ খ্রি.) বলা হয়েছে *মহাভারত*-এর শ্লোক সংখ্যা শতসহস্র (১ লক্ষ)[১]; বর্তমানে প্রাপ্ত পুনা সংস্করণে দেখা যায় এই সংখ্যা মোটামুটি ৮২,০০০। মহাকাব্যের মধ্যেই বলা হয়েছে এর শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০০। কেমন করে এই ২৪,০০০ শ্লোকের বীজকাব্য পল্লবায়িত হল ৮২,০০০-এ সে কথাও কাব্যের মধ্যেই বলা হয়েছে।[২] এই কাব্যের মুখবন্ধ ছিল তিনটি; মনুর উপাখ্যান, আস্তিকের উপাখ্যান আর উপরিচর উপাখ্যান।[৩] অর্থাৎ, মহাকাব্যটি রচিত হয়েছিল তিনটি পর্যায়ে, এর তিনটি পৃথক পৃথক নামও ছিল, সম্ভবত রচনার বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই *জয়*, *ভারত* এবং *মহাভারত*।[৪] এই মহাকাব্যে বলা হয়েছে এই গ্রন্থ রচনার পরে ব্যাসদেব তা পাঠ করেন তাঁর পুত্র শুকদেবের কাছে, এবং তারপরে তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের কাছে।[৫] শুকদেব এটি আবৃত্তি করেন জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে এবং সম্ভবত সেই সময়ই চিরন্তন মূল্যবোধের নীতিমূলক আখ্যানগুলি যুক্ত হয়। কিন্তু এই প্রক্ষেপণ খুব বৃহৎ অংশের নয় এবং এই বীরগাথাত্মক কাব্যের মূল সুরের সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত অংশের ভাবনা ও সৌন্দর্যবোধ মিলে যায়। অনেক পরে, শৌনকের দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সোম যজ্ঞে, রাজা সূত লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবসকে মহাকাব্যটি আবৃত্তি করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর প্রথম অনুরোধ ছিল ভার্গব বংশের একটি ঐতিহাসিক, প্রথম বিবরণের জন্য।[৬] এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর ফলে আলোচ্য অংশের রচয়িতা ভৃগুবংশের গুণকীর্তন করার সুযোগ পেয়ে যান, ভার্গবদের কীর্তিকে মহত্তর রূপে প্রচার করা হয় এবং প্রক্ষিপ্ত অংশের অতিরিক্ত প্রামাণ্যতা সৃষ্টির সুযোগ পাওয়া যায়। যখন এই ভার্গবদের বিবরণ শেষ হল, তখন শৌনক ব্যাসরচিত *জয় সংহিতা* শোনার ইচ্ছা করলেন।[৭]

চারণ লোমহর্ষণ ও তাঁর পুত্র উগ্রশ্রবস, এই সূত পরিবার একত্রে প্রক্ষিপ্ত অংশের এক বৃহৎ ভাগের অধ্যায়গুলি রচনা করেন। এই প্রক্ষেপণ, বর্তমান মহাকাব্যটির আকারের দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি; একেই বলা হচ্ছে ভার্গব বা ব্রাহ্মণ্য সংযোজন। রচনাশৈলির বিচারে এই অংশটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অতি-অলঙ্কৃত, শব্দভারাক্রান্ত এবং পুনরুক্তি দুষ্ট।[৮] আদি, বন, দ্রোণ, শল্য, শান্তি এবং অনুশাসন পর্বগুলির অধিকাংশ এই প্রক্ষিপ্ত অংশেরই অন্তর্গত; এবং আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থান এবং স্বর্গারোহণ সম্ভবত সম্পূর্ণ ভাবেই প্রক্ষেপণের অন্তর্ভুক্ত। এখানে আকর্ষণীয় তথ্য এই যে, এই ভার্গববংশেরই কৃষ্ণের জন্ম, যারা তাঁকে মহিমান্বিত করে উপস্থিত করবেন। ভৃগুর পুত্র কবি, তাঁরই সন্তান শুক্রাচার্য, যাঁর কন্যা দেবযানী হয়েছিলেন যদুর জননী; এই বংশধারাতেই কৃষ্ণের জন্ম। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে চূড়ান্ত ভাবে ভার্গবেরা কৃষ্ণের গুণগান করে যাবেন যতক্ষণ না তিনি প্রকৃত অর্থে একজন দেবতা হয়ে উঠেছেন।

মনুসংহিতা-ও সেই একই যুগের সৃষ্টি যখন এইসব সংযোজন ঘটেছিল; এই গ্রন্থ ভার্গব বংশেরই এক শিষ্যের রচিত।[৯] *মহাভারত* কোনও ধর্মসূত্র বা স্মৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করে না; যে সময়ে *মহাভারত* রচিত হয়েছিল তাতে প্রাচীন সূত্রসমূহের প্রকৃত উৎস বিস্মৃতিতে ঢেকে গিয়েছিল, যদিও শাস্ত্রের কোনও বস্তুগত পরিবর্তন ঘটেনি।[১০] এই ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভৃগুবংশের তরুণ ব্যক্তিরা ও শিষ্যেরা, খ্রিস্টিয় যুগের প্রারম্ভিক শতাব্দীগুলিতে দুটি অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করেন; অর্থাৎ *মনুসংহিতা* এবং *মহাভারত*-এর ভার্গব সংযোজন এই সময়ে ঘটেছিল।

আধুনিক পণ্ডিত এম আর ইয়ার্দি, মহাকাব্যের রচনার পর্যায়গুলির বিষয়ে সুক্থঙ্করের মতামত মেনে নিয়েছেন।[১১] কিন্তু তাঁর মতে আরও দু'জন লেখক এই রচনার সঙ্গে জড়িত, যাঁরা *হরিবংশ* এবং আলোচ্য মহাকাব্যের পর্বসংগ্রহ পার্বণ রচনা করেন। *হরিবংশ* অনেক পরবর্তী রচনা, আর পার্বণ অধ্যায়টি মহাকাব্যের উপর তার প্রভাবের বিচারে অকিঞ্চিৎকর। ভার্গব অধ্যায়েই আলোচ্য দুটি পর্বের সূত্রপাত যথাযথ ভাবে আন্দাজ করা যায়। এই সংযোজিত অংশেই যে যুদ্ধ কাহিনি প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের ঘটনার সময়ে তৎকালীন শাসকবংশে কৌরবদের অনুকূলে রচিত হচ্ছিল, সেই কাহিনিকে বিজয়ী পাণ্ডবদের অনুকূলে পরিবর্তিত করা হয়। সূত লোমহর্ষণ ও সৌতি উগ্রশ্রবসের এই রচনাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কেন তাঁরা এই অংশগুলি রচনা করলেন? ভার্গব অংশগুলির সঙ্গে সহঘটিত ভাবে যুক্ত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল সংস্কৃত ভাষার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার। প্রাকৃতের ক্রমশ সমৃদ্ধি হচ্ছিল কিন্তু বিদেশি অভিযানকারীরা সংস্কৃতকেই প্রাধান্য দিতেন। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকের প্রথম 'যূপ' শিলালেখে কণিষ্ক সংস্কৃত ব্যবহার করেছেন, রুদ্রদমন ও তাঁর বিখ্যাত শিলালিপিতে (১৫০ খ্রি.) সংস্কৃতই ব্যবহার করেছেন। এই ভাবে বিদেশি শাসক গোষ্ঠীগুলি সংস্কৃতের মাধ্যমে ভাষাগত ঐক্য খুঁজেছেন এবং পুরোহিততন্ত্রের এতে সাগ্রহ সম্মতি ছিল, কারণ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা থেকে দূরবর্তী এবং সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য না থাকার ফলে এটি পুরোহিত শ্রেণির হাতে

একটি শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠেছিল।

যেহেতু *মহাভারত* তার কাব্যগত উৎকর্ষের জন্য ইতিমধ্যেই বিপুল ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, ভার্গবদের পক্ষে নিজেদের মতামত বিজ্ঞাপিত করার জন্য এটিই ছিল শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাঁদের রচনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেই এই সংযোজনের কারণ বোঝা যায়।

ধর্মের ক্ষেত্রে এই ভার্গব গোষ্ঠী সর্বপ্রথম সম্প্রদায়গত ধর্মের জন্য এক প্রকার দেবতাতত্ত্ব ও একটি ধর্মশাস্ত্রের সৃষ্টি করলেন— মুখ্যত শিব এবং কৃষ্ণ এই দুই দেবতাকে ঘিরে। *ঋগ্বেদ*-এ রুদ্র ছিলেন সম্পূর্ণ ভাবে এক গৌণ দেবতা। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে তিনি অবশ্য রুদ্র-শিব রূপে অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব পেয়েছেন। কিন্তু মহাকাব্যের আলোচ্য অংশে তিনি প্রকৃতই গুরুত্বপূর্ণ, ভীতিকর, একজন প্রধান দেবতা হয়ে উঠেছেন, গ্রিক পর্যটকরা 'সিবই' নামে জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তাঁরাই শৈব সম্প্রদায়। ভার্গব প্রক্ষেপণগুলিতেই প্রথম শিবের উপর মানবত্ব আরোপিত হতে দেখা যায়। এখানে শিবের ভাবমূর্তি ধীরে ধীরে, অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে একজন প্রধান দেবতারূপে গড়ে তোলা হয়েছে। দ্রোণপর্বে আমরা প্রথম শিবের মধ্যে প্রলয়কর্তার রূপ দেখি; সৌপ্তিক পর্বেও তাঁর ভূমিকা ওই একই রকম। দ্রোণপর্ব এবং অন্যত্র কৃষ্ণ তাঁর গুণগান করেছেন।[১২] ব্যাস ও পরমেশ্বর শিবের স্তুতি করেছেন।[১৩] অন্যান্য দেবতারাও ত্রিপুর ধ্বংসের পূর্বে তাঁর বন্দনা করেছেন।[১৪] অশ্বত্থামা[১৫] এবং উপমন্যু[১৬] তাঁকে দেবাদিদেবরূপে, সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহারের দেবতারূপে স্তুতি করেছেন। এই সব চিন্তার কোনও কোনও ধারণা ইতিপূর্বেই বৈশম্পায়ন রচিত মহাকাব্যের 'ভারত' পর্যায়েই দেখা গিয়েছিল। এই সময়েই পাশুপত ও লকুলীশ এই সম্প্রদায় দুটির বীজাকারে সূচনা হয়। বনপর্বে আমরা গাণপত্য সম্প্রদায়ের ধর্মগত আচার অনুষ্ঠানের সূচনা দেখতে পাই।

ভার্গব পর্যায়ের অপর প্রধান দেবতা হলেন কৃষ্ণ; তাঁর দেবত্ব আরোপ করেছেন সূত এবং সৌতি। বাসুদেব এবং নারায়ণীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ইতিপূর্বেই ছিল; এখন যা ঘটল তা হল: প্রথমত বিষ্ণু এবং নারায়ণ উভয়ের সমন্বয় ঘটেছিল কৃষ্ণের মধ্যে এবং এঁদের সম্মিলিত ভাবরূপ হয়ে উঠেছিলেন পরমেশ্বর। ক্ষত্রিয় কাব্য *জয়সংহিতা*-তে পাণ্ডবের সখা রূপে, মথুরার রাজা রূপে কৃষ্ণের যে চরিত্র সেখানে কোথাও কৃষ্ণ দেবতা নন। পরবর্তীকালে, তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাসুদেব সম্প্রদায়ের ধর্মমতত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু।[১৭] বৈশম্পায়ন কৃত বিবরণে তিনি কেবলমাত্র বৃষ্ণিদের কাছেই একজন দেবতা রূপে স্বীকৃত। এই অংশের মানব কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পদস্পর্শ করেন, যেমন ভাবে কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠকে প্রণাম করেন, সাধারণ মানুষ কোনও ধার্মিক সাধু চরিত্রের ব্যক্তিকে প্রণাম করে। পরবর্তীকালে ভার্গব-সংযোজন অংশে, যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন, যেমন আচরণ করেন কোনও শিষ্য তার গুরুর প্রতি। ভূরিশ্রবস, কৃষ্ণের কোনও দেবমহিমা উপলব্ধি করে না, তাই অর্জুনকে তিরস্কার করে বলে— 'বৃষ্ণিরা অ-সভ্য, পাপপুণ্যের ভেদজ্ঞান রহিত দুষ্ট; এই গোষ্ঠীর কোনও লোককে তুমি কি করে সম্মান কর?'[১৮] এই মানব কৃষ্ণ উমার কাছে বর প্রার্থনা করেন এবং উমা বলেন 'কেমন করে তুমি, একজন সাধারণ মানুষ, সত্যের পথ জানবে?'[১৯]

৪০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে আগাথোক্লেস-এর মুদ্রায় কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি প্রথম পাওয়া যায়। একজন বিদেশি শাসকের মুদ্রায় এটিই একমাত্র প্রতিমূর্তি। পরবর্তী সময়ে হেলিওডোরাস নিজেকে বলেছেন একজন ভাগবত, বাসুদেবভক্ত। বিষ্ণু নারায়ণের পরে, পঞ্চ বৃষ্ণি-বীরের ব্যূহ থেকে বাসুদেবই নিজস্ব, পৃথক সত্তা রূপে পরিগণিত হন এবং ধীরে ধীরে একজন মুখ্য দেবতার স্থান গ্রহণ করেন। ভার্গব গোষ্ঠী তাঁর নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে নিজেদের লক্ষ্য স্থির করেছিল। সভাপর্বে শিশুপালের প্ররোচনামূলক ঔদ্ধত্যের প্রত্যুত্তর স্বরূপ এই অঘোষিত লক্ষ্যের প্রথম বহিঃপ্রকাশ। এর পরে, বনপর্বে মার্কণ্ডেয় দেখেন শিশুর উদরে মহাজাগতিক সমুদ্রে ভাসমান মহাব্রহ্মাণ্ড।[২০] দ্রোণ পর্বে এবং অন্যত্র এরই বর্ধিত এবং অতিরঞ্জিত বিবরণ দেখা যায়। বনপর্বে আমরা কৃষ্ণবন্দনা দেখতে পাই। এগুলি উদাহরণযুক্ত আখ্যানের অন্তর্নিহিত। এমনকী বনপর্বে কল্কি অবতারেরও উদ্ভব হয়েছে। শিব এবং কৃষ্ণকে ঘিরে এই যে নূতন সম্প্রদায়গত ধর্ম গড়ে উঠল তার কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। এই প্রথম একজন দেবতা অধ্যাত্মজীবনে একজন পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখা দিলেন। এ বিষয়ে প্রথম ছিলেন ঐতিহাসিক চরিত্র বুদ্ধ, তাঁর মহিমা গান করা হয়েছে *ললিত বিস্তার*, *মহাবস্তু*, *অবদানশতক* এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যত্র। বৈদিক দেবতারা ব্যক্তিগত পরিত্রাতা ছিলেন না; তাঁরা শুধুমাত্র পার্থিব প্রাপ্তির বিষয়ে আশীর্বাদ দিয়েছেন এবং *ঋগ্বেদ সংহিতা*-র অর্বাচীন অংশগুলিতে স্বর্গসুখের বিষয়ে কিছু অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিও দেখা যায়। জীবন এতই আনন্দময় ছিল যে মানুষের লক্ষ্য ছিল যত দীর্ঘ সময়ের জন্য সম্ভব, জীবনকে প্রাণভরে উপভোগ করা। তাই বৈদিক ঋষিরা প্রার্থনা করেছেন দীর্ঘ জীবন, প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি অর্থাৎ সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যসহ পার্থিব সুখ। পরবর্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্য এবং প্রাথমিক যুগের উপনিষদগুলিতে, জীবনকে মূলত দুঃখদায়ী বলে চিত্রায়ন শুরু হল কারণ এই সময় থেকেই জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবর্তনের ভাবনা রূপ নিয়েছে। সুতরাং এই সময়েই জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় এই অস্তিত্বচক্রের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করা। এখন লক্ষ্য ছিল মোক্ষলাভ এবং এই সব নূতন দেবতারা মুক্তির বরদান করতেন। এই প্রথমবারের জন্য আরাধ্য দেবতা আর তাঁর ভক্তের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আর আত্মসমর্পণের দ্বারা একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল— তা হল ভক্তি। এখন থেকে এই ভক্তিই মোক্ষলাভের একমাত্র সত্য পথ বলে স্বীকৃত হল। মৌর্য এবং গুপ্ত যুগের মধ্যবর্তী সময়ে সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করার একমাত্র উপায় ছিল তাঁর কর্তৃত্বের কাছে ভক্তির মাধ্যমে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ; এই যুগের ধর্মমতেও এই মনোভাবই অন্তত আংশিক প্রতিফলিত হয়েছে। ভক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ধরেই এল পূজা, বিগ্রহ, মন্দির এবং নূতন ধরনের অর্ঘ্য-উপহার। *ভগবদগীতা*-য় কৃষ্ণ বলেছেন 'পত্র, পুষ্প, ফল, জল যা কিছু ভক্তির সঙ্গে আত্মসংযমী ভক্ত আমাকে উৎসর্গ করেন তা-ই আমি গ্রহণ করি।'[২১]

এই অংশেই প্রথম মূর্তি পূজা দেখা গেল। কৃষ্ণ বলেন, 'আমার একনিষ্ঠ ভক্ত যে রূপে আমায় পূজা করতে চায় আমি সেই রূপই গ্রহণে স্বীকৃত হই।'[২২] এখনই সর্ব প্রথম আমরা উপবাসের উপকারিতা এবং ব্রতরক্ষার পুণ্যফল সম্পর্কে অবহিত হই।[২৩] এই সব তত্ত্বও

পুরাণে বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে, কিন্তু মহাকাব্যের এই সব আলোচ্য অংশেই এগুলি প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, ব্রতপালন না করে, তীর্থদর্শন না করে কেউ স্বর্গলাভ করতে পারে না।[২৪] বনপর্বে তীর্থসমূহের একটি বিশদ বিবরণী আছে।[২৫] নদী ও সমুদ্রতীরবর্তী আশ্রয়স্থল, পর্বত এবং অন্যান্য সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক আকর্ষণীয় স্থান এবং বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিও তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। এই প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতে বিষ্ণুর অবতার সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে যেন নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, বলরাম এবং কল্কিন।[২৬]

স্বর্গনরকের বিচার উদ্ভূত হল এই প্রথম। বিত্তবান সমাজের প্রত্যক্ষগোচর উচ্চমানের জীবনযাত্রার এক কল্পিত প্রতিফলনেই স্বর্গের রূপকল্পনা করা হয়েছিল এবং ক্ষমতাশালীর হাতে দুর্বলের নিপীড়নের প্রতিচ্ছবি ছিল নরকের রূপকল্পনাতে। এই ভার্গব অংশে আমরা দুর্লক্ষণ, অমঙ্গলের পূর্বাভাস, প্রভৃতির বিবরণ পাই।[২৭] অর্বাচীন ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ইতিপূর্বেই পুরোহিতদের যজ্ঞ-দক্ষিণার কথা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন দেখা দিলেন এক নূতন শ্রেণির পুরোহিত যাঁরা পূজা পরিচালনা করতেন, ব্রতপূর্ণ করার পারণ কার্যে সাহায্য করতেন এবং তীর্থস্থানে সঠিক ভাবে পূজা দেওয়ার কাজে তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করতেন। এই সব পারিবারিক ও মন্দিরের পূজারীরা বর্তমানে বর্ধিত দক্ষিণা চাইতে লাগলেন এবং পেতে শুরু করলেন।

এই সব কিছুরই কারণ যে সব দার্শনিক তত্ত্ব সেগুলি ইতোমধ্যেই উপনিষদসমূহে প্রচারিত হয়েছিল, এর মধ্যে কর্ম ও জন্মান্তরবাদের তত্ত্বগুলিই প্রধান। এখন যে নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হল তা হল ভাগ্য বা নিয়তিবাদ।[২৮] যুক্তির বিচারে, নিয়তিবাদ আর কর্মফলবাদ একে অন্যের সঙ্গে মেলে না, কিন্তু ভার্গব অংশে উভয় তত্ত্বের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখা যায়। গৌতমীপুত্রের অকালমৃত্যুর উপাখ্যান দিয়ে অনুশাসন পর্ব শুরু হয়— কাল, মৃত্যু এবং কর্ম পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকে, যতক্ষণ না সিদ্ধান্ত হয় যে মৃত বালক তার মৃত্যুর জন্য নিজেই প্রকৃত দোষী। সমস্যা ছিল এই যে গৌতমী বা তার পুত্র কেউ জানত না যে মৃত্যু কেন ঘটেছে; তাদের কাছে এই মৃত্যু ছিল ভাগ্য, অ-দৃষ্ট। কর্মফলবাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য অজস্র উপাখ্যান নির্মাণ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও কর্ম আর পুরুষকারের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী তাই নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। দৈব অনুগ্রহ, অকারণ আনুকূল্যের বিপরীতে কেলভিনের পূর্ব নির্ধারণের তত্ত্বের মতোই এখানেও একটি তত্ত্ব দেখা যায়। এই সব তত্ত্বের অন্তর্নিহিত বিরোধ বোঝা যায় একটি প্রশ্ন থেকে: তথাকথিত বিদেশী আত্মার পরিণতি কী হয়? মুক্তি? স্বর্গ? নরক? প্রেতাবস্থা? পুবর্জন্ম? মানুষ রূপে না পশুরূপে? প্রথমে কোনটি? কত দিনের জন্য? মৃত্যুর পরে কর্মের আপেক্ষিক ফলাফল সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করার জন্য কোথাও একটি নির্দিষ্ট বিধি নেই।

বিভিন্ন কর্মের জন্য আমরা একই প্রকার ফলের বিভিন্ন উদাহরণ এবং একই কর্মের বিভিন্ন ফলের উদাহরণ দেখতে পাই; চিত্রগুপ্ত একজন সাধারণ হিসাবরক্ষক, তার উপরে কোনও সচিব নেই। এই শেষতম প্রক্ষিপ্ত অংশে হঠাৎ অলৌকিক ভাবনার অত্যাধিক্য দেখা

যায়। মূল *জয়সংহিতা* প্রকৃতপক্ষে ছিল মানব বীরদের কাহিনি; সেখানে দেবতাদের মুখ্য স্থান ছিল না। চাডউইক বলেন, 'বীরগাথাতে যে লৌকিক কাহিনি অপেক্ষা অলৌকিকের প্রাধান্য অনেক কম, তার কারণ নিঃসন্দেহে এই যে, ওই সময়ের রাজসভাগুলি জনসাধারণের অবশিষ্ট অংশ অপেক্ষা এক অনেক উন্নত স্তরের সংস্কৃতির অধিকারী ছিল।'[২৯] অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরোহিত শ্রেণির লেখকরাই ভার্গবদের সংযোজিত অংশে অলৌকিক ঘটনার বাহুল্য বিস্তার করেন।

ঘটনাপ্রবাহকে আরও জটিল করে তুলতে, এই সময়ই প্রথম দেখা যায় রাশি রাশি অভিশাপ আর আশীর্বাদের ঘটনা। তপস্যার অন্তর্বর্তী অবসরে কোপনস্বভাব মুনিঋষিরা মানুষকে অভিশাপ দেন। আবার সেবা প্রাপ্তিতে প্রসন্ন হয়ে তাঁরা বরদান করেন— কিন্তু কার্য আর অভিশাপ/আশীর্বাদের কোনও নৈমিত্তিক যোগসূত্র নেই। অতএব বিভ্রান্ত মানুষের কাছে অভিশাপ বা আশীর্বাদ দৈবলীলার রূপ নেয়। পুনর্জন্ম, কর্ম এবং ভাগ্যের তত্ত্বসমূহ একই উদ্দেশ্য সাধন করে, অতীত এবং ভবিষ্যৎকে অজ্ঞাত এবং অ-জ্ঞেয় তত্ত্বসমূহ একই উদ্দেশ্য সাধন করে, অতীত এবং ভবিষ্যৎকে অজ্ঞাত এবং অ-জ্ঞেয় বলে প্রচার করে; ফলস্বরূপ, বর্তমান হয়ে পড়ে বোধের অতীত। এই সব কিছুই অবধারিত ভাবে সাধারণ মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তুলে দেয় এক বিশেষ শ্রেণির হাতে, যারা জীবনের রহস্যময়তার গভীরে প্রবেশ করার ভান করে থাকে। এক শ্রেণি-বিভক্ত সমাজে এই সুবিধাভোগী শ্রেণির প্রাথমিক স্বার্থ হল জনসাধারণের কাছে অটল বিশ্বাস এবং প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রাপ্তি, ভাষান্তরে যাকে বলা যায় শোচনীয় বশ্যতা। যার ফলে ইহজন্মে দুঃখ প্রাপ্তি। পূর্বজন্মের সেই অজ্ঞাত পাপকে ব্যাখ্যা করার নামে এবং উন্নততর অবস্থায় পুনর্জন্ম নিশ্চিত করার নামে এই শ্রেণি সাধারণ মানুষের কাছে আনুগত্য ও সেবা দাবি করে, পেয়েও থাকে। এই তথ্যের উদাহরণে ভার্গব সংযোজিত অংশ ভারাক্রান্ত।

এখানে আমরা দেখি রাজা এক নূতন মহিমায় মণ্ডিত। ইহ-পরলোকে তাঁকে ধর্মত এবং বাস্তবত 'গুরু'র আসন দেওয়া হয়েছে। রাজাকে যে অবহেলা বা অপমান করে তাঁর দান, যজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধের পুণ্য বিনষ্ট হয়।[৩০] ন্যায়নিষ্ঠ রাজা একজন চিরন্তন দেবতা, এমনকী দেবতারাও তাকে সম্মান করেন।[৩১] সমৃদ্ধি চায় যে মানুষ তারা প্রথমেই রাজা নির্বাচন করে।[৩২] যেমন করে শিষ্যরা গুরুকে প্রণাম করে তেমনই মানুষদের উচিত রাজাকে প্রণাম করা। যেমন দেবতারা ইন্দ্রকে স্তুতি করেন তেমনিই প্রজাদের উচিত রাজাকে স্তুতি করা।[৩৩] একজন রাজাকে কখনও মানুষ ভাবা এবং অবহেলা করা উচিত নয়। নররূপে তিনি এক মহতী দেবতা।[৩৪]

খ্রিস্ট পূর্ব যুগের শেষ শতকগুলিতে যে সব অভিযানকারী গোষ্ঠীগুলি উত্তর ভারতে এসেছিল, তারা সকলেই নিজ নিজ রাজাকে অতিমানব মনে করত। ব্যাকট্রিয়ার গ্রিক, রোমান, হূণ রাজ্যের অধিবাসীরা; সিথিয়ান, কুষাণ, য়ুয়ে চি, পার্সীয় সকলেই নিজেদের রাজাকে অতিমানবীয় মর্যাদা দিয়েছে। এই বিশ্বাসের কথা তাদের মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে

জানা যায়, তাদের রাজাকে প্রায়ই বলা হয়েছে দেবপুত্র, তাদের মাথা ঘিরে এক জ্যোর্তিবলয় দেখা যায়। ভারতবর্ষেও এই সব প্রভাব পড়েছিল এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত এখানে শক্তিমান রাজাদের পরম্পরা দেখা যায়। সুতরাং রাজশক্তিকে মনে করা হত দৈব শক্তিরই রূপান্তর। ভার্গব সংযোজন সোৎসাহে এই ধারণাকে শক্তিশালী করেছিল। সমুদ্রগুপ্তের সময় হরিষেরের লিপিতে আমরা জানতে পারি যে রাজা শক্তিশালী, কারণ, তিনি বন্দি করতে পারেন, মুক্ত করতে পারেন এবং অনুগ্রহ করতে পারেন; তিনি এই তিন কার্যের সমন্বয় সাধক।[৩৫] সুতরাং রাজকীয় কর্তৃত্ব ছিল বন্ধন, মোচন এবং অনুগ্রহ প্রদানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল; খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকের প্রথমে নাসিক শিলালেখে আমরা চতুর্বর্ণের ধারক রাজা গৌতমী বলশ্রীর কথা শুনি; নাসিকে রাজা নহপানের জামাতা উষভদাত এক ব্রাহ্মণকে তার কন্যার বিবাহের জন্য প্রচুর দান করেছিলেন, এ কথাও জানা যায়। বনঘটে সাতকর্ণীর শিলালেখে বলা হয়েছে রাজা ব্রাহ্মণদের মুক্ত হস্তে দান করেন এবং তিনি বর্ণসংকর রোধ করেছেন।[৩৬] একটি গুপ্ত যুগের শিলালিপিতে বলা হয়েছে দানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে সুতরাং রাজার কাছে এইটিই ছিল প্রত্যাশিত; তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করবেন এবং বর্ণ বিভাগকে অক্ষুণ্ণ রাখবেন যাতে বর্ণসংকর না ঘটে।

ভার্গব অংশের অন্যতম কেন্দ্রীয় ভাবনা হল বর্ণধর্ম। বর্ণাশ্রমের উচ্চতম যে ব্রাহ্মণ তিনি রাজার মতোই পূজনীয়; তাঁর ক্রোধে সর্বনাশ হতে পারে। বাতাপি ও ঈল্বলের উপাখ্যান একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।[৩৭] অনুরূপ একটি উপাখ্যান হল কার্তবীর্যার্জুন ও পরশুরাম,[৩৮] এগুলি প্রমাণ করে যে ব্রাহ্মণ হল পৃথিবীচারী দেবতা।[৩৯] তার ব্যবহার সাধু বা অসাধু যাই হোক না কেন ব্রাহ্মণকে কখনও অপমান করা চলে না।[৪০] ব্রাহ্মণ অন্য সব বর্ণের সম্পদ নিতে পারে কিন্তু যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণের চেষ্টা করে সে দুঃখভাগী হবে। অন্যান্য বর্ণের ক্ষেত্রে রাজদ্রোহের জন্য চরম দণ্ড পেতে হত, কিন্তু রাজদ্রোহে অপরাধী ব্রাহ্মণের শাস্তি কেবল নির্বাসন।[৪১] যখন রাজা পাওয়ার জন্য উৎসুক প্রজারা বেণ-পুত্র পৃথুকে অভিষেক করেছিল তখন ভবিষ্যৎ প্রজাদের জন্য তাঁর প্রথম প্রতিশ্রুতিই ছিল যে তিনি ব্রাহ্মণদের শাস্তি দেবেন না এবং অন্তর্বর্ণ বিবাহ রোধ করবেন।[৪২] ইওরোপে যেমন চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘ, তিক্ত বিরোধ চলেছিল, তেমনই এ দেশেও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যুগেই ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল।[৪৩] ভার্গব অংশে আমরা দেখি 'পৃথিবীর আধিপত্য কার? ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়ের?'— উত্তর, 'পৃথিবীর সমস্ত কিছুরই অধিপতি ব্রাহ্মণ।' 'তবে ক্ষত্রিয় কেন রাজা?'— উত্তর, 'যেমন স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা তার দেবরকে আলিঙ্গন করে, এ-ও তেমন।'[৪৪] উপাখ্যানে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণের ফল চুরি করায় এক ব্যক্তি বানর হয়ে পুনর্জন্ম নিয়েছিল; আর একজন ব্রাহ্মণকে উদার ভাবে দান না করায় শৃগাল হয়েছিল।[৪৫] এই সব গল্পের স্পষ্ট ভাবেই একটি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল। একটি উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে, জমদগ্নি তীর নিয়ে খেলা করতে করতে সেগুলিকে ক্রমেই দূর থেকে আরও দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন; তার পত্নী রেণুকা সেগুলি কুড়িয়ে আনছিলেন। একবার মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে ক্লান্ত হয়ে

তিনি ফিরে আসতে দেরি করলেন; ক্রুদ্ধ জমদগ্নি সে কথা জেনে সূর্যকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। সূর্য নীচে নেমে এসে তাঁকে একটি তাপ নিরোধকারী শ্বেতছত্র দিলেন। 'অতএব ব্রাহ্মণকে ছত্রদান করলে পুণ্য লাভ হয়।'[৪৬] ব্রাহ্মণকে দানযোগ্য বস্তুর দীর্ঘ ক্লান্তিকর তালিকা দেখা যায়। সেই সঙ্গে আছে পরলোকে এই সব দানের কত গুণ পুণ্য হবে সে তালিকাও। কেবলমাত্র অনুশাসন পর্বেই পঁয়ত্রিশটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদে এই বর্ণনা রয়েছে।[৪৭]

কেবল দান নয়, দক্ষিণাও প্রচলিত ছিল বৈদিক যুগ থেকেই; কিন্তু আলোচ্য ভার্গব অংশে এগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছিল গাণিতিক অনুপাতে; পুরাণে এই বৃদ্ধির প্রবণতা শুরু হয়। খাদ্য, বস্ত্র, জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্য, নানা বিলাসদ্রব্য, সোনা, গো-ধন, রথ, ভূমি, দাস এবং নারী— এগুলি যদি প্রচুর পরিমাণে দান করা হয় তবে ইহলোক-পরলোকে বহুগুণ ফল লাভ করা যায়। কুমারী, শিশু সন্তানসহ বিবাহিতা নারী এবং সন্তানহীনা বিবাহিতা তরুণীর এদের বিশাল সংখ্যায় উল্লেখ আমাদের বোধকে আহত করে। এই সব নারীদের নিয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা কী করতেন সে আর এক প্রশ্ন। এই ভার্গব অংশেই আমরা প্রথম শুনতে পাই জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ— ব্রাহ্মণ জাতির কথা। জপতপ অধ্যয়ন ছাড়াও তাকে ব্রাহ্মণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৪৮] এবং এই ব্রাহ্মণও পূজনীয়।[৪৯]

মহাকাব্যে ক্ষত্রিয় হল যোদ্ধা, কিন্তু স্থল-বাণিজ্যে ক্ষত্রিয়েরা প্রহরী রূপে পণ্যবাহীর সঙ্গে যেতেন। সমকালীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ক্ষত্রিয়কে সমৃদ্ধ ভূস্বামী শ্রেণিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈশ্যের জীবিকা ছিল দুটি— কৃষি ও বাণিজ্য।

বণিকেরা প্রায়ই ধনী হতেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও ধনী বৈশ্যরা একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণিরূপে গণ্য হতেন। প্রাচীন জৈন শাস্ত্র— *অঙ্গবিজ্জা*-তে দুটি শ্রেণির কথা বলা হয়েছে। 'অজ্জ' এবং 'পেস্‌স'।[৫০] স্পষ্ট ভাবেই এটি অর্থনৈতিক বিচারে সরল শ্রেণিবিভাগ: ক্ষমতাবান, সমৃদ্ধ শ্রেণি ছিল আর্য বা অজ্জ, অবশিষ্টেরা ছিল ভৃত্য, প্রেষ্য বা পেস্‌স।

অর্বাচীন যুগের বৈদিক সাহিত্য থেকেই দেখা যায় শূদ্র হল ভৃত্য, প্রায়ই সে 'দাস' যে অপর তিন বর্ণকে সেবা করে। মহাকাব্যের আলোচ্য অংশে বলা হয়েছে প্রজাপতি শূদ্রকে সৃষ্টি করেছেন অপর তিন বর্ণের ভৃত্যরূপে।[৫১] শূদ্রের উচিত বিগতদ্বেষ হয়ে উচ্চ তিন বর্ণের সেবা করা।[৫২] ছত্র, প্রলেপন, জুতা, পাখা এবং পরিচ্ছদ যখন জীর্ণ হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হবে তখন শূদ্র দাসকে দিয়ে দেবে।[৫৩] প্রভু স্বচ্ছন্দে তার ভৃত্যের ধন ব্যবহার করতে পারে।[৫৪]

কিন্তু এমনকী এই প্রেক্ষাপটেও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল। লৌহ লাঙ্গলের ব্যবহার প্রবর্তন হওয়াতে কর্ষণযোগ্য ভূমির বিস্তার হচ্ছিল। একা বৈশ্যের পক্ষে এত পরিমাণ ভূমিতে কৃষিকাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না, সুতরাং কিছু শূদ্রও কৃষিকাজ করছিল, খুব সম্ভব ভাগীদার চাষি হয়ে। দ্বিতীয়ত খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দী থেকেই মৌসুমী বায়ুর পূর্বজ্ঞান পাওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং মাস ও বৎসরের গণনা পঞ্জিকাও প্রচলিত ছিল ফলত, অতএব সামুদ্রিকবাণিজ্যও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হয়েছিল, এবং কিছু কিছু বৈশ্য, যাদের বিনিয়োগ করার মতো সচ্ছলতা ছিল, তারা এই পরিশ্রমসাধ্য কৃষিকাজ শূদ্রের হাতে ছেড়ে নিজেরা

বাণিজ্য শুরু করে। যারা সামাজিক মর্যাদার গণ্ডির বহির্ভূত ছিল যেমন ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, পুলকস, স্বপাক, শবর ও নিষাদ— এরা সকলেই সমৃদ্ধিশালী বৈশ্য ও শূদ্রের অধীনে কাজ করত। ভার্গব সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম প্রবক্তা মনু বলেন — এরা হল 'স্বনির্ভর শূদ্র'।[৪৫] যে সব ব্রাহ্মণেরা শূদ্রযাজী বা শূদ্র প্রতিগ্রাহী ছিলেন না সমাজে তাঁদের স্থান ছিল অধিকতর মর্যাদার।[৫৬] তবুও শূদ্রের অনুষ্ঠানে যাজকবৃত্তি লোভনীয়। চাতুর্যের সঙ্গে এই উভয় সংকটের সমাধান করা হয়েছিল, কারণ মনু বলেন ন্যায়বর্তী শূদ্রের জন্য ধর্মানুষ্ঠানে যাজন করা যেতে পারে। আর কে সেই ন্যায়বর্তী শূদ্র? মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি বলেন 'যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে সে ন্যায়বর্তী।'[৫৭] এই ন্যায়বর্তী শূদ্রের পরিবারে কারও মৃত্যু হলে ধর্মীয় অশৌচের কাল-সীমা এক মাস ছিল না, ছিল মাত্র পনেরো দিন। স্পষ্ট ভাবেই, আর্থিক সমৃদ্ধির বিচারে এই সব সুবিধা দেওয়া হত; এখন এই ধনীশূদ্ররা সমাজে উন্নতির সোপানে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছিল। অবশ্য সাধারণ শূদ্র অর্থাৎ শূদ্র জনসমাজের অধিকাংশই পড়ে ছিল দরিদ্র ও অবদমিত স্তরে। তাই আমরা দেখি যারা অর্থ দিয়ে কর দিতে পারে না তারা 'বিষ্টি' অর্থাৎ বাধ্যতামূলক শ্রম দিয়ে তা শোধ করতে পারে। *বৃহস্পতি ধর্মসূত্র*-তে[৫৮] বলা হয়েছে শূদ্র বণিককে সর্বোচ্চ হারে কর দিতে হবে। অতএব কোনও কোনও শূদ্র যথোচ্চ হারে এবং অর্থমূল্যে কর দেওয়ার মতো যথেষ্ট ধনী ছিল এবং তা হলেই সমাজে তারা সম্মান পেত। কিন্তু দরিদ্র শূদ্রর অবস্থান ছিল জঞ্জাল-তুল্য।[৫৯] *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ* বলছে, যে রাজার অধীনে বহু শূদ্র প্রজা রয়েছে তাঁরা রাজ্যের বহু অংশেই অ-বৈদিক ধর্মাচরণ হয়।[৬০] *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* বলে শবর, মূর্তিব পুণ্ড্র এবং অন্ধ্র এরা হল বিশ্বামিত্রের অবাধ্য সন্তান অর্থাৎ পতিত ক্ষত্রিয়। এই ভাবে বিদেশি আগন্তুকদের সমাজে মিশিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তাদের স্থান হয়েছিল ম্লেচ্ছদের ওপরে; তারা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযথ ক্ষত্রিয় হতে পারত। সুতরাং ব্রাত্যস্তোমের মাধ্যমে বহুবিবাহের মাধ্যমে এবং স্বাধীন সচ্ছল বৃত্তির মাধ্যমে কোনও কোনও শূদ্র সমাজে উচ্চতর স্থান অধিকার করত।

প্রাগার্যরা কারুশিল্প এবং বহু কুটির শিল্পে অধিকতর দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত ছিলেন; সেই জন্য তাঁরা প্রাচীনকাল থেকেই এই সব কারুশিল্পের ধারা নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। ধীরে ধীরে এই কায়িক শ্রমকে হীন দৃষ্টিতে দেখা শুরু হয়েছিল। ভার্গব অংশে বলা হয়েছে যে, যদি কোনও ব্রাহ্মণ এই সব কারুশিল্প ও বাণিজ্যে যোগ দেয় তবে তাকে শূদ্র বলে মনে করা হবে। মনুরও একই মত।[৬১] সমাজ বিদেশি আগন্তুকদের মধ্যে অভিজাতবর্গকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়েছিল এবং বিদেশিদের এই সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। অতএব, এই সমস্যার সমাধান করতে আইন-নির্ধারকরা তাঁদের শ্লাদদণ্ড পরিবর্তিত করেছিলেন; তাঁরা এই সব বিদেশিদের যথাযথ ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা দিলেন এবং তাঁদের রাজা ও অভিজাত বলে সম্মান করলেন। বশিষ্ঠের কামধেনুর উপাখ্যানে, কামধেনু তার প্রভুর বিপদে বিদেশি সৈন্যদল সৃষ্টি করেছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে ব্রাহ্মণেরা বিদেশিদের নিজেদের বন্ধু হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন।

ভার্গব অংশে বর্ণ সংমিশ্রণকে অসন্দিগ্ধ ভাষায় নিষিদ্ধি করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে বর্ণসংকর বিনাশ ডেকে আনে এবং এটি কলিযুগের এক বিশিষ্ট, অব্যর্থ লক্ষণ। ভার্গব অংশে কলির পীড়াদায়ক অবস্থা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবে আলোচিত হয়েছে। কলিযুগে শূদ্র ধর্মীয় নির্দেশ দেবে আর ব্রাহ্মণ হবে ভৃত্য,[৬২] এবং শূদ্র ব্রাহ্মণকে সেবা করতে অস্বীকার করবে।[৬৩] কলিযুগের আর একটি স্বভাব বৈশিষ্ট্য হল যে স্ত্রী স্বামীকে মান্য করবে না।[৬৪] মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেন: একজন ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ এক বককে অভিশাপে দগ্ধ করে; তারপর সে এক গৃহে যায় যেখানে ব্রাহ্মণ অতিথিকে সেবা করার আগে স্ত্রী তার স্বামীকে খাবার পরিবেশন করে। ব্রাহ্মণ যখন তাকে শাপ দিতে উদ্যত হয়, তখন সে বিদ্রূপ করে বলে, 'আমি কি বক'; বিস্মিত ব্রাহ্মণকে তার পরে বলা হয় সমস্ত পতিব্রতা স্ত্রীদেরই দৈব অন্তর্দৃষ্টি থাকে। মার্কণ্ডেয় বলেন পতিব্রতা রমণী সর্বদাই তার স্বামীর ভোজন পাত্রের অবশিষ্ট খেয়ে তাকেন।[৬৫] দ্রৌপদী স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে সত্যভামাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, আমি সভয়ে আমার স্বামীদের সেবা করি, যেন তারা ক্রুদ্ধ সর্প।[৬৬] আমি কখনও আমার স্বামীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করি না, কখনও তাঁদের ছাড়িয়ে যাই না, কখনও আমার শাশুড়ির বিরোধিতা করি না।[৬৭] আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পত্নীদেরও সেবা করি।[৬৮] এই হল সাধ্বী স্ত্রীর, 'সতী' স্ত্রীর কর্তব্য। প্রসঙ্গত, 'সতী' এবং 'পতিব্রতা' এই শব্দ দুটির অর্থগত দিক থেকে কোনও পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ নেই। সুতরাং বিবাহিত জীবনের কর্তব্য সম্পূর্ণ ভাবেই একপক্ষের।

নারীর পক্ষে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা অপরাধ, কিন্তু পুরুষের বহুবিবাহ কোনও অন্যায় নয়।[৭০] অপ্সরা পঞ্চচূড়া নারদকে বলে— পুরুষ অপেক্ষা নারীই বেশি যৌন আনন্দ উপভোগ করে। আমরা লক্ষ্য করি এ কথা বলানো হয়েছে একজন নারীর মুখ দিয়েই, যাতে বক্তব্যটির বিশ্বাসযোগ্যতা অধিক হয়। শরশয্যায় মৃত্যুমুখে পতিত ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরকে দু'বার বলেন, নারীর চেয়ে পাপিষ্ঠ কেউ নয়।[৭১] তিনি বলেন— অন্তক, শমন, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরের ধার, বিষ, সর্প, অগ্নি— এই সব কিছু একত্রে একটি নারীর সমান।[৭২] তরুণী রাজকন্যা মাধবীর উপাখ্যান আমাদের চোখ খুলে দেয়। গুরুদক্ষিণা দিতে অপারগ গালব রাজা যযাতির কাছে প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু রাজার রাজকোষ তখন নিঃশেষিত অর্থের পরিবর্তে তিনি তাই নিজের সুন্দরী কন্যা মাধবীকে গালবের হাতে দিলেন যাতে গালব একে একে তিন রাজার কাছে মাধবীকে এক এক বছরের জন্য গচ্ছিত রেখে তার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ নিতে পারেন। গালব এতে কোনও অন্যায় দেখলেন না। তিনি তা-ই করলেন।[৭৩] নারীর কাছে শিক্ষা হয়েছিল নিষিদ্ধ।[৭৪] নারীকে বিবাহ করতেই হবে; পুরুষ নাও করতে পারে। তাই স্বর্গপ্রবেশের অধিকার লাভের জন্য কুণিগর্গের কন্যা, বর্ষীয়সী তপস্বিনীকেও বিবাহ করে এক রাত্রের জন্য হলেও স্বামীসঙ্গ করতে হয়।[৭৫] কৃষ্ণ নিজেই তাঁর উদ্ধারযোগ্য পাপীদের তালিকায় নারীকে অন্তর্ভুক্ত করেন।[৭৬]

মূল মহাকাব্যে স্বামীর চিতায় সহমরণ এক বিরল ঘটনা; বিধবাদের বাঁচার অধিকার

সেখানে আছে। কিন্তু ভার্গব অংশে দুই একটি ব্যতিক্রম আছে; বসুদেবের মৃত্যুতে দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন; কৃষ্ণের মৃত্যুতে সত্যভামা, রুক্মিণী এবং তার অন্যান্য পত্নীরা সহমরণে যান। শান্তি পর্বের উপাখ্যানে ঘুঘুপাখির পত্নীও স্বামীর সঙ্গে পুড়ে মরে।[৭৭] কিন্তু গান্ধারী, কুন্তী, সত্যবতী এবং আরও অনেক বিধবা ও যুদ্ধবিধবারা কোনও সামাজিক কলঙ্ক ব্যতীতই বেঁচে থাকেন। হেরোডোটাস বলেছেন সিথিয়ানদের মধ্যে 'সতী' প্রথা প্রচলিত ছিল। এরাণ স্তম্ভ লিপিতে আমরা পাই যে রাজা গোপবর্ধনের পত্নী তাঁর স্বামীর চিতায় আরোহণ করেন।

ভার্গব অংশের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হল নারীর সামাজিক অবনমন। ১৪০ খ্রিস্টাব্দে জনৈক সিরিয়ান লেখক বর্দোসনেস বিভিন্ন দেশের আইন সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন—*বুক অব্ দ্য ল'জ অব্ দ্য কান্ট্রিজ্*। সেখানে তিনি বলেছেন যে, কুষাণরা তাদের পত্নীদের সঙ্গে উপপত্নীর মতো ব্যবহার করত এবং তাদের কাছে যৌন আনুগত্য আশা করত না। তাদের স্ত্রীরা এমনকী ভৃত্যের সঙ্গেও প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করত। সম্ভাবনা আছে যে, এই ধরনের প্রবণতাকে বাধা দেওয়ার জন্যই আইন প্রণয়নকারীরা নারীর উপর বেশি করে বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। কিন্তু ভার্গব অংশে বারংবার নারীকে নিন্দা করা হয়েছে এবং তাদের অবদমিত রাখার জন্য বিধি তৈরি করা হয়েছে। তবুও কিন্তু পূর্বতন মূল মহাকাব্যে বেশ কিছু স্বাধীনচেতা নারীর কথা বলা হয়েছে যাঁরা ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্রী। ভার্গব অংশে অবশ্য প্রয়োজন ছিল নারীর বশ্যতা স্বীকারের কথা প্রচার করা, সেই জন্যই এই বিষয়বস্তু নিয়ে অসংখ্য উপাখ্যান ও নীতিমূলক অংশ রচিত হয়েছে। সমসাময়িক একটি অর্বাচীন গুপ্তযুগের ভাস্কর্যে আমরা প্রথম বারের জন্য দেখতে পাই লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছেন।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ এবং তৃতীয় শতাব্দী থেকে সমাজে এবং ধর্মবিশ্বাস ও আচার আচরণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। এই সবের জন্য কোনও শাস্ত্র তখনও পর্যন্ত তৈরি হয়নি। এই প্রাক-পৌরাণিক ভার্গব সংযোজনই সেই শাস্ত্র রচনা করেছিল। মূল *জয়সংহিতা* রচনা শুরু হয়েছিল মোটামুটি ভাবে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এবং শেষ হয়েছিল খুব সম্ভব দ্বিতীয়/প্রথম খ্রিস্টিয় শতকে, এই সময়েই সংযোজনের প্রথম পর্যায় রূপে চিরন্তন মূল্যবোধের উপাখ্যানগুলি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। অল্পদিন পরেই ভার্গব সংযোজন শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে শেষ হয়েছিল। এই সংযোজন ছিল সাম্প্রাদায়িক মনোভাবাপন্ন পুরোহিত গোষ্ঠীর রচিত, মূল মহাকাব্যের চেয়ে গঠনভঙ্গিতে অনেক নিম্নস্তরের অলঙ্কৃত, অতিরঞ্জিত, বাহুল্যযুক্ত এবং পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট।

বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক এবং উপনিষদীয় প্রভাব মুছে যাওয়ার পর অথবা যথেষ্ট কমে আসার পর মানুষ যাগযজ্ঞে বিশ্বাস হারিয়েছিল এবং উপনিষদের দুর্বোধ্য দর্শন সাধারণ মানুষের বোধক্ষমতার সীমানায় ছিল না। সুতরাং দেশজ মানুষেরা খুব সম্ভব সমাজের সীমারেখায় বসবাসকারী অ-বৈদিক আর্যদের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল এবং ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবেই সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট

হচ্ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আগন্তুক গোষ্ঠীগুলির বিশ্বাস এবং রীতিনীতি, যার ফলে তৎকালীন সামাজিক ধ্যানধারণাতে ইতিপূর্বেই যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। যজ্ঞবিহীন যে জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি ও বিশ্বাস এর আগে অবদমিত ও বিতাড়িত হয়েছিল বর্তমানে তা পুনরুজ্জীবিত হল এবং মহাকাব্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনের স্তরে তা আবার দৃষ্টিগোচর হল। রাজার উপর ঐশ্বরিকত্ব আরোপ, সম্প্রদায়নিষ্ঠ ধর্মের তত্ত্বনির্মাণ এবং পুরোহিত গোষ্ঠীর সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার ক্রমিক বৃদ্ধি এই সময়েই শুরু হয়। এর পর এই নূতন পূজাভিত্তিক ধর্মের নূতন নূতন দিক আবিষ্কার হতে থাকে— মন্দির, বিগ্রহ, ব্রত, তীর্থযাত্রা এবং ব্রাহ্মণের প্রতি দান ও আনুষ্ঠানিক দক্ষিণার নিয়ত বৃদ্ধি সব কিছু ক্রমেই গুরুত্ব পেতে থাকে। কয়েক শতাব্দী ধরেই জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদের তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। ইতিপূর্বে উপনিষদীয় যুগেই এই সব ধর্মতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল এবং এই নিগূঢ়-রহস্যময় জ্ঞানই ছিল ঋষিদের মূল তত্ত্ব। এখন এই সব তত্ত্বকে কাজে লাগানোর জন্য পুরোহিতগোষ্ঠী উপাখ্যানের পর উপাখ্যান রচনা করতে লাগলেন। স্বর্গ-নরক-প্রেতকথা-জ্যোতিষ-দুর্লক্ষণ চিহ্ন— এই সব কিছুই এই নব্য ধর্মীয় দার্শনিক আদর্শের মূলভিত্তি যে নিয়তিবাদ তার সহায়কের কাজ করতে লাগল। এর ফলে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি এক রহস্যময়তায় আবৃত হয়ে হয়ে পড়েছিল, যে আবরণ ভেদ করতে পারতেন কেবলমাত্র পুরোহিতরা।

কুষাণ, শক, মুরুন্দ, পহ্লব, হূণ এবং পারদ-দের বারংবার আক্রমণের ফলে নিরাপত্তাবোধ ব্যাহত হয়েছিল, অন্তত সাময়িক ভাবেও সমাজে কিছুটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। এই গোলযোগের ফলে রক্ষণশীল মনোভাব জেগে উঠেছিল এবং এই সব নূতন মূল্যবোধের সৃষ্টিকর্তা পুরোহিত গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য ছিল দরিদ্র, শূদ্র, দাস এবং নারীরা। স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর ভারতের এক বিশাল অংশে অন্তর্বিবাহ দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। নারীর সতীত্ব এবং শূদ্রের আনুগত্য স্বীকার— উভয়কে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আইনরক্ষকেরা অত্যন্ত সরব হয়ে পড়লেন। রক্ষণশীল মূল্যবোধ, বিশেষ করে বর্ণাশ্রমের নিয়ম বর্ণধর্ম ছিল শূদ্র ও নারীর প্রতি অবদমনমূলক। যে কলিযুগের তাঁরা বর্ণনা দিয়েছেন সে বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে ছিল তাঁদেরই সমকালের সমাজের; এই সময় গ্রিস, রোম এবং মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে জলপথের বাণিজ্য ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় বাণিজ্য সম্পর্কটি কোনও নূতন ধ্যানধারণার সৃষ্টিধর্মী অভিঘাত বা নূতন চিন্তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব হয়ে আসেনি। অতএব এক প্রকার সংকীর্ণ মনোভাব দেখা দিল। খ্রিস্ট পূর্ব চতুর্থ শতকে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদনের সম্বন্ধ ও শ্রেণি বিন্যাস কিছুটা স্থিতাবস্থায় এসেছিল। বর্ণসংকরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং নিশ্চিত ভাবেই এই সরলীকরণ ধীরে ধীরে অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠল। আর্য অভিজাত সমাজ ছিল ব্রাহ্মণ, ধনী ক্ষত্রিয় ও ধনী বৈশ্যদের নিয়ে গঠিত আর দরিদ্র ক্ষত্রিয়, দরিদ্র বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ এবং অন্ত্যজ অশুচিদের সমাহারে গঠিত হয়েছিল দাসবর্ণ। এই শ্রেণি ও বর্ণবিভাগে ক্লিষ্ট সমাজ শাসন করতেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও নীতি নির্ধারকেরাই।

জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদের তত্ত্বের দ্বারা লালিত কুসংস্কারে মানুষকে অন্ধ করে রাখা হত, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিয়তিবাদ, শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক ক্রিয়া এবং প্রায়শ্চিত্তের প্রতি বিশ্বাস। এই সব বিষয়ে শাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু মহাকাব্যের ভার্গব সংযোজন অংশেই এগুলির প্রথম সূচনা হয়। এই সব তত্ত্বের বিস্তারিত চর্চা দেখা যায় পুরাণসমূহ, স্মৃতি, ধর্মশাস্ত্র এবং নিবন্ধগুলিতে। *মহাভারত*-এ ভার্গব সংযোজনে যার প্রথম অঙ্কুরোদগম পরবর্তী কালে তারই পরিণতরূপ দেখা যায় হিন্দুত্বে। এবং সেখানেই এই সংযোজনের প্রকৃত গুরুত্ব।

সূত্রাবলি

১. এই মহাকাব্যের অপর প্রচলিত নাম *শতসাহস্রী*।

২. চতুর্বিংশতি সাহস্রী চক্রে ভারত-সংহিতাম, উপাখ্যানং বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ১.১ ৬১।

৩. মানবাদি ভারতং কেচিদাস্তিকাদি তথা পরে/তাতোপরিচরাদন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে ১ ১·৫০।

৪. ৩.৪.৪।

৫. পৈল, সুমন্ত এবং বৈশম্পায়ন 'ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্বম পত্রমধ্যাপযচ্ছুকমং ততোঽন্যেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভঃ প্রদদৌ প্রভুঃ ১·১:৬৩।

৬. তত্র বংশমহং পূর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ভার্গবম্ ১:৫:৩।

৭. যাং কথাং ব্যাসম্পপ্যানাং তাঞ্চ ভূয়ঃ প্রচক্ষ মে ১:৫৩:২৮।

৮. Buhler কৃত *মনুসংহিতা*-র ভূমিকা Sacred Books of the East (SBL) ২৫ তম খণ্ড।

৯. গোবিন্দরাজ তাঁর গ্রন্থভাষ্যে বলেছেন 'এই সর্বোৎকৃষ্ট স্মৃতিগ্রন্থ যা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল ভৃগুর কিছু শিষ্য মিলে এর বিষয়বস্তু সঙ্কলন করেন।' Buhler বলেন 'ভৃগুর মনুসংহিতাই ছন্দোবদ্ধ মনু-স্মৃতির এক দীর্ঘশৃঙ্খলের শেষ বন্ধনটি রচনা করেছে।' SBE ২৫তম খণ্ড, পৃ

১০. Buhler প্রাগুক্ত

১১. মহাভারত *Mahabharata, its Genesis and Growth*, Poona 1986

১২. ৮·৬৯, ৭৩, ১৭২; পঞ্চদশ ১৪৬।

১৩ ৭:১৭৩

১৪. ত্রিপুরদহন

১৫ ১০-৭

১৬. দ্বাদশ: ১৪-১৮

১৭. সর্বেষাং বাসুদেবানাং কৃষ্ণ লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠাতা ৮·২৭.৬২

১৮. সপ্তমং ১:১৮

১৯. কথং হি নরমাত্রেণ শক্যো জ্ঞাতুং সতাং গতিঃ ১৩.১৪.৭

২০. তৃতীয় ১৮৬

২১. পত্রংপুষ্পং ফলং তোয়ং, যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি তদাহং ভক্ত্যুপহৃতং অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ৭ ২১

২২. *শ্রীমদ্ভাগবদগীতা*

২৩. ব্রত

২৪. ত্রয়োদশ ১০৬-১০, ১৩৫

২৫. অধ্যায় ৮০-৮৮

২৬ '...আমাদেব নায়ক, ভারতীয় জনগণেব মধ্যে এমনকী খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেও যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। পরবর্তীকালে শুঙ্গ যুগেব শেষ ভাগে তাঁকে বলা হত ভগবৎ, যা প্রকৃতপক্ষে ছিল বুদ্ধদেবের উপাধি।' ডি ডি কোসাম্বী' *Myth and Reality* পপুলাব প্রকাশন ১৯৬২, বোম্বাই, পৃ. ২৬।

২৭ এব থেকেই নিমিত্তনিদান এবং শকুন শাস্ত্রের মত সম্পূর্ণ গ্রন্থ পরে রচিত হয়।

২৮ নানা নামে ডাকা হয যথা— ভাগ্য কৃতান্ত, নিয়তি, দৈব, অদৃষ্ট, বিধিলিপি, ইত্যাদি।

২৯ H K Chadwick, *The Heroic Age*, Cambridge Univ Press ১৯২৬ পৃ. ১৪

৩০. পবলোকগুরুং চৈব বাজানম্, যোহবমন্যতে/ন তস্য দত্তং ন হুতং ন শ্রাদ্ধং ফলতি ক্বচিৎ দ্বাদশ: ৬৫ ২৮

৩১ মানুষাণাম্ অধিপতিং দেবভূতং সনাতনম্।/দেবাশ্চ বহুমনন্তধর্মকামং নরেশ্বরম্।। প্রাগুক্ত; পৃ. ২৯।

৩২ এবং যে ভূতিমিচ্ছেযুঃ পৃথিব্যাং মানবা ক্বচিৎ/কুর্য্যু রাজানমেবাগ্রে প্রজানুগ্রহকারণাৎ। দ্বাদশ: ৬৭:৩২

৩৩. নমস্যেয়ুশ্চ তং ভক্ত্যা শিষ্যা ইব গুরুং সদা।/দেবা ইব সহস্রাক্ষং প্রজাঃ বাজানমস্তিকে। প্রাগুক্ত: ৩৩

৩৪ ন জাত্ববমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিকঃ/মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেন তিষ্ঠতি।। প্রাগুক্ত ৪০

৩৫ গ্রহণমোক্ষানুগ্রহজনিতপ্রতপন্নিশ্রমহাভাগঃ।

৩৬ বিনিবর্তিতচাতুর্বর্ণসংকবঃ

৩৭ ৩ ৯৬-৯৭

৩৮ ৩ ১১৭

৩৯ ভৌমং ব্রহ্ম দ্বিজশ্রেষ্ঠ:/দ্বাদশ. ৫৬·২৬

৪০ ব্রাহ্মণো নাবমন্তব্যঃ সদসদ্বা সমাচরণ ১:১৮৮ ১৩

৪১ বাজদ্বিষ্টে তু বিপ্রস্য বিষয়ান্তে বিসর্জনম্। দ্বাদশ: ৫৬·৩৩

৪২ অদণ্ড্যা মে দ্বিজা লোকঞ্চ সংকবাং কৃৎস্নং এতোস্মীতি পরন্তপ। দ্বাদশ· ১১৪-৪৫। মহাভাবতেও বর্ণসংকব নিন্দিত হযেছে। সপ্তম· ১৫৮:২০

৪৩ অর্থাৎ খ্রি পূ সপ্তম-ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়ে।

৪৪ পত্যভাবে যথা স্ত্রী হি দেববং কুবুতে পতিম্। আনন্তর্য্যাৎ তথা ক্ষত্রং পৃথিবী কুবুতে পতিম্। দ্বাদশ· ৭৩ ১০

৪৫ দ্বাদশ ৯

৪৬. এযোদশ ৯৭

৪৭ ৬৪ – ৯৫, ১০৬, ১১২

৪৮ 'তপঃ শ্রুতাভ্যাং বিহীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ পঞ্চম ১:১১৫

৪৯ ব্রাহ্মণো নাম ভগবান্ জন্মপ্রভৃতি পূজ্যতে – দ্বাদশ ২৬৮.১২।

৫০ আর্য্য ভদ্রলোক, প্রেষ্য—ভৃত্য।

৫১. 'প্রজাপতির্হি বর্ণনাং দাসং শূদ্রমকল্পয়ৎ। দ্বাদশ: ৬:২৭

৫২. শূদ্র এতৌ পবিচবেৎ ত্রীণ্ বর্ণাননসূয়কঃ ওই: ২৯

৫৩ ছত্রং বেষ্টনং ঔশীনরমুপানদ্ ব্যজনানি চ। যাতযামানি দেয়ানি শূদ্রায় পরিচারিণে। অধার্য্যানি বিশীর্ণানি বসনানি দ্বিজাতিভিঃ। প্রাগুক্ত: পৃ. ৩১-৩২

৫৪ ভর্তৃহার্য্যধনো হি সঃ— প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫

৫৫ শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিন সপ্তম ১৩৮

৫৬. অশূদ্রযাজিন এবং অপ্রতিগ্রাহিন ব্রাহ্মণ

৫৭. *মনুসংহিতা* ১.১২১, ৩: ১৫৬

৫৮. দ্বাদশ: ১৬

৫৯. *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ*

৬০. রাজানঃ শূদ্রভূয়িষ্ট: পাখণ্ডানাং প্রবর্তকা: ২:৩১:৪১

৬১. অষ্টম: ১০২

৬২. ৩:১৮৮.৬৩

৬৩. ওই পৃ. ৬৪

৬৪. ভর্তৃণাং বচনে চৈব ন স্থাস্যন্তি তদাস্ত্রিয়ঃ। ৩:১৮৮:৭৭

৬৫. উচ্ছিষ্টং ভুঞ্জতে ভর্তুঃ সা তু নিত্যং যুধিষ্ঠির। ৩:১৯৭:১২

৬৬. আশীবিষানিব ক্রুদ্ধান্ পতীন্ পরিচরাম্যহম্। ৩:২২২:১৮

৬৭. অহং পতীন্নতিশয়ে নাত্যহ্নে নাতিভূষয়ে।/নাপি পরিবদে শ্বশ্রুং সর্বদা পরিযন্ত্রিতা। ওই পৃ. ৩৬

৬৮. সদারান্ পাণ্ডবান্নিত্যং প্রযতোপচরাম্যহম। ৩:২২২:১৮

৬৯. এতদ্ধি পরমং নার্য্যাঃ কার্য্যং লোকে সনাতনঃ। প্রাণানপি পরিত্যজ্য যদ্ভর্তৃহিতমাচরেৎ। ৩.১৪:৪

৭০. ন চাপ্যধর্মঃ কল্যাণ বহুপত্নীকতা নৃণাম্, স্ত্রীণামধর্মঃ সুমহান্ ভর্তুঃ পূর্বস্য লঙ্ঘনে ১.১৪৬:৩৪

৭১. ন হি স্ত্রীণাং পরং পুত্র পাপীয়ঃ কিঞ্চিদস্তি বৈঃ। দ্বাদশ: ৪০

৭২. অন্তকঃ শমনো মৃত্যুঃ পাতালো বাড়বামুখঃ। ক্ষুরধারা বিষং সর্পো বহ্নিরিত্যেকতঃ স্ত্রিয়ঃ।। অষ্টম: ৩৮:২৯

৭৩. পঞ্চম: ১১৮-২২

৭৪. নিরিন্দ্রিয়া অমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি শ্রুতিঃ। ত্রয়োদশ: ৪০:১১

৭৫. চতুর্থ. ৫২.১

৭৬. মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি যান্তি পবাং গতিম্। স্ত্রিয়ো বৈশ্যস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্। ভগবদ্গীতা। ৬:৩৩:৩২

৭৭. দ্বাদশ: ১৪৪:৯

নারী সমাজের উপর হিংসাত্মক উপদ্রব

কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিক্‌সনারি অনুসারে 'হিংসাত্মক উপদ্রব' হল কোনও ব্যক্তি বা সম্পত্তির ওপর আঘাত বা ক্ষতিসাধন। প্রাচীন ভারতে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার তো ছিলই না, বরং তারা নিজেরাই (অন্যের) সম্পত্তি গণ্য হত। তাই তাঁদের প্রসঙ্গে হিংসা বলতে তাঁদের ওপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতনই বোঝাত। অধুনাতন ইংরেজি ভাষায় person শব্দটি শুধু শরীর বোঝায় বটে, তবে আলোচ্য প্রসঙ্গে তা শরীর ছাড়িয়ে মনকেও বোঝাবে।

নারীবাদী পরিস্থিতিতেও যদি ধরে নেওয়া যায় যে, উপদ্রবকারী অবশ্যই কোনও পুরুষ, কিন্তু আমরা জানি, অন্য কোনও নারীও প্রায়শ তেমন করতে পারে, সে কথায় পরে আসছি। আক্রমণকারী যেই হোক, আক্রান্ত মহিলাটির দুর্দশা ঘটবেই এবং আরও সরাসরি ও শোচনীয় ভাবে সে পাশবিকতার শিকার হবেনই।

বেদে এ কথা স্পষ্ট আছে যে, নারীর শরীর তার নিজস্ব নয় এবং এতটুকু ওজর-আপত্তি না করে পতির কাছে আত্মসমর্পণ করা তার বিধেয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, কোনও স্ত্রী যদি তার পতির শয্যায় আসতে অসম্মতি জানায়, (প্রথমে) মিষ্টি কথায় তাকে আদর ও অনুনয় করা যেতে পারে; তাতে কাজ না হলে গয়নাপত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে 'কিনে নেওয়া'ও যেতে পারে; আর তার পরও যদি রাজি না হয় তাহলে পতির উচিত লাঠ্যৌষধি কিংবা চড় থাপ্পড় প্রয়োগ।[২] *মৈত্রায়নী সংহিতা*-য় অনেক বার বলা আছে, নারীশরীর নারীর নিজের নয়, তাই যৌন নিপীড়ন থেকে তার নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ নেই।[২] কোনও নারী পরপুরুষের শয্যাসঙ্গী হলে তার নির্দিষ্ট অঙ্গে কাঁকড়াবিছে ঢুকিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে।[৩] তার ওই প্রেমিককে মারবার জন্য অভিচারমন্ত্র ও আচারক্রিয়া তো আছেই, যা নিঃসন্দেহে মানসিক নির্যাতন বৈকি।

নারীমাত্রই অশুভ প্রতীক গণ্য হতেন, যেমনটা ছিল কুকুর, শকুনির মতো অশুভ পাখি, বেজি ইঁদুরের মতো প্রাণী ও শূদ্রের বেলায়। এদের মধ্যে যে কোনও একটির হত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ছিল সমান।[৪] *তৈত্তিরীয় সংহিতা* স্পষ্ট ভাষায় লিখেছে, নারী কেবলমাত্র যৌনসম্ভোগের বিষয়;[৫] গরু, জমি এবং নারীকে অতিমাত্রায় ব্যবহার করা ঠিক নয়— অন্যথায় তারা হয় মরবে নয়তো রুগ্ন হয়ে পড়বে।[৬] অগ্নি পত্নীবৎ অনুষ্ঠানে একটা লাঠি দিয়ে ঘিয়ের ওপর আঘাত করা হত। নির্মম স্পষ্টতায় এই প্রতীক ব্যাখ্যা করে জানানো হচ্ছে— স্ত্রীকেও এই ভাবে মারা দরকার, যাতে তার শরীর কিংবা সম্পত্তির ওপর তার কোনও অধিকার না বর্তায়।[৭]

মানসিক নির্যাতনও অবশ্যই ছিল এবং তা সেই বৈদিক যুগেও। প্রায় সব বেদগ্রন্থই দেখিয়েছে, নারী শুধু অধম জীব তাই নয়, অকল্যাণকরও বটে। সমাজে তার একমাত্র পরিচয় কর্তব্যনিষ্ঠ স্ত্রী, গৃহিণী ও ছেলেদের মা হিসেবে। বারো বছর ধরে পুত্র প্রসব করতে না পারলে সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা শাস্ত্রসম্মত, ঠিক যেমন মৃতবৎসা হলে পনেরো বছর আর বন্ধ্যা হলে দশ বছর পর তাকে ত্যাগ করা যায়।[৮] এমনকী নববিবাহিত দম্পতি যখন তাদের নতুন ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তখন বর নববধূর সামনে প্রার্থনা করত— 'এস, আমরা সঙ্গত হই, যাতে আমরা (অনেক) পুত্র, পৌত্র, দাস, বস্ত্র, কম্বল, ধাতুরাজি, সুশাসক, শিষ্যকুল, প্রচুর খাদ্য ও বহু স্ত্রী পেতে পারি।[৯] 'শিক্ষিত নারী পুরুষ বৈ তো নয়।[১০] যাবতীয় বড় ধরনের দানের অন্যতম উপকরণ ছিল নারী, মাদি গোড়ার সঙ্গে নারী ও শিশু (দেয়বস্তু হিসেবে থাকা উচিত।[১১] কোনও অশুভ পাখি, শকুনি, বেজি, ইঁদুর, কুকুর ও শূদ্রের হত্যা ও নারীহত্যার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা যে অভিন্ন তাতেই নারীর সামাজিক মর্যাদা বোঝা যায়।[১২] পত্নীকে স্বামীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করতে হত।[১৩] খ্রিস্টপূর্ব নবম-অষ্টম শতাব্দীতে লেখা একটি প্রাচীন গ্রন্থ জানাচ্ছে, সর্বগুণান্বিত শ্রেষ্ঠ মহিলাও সব দিক দিয়ে অপদার্থ কোনও পুরুষের অধম।[১৪] নারী ও শূদ্র (বলতে গেলে) অশুভ ও অসত্য-র মূর্তি। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের দীনহীন ভাবে সেবা করবেন মেয়েরা, এটাই ধরে নেওয়া হত। একটি গ্রন্থে তার পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে— মেয়েকে (বিয়ে) দেওয়া হয় (বরের) পরিবারে।[১৫]

বরুণপ্রঘাস অনুষ্ঠানে সমবেত জনসমাজের মধ্যেই যজমানের পত্নীকে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করতেন— কার সঙ্গে তোমার অবৈধ যৌন সম্পর্ক আছে?[১৬] কোনও পুরুষকে কিন্তু কোনও অনুষ্ঠানে কদাচ এ কথা জিজ্ঞাসা করা হত না। সামাজিক নির্বাসন ও মানসিক নির্যাতনের আর এক দৃষ্টান্ত হল, কঠোর বাক্য ব্যবহার করলে তৎক্ষণাৎ কোনও নারীকে পরিত্যাগ করা হত।[১৭]

এ সব থেকে ধরা যায় যে, হয় সমাজ বুঝে ছিল মেয়েদের মন বলে কিছু নেই, নয়তো বা তা ছিল পুরুষের উদ্ধত নিয়ন্ত্রণে; পুরুষ সচেতন ভাবে নারীবিদ্বেষী ও ধর্ষকাম।

জাতক-এর গল্পগুলোতে এমন একটি সমাজের ছবি আঁকা হয়েছে যা মূলত মেয়েদের প্রতি নির্মম। এর বেশির ভাগ গল্পেই আছে শারীরিক নির্যাতনের দৃষ্টান্ত; কয়েকটিতে মানসিক নিপীড়নের ছবিও আছে। যেমন, একটি তরুণীকে প্রেমে পড়ার অপরাধে অগ্নিপরীক্ষায় বাধ্য করা হয়েছিল। সে যে একটা কৌশলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে তা একজন ব্রাহ্মণ দেখে ফেলে এবং তাকে ধাক্কা মেরে প্রেমিকের কাছ থেকে সরিয়ে আগুনে ফেলে দেয়।(৬২) এক বণিকের এক বদমেজাজী কন্যা ছিল। তার দাসেদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় তারা তাকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়। বুদ্ধ তাকে উদ্ধার করে তার সঙ্গে বাস করেছিলেন। একদিন চোরের দল তাকে তাদের সর্দারের বউ করবে বলে চুরি করে নিয়ে যায়। বুদ্ধ উপস্থিত হলে চোরেদের সর্দার তাকে আঘাত করে। বুদ্ধ তাকে নারীহরণের অপরাধের কথা শোনান। সর্দার তখন মেয়েটিকে দু' টুকরো করে কেটে ফেলে।(৬৩)

এক রাজা রানিকে খেতে দিতেন না। বুদ্ধ তাঁকে ভিক্ষা করতে বলেন, তিনিও সব কথা রাজাকে জানান। বুদ্ধ তখন তাঁকে সমস্ত ব্যাপারটা রাজসভায় পুনরাবৃত্তি করতে বলেন। অতঃপর বুদ্ধ তাঁকে স্বামীকে ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। ততদিনে রাজা কিন্তু উচিত শিক্ষা পেয়েছেন।(২২৩)

কোনও এক জন্মে বুদ্ধ চোর হয়েছিলেন। শ্যামা তাঁর প্রেমে পড়েন। তাঁর আর একজন প্রেমিক বুদ্ধের জন্য নিজের জীবন দেয়। তিনি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি বেঁচে যান। বুদ্ধের কাছে ভৃত্যদের মাধ্যমে তিনি বলে পাঠান— 'শ্যামা তোমার জন্য কাতর হয়ে প্রতীক্ষায় রত।' কিন্তু বুদ্ধ আর আসেননি।(৩১৮)

বিপন্ন অবস্থায় এক রাজদম্পতি ঘরে ফিরছিলেন, ব্যাধের দল তাঁদের একটা পোড়া গিরগিটি দিলে রাজা তাই খেয়ে ফেলেন। রাজার বিদূষক বুদ্ধ ভিক্ষাদানে নারীর কুণ্ঠার অভিযোগ করলে তিনি তার কারণ বুঝিয়ে বলেন। বুদ্ধ বলেন— তাঁকে ত্যাগ করুন; তখন রাজার অনুশোচনা জন্মায়।(৩৩৩) এক ক্রীতদাসকন্যা দেখে ফেলে যে রাজপুত্র তার পিতাকে হত্যা করতে উদ্যত। (রাজপুত্র) তখন তাকে দু'টুকরো করে কেটে পুকুরের জলে ফেলে দেয়। রাজা (স্বয়ং) তা খুঁজে পান। তবে রাজপুত্র অনুশোচনা করায় তাকে ক্ষমা করা হয়।(৩৭৩)

নাগরাজ তাঁর রানিকে এক জলচর সাপের সঙ্গে খেলা করতে দেখে বাঁশের লাঠি দিয়ে তাঁকে পেটান। শারীরিক নিপীড়নের আর একটা দৃষ্টান্ত— রানি একটি মন্ত্র লিখতে চাইছিলেন, যার মূল্য একশো ঘা বেত (সহ্য করা)। তিন নম্বর ঘা পড়তেই রানি চেঁচিয়ে ওঠেন আর তখনই তাঁকে মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।(৩৮৬) বিখ্যাত বেশান্তর গল্পে আছে কী ভাবে নির্বাসিত রাজা স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে গিয়ে ইন্দ্রের ছদ্মবেশে মারধর করেছিলেন। মানসিক নির্যাতনের একটা আশ্চর্য গল্প দেখি সুজাত জাতকে। সেখানে এক রাজা ফলের পসারিণী সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। একদিন রাজা যখন সোনার পাত্রে ফল খাচ্ছেন, তখন সরল মনে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে রাজা কী ফল খাচ্ছেন। তাতেই চটে গিয়ে রাজা তাকে কটুবাক্য বলে উপহাস করেন এবং তাড়িয়ে দেন। এমন অনেক উদাহরণই দেওয়া যায়। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট— মেয়েরা তখন সম্পূর্ণ ভাবে পুরুষের দয়ায় বেঁচে থাকত। তাকে মারধর করা, হত্যা করা, অপমান করা এবং কোনও তোয়াক্কা না করে তাড়িয়ে দেওয়া যেত।

রামায়ণ-এ অহল্যার সঙ্গে গৌতমের দুর্ব্যবহার আমরা দেখেছি। যৌন অসংযমের জন্য কদাচ কোনও পুরুষকে শাস্তি পেতে হয়নি। বালী মৃত ভেবে সুগ্রীব বালীর পত্নী তারাকে গ্রহণ করেছিলেন। বালী সশরীরে ফিরে এলে তাঁর সঙ্গেই তারা ঘর করতে যান এবং তাঁর মৃত্যুর পর আবার সুগ্রীবের ঘরণী হন। এ সব ক্ষেত্রে বাস্তব হিংসা ছিল না বটে, তবে সমাজ অনুমোদিত মানসিক নিষ্ঠুরতা তো ছিলই, যাতে করে পুরুষের হাতে ফেলার সামগ্রী হিসেবে কোনও নারীকে এ-হাত থেকে ও-হাতে ফিরতে হয়েছে।

সীতাকে তো অন্যায় ভাবে সন্দেহ করা হয়েছে এবং প্রকাশ্যে কঠোর বাক্য বলে অপমান পর্যন্ত করা হয়েছে। প্রতিবাদ না করে রামের সে ক্ষেত্রে নীরবতা পালন সীতাকে অগ্নিদাহের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অযোধ্যায় তাঁকে নির্দয় ভাবে প্রবঞ্চিত করে অরণ্যে নির্বাসন দেওয়া হয়। অথচ তিনি গর্ভিনী হিসেবে একবার অরণ্যভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। (রাজসভায় সীতার) যমজ পুত্র (লব ও কুশ) বাল্মীকির শেখানো গান গাইবার পর সীতাকে রাজসভায় এসে নিজের সতীত্ব প্রমাণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সীতা যে নির্দোষ তা বোঝাতে বাল্মীকি তাঁর হাজার হাজার বছরের তপস্যাবলে সঞ্চিত পুণ্যফল ত্যাগ করার বাজি রাখার পরও এমন ঘটনা ঘটে। এ বার অবশ্য সীতা কার্যকর ভাবে প্রতিবাদ করে অন্তর্ধান করেন। একজন সম্পূর্ণ সতীসাধ্বী ও আন্তরিক ভাবে অনুগত পত্নীর সঙ্গে রামের এই ব্যবহার মানসিক নিপীড়নের উর্ধ্বসীমা স্পর্শ করেছে সন্দেহ নেই।

নারী সমাজের ওপরে পুরুষের শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে নির্দয় আচরণ মহাভারতে এত বেশি সংখ্যায় আছে যে বলে শেষ করা যাবে না। আমি তার অল্প কয়েকটি এখানে উল্লেখ করতে চাই। ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় দ্রৌপদীর প্রকাশ্য লাঞ্ছনা তার মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক ঘটনা এবং মূল গল্পের নির্ধারক বৃত্তান্ত। এ ঘটনায় যে শারীরিক ও মানসিক নির্দয়তা প্রকাশ পেয়েছে, তা দেখিয়ে দিচ্ছে মেয়েরা কতটা দীনহীন অসহায় যার জন্য তারা নিষ্ঠুরতার শিকার হলেও সমাজ সে অত্যাচার ক্ষমা করে দিচ্ছে, এমনকী অনুমোদন করছে। সারাটা মহাকাব্য জুড়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেয়েদের উপর বলাৎকারের নানা বৃত্তান্ত ছড়ানো। ধর্ষণকারীকে অপরাধী হিসেবে ঘৃণা করা দূরে থাক, বিজয়ী বীরের মর্যাদা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের উপর উপদ্রব করার জন্য কেউ গর্ববোধ করলেও তাকে সংযত করার দৃষ্টান্ত বিরল। পুরাণ গ্রন্থগুলো তো ধর্ষণ, অত্যাচার, মানসিক নিপীড়নের গল্পে পরিপূর্ণ।

এই যে নিজের মনে শুধু অর্জুনকে কামনা করলেও পাঁচ পাঁচটি ভাইকে বিয়ে করতে বাধ্য হন দ্রৌপদী, তাতে খুব সূক্ষ্ম ভাবে তাঁর মনের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার ঘটেছিল বৈকি। স্ত্রীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে যযাতি কৌশলে দেবযানীতে উপগত হয়েছিলেন। আচার্য গালবকে গুরুদক্ষিণা হিসেবে তিনি তাঁর নিজের তরুণী কন্যাকে দান করেন। প্রতি বছর একজন হিসেবে তিনজন রাজার কাছে ওই রাজকন্যাকে ভাড়া দেওয়া হয়, যতদিন না তাঁদের জন্য এক একটি পুত্রসন্তান তিনি প্রসব করেন। তাঁর ইচ্ছা, সম্মতি, পছন্দ সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষিত থেকেছে। এ গল্পটির একটি উপযুক্ত চূড়ান্ত পর্যায় আছে। রাজকন্যা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যাবলে যে পুণ্য অর্জন করেছিলেন, তাঁর বাবা তার দখল নেন, কেননা তাঁর নিজের পুণ্য স্বর্গলাভের থেকে কিঞ্চিৎ ন্যূন ছিল।

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের আরও দৃষ্টান্ত: কুনিগর্গের তরুণী কন্যা সুদীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রস্ত অবস্থায় যখন তাঁর মৃত্যু আসন্ন এবং বহু প্রচেষ্টায় অর্জিত স্বর্গসুখ লাভও প্রায় নিশ্চিত, নারদ তখন তাঁকে জানালেন যে কোনও নারী কদাচ স্বর্গে যেতে পারেন না! চন্দ্র বৃহস্পতির পত্নী তারাকে অপহরণ করেছিলেন। এই চন্দ্রের ঔরসে

তারার গর্ভে বুধের জন্ম। পরে বৃহস্পতি ওই স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনেন। আরও একবার দেখা গেল যার মন বলে কিছু নেই নারী এমন এক জড়বস্তু ও হাতফেরতযোগ্য খেলার সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়।

এই গল্পে এবং আরও নানা গল্পে যে সূক্ষ্ম ভাবে নারী নির্যাতন সম্ভব হয়েছে তার একমাত্র কারণ নারীকে ভাগ্যবস্তু হিসেবে মনে করার মধ্যে নিহিত। সুতরাং নির্বিচারে তাঁর ওপর অত্যাচার করা যায়! সমাজ নারীকে এমন এক ভাবে দেখতে চেয়েছে যাতে অন্য ভাবে তার সামাজিক প্রয়োজন প্রমাণ করতে না পারায় পিতা, স্বামী বা পুত্র কোনও এক পুরুষের উপরেই তাঁকে নিতান্ত দীন ভাবে নির্ভর করে থাকতে হয়। এমনটা হওয়ার কারণ হল, দুঃখের সঙ্গে তাকে সচেতন থাকতে হত যে তার ভূমিকা পরনির্ভর অস্তিত্ব পদানত এবং তা কাম্যবস্তু হিসেবে নিজের স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের অনুগ্রহে। তাঁরাও জানতেন স্বামীর সম্পত্তির আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী হিসেবে পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে মেয়েটির পরনির্ভরতার কথা।

এই ভূমিকা সম্বন্ধে নারী যে শুধু সচেতনই ছিল তাই নয়, তা অন্তরেও বুঝেছিল। ফলে তার উপর দৈহিক ও মানসিক নিপীড়ন চিরস্থায়ী করা সম্ভব হয়েছিল। বস্তুত আরিস্তোফানিস, ডেরেন্স ও প্লাউতুস-এ বর্ণিত নারীদের অবস্থার কথা আমাদের ভাবা উচিত যাতে হেলেনীয় গ্রিসে ও রোম সাম্রাজ্যে মেয়েদের অগ্রগামী পুনর্মূল্যায়ন ও আইন সংশোধন দেখে পার্থক্যটা ধরা যায়।

এ রকম স্বনির্ভর অবস্থা ভারতীয় সমাজেও লালিত হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু এখানে মেয়েদের একত্র হয়ে নিজেদের দুরবস্থা আলোচনা করার কোনও মঞ্চ ছিল না। সুতরাং প্রতিটি ঘটনাই বিচ্ছিন্ন ভাবে একক ঘটনা বলে গণ্য হত। বেশ্যাদের বাদ দিলে মেয়েদের ঘটনা নিয়ে কোনও ব্যবস্থারীতিও ছিল না। সুতরাং পুরুষের অত্যাচারজনিত দুঃখকষ্ট মাঝে মধ্যেই সর্বত্র ঘটত এবং তা নিন্দনীয়ও ছিল না, শাস্তিযোগ্যও ছিল না। হাজার বছরের পুরোনো এই কদাচারের অবসান ঘটতে পারে কেবলমাত্র মেয়েদের সংঘবদ্ধ চেষ্টায়, আর যদি তার পিছনে থাকে দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট নীতি ও স্বচ্ছ ভাবে নির্ধারিত আইন।

কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদীর মতো নারীব্যক্তিত্ব কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেছিলেন সত্য, তবে সমাজ মোটামুটি ভাবে সে প্রতিবাদ উপেক্ষা করার সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন কোনও শাস্তি ভয় ছাড়াই চলে এসেছে।

মেয়েদের নাগরিকত্বের কোনও আইন ছিল না, আইনের চোখে তাদের মর্যাদা ছিল নিচের দিকে। উচ্চ তিন বর্ণের পুরুষরা শূদ্র ও নারীদের ওপর ধর্ষণ, অপহরণ, নিপীড়ন, ইত্যাদি অত্যাচার চালিয়ে যেত, অথচ তার জন্য কোনও শাস্তি পেতে হত না। শুধু বারাঙ্গনার কিছুটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ছিল এবং বিনা শাস্তিতে তার উপর অত্যাচার কিংবা তার শারীরিক বিকৃতি ঘটানো সম্ভব হত না। মর্যাদাপুরুষোত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মানব বলে কথিত রামচন্দ্রের নির্দেশে তাঁরই অনুগত ভাইয়ের হাতে শূর্পণখার শারীরিক বিকৃতি

সংঘটিত হওয়ার কথা আমরা জানি। রীতিনীতি এমনই ছিল: সামাজিক ভাবে দুর্বল মানুষ, বিশেষত স্ত্রীলোকও শূদ্রদের ওপর অত্যাচার অনুমোদিত আচরণবিধির মধ্যেই পড়ত এবং তা সম্ভব ছিল এই জন্যই যে পুরুষ ও নারী উভয়পক্ষই তা মেনে নিয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীর লেখা *তৈত্তিরীয় সংহিতা* জানাচ্ছে, নারীর শরীর তার নিজস্ব অধিকারে নয়; সুতরাং চিরটা কাল ধরে নারীদেহ স্বচ্ছন্দে ভোগ করা চলে, ইচ্ছেমতো তার ওপর অত্যাচার করা চলে এবং পুরুষ খুশিমতো তাকে ত্যাগ করতেও পারে। খুব প্রাচীনকাল থেকেই মেয়েদের মন ও অনুভূতির কথা সমাজ গ্রাহ্য করেনি। সুতরাং পুরুষের ধর্ষকামিতা যতক্ষণ না কিছুটা পরিতৃপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ মানসিক নিপীড়ন মেনে নেওয়া হয়েছে। যেটা আরও খারাপ এ ক্ষেত্রে পুরুষদের সচেতনতার ব্যাপারে সার্বিক ঔদাসীন্য কাজ করেছে। এই জন্যই নববিবাহিত স্ত্রীর সামনে বহু পত্নীর প্রার্থনা সম্ভব। এই জন্যই সম্পূর্ণ নির্দোষ স্ত্রী হলেও রামের হাতে সীতার অপমান ও নিষ্ঠুর আচরণের পুনরাবৃত্তি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে সামাজিক সত্তা হিসেবে মেয়েদের কোনও রাজনৈতিক আইনগত মর্যাদা ছিল না। নারীর ওপর শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের ব্যাপারটা সমাজের উচ্চকোটির লোকেদের পক্ষে তাই সহজতর হয়েছিল। নারী ও স্ত্রী হিসেবে তার কর্তব্যকর্ম আগেই নির্ধারিত ছিল; সে কাজে ব্যর্থতা বা ত্রুটি হলে তৎক্ষণাৎ নির্যাতন ছিল অবধারিত। এমনকী কর্তব্যহানি হয়নি এমন ক্ষেত্রেও বলাৎকার, যৌন নির্যাতন এবং দুর্ব্যবহার ঘটতে পারত। উদারচেতা ব্যক্তিবিশেষের নৈমিত্তিক মহানুভবতা ছাড়া প্রতিকারের প্রার্থনা করার কোনও জায়গা ছিল না। তার প্রার্থনায় কান না দেওয়াও তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যেমনটা দ্রৌপদীর আবেদনে কুরুবৃদ্ধদের ক্ষেত্রে দেখেছি।

মেয়েদের ওপর বলাৎকার ও নিপীড়নের ঘটনা প্রায়শ তাদের সমাজের পুরুষদের কোনও কাজের প্রতিশোধ হিসেবে সংঘটিত হত। বলতে গেলে, পুরুষদের কোনও বাস্তব বা কাল্পনিক অপরাধের মূল্য দিতে হত সম্পূর্ণ নিরাপরাধ মেয়েদের এবং অন্যান্য দুর্বলদের। এটাকে বাধা দেওয়াও সমাজনীতির অংশবিশেষের বিরুদ্ধাচারণ করা বোঝাত। মেয়েদের পরিকল্পিত ভাবে অসহায় ও পরাশ্রিত হিসেবে ধরে নিয়ে পালন ও রক্ষা করা হত। আর তারাও এই মূল্যবোধ অন্তরে গ্রহণ করে আত্মসমর্পণ করত। একমাত্র কার্যকর প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই অত্যাচারের এই কাহিনিগুলোর পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব ছিল। আজকের দিনেও এই প্রতিবাদ সমান জরুরি।

সূত্রাবলি

১. *বৃহদারণ্যকোপনিষদ* ৬ ৪ ৭
২. *মৈত্রায়নীসংহিতা* ৩·৬.৩, ৪.৬ ৭, ৪ ৭ ৪, ১০ ১০ ১১
৩ *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ২৩ ৪, *হিরণ্যকেশি গৃহ্যসূত্র* ১ ১৪ ২
৪ *খাদির গৃহ্যসূত্র* ১·৯; ২৩·৪৫
৫. *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ২.৩, ১০.৭

৬. প্রাগুক্ত ১২:৩৯
৭. *শতপথব্রাহ্মণ* ৪.৪.২:১৩
৮. *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ২:১১-১৪; *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* ৪:৬, *মনুসংহিতা* ৯:৪
৯ *হিরণ্যকেশি গৃহ্যসূত্র* ১ ৬·১২ ১৪
১০ *তৈত্তিরীয় আরণ্যক* ১·১১:৪
১১. সাবসস্বতানাময়ন অনুষ্ঠানের জন্য; *শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র* ১২.২৯:২১
১২. *শতপথব্রাহ্মণ* ১ ৯·২৩.৪৫
১৩. *খাদির গৃহ্যসূত্র* ১·৪·১১
১৪ *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ৬.৫:৮·২
১৫. *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ২·১০.২৭·৩
১৬ *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ২ ৫ ২ ২০
১৭. *আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র* ২:১১·৪

নারী ও নীরবতা

এক

এই আলোচনাপত্রটি শুরু হচ্ছে আমাদের প্রথম সাহিত্য *ঋগ্বেদ* থেকে, যার আনুমানিক রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে। *ঋগ্বেদ*-এ বেশ কয়েকজন নারী কবির নাম জানা যায়— ঘোষা, শাশ্বতী, রোমশা, লোপামুদ্রা, অপালা, বিশ্ববারা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ঋগ্বেদে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ (অর্থাৎ বাণী) যাবতীয় প্রধান দেবতাদের যথার্থ মূর্ত রূপ হিসেবে আত্মপরিচয় ঘোষণা করতে অগ্রণী হয়েছিলেন। সংক্ষেপে বললে বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিভূমিতে যে সোহম্ (অর্থাৎ, আমিই সেই) তত্ত্ব আছে, তিনি তাই উচ্চারণ করেন।[১] তবু সামাজিক মর্যাদায় তাঁর স্থান অধস্তন; সামাজিক ভাবে যাঁরা ঊর্ধ্বতন, বিশেষত পুরুষ, তাঁদের সামনে তাঁর মুখ খোলা অনুচিত। তাঁর অবদান অনাদৃত থেকে গেছে। তাহলে, এক সময় কিছু মহিলা যথেষ্ট সরব ছিলেন এবং পুরুষরা কোনও কুণ্ঠা না করেই নারী কবি হিসেবে তাঁদের নাম রক্ষা করেছেন। তবু সভা-সমিতিতে উপস্থিত হওয়ার দস্তুর মেয়েদের ছিল না[২], সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত কোনও আলোচনায় যোগদান করার ক্ষেত্রেও একই কথা।

খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যুগে অবশ্য কোনও সৃজনশীল কাজে মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু শুনতে পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন যজমানের পত্নী হিসেবে তাঁকে সাহায্য করতে এবং সম্ভবত কিছু তুচ্ছ কাজে অংশ নিতে। এরই মধ্যে উপনয়নের অধিকার তিনি হারিয়েছেন এবং তার ফলে বৈদিক শাস্ত্র জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন। সুতরাং যজ্ঞে নারীর ভূমিকা নিতান্ত নীরব। যদিও কোনও কোনও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পত্নীকে যজ্ঞের পশ্চার্ধ (অবশ্যই পতি এই সঙ্গে পূর্বার্ধ বলে চিহ্নিত) বলা হয়। তাঁকে অর্ধেক বলার কারণ হল এই যে যতদিন পত্নী না থাকে সন্তানলাভও ঘটে না।[৩] সুতরাং পত্নীর আসল উপযোগ সন্তান প্রসব করায়। সোমযাগের অগ্নিপত্নীবত অনুষ্ঠানে একটা লাঠি দিয়ে ঘি-তে আঘাত করা হত। লাঠিটি যেন বজ্র আর এই ভাবে দেবতারা তাঁদের পত্নীদের দুর্বল করে দিতেন যাতে আপন শরীরের কিংবা উত্তরাধিকারের উপর পত্নীদের কোনও অধিকার না থাকে।[৪] সুতরাং মারধর করলেও পত্নী নিষ্ক্রিয়, নীরব, কেননা এহেন মারধর যজ্ঞ-অনুমোদিত। সেই পতি আরও নিচু গলায় মন্ত্র আবৃত্তি করবে যাতে তার কোনও ক্রমে উৎসাহে উজ্জীবিত না হতে পারে। কিন্তু যজ্ঞে, যেমন বরুণপ্রঘাস অনুষ্ঠানে পত্নী কোনও কথা বলবেন না। যজ্ঞ শুরু করার সময় পুরোহিত প্রকাশ্য সমাবেশে যজমানপত্নীকে শুধাবেন— কারও সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্ক তিনি করেছেন কিনা। তাঁকে এ কথার জবাব দিতেই হবে,

না হলে দুর্দৈব নেমে আসবে। যিনি স্বীকার করলেন, তাঁর পাপের মাত্রা কমে যাবে।[৫] তাঁর স্বামীকে কিন্তু কদাচ এমন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় না, আসলে কোনও পুরুষকে কদাচ এমন অবমাননাকর প্রশ্ন করা যায় না। একটি ব্রাহ্মণ-সন্দর্ভে বলা আছে— নারীকে আলাদা করে রাখতে হবে, না হলে তার শক্তিক্ষয় ঘটবে।[৬] জিজ্ঞাসা করা চলে— বিচ্ছিন্ন করে রাখলেই শুধু রক্ষা পায়, কি এমন সেই শক্তিটি?

উপনিষদ-এ মেয়েরা কদাচিৎ কথা বলেছেন, তাঁর স্বামী দুই স্ত্রীর মধ্যে যা বাঁটোয়ারা করে দিতে চাইছিলেন, মৈত্রেয়ী সেই ঐহিক সম্পদের বিশেষ পরোয়া করেননি। স্বামী তাঁকে তখন আধ্যাত্ম-উপদেশ দেন, কিন্তু সারাক্ষণ নীরব নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হয়েই ছিলেন মৈত্রেয়ী।

দুই

যাজ্ঞবল্ক্য নামে পরিচিত এই একই স্বামী অন্যত্র বলছেন কীভাবে স্বামীর শয্যায় আসতে নারাজ স্ত্রীকে রাজি করানোর জন্য মারধর পর্যন্ত করতে হবে।[৮] এও আর এক অপমান ও আঘাতের নীরব পাত্র হওয়া। আধ্যাত্মিক বিতর্কে পুরোপুরি কোনঠাসা না করা পর্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন গার্গী। যাজ্ঞবল্ক্য তখন বলে বসলেন, 'আর কথা বাড়িও না, গার্গী, না হলে তোমার মাথা খসে পড়বে।'[৯] এখানেও নারীকে নীরব হতে বলা হল। সুলভা নামে এক বর্ষীয়সী নারী এসেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে আধ্যাত্ম আলোচনা করতে। তাঁর চরিত্র, যৌন মতলব ও উদ্দেশ্য নিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য এমন অপমানকর ইঙ্গিত করেন যে ওই মহিলা স্থানত্যাগ করেন। একজন নারীবিদ্বেষীর হাতে অন্যায় কৌশলে এই ভাবে সুলভাকে নীরব হতে হয়েছিল।[১০]

সুতরাং সমাজ নারীদের কাছে এটাই আশা করেছিল যে, তাঁরা উচ্চ চিন্তাভাবনার বিষয়গুলো পুরুষদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সাংসারিক কাজকর্ম পালন ছাড়া অন্যত্র নীরব থাকবেন। এক মহিলার গল্প আছে যেখানে, জনৈক গন্ধর্ব তার ওপর ভর করায় তিনি খুব কথা বলতেন।[১১] তিনি খুব বেশি কথা বলতেন বটে; কিন্তু আসলে তাঁর মুখ দিয়ে পুরুষ গন্ধর্বটিই কথা বলত। আর এক মহিলার উল্লেখ পাই, যিনি ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর অতিস্বল্প খাদ্যভাগ থেকে স্বামীর জন্য খাবার বাঁচাতেন এবং খুব কম কথা বলে স্বামীকে তা দিতেন। যখনই দরকার, তখনই নারীকে পুরুষের সেবা করতে হবে, কিন্তু কথা বলা চলবে না; সেবা নীরবে হওয়া চাই।

মহাকাব্যের যুগের আগে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ রচিত পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* ব্যাকরণে প্রত্যয়যোগে শব্দ নিষ্পাদনের এমন কিছু সূত্র যাতে নারী শিক্ষিকার অর্থ অনুধাবন করা যায়। যেমন, নিজে শিক্ষিকা অর্থে আচার্যা, নিজে উপাধ্যায়া অর্থে উপাধ্যায়া; উপাধ্যায়ের পত্নী উপাধ্যায়ানী, আচার্যের পত্নী আচার্যানী। বিস্ময় জাগে, নারীদের যদি উপনয়ন সংস্কার সহ বিদ্যারম্ভ না হত, তাহলে তাঁরা শাস্ত্র শিখতেন কী ভাবে, যাতে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে অন্যদের বিদ্যাদান করতেন? কোনও নারী শিক্ষাদান করছেন, এমন কোনও লিখিত প্রমাণ অবশ্য

নেই। সম্মানীয় ব্যতিক্রম নিশ্চয় ছিল কিন্তু ব্যতিক্রম হিসেবেই আমরা যেন গণ্য করি। দেখতে হবে, সাধারণ ভাবে নারী মৌন পালন করতেন, কেননা তাঁদের মৌনভাবই সমাজ পছন্দ করত।

রামায়ণ, *মহাভারত*-এর মূল অংশে অবশ্য কিছু নারীচরিত্র আছে যাঁরা সরব থেকেছেন। অরণ্যবাসে রামের সঙ্গী হওয়ার জন্য অনুমতি পেতে সীতা তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করেছিলেন![১২] সাবিত্রী প্রকাশ্য রাজসভায় পিতার সঙ্গে বিতর্ক করেছিলেন— নিজের পছন্দ মতো স্বামী নির্বাচনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। শাল্বকে অম্বা ভালবাসতেন এবং তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভীষ্মের সঙ্গে অম্বা তর্ক করতেন।[১৩] তপস্যারত মুনি ঋষিদের প্রলোভিত করার সময় অপ্সরাদেরও খুবই বাক্‌পটু হতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁরা তো আসলে পার্থিব বারাঙ্গনাদের প্রতিরূপ। নীতি প্রসঙ্গে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তর্ক করেছেন। সুতরাং মহাকাব্যের মূলভাগে এমন এক যুগের স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান যখন পর্যন্ত নারীর প্রকাশ্যে ব্যক্তি হিসেবে কথা বলার অনুমোদন ছিল। কিন্তু মহাকাব্যের পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতেই দেখছি নারীর সামাজিক অধিকারগুলি নির্মম ভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে এবং এই সব অধিকারের মধ্যে আছে কথা বলার মুখ্য অধিকার।[১৪] মহাকাব্যের কোনও কোনও নারীচরিত্র যাঁরা আগের পর্যায়ে যথেষ্ট সরব ছিলেন, এই পর্যায়ে তাঁরা পর্যন্ত নীরবে দীনহীন ভাবে পুরুষের অধীন হয়ে পড়েছেন।

যেমন, বনপর্বে সত্যভামা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি কী ভাবে তাঁর পাঁচজন স্বামীকে খুশি রাখেন। দ্রৌপদী অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উত্তরে জানান— তিনি কদাচ কোনও বিষয়ে পাঁচজনের কারও কথার বিরুদ্ধাচরণ করেন না।[১৫] ইনি সেই একই দ্রৌপদী যিনি তাঁর স্বামীদের আগে এক সময় 'কাপুরুষ', 'ক্ষত্রিয় নামের অযোগ্য' বলেছেন, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যিনি ধর্মবিষয়ে বিতর্ক করেছেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যিনি কৃষ্ণকে নিষ্ক্রিয়তার জন্য নিন্দা করেছেন। কিন্তু এই দ্রৌপদী যিনি সত্যভামার কথার উত্তর দিচ্ছেন, তিনি নারীর নীরবতার সমর্থক-প্রবক্তা, *মহাভারত*-এর প্রক্ষেপকারী ভার্গব কবিদের এক দুর্বল সৃষ্টিমাত্র। এই জন্য একটি ব্রাহ্মণ সন্দর্ভে আমরা বলতে দেখি, আদর্শ নারী যিনি তাঁর শাশুড়ি-ঠাকরুণকে কোনও গৃহকর্মে হাত দিতে হয় না, এবং 'যিনি কখনও কথার উত্তর করেন না।'[১৬] এই একই মহাকাব্য অন্যত্র জোরের সঙ্গে বলেছে, শ্রেষ্ঠ নারীত্ব একজন সবচেয়ে নিকৃষ্ট পুরুষের চাইতেও খারাপ! আগের যুগে, আরণ্যক সাহিত্যে লেখা হয়েছিল, একজন শিক্ষিত নারী বস্তুত পুরুষ এবং উপার্জনশীল নারীও পুরুষতুল্য।[১৭] *মহাভারত* কিন্তু সেই নারীর প্রশংসা করেছে, যিনি তাঁর শাশুড়ি ঠাকুরণের সেবা করেন এবং তাঁর কথার ওপর কথা বলেন না।[১৮] সংঘে নারীদের যোগদানে বুদ্ধদেবের প্রতিবন্ধকতার কথা আমাদের নিশ্চয় মনে রাখতে হবে, যদিও পরে তিনি তা মেনে নেন। থেরী গাথাগুলি কবিদের কারও কারও সামাজিক ব্যর্থতার কথা বলে। তবে এমনকী বৌদ্ধ মতবাদের মধ্যেও নারীসমাজ ছিল নীরব ও পরাধীন, চাইকি পুরুষের পদানত। সংঘারামের ভিক্ষুদের জন্য নারীদের গৃহকর্ম করতে হত। এমনকী ভিক্ষুনীদেরও

পর্যন্ত তাই করণীয় ছিল *মহাভারত*-এ রাজকন্যা মাধবীর গল্পের কথা তো এ বইয়ের অন্যত্র উল্লেখ করেছি, কী ভাবে আছে, তাঁর বাবা গালবের হাতে তাঁকে ধার দিয়েছিলেন, যাতে তিনজন রাজার হাতে পর্যায়ক্রমে তাঁকে পুত্র উৎপাদনে নিযুক্ত হতে হয়।[১৯] মেয়েটি নীরব অত্যাচারের শিকার হয়ে রইলেন।

বারললনাদের বাদ দিলে, মেয়েদের কথা খুব কমই কানে তোলা হয়েছে। তাই বারাঙ্গনারা সরকারি খরচে শিক্ষালাভ করতেন এবং সমাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত নারী বলতে শুধু এঁরাই ছিলেন। পরবর্তী সাহিত্যে মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেখা যায় এবং তারপর আর তাদের প্রসঙ্গ শোনা যায় না। এমনকী রাজরানিদেরও পরবর্তী সাহিত্যে এমন ভাবে পাওয়া যাচ্ছে যে, তাঁরা প্রায় কিছুই বলেন না, কিন্তু স্বামীদের বাক্যে 'হ্যাঁ' বলেন। কেউ কেউ কাঁদেন আর ভাগ্যকে দোষ দেন।

নাট্যসাহিত্যেও দেখি শ্রেষ্ঠ নায়িকারা খুবই কম কথা বলছেন এবং তাঁরা যে চুপচাপ থাকেন এটা তাঁদের অন্যতম গুণ। এটা হল গিয়ে লজ্জাশীলতা, যা নারীচরিত্রের মৌলিক সম্পদ। এ সাহিত্যে তর্কবিতর্ক দুর্লভ এবং মেয়েরা অংশ নিচ্ছেন এমন কথোপকথন, সামান্য কিছু ব্যতিক্রমী নাটক বাদ দিলে, আরও দুর্লভ।

এমনটা হল কেন? কেন আমরা কোনও আরিস্তোফানিসকে পেলাম না, যিনি মেয়েদের অসহযোগের ছবি আঁকতে পারেন, তা সে ঠাট্টা-মস্করার ছলে হলেও? কিংবা, অ্যাটিক কমেডির মতো কিছু, যেখানে মেয়েরা উদ্যোগ নেন, কথা বলেন, তর্ক-বিতর্ক করেন, ভয় দেখান এবং তুলনামূলক ভাবে সরব হন। গ্রিক মহাকাব্যেরও নাটকে মুখ্য নারীচরিত্রগুলি, তা সে দেবী বা মানুষী যাই হোন, স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের মনের কথা বলেছেন। ভারতীয় নারীকে কেন এমন আড়ালে রাখা হল, কথা বলার ন্যূনতম সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হল না? তাঁকে এমন জায়গায় নামিয়ে দেওয়া হল, যাঁর কথা শোনা যায় না, কেননা বাক্ (অর্থাৎ বাণী) থাকেন দেহের গভীর অন্তরে।[২০] তাঁর সামাজিক অবস্থান তাঁকে দাসত্ব ও নীরবতার পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

এর একটা কারণ তাঁদের সামাজিক অবনত মর্যাদা যা সমাজ শিক্ষালাভ ও তার ফলে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন থেকে মেয়েদের বঞ্চিত রেখে সৃষ্টি করেছে। নারী-পুরুষ উভয়পক্ষ নারীর নীরবতা মেনেই নিয়েছিল। শিক্ষার অভাব তাঁদের জানার জগৎ কার্যকর ভাবে সঙ্কুচিত করেছে এবং আলাপ-আলোচনার সজীব বিষয় কেড়ে নিয়েছে। আর একটা কারণ হল পুরুষের ওপর মেয়েদের চূড়ান্ত অর্থনৈতিক নির্ভরতা, যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস তাঁদের ছিল না। আমরা মনকে বোঝাই, মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বেশ জোরে জোরে এবং যেটা মেয়েদের দোষ বলা হয়, বাচালের ভঙ্গিতে কথা বলতেন। কিন্তু বাইরের সমাজ দেখতে চাইত, মেয়েরা সম্পূর্ণ বশীভূত এবং নীরব থাকবেন। এই জন্য, যেটা আদর্শ ভাবা হয়েছে সেই ভাবে নীরব নারীর ছবি ওঁরা এঁকেছেন।

সমাজে নারীর প্রতি উপেক্ষা ছিল অত্যন্ত তীব্র। এতটাই যে নারী আপন অন্তরে এই

অন্যায় সামাজিক বিধান মেনে সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে তাঁদের যেন কেউ না শুনে ফেলে। যেমন, খনা আপাতদৃষ্টিতে সমাধানের অতীত একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য এতটাই খুশি হলেন যে, তিনি তাঁকে রাজসভায় দশম রত্ন গণ্য করতে চাইলেন। কিন্তু খনার স্বামী বরাহমিহির তাঁর জিভ কেটে দিয়ে সত্যি সত্যি তাঁকে বাক্যহীনা করে দিলেন, যাতে তিনি তাঁর গুণের জন্য আর প্রশংসা না পান। এই ঘটনাটি সর্বকালের জন্য একটি প্রতীকী তাৎপর্য পেয়েছে। মেয়েরা দর্শনীয় হলেও তাঁদের নির্বাক হওয়া চাই। মেয়েরা নিজেরাই সমাজের এই ইচ্ছা অন্তরে বুঝেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন এবং মানতেন যে মর্যাদায় তাঁরা নিচু; তাঁরা পুরুষের সামনে কথা বলা অস্বাভাবিক ও অমর্যাদাকর ভাবতেন। অবশ্য সাহিত্যের বৃহদংশ সম্পন্ন সমাজের নারীর চিত্রই এঁকেছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যাঁরা নিম্ন পর্যায়ের, সেখানে মেয়েদের নিশ্চয় আর একটু সরব থাকার কথা। উচ্চবর্গের বিধিনিষেধ সেখানে চালু না থাকাই স্বাভাবিক।

এ থেকে একটা মৌলিক প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে: শব্দ কী, প্রাচীন মানুষের কাছে তার মূল্য কী ছিল? বেদের গল্পের পর গল্পে বলা হচ্ছে, শব্দ নাকি আধ্যাত্মিক শক্তিতে ভরপুর। বর কিংবা অভিশাপ হিসেবে তা অবিনাশী। শক্তিমান এবং অপরিবর্তনীয়। ঋগ্বেদের ঋষি এমন শব্দ উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু, তার পরই নারীর উপনয়ন সংস্কার বাদ পড়ল, আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মণ্ডিত বাক্য উচ্চারণ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন, বিবাহ ও স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সেবাকেই শিক্ষার সঙ্গে সমান গণ্য করা হল।[২১] এই ভাবে মেয়েদের আরও পিছনে সরিয়ে দেওয়া হল। অথর্ববেদের একটি মন্ত্র বলছে, দিন শুরু হলে নক্ষত্রেরা যেমন আলো থেকে দূরে সরে যায়, তেমনই শ্বশুরের কাছ থেকে বধূরা পালান।[২২]

তবু, *ঋগ্বেদ*-এর বাক্, এবং ভারতী এবং আরও পরে সরস্বতী স্বয়ং বাগ্‌দেবী!

পরবর্তী সাহিত্যে যে সব দেবীরা কথা বলেন, অভিশাপ দেন কিংবা আশীর্বাদ করেন, তাঁদের কল্পনা সমাজে আসলে বাক্যহীনা বৃহৎ নারীগোষ্ঠীর দুর্দশার ক্ষতিপূরণ। নারীর বাক্য যেটুকু আমরা পাই তা গোঁড়া মতাদর্শের কাছে ভয়ানক, দ্রৌপদী, গান্ধারী, সীতা, দময়ন্তী, গার্গী, অম্বা, শকুন্তলা ও অন্যান্যরা যাঁরাই কথা বলেছেন, ভয় দেখিয়েছেন, চ্যালেঞ্জ করেছেন, তাঁরাই ক্ষতিপূরণের পদ্ধতিতে, প্রতীকী পন্থায় নতুন দেবসমাজে অঙ্গীভূত হয়েছেন। তাঁরা বেশির ভাগ দৈব অধিকারে বলীয়সী দেবী হয়ে উঠেছেন।

যেখানেই প্রতিবাদ উঠেছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীর সাফল্য হয়নি বললেই চলে। কে প্রতিবাদ করতে পারেন? নারীকে চুপ করাতে সফল হয়েছে সমাজ। যদি বা তাঁরা কিছু বলেছেন, শক্তিমানের আসন পর্যন্ত তা কখনও পৌঁছয়নি, তাঁদের কণ্ঠস্বর এমনকী নির্বিচারে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই ভাবে সমাজ সরব নারীদের দমন করার ব্যবস্থা নিয়েছে। পুরাণে ও সাহিত্যিক প্রমাণে প্রায়শ এমন সব জো-হুজুর নারীচরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে যাঁরা তাঁদের জীবন ও আচরণ সম্বন্ধে পুরুষের নির্দেশিকা মেনে চলেন, কদাচ প্রশ্ন তোলেন না এবং পতিব্রতা ও সতী হিসেবে নিজেকে বড় প্রমাণ করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় মাতেন—

চিন্তাশীল হিসেবে কিংবা সামাজিক মূল্যাবোধের বিচারক হিসেবে নয়। জনতার অর্ধেককে এই ভাবে নির্বাক নিষ্ক্রিয় দর্শকে অবনমিত করার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সমাজ আখেরে হারিয়েছে অনেক কিছু। কেননা, দুটি মস্তিষ্ক সব সময়ে একটির চেয়ে ভাল। নারীর ওপর নীরবতা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে নিঃসন্দেহে সমাজের অধোগতি ত্বরান্বিত হয়েছে, বিশেষত খ্রিস্টিয় পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। নারীদের সম্বন্ধে সমাজের নীরবতা এবং নারীর ওপর নীরবতা চাপানোর কুফল হিসেবে, সমাজে নারীর নীরবতা এই ভাবে একটা চরম অভিশাপ হয়ে উঠেছিল।

সূত্রাবলি

১. *ঋগ্বেদ* ১০:১২৫
২. *মৈত্রায়নী সংহিতা* ৪:৭:৪
৩. *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ৬:১:৮.৫
৪. প্রাগুক্ত ৬:৫:৮.২; *শতপথব্রাহ্মণ* ৪.৪:২·১৩
৫. *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ২:৫·২·২০
৬. *শতপথব্রাহ্মণ* ১৪:১·১·১১
৭. *বৌধায়ন* ৩:৬:১
৮. প্রাগুক্ত ৫:৪.৭
৯. প্রাগুক্ত ৩.৬.১৭
১০. *মহাভারত* ১২ ৩২০
১১ *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* ৩:৩:১২
১২. *রামায়ণ* ২·২:২১, ২৮, ৩৫, ৩৬, ৩০, ২০, ২১
১৩. *মহাভারত* ১:৯৬:৪৭:৪৮
১৪. প্রাগুক্ত ৩:২৭, ৩০, ৩২, ৩৭
১৫. প্রাগুক্ত ৩·২২২.২৮-৩৩
১৬. *ঐতরেয়ব্রাহ্মণ* ৩.২৪:২৭; *আপাস্তম্ব ধর্মসূত্র* ১·১০:৫১-৫৩-তে বিষযটিব পুনরাবৃত্তি মেলে।
১৭. *তৈত্তিরীয় আরণ্যক* ১·১১·৪
১৮. *মহাভারত* ২:২২৭·৩৬; ১৩:৯৩·১৩১
১৯. প্রাগুক্ত ৫:১১৮-১২২
২০. *ঋগ্বেদ* ১:৬৭:৩
২১. *মনুসংহিতা* ২:৬৭
২২. *অথর্ববেদ* ৮:৬·২৪

সতী

দেওরালার ভয়াবহ ঘটনা আমাদের সত্য সত্যই বিচলিত করে তুলেছে— আমরা আমাদের ধর্ম-সামাজিক পরম্পরার বিভিন্ন ধারা আলোচনা করতে শুরু করেছি। এ কী কেবল একট বিচ্ছিন্ন ঘটনা? না কি ইতিহাসে ঐতিহ্যে এর শিকড় সুদূর প্রসারিত? এই ঘটনা কি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা না কি তার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা, প্রতিবেশীরা প্রয়োজনীয় ইন্ধন জুগিয়েছিল অথবা কোনও নির্মম চক্রান্তের শিকার হয়ে তাকে অনিচ্ছায় প্রাণ দিতে হল? নিহতের অথবা তার স্বজনবর্গের মানসিক অবস্থা যাই হোক না কেন, যে তথ্য আমাদের প্রকৃত ভাবে আহত এবং বিস্মিতও করে তা হল এই যে, বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই ঘটনা সত্যই ঘটেছে। এ কথাই আমাদের বিভ্রান্ত করে, এক প্রতিস্পর্ধার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়: এই হত্যা কেবল ঘটেইনি, বহু দৃষ্টিকোণ থেকেই এই ঘটনার প্রশংসা এবং অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সে কি কোনও ধর্মীয় প্রেরণার বশবর্তী হয়ে না কি অন্য কোনও আবেগের ফলে? ভবিষ্যতে আরও অনেক মৃত্যুকে প্রতিহত করার জন্য কেমন করে এই প্রেরণাকে বিনষ্ট করা যায়?

রূপ কানোয়ার 'সতী' হয়েছেন। 'সতী' শব্দের অর্থ কি? আমাদের ভুললে চলবে না যে ভারতীয় ভাষাগুলির ক্ষেত্রে 'সতী'র কোনও পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ নেই। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে এবং বিশেষ ভাবে শব্দটির নৈতিক তাৎপর্য কেবল কোনও নারীর প্রতিই প্রযোজ্য। কী এই তাৎপর্য? 'সদ্যবিধবা নারী তার মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করে এবং নিজেকে উৎসর্গ করে, প্রথমত পরলোকে তার স্বামীর স্বচ্ছন্দ অবস্থানের জন্য, দ্বিতীয়ত স্বর্গে চিরকাল স্বামী সঙ্গ সুখের আশায়।' আলোচ্য বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারি যে রূপ কানোয়ারের স্বামী ছিল নির্বীর্য, তাই তার মৃত্যুর কিছুদিন আগেই সে স্বামীকে ত্যাগ করেছিল অপর এক পুরুষের জন্য। তাই সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন ওঠে অনন্তকালের জন্য সেই স্বামীর সঙ্গলাভের আশায় কি সে সত্যই ব্যাকুল ছিল? হয়তো এ সম্ভাবনা তার কাছে ভয়াবহ হয়েই দেখা দিয়েছিল।

রূপ-এর আত্মোৎসর্গের বিভিন্ন ব্যাখ্যা, অন্তত যুক্তি ও মানবতার বিচারে যে তথ্য তাৎপর্যপূর্ণ, তা হল বহু শাস্ত্রগ্রন্থ এবং সমাজের একটি বৃহৎ অংশের মিলিত সিদ্ধান্ত এই যে স্বামীর চিতায় আত্মহননই সদ্যবিধবার উচিত কাজ। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বামীর মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক। কোনও সচেতন আত্মহত্যার পিছনে যে বাড়তি যন্ত্রণা, সে দুর্ভোগ তাকে সহ্য করতে হয়নি। মৃত্যু যখন উপস্থিত হল, তখন তার সামনে কোনও বিকল্প ছিল না, কিন্তু তার বিধবা পত্নীর ক্ষেত্রে ছিল। তবু কোন অমানবিক পারিপার্শ্বিক ওই বিধবাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল?

সম্ভবত সহমরণ প্রথার শিকড় বহু দূরে প্রসারিত। *অথর্ববেদ*-এ আমরা দেখি 'আমরা মৃতের বধূ হওয়ার জন্য জীবিত নারীকে নীত হতে দেখেছি অথবা এই নারী প্রাচীন প্রাথারই অনুগমন করছে। (*অথর্ববেদ* ১৮:৩:১,৩)। এই প্রথা কত প্রাচীন? এটি কী প্রাগার্য যুগের? সম্ভবত তাই। কারণ, গ্রিক, রোমান, জার্মান অথবা কেল্টিক প্রাচীন সাহিত্যে অর্থাৎ অন্যান্য সমগোত্রীয় ইন্দো-ইউরোপীয় সাহিত্যে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে দাহ করার কোনও সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। যেখানে অথবা যখনই এর সূচনা হয়ে থাক, প্রমাণ রয়েছে যে আর্য ও প্রাগার্যদের মিশ্র জনগোষ্ঠী অন্তত আংশিক ভাবে, সাময়িক ভাবে হলেও অথবা আঞ্চলিক ভাবে এই প্রথাকে গ্রহণ করেছিল, যদিও কখনওই প্রথাটি বহুল প্রচলিত হতে পারেনি। *মহাভারত*-এ পাণ্ডুর মৃত্যুর পরও কুন্তী বেঁচে থাকেন। মাদ্রীর স্বেচ্ছায় মৃত্যু কোনও সহমরণের ঘটনা নয় বরং অপরাধবোধে আত্মোৎসর্গ। মনে হয় যে ওই সময়ে এই প্রকার সহমরণ ছিল বিকল্প প্রথা। মূল কাব্যে মাদ্রীর মৃত্যু একক ব্যতিক্রম মাত্র। উভয় মহাকাব্যেই অধিকাংশ বিধবা জীবিত থেকেছেন; স্বর্গে অনন্তকাল স্বামীসঙ্গে বাস করার প্রলোভনে কেউ তাঁদের আত্মহননে প্রলুব্ধ করেনি। যখন *হর্ষচরিত* রচিত হয়েছিল সেই সময় উত্তর ভারতীয় সমাজ এক অনুদার সংরক্ষণশীল পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। তবুও যখন যশোবতী, তার স্বামীর মৃত্যুর পর চিতারোহণে উদ্যত হলেন, কেউ তাঁকে উৎসাহিত করেননি; বরং যাদের কাছে তিনি বিদায় নিতে গেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁকে নিরস্ত করেছেন। এরও পূর্ববর্তী সাহিত্যে কালিদাসের *কুমারসম্ভব* কাব্যে দেখা যাচ্ছে স্বামীর বিয়োগে কাতর রতি আত্মহত্যায় উদ্যত বলে কবি বর্ণনা করছেন, এর খুব সম্ভাব্য কারণ, বাস্তবে তা ঘটবে না। *রঘুবংশ* একাধিক রাজার মৃত্যুর উল্লেখ আছে কিন্তু স্বামীর সহমৃতা একটিও বিধবার কথা নেই। পরবর্তী যুগের সাহিত্যে বিশেষ করে *রাজতরঙ্গিনী*র মতো প্রাচীন মধ্য যুগের সাহিত্যে, স্বামীর সহমরণে যাওয়ার ঘটনা বহুবার উল্লেখিত হয়েছে, সমাজের প্রশংসাও পেয়েছে।

মহাভারত-এ দক্ষযজ্ঞের একাধিক বিবরণ রয়েছে কিন্তু শিব-নিন্দার কারণে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের উল্লেখ নেই। অতঃপর শিব ক্রোধে যজ্ঞ পণ্ড করেন। পরবর্তী পুরাণগুলিতে, *বায়ু পুরাণ* (৩০:৪০-৪৫) *স্কন্দ পুরাণ* ও *বামন পুরাণ*-এ কাহিনিটির উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই পরিচিত কাহিনির একটি বিশদ সংস্করণ পাওয়া যায় অর্বাচীন, গৌণ *শিব পুরাণ*-এ (১৭:২৫-২৯)। এখানে পতিব্রতা স্ত্রী সতী, তাঁর স্বামীর নিন্দা সহ্য করতে না পেরে স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছেন। কিন্তু অগ্নিদগ্ধ হয়ে নয়। এই কাহিনিতে সতী বিশেষণটি (প্রকৃতপক্ষে তাঁর নাম) একটি নূতন মাত্রা পেয়েছে: যখন স্বামীর অপমান হয় তখন স্ত্রীর জীবন সম্পূর্ণ অর্থহীন, তাই তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বেছে নিয়েছেন। দক্ষের কন্যা পুনর্জন্ম নিলেন হিমালয় দুহিতা পার্বতী রূপে এবং আবার শিবকেই বিবাহ করলেন। সতী-র ভাবমূর্তিতে এবার নূতন একটি সংজ্ঞা যুক্ত হল: স্বামীর সম্মান রক্ষার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করলেন। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে সমস্ত সাহিত্যের কোথাও স্ত্রীর সম্মান বা মর্যাদা রক্ষার জন্য স্বামীর পক্ষে কোনও প্রকার দুশ্চিন্তার অবকাশ রাখা হয়নি। কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়, কখনওই

মানুষ হিসাবে সামাজিক সম্মান মেয়েদের প্রাপ্য ছিল না। তাই ধৃতরাষ্ট্রের সভায় কুরু বৃদ্ধদের মতো প্রত্যেকেই বিনা প্রতিবাদে নারীর নিগ্রহ এবং অপমান প্রত্যক্ষ করেছে।

সতীদাহের সূত্রপাতে দেখা যায় ধর্মশাস্ত্রে ও পুরাণগুলির চিন্তাধারায় যেখানে একে পবিত্র, কর্মের আখ্যা দেওয়া হয়েছে। *ব্যাসস্মৃতি*-র নিদান অনুসারে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ-নারীর— অন্য কোনও বর্ণের নয়— অধিকার আছে নিজের স্বামীর চিতায় দগ্ধ হওয়ার। 'এবং যদি সে জীবিত থাকে, তবে উত্তম বস্ত্র ও গহনা পরিত্যাগ করবে, এবং তপস্যার দ্বারা শরীরকে শুদ্ধ করবে।' (২:৫৩) এখানে একটি বিকল্প রয়েছে: বিধবা নারী তপস্বিনী হয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন; পরাশরের *ধর্মসূত্র*-তেও বিকল্প ব্যবস্থার স্বীকৃতি রয়েছে: যে নারী স্বামীর মৃত্যুর পর তপস্যাচরণ করে থাকেন তিনি তপস্বীদের মতোই স্বর্গলাভ করেন। (৪:২৭) কিন্তু তার একটু পরেই বলা হয়েছে মানুষের শরীরে সাড়ে তিন কোটি লোম থেকে, যে নারী মৃত্যুতেও তার স্বামীকে অনুগমন করে, সে স্বামীর সঙ্গে ৩৩ বৎসরই স্বর্গবাস করে।' (৪:২৮) এখানে অন্তর্নিহিত বক্তব্য এই যে জীবিত থাকার বিকল্প নিকৃষ্ট নারীর জন্যই প্রযোজ্য; সতী নারী সহমরণের পথ বেছে নেন এবং স্বর্গে চিরকাল স্বামীসঙ্গ লাভ করেন। সদ্যবিধবাকে তার দুর্বল, বিহ্বলতর মুহূর্তে এই কথা বলা হত। *দক্ষসংহিতা*-তে বলা হচ্ছে, যে সতী নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রবেশ করে সে স্বর্গে পূজা পায়। যেমন করে সাপুড়ে সাপকে তার গর্ত থেকে টেনে বার করে তেমন ভাবে সতী তার স্বামীকে নরক থেকে আকর্ষণ করে এবং তার সঙ্গে সুখে থাকে। *হারীত সংহিতা*-য় বলা হয়েছে 'যে নারী স্বামীর চিতায় আত্মোৎসর্গ করে সে তার, পিতৃকুল, স্বামীকুল উভয়কেই পবিত্র করে।' (৫:১৬০) যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্য সহমরণকে অনুমোদন করেন না; সেখানে বলা হয়েছে স্বামীহারা পত্নীর দায়িত্ব নেবেন তাঁর পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, এমনকী ভাইরাও মাতুল। অন্যথায় তার নামে নিন্দা হবে। (১:৮৬) *বৃদ্ধ হারীত সংহিতা* বলে কোনও বিধবা রমণী দিনে দুই বার মাত্র আহার করবে এবং সুগন্ধি ফুল, অলংকার, রঙিন পোশাক ও কাজল পরিত্যাগ করবেন।' (১১:২০৫-২১০)

যাজ্ঞবল্ক্যের মতোই *বিষ্ণুধর্মসূত্র*-এর লেখকও বলেন বিধবা নারী আজীবন কঠোর সংযম অভ্যাস করবেন। (২৫:১৪) যদিও তিনি তার স্বামীর চিতায় মৃত্যুও সমর্থন করেন। মাদ্রী পাণ্ডুর চিতাতেই অনুমৃতা হয়েছিলেন, কিন্তু এ ঘটনা সহমরণের উদাহরণ নয়। পাণ্ডুর প্রতি অভিশাপের শর্ত অবমাননার জন্য প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টামাত্র। *মহাভারত*-এর অর্বাচীন সংযোজিত অংশ মৌষল পর্বে কৃষ্ণের চার স্ত্রী রুক্মিণী, রোহিণী, ভদ্রা এবং মদিরা তাঁর চিতায় সহমৃতা হয়েছিলেন। এমনকী বসুদেবের আট পত্নীও তাঁর মৃত্যুর পরে সহমরণে গিয়েছিলেন। মনে হয় বৃষ্ণি ও সাত্বতদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কোনও কোনও নারী তাদের স্বামীর মৃত্যুর পরে অথবা শীঘ্রই অগ্নিপ্রবেশ করেন, কারণ স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁদের কাছে অসহনীয় ছিল; যদিও কখনওই কোনও স্বামী বিচ্ছেদ বা মৃত্যুর দুঃখে নিজে মৃত্যুকে বরণ করেননি। ভারতীয় সাহিত্যে স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীর আত্মোৎসর্গের কথা কোথাও পাওয়া যায় না।

যাজ্ঞবল্ক্য স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর সহমরণের বিধান না দিলেও তাঁর ভাষ্যকারেরা নিজেদের মতের সমর্থনে যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর একটি বিধিকে উদ্ধৃত করে *মিতাক্ষরা* টীকা বলে কোনও অন্তঃস্বত্ত্বা বা সদ্যোজাত শিশুর জননী ভিন্ন অব্রাহ্মণ চণ্ডাল সব নারীর জন্যই সহমরণ বাধ্যতামূলক। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের নিজের শাস্ত্রে বলা হয়েছে বিধবা তার পিতামাতা অথবা স্বামীর পিতামাতার পরিবারে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সুতরাং সে জীবিতই থাকবে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মানবিকতাবোধ তাঁর টীকাকারেরা কল্পনা করেননি বরং পরিবর্তনশীল সামাজিক বিধির স্রোত অনুযায়ী তাঁর শাস্ত্রবিধানকে পরিবর্তিত করেছেন। এমনকী স্বভাবত সংরক্ষণশীল মনুও কিন্তু বিধবার জন্য সংযত নিয়ন্ত্রিত জীবনের বিধান দিয়েছেন, স্বামীর সঙ্গে সহমরণের বিধান নয়। তিনি বলেছেন 'বিধবার ভক্ষ্য হবে শুধু ফলমূল এবং ফুল, সে শীর্ণ হবে, কোনও অসম্পর্কিত পুরুষকে এমনকী নাম ধরেও সম্বোধন করবে না। (৫:১৫৭) এখানে 'শীর্ণ' হওয়ার যে বিধান তার অন্তর্নিহিত অর্থ হল 'আয়ুক্ষয়', কিন্তু সদ্য বৈধব্যের পরই মৃত্যুর সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। ভাষ্যকার মেধাতিথি এই শ্লোকের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন 'পুরুষের পক্ষে যেমন, স্ত্রী লোকের পক্ষেও তেমন, আত্মহত্যা সমর্থন যোগ্য নয়।' যদিও অঙ্গিরস বলেন স্বামীর চিতায় মৃত্যুই নারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক, কিন্তু এ ক্ষেত্রে মৌলিক বিধিকেই (নিত্যবিধি— এক্ষেত্রে আত্মহনন উচিত নয়) অনুসরণ করতে হবে। যদি কোনও বিধবা ফললাভের তীব্র (অন্যায্য, উদগ্র) আশায় প্রলুব্ধ হয়ে আত্মহত্যা করে তবে শাস্ত্রানুসারে কাজ করা হল না। *বৌধায়ন ধর্মসূত্র* বলে যে, 'বিধবা এক বছরের জন্য মধু, মাংস, মদ্য এবং লবণযুক্ত আহার্য ত্যাগ করবেন।' (২:২:৬৬-৬৪) এখানে লক্ষণীয় এই যে অবিধবাদের জন্য মাংস ভোজন ও মদ্যপানের পরোক্ষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সাধারণত সকল শাস্ত্রকারই আত্মহত্যাকে হীন অপরাধ বলেছেন কিন্তু *মিতাক্ষরা* এবং *অপরার্ক* ভাষ্যে বলা হয়েছে 'সতী'র ক্ষেত্রে অর্থাৎ সহমরণের ক্ষেত্রে আত্মহত্যা কোনও অপরাধ নয়। অপরার্ক, আপস্তম্বকে উদ্ধৃত করে বলছেন, যে নারী মায়াবশে ভ্রান্ত হয়ে চিতা থেকে নেমে আসে সে 'প্রাজাপত্য' প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করতে পারে। এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে, সমস্ত পৃথিবীতেই আত্মহত্যা নিজের প্রতি একট হিংসাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হয়। তবুও যদি ও সব যুগেই এই সত্য পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নারীর ক্ষেত্রে কিন্তু 'সতী'র মতো আত্মহত্যার ঘটনা কোনও পাপ বা অপরাধ তো নয়ই, বরং পুণ্যকর্ম।

আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বিশ্বজনীন এবং সমর্থনযোগ্য (তুল বহু প্রচারিত উক্তি: আত্মানং সততং রক্ষেৎ— নিজেকে সর্বদা রক্ষা করবে) কিন্তু যখন কোনও নারী চিতা থেকে নেমে এসে নিজেকে রক্ষা করতে যায় তখন সে কাজ পাপ হয়ে দাঁড়ায়। অঙ্গিরসকে উদ্ধৃত করে বলা হয় 'সতী নারীর চিতায় আত্মোৎসর্গের কোনও বিকল্প নেই।' 'সতী'র প্রতিশব্দ হল 'সাধ্বী' এবং 'সতী' শব্দের মতো এরও কোনও 'পুংলিঙ্গ' শব্দ নেই। 'সৎ'-অর্থ ভাল। যদি কোনও নারী সারা জীবন পবিত্র এবং ভাল থেকে থাকে তবু মৃত স্বামীর জন্য আত্মহনে অস্বীকৃত হলেই সে হয়ে যায় মন্দ—অসতী, অসাধ্বী।

স্মৃতিশাস্ত্রের নব্য মধ্যযুগীয় পণ্ডিত রঘুনন্দন। তিনি অঙ্গিরসকে উদ্ধৃত করে বলেন 'সেই নারী যে চিতারোহণ করে, এর অর্থ থেকে বোঝায় অন্যান্য যে সব নারী সতী হতে চাইতই না তাদের জন্য বিকল্প পথ খোলা ছিল। রঘুনন্দন অনুমোদন করেন যে বিধবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা হল মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করা, কিন্তু তিনিও যারা স্বামীর মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকতেই চায় তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছেন। তাঁর মতে, যে সতী হয় সে হল শ্রেষ্ঠ কিন্তু, অন্যরাও থাকতে পারে; যারা শ্রেষ্ঠ না হলেও বাঁচতে চায়, সে জন্য তাদের পাপী মনে করা উচিত নয়। *বিষ্ণু ধর্মশাস্ত্র*-তেও এই দুটি বিকল্পকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর (নারী) সংযত তপস্বিনীর জীবনযাপন করবে অথবা স্বামীর চিতায় আরোহণ করবে। এখানে লক্ষণীয় এই যে প্রথম বিকল্পটি বেঁচে থাকাকেই সমর্থন করে।

কী এই সংযম? যৌন জীবন থেকে বিরতি— তাম্বুল, প্রভৃতি পরিত্যাগ ইত্যাদি। ইত্যাদি শব্দটির ব্যাখ্যায় টীকাকার উল্লেখ করেছেন কাঁসা, প্রভৃতি ধাতুর পাত্রে আহার এবং প্রসাধন দ্রব্যাদি বর্জনের কথা। এই প্রসাধন দ্রব্যাদি কী? রঘুনন্দন বলেন, 'এই অভ্যঞ্জন একটি চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ, এর অর্থ হল সেই পরিমাণ কেশ-তৈল যা মাথা থেকে দুই কাঁধ এবং বাহু পর্যন্ত লিপ্ত হতে পারে আর অল্প পরিমাণকে বলা হয় মাষ্টি।' অনেক অর্বাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে বিধবার জন্য দিনে একবার আহারের বিধান দিয়েছে, এবং তাকে পালঙ্কে শোবার অনুমতিও দেওয়া হয়নি— অন্যথায় তার স্বামী পরলোকে দুর্গতি ভোগ করবে। *স্কন্দপুরাণ* বলে বিধবা যদি কবরী রচনা করে তাহলে স্বামীর পক্ষে তা পাপ হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ আরও দেওয়া যায়; কিন্তু শাস্ত্রীয় এই সব বিধিনিষেধের অন্তর্নিহিত চিন্তা খুবই স্পষ্ট। এই সব হীনবুদ্ধি শাস্ত্র গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য হল ন্যূনতম মানবিক সুখ সুবিধা থেকেও বিধবাদের বঞ্চিত করা। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে বিগতদার ব্যক্তির জন্য শোকপালনের সীমা মাত্র একদিন, যার পরে সে কেবল পুনর্বিবাহ করতেই পারে না, তার জন্য পুনর্বিবাহ করার বিধানই দেওয়া হয়েছে।

হারীত 'সাধ্বী' নারীর সংজ্ঞা দিয়েছেন 'স্বামী যখন দুঃখ পায় তখন সে দুঃখ পায়; স্বামীর সুখ ভোগে সে সুখ পায়, স্বামী গৃহ ছেড়ে গেলে তাকে দেখে মনে হয় ভেঙে পড়েছে এবং সে ব্যাকুল হয় এবং স্বামীর মৃত্যুতে প্রাণ ত্যাগ করে।' এই প্রকার নারীই পতিব্রতা। এই গ্রন্থটিকে বলা হয় অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্য। *মহাভারত*-এ বলা হয়েছে যথাযথ সময়ে (অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পরে) যদি নারীরা তাদের (মৃত্যুতেও) অনুসরণ করে, এমনকী অনুরাগ, ক্রোধ ভয় অথবা ভ্রান্তির বশে, তবুও সেই সব নারীরা পবিত্র হয়ে ওঠেন (মতান্তরে এই সব প্রবৃত্তি থেকে নারীরা সহমরণের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে ওঠেন)। *ব্রহ্মপুরাণ* বলে যদি স্বামীর প্রবাসে মৃত্যু হয়ে থাকে তবে স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর পাদুকা বুকে ধরে অগ্নিপ্রবেশ করা। আমরা লক্ষ্য করি যে, সমস্ত পরবর্তী শাস্ত্রগুলিই ক্রমান্বয়ে এমন এক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছে যেখানে বিধবা নারীর বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়ে যাচ্ছে।

ঋগ্বেদ-এর একটি অর্বাচীন অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে রঘুনন্দন বলেন নারীর আত্মহত্যা করা উচিত নয়। বিভিন্ন মত আলোচনা করে তিনি বলেছেন ব্রাহ্মণ-বিধবা কেবলমাত্র স্বামীর চিতায়, পৃথক কোনও চিতায় নয়, মৃত্যুকে বেছে নিতে পারেন। এই ভাবে তিনি ব্রাহ্মণ বিধবার জীবনের সম্ভাবনাকে আংশিক ভাবে হলেও সম্ভাব্য করেছেন। *ব্যাস ধর্ম শাস্ত্র* বলে, 'যদি স্বামী এমন দূরত্বে মারা যায় যে, পথ এক দিনের, তবে যতক্ষণ না স্ত্রী সহমরণের জন্য উপস্থিত হচ্ছে ততক্ষণ দাহ করা উচিত নয় এবং যে অগ্নিকর্তা সে উভয়েরই পারলৌকিক ক্রিয়া করবে।' ভারতের মতো উষ্ণ দেশে মৃতদেহের একদিন অপেক্ষা করার ফলাফল সহজেই অনুমান করা যায়, তবে এই বিধিনিষেধ কেন? এর ফলে বিধবার জীবিত থাকার আশা ক্ষীণতর হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে এই কথাই বলে: হয় তাকে স্বামীর সঙ্গেই দাহ করা অথবা তার জীবৎকালকে করে তোল জীবিতমৃত্যু।

ব্রহ্মপুরাণ বলে, যে নারী স্বামীর বংশরক্ষার জন্য স্বামীর চিতায় আরোহণ করতে উদ্যত, তার জন্য উপস্থিত সকলে তাকে চিতারোহণে সাহায্য করবে। এই আবৃত্তি করে এই সব পবিত্র সুসজ্জিত নারীরা পতিব্রতা; তাঁরা তাঁদের স্বামীর দেহের সঙ্গে সঙ্গে চিতায় প্রবেশ করুন; এই কথা শুনে পতিব্রতা বিশ্বস্তা স্ত্রী পিতৃমেধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে স্বর্গলাভ করবেন। রঘুনন্দন তাঁর ভাষ্যে বলেছেন পিতৃমেধ অনুষ্ঠান হল চিতায় আরোহণ করা। এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, স্বর্গের এই পথ খোলা আছে শুধু বিধবার জন্য, বিপত্নীকের জন্য নয়।

বিষ্ণু ধর্মশাস্ত্র একটি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছে: এই ভাবে আত্মহননের কাজ নারীর পক্ষে পাপজনক কিনা— এ বিতর্কের সিদ্ধান্ত এই যে, যেহেতু তার স্বামীর চিতারোহণ করছে সে হেতু এই মৃত্যু আত্মহত্যা নয়। স্বামী এমনই এক পূত পবিত্র বস্তু যার ফলে তার চিতায় আত্মহত্যাও আর আত্মহত্যা থাকে না, পুণ্যকর্ম হয়ে দাঁড়ায়। সংক্ষেপে, বিধবার মৃত্যুই ভাল, সুতরাং বিভিন্ন কথায় সহমরণকে পুণ্যকর্ম বলে ঘোষণা করে তাকে উৎসাহ দেওয়া হয়। এরপরে রঘুনন্দন অনুত্তেজিত সুচিন্তিত ভাবে সতীর অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন।

ব্যাসস্মৃতি বলছে চিতায় বিধবা নারী তার স্বামীর মৃতদেহে আলিঙ্গন করবেন; অথবা তার মস্তকমুণ্ডন করতে হবে। (২:৫৫) অন্যান্য শাস্ত্রেও এই প্রকার সব নির্দেশ পাওয়া যায়। যে যুক্তিতে তাকে প্রসাধন, সুগন্ধি, ফুল, ইত্যাদি ব্যবহার থেকে বিরত করা হয় সেই একই যুক্তিতে এই মুণ্ডনকে উচিত মনে করা হয়, যাতে তার চেহারায় নারী সুলভ আকর্ষণ না থাকে, সে কোনও পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে না পারে। কিন্তু এই সমস্ত সাবধানতামূলক বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও পুরুষের প্রলোভন বাধা পেত না এবং যুগে যুগে পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিধবাই হয়েছে সহজলভ্য শিকার। আশ্চর্যের কিছু নেই যে, *স্কন্দপুরাণ* বলে, সমস্ত রকম অশুভ দ্রব্যের মধ্যে বিধবা হল অশুভতম। (৩:৭:৫০-৫১) ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহির, তাঁর *বৃহৎসংহিতা*-য় বলেন, অহো নারীর প্রেম কি সুদৃঢ়, তারা স্বামীর দেহ ক্রোড়ে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করে। (৭৪:২৩)

নারদ স্মৃতিতে সাত প্রকার নারীর কথা বলা হয়েছে: (১) যার পূর্বে একজনের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে; (২) কুমারী; (৩) যে বিধবাকে তার শ্বশুরকুল তার স্বামীর বংশে অন্য কাউকে সমর্পণ করেছে; (৪) নিঃসন্তনা বিধবা; (৫) যে বিধবা তার দেবরকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে এবং নিজের পছন্দ মতো কাউকে বিবাহ করে; (৬) যে বিধবা যাকে কিনে আনা হয়েছিল অথবা যে বিদেশি এবং নিজে ইচ্ছা মতো যে অন্য কাউকে বিবাহ করে; এবং (৭) যে বিধবাকে তার গুরুজনেরা কোনও অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির হাতে দান করেন। এর মধ্যে শেষের চার শ্রেণিকে বলা হয় বহির্মুখী বা স্বেচ্ছাচারিণী অর্থাৎ বারাঙ্গনা, যদিও শেষোক্ত জন তার গুরুজনদেরই আজ্ঞা পালন করে। শাস্ত্রগ্রন্থ এই সাতজনকে বলেছে 'পুনর্ভূ' অথবা 'অন্যপূর্বা' অর্থাৎ যে নারীর পূর্বে অন্য পুরুষ ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য *ধর্মশাস্ত্র* বলে পুনর্ভূ দুই প্রকার— কুমারী এবং অ-কুমারী; মনু (৯:১৭৬), *বিষ্ণু ধর্মসূত্র* (১৫:৮, ৯), *বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র* (১৭:১৮) 'পুনর্ভূ'র কথা বলেছে। গ্রন্থগুলিতে সতীদাহের বিকল্পের অবকাশ আছে।

বিধবার জীবিত থাকার সামাজিক অধিকার বিষয়ে এই বিতর্ক শুরু হয়েছে, *ঋগ্বেদ*-এর অর্বাচীন অংশের একটিমাত্র মন্ত্রের বিষয়ে বিভিন্ন ভাষ্য থেকে। প্রসঙ্গত *ঋগ্বেদ*-এর এই অংশটি দেশজ অধিবাসীদের সঙ্গে বহিরাগত জনগণের সংমিশ্রণ এবং উভয়ের সাংস্কৃতিক একীভবনের পরবর্তীকালে রচিত। এই মন্ত্রে কোনও সদ্যবিধবাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যে চিতায় তার স্বামীর মৃতদেহের পাশে শুয়ে রয়েছে আত্মহননের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে: ওঠো, হে নারী, যে শুয়ে আছে মৃতকে আলিঙ্গন করে, তুমি জীবিতের রাজ্যে এসো, যে পুরুষ তোমার হাত ধরে আছে তার স্ত্রীর অধিকার স্বীকার কর। (১০:১৮:৮)। কে তার হাত ধরে জীবিতের রাজ্যে নিয়ে যেতে চায়? *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র* বলে এই পুরুষ হল তার দেবর, মৃত স্বামীর শিষ্য অথবা পুরাতন ভৃত্য। (৪:২:১৮) এখানে বহু বিষয়ে আমরা প্রশ্ন করতে পারি: তবে কী ওই বিধবা সতীর ভূমিকাটি অভিনয় করছে? অতঃপর দেবর অথবা অন্য কেউ তাকে চিতা থেকে হাত ধরে তুলে আনে (সম্ভবত দেবর শব্দটির উৎপত্তি 'দ্বি—দুই বর' এই ভাবে। এমনকী এখনও ওড়িশা এবং অন্যান্য রাজ্যের কোনও কোনও স্থানে কনিষ্ঠ দেবরের সঙ্গে বিধবা ভ্রাতৃবধূর পুনর্বিবাহ প্রথা চালু আছে। তৃতীয়ত, সহমরণে বাধা দেওয়ার কারণ বলা হয়েছে বংশ রক্ষার কাজ অব্যাহত রাখা, প্রজনন। ভাবী জননীর অকাল মৃত্যুকে প্রতিহত করা হয়েছে, কারণ নারীর প্রসবিনী শক্তি এবং সন্তানলাভ করা সমাজের প্রয়োজন ছিল। কোষগ্রন্থ *শব্দকল্পদ্রুম*-তে বলা হয়েছে দিদিষু শব্দের অর্থ 'পুনর্ভূ'; সেই জন্যই তাকে পুনর্বিবাহের প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। মনে হয় স্বামীর চিতায় বিধবার আত্মাহুতি দেওয়ার প্রথা কোনও প্রাগার্য প্রথা, সম্ভবত সিন্ধু সভ্যতায় এই প্রথার প্রচলন ছিল, ইন্দো ইওরোপীয় সভ্যতায় এর কোনও সমর্থন পাওয়া যায় না। সুতরাং এই প্রথা অনুসরণে উদ্যত কোনও নারীকে (আর্য পুরুষদের অনার্য পত্নীরা নিজেদের প্রথা পালনে উদ্যোগী হতেই পারেন) অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী আর্য প্রথা মানতে বাধ্য করা হতেই পারে; সেই ঘটনাই আলোচ্য

ঋগ্বেদের মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের কিছু কিছু ঘটনা গ্রিক, লাতিন ও জার্মান সাহিত্যে দেখা যায়।

ঋগ্বেদ পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে ক্রমান্বয়ে বিধবাকে দেখানো হয়েছে অশুচি ও অশুভ রূপে, তাঁর বেঁচে থাকার অধিকার হয়ে উঠেছে বিতর্কের বিষয়। তারপর বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক পরিস্থিতির চাপে ওই ঋগ্বেদীয় মন্ত্রটির অর্থকে, সমাজপতিদের অনুকূলে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী শাস্ত্র *ঋগ্‌বিধান* বলে, কেবল মাত্র নিঃসন্তান বিধবাকেই জীবিতের রাজ্যে ফিরিয়ে আনা চলে। (৩:৮:৪) অর্থাৎ মৃতের পারলৌকিক কাজ করার জন্য একজন যথাযথ অধিকারী চাই। কোনও কোনও শাস্ত্রে দেখা যায় দেবরের সঙ্গে বিধবার বিবাহ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু *ঋগ্বেদ*-এর আর একটি মন্ত্রের অর্থ বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না। অশ্বিনদ্বয়কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে— অন্য কে তোমাদের (সূক্ত দ্বারা) স্তুতি করেছে, যেমন করে কোনও বিধবা শয্যায় তার দেবরকে সন্তুষ্ট করে। (১০:৪০:২) অতএব, *ঋগ্বেদ*-এর যুগে বিধবারা বেঁচেই থাকত এবং দেবরকে বিবাহও করত। এই প্রথা সে যুগে অবশ্যই বহুপ্রচলিত ছিল, অন্যথায় উপমা হিসাবে ব্যবহৃত হত না। *অথর্ববেদ*-এ এক নারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে একাধিক বিবাহ করেছিল। (৯:৫:২৭) এমনকী দশজন স্বামী গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। (৫:১৭:১৯) এখানে অন্তত দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিধবার পুনর্বিবাহ যে প্রচলিত ছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। *অথর্ববেদ*-এ অবশ্য দু'বার সহমরণেরও উল্লেখ আছে। এই ভাবে এই প্রথার উদ্ভব ও প্রয়োগ যে প্রাগার্যদের মধ্যে ছিল না বোঝা যায়। হয়তো এটি সিন্ধু সভ্যতার প্রথার একটি স্মৃতিচিহ্ন। *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*-এ প্রার্থনা করা হয়েছে, আমি যেন ইন্দ্রাণীর মতো অবিধবা হই। (৩:৭:৫:৫১) এখানেও স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার বেঁচে থাকার পরোক্ষ ইঙ্গিত পাচ্ছি, কারণ বৈধব্যের দুঃখ যন্ত্রণার ভোগ সতীর কাছে অজানা।

রামায়ণ ও *মহাভারত*-এর মূল অংশে কোনও সতীদাহের ঘটনা নেই; মাদ্রী অনুতাপে আত্মহনন করেন কারণ তিনি পাণ্ডুর কামনার বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। আর্য বসতিগুলির চারপাশের সমাজে এই প্রাগার্য প্রথার প্রচলন ছিল, সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই আর্যদের উপরেও এই প্রথার সক্রিয় প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু রামায়ণে দশরথের তিন পত্নী; তারা, মন্দোদরী; ইন্দ্রজিৎ অথবা কুম্ভকর্ণের পত্নীরা কেউই স্বামীর সঙ্গে চিতা আরোহণ করেননি। মহাভারতেও সত্যবতী, কুন্তী, অম্বিকা, অম্বালিকা, দুঃশলা এবং দ্রৌপদী— তাঁর চার স্বামীর মৃত্যুর পরও বেঁচেছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত সময়ে উত্তর ভারতে বিদেশি অভিযানের মিছিল চলেছিল। এর ফলে সামাজিক পরিমণ্ডলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। *ভগবদ্‌গীতা* প্রথম থেকে দ্বিতীয় শতকে রচিত। এই গ্রন্থে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের কুফল সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন— এতে বংশক্রম বিনষ্ট হয় এবং এর ফলে পরম্পরাগত ধর্ম ক্ষয় পায়। এইরূপ ঘটনা ঘটলে সমস্ত পরিবার অপবিত্র হয়, অভিজাত কুলনারীরাও দুষ্ট ব্যবহার করেন এবং বর্ণসংকর ঘটে থাকে। (১:৩৯:৪০) এই সব দুষ্টা কুলনারীদের মধ্যে

যুদ্ধ-বিধবাদের দেখা যেতে পারে কারণ অর্জুন এখানে যুদ্ধ ও তার ফলাফল বিষয়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। অন্য ভাবে বলতে গেলে, যদি স্বামীর মৃত্যুর পরও বিধবা জীবিত থাকে, সে অন্য স্বামী বরণ করতে পারে এবং তারই ফলে ঘটে যাবে সর্বাধিক ভয়াবহ বিপদ— বর্ণসংকর। তখন পরিবার এবং তার ধ্বংসকারী উভয়েরই গতি হয় নরকে, পিতৃপুরুষের সংকার সঠিক ভাবে হয় না এবং তারা নরকে পতিত হয়। (১:৪২) এ কথা সহজবোধ্য এবং এ জন্যই সতী প্রথা উজ্জীবিত হয়, অংশত এই ভাবে ব্যাপক সামাজিক অবক্ষয় রোধের জন্য।

গুপ্তযুগে মনুর নির্ধারিত নীতিই প্রচলিত ছিল। (তুলনীয় রঘুনন্দন ১:১৭) যদিও মনু বিধবার জন্য স্বামীর চিতায় মৃত্যুর বিধান দেননি, তবু তিনি কঠোর সংযমবিধি নির্দেশ দিয়েছেন। এই যুগে পুরাণগুলি রচিত হতে শুরু করেছিল এবং সেগুলির মাধ্যমে নারী ও শূদ্রের প্রতি অবদমনের এক ক্রমবর্ধমান চিত্র পাওয়া যায়। সম্প্রদায়গত পুরোহিতগণ কয়েক শতক ধরে পুরাণ রচনা করে আসছিলেন; তাঁদের ধর্ম ও দর্শনগত মতবাদ ছিল ভিন্ন, কিন্তু নারী ও শূদ্রের প্রতি নিপীড়ন করতে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে একমত ছিলেন।

বেদ-পরবর্তী যুগ থেকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত কুড়িজন শাস্ত্রকার তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছেন: বহু বিষয়ে তাঁদের মতভেদও আছে। কেউ কেউ বিধান দিয়েছেন স্বামীর সঙ্গে বা তারপরে সতীদাহ করতে, কেউ বলেছেন শুধু ব্রাহ্মণ বিধবারাই এই ভাবে মারা যেতে পারেন; অন্যরা শুধু কঠোর নিয়ম পালন করবেন। কেউ কেউ বলেন যে সব বিধবা এই ভাবে মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়েরই পূর্বপুরুষদের মুক্তি দেন। অন্যরা বলেন সাপুড়ে যেমন গর্ত থেকে সাপকে টেনে বার করে তেমন করেই একজন সহমৃতা সতী তার স্বামীকে নরক থেকে উদ্ধার করে। এই ভাবে বিষয়টি অনুমান করা হয় যে, যে স্বামী কোনও গুরুতর অপরাধ করে নরক ভোগ করছে, তাকে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় হল পত্নীর আত্মহত্যা। যে স্বামী তার নিজের পাপের জন্য নরকবাসের যোগ্য, সে উদ্ধার পেতে পারে একটি নিরপরাধিনী মেয়ের মৃত্যুতে— এই বিধানের অন্তর্নিহিত অবিচারে কোনও সংশয় নেই; ঠিক যেমন যে নারী পাপ করছে তাঁকে বাঁচাবার জন্যও কোনও দুশ্চিন্তা দেখা যায় না। সারা জীবন নীরবে স্বামীর সেবা করে যাওয়া আর তার মৃত্যুতে আত্মহত্যা করা, নারীর জন্য এই বিধান দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও শাস্ত্র আর একটু অগ্রসর হয়েছে: সে স্বর্গে তার স্বামীর সঙ্গে বাস করবে ত্রিশ কোটি বছর কিংবা তার শরীরে যত লোম আছে তত বছর, যখন স্ত্রীর মৃত্যু হয় স্বামীর আগে, তখন কিন্তু স্বামীর জন্য এমন কোনও নিষ্ঠুর বিধান নেই যাতে সে চিরদিন তার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করবে। প্রচলিত প্রবাদ হল ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার গরু। শাস্ত্র বিধান দেয় স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীর শোক পালন এবং অশৌচ মাত্র এক দিনের। তারপরে তার পুনরায় বিবাহ করাই উচিত।

কানে-র আট খণ্ডে রচিত ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক ইতিহাসে 'সতী' বিষয়ক কয়েকটি অধ্যায় আছে। তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতকের বাংলায় (যা তখন বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) সতীর সংখ্যা সর্বনিম্ন ৩৭৮ (১৮১৫ খ্রি.) সর্বোচ্চ ৮৩৯ (১৮১৮

খ্রি.)। এবং, ১৮১৫ থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কেবলমাত্র বাংলাতেই সংখ্যাটি ২৩৬৬, যার মধ্যে শুধু কলকাতাতেই সতীদাহের সংখ্যা ১৮৪৫। কানে-র মতে এর মুখ্য কারণ হল শুধু বাংলাতেই *দায়ভাগ স্মৃতির* অনুসরণ করা হয়, (বাকি ভারতবর্ষ *মিতাক্ষরাকে* অনুসরণ করে), এবং এই স্মৃতি অনুযায়ী বিধবাই স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী। জনৈক জিতেন্দ্রিয় পরবর্তীকালে সংযোজন করছেন, 'নিঃসন্তানা বিধবা তার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির নিঃশর্ত অধিকার পাবেন।' কানে যথার্থই অনুমান করেছেন যে, পাছে বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তির অধিকার চেয়ে বসে সেই ভয়ে তাকে সক্রিয় প্রেরণা দিয়ে এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে ভয় দেখিয়ে স্বামীর চিতায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করা হয়। ব্যবসায়ী আর উদ্যোগপতিরা যেহেতু বেশির ভাগই ছিলেন কলকাতাবাসী, তাই এখানে সতীর সংখ্যা এত নির্মম ভাবে বেশি— যাতে আইনানুযায়ী বিধবারা বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে বসতে না পারে।

সমস্যা দুটি: পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বিধবাদের স্বামীর চিতায় উঠতে প্রেরণা দেওয়া হত, জোর করে নিয়ে যাওয়া হত। তা যদি না হত তাহলে স্বামীর মৃত্যুতে যে বিধবা যথেষ্ট সম্পত্তি পেয়ে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন হচ্ছে সে কেন সহমরণে যাবে? সুতরাং নিকটবর্তী আত্মীয় এবং অর্থলোভী অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা মেয়েটিকে সতী হওয়ার জন্য ভয় দেখায়, মিষ্টি কথায় ভোলায়। কিন্তু সেই সব বিধবারা যাঁরা এই সব প্রেরণাকে জয় করেও বেঁচে ছিলেন ও স্বামীর সম্পত্তির অধিকার নিয়েছিলেন— পরিসংখ্যান বলে সতীদের চেয়েও তাঁদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু এই সব জীবিত বিধবাদের পরিণতি কি হয়েছিল? ব্রহ্মচর্য— সংযমের জীবন। অন্যান্য কিছু তপস্বী সম্প্রদায় যাঁরা ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করতেন তাঁদের মাথা মুড়িয়ে, দিনে একবার মাত্র আহার করে বেঁচে থাকতে হত। ব্রহ্মচারী ছাত্রের সংযম-চর্যা শেষ হত তার স্নাতক হওয়ার পর। তারপর সে দিনে দু'বার আমিষ আহার করতে পারত, সুগন্ধ, প্রসাধন, অলংকার ব্যবহার করতে পারত। কোনও ব্রহ্মচারীকে কখনও অশুভ, অমঙ্গলকারী বলা হয় না। সুতরাং বিধবার ব্রহ্মচর্যা এক অদ্ভুত প্রকারের, যার লক্ষ্য হল বিধবাকে বঞ্চিত ও নিপীড়িত করে তার মৃত স্বামীর আত্মার উপকার করা।

দায়ভাগ-এর প্রাধান্য সত্ত্বেও, তার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তিতে তত্ত্বগত ভাবে অধিকার থাকা সত্ত্বেও, অশিক্ষিত বঞ্চিত সন্তানহীন বিধবার পক্ষে তার মৃত স্বামীর শক্তিমান পুরুষ আত্মজনের নিরাবরণ অর্থলোভের বিরুদ্ধে কী করা সম্ভব? এ সত্ত্বেও যদি সে পিতৃপরিবারের সাহায্যে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, কেবলমাত্র সেই সম্ভাবনার ভয়েই সম্ভাব্য অধিকারিণীদের পুড়িয়ে মারা হত। বহু নারীর কাছে স্বামীর সম্পত্তির তত্ত্বগত অধিকার যে কেবল মরীচিকা ছিল, সে সত্য প্রমাণিত হয় সামান্য সাহায্যের ভরসায় বেঁচে থাকা কাশীবাসিনী বাঙালি বিধবার বিপুল সংখ্যা থেকে। বৃহত্তর সংখ্যায় বিধবারা তাদের আত্মীয়দের নিপুণ হলচাতুরীর ফলে আইনসঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এরা বেঁচেছিল— বেঁচে থাকে— আত্মীয়দের বাড়িতে গলগ্রহ, বিনা বেতনের ঝি-এর মতন।

দ্বিতীয় সমস্যা হল, *মিতাক্ষরা* অনুসারী রাজ্যগুলিতে, যেখানে সন্তানহীনা বিধবা কেবল

আশ্রয় আর খাদ্যের অধিকারী, এবং স্বামীর সম্পত্তিতে তার কোনও অধিকারের আশা নেই, সেখানে কী কোনও সতী ছিল না? *মিতাক্ষরা*-র শাসন মেনে চলা এমনই একটি অঞ্চল হল রাজস্থান। তবে কেন সেখানে জহরব্রতের (স্বামীর মৃত্যুতে নারীর স্বেচ্ছামৃত্যু) এত ব্যাপক প্রচলন? এ তো আক্ষরিক অর্থে গণ-আত্মহত্যা। এই সমাজ অনুমোদিত গণহত্যার ব্যাখ্যা কী? এখানেই একটি বাস্তব সমস্যা দেখা যায়।

হিন্দু সমাজ কোনও দিনই নারীর স্বতন্ত্র স্বাধীন পরিচয়কে মেনে নেয়নি বরং বারবার ঘোষণা করেছে যে, নারী স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য নয়। তার উচিত স্বামীর পদাঙ্ক ছায়ার মতো অনুসরণ করা। যে সব অধিকার মানুষকে স্বাধীনতা দিতে পারে— শিক্ষা, সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার, স্বাধীন বৃত্তি, সম্পত্তির অধিকার, নিজের দেহের ওপর অধিকার, সন্তান ধারণের সিদ্ধান্ত বজায় রাখার অধিকার, সমাজ শাসনে অথবা রাষ্ট্র শাসনে অংশ নেওয়া বা নিজের মত প্রকাশের অধিকার, নারী কখনওই এগুলি ভোগ করেনি। অবশ্যই কোথাও কোথাও কোনওখানে এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে কিন্তু এগুলি শুদুই ব্যতিক্রম, নিয়মকেই কেবল প্রতিষ্ঠা করেছে। সমাজ কোনও কুমারী বা বিধবার সামাজিক সত্তাকে স্বীকৃতি দেয়নি; এখানে তার একটাই পরিচয়— সে কারও পত্নী। স্ত্রী রূপে তার আদর্শ কী? সতী হওয়া, পতিব্রতা হওয়া। স্বামীর প্রতি নিবেদিত প্রাণ হওয়া শব্দটির একটি তির্যক অর্থ আছে— স্বৈব স্বামী। আমাদের মনে রাখতে হবে এই অর্থে 'সতী'র কোনও পুংলিঙ্গ শব্দ নেই, যেটা হতে পারত 'পত্নীব্রত', কিন্তু হয়নি। আবার পতিব্রতা শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এটা উচ্চ আদর্শ।

মহাভারত-এ বনপর্বে (এই অংশটি মহাকাব্যে ভার্গব প্রক্ষেপণের শেষতম অংশ এবং চরিত্রগত ভাবে প্রাক্ পৌরাণিক) সত্যভামা দ্রৌপদীকে প্রশ্ন করেছেন, তুমি কেমন করে তোমার পাঁচ স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখ? উত্তরে দ্রৌপদী পতিব্রতার আদর্শ সম্পর্কে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছেন, যেটি সম্ভবত ভারতীয় সাহিত্যে পতিব্রতার সর্বপ্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য সংজ্ঞা। (৩:২২২-২২৩) এর শুরুতেই দেখা যাচ্ছে— 'অহংকার, কামনা, ক্রোধ ত্যাগ করে আমি সস্ত্রীক পাণ্ডবদের সেবা করি।' (২২৮-১৮১) প্রত্যেক পাণ্ডবেরই দ্রৌপদী ছাড়া অন্য পত্নী ছিল। পতিব্রতা নারী প্রথম যে বস্তু ত্যাগ করবেন তা হল অহংকার, ব্যক্তির আত্মমর্যাদা। এরপর দ্রৌপদী, স্বামীর কাছ থেকে নারীর প্রাপ্য বিষয়ে একটি তালিকা দিয়েছেন— সন্তান, সুখভোগের নানা বস্তু, শয্যা, সুখাসন, পোশাক, মালা, সুগন্ধি, স্বর্ণ এবং নানা দুর্লভ দ্রব্য। (২২৩:৩) এর আগে তিনি বলেছেন স্বামী সন্তুষ্ট হলে তিনি এগুলি দিয়ে থাকেন, অন্যথায় নয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই তালিকায় ভালবাসা বা শ্রদ্ধার কোনও স্থান নেই। আর এ কথাও সুস্পষ্ট যে, এই সব উপহারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্ক কিন্তু জৈবিক স্বাচ্ছন্দ্য বা বস্তুগত সুখকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। দ্রৌপদীর আলোচনা থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, পতিব্রতার আদর্শ হল স্বামী ও তার সংসারের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন অক্লান্ত সেবা আর সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ। শেষেরটিই পতিব্রত্যের ধারণার কেন্দ্রবিন্দু।.পতিব্রতা তার নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ লোপ করে স্বামীর স্বার্থসাধন করে যাবে। তবেই তার বিশেষণ হবে 'পতিব্রতা'।

মানবিক মর্যাদার পক্ষে যা কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ তার সব কিছু থেকেই আমাদের সমাজ নারীকে বঞ্চিত করেছে; সুদূর বৈদিক যুগেই সে তার শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, চিরকাল স্বাধীন জীবিকার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত, জীবনের জন্য তার পাথেয় হল দৈহিক সৌন্দর্য, যৌবন, কর্মক্ষমতা, সন্তানধারণের যোগ্যতা; তার মনকে কখনও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, তাই সে নিজেকে কখনও স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। স্বাধীন অস্তিত্বের আস্থা ও যোগ্যতা ছাড়া তার অস্তিত্ব কেবল প্রাণীরূপে, শূদ্রের মতোই সে-ও কেবল প্রভুর সম্পত্তি। এই পরিস্থিতিতে, শাস্ত্র নারীর জন্য একটিই ভূমিকার নির্দেশ দিয়েছে— পতিব্রতার ভূমিকা। কেবল এই কাজটিতে সফল হলেই একজন নারী জনগণের মনোযোগ পেতে পারে। সার্থকতার উপায় হল স্বামী ও শ্বশুরকুলের সেবায় তাদের প্রসন্নতার জন্য নিঃশব্দ আত্মসমর্পণ।

যদি সে পাদ-প্রদীপের আলোয় আরও বেশি করে আসতে চায় তবে সেই ভাবে গুরুত্ব পাওয়ার উপায় হল সতী হওয়া, যা পতিব্রতার জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়। সমস্ত পুরাণগুলি এবং পরবর্তী সাহিত্যের অধিকাংশই সতীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভারতীয় নারীর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের মধ্যে এই ধারণা কাজ করে যে, একজন সতী তার স্বামীর সঙ্গে চিরকাল স্বর্গে বাস করে। একজন সুখী বিবাহিতা রমণীর কাছে এ এক লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু অন্য দিকে যে নারী তার স্বামীর দ্বারা নিপীড়িতা, অবহেলিতা— তার কাছে এই চিন্তা বিতৃষ্ণাই সৃষ্টি করে। এর পরেও যদি 'সতী'র প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা তার কাছে কোনও ভাবে অর্থবহ হয় তবে তার কারণ হল সতীদাহের পটচিত্রের মতো প্রেক্ষাপট, এর চোখ ধাঁধানো নাটকীয় অন্তিম দৃশ্য, যেখানে শাঁখ বাজে, ঢাক ঢোল বাজে, জনতা জয়ধ্বনি করে আর সামাজিক উত্তেজনা ও ধর্মের বাতাবরণ তৈরি হয়। এই দৃশ্যপটের মধ্যে নায়িকা, সদ্যবিধবা নারী নববধূর মতো সাজে; তার শ্রেষ্ঠ পোশাক পরে, সিঁদুর কাজল ফুলমালা চন্দন আলতায় সুসজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে সে চিতায় ওঠে; তার স্বামীর পা দুটি বুকে আঁকড়ে ধরে কিংবা মৃতদেহকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করে; এই ভাবে যতক্ষণ না আগুন জ্বলে সে বিভ্রান্তির সঙ্গে অপেক্ষা করে। শেষ মুহূর্তে সে যাতে বিচলিত না হয়, এবং নীতিগত, দৃশ্যগত ভাবে ছন্দপতন না ঘটে, সে জন্য শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাকে উত্তেজক পানীয় পান করায়। এমনকী পরে যখন আগুনের লেলিহান শিখা অসহনীয় হয়ে ওঠে; পানীয়ের নেশা কেটে যায়; তখন যদি সেই বিধবা বিচলিত হয়ে পড়ে; 'সতী'র মহিমা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয় দেখা দেয়; যদি সে চিতা থেকে নেমে আসতে চায়— তখন সেই শুভাকাঙ্ক্ষীরাই তাকে বাঁশের লাঠি দিয়ে চেপে ধরে; প্রতিবেশী, পুরোহিত, সমাজকর্তা সকলেই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য অতিমাত্রায় সাহায্য করতে চায়। তারা গান করে, ঢাক বাজায়, এত উচ্চ জয়ধ্বনি দেয় যে, সতী যা কিছু বলতে চায় সবই উচ্চনাদে ঢেকে যায়।

যেখানে বিধবা স্বেচ্ছায় সতী হতে চেয়েছেন সেই রকম কয়েকটি মাত্র ব্যতিক্রমী উদাহরণ ছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করে এবং দীর্ঘকালীন সামাজিক

শিক্ষাকে বিনষ্ট করে তার সেই প্রবৃত্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু একবার যখন ধার্মিক প্রতিবেশী আর সমাজের নৈতিক রক্ষাকর্তারা সিদ্ধান্ত নেন যে। মেয়েটিকে সতী হতেই হবে এবং যদি কোনও দুর্বল মুহূর্তে সে সম্মতি দিয়ে থাকে— বা না দিয়ে থাকে— তবু সে ভাগ্যের হাত থেকে অব্যাহতি পায় না। আমাদের মনে পড়ে সেই অধ্যক্ষের কথা, যিনি জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন, কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর তাঁদের জয়ে সাহায্য করবেন তাই অধস্তনদের উপদেশ দিতেন 'ঈশ্বরে সর্বতো ভাবে বিশ্বাস রাখ কিন্তু বারুদ শুকনো রাখতে ভুল কোর না।' ঠিক তেমনই, সম্ভাব্য সতীর উদ্দেশের দৃঢ়তা আর ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি পুরোপুরি ভরসা না রেখে লোকেরা প্রয়োজনীয় নৈতিক ও দৈহিক সাহায্য নিয়েই উপস্থিত থাকে, যাতে জীবিত বিধবাদের বিশ্বাস সতীদাহের উপর থেকে টলে না যায়। এও সত্য হতে পারে যে, সমাজে বিধবাদের দুর্বিষহ সামাজিক ও দৈহিক দুর্দশা কোনও কোনও নারীকে প্রেরণা দিয়েছিল সব দুর্গতির একবারেই শেষ করতে। তাই শুভানুধ্যায়ীদের অনুপ্রেরণা, ঘটনার তাৎক্ষণিক গরিমার মোহ আর পরলোকের দুর্দশার ভয় কিংবা স্বর্গের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি এই সব কিছু মিলেই মেয়েটিকে এই সিদ্ধান্ত নিতে উদ্যোগ জোগায়। আর তারপর সমাজ তাকে সেই সিদ্ধান্তে অবিচলিত থাকতে সাহায্য করে। পৌরাণিক কাহিনিতে পতিব্রতার কর্তব্যের মহিমাকীর্তন করা হয়েছে: এক পতিব্রতা সতী তার লম্পট কুষ্ঠরোগী স্বামীকে প্রতি সন্ধ্যায় পিঠে বয়ে গণিকাগৃহে নিয়ে যায় আর সকালে ফিরিয়ে আনে— সমাজের এই মূল্যবোধই বিধবা হত্যার প্রেরণা জোগায় আর তারপর তাকে 'সতী'র সম্মান দেয়। এমনকী পুরুষ পুরোহিতদের নির্ধারিত নিয়মে বাঁধা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজেও কিন্তু সতীপ্রথা টিকে থাকত না, যদি নারী নিজেই পরলোকের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর না হত, যদি তার আত্মীয়স্বজনদের প্রলোভনে মন্ত্রণায় বিচলিত না হত।

নারী নির্যাতনের অন্যান্য উপাদানের মতোই এই সতীদাহের মূলও তারই অবচেতনের গভীরে প্রোথিত এবং কুসংস্কারে লালিত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন এই নারীর জন্য সমাজ পালানোর কোনও রাস্তা খুলে রাখেনি। মাঝে মাঝে যদি দু-একজন নারী সহমরণে না যান তবে তো 'সতী'ত্বের গৌরবময় স্মৃতি জনচেতনায় মলিন হয়ে যাবে। এবং যদি মাঝে মাঝে সতীর স্মৃতিতে মন্দির, প্রার্থনাকক্ষ গড়া হয় তবে তো পুরোহিতদেরই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়। আর যুগ যুগ ধরে যে অতিকথা সরবে ঘোষিত হয়ে আসছে যে, কেবলমাত্র কোনও হিন্দু নারীই তার স্বামীর জন্য জীবন দিতে পারে (অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতিতে অনুরূপ উদাহরণগুলি অগ্রাহ্য করে এবং এই সব নারীদের 'সতী' আখ্যাও দেওয়া হয় না) সেই দাবি ও যুগে যুগে প্রমাণিত করা যায়। সুতরাং মাঝেমাঝে কোনও অভাগিনীকে পুড়িয়ে মেরে যদি সতীত্বের গৌরব শিখা অম্লান থাকে তবে সমাজের, বিশেষ করে পুরোহিত ও নীতিবাগীশদের স্বার্থ রক্ষিত হয়। *বৃহৎসংহিতা*-র যুগ থেকেই সমাজ এই অতিকথা ঘোষণা করে আসছে যে, নারী তার স্বামীর প্রতি ভালবাসার জন্যই সহমরণে যায়। এই মিথ্যার অবসান হওয়া উচিত। যদি স্বামীর প্রতি প্রেমে এক নারী আত্মহত্যা করে তবে কেন আজ পর্যন্ত কোনও স্বামী তার স্ত্রীর চিতায়

আত্মহত্যা করেনি? এ তো হতে পারে না যে, আজ পর্যন্ত কোনও স্বামী তার স্ত্রীকে ভালবাসেনি। যদি সতীদাহের ভিত্তি হত প্রেম, তবে আমরা অবশ্যই কিছু কিছু ঘটনা দেখতে পেতাম যেখানে মৃত স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীও সহমরণে গেছেন। কিন্তু তা হয়নি, এ বিষয়ে কোনও শাস্ত্রীয় বিধিও নেই। সুতরাং মূল ব্যাপার হল, স্বামীর স্বার্থে স্ত্রীর সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন: আর সতীদাহ এই আজীবন নাটকেরই পঞ্চমাংশের শেষ দৃশ্য। আজ একুশ শতকের দরজায় দাঁড়িয়ে আমরা এই সতীদাহের সগর্ব প্রশংসা শুনছি। আর সমাজ এই ভাবে কৌশলে নারীহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে, কারণ, ভারতবর্ষে পুরুষহত্যা অপরাধ, কিন্তু নারীহত্যা তা নয়। পরিবর্তে ধর্মের নামে পবিত্রতার নামে নারীহত্যা করতে পারা সমাজের কাছে সর্বদাই গৌরবের বস্তু। হিন্দু সমাজ ভয় দেখাচ্ছে যে, এই পবিত্র হত্যাকার্যের অধিকারে তারা কোনও হস্তক্ষেপ সহ্য করবে না। আত্মহত্যা যে অপরাধ, সেখানে লিঙ্গভেদ থাকা উচিত নয়, সে কথা সরিয়ে রেখে সেই আত্মহত্যাকে করে তোলা হয়েছে পুণ্যকর্ম— পুণ্য অগ্নিকে উজ্জীবিত রাখার জন্য সেই আত্মহত্যার স্থলে মন্দির তোলা হচ্ছে। যতদিন শিক্ষা, প্রগতি, যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এই জঘন্য ধর্মীয় অন্যায় নরনারীর চেতনা থেকে উৎপাটিত না হয়, সমাজ সচেতন ভাবে এই সব ঘটনাকে প্রতিরোধ না করে, এই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি না দেয়, ততদিন শুধু রূপ কানোয়ারের সঙ্গে সঙ্গেই সতী প্রথার শেষ হবে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে শান্তি-র সংজ্ঞা

'শান্তি' কাকে বলে? নঞর্থক ব্যাখ্যার সাহায্যে এ প্রশ্নের সমাধান সূত্র পেতে পারি। 'শান্তি'র অভাবে দেখা যায় অনৈক্য, অস্থিরতা এবং দ্বন্দ্ব; সুতরাং শান্তি নির্ভর করে সঙ্গতিবোধ, নিরুপদ্রবতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণতার উপর। এর বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখা যায়: ব্যক্তিগত, পারিবারিক, কৌমগত, সমাজগত এবং রাজনৈতিক। বর্তমান সময়ে বিশ্বযুদ্ধের পথে পৃথিবী এক সামগ্রিক অবলুপ্তির সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়েছে; তাই, আজ মানবজাতির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থায় অত্যন্ত প্রাধান্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে শান্তি। একবার পুনর্বিচার করে দেখা যেতে পারে প্রাচীন ভারতে 'শান্তি'র সংজ্ঞা কী ভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে প্রাচীনতম গ্রন্থ *ঋগ্‌বেদ*-এ পারিবারিক শান্তির জন্য কয়েকটি প্রার্থনা দেখা যায়। ৩:৬ সূক্তে দেখা যায় অসঙ্গতিপূর্ণ যে সব সম্পর্ক সেখানে বিবাদ ভঞ্জনের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। শেষতম সূক্ত (১০:১৯১)-তে বলা হয়েছে:

> সমবেত হও সকলে সমসুরে, কথা বল; তোমাদের মন ঐক্যবদ্ধ হোক; যেমন করে পূর্বকালে দেবতারা সুষম ভাবে তাঁদের অর্ঘ্যের ধর্মীয় অংশগ্রহণ করতেন। তোমাদের মতামত এক হোক; তোমাদের সভা এক হোক তোমাদের সংকল্প, হৃদয় এক হোক; যেন তোমরা একত্রে দীর্ঘকাল বাস কর— ঐক্যে ও সংহতিতে।।[১]

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রচিত বৈদিক সংহিতা *অথর্ববেদ*-এ কয়েকটি 'সমভাববিষয়ক' সূক্তের দেখা পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে যেটি বিখ্যাত (৩:৩০), সেখানে বলা হয়েছে:

> আমি তোমাদের ঐক্যবদ্ধ হৃদয়ে ও মনে বিদ্বেষ রহিত করি; একে অপরকে ভালবাস, যেমন গাভী ভালবাসে তার বৎসকে, যাকে সে জন্ম দিয়েছে; পুত্র পিতার অনুগামী হোক, মাতার সমমনস্ক হোক... পত্নী স্বামীর প্রতি নম্র এবং মধুর ভাষিণী হোক ভ্রাতা যেন কখনও ভ্রাতার প্রতি দ্বেষ না করে; অথবা ভগ্নী ভগ্নীকে আঘাত না করে; হৃদয়ে এবং কার্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একত্রে প্রীতিপূর্ণ ভাবে সমান আচরণ কর...নম্র ভাবে সর্ব কার্যে, পরিকল্পনায় ঐক্যবদ্ধ হও... মধুর বাক্যে এক চিত্তে, সংঘবদ্ধ ভাবে সমমনস্কতায়।[২]

একই ভাব প্রতিফলিত হয়েছে অন্য সূক্তগুলিতেও।(১-৩, ৬, ৭৪:২; ৬:৯৪:১-৩)।[৩] মানুষ সমগ্র প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা করেছে শান্তিপূর্ণ ভাবে মানুষের প্রতি সদয় আচরণ করার জন্য। বন্ধুর সঙ্গে ঐক্য রেখে বাস করা কঠিন নয়; কিন্তু প্রাচীন ভারত উপলব্ধি করেছিল অপরিচিতদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া কত কঠিন। কিন্তু এ কথাও সে বুঝেছিল, যতই কঠিন হোক এই কাজ সাধন করতেই হবে। তাই এই প্রার্থনা:

হে আমার অন্তরাত্মা, ভয় কোর না, যেহেতু আকাশ ও পৃথিবী ভীত হয় না; যেমন দিন এবং রাত্রি...সূর্য এবং চন্দ্র...ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়...সত্য আর অসত্য...অতীত আর বর্তমান ভীত হয় না।'[৪]

শান্তির জন্য যে প্রার্থনা করে তার পক্ষে কঠিনতম কাজ হল 'যারা আমাদের আপন তাদের সঙ্গে যেন এক হতে পারি এবং যারা আমাদের থেকে ভিন্ন তাদের সঙ্গেও যেন এক হতে পারি।'[৫]

একটি সূক্তে প্রার্থনা করা হয়েছে:

প্রশান্ত দ্যৌ, প্রশান্ত পৃথিবী, প্রশান্ত অন্তরীক্ষ ও ভূমি,
জলাধারের জলভার প্রশান্ত, আমাদের জল প্রশান্ত,
আমাদের ওষধি প্রশান্ত হোক...যা কিছু ঘোর,
যা কিছু ক্রুর, যা পাপ সব কিছু হোক
প্রশমিত, শুভ; সব কিছু প্রশান্ত হোক।'[৬] (*অথর্বসংহিতা* ১৯.৯)

প্রাচীন মানুষ অন্তরীক্ষবাসী এক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করেছিল এবং বারংবার সেই শক্তির কাছে প্রার্থনা করেছিল সহৃদয় বদান্যতা।[৭] বিবাহে, দম্পতির মধ্যেও পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ, সুসমঞ্জস্য ঐক্যের প্রার্থনা করা হয়েছে।[৮]

যখন কোনও বিদ্যার্থী তার গুরুর কাছে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা প্রাপ্ত হয় তখন গুরু শিষ্য উভয়েই শিক্ষাকালীন দীর্ঘ সময়ের জন্য পারস্পরিক সম্পর্কের সামঞ্জস্যের জন্য প্রার্থনা করেন। এই সময়টুকুতে এবং তাদের জীবৎকালের জন্যও শিক্ষক ছাত্রের পিতৃতুল্য। এই ভাবে প্রার্থনার মধ্যে তাদের সামাজিক সম্পর্কের সমগ্র সময়টুকুই সূচিত হয়। গোষ্ঠীগত জীবনে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, ঘৃণা ও প্রতিযোগিতা সহজেই দেখা যেত। এমনকী যখন যাযাবর আর্যরা দেশীয় জনগোষ্ঠীকে পরাজিত করে কৃষিজীবীর জীবনধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ল তখন আন্তঃগোষ্ঠী দ্বন্দ্বের অসংযত উচ্ছ্বাস বহু দেখা যেত। তবু তারা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে, সমৃদ্ধির মূল শর্ত হল শান্তি। তাই শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা দেখা গেল। যুদ্ধের এমনকী জয়ের অভিজ্ঞতা ছিল তিক্ত।

বিখ্যাত সম্রাট অশোক। তাঁর কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী করুণ অভিজ্ঞতার পরে এ রকমই তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।[৯] ফলত যুদ্ধ ত্যাগ করে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন, প্রজাদের মধ্যে অহিংসা প্রচার করেন এবং নির্মম বিচারকের পরিবর্তে স্নেহময় পিতার মতো শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। তক্ষশিলা স্তম্ভে তার আরামায়িক শিলালিপিতে বলা হয়েছে: ধর্ম হচ্ছে সৃষ্টির জন্য, প্রাণীদের জন্যে অনাঘাত যা কিছু অহিংসা তারই জন্যে।[১০] গ্রিক ভাষায় রচিত তাঁর কান্দাহার লিপিতে আছে: 'যারা এখানে বসবাস করতেন তাঁরা ভালবাসতেন এবং বন্ধু ও স্বজনদেরকে পরস্পরকে প্রতারণা থেকে বিরত থাকতেন, ক্রীতদাস ও ভৃত্যদের প্রতি যথাসম্ভব কোমল ব্যবহার করতেন— যদি এঁদের মধ্যে কারও মৃত্যু হত বা দেশান্তরিত হতে হত তবে সে ঘটনা অন্যদের কাছে ব্যক্তিগত বেদনার মতোই অনুভূত হত।' তাঁর

প্রস্তর লিপি ৪ (কালসি) বলে, 'সম্রাট প্রিয়দর্শী নির্মিত দয়ার বিধি... সর্ব জীবনে হিংসা পরিহার।' নবম প্রস্তর লিপি বলে, 'ক্রীতদাস ও ভৃত্যের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, জীবিত প্রাণীর প্রতি (হিংসায়) সংযম।' ত্রয়োদশ শিলালিপি ঘোষণা করে, 'দেবগণের প্রিয়' আকাঙ্ক্ষা করেন সর্বজীবের হিংসা হতে মুক্তি, আত্মসংযম, যথাযথ আচরণ ও মৃদুতা।

প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে প্রথম সম্রাট এক বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন এবং যিনি এক অশুভ-রক্তস্নানের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাজ্য কলিঙ্গকে পরাজিত করে নিজের রাজ্যসীমা বাড়িয়েছিলেন, তিনিই যুদ্ধলোভী, রাজ্যখণ্ডপিপাসু সম্রাটদের গতানুগতিক পথকে পরিত্যাগ করেছিলেন। অশোকের পক্ষে এই রকম একটি যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট ছিল; তিনি তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় দিগ্বিজয়ী চক্রবর্তী সম্রাটের পথ পরিত্যাগ করলেন এবং অহিংসা, সাম্য ও শান্তির পথ অবলম্বন করলেন।

জীবনে অমঙ্গলের মূলোচ্ছেদ করার জন্য বুদ্ধদেব যে মার্গ নির্দেশ করেছিলেন সেই পথই অশোক বেছে নিলেন: অমঙ্গলের এই উৎস ছিল আকাঙ্ক্ষা, 'তন্‌হা' (তৃষ্ণা)— যার প্রেরণায় মানুষ নূতন থেকে নূতনতর বস্তু প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করে। যখন সহজে এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না, তখন সংঘর্ষ হয়ে পড়ে অনিবার্য। উচ্চাশার মূলে আছে আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা আত্মকেন্দ্রিক এবং এই আত্মবোধের পুষ্টি হতে পারে কেবল প্রতিদ্বন্দ্বীর স্বার্থকে আঘাত করে, বিনষ্ট করে। যখন নিজের আত্মস্বার্থের সন্ধানে প্রণোদিত মানুষ ধাক্কা খায় তখন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিনিময়েও মানুষকে নিজের স্বার্থ সন্ধানে প্রবৃত্ত করে তার অহংকার এবং এই অহংকারের ভিত্তি হল তার নিজের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার নির্মম উচ্চাশা।

কারণ, ব্যক্তিগত মর্যাদাকে অতিক্রম করে যে সমষ্টিগত মর্যাদাবোধের মহত্তর প্রতিষ্ঠা, মানুষকে সে কথা শেখানো হয়নি। তার নিজের সংগ্রাম শুধু সংকীর্ণ, নিষ্ঠুর, নিরন্তর। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার তাড়না যত বেশি, বিপর্যয় আর বিনাশ ততই বৃহত্তর। দুটি বিশ্বযুদ্ধ আমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, জাতীয় আত্মম্ভরিতার সংঘর্ষ মানবতার কত সুদূরপ্রসারী বিনাশ করতে পারে। যুদ্ধ শেষ হয়, সই হয় শান্তির সন্ধি, ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। কিন্তু ক্ষতস্থান কখনও নিরাময় হয় না, তার চিহ্ন থেকে যায়। তবু এখনও কোনও কোনও মহাশক্তি, অদ্ভুত সাবলীলতায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিকল্পনা করতে থাকে; নির্লজ্জ স্পর্ধায় তারা বিশ্বজনীন ধ্বংসের পথে দ্রুত ধাবমান হতে চায়।

ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকে কোনও চরিত্রের মুখে একটি অন্ত-শ্লোক উচ্চারণের প্রথা আছে, তাকে বলা হয় 'ভরতবাক্য'। মঞ্চস্থ অন্যান্য কুশীলবের প্রতি, সেই সঙ্গে অন্যান্য দর্শকদের প্রতি এটি প্রযোজ্য। অন্য ভাবে বলা যায়, এই প্রার্থনাগুলি সমগ্র গোষ্ঠীর মনোবাসনাকে রূপায়িত করে। প্রায়ই দেখা যায় এই সব 'ভরতবাক্য'-তে সমষ্টির শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রাচীন নাট্যকার ভাস, তাঁর *অবিমারক* নাটকের শেষে বলেছেন, 'যেন পৃথিবীর সমস্ত প্রজা সুখে থাকে।'[১১] তাঁর *কর্ণভার* নাটকের সমাপ্তিতে বলছেন 'তোমরা সকলে সুখে সমৃদ্ধিতে থাক, সর্ব বিঘ্ন বিনাশ হোক, রাজোচিত গুণসম্পন্ন রাজা পৃথিবী শাসন করুন।

মহাবীর চরিতের সমাপ্তি অংশটি গুরুত্বপূর্ণ: যেন জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীর কার্যকলাপে আনন্দ খুঁজে পান।

কালিদাস, তাঁর *বিক্রমোর্বশীয়* এবং *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* নাটক শেষ করছেন এই প্রার্থনা দিয়ে, যেন সুশাসক রাজা দৃঢ় হাতে, ন্যায্য ভাবে প্রজাদের যৌথ সমৃদ্ধি ও একত্র বিকাশের জন্য সুশাসন করেন। তাঁর *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটক সমাপ্তিতে বলা হয়:

> সমগ্র জগৎ সুখী হোক; সর্ব প্রাণীকুল অপরের কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করুক; অমঙ্গল বিনষ্ট হোক, সর্বত্র সকলে আনন্দিত হোক।

বৌদ্ধ বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত শ্রীহর্ষের *নাগানন্দ* নাটকের সমাপ্তি হচ্ছে এই বাক্য দিয়ে: যেন সকল প্রাণী (প্রজাগণ), সর্ব বিপন্মুক্ত হয়ে সৎকর্মে রত থাকে এবং বিদ্বেষশূন্য চিত্তে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে আনন্দ উপভোগ করে।

এখানে নাট্যকার আনন্দের মূল সুরটির সন্ধান পেয়েছেন। 'বিদ্বেষশূন্য চিত্তে' এবং 'সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করা'— কেবলমাত্র এগুলির মাধ্যমেই সামগ্রিক শান্তি ও সুখলাভ নিশ্চিত হতে পারে আর এই পথেই আনা যায় সমষ্টির শান্তি।

ভারতবর্ষে যুদ্ধ ও শান্তির শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ এ দেশের, সম্ভবত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য— *মহাভারত*। এখানে কুরুসিংহাসনের অধিকার নিয়ে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃসম্পর্কিত বংশধারার মধ্যে নিষ্ঠুর, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছিল। যখন বিপুল ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হল, তখন স্বজনের রক্তমাখা পথে হেঁটে যে সিংহাসন তাঁরা জয় করেছেন সেই সিংহাসনে বসতে বিজয়ীরা বিতৃষ্ণা অনুভব করলেন। বিজয় তার গৌরব হারাল। তাদের অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি এই:

> যেমন কোনও ব্যক্তি কূপখনন করার পর দেখে সেখানে জল নেই, তাকে কর্দমাক্ত, ক্লিন্ন অবস্থায় ফিরে আসতে হয় আমাদের এই প্রচেষ্টার ফলও অনুরূপ হয়েছে।[১২]

যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাপ্য এই সিংহাসন, অথচ যিনি বৈরাগ্য ও তীব্র আত্মিক ক্ষোভে বিচলিত, তাঁকে মধ্যম ভ্রাতা বলেন:

> যে যুদ্ধে তীর কার্যকরী হয় না, যেখানে শত্রু মিত্র কারও কোনও উপকারিতা নেই। হে রাজন্ আজ সেই যুদ্ধ তোমার সম্মুখে উপস্থিত, যে যুদ্ধ, নিজের অন্তর্লোকে একাকী করতে হয়।[১৩]

তিনি অগ্রজকে প্রায়শ্চিত্তের পরামর্শ দেন, ক্ষত্রিয় বংশে জাত ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ অবশ্য কর্তব্য এবং প্রশংসনীয় কর্তব্য এই যুক্তিতে সান্ত্বনা দিতে থাকেন।

উত্তরে অগ্রজ বলেন:

> যে সম্রাট এই সমগ্র পৃথিবী শাসন করবেন, এমনকী তাঁরও কেবল একটিই উদর; তবে কেমন করে তুমি যুদ্ধের প্রশংসা কর?.... তুমি (যুদ্ধে বিজিত) ভোগ্যবস্তু সমূহের ভোগ সুখের প্রশংসা করছ, কিন্তু যারা এগুলি ভোগ করেন না, যাঁরা দুর্বল, তাঁরাও উচ্চ (আত্মিক) স্তর প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

মিথিলাপতি জনক বলেন:

> আমি কিছুরই অধিকারী নই, তবু আমার সম্পদ অসীম; মিথিলা দগ্ধ হয় তবু আমার কোনও কিছুই দগ্ধ হয় না।[১৪]

যে চিরন্তন আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা মানুষকে অধিকার বোধের প্রশ্নে তাড়িত করে, প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞা এখানে সামগ্রিক ভাবে তার গভীর মূলে অনুসন্ধান করেছে। মানুষ যখন এমন একটি সীমায় পৌঁছায় যেখানে ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা জাতিগত ভাবে অধিকার প্রাপ্তির যুক্তিহীন তাড়না কোনও বাহ্যিক শক্তির মাধ্যমে বাধা পায় তখন শান্তি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। যখন জনক বলেন যে তাঁর রাজধানী মিথিলা অগ্নিদগ্ধ হলেও তাঁর কিছু দগ্ধ হচ্ছে না, তখন তিনি সমস্ত পার্থিব অধিকারবোধ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেন এবং এর ফল অন্তরের শান্তি, সমস্ত জগৎকে অধিকার করার এক উল্লসিত বোধ। ঈশোপনিষদের প্রারম্ভিক শ্লোকেও এই প্রকার একটি উপলব্ধি দেখতে পাই:

> সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাঁর দ্বারা যা পরিত্যক্ত তাই-ই ভোগ কর। অপরের ধনে লোভ করে না।

যখন ব্যক্তি হয় আত্মকেন্দ্রিক, সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন, তখন তুচ্ছ কণাটির বিয়োগও অসহ্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বলেন: অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়। অন্য ভাবে বলা যায়, কোনও কিছু হারাবার উপায় হল অল্পের অধিকার মদে মত্ত না হওয়া, ব্যক্তিগত অধিকারবোধের ঊর্ধ্ব চেতনাকে প্রসারিত করা। অধিকারের আকাঙ্ক্ষায়, ব্যক্তিগত ভাবে নিঃশেষে অধিকার করার তাড়নায় অস্থির মানসিকতা থেকেই সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব, অসাম্য আর সংঘর্ষের আকাঙ্ক্ষা। এর পরে তা মানুষকে নিয়ে যায় প্রভুত্বের অধিকারের পথে, যার সঙ্গে ঘটনার প্রবাহে সংঘর্ষ হয় প্রতিদ্বন্দ্বী আকাঙ্ক্ষার। এর ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে। এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের শান্তিহরণ করে, নিদ্রাহরণ করে। আর্ত, ক্রোধী এবং প্রেমিকের জন্য নিদ্রা কোথায়?[১৫] যখন শেষতম কৌরব রাজপুত্র মৃত্যুমুখে পতিত, তখন তাঁর বিজয়ী জ্ঞাতিভ্রাতাদের একজন বলেছিলেন: 'অনুশোচনা কোর না, আমরা যারা অবশিষ্ট রইলাম তারাই করুণার পাত্র।'[১৬] দীর্ঘ এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে বিজয়ীর কাছে জয়ের উপলব্ধি কেমন করে ধরা দিয়েছে, এই তার উপলব্ধি। এ শুধু সন্তুষ্টির লেশশূন্যতা নয়, উপরন্তু এক নিশ্চিত দুঃখের ইঙ্গিতবাহী, কারণ এই প্রক্রিয়াতে সকল সঙ্গী এমনকী ভ্রাতারাও নিহত হয়েছেন।[১৭] মৃত্যুপথযাত্রী মহাকাব্যের নায়ক তাঁর জীবিত জ্ঞাতি ভ্রাতাদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন— 'আমার সঙ্গে সঙ্গে যেন এই যুদ্ধেরও অবসান হয়, যেন এই পৃথিবীর রাজগণ পুনরায় সুস্থ থাকেন।'[১৮]

তাহলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা একপ্রকার অসুস্থতা! গান্ধারী, পরাজিত বিধ্বস্ত এবং মৃত রাজপুত্রদের অন্ধ বৃদ্ধা জননী যুদ্ধের প্রেরণাদাতা কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন: কৃষ্ণের মৃত্যু হবে বড় নির্মম, কারণ যুদ্ধে তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ লাভ ছিল না; তিনি এই অযথা রক্তপাত বন্ধ করতে পারতেন— কারণ উভয়পক্ষই তাঁর কথা শুনত— তবু তিনি তা করেননি।[১৯] মহাকাব্যের কবি গান্ধারীর বাক্যগুলিকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। তাঁর অভিশাপ অনুযায়ীই কৃষ্ণের মৃত্যু

ঘটেছিল। অন্য ভাবে বলা যায়, মহাকবির মতে রক্তক্ষয়ের প্রতিরোধ না করা ছিল প্রথম পর্যায়ের অপরাধ। যুদ্ধের অবসানে, যখন লোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজপুত্রদের শবদেহে ভূমি আকীর্ণ তখন সেই দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই ভাবে— 'এই পৃথিবীর অধীশ্বরগণ, সর্বাঙ্গ দিয়ে ভূমিকে আলিঙ্গন করে, ভূমির জন্যই ভূ-শয্যায় শুয়ে আছেন।' যুদ্ধে কার লাভ হয়? মহাকাব্যের কবি বলেন: 'শূকর আর কুকুরের মধ্যে যখন সংঘর্ষ হয়, তখন লাভবান হয় কেবল শ্মশানরক্ষক।'[২০] পরে আমরা এই রূপকল্প বিষয়ে আবার আলোচনা করব।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে একজন আচার্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন: 'ভ্রাতাদের সঙ্গে ভাগ করে পৃথিবী (রাজ্য) উপভোগ কর, হয়তো তোমার পীড়া আরোগ্য হবে।'[২১] যখন কেউ তার স্বজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন আভ্যন্তরীণ শান্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ভেঙে পড়ে: এই অস্থির বিবেক যন্ত্রণার সঙ্গেই পীড়ার তুলনা করা হচ্ছে। প্রকৃত অর্থে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব মুহূর্তে ধর্মনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাই ছুটে গেলেন বিপক্ষ শিবিরে, বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনদের পায়ে ধরে, আকুল আবেদন জানালেন যুদ্ধ না করার জন্য, আসন্ন হত্যালীলাকে রোধ করার জন্য। উত্তর পেলেন:

> মানুষ বিত্তের দাস, বিত্ত কারো ভৃত্য নয়; হে রাজন, জেনে রাখ, এই-ই প্রকৃত সত্য। বিত্তের পরিবর্তে আমরা স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়েছি; তাই আমরা নপুংসকের মতো কথা বলছি।[২২]

এই মহাকাব্যে একটি ছোট রূপক আছে: প্রজাপতি ব্রহ্মা লোকসংখ্যার আধিক্যে চিন্তিত হয়ে পড়লেন: তাঁর দুশ্চিন্তা উদ্বেগ থেকে এক নারীর উদ্ভব হল: ব্রহ্মা তাকে সৃষ্টি ধ্বংসের নির্দেশ দিলেন। নারী ক্রন্দন করে উঠল, তার সেই অশ্রু ব্রহ্মা অঞ্জলি বদ্ধ করে ধারণ করলেন; সেই অশ্রু হল ব্যাধিসমূহ। তারপরে আবার ব্রহ্মা আদেশ দিলেন সৃষ্টি ধ্বংসের; নারী এক অনুগ্রহ প্রার্থনা করল— মানুষের নিজের দোষই যেন তার মৃত্যুর কারণ হয়। বিধাতা বললেন 'তথাস্তু'।[২৩] যে কারণে বহুসংখ্যক মানুষের বিনাশ ঘটে, মানুষের অভিজ্ঞতায়, তার মধ্যে তীব্রতম, ব্যাপকতম হল যুদ্ধ। রূপক কাহিনির মতে এই সব মৃত্যুর কারণ হল মানুষের নিজেরই দোষ। কার দোষ? তা কিন্তু যে ভুক্তভোগী তারই দোষ আবশ্যিক ভাবে নয়, দোষ সেই শক্তির, সেই গোষ্ঠীর এমনকী সেই ব্যক্তির যে বা যারা স্থির শীতল বুদ্ধিতে এই সব তাণ্ডবের পরিকল্পনা করে এবং মৃত্যুর ফসল ঘরে তোলে। শূকর এবং কুকুর ঝগড়া করে, মারা যায়। যে শ্মশানরক্ষক— তাদের চামড়া বিক্রি করে আনুষঙ্গিক আয় করে— সে তাদের বিদ্বেষের সুযোগ নিয়ে নিজে লাভবান হয়। স্পষ্টদর্শী মহাকবি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভাগ্যের পরিহাস অনুভব করেছেন। তিনি মহাকাব্যের মহাযুদ্ধ, ব্যাপক ধ্বংস কাণ্ডের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, আর মানব জাতি যে সব শিক্ষা নিতে অসম্মত হয়, সেই সব তত্ত্বকথা নিরাবেগ কঠিন ভাবে বর্ণনা করেছেন।

সমাপ্তিসূচক আখ্যান রূপে আমরা একাদশ শতকের একটি নাটক, বাঙালি নাট্যকার ভট্টনারায়ণ বিরচিত *বেণী সংহার*[২৪]-এর গর্ভাঙ্ক দৃশ্যের দিকে তাকাতে পারি। *মহাভারত* যুদ্ধের শেষাংশের ঘটনা অবলম্বনে নাটকটি রচিত। ঘটনার শেষ ভাগে যখন আঠারো দিন

ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভ্রাতৃরক্তপাত চলেছে তখন আমরা একটি গর্ভ-দৃশ্যে[২৫] দেখতে পাই রাক্ষস রুধিরপ্রিয়[২৬] আর তার রাক্ষসী সঙ্গিনী বসাগন্ধার[২৭] সংলাপ। রাক্ষসীর স্বগতোক্তিতে বোঝানো হয়েছে, তাদের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ; দীর্ঘদিন চলার মতো যথেষ্ট রক্ত, মাংস, হাড়, চর্বি, ইত্যাদি সে মৃত বীরদের দেহ থেকে সংগ্রহ করে রেখেছে। তাই স্বামীকে সে ভোজনে আপ্যায়ন করতে চায়। রাক্ষস তার গৃহিণী প্রবৃত্তির প্রশংসা করে বলে যে, সে নিজে তৃষ্ণার্ত, ঈষদুষ্ণ (অর্থাৎ টাটকা) রক্ত পান করতে চায়; রাক্ষসী সেইরূপ পানীয়ই দেয়, রাক্ষস তৃপ্ত হয়। সানন্দে তারা এই আত্মক্ষয়ী যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ স্মৃতিচারণার মাধ্যমে বর্ণনা করে; বলে শবদেহের স্তূপের কথা যা, তাদের কাছে প্রচুর সুস্বাদু খাদ্যভাণ্ডার স্বরূপ। রাক্ষসী দেখায় তার পুরাতন সম্ভার আর নূতনতর সংগৃহীত খাদ্যভাণ্ডার। সে বলে, যুদ্ধ যদি এই ভাবে চলতে থাকে তবে তার আর খাদ্যচিন্তা থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে পড়ে পূর্বোক্ত শূকর আর কুকুরের দ্বন্দ্বের কথা। যাদের মৃত্যুতে লাভবান হয়েছিল অপর এক তৃতীয় পক্ষ। রাক্ষস দম্পতির সংলাপে একটি রূপক অর্থ আছে: যতদিন মানুষ তার ভ্রাতার বিরুদ্ধে অর্থাৎ অপর মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, ততদিন যুদ্ধ ব্যবসায়ীরা— অর্থাৎ অস্ত্রবণিক বা যুদ্ধের অধিপতিরা— সমৃদ্ধ, বর্ধিষ্ণু হতে থাকবে। যুদ্ধ কেবল রাক্ষসদেরই সমৃদ্ধির জন্য। শান্তি তাদের স্বার্থের পরিপন্থী। তাই বিশ্বশান্তির যে কোনও সম্ভাবনার বিরুদ্ধে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং স্ব স্ব রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের আড়ালে থেকে তারা শান্তির বিরূপ পদক্ষেপ পরিকল্পনা করে যায়। যাঁরা শান্তি ভালবাসেন, যাঁরা জীবনকে ভালবাসেন তাঁদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই যুদ্ধ ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ অনুমান করতে হবে, বুঝে নিতে হবে, তার দৃঢ় প্রতিবাদ করতে হবে।

পরিবারগত ভাবে, দাম্পত্য সম্পর্কে, পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে অথবা গুরু শিষ্যের মধ্যে, প্রতিবেশীদের মধ্যে— যেখানেই হোক না কেন, দ্বন্দ্বের মূল কিন্তু এক। লোভ, দম্ভ, অহংকার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অসহিষ্ণুতা এবং প্রতিযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বুদ্ধদেব যথাযথ ভাবেই নির্ণয় করেছিলেন: তন্‌হা— 'তৃষ্ণা' আকাঙ্ক্ষাই এই সামগ্রিক বিষচক্রকে আবর্তনে প্রবৃত্ত করে। তবু আকাঙ্ক্ষা নিজে জীবনের এক অনুষঙ্গ স্বরূপ। কখন তবে আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিষ সঞ্চারিত হয়? যখন অপরের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ভ্রষ্ট আকাঙ্ক্ষা হতাশায় প্রত্যাঘাত করে।

যেহেতু আমরা নিজেদের নিয়ে শান্তিতে থাকার শিক্ষা পাই না তাই আমরা সেই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি যা অপরের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিরোধ বাধায়। বৌদ্ধগ্রন্থ *ললিতবিস্তার*-এ আমরা একটি নূতনতর সামাজিক সুস্থ ভাবনার পরিচায়ক সুর শুনতে পাই: বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়, লোকানুকম্পায়ৈ মহতো জনকায়স্যঅর্থায়— 'অনেকের মঙ্গলের জন্য, অনেকের আনন্দের জন্য, মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিতে, সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের প্রয়োজনে।' এই প্রকার লক্ষ্যের একটি স্বাভাবিক পরিণাম আছে: যখন গোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত বাধে, তখন ব্যক্তি তার নিজস্ব অবাধ আত্মস্বার্থকে রূপান্তরিত করতে বাধ্য হয়।

এই প্রকার শিক্ষা ফলপ্রসূ ভাবে কার্যকার হওয়ার পূর্বে, অবশ্যই গোষ্ঠীগুলির আর্থিক এবং রাজনৈতিক গঠন আমূল পরিবর্তিত হওয়া উচিত। বর্তমানে অধিকাংশ সমাজব্যবস্থাই পুঁজিবাদী। অন্যান্য প্রতিবেশীকে বঞ্চিত করে আত্মসমৃদ্ধি সাধনের জন্য কোনও সম্প্রদায়বিশেষের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে এই সব সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এমনকী এই সব সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেও কেবল মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ব্যক্তিই জনগণের পরিশ্রমের ফল নিজেরা ভোগ করে থাকে। শোষণ যে ভাবেই করা হোক, তার মূলে থাকে লোভ এবং অনৈতিক, দ্বন্দ্বমূলক আকাঙ্ক্ষা। সমাজবাদের ভিত্তি হল প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতা, মুষ্টিমেয়ের দ্বারা বহুজনকে শোষণ করার পরিবর্তে সকলের জন্য করুণা ও সহানুভূতি। এর প্রচলনের মাধ্যমে সর্ব প্রকার সামাজিক ও বিশ্বনৈতিক অমঙ্গল দূরীভূত হতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রাতারাতি অথবা আপনা হতেই সর্বপ্রকার অমঙ্গল অন্তর্হিত হবে, কারণ আমাদের মানবিক পরম্পরার অধিগঠন গড়ে উঠেছে বহু সহস্রাব্দ ধরে এবং একে উন্মূল করতে সময় লাগবে। কিন্তু একবার যখন সামগ্রিক ভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অপরকে শোষণ করা, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অপরকে আঘাত করা বা অপ্রতিভ করার প্রবণতা মুছে যাবে, তখনই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তির বাতাবরণ আসবে, পারিবারিক সাম্প্রদায়িক এবং রাষ্ট্রগত শান্তি দেখা দেবে।

যুদ্ধের আশঙ্কা যেহেতু অতি স্পষ্ট এবং নিষ্ঠুর বাস্তব, সেহেতু যাঁরা বিশ্বশান্তির স্বপ্ন দেখেন সেই সব মানুষের সক্রিয়তা আশু প্রয়োজন। কারণ, রক্তপিপাসু দানবেরা ক্রিয়াশীল, তাদের মূলধন হল পারস্পরিক ঘৃণা, উচ্চাশার সংঘাত, মানুষের অন্তর্নিহিত নিষ্ঠুরতা-বিলাস এবং তার বোধহীন আত্মঘাতী মনোবৃত্তি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই সব অত্যাচারী তাদের তাণ্ডব চালিয়ে এসেছে। আশা করতে পারি— শান্তিকামীরা তাঁদের উদ্দেশ্যকে সকল করার জন্য সচেষ্ট হবেন, দানবের অ-শিব চক্রন্তকে বিনষ্ট করবেন। অস্ত্র ব্যবসায়ীরা সুকৌশলে প্রচারমাধ্যম, বিজ্ঞাপন, সাহিত্য এমনকী জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মাধ্যমেও অতি সূক্ষ্ম ভাবে আবার কখনও কখনও অনতি সূক্ষ্ম ভাবেও এই যুদ্ধোদ্মাদনাকে উচ্চকিত করে চলেছে। শান্তি জীবনকে নিশ্চিত করে, সুতরাং শেষ কথা বলার অধিকার শান্তিরই থাকা উচিত। কিন্তু আণবিক অস্ত্রযোগে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তির সম্ভাবনা বিলীয়মান মনে হয়। যুদ্ধকারীদের সংকেতকে বিনষ্ট করে আমাদের তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে হবে। জনগণকে তাদের সমষ্টিগত স্বার্থে জাগ্রত করতে হবে। ওই সব অমঙ্গলকামী স্বার্থান্বেষীদের লক্ষ হল সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিনষ্ট করা, পৃথিবী থেকে প্রাণকে মুছে ফেলা। মানুষ যখন এই আসন্ন বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে এক বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের তাণ্ডবের সম্ভাবনা বুঝবে তখন মানুষের এই শত্রুদের অ-শিব শক্তিকে বিনষ্ট করার জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

শান্তির প্রতীক বড় মনোরম কিন্তু সে দুর্বল, তবু মানুষের মধ্যে যা কিছু মহৎ এই শান্তির আশা তাকে অনুপ্রাণিত করে; মানুষ যদি তার পিছনে সঙ্ঘবদ্ধ হয় তবে শান্তির রূপক এই পবিত্র কপোত সিংহ বা সাপের বিরোধিতা করে অবশ্যই জয়ী হবে। যে পদ্ম সূর্যকিরণের

স্পর্শে বিকশিত হয়, যার কোনও চোখ ধাঁধানো চমৎকারিত্ব নেই, আছে নীরব শান্ত সৌন্দর্য আর স্নিগ্ধ সুবাস তাকেই প্রাচীন ভারতবর্ষ বরণ করেছিল শান্তি আর সমৃদ্ধির প্রতীক রূপে। পদ্ম বিকশিত হয় প্রভাতে আর সন্ধ্যায় সে সলিল। তবু এর মধ্যে আছে অমরত্বের ইঙ্গিত, কারণ প্রতিদিনই সে একটু করে ফুটে ওঠে, এ ফুল আকাশ-মাটি-জলের মধ্যে মালিন্য আর পবিত্রতার মধ্যে বিচরণশীল; এ ফুল নিজে এক শান্তিপূর্ণ, মর্যাদাময় তৃপ্ত জীবনবোধের পবিত্র প্রতীকস্বরূপ। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষ একে সম্পর্কিত করেছিল কেবল সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গেই নয়, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সঙ্গে, বাগ্‌দেবী সরস্বতীর সঙ্গে, শান্তির দূত বুদ্ধের সঙ্গে— যাঁর চরণপাতে ফুটে উঠত শান্তিকমল। জীবনের জন্যই শান্তিকে কামনা করা হয়, সেখানেই পদ্মের পেলব প্রতীক তার শক্তিলাভ করে থাকে।

সূত্রাবলি

১. অনুবাদ: আর পানিক্কর— *মন্ত্রমঞ্জরী* ১, পৃ. ৮৫৪
২. ৩.৩০; ১০৩, ৫; অনু. আর. পানিক্কর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৭
৩. তুলনীয় *অথর্ববেদ* ৬:৭৩:১-৩; ৬:৭৪·২; ৬.৯৪:১-৩
৪. *ঋগ্বেদ* ২:১৫:১-৬
৫. *অথর্ববেদ* ৭:৫২.১
৬. *অথর্ববেদ* ১৯:৯:১-৪
৭. এই পংক্তিটি বিখ্যাত শিবসংকল্পসূক্ত— ৩৪:১-৬-এব ধ্রুবপদ।
৮. তুলনীয় *অথর্ববেদ* ৭:৩৬-৩৭, ১৪:১:১৭, ৪২; ১৪:২:৬৪, ৭১; অন্যান্য পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রেও একই সুরে আলোচনা করা হয়েছে।
৯. যিনি খ্রিস্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে উত্তর ভারতে রাজত্ব করেন।
১০. তক্ষশিলা স্তম্ভলিপি
১১. খ্রিস্ট পূর্ব প্রথম শতকের শেষাংশ।
১২. *মহাভারত*; পুণা সং ১২-১০:৯
১৩. *মহাভারত* ১২:১৬:২১
১৪. *মহাভারত* ১২:১৭:৩
১৫. *মহাভারত* ১০:৪:২১
১৬. *মহাভারত* ৯:৫৯:২৭ বাংলা সংস্করণ
১৭. এখানে তুলনীয় উইলফ্রেড ওয়েনের মর্মস্পর্শী কবিতা, লাস্ট মিটিং (শেষ দেখা)
১৮. *মহাভারত* ৬:১১৭:২
১৯. *মহাভারত* ১১:২৫:৪০, ৪১
২০. *মহাভারত* ৭:১৮০:৮ বাংলা সংস্করণ
২১. *মহাভারত* ৫:১২৬:১৮
২২. *মহাভারত* ৬:৪:৪১
২৩. *মহাভারত* ১২:২৪৮:২৫০
২৪. খ্রিস্টিয় ১০৭৭ সাল
২৫. তৃতীয় অঙ্কের পূর্বে
২৬. আক্ষরিক অনুবাদ 'রক্তলোভী'
২৭. 'চর্বির গন্ধ'

শম্বুক ও মায়াতি: সমাজে শূদ্রের অবস্থান বিষয়ে একটি বিচার

এক

শূদ্র বিষয়ে অধ্যাপক আর এস শর্মার প্রসিদ্ধ বইটি এবং অন্যান্য লেখকের কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষার পরে প্রাচীন বর্ণবিভক্ত সমাজে শূদ্রের স্থান আমাদের সবার কাছে মোটামুটি পরিষ্কার। তেমনই পরিষ্কার *রামায়ণ*-এর শেষ কাণ্ডে শম্বুক উপাখ্যান। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শম্বুকের কাহিনির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ পরীক্ষা করা এবং প্রাক্-মধ্যযুগীয় একটি পুরাণের থেকে একটি চতুর্থ প্রাসঙ্গিক অংশ যোগ করা।

উত্তরকাণ্ডে দেওয়া প্রাচীনতম শম্বুক কাহিনিতে বলা হয়েছে, 'রাজার কোনও ত্রুটির ফলেই কেবল প্রজাদের অকাল মৃত্যু ঘটতে পারে।' এ কথা বলেছিল সেই ব্রাহ্মণ যার পুত্র বাল্যকালে মৃত হয়েছিল; সে রামকে সম্পূর্ণ ভাবে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছিল।[১] তাই রাম বেরিয়ে পড়লেন, কোথায় তাঁর শাসনে ত্রুটি হয়েছে দেখতে; তিনি দেখলেন শূদ্র শম্বুক তপস্যা করছে এবং নারদ এর মধ্যেই ব্রাহ্মণ বালকের অকাল মৃত্যুর হেতু খুঁজে পেলেন।[২] তৃতীয় যুগ দ্বাপরে সুবর্ণময় সত্যযুগের তুলনায় অনেক পাপ ঢুকেছিল, তাই বৈশ্যেরা তখন তপস্যা করতে পারত এবং করতও। কিন্তু শূদ্র? কখনওই না। তাদের একমাত্র ধর্ম উচ্চতর তিন বর্ণের দীন ভাবে সেবা, মনু ও অপর ধর্মশাস্ত্রগুলি যে বিধান দিয়েছেন সেই অনুযায়ী কাজ করা। শুধু তাই নয়, যে রাজার রাজত্বে শূদ্র তপস্যা করে, সেই রাজা নরকে যান। নারদের কথায় রাম শূদ্রকে সম্ভাষণ করে তার পরিচয় এবং তার প্রযত্নের হেতু জিজ্ঞাসা করলেন শূদ্র উত্তর দিল, 'আমি এই নশ্বর দেহে দেবত্ব লাভ করতে চেষ্টা করছি।' কিন্তু সে যখন এই কথা বলছে, তখনই রাম তাঁর উজ্জ্বল তরবারি নিষ্কোষিত করে তার মুণ্ড কেটে ফেললেন। তৎক্ষণাৎ দেবতারা রামের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করলেন, তাঁর এই কর্মের প্রশংসা করলেন এবং বললেন রাম দৈবকার্য সাধিত করেছেন। তাঁরা তাকে বর দিতে চাইলেন, তাই দিয়ে রাম ব্রাহ্মণ কুমারকে বাঁচিয়ে তুললেন।

রামায়ণ-এর অন্তিম সংযোজন সম্পূর্ণ হওয়ার প্রায় দুই শতাব্দী পরে কালিদাস তাঁর *রঘুবংশ*-তে এই ইতিবৃত্ত তুলে নিলেন। সেখানে পঞ্চদশ সর্গে (৫০-৫৫ শ্লোকে) আমরা এই উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই। কালিদাস বাল্মীকির মূল ইতিবৃত্ত থেকে ব্যতিক্রম ঘটাতে সাহস পাননি এবং তাঁর সামাজিক মূল্যবোধ মূলত বাল্মীকির সঙ্গে একই ছিল, কারণ তিনি *রঘুবংশ* রচনা করেছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ব্রাহ্মণ্য পুনরুত্থানের যুগে। তিনি রঘুবংশের প্রতিষ্ঠাতাকে প্রশংসা করেছেন, 'যাঁর প্রজারা মনুর বিধান থেকে রেখামাত্রও সরে যায়নি।' (১ম সর্গ, ১৭শ শ্লোক)

কিন্তু ধার্মিক শূদ্রের এই তাৎক্ষণিক বধের বিষয়ে তাঁর ভিতরের কবি স্বস্তিবোধ করেননি। রামের কাজটি সমর্থন করা ছাড়া তাঁর কোনও উপায় ছিল না, কারণ, বাল্মীকিও তাই করেছেন, কিন্তু তিনি যা করতে পারতেন এবং করেওছেন, তা হল একটি মর্মস্পর্শী চিত্রকল্পের মাধ্যমে তাঁর কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ। 'রাম শম্বুকের কণ্ঠ থেকে তার সেই মুখখানা বিচ্যুত করলেন, যা হেমাঙ্গ পরাগবিশিষ্ট পদ্মের মতো, তার প্রান্ত দেবতার শ্মশ্রু, তাতে যেন উজ্জ্বল বিন্দু ঝুলে আছে।' (১৫:৫২)। মৃত্যুর ফলে শূদ্র ধার্মিকদের স্থান পেল; কঠোর তপস্যাতেও সে তার নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি, কালিদাস খুব সূক্ষ্ম ভাবে বাল্মীকির বর্ণগ্রস্ত উপাখ্যান আগে বিচার করেছেন, বিধ্বস্ত পরাগযুক্ত পদ্মের কোমল চিত্রকল্প দিয়ে এবং শ্মশ্রুর প্রান্তদেশ উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করে। তারপরে তিনি শম্বুকের সামাজিক কলঙ্ক দূর করেন, ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়ায় তাকে ধার্মিকদের স্থান প্রাপ্ত করিয়ে।

প্রায় তিন শতাব্দী পরে ভবভূতি একই কাহিনি তুলে নিলেন তাঁর *উত্তর রামচরিত*-এর দ্বিতীয় অঙ্কে। তিনি দ্রুত প্রথম অংশটির উপর আচ্ছাদন ফেলে রামকে দিয়ে বলান, তাঁর মতো নিষ্ঠুর ব্যক্তি, যিনি স্নেহময়ী, নিষ্পাপ পত্নীকে গৃহচ্যুত করেছেন, তাঁর পক্ষে হতভাগ্য শূদ্রকে বধ করা তুচ্ছ ব্যাপার। তারপর এক দৈবী মূর্তি মঞ্চে প্রবেশ করে নিজেকে শম্বুক বলে পরিচয় দেয়; রামের হাতে মৃত্যু তাকে দৈব তেজ দিয়েছে।

রাম শম্বুককে আশীর্বাদ করেন, 'বৈভ্রাজ নামে তেজোময় লোক, যেখানে ধার্মিকতা থেকে উৎসারিত হয় আনন্দ ও উল্লাস, তা চিরদিন তোমার হোক।' আমরা লক্ষ্য করি, এই আশীর্বাদ শ্লোকের প্রথম পাদ সরাসরি *ঋগ্বেদ* (৯:১১৫:১১) থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, যেখানে তাদের কাল্পনিক লোকে সোমপায়ীদের ভোগের বর্ণনা আছে। রাম শূদ্র শম্বুকের জন্য স্বর্গভোগ কামনা করেছেন, যে শূদ্রকে তিনি নির্মম ভাবে হত্যা করেছেন— বাল্মীকির বর্ণনা অনুযায়ী স্বয়ং দেবতারা তাঁর যে কাজের প্রশংসা করেছেন। কালিদাস শূদ্রকে আশীর্বাদ করেছেন, বরপ্রাপ্তদের লোকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। ভবভূতি সেই আশীর্বাদ কার্যে পরিণত করেছেন এবং শূদ্রকে অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ থেকে মুক্ত করেছেন।

এই থেকেই প্রকাশ পায় একটি স্বীকৃত ও উত্তরাধিকারলব্ধ উপাখ্যানের পরই কবিদের চিন্তাধারার পরিবর্তন; যে নতুনত্ব তাঁরা উপস্থাপিত করেছেন, তা কবিদের ব্যক্তিগত সহানুভূতিরই সাক্ষ্য বহন করে, শূদ্রের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনও নমনীয়তার প্রমাণ নয়। কালিদাস ও ভবভূতির মাঝামাঝি সময়ে রচিত পুরাণগুলিতে, এমনকী তার পরে রচিত যেগুলি তাতেও, শূদ্রের প্রতি ক্রমশ দৃষ্টিভঙ্গির কঠোরতাই ধীরে ধীরে প্রতিফলিত হয়। তার একমাত্র কর্তব্য হল অপর তিন বর্ণের সেবা করা, তার অধিকার শাস্ত্রগত ভাবে ক্রমশই খারিজ করা হচ্ছে এবং তাকে উত্তরোত্তর সমাজের শত্রু হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কলিযুগে শূদ্র তার স্বীকৃত অধিকার লঙ্ঘন করবে, আরও বেশি সামাজিক সম্মান লাভ করবে, এবং সমাজের অন্যান্য অংশের উপর কর্তৃত্ব করার ভান করবে। সে গুরুতর ধর্মসঙ্কট ও সমাজের সত্যকার বিপদ হওয়ার পথে চলেছে।

দুই

এই ব্যাপার যে ঘটছে, তার একটি প্রমাণ হল, তথাকথিত অপকর্মের নিয়ম, যেগুলি অনুসারে শূদ্র আপৎকালে উচ্চতর তিন বর্ণের কিছু কিছু জীবিকা অবলম্বন করতে পারে। বলাই বাহুল্য, পুরাণের এই অংশগুলি বাস্তবে যা ঘটছে তারই সমর্থন ও গ্রহণের জন্য কল্পিত; কোনও কোনও শ্রেণির শূদ্র কিছু শিক্ষা পেয়েছে, কিছু ধন সঞ্চয় করেছে, সমাজে অস্বীকৃত সম্মান লাভ করেছে। এই উন্নতিশীল শ্রেণির শূদ্রকে বলা হত সচ্ছূদ্র (সচ্ছূদ্রৌগোপনাপিতৌ)। মনু তাকে বলেছেন পতিত বৈশ্যের সন্তান (১০:২২); যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, সে বৈশ্য মাতা ও শূদ্র পিতার সন্তান (১:৯২); *মহাভারত*-এর আদিপর্বে বলা হয়েছে, তার পিতা ক্ষত্রিয় ও মাতা বৈশ্য, জীবিকার দিক দিয়ে করণ হল লেখক। *বৃহদ্ধর্ম পুরাণ*-এ বলা হয়েছে, 'করণ চিরদিন শ্রীযুক্ত হোক। সে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলে ও আচরণ করে; সে রাজকার্যে নিযুক্ত এবং নীতিজ্ঞ। সে ব্রাহ্মণ ও দেবতার প্রতি ভক্তিমান। সচ্ছূদ্র নিঃসন্দেহে এমন হবে। সে ব্রাহ্মণ ও দেবতার আরাধনায় রত। সচ্ছূদ্রের লক্ষণ অমাৎসর্য এবং সুশীলতা।'[৪]

বর্ণনায় কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়: করণের সম্পত্তি (শ্রী) আছে, কিন্তু তার আচরণ বিনীত, সে ব্রাহ্মণ ও দেবগণের প্রতি ভক্তিমান; কোনও করণিকস্তরে সে রাজকর্মচারী। যেহেতু সে লিখতে পারে এবং তার কাজ তাকে রাজ্যসভার সন্নিকটে নিয়ে যায়, তার ভাগ্যে অবশ্যই অভিষিক্ত রাজকীয় প্রসাদ জোটে, যার সঙ্গে কিছু সামাজিক সম্মান যুক্ত থাকতে পারে। এই শ্লোকের তাৎপর্য হল, সচ্ছূদ্র দরিদ্র ও সমাজে শক্তিহীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সত্যকারের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-এর একটি পাঠে এর সমর্থন পাওয়া যায়। একটি অংশে বলা হয়েছে, নরমেধ যজ্ঞে অশ্বমেধযজ্ঞের অর্ধেক পুণ্য হয়। (প্রকৃতিখণ্ড ২৭:১২০) দুর্গার উদ্দেশ্যে 'একটি মায়াতি', একটি মহিষ, একটি ছাগ এবং একটি সুলক্ষণ মেষ নিবেদন করা উচিত। তাঁর উদ্দেশ্যে মায়াতি নিবেদন করলে দুর্গা সহস্রবর্ষ প্রসন্ন থাকেন। (প্রাগুক্ত ৫৫:৯১, ৯২) 'শোনো, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, মায়াতির (এই) লক্ষণ; এগুলি অথর্ববেদ-অনুসারে; এর অবহেলা হলে সব সুফল বিনষ্ট হয়। এক তরুণ পিতৃমাতৃহীন (যুবক), স্বাস্থ্যবান, প্রসন্নভাব, বিবাহিত এবং সদ্বংশের অজারজ সন্তান, দীক্ষিত সচ্ছূদ্র, বংশের একমাত্র মূল, এমন (ব্যক্তিকে) প্রকৃত মূল্যের অধিক মূল্য দিয়ে তার বান্ধবদের কাছ থেকে কিনে নিতে হবে। ধার্মিক ব্যক্তি তাকে স্নান করিয়ে বস্ত্র, চন্দন, মালা ও ধূপ দিয়ে পূজা করে একজন চর সঙ্গে দিয়ে (সম্ভবত যাতে সে পালাতে না পারে) এক বৎসরের জন্য বাইরে ঘুরতে পাঠানো হবে (অশ্বমেধের অশ্বের মতো)। এক বৎসর পূর্ণ হলে তাকে অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে রাত্রিকালে দুর্গার উদ্দেশে নিবেদন করতে হবে।'[৫]

সুতরাং ছাগ বা মেষের মতো মায়াতিও বলির পশু— সেই ভাবেই তাকে কেনা হয়, স্নান করানো হয়, সাজানো হয়, এক বছর সেই ভাবেই ঘোরানো হয় (অশ্বমেধের অশ্ব তুলনীয়), এবং সেই ভাবেই বলি দেওয়া হয়। উদ্দেশ্যও একই, দেবীর প্রসন্নতা— এ ক্ষেত্রে

সহস্রবৎসরের জন্য— যাতে যজমানের পরিবারে বর প্রবাহিত হয়।

কিন্তু এ ছাড়াও এই হতভাগ্য মায়াতি, যার মৃত পিতামাতা বংশ রক্ষার প্রয়োজনে আর সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না, যার নিজের বিধবা পত্নী নিঃসন্তান অবস্থায় পরিত্যক্ত হবে, যেহেতু তার স্বামী মায়াতি হল মূলক অর্থাৎ বংশের শেষ জীবিত পুরুষ, সে স্বাস্থ্যবান, সুতরাং ভাগ্য ভাল হলে যে সুখী, সমৃদ্ধ পরিবার ও একাধিক সন্তান নিয়ে সংসার করতে পারত, যার চারিত্রিক কোনও দোষ নেই, শারীরিক সুস্থতা আছে, কিছু অর্থ ও শিক্ষালাভ করেছে (দ্রষ্টব্য, তার করণের বৃত্তি এবং সভায় তার জীবিকা), এবং সেই কারণে যে কিছু সামাজিক ক্ষমতা ও সম্ভবত কিছু রাজনৈতিক সম্মানেরও অধিকারী— এমন একজন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তে জীবনচ্যুত। সমাজের ক্ষমতাশালী রাজনীতিবিদদের একটি ভাবী বিপদ এমনি ভাবেই দূর করা হল।

তিন

শম্বুক উপাখ্যান যে পর পর তিন কবির দ্বারা তিন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে কবিদের মর্মগ্রাহিতারই সাক্ষ্য রয়েছে, স্পষ্ট ভাবেই নিরপরাধ এক শূদ্রের নিষ্ঠুর হত্যার বিষয়ে তাঁদের অস্বস্তি পরবর্তী দুটি সংস্করণ থেকে প্রমাণিত হয়। অতি কল্পনার দ্বারাও কবিদের সমসাময়িক সমাজের চিত্র বলে একে গ্রহণ করা যায় না। খুব সম্ভব ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ী শূদ্রদের এবং নিপীড়িত শ্রেণির উপরে অমানবিক নিষ্ঠুরতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই কবিদের অনুপ্রেরিত করেছিল তাঁদের সৃষ্টিতে সামাজিক কুপ্রথার কিছুটা প্রশমন অথবা তার কতকটা ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করতে। উপরন্তু, শিক্ষিত ও সম্পন্ন শূদ্রেরা সমাজের উচ্চতর শ্রেণির চোখে বিপদ, তারাই হয়তো তাদের বিষয় কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। কবিরা বুঝেছিলেন, তারা উচ্চতর বর্ণের অনেকের চেয়ে মন্দ নয়।

সপ্তম শতাব্দীতেই বাণভট্ট অচ্ছুৎ চণ্ডালকন্যা ও তার পিতাকে জাতিচ্যুত শবর শিকারীদের এবং অন্যান্য শূদ্র চরিত্রগুলিকে কবিসুলভ যে মর্মস্পর্শিতার সাহায্যে চিত্রিত করেছেন, তা করুণা, মানসিকতা এবং কতকটা সহানুভূতিতেও সজীব। হয়তো তিনিও শিল্পী হিসেবে প্রতিবাদ করেছিলেন ক্রমবর্ধমান বর্ণভেদের অনমনীয়তায় গড়ে ওঠা এক সমাজের, যে সমাজ দ্রুত চলেছে নরমেধ যজ্ঞের দিকে, তার বলি অবদমিত শূদ্র মায়াতি, যে উন্নতিশীল শূদ্রগোষ্ঠীর প্রতিভূ। অন্য সব দিক দিয়ে ভাল, স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত এই যুবককে বলির পশুর মতো হত্যা করার যে এই অত্যন্ত অমানবিক আচরণের দৃষ্টান্ত মেলে, তা একদিকে সম্ভাব্য সামাজিক প্রতিস্পর্ধীর ভয়ের দ্বারা প্ররোচিত এবং অন্য দিকে লোভের দ্বারা— রক্তপিপাসু দেবীকে অপর কোনও মানুষ বলি দিয়ে সহস্রবর্ষ প্রসন্ন রাখার লোভ। নরমেধ যজ্ঞ সম্ভবত ঋগ্বেদ রচনার পূর্ব থেকেই বাস্তব, হয়তো খাদ্যাভাবের সময়ে যুদ্ধ বন্দিদের এই দুর্ভাগ্য হত (এবং বন্দিদের শুধু বন্ধনকারীদের স্বল্প খাদ্য থেকেই খাওয়াতে হত)। কিন্তু এর চিহ্ন এবং স্মৃতি সাহিত্যে রয়ে গেছে (দ্রষ্টব্য, শাস্ত্রে উল্লিখিত নরমেধ যজ্ঞ), যা পরবর্তীকালে একটি প্রতীকে

পর্যবসিত হয়েছিল। একটি রক্তমাংসের মায়াতিকে বলি দেওয়ার এই অনুষ্ঠানে নরবলির পুনরুত্থান ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে এবং তৎকালীন অবদমিত শ্রেণির উন্নতিতে বিপন্ন এক সমাজ যে কত নিম্নস্তরের নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং প্রশংসা করে, তাই প্রকাশ করে। মনে পড়ে কলিযুগে শূদ্রদের মানবিক অধিকার ও সম্মান অর্জনের স্পর্ধা যে তাদের দীন ভূমিকা ভুলিয়ে দেবে তার বারে বারে উল্লেখ। এই হল তাহলে বাধা পাওয়ার উপায়: আনুষ্ঠানিক ভাবে এক সাধু, পুণ্যবান, স্বাস্থ্যবান, সমর্থ শূদ্রকে হত্যা করে সমাজ শূদ্রকের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে সমাধান বাণী শোনাচ্ছে। এমন নির্মম আনুষ্ঠানিক হত্যার কথা মনে হলে শিহরিত হতে হয়, যে হত্যা পরিপূর্ণ ভাবে এবং বারে বারে ঘটলে ক্রমে ক্রমে শূদ্রদের উৎকৃষ্ট ও উচ্চতর গোষ্ঠীর বিনাশ ঘটবে।

সূত্রাবলি

১. দ্রঃ রাজদোষৈর্বিপর্যদ্যন্তে প্রজা হ্যবিধিপালিত।
অসদ্‌বৃত্তে হি নৃপতাবকালে ম্রিয়তে জনঃ।। ৭:৭৩:১৩

২. ৭:৭৪:২৫

৩. ৭:৭৬:১-১৪

৪. অয়ন্তু করণো নাম শ্রীযুক্তো বর্ততাম্ সদা।
বিনয়াচারসম্পন্নো সুষ্ঠু বচনং চোক্তবান্।।
রাজকার্যং করোত্যেষ নীতিজ্ঞো দৃশ্যতে হ্যয়ম্।
ব্রাহ্মণে ভক্তিমাংশ্চৈব দেবেষ্বপি ভবত্যপি।।
এষ এব হি সচ্ছূদ্রো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণে ভক্তিমন্তস্তু দেবতারাধনে চাতঃ।
অমাৎসর্যং সুশীলত্বম্ এতৎ সচ্ছূদ্রলক্ষণম্।।
(উত্তরখণ্ড, ১৪। ৩০-৩২)
রচনার নিম্নমান, অকারণ পুনরুক্তি, ব্যাকরণগত এবং ভাষাবিধিগত ভ্রান্তিগুলি থেকে এর রচয়িতা কোনও অর্ধশিক্ষিত পুরোহিত বলেই অনুমান হয়।

৫. মায়াতিনাং চ নির্ণীতং শ্রূয়তাং মুনিসত্তম।
রক্ষ্যমথর্ববেদোক্তং ফলহানির্ব্যতিক্রমে।।
পিতৃমাতৃ বিহীনং চ যুবকং ব্যাধিবর্জিতম্।
বিবাহিতং দীক্ষিতঞ্চ পরদারবিহীকম।।
অজারজং বিশুদ্ধঞ্চ সচ্ছূদ্রং মূলকং বরম্।
তদ্‌বন্ধুভ্যো ধনং দত্ত্বা ক্রীতং মূল্যাতিরেকতঃ।।
স্নাপয়িত্বা চ তং ধর্মী সম্পূজ্য বস্ত্রচন্দনৈঃ।
মালৈন্যেধূপৈশ্চ সিন্দূরৈর্দধিগোরোচনাদিভিঃ।
তং চ বর্ষং ভ্রাময়িত্বা চরদ্বারেণ যত্নতঃ।
বর্ষান্তে চ সমুৎসৃজ্য দদ্যান্মায়াতিমেব চ।।

(প্রকৃতিখণ্ড, ৬৫:১০০-১০৫)

নিয়তিবাদ: কারণ ও প্রভাব

প্রকৃত ব্যবহারে নিয়তিবাদের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রায় চল্লিশ বছর আগে। এক সপ্তাহ অনুপস্থিতির পরে আমার পরিচারিকা ফিরে এসে জানাল তার দু বছরের শিশুটির বসন্তরোগে মৃত্যু হয়েছে। যখন প্রশ্ন করলাম তাকে টিকা দেওয়া হয়েছিল কিনা, সে উদাস বৈরাগ্যের সুরে জানাল যখন 'বসন্তে' মৃত্যুই তার ছেলের 'কপালে' ছিল তখন কোনও টিকাই তার মরণকে আটকাতে পারত না। নিশ্চয়ই তার এই মনোভাব অজ্ঞানতা প্রসূত, কিন্তু আমাকে যা আঘাত করল তা হল তার এই সহজ ভাবে মৃত্যুকে মেনে নেওয়া। আর এই মেনে নেওয়া থেকে সে যে শান্তি আর সান্ত্বনা পেয়েছে সেই তথ্য।

আজ যখন কোনও অজ্ঞ কৃষক কারখানায় তৈরি সার ব্যবহার না করে তার অল্প ফসলকেই মেনে নেয়, তখন সে এই একই নিয়তিবাদী মনোভাব দ্বারা চালিত হয়— 'এ বছর সার দিই বা না দিই ফসল কম হওয়াই কপাল।' যা ক্ষতিকর তা হল, এই প্রকার নিষ্ক্রিয় মনোভাব প্রগতির পথ রোধ করে। সঠিক শিক্ষার সুযোগ আর অর্থনৈতিক সুযোগ দেওয়া হলে কিন্তু আধুনিক কলাকৌশল এবং তার উপকার সম্পর্কে এই বিরোধী মনোভাব অনেকাংশে লোপ পাবে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একটি প্রাচীন ভারতীয় পুরাকথাতে বলা হয়েছে যে পৃথিবী অবস্থান করে বহু ফণাযুক্ত দিব্য সর্প 'বাসুকি'র মস্তকে, তাই 'বাসুকি' যখন তার ক্লান্ত ফণা থেকে পৃথিবীর ভার অপর ফণায় সরিয়ে নেন তখনই ভূমিকম্প হয়। আর একটি পুরাকথায় বলা হয়েছে যখন দানব রাহু চন্দ্র বা সূর্যকে গ্রসে করে তখনই গ্রহণ লাগে। প্রাক্-বিজ্ঞান যুগের মানুষের এই অনুসন্ধিৎসা তার উৎসাহী এবং কৌতূহলী মনেরই পরিচয়। সে মন তাকে প্রেরণা দিয়েছে প্রাকৃতিক ঘটনা প্রপঞ্চ, যে সব ঘটনা তার নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত, যাকে দেখে মনে হয়, কোনও মহাজাগতিক বিপর্যয়, সেই সব অনুষঙ্গকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে, অনুসন্ধান করতে এবং ব্যাখ্যা করতে। জ্ঞানের মাধ্যমে, অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতি এবং ভূকম্পলিখ্ যন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ ব্যাখ্যাগুলি অকেজো হয়ে পড়ে; বৈজ্ঞানিক, কারণ-নির্ভর সম্পর্কের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং আকস্মিক সুযোগ থাকার অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি আর স্বীকার করা হয় না। প্রাক্-বিজ্ঞান যুগের কৃষকেরা বৈদিক যুগে শুনাসীরীয় যজ্ঞের মাধ্যমে আর পৌরাণিক যুগে 'ক্ষেত্রপূজা' করে ক্ষেত্রের কর্ষণের জন্য দেবতাকে প্রসন্ন করত। এমনকী কৃষির উন্নতির জন্য 'ক্ষেত্রপতি', 'হলধর', ইত্যাদি দেবতাকেও কল্পনা করা হয়েছি।[১] বৈদিক যুগে খরার প্রতিবিধানের জন্য

অনুষ্ঠিত হত *কারীরী* ইষ্টি, পরবর্তী পুরাণের যুগেও হত নানাবিধ পূজা। অনুরূপ ভাবে ফসল না হওয়ার কারণ হিসাবে মাটিতে বিবিধ রসায়নের ঘাটতিকে খুঁজে দেখা হত না, বরং খোঁজা হত নানা অতিলৌকিক শক্তিকে; যথাযথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাদের প্রসন্ন করা গেলে প্রচুর ফসলে আবার পূজকের ঘর ভরে উঠবে। আদর্শ কৃষি-খামারগুলিতে কৃষকদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, সার প্রয়োগে মাটির উৎপাদনশক্তি পুনরায় জীবিত করা যায়, এর ফলে কুসংস্কার দূরীভূত হয়েছে, বহু কৃষক সার কিনতে উৎসাহী হয়েছেন। কিন্তু সেচপ্রণালী, খালের জল আর সারের ব্যবহার— এ সবের জন্যই অর্থের প্রয়োজন। আর তাই কেবলমাত্র শিক্ষার ভূমিকাও একটা সীমারেখাতে এসে থেমে যায়। অতএব যতদিন না দেশে জ্ঞানকে পরিব্যাপ্ত করার মতো সামর্থ্য হচ্ছে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাগুলি ব্যবহার করার উপায় সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে না দেওয়া যাচ্ছে— ততদিন নিয়তিবাদ অত্যন্ত দৃঢ় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আত্মবিস্তার করে রাখছে তার মূল অতি গভীরে, ইতিহাসের বহু দূরে প্রোথিত হয়ে রয়েছে।

যদি বিষয়ান্তরে গিয়ে নিয়তিসম্পর্কিত ধারণার উৎপত্তি অনুসন্ধান করি তবে দেখা যায় নিয়তিবাদের উদ্ভব তিনটি মূল কেন্দ্র থেকে— জন্ম, দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু; যার মধ্যে সম্ভবত শেষতমটিই চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন্ম অতীতে হয়েছে, মৃত্যু ভবিষ্যতে আসবে। কিন্তু দুর্ঘটনা, যা আমাদের জীবনকে পদে পদে অনুসরণ করে সে তো মানুষের জীবন ধারণার অন্তর্নিহিত যুক্তিবাদ বিষয়ে বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করতে থাকে। এ সব ঘটনা তো বর্তমানের তাই এর পীড়নও বেশি। জন্মের সঙ্গে নিয়তির সম্পর্ক জড়িয়ে আছে এইখানে যে, শিশু তার পছন্দ মতো পিতামাতা কিংবা তার নিজের চারপাশের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশকে বেছে নিতে পারে না। অথচ তাকে সারাজীবন ধরে এই আকস্মিক ঘটনার প্রভাব বয়ে বেড়াতে হয়, কারণ প্রায়ই এই সব সমাপতনের ফলে তার গতিবিধির সীমা নির্দিষ্ট হয়ে যায় অথবা আকস্মিক ঘটনার ফলে তার উচ্চাশা ব্যাহত হয়। অবশেষে, প্রায় প্রতিটি মৃত্যুতেই, অপূর্ণ স্বপ্ন আর অসমাপ্ত কাজের দীর্ঘ তালিকা যেন এক নিষ্ঠুর অকাল সমাপ্তির কথা বয়ে আনে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে: যদিও যুক্তি আর বুদ্ধি তাকে প্রণোদিত করে সযত্নে নিজের জীবনের পরিকল্পনা সাজাতে আর সেই কল্পনা অনুসারে কাজ করতে। তবুও দুর্ঘটনা, ব্যাধি, দুর্ভাগ্য আর প্রিয়জন বিয়োগ অপ্রত্যাশিত ভাবে তার পরিকল্পনা বিনষ্ট করে দেয়, আর শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এসে এই সবের উপর যবনিকা টেনে দেয়। অধিকাংশ মৃত্যুই বোধহীন মনে হয়, আর জীবন কখনওই মৃত্যুকে, অস্তিত্বে চরম নঞর্থকতাকে মেনে নিতে পারে না। তাই মৃত্যুতে মানুষকে দুর্ঘটনা আর আকস্মিকতাকে মেনে নিতে হয়, যখন সে এর সংস্পর্শে আসে তখন সে যে ভাষা ব্যবহার করে তা হল একে 'ভাগ্য' এই সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট করা। কারণ, অত্যন্ত বাস্তব অর্থেই এই সব দুর্ঘটনা মানবীয় প্রচেষ্টাকে যেন বিদ্রূপ করে।

আশ্চর্যের কিছু নেই যে, অধিকাংশ পুরাকথাতেই অসংখ্য নামে 'ময়রা'র অস্তিত্ব রয়েছে। নিয়তিবাদ একটি বহু প্রাচীন ধারণা; 'ময়রা' প্রাচীন দেবী এবং ক্রীট অঞ্চলের লিনিয়ার বি

লেখসমূহে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকেই 'এরিনিস'-এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গ্রিস দেশে ডেমোক্রিটাস এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, জীবনের একটি সংগত ব্যাখ্যা হল অণু-বাদ। কিন্তু সেই ইউডেমোনিয়া বা হাগেন ও মানুষের আয়ত্তেই ছিল; এবং ডাইওজিনিস লেয়টিয়স বলেছিলেন যুক্তি, ভাগ্য, হাইমারমেনে এবং জেউসের সঙ্গে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। বিধাতার ধারণা ঈষৎ পৃথক এবং ক্রিনথিয়স বলেছেন যদিও বিধাতার হাত ধরে যা কিছু আসে সবই ভাগ্যনির্ধারিত তবু এর বৈপরীত্য ঘটে না। অর্থাৎ যা কিছু ভাগ্যনির্ধারিত সবই কিন্তু বিধিনির্দিষ্ট নয়।[২] এই মতবাদ ভাগ্যের মঙ্গলময় ও অমঙ্গলকারী দুটি বিধানকে আলাদা করে দেখায়। নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী সমস্যাটি হল স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা। ক্রিসিপ্পাস উভয়ের সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বিশেষ সফল হননি। ভারতীয় সাহিত্যেও সম্পূর্ণ পূর্বনির্ধারিত রূপে নিয়তিকে একক একটি ছাঁদে ফেলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, কখনও তাকে মানুষী প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে কখনও কখনও প্রচেষ্টাকে নিয়তির সহায়ক বলা হয়েছে। এই ভাবে আমরা উত্তরবৈদিক সাহিত্যেও দেখি, কিছু কিছু রচনা যেখানে নিয়তির সঙ্গে পুরুষকার অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার প্রতি স্পর্ধা বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে এই মনোভাব আরও সুস্পষ্ট ভাবে দৃঢ় ভাবে প্রকাশিত হয়েছে সিসেরো'র *ডি ফাতো*-তে; এখানে নিয়তিবাদকে বর্ণনা করা হয়েছে নৈতিক ভাবে পলায়নপর মনোভাব রূপে। নিয়তির বিধান আর স্বাধীন ইচ্ছা এই উভয় বিষয়ে, ভারতীয় সাহিত্যে একটি সরব দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব দেখা যায়। নিয়তির বিভিন্ন রূপকে বিভিন্ন মহিমান্বিত সংজ্ঞায় ভূষিত করা হয়েছে যেমন 'ময়রা', 'হাইমরমেনে আতে', 'এরেনিস', 'নিকে', 'নেমেসিস' এবং এই রকম বহু নাম। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবকল্পনা 'ময়রা', মৃত্যুর সঙ্গে সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অন্য দিকে জন্মের সঙ্গেও তার সংযোগ রয়েছে। যে জন্ম জীবনের অপর প্রান্তসীমায় অবস্থিত, যা সম্পূর্ণ ভাবে মানুষের নিয়ন্ত্রণ রেখার বাইরে। ইলিয়াড কাব্যে 'ময়রা'র প্রাচীনতম উল্লেখ পাচ্ছি, সেখানেই সে নিয়তিনির্দিষ্ট মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত অবস্থা আর মানবিক শক্তির নৈতিক দায়িত্ব, উভয়ের মধ্যে যে সংঘাত তা সুস্পষ্ট হয়ে যায় *ওডিসি* কাব্যে, যখন জেউস বলেন যে মানুষ ভাগ্য বা দৈব নিয়ন্ত্রণের নামে যে দোষ দেয় তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, প্রকৃতপক্ষে সে তার নিজের কার্যকলাপের ফল ভোগ করে।[৩]

ভারতের প্রাচীনতম ধর্মমূলক সাহিত্য *ঋগ্বেদ*-এ অবশ্য নিয়তিবাদের কোনও উল্লেখ নেই। এ গ্রন্থ এক যুদ্ধপ্রিয় কর্মোদ্যোগী জনগোষ্ঠীর বিবরণী, যারা দৈব বা নিয়তির পরিবর্তে শক্তি আর মানুষী প্রচেষ্টা দিয়ে অর্থাৎ পুরুষকার দিয়ে বহু উল্লেখযোগ্য জয়লাভ করেছিল। এমনকী অন্যান্য সংহিতা আর ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিও নিয়তিবাদী নয়। অতিলৌকিক শক্তিসমূহ অর্থাৎ দেবতারা এই সব গ্রন্থে বিজয়ী আর্যদের সপক্ষে নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করতে যত্ন করেছেন, আর আর্যরা তাঁদের স্তুতি করেছে প্রশংসা করেছে, তাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করেছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে প্রতিটি দৈনন্দিন প্রয়োজন এবং সংকটময় পরিস্থিতির উপযুক্ত যজ্ঞের কথা সুস্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরবর্তীকালে দর্শনের যে শাখার উৎপত্তি

যজ্ঞীয় ধর্মবিধির প্রয়োজনে, সেই জৈমিনির *পূর্বমীমাংসা* গ্রন্থে এই সত্য স্বীকার করা হয়েছে যে যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলে অপূর্ব বা অলৌকিক শক্তিবিশেষ উৎপাদিত হয়, যার সাহায্যে প্রার্থিত উদ্দেশ্যসাধন করা যায়। এই ভাবে যজ্ঞ আর তার ফল, উভয়ের অন্তর্বর্তী যে মাধ্যম সেখানেই এক অদৃশ্য শক্তির ধারণা বর্তমান রয়েছে— যে শক্তি, পূর্বকালে দেবতারা যা সম্পাদন করেছেন তাও সম্পন্ন করতে পারে। এই শক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা বহির্ভূত বলা যায় না, তবে কী ভাবে যথাবিধি যজ্ঞ নিষ্পন্ন হচ্ছে তার সঙ্গেই এই শক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থে এই অপূর্ব-কে দেবতাদেরও অতিক্রমকারী শক্ত বলা যায়, এ এক বিমূর্ত অজ্ঞেয় শক্তি যা প্রকৃতপক্ষে দেবতা নিরপেক্ষ ভাবেই কাজ করে। পরবর্তীকালের নিয়তিবাদের বীজ এখানেই নিহিত, যদিও এখন পর্যন্ত এটি ব্যাখ্যাযোগ্য এবং পূর্ব-নির্ধারণযোগ্য।

আরণ্যক এবং উপনিষদ গ্রন্থাবলিতেও যথাযথ ভাবে নিয়তিবাদের কোনও ধারণা বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হয়নি। দৈব নিয়তি, ভাগ্য, কৃতান্ত, বিধিলিপি, ললাটলিখন, প্রভৃতি শব্দ এখনও অজ্ঞাত, কিন্তু বাস্তবত এই সাহিত্যে নিয়তিবাদবিষয়ক ধারণার একটি অত্যাবশ্যক উপাদান বিদ্যমান। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় পৃথিবীতে গ্রিস, রোম, চিন থেকে ইরান এবং ভারতবর্ষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। ভারতবর্ষে এই সময় বিভিন্ন তপস্বী সম্প্রদায় যথা জৈন, আজীবিক এবং বৌদ্ধদের উদ্ভব হয়; এমন আরও বহু মতবাদের অস্তিত্ব ছিল, বুদ্ধ যাদের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হন এবং প্রাচীন পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে যে সব অগণিত যোগীদের উল্লেখ আছে। দেশ তখন বিবিধ মতবাদ সমন্বিত তপস্বীর দলে পূর্ণ ছিল। সনাতন বৈদিক ধর্ম থেকে তাদের পার্থক্যের মূল কারণ ছিল বেদ ও যজ্ঞবিধিতে তাদের অবিশ্বাস। *মুণ্ডক উপনিষদ*-এর প্রাচীন গ্রন্থেও আমরা শুনি যে যজ্ঞ হল অনির্ভরযোগ্য তরণী।

কিন্তু এই মনোভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই দেশের ধর্মীয় বাতাবরণে কিছু ঘটনা ঘটেছিল। লৌহ-হলমুখের প্রবর্তনের ফলে, বৃহৎ বৃহৎ ভূখণ্ড কর্ষণ করা সম্ভব হচ্ছিল। ইটের কাঠামো গড়ে তোলার মতো বাস্তুবিদ্যার জ্ঞান প্রচলিত হয়েছিল, তাই ভবিষ্যৎ দুর্দিনের অপেক্ষায় অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চয় করা সম্ভব হচ্ছিল। আর্য-আগমনের পরবর্তী কয়েক শতক-ব্যাপী নিষ্ক্রিয়তার পরে, মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক পুনরায় শুরু হয়েছিল, ফলে খাদ্যের উদ্বৃত্ত এবং কুটিরশিল্পের সম্ভার সমাজের শীর্ষস্থিত কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সব মানুষ কৃষক ও শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানকে নিম্নতমহারে বেঁধে দিয়ে তাদের শ্রমকে কাজে লাগাত। বর্ষপঞ্জির হিসাব পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে, কৃষিকাজ অনেকাংশে নিশ্চিত ভাবে করা সম্ভব হয়েছিল। এবং, যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বন্যা, খরা, পঙ্গপাল, ইত্যাদির উৎপাত বাদ দিলে কৃষিতে উৎপাদিত ফসল অনেকটাই নিশ্চিত ছিল। রেশম সড়ক অনুসরণ করে বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছিল এশিয়ার অন্যান্য অংশে এবং মুদ্রার প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবহার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যবিধি অনেকাংশে নিরাপদ

ভিত্তি পেয়েছিল। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, এই সবের ফলে প্রত্যক্ষ উপকৃত হয়েছিলেন ধনী, বণিক, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়েরা আর পরোক্ষ ভাবে ব্রাহ্মণেরা। এবং এর ফলে প্রত্যক্ষ ভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল এক বৃহত্তর জনসংখ্যা, যারা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদক: দরিদ্র, বেশ্যা, চাষি আর অগণ্য শূদ্র। তাদের পক্ষে জীবন হয়ে দাঁড়াল প্রকৃত অর্থে এক অভিশাপ। তাদের জন্য এক ধর্মতত্ত্ব প্রতি-উদ্ভাবন করা হল, যেখানে বলা হল জীবন এক অবিমিশ্রি অভিশাপ, যেখান থেকে সকলেরই মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। পূর্ববর্তী কালে *ঋগ্বেদ*-এ যে মনোভাব দেখা গিয়েছিল, যেখানে জীবনকে বলা হয়েছে মধুর এক প্রার্থিত বস্তু, একে কামনা করা হয়েছে। এর দীর্ঘ স্থায়িত্ব উপভোগ করতে চাওয়া হয়েছে পূর্ণ ভাবে, এখন দেখা গেল তার চরম বৈপরীত্য এখানে জীবনকে বলা হল অশুভ এক শৃঙ্খল যা পুনরাবৃত্ত হতে থাকে, চরম শান্তি ও মোক্ষলাভের আগে মানুষকে তার থেকে মুক্তি পেতে হবে।

কর্মবাদের তত্ত্ব অনুসারে প্রতিটি কর্মের একটি সমান এবং আনুপাতিক ফল উৎপন্ন হয় যা ইহজন্মে অথবা পরজন্মে ভোগ করতে হয়— তা ভাল মন্দ যাই হোক, এই তত্ত্ব বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল জন্মান্তরবাদের। সম্ভবত জীবনের অসঙ্গতিগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য মানুষ আজ পর্যন্ত যে সব সমাধান চিন্তা করেছে এটিই তার মধ্যে চতুরতম; সে দিনেও এই মতবাদ উল্লেখযোগ্য ভাবে সার্থক হয়েছিল এবং আজকের দিনেও এই মত সার্থক।

বহু যোগী গোষ্ঠী এই 'কর্মফলবাদ'-কে নাকচ করেছেন এই বলে যে সৎকর্ম এক প্রকার উপলব্ধি নিয়ে আসে যা মোক্ষলাভের সহায়ক; কেউ কেউ, যেমন আজীবিকরা মনে করেছিলেন মানুষ যে কর্মই করুক না কেন, চুরাশি লক্ষ জন্মের পর মোক্ষ অবশ্যই আসবে অথবা আসবে না। যাই হোক, প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলি কর্ম ও জন্মান্তরবাদের তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিল। এই সময়ের কাছাকাছি, স্বর্গ ও নরকের তত্ত্বও দ্রুত বর্ধিত হয়েছিল যার ফলে পদানত নিম্নবর্গের ভবিষ্যৎ-চিন্তা হয়েছিল আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন। ধনীর লক্ষণীয় ভোগময় জীবনের প্রক্ষেপণ ছিল স্বর্গের দৃশ্য, যা সমসাময়িক নূতন সমৃদ্ধির সহগামীরূপে কল্পিত হয়েছিল। অপরপক্ষে নরক ছিল সেই সব অত্যাচার কুঠুরির দৃশ্য প্রক্ষেপণ, যেখানে নূতন সব শক্তির অধিকারী শাসকবৃন্দ সামাজিক ও রাজনৈতিক অপরাধীদের নিক্ষেপ করতেন। উভয়প্রকার কল্পনার মূলেই ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা— ফলে মানুষের কল্পনার উপর এর সবল নিয়ন্ত্রণ থাকত।

যদিও তত্ত্বগত ভাবে মানুষই তার নিজ ভাগ্যের রূপকার, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সে তার পরিবেশের শিকার এবং সে নিজেকে বিশেষ বিশেষ বন্ধনে শৃঙ্খলিত বলেই অনুভব করেছে যে শৃঙ্খল তার ইচ্ছাকে প্রায়ই স্বাধীনতা দিত না। মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা, আর বস্তুগত প্রয়োজনের চাহিদা তার বাস্তব জীবনে খুব বেশি স্বাধীন নির্বাচনের সুযোগ রাখত না। সাধারণ মানুষের কাছে জীবন সত্যই ছিল এক অভিশাপ। তাই বর্তমান জীবনের অপ্রীতিকর অবস্থার পুনরাবৃত্তি রোধ করে পরবর্তী জীবনে অপেক্ষাকৃত উন্নতির মুখ দেখার জন্য মানুষ সব কিছুই করতে রাজি থাকত।

এখানে আমরা আরও মনে করতে পারি যে উত্তরবৈদিক যুগের শেষাংশে, অর্থাৎ সংহিতা সমূহের প্রামাণ্য সংকলনে যখন *অথর্ববেদ*-এর স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল তখন ধর্মের ক্ষেত্রে মূল ধর্মধারা ক্রমে প্রধান হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, ইত্যাদি প্রতিবাদী ধর্মগোষ্ঠী এই প্রত্যন্ত ধর্ম ধারাকে অধিকতর সুস্পষ্ট, কুণ্ঠাহীন ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এমনকী ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে *অথর্ববেদ*, পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ সমূহের মধ্যে কিছু কিছু উপাদান দেখা যায়, যেখানে ওঝাদের জাদু আর ঝাড়ফুঁক প্রান্তিক ধর্মধারার এক বলিষ্ঠ পুনরুত্থানের সংকেত পেয়েছে। মূলত প্রাণবাদী জগৎ তত্ত্বে বিশ্বাসী এই ধর্মধারার মতে মানুষের চারদিকে আছে আত্মা, যক্ষ, দানব, দৈত্য, পরী, ইত্যাদি। এই সব অধিষ্ঠাত্রী আত্মা সহজেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং একবার ক্ষিপ্ত হলে তারা ক্ষমাহীন ভাবে প্রতিশোধ নিতে থাকে। সুতরাং পবিত্র ভাবে জীবনযাপন করা দ্বিগুণ ভাবে কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। যদি কেউ তার নিজস্ব বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করে যায় এবং দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে চলার আপ্রাণ চেষ্টাও করে তবু সহজেই সে এই সব অতিলৌকিক আত্মা, প্রভৃতির খেয়ালখুশির বা আক্রমণের শিকার হতে পারে। এই ভাবে অবাঞ্ছিত ভাবেও মানুষ তার চারিদিকে শক্তিমান অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ করে বসতে পারে। তাই জীবন মানুষের কাছে এক অন্তহীন দুঃখ। তার এই দুর্দশার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ধর্মতত্ত্ববিদরা একটি মার্জিত তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষ তার পূর্বজন্মের স্বকৃত কর্মেরই ফল ভোগ করে থাকে। স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হল এই যে, পরবর্তী জীবনে অনুরূপ দুঃখকে এড়িয়ে চলার জন্য মানুষ অনপরাধী হয়ে জীবনযাপন করবে। এবং ভারতবর্ষে যেমন অন্যান্য দেশেও অপরাধশূন্য ভাবে বেঁচে থাকার অর্থ হল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অনুশাসকদের কোনও রূপ বিরক্তি উৎপাদন না করা। সাধারণ মানুষ তার নিজের কোনও কৃতকর্মকে যখনই ফলের সঙ্গে মেলাতে না পারে, তখনই তার নাম দেয় 'অ-দৃষ্ট'— যাকে দেখা যায় না, অর্থাৎ নিয়তি। এই ভাবে জানা এবং অজানা শক্তিগুলির সন্তোষ বিধান করা তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, সে ভাগ্যের চরম আধিপত্যকে স্বীকার করে নেয়।

পরবর্তী যুগের বেদাঙ্গ সাহিত্যে ভাগ্যকে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; জীবনের অসংখ্য দুঃখের আকারে এই ভাগ্যের নানা প্রতিমূর্তিকে গণনা করা হয়েছে; এবং এর বিরূপতাকে প্রশমিত করার জন্য নানা গৌণ নূতন নূতন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক প্রকার সম্পূর্ণ নূতন সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয়েছে— এটা 'প্রায়শ্চিত্ত'— সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে কৃত অপরাধের জন্য, সুস্পষ্ট ভাবে সীমারেখা লঙ্ঘন করা বা ছোটখাট অনুষ্ঠানগত ত্রুটি বা শৈথিল্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত। বেদাঙ্গ সাহিত্যের শেষ ভাগে আর একটি সহায়ক সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছিল, তা হল 'শ্রাদ্ধকল্প' এবং 'প্রেতকল্প', এখানে মৃত পূর্বপুরুষদের পরলোকে উন্নীত করার জন্য বিধিনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সব আনুষঙ্গিক শাস্ত্র এই জন্যই গড়ে উঠেছিল যে, অন্ত্যেষ্টি ও শবানুগমন সংক্রান্ত এই সব অনুষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য ছিল মৃত আত্মার সুখ নিশ্চিত করা এবং এই সব অনুষ্ঠান ও তার ফলসমূহ পরলোকের অজানাকে

স্পর্শ করতে চায়; সুতরাং এখানে অজ্ঞ জনসাধারণকে কিছুটা জোর করেই যেন ভাবতে বাধ্য করা হচ্ছে যে যদি এই সব অনুষ্ঠান যথাযথ পালন না করা হয় তবে তাদের প্রিয়জন পরলোকে কষ্ট পাবে। সমাজে প্রচলিত নিয়তিবাদী ধারণার এটি অন্যতম ফল।

একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, এই যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে যে অপরাধী সেই কিন্তু সন্তোষবিধায়ক ব্যক্তি নয়; সুতরাং মৃত স্বজনের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত পানভোজনের মতোই এই সন্তোষবিধান কল্পনালব্ধ বা পরোক্ষ। স্বজনবিয়োগে কাতর জীবিত আত্মীয় এখানে তার মৃত প্রিয়জনের সেবা করতে পেরে সন্তুষ্ট হন এবং অনুষ্ঠানকারী পুরোহিতের পক্ষে এখানে যথেষ্ট দক্ষিণা পাওয়া সম্ভব হয়। পুরাণগুলিতে যে শ্রাদ্ধের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে পুরোহিতদের যথাযথ দক্ষিণা প্রাপ্তির এবং তাদের প্রাপ্য দ্রব্যাদির গুণ ও পরিমাণ বিষয়ে যে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা কেবল আকস্মিক নয়। এই ভাবে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে অজানা ভয়কে কাজে লাগিয়ে পুরোহিতেরা নিজের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলতেন আর সাধারণ মানুষের ধর্মাচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করতেন। এই ভাবে মৃত ব্যক্তি নয়, পরলোকে মৃত ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে জীবিতের উদ্বেগকেই কাজে লাগানো হয়েছিল, এবং অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ অবস্থানের সম্পর্কিত চিন্তাই সমাজ থেকে তার প্রাপ্য নিষ্কাশন করে নিত।[৪]

মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে, লোকপ্রিয় এই সব শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এক নূতন স্তরে, হিন্দুত্বের চরম গঠনমূলক স্তরে প্রবেশ করি। ইতোমধ্যে, বৈদিকযুগের যজ্ঞনির্ভর ধর্ম থেকে সমাজ বহু দূরে সরে এসেছে। যদিও রাজা এবং ধনবান পৃষ্ঠপোষকরা তখনও যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন, তবুও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বেই জনসাধারণ এই সব যজ্ঞমূলক ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিরপেক্ষ দর্শকের পর্যায়ে নেমে এসেছিল, কারণ এই সব যজ্ঞব্যয়ের ভার বহন করা যেমন তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না তেমনই এগুলি ছিল দুর্বোধ্য। কৌমগত সমাজবিধি ভেঙে যাওয়ার ফলে প্রাচীন ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল; মুখ্য সমষ্টিগত যজ্ঞগুলি হত রাজাদের ও সমাজ প্রধানদের জন্য এবং তাঁদের দ্বারাই এগুলি অনুষ্ঠিত হত। গুপ্ত আধ্যাত্ম রহস্যের জ্ঞান-যোগে মোক্ষলাভ— উপনিষদের এই মতবাদ ছিল সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং তাদের আশ্রয়যোগ্য মতবাদ অতি অল্পই ছিল; এই শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে এল মহাকাব্য পুরাণের যুগের প্রকাশমান ধর্ম যার নাম হিন্দু ধর্ম। এই ধর্ম তার মূল ভিত্তি করে গ্রহণ করেছিল কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের তত্ত্বকে।

সাধারণলোকের মধ্যে নিজেদের ধর্মীয় তত্ত্বকে ফলপ্রসূ ভাবে প্রচারের জন্য মহাকাব্য ও পুরাণগুলি, পুরাকথা কিংবদন্তী ও নানাবিধ আকর্ষণীয় গল্পের অবতারণা করেছিল। *মহাভারত* থেকে নেওয়া এমন একটি গল্পকে বিচার করা যাক (ত্রয়োদশ-১):

> *গৌতমীর* পুত্র সর্পাঘাতে মারা গেল। সে তার সন্তানের অকালমৃত্যুর জন্য সাপকে দোষারোপ করল। সাপ তা অস্বীকার করল এই বলে যে ওই বালকের সময় পূর্ণ হয়েছিল, অতএব দোষ কালের। কাল শব্দের অর্থ সময় এবং মৃত্যু উভয়ই। অভিযুক্ত হয়ে কাল তখন বললেন তিনি নিমিত্তমাত্র, বালকের পূর্বজন্মার্জিত নিজকর্মই তার মৃত্যুর সময় ও উপায় নির্ধারণ করেছে।

সুতরাং চরম বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের নিজ কর্মই তার জন্ম ও মৃত্যুর কারণস্বরূপ। কাল, অন্তক, যম এঁদের সবাইকেই, ভিন্ন ভিন্ন অংশে বলা হয়েছে ধর্মরাজ।[৫] অর্থপূর্ণ ভাবেই এই যুগে দেখা যায়, এই সব কল্পিত শক্তির কাছে দেবতারাও নতিস্বীকার করছেন। উদাহরণরূপে বলা যায় *ভবিষ্য পুরাণ*-এ দেখা যাচ্ছে বিষ্ণু, কালের আজ্ঞাবহ রূপে কাজ করছেন।[৬] এক কথায় কাল এবং অন্তক রূপে যম হয়ে দাঁড়িয়েছেন ন্যায়বিচার ও পাপের শাস্তি বিধানের প্রতিভূ।[৭] কিন্তু মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে যে অনির্দেশ্য ক্ষমতা তা মৃত্যু নয়, নিয়তি; মূল ধর্মধারা এবং প্রান্তিক ধর্মধারা উভয়ই একে সে ভাবেই স্বীকৃতি দিয়েছে। মহাকাব্য ও পুরাণে গল্পের পর গল্প এই নিয়তির অনির্দেশ্যতা ও অনিবার্যতার কথা শুনিয়েছে।

আলোচ্য সময়ে রচিত বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাবলিতে, বিশেষ করে *জাতক* ও *অবদানশতক*-এ, পুনর্জন্মের বহু কাহিনি দেখা যায় যেখানে কোনও ব্যক্তিকে তার ইহজন্মের কাজের ফল হিসাবে পরজন্মে উন্নত বা অধোগামী অবস্থায় জন্ম নিয়ে পুরস্কার বা শাস্তিভোগ করতে হয়েছে। মহাকাব্যগুলিও এই প্রকার বিবরণে পূর্ণ। মুখ্য চরিত্রগুলির বিষয়ই হোক আর গৌণ চরিত্রের বিষয়েই হোক কেবল কর্মফলবাদের তত্ত্বই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যাই হোক কর্মফলের মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ফল আছে, অস্পষ্ট ভাবে হলেও একে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এ বিষয়ে পূর্বাভাস দেওয়া যায় সুতরাং একে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়তির সমান সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কিন্তু আবশ্যিক ভাবে এটি নিয়তিবাদেরই জন্ম দেয়। এটা কী ভাবে হয়?

কর্মফলবাদের তত্ত্ব এই বিধান দেয় যে, প্রতিটি কাজের একটি সমান বা সামঞ্জস্যপূর্ণ ফল পাওয়া যায়— সে ফল ভাল হতে পারে, মন্দও হতে পারে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সেটি এ জন্মে অথবা পরজন্মে ভোগ করেন। কিন্তু কখনওই এই মতবাদে কোনও বুদ্ধিমান বিচারক বা নিয়ন্তার অস্তিত্বের স্বীকৃত নেই যিনি স্থির করবেন কোন কাজের কী ফল হতে পারে।[৮] বৌদ্ধ, জৈনশাস্ত্রে, ব্রাহ্মণ্য মহাকাব্য ও পুরাণে কাহিনির পর কাহিনিতে বর্ণনা করা হয়েছে কর্ম ও তার ফলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কল্পিত কারণাত্মক বন্ধনের কথা। এই সব গল্পে কল্পনা ও আবিষ্কার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে গুণ যথাযথ সমানদর্শিতা বা অবিকল প্রতিরূপের বিকল্প নয়, যা থাকলে এই কর্মফলবাদ যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারত। এই সব গল্পগুলি পড়লে বোঝা যায় এই তত্ত্বে প্রচুর অসংগতি এবং বৈষম্য রয়েছে, কারণ প্রায়ই দেখা যায় একই ধরনের কাজে বিভিন্ন ফল হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সম্ভবত বৌদ্ধ গল্পসাহিত্যে অধিকতর সামঞ্জস্য বা ঐক্য দেখা যায়। সৎকর্ম ও অসৎকর্ম বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনীগুলি মনে হয় আরও বেশি বর্ণময় ও রোমাঞ্চকর। কিন্তু, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি সঙ্গতিপূর্ণ এবং একই প্রকারের সমীকরণের রীতি গড়ে তুলতে এগুলি ব্যর্থ।

সুতরাং পরিকল্পনাবহির্ভূত ভাবে কিছু ঘটার সম্ভাবনা থেকেই যায় এবং বোধসীমার বাইরে অবস্থিত অনির্দেশ্য শক্তিকে বলা হয়ে থাকে 'অ-দৃষ্ট'— ভাগ্যের একটি প্রতিশব্দ।

মহাকাব্য ও পুরাণের গল্পগুলি আশীর্বাদ এবং অভিশাপের উপাখ্যানের মাধ্যমে ভাগ্যের ক্রিয়াকলাপকে স্পষ্ট করে দেখায়। কোনও ব্যক্তি, কোনও সাধু, ছদ্মবেশী দেবতা অথবা শুধুমাত্র কোনও বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি ভাল ব্যবহার করে। পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে সেই উপকৃত ব্যক্তি উপকারীকে সৌভাগ্যের দীর্ঘ জীবন, রোগমুক্তি, নিঃসন্তান ব্যক্তির জন্য সন্তানলাভ, সম্পদ, স্বর্গসুখ বা অন্য আনন্দের বর দান করে। অথবা কোনও ব্যক্তি যদি কোনও নির্দোষের ক্ষতি করে, সে তাকে কোনও বিপদ, ক্ষতি, অঙ্গহানি নরকবাস বা অন্য কোনও দুঃখের অভিশাপ দেয়। এই সব আশীর্বাদ বা অভিশাপ এই জন্মে অথবা পরজন্মে সফল হয়। আবার এগুলি, বিশেষ করে অভিশাপ অনেক সময়ই সংশোধিত, সীমিত, লঘুকৃত বা বিলম্বিত করা হয়, যদি শাপদাতাকে সকাতর অনুনয়ে সদয় করা যায়। এই সব ঘটনাতে দেখা যায় শাপ বা বর একবার উচ্চারিত হলে এক বিচিত্র রহস্যময় নিজস্ব শক্তি তাতে সঞ্চারিত হয়। যেমন যথাবিধি অনুষ্ঠিত যজ্ঞের মাধ্যমে 'অপূর্ব' জন্ম নেয় তেমনই শাপ বা বরের মাধ্যমে সঞ্জাত শক্তিও অপ্রতিরোধ্য। এ যেন জ্যা-মুক্ত তীরের মতো; কিন্তু কদাচিৎ একে ঈষৎ পরিবর্তিত করা যায়। এই সম্ভাবনা অভিশপ্ত ব্যক্তিকে, সেই সব ব্রাহ্মণ বা ঋষি, যাঁরা কখনও তপোবল কখনও বা যথাবিহিত ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা রাখেন, তাঁদের কাছে ত্রস্ত বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে এই রূপ অভিশাপ বা বরপ্রাপ্তি অনেক অংশেই বোধের অতীত ভাগ্যের লীলা, ছদ্মবেশী দেবতা বা ঋষিদের দ্বারা এগুলি উচ্চারিত; তাই অনুরূপ ফল দিয়ে থাকে। এই সব বর বা শাপের শব্দগুলি, মানুষের মুখে উচ্চারিত হলেও এগুলি প্রকৃতপক্ষে অতিলৌকিক শক্তি সমন্বিত, দৈবী হস্তক্ষেপের একটি মাধ্যম। প্রায়ই শাপগুলি অপ্রত্যাশিত হয়ে থাকে। এগুলি কোপনস্বভাব ঋষিদের অন্যায্য, অযৌক্তিক ক্রোধ ও অহঙ্কারের প্রকাশ। এই সব সময়ে, সেগুলিকে কেবলমাত্র ভাগ্য বলেই মেনে নেওয়া সম্ভব, কারণ এই সবের পিছনে যে সব ভ্রান্তি বা কর্তব্যচ্যুতি থাকে তার অনুপাতে অভিশাপগুলি খুবই সঙ্গতিহীন অনিশ্চয়তা, আঘাত ও বিস্ময়ের এই সব উপাদান এই সব অভিশাপকে তাই অপরাধীর আয়ত্ত বহির্ভূত এক অনির্দেশ্য শক্তির, ভাগ্যের বহিঃপ্রকাশেই পর্যবসিত করে।

যদিও কর্মফলবাদ সম্পূর্ণ ভাবে ভাগ্য নির্ভর নয়, তবুও কার্যক্ষেত্রে এটি অনিবার্য ভাবে নিয়তিবাদী রূপ ধারণ করে। দেখা যাক, কী ভাবে তা হয়।

উপনিষদ ও পুরাণ-এর এই মধ্যবর্তী সময়ে, ভারতবর্ষের ধর্মমতগুলি এক বিশেষ অপরিণত অবস্থায় ছিল; ভারতবর্ষে কোনও সংগঠিত ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মপ্রতিষ্ঠান ছিল না। প্রাথমিক বৈদিক ধর্মে ছিল ধর্মমত ও অনুষ্ঠানের মধ্যে এক প্রকার সংযুক্তি গঠন করার মতো প্রয়োজনীয় মতবাদের সামঞ্জস্য। এর কারণ অনেকটাই এই প্রকার যে, ধর্মমতের অনুগামী সমাজের প্রকৃতি ছিল মূলত গোষ্ঠী নির্ভর এবং একটি অপেক্ষাকৃত দৃঢ় সংবদ্ধ সমাজ এখানে একত্রে পুরাকল্প ও ধর্মানুষ্ঠানকে অনুসরণ করত। এই বিশাল উপমহাদেশে দূরবর্তী প্রান্তে এই ধর্মমত বিস্তার লাভ করার পরে যখন জাতিসংকর সৃষ্টির ফলে এই ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐক্যের মধ্যে

বিভেদ দেখা দিল এবং পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক সংগঠনগুলি অভ্যুত্থানের ফলে গোষ্ঠীনির্ভর সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, তখন এই প্রকার ধর্ম তার উৎপত্তির যথার্থ উদ্দেশ্য হারাল। প্রধান যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান করতে লাগলেন রাজা ও সমাজ প্রধানরা। পারিবারিক সংগঠনগুলি গৌণ ধারার গৃহ্য অনুষ্ঠান ও মঙ্গলাচরণকে আশ্রয় করল। এই গৌণ ধারা এই সময় পুনরুজ্জীবিত হল বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য মতের মাধ্যমে। এই গৌণ ধারার অন্তর্নিহিত সর্বপ্রাণবাদ মূল ও গৌণ ধর্মধারাকে বিভিন্ন প্রকার প্রেত ও আত্মার তত্ত্বে ভরিয়ে তুলল।

কর্মফলবাদের অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়ভাবের ফলে স্বর্গ নরক সংক্রান্ত তত্ত্ব ছিল চূড়ান্ত ভাবে পৃথক। মানুষের মৃত্যুর পরে তার পরিণতি কী হয়? যদি সে পবিত্র জীবনযাপন করে থাকে আর পূর্ব জন্মের পাপভার মোচন করে থাকে, তবে সে:

(ক) হয় স্বর্গে যায়; অথবা (খ) সুখী আনন্দময় পরিবেশে পুনর্জন্ম লাভ করে অথবা (গ) নরকে যায়; সেখানে অল্পকাল যন্ত্রণা ভোগের পর স্বর্গপ্রাপ্ত হয়; (ঘ) যদি পার্থিব বন্ধন আর বাসনা মুক্ত হতে পারে তবে সে ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।

যদি সে দুষ্ট, পাপী জীবনযাপন করে থাকে, তবে সে:

(ক) এই ঘৃণ্য দুষ্ট আত্মায় পরিণত হয় এবং ঊর্ধ্বলোকে ঘুরে বেড়ায়; (খ) স্বর্গে যায় ও অল্প কিছুদিন তার প্রাপ্য সামান্য সুখ ভোগের পর নরকে নিক্ষিপ্ত হয়; এবং (গ) পরজন্মে এক অকাম্য হতাশাজনক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই সব জটিলতা দ্বিগুণ হয়ে পড়ে, কারণ:

(১) ভাল ও মন্দের বিধিগুলির অস্থিতিশীল ভাব কারণ ভারতবর্ষ কখনওই ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে নীতিবাদ চর্চা করেনি; (২) কোন কাজের কোন প্রতিফল হবে সে বিষয়ে সমপূর্ণ অনিশ্চয়তা; (৩) একজন পক্ষপাতহীন সর্বজ্ঞ বিচারক যিনি নিরপেক্ষ ভাবে শাস্তি আর পুরস্কার দেবেন তাঁর অভাব; (৪) পারলৌকিক জগতের হস্তক্ষেপ এবং সর্বশেষে শাপ ও বর যদিও তার প্রাপকের আচরণ অনুসারেই নেমে আসত, তবু প্রায়ই সেগুলি অপ্রত্যাশিত আর অসঙ্গত। এইগুলি যাঁরা নিতেন তারা ভাগ্যের প্রবক্তা রূপেই কাজ করতেন।

কোনও ব্যক্তির কর্মফলের বিবিধ বিকল্প কোথাও নির্দিষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি এবং তার উৎপাদক কাজের সঙ্গে সঠিক ভাবে তার সম্পর্কও নির্ধারণ করা হয়নি। বৈদিক যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠান করলে 'অপূর্ব' উৎপাদিত হয় এবং এই অপূর্ব কাম্যবস্তুর জনক। কিন্তু 'কর্মফলবাদ' অ-পূর্ব তত্ত্বের চেয়েও অনিশ্চিত, অবোধ্য। তত্ত্বগত ভাবে তাই বৈদিক ধর্মতত্ত্বের উপলব্ধি পৌরাণিক হিন্দু 'কর্মফলবাদ'-এর চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়। এই যুগের নিয়তিবাদতত্ত্বের অন্তর্নিহিত বিশৃঙ্খলা অবশ্য এই যুগের ধর্মীয় বাতাবরণের পক্ষে কেবল যথাযথ নয়, এমনকী, অপরিহার্য ছিল।

জ্যোতিষবাদের চর্চাও এই যুগে নিয়তিবাদের বিকাশকে সাহায্য করেছিল। জ্যোতিষীদের সম্পূর্ণ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল এবং এই ছদ্মবিজ্ঞান সাধারণ মানুষকে যথেষ্ট গভীর ভাবে ভীত ও প্রভাবিত করেছিল। এর উৎপত্তির অন্যতম কারণ ছিল গ্রহ-নক্ষত্রের উপর দেবত্ব

আরোপ করা এবং মানুষের ভাগ্যেরউপর তাদের গতিবিধি অবস্থান ও প্রভাব সম্পর্কে সমীহপূর্ণ বিচার। যতক্ষণ পর্যন্ত মানবজীবনে প্রায় কোনও কিছুই অব্যাখ্যাত রইল না ততক্ষণ এই ভাবে অক্লান্ত বিচার চলতে লাগল। প্রত্যেকটি দেশেই জ্যোতিষের চর্চা হত। কারণ মোটামুটি ভাবে ধারণা করা যায় যে দৈনিক জীবনযাত্রা ও বিশ্বাসের সঙ্গে এর কিছু কিছু সম্পর্ক রয়েছে। এই সমীক্ষার থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির সঙ্গে মানব জীবনের নিমিত্তগত সম্পর্ক রয়েছে, যদিও সিদ্ধান্তটি সমর্থনযোগ্য নয়। কালক্রমে ভারতবর্ষে জ্যোতিষ্ক নামাঙ্কিত বিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হল এবং রাজধানী, দুর্গ, কোষাগার, নগর তোরণ, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এগুলি প্রতিষ্ঠিত হল। এই সব দেবতার পূজার বিধি সম্বলিত শাস্ত্র তাদের বিশেষ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং ভক্তদের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুত বরদানের ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে লাগল।[১০]

বঙ্গ দেশে শনিপূজার সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাব ঘটেছে প্রায় এক দশক আগে। এই অশুভকারী দেবতার ছোট একটি ছবি, থালাতে ফুল, ইত্যাদি উপাচারে সাজিয়ে একটি ঠেলাগাড়িতে রাখা হয়। মানুষ প্রণাম করে আর থালাতে প্রণামী দেয়। এই ধর্মানুষ্ঠানটির সুস্পষ্ট এক আর্থসামাজিক মূল্য রয়েছে। কারখানার শ্রমিকদের একটি বৃহদংশই অস্থায়ী শ্রমিক, তাই কাজ হারাবার আশঙ্কায় তারা সর্বদাই ত্রস্ত— যাকে পুরাকল্পের ভাষায় বলা হয় 'শনির অশুভ দৃষ্টির সামনে পড়া'। এই অতি বাস্তব বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে স্বভাবতই তারা শনিকে পূজা করতে প্রলুব্ধ হয়। এই সমস্ত বিষয়টিরই এক প্রকৃত অমঙ্গলজনক ও করুণ এক তাৎপর্য রয়েছে; তা হল এই সব শ্রমিকদের মাইনে শনিবারেই হয়ে থাকে, আর এই ভীতিপ্রদ দেবতাটির কোপ থেকে মুক্তি পেতে তারা আতঙ্কিত ভাবে দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। এই ভাবে যে বিপদ অর্থাৎ ব্যয় সংকোচের বিরুদ্ধে এক সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতার মাধ্যমে প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল তার বিরুদ্ধে দেখা যাচ্ছে এই শান্তিচুক্তির ব্যবস্থা, যার ব্যয়ভার বহন করা এই দরিদ্র শ্রমিকদের পক্ষে কঠিন। অন্যান্য গ্রহদেবতারা জীবনের অন্যান্য নিরাপত্তাহীন ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং নিজ নিজ দক্ষিণা আকর্ষণ করেন, যা মন্দিরের কোষ পূর্ণ করে অথবা যে দক্ষিণার গতি হয় পুরোহিতের থলিতে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সব গ্রহদের ঘিরে বিশদ পুরাণ কথা আর স্তোত্র, ইত্যাদি গড়ে উঠেছে, কারণ, এই সব দেবতার নিয়ন্ত্রণে যে আতঙ্কের উদ্রেক হয় তা এক অর্থে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। যে মানুষ দুর্দশার হীন গ্লানিতে ডুবে আছে তার বিরুদ্ধ মনোভাব আর প্রতিবাদ, প্রকৃত যে শত্রুর বিরুদ্ধে হওয়ার কথা সেই উৎসবে তাকেই সযত্নে আড়াল করে রাখা হয়েছে; পুরোহিত এবং শাস্ত্রকাররা এর প্রকৃত লক্ষ্যকে লুকিয়ে রাখছে। এই ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান আন্দোলনকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং ফলস্বরূপ সাময়িক ভাবে হলেও বিকাশের পথ রুদ্ধ হচ্ছে।

মহাকাব্য ও পুরাণ যুগের ধর্মমতে 'কর্মফলবাদ' জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব ছাড়াও বহু নূতন বেদ-পরবর্তী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্যে আছে মন্দির, বিগ্রহ, তীর্থ, সংকল্প, শিবের মতো

পবিত্রাতার স্বরূপ কল্পনা; বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের রূপ পরিকল্পনা; পরিবারগত পুরোহিতের মাধ্যমে পূজাপ্রথা এবং পারিবারিক বিগ্রহের প্রবর্তন; এবং আবহাওয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাব তত্ত্ব। আধ্যাত্ম জীবনে আশঙ্কার প্রসার হল, সামগ্রিক ভাবে ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যে অবহেলার ফল কী হতে পারে এই সংশয়; অথবা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মন্দিরে অধিষ্ঠিত বা পারিবারিক দেবতার প্রতি অবহেলা কিংবা ঈশ্বর ও সাধারণ মানুষের মধ্যস্থ যে পুরোহিত বিশেষ গৌরবভাজন তাঁর প্রতি অবহেলা, ইত্যাদির ফল নিয়ে আশঙ্কা। অন্তরীক্ষে অবস্থিত অদৃশ্য সব শক্তি— দানব, অতৃপ্ত প্রেতাত্মা আর অতৃপ্ত আত্মারা, এঁরা সকলেই মানুষের শান্তি আর সুস্থতাকে বিঘ্নিত করতে পারতেন। আবার অনিচ্ছাকৃত ভাবে সাধুদের কাছেও মানুষ অপরাধী হয়ে পড়ত এবং ইহ বা পরজন্মে অভিশাপগ্রস্ত হত। পুরাণগুলিতে বহু কাহিনি এ বিষয়ে সংযোজিত হল: বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মন্দিরের পুরোহিতবর্গ ছিলেন এ সবের রচয়িতা। তাঁরা বিভিন্ন মতবাদের আনুষ্ঠানিক বিধি প্রবর্তন করলেন এবং সম্ভাব্য সর্বপ্রকার দুঃখদুর্দশার প্রতিকারমূলক অসংখ্য নৈতিক কর্তব্য, সম্প্রদায়গত ভাবে এবং ঋতু-অনুযায়ী নির্ধারণ করলেন; এমনকী প্রায়শ্চিত্ত বিধিরও ব্যবস্থা করলেন।

এই প্রকার ধর্ম এক দিকে সর্বপ্রকার গার্হস্থ্য ও সামাজিক প্রথার দায়িত্ব নিয়েছিল এবং সেগুলির জন্য আচার অনুষ্ঠানের বিধান দিয়ে সন্দেহ এবং অপাত্রে দান হ্রাস করেছিল, অন্য দিকে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাত্রাকে অসংখ্য অনুষ্ঠানের জন্য দায়বদ্ধ করেছিল। বৈদিক শ্রৌত ও গৃহ্যকর্মের একত্রীকৃত তালিকার চেয়েও এই সব প্রথার সংখ্যা অনেক বেশি। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত পৌরোহিত্য করতেন এবং এ জন্য তিনি দক্ষিণা পেতেন। অবশ্যই এই সব উচ্চবর্ণের স্বার্থেই অজ্ঞ সাধারণ মানুষকে বিশদ ভাবে বোঝানো হত যে, ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ ভাবে দুর্জ্ঞেয়। কারণ তা হলেই যে সব বাস্তব ও কাল্পনিক বিপদ চারদিকে ঘনিয়ে রয়েছে, যে সব আত্মারা, আশেপাশে আক্রমণের অপেক্ষা করছে তারা মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ধ্বংস করতে চাইছে। সেই সব বিপদের প্রতিষেধক অনুষ্ঠান করার জন্য আরও আরও বেশি দক্ষিণা আদায় করা যাবে।[১১] পূর্বজন্মের যে সব অভিশাপ ইহজন্মে ফল দিচ্ছে অথবা ইহজন্মের যে সব অজ্ঞানকৃত অপরাধ পরজন্মে কষ্ট দেবে সেই সব দূর করার জন্য পুরোহিতেরা পারিশ্রমিক পাবেন।[১২] এই ভাবে ভাগ্যের এক প্রধান শক্তির প্রকাশ হল অভিশাপ। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যেও অনুরূপ চিন্তাধারা দেখা যায়। হোমারের লেখায় এরিনিয়েস (Erinyes) প্রায়ই তাদের নিজস্ব ক্ষমতা হারিয়েছে, এবং তখন তারা কেবল কোনও অভিশাপ বা কোনও ব্যক্তির উচ্চারিত অভিশাপের প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৩] অভিশাপ ও আশীর্বাদের পক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে ফলপ্রসূ হওয়ার ধারণাকে এই ভাবে নৈর্ব্যক্তিক করে দেওয়াতে সেগুলি হয়ে দাঁড়াল সমীহ উদ্রেককারী আধিদৈবিক শক্তিস্বরূপ। এর যুক্তিনির্ভর পরিণতি হল এই যে, সেগুলি কেবল মানুষী শক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে রইল না, কখনও কখনও দেবতাদেরও আয়ত্তে রইল না; এই ভাবে পুরাণ কথা, আখ্যান ও ধর্মতত্ত্ব ভাগ্যের অদৃশ্য শক্তির কাছে বশীভূত হতে হল। সাধারণ মানুষের পক্ষে তার দুঃখ, রোগ, ক্ষতি,

মৃত্যু, ইত্যাদির অসংখ্য সম্ভাব্য কারণ বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠল। নিজের দুর্দশার সঠিক কারণ সে কখনওই অনুমান করতে পারল না, কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারল না ও সমস্ত ঘটনাই তার কাছে মনে হল ভাগ্যের লীলা। তার চারপাশ ব্যাপ্ত করে এই যে অতিলৌকিক শক্তির সর্বগ্রাসী জাল, তার কাছে মানুষ আত্মসমর্পণ করল। এই শক্তির নিজস্ব গতি সম্পর্কে তার জানার, অনুমান করার অথবা একে নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ কোনও সম্ভাবনাই তার ছিল না, কেবল খোলা ছিল বহু-বিচিত্র আচারবিধির মাধ্যমে ভাগ্যকে প্রসন্ন করার বা প্রায়শ্চিত্ত করার পথ।

আদর্শগত ভাবে কর্মবাদের তত্ত্বের সঙ্গে নিয়তিবাদকে যুক্ত করা যায় না, কারণ কর্মবাদ একটি কার্যকারণ সূত্রের ফলশ্রুতি। নিয়তিবাদকে সঠিক ভাবে কোনও ধর্মের সঙ্গেও যুক্ত করা যায় না, কেননা, মঙ্গলময় দেবতারা, যাঁরা এখন অধিকাংশই মোক্ষদাতা, যথাযথ পূজার দ্বারা তাঁদের প্রসন্ন করা যেত। তাঁদের তুষ্ট করার এক অপেক্ষাকৃত নূতন আবেগনির্ভর উপায় দেখা দিল— ভক্তিমার্গ। তত্ত্ব অনুযায়ী তীর্থযাত্রা এবং ব্রতরক্ষার ফলেও কেবল এ জন্মের নয় বহু পূর্ব জন্মের অজস্র পাপমোচন হয়। সুতরাং তত্ত্বগত ভাবে তারা ভাগ্যকে অস্বীকার করছে। কিন্তু স্বর্গ-নরকের ধারণা কখনওই সুস্পষ্ট রূপে ঘোষিত হয়নি, সুতরাং মৃত্যুর পরে মানুষের ভাগ্য বিষয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। ভ্রান্তি, কর্তব্যে অবহেলা এবং অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো অসংখ্য বিপদের সম্ভাবনা সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করে তোলে। আর একটি বিষয়ে এই সময়ে পুরোহিত এবং জাদু চিকিৎসক উভয় গোষ্ঠীই মন দিয়েছিলেন। এটা হল ভবিষ্যদ্বাণী, অমঙ্গলচিহ্ন, কুলক্ষণ, স্বপ্ন, ইত্যাদি, যা কিছুকে অশুভ ঘটনার পূর্ব সূচনা বলে মনে করা হয় এবং ওই সব অমঙ্গলকে এড়ানোর জন্য যার বিরুদ্ধে ধর্মানুষ্ঠানমূলক প্রতিষেধক গ্রহণ করা উচিত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৩৩ অধ্যায়) এবং *ভাগবত পুরাণ* (৩:১৭)-এ আমরা দুর্লক্ষণ এবং অমঙ্গল চিহ্নের দীর্ঘ তালিকা পাই। *ভাগবত*-এ দৈত্য হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর জন্মের সময় বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। *মহাভারত*-এর মুখ্য চরিত্রগুলির জন্মকাল এবং যখন তারা যুদ্ধযাত্রা করছে— যে যুদ্ধে তারা ঘটনাক্রমে মৃত্যু অথবা বিজয়ের সম্মুখীন হবে— সেই সময় বহু প্রকার দৈব লক্ষণের বর্ণনা রয়েছে। *ইলিয়াড* কাব্যে দেখা যায় ভাল এবং মন্দ লক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বিশ্লেষণে, এই প্রকার শব্দের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে।[১৩] অমঙ্গল চিহ্ন ও দুর্লক্ষণ সম্পর্কে এই প্রকার মনোভাবের পিছনে এই অনুমান রয়েছে যে, চোখে যা দেখা যায় এবং এর থেকে যার পূর্বাভাস পাওয়া যায়— এই দুইয়ের মধ্যে কোনও অচিন্তিতপূর্ব যুক্তিসম্মত যোগাযোগ আছে; আমাদের চোখ এই আবরণ ভেদ করে দেখতে পায় না, যেহেতু আমরা সাধারণ মানুষ মাত্র। এই যুক্তিকে দৃঢ় করার জন্য অনেক সময় সন্ন্যাসী, দেবতা ও মহাপুরুষরা লক্ষণ ও স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে থাকেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, দুর্লক্ষণতত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য সংগুপ্ত জ্ঞান, যোগসিদ্ধ ক্ষমতা বা অতিলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।[১৪]

ভারতবর্ষে সেই অর্থে দৈবপ্রত্যাদেশের পীঠস্থান নেই, কারণ এখানে সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষরাই দৈবপ্রত্যাদেশ দিয়ে থাকেন। মানুষ উদভ্রান্ত মানসিক অবস্থায় বা কোনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে পূর্বাভাসের আত্যন্তিক প্রয়োজনে, অথবা তাদের কোনও প্রচেষ্টায় বাধা পেয়ে সাধু সন্তের কাছে যায়, যাঁরা তাদের জন্য আধ্যাত্মিক উপায় খুঁজে বার করেন। আমাদের ডোডোনা (দেবীস্থান) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্দিরের পুরোহিতকুল, যাঁরা শরণার্থীদের প্রার্থনা কী ভাবে পূর্ণ হবে বা আদৌ হবে কি না তা দেখাবার জন্য কোনও আনুষ্ঠানিক শুদ্ধি, ব্রত বা পুণ্য কাজের অনুষ্ঠান করতে বলেন। সম্ভাবনার সূত্র অনুযায়ী কয়েকটি ক্ষেত্রে তা সফলও হয় এবং বলার অপেক্ষা থাকে না যে, ব্যর্থতার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য প্রচুর ভুলভ্রান্তির সুযোগও থাকে। আবার কোনও অতিপ্রাকৃত কার্যকলাপে— যেখানে মধ্যবর্তী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা (অবশ্যই রহস্যময় ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে) রয়েছে— সেই সব কার্যে বিশ্বাস জন্ম নেয়; যেহেতু এই সব ক্রিয়াকলাপ, শক্তি এবং ভবিষ্যদ্বাণীর পদ্ধতি সব কিছুই অস্পষ্ট, সে জন্য মনে করা হয় এগুলি ভাগ্যেরই বহুবিচিত্র প্রকাশ।[১৫]

কালিদাসের *রঘুবংশ* কাব্যে নিঃসন্তান রাজা দিলীপ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী ও সমাধান প্রার্থনা করেন; তিনি ঋষির উপদেশ মতো আচরণ করেন ও একটি পুত্র লাভ করেন। *মহাভারত*-এ নারদ মুনি সত্যবানের আয়ু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন (৩:২৯); অধিকাংশ পুরাণেই এই ভাবে মহাপুরুষেরা মানুষের দুর্দশার কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের উপায় বলেছেন। এর কারণ এই যে তাঁদের পবিত্র তপোবল মহাবিশ্বের অধ্যাত্মশক্তির সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ স্থাপন করেছে, ফলে তাঁরা জানতে পারেন, এবং যেহেতু তাঁরা পরিণতি বুঝতে পারেন তাই তাঁরা কার্যের যথার্থ প্রতিষেধকও নির্ণয় করেন।

পুরাণসম্মত সর্বপ্রকার কুসংস্কার পোষণ করার পক্ষে মানসিক পরিবেশ ছিল একেবারে যথাযথ। জাদু এবং রহস্যময়তার প্রতি বিশ্বাসের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল।[১৬] কিন্তু অনির্ণেয় এবং সর্বশক্তিমান নিয়তি সর্বব্যাপী জাল বিস্তার করেছিল। সাধারণ মানুষকে পদানত করে, তাকে পুরোহিত ও শাস্ত্রের নির্দেশ মানতে বাধ্য করেছিল। এর প্রধান অস্ত্র ছিল আতঙ্ক এবং নিয়তির অনির্ণেয়তাই তাকে আরও ভীতিকর করে তুলেছিল।

নিয়তিবাদের তত্ত্ব যখন ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছে তখন সেই সব শতাব্দীর পর শতাব্দীতেই যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। এই সব শৈব ও বৈষ্ণব আন্দোলনেও প্রায়ই পরোক্ষ ভাবে নিয়তি তত্ত্বকে ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষ করে গোষ্ঠীগত ধর্মতত্ত্বকে মানুষের মনে দৃঢ়মূল করার জন্য যে সব আখ্যান মূলত রচিত হয়েছিল সেগুলির ক্ষেত্রে। এর মধ্যে মুসলিম ধর্মও প্রবর্তিত হয়েছে এবং কিছু মানুষ ধর্মান্তরিতও হয়েছে। কিন্তু জীবনের প্রতি যে গভীর নিয়তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল— যার ফলে মানুষ যে কোনও ধর্মীয়, সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতার আস্ফালন বিনা প্রতিবাদে মেনে নিত তার কোনও পরিবর্তনই হল না।

কেউ যদি দরিদ্র, মৃত, বঞ্চিত বা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় থাকে তবে এ-ই তার নিয়তি। বারংবার আমরা এই প্রবচন শুনতে পাই— 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে'— ভাগ্যকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। দীর্ঘতর কাব্যে নাটকে বা ধর্মসাহিত্যে আমরা সহস্রাধিক শ্লোকে এই একই কথা শুনি— নিয়তির সর্বোচ্চ ক্ষমতার কাছে এই নির্বিবাদ আত্মসমর্পণ। এ কথা সত্য যে, আমরা এমন বিবরণও পেয়েছি যেখানে মানুষ তার ক্ষমতার প্রমাণ করার জন্য ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু সেই যুদ্ধের পরিণতিও হয় পরাজয়। মহাভারতে কর্ণ বলেন, 'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম— নীচ বংশে জন্ম ছিল ভাগ্যের অধীন কিন্তু আমার পৌরুষ আমার অধীন।' কিন্তু মহাকাব্যের সব পাঠকই জানেন নিষ্করুণ ভাগ্যের বিরুদ্ধে কর্ণের এই যুদ্ধ অনেকাংশে গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কদের মতো; যারা অতুলনীয় বলশালী সব শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, শুধু হেরে যাওয়া যুদ্ধই করে গেছে কেবলমাত্র তাদের মনুষ্যত্বের গৌরব রক্ষা করতে। কিন্তু গ্রিক ট্র্যাজিক নায়করা যুদ্ধ করেছে দেবতা দ্বারা রক্ষিত সব শত্রুর বিরুদ্ধে, এখানে ধর্মীয় ও সামাজিক শর্ত অনুযায়ী যুদ্ধ সমর্থিত হয়েছে, কারণ তার উদ্দেশ্য কাউকে সাহায্য করা এবং অন্যদের প্রতিরোধ করা তাই এমনকী পরাজিত নায়করাও ভাগ্যের বঞ্চনা অনুভব করে না। কিন্তু ভারতবর্ষে ভাগ্য মানুষের কাছে এক অন্ধ চালিকা শক্তি রূপে উপস্থিত হয়, কেননা, মানুষ নিজেই এই শক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্ধ। সুতরাং কোনও মানুষের এ কথা জানার উপায় নেই যে, পবিত্র জীবনযাপন করা সত্ত্বেও তার কেন বিনাশ হল। মাঝে মাঝে মহাকাব্য ও পুরাণের অতিকথাগুলি ভাগ্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে হতভাগ্য মানুষকে জ্ঞান দেয়। এই ভাবে ভাগ্যের বোধ বহির্ভূত প্রকৃতি নির্দিষ্ট করে দেয় কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু সামগ্রিক ভাবে অধিকাংশ মানুষের কাছে এই সব ব্যাখ্যা খুবই প্রক্ষিপ্ত ভাবে গ্রহণযোগ্য এবং কোনও কোনও সময়ে এর অস্তিত্বই নেই, তাই কেন তারা এই ভাবে কষ্ট পায় এ বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণ অন্ধকারেই থেকে যায়।

এই সুদীর্ঘ সময়ে অধিকাংশ মানুষের কাছে জীবন ছিল প্রায় অসহনীয়। কৃষক এবং কারিগর এরা অত্যল্প শ্রমমূল্য পেত। স্বল্পসংখ্যক ধনীর হাতেই সম্পদ রাশিকৃত হত। রাজসভায় রচিত কাব্য ও নাটকের পাতা এদের উপভোগের বিবরণেই আকীর্ণ। সমাজের সর্বোচ্চ স্তর আর সর্বনিম্ন স্তরের জীবনযাত্রার মানে এতই পার্থক্য যে, এর জন্য কিছুটা ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দক্ষতার সঙ্গেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছিল। যেখানে সাধারণ ক্ষেত্রে মানুষ অভাব, রোগ, দুর্দশা এবং শোষণের বিরুদ্ধে সরবে প্রতিবাদ করবে সেখানে এই সব দুষ্ট মতবাদ সহজেই প্রতিবাদী কণ্ঠকে রুদ্ধ করেছিল। কারণ পূর্বজন্মের কার্যকলাপ অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়ই রয়ে যায়, তার তথাকথিত যে ফল মানুষ ইহজন্মে ভোগ করে তাই হল অ-দৃষ্ট।

তবুও মানুষ অবদমন আর শোষণকে প্রতিহত করেছে। কারণ, যে কোনও তত্ত্ব যত দৃঢ় এবং আপাতদৃষ্টিতে যত নিয়ন্ত্রক হোক না কেন তা কখনওই মানুষের জীবনতৃষ্ণাকে সম্পূর্ণ বিনাশ করতে পারে না।

মহাকাব্য ও পুরাণগুলিতে নিয়তি আর স্বাধীন ইচ্ছা— উভয়ের আপেক্ষিক কার্যকারিতা বিষয়ে দীর্ঘ বিতর্ক দেখা যায়। যদি পরিণামবাদকে সম্পূর্ণ ভাবে মেনে নেওয়া হয়, তবে তা জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করে, সুতরাং এ বিষয়ক বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থগুলি স্পষ্টতই পরস্পরবিরোধী। প্রথম তাৎপর্যময় শ্লোকটি দেখা যায় *মহাভারত*-এ, যেখানে আমরা শুনি, চেষ্টা ব্যতীত ভাগ্য নিষ্ফল;[১৭] ভাগ্য কোনও ন্যায়বান পুরুষকে কী করতে পারে?[১৮] অহংকারী, ক্ষমতাবান পুরুষ ভাগ্যের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন না। এর পর উদাহরণের একটি তালিকা আছে: 'যেমন করে নিঃশেষিত তৈলপ্রদীপে তেল দিলেও' প্রদীপ নিভে যেতে থাকে তেমনই যখন কর্ম বিনষ্ট হয় তখন ভাগ্যও দুর্বল হতে থাকে।[১৯] ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১১৬-১১৯ পরিচ্ছেদ এবং ১৪৪, ১৪৫ পরিচ্ছেদ) জীবনের নীতিনিষ্ঠ পথ এবং কর্ম থেকে মোক্ষপ্রাপ্তি ও তার ফলকেই জীবনের সারমর্ম বলে দৃঢ় ভাবে ব্যাখ্যা করে। সমগ্র ঊনবিংশ পরিচ্ছেদটি হল কর্ম এবং তার প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা। এর প্রথমেই রয়েছে— সৎ বা অসৎ কোনও কর্মই নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে যায় না, তারা পরিণত হয় অর্থাৎ যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে ফলদান করে। এর পরিবর্তে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে: বহু আখ্যানেই আপাত-অলঙ্ঘ্য প্রতিকূলতার সম্মুখে মানব প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য। কিন্তু এক প্রকার বিপরীত অর্থাৎ নিয়তিবাদী মনোভাব, যার অন্তর্লীন ইঙ্গিত হল সচেতন ভাবে এমনকী স্বেচ্ছায় এক অপ্রতিরোধ্য অনির্ণেয় শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করা, সেই বোধ অজস্র আখ্যানে ফুটে উঠেছে এবং এই মনোভাবই সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে এমন এক জগৎ গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সবই পূর্বনির্দিষ্ট, ফলে কাঁটায় পদাঘাত করলে তা ব্যর্থ হয়েই ফিরে আসে।

এই ভাবে, এই নৈতিক ভাবে দুর্বলকারী মতবাদ বিস্তার লাভ করায় অনেক প্রতিরোধের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়েছিল। কারণ এই মতবাদ একটি সহজবোধ্য স্তরে মানুষকে বোঝায় যে তার ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ অবশ্যই বোধসীমার বহির্ভূত, কারণ নিয়তিই সব কিছুর চরম নিয়ন্তা। যে সব শক্তি মানুষের ভাগ্যবিধি নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলিকে চেনা অসম্ভব; এই বোধের মারাত্মক চাপ মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয় প্রকার নেতৃত্বের কাছেই এই মতবাদ অত্যন্ত সুবিধাজনক। কারণ, এর সাহায্যে সাধারণ মানুষকে নির্বীর্য করে আত্মিক এবং বস্তুগত উভয় বন্ধনেই বেঁধে রাখা সম্ভব ছিল। এই সব সমাজপতিদের হাতে বহু শতাব্দী ধরে নিয়তিবাদ ছিল এক মারাত্মক বলবান অস্ত্র। এক ধর্মীয় বাতাবরণ যার মধ্যে আছে অনেকাংশে জাদু, শুভাশুভ লক্ষণ বিচার, দেবত্ব-আরোপ, দৈববাণী, জ্যোতিষ, অভিশাপ আশীর্বাদ এবং সর্বোপরি যে বাতাবরণকে ক্রমশ এক শক্তিশালী পুরোহিত তন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করেছিল— তা সাধারণ মানুষকে এক ভাবে বন্দি করে রেখেছিল। এই কারণেই প্রায় পনেরো শতাব্দী কাল ধরে এই দুষ্ট শক্তি সম্পন্ন মতবাদ সক্রিয় থাকার ক্ষমতা সংগ্রহ করেছিল।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে নিয়তিবাদ কোনও দার্শনিক তত্ত্ব নয়; এর কোনও ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। কোনও মহাজাগতিক তত্ত্ব, সত্তাতত্ত্ব,

জ্ঞানতত্ত্ব, কারণতত্ত্ব বা স্বর্গ-নরক বিচার— কিছুই এখানে নেই। কিন্তু যে সমাজে এই নিয়তিবাদ সৃষ্টি হয় সে সমাজে এই সব ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদের উপরই নিয়তিবাদের প্রভাব পড়ে। অবশ্যই এই মতবাদ আবশ্যিক ভাবে আদিম নয়, কারণ প্রায়ই দেখা যায় সমাজের যথেষ্ট শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান স্তরেও এর বিস্তার। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায়, এর অন্যতম শর্ত হল বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া। যখন প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ে, যখন বস্তুগত সমৃদ্ধির ফলে কারিগরি উন্নতির ফল জনগণের কাছে সহজলভ্য হয়, তখন নিয়তিবাদের ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়ে। অধিকাংশ সমাজেই সামগ্রিক ভাবে বস্তুগত সমৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যার বিস্তার আর নিয়তিবাদের মধ্যে এক প্রকার বিপরীত অনুপাত রয়েছে।

অবশ্য কোনও মানুষের পক্ষে প্রকৃতিবিষয়ে সামান্য অতিকথা— বিরোধী বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জ্ঞান— নিয়তিবাদের বিরোধিতা করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ প্রায়ই এই জ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মতো সহায় তার থাকে না (যেমন ঘটে কৃষক ও কৃষি সারের ক্ষেত্রে)। কখনও বা অন্তর্নিহিত বাধাই তাকে বৈজ্ঞানিক সাহায্য আসার পরেও নিষ্ক্রিয় করে রাখে, বিশেষ করে যখন তার সমগ্র জীবনের চিন্তাধারার সঙ্গে কোনও বিজ্ঞান শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র অংশকে সংযুক্ত করার পক্ষে তার নিজস্ব শিক্ষাদীক্ষার স্তরটি প্রয়োজন মতো উন্নত না থাকে (যেমন টিকাকরণ ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে)। যতদিন জীবনচর্যার এক বৃহদংশ মানুষের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে, ততদিন নিয়তিবাদ পল্লবিত হতে থাকে। তার প্রধান কারণ এই যে, জীবন সম্পর্কে এক পুরাণকথানুগ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একে যুক্ত করা সহজ। অন্যান্য বহু দেশের মতো ভারতবর্ষেও এই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রাধান্য দেখা যায়।

নিয়তিবাদের সারমর্ম হল যৌক্তিকতার উপরে আকস্মিকতার, প্রত্যাশিত নিয়ন্ত্রণাধীনের উপর অপ্রত্যাশিতের অচিন্তনীয়ের প্রাধান্য। এর ভিত্তি হল জীবনে আকস্মিক অনায়ত্ত পরিস্থিতি উপস্থিত হওয়ার অতিবাস্তব সম্ভাবনা; এবং জীবনে যে সব ঘটনা যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রত্যাশা করা যায় তার চেয়েও আকস্মিক ঘটনাকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করার মানসিকতাই নিয়তিবাদ।

ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশেও বুদ্ধিনির্ভর জীবনযাত্রার এক মূর্ত প্রতিবাদ হল নিয়তিবাদ। বিশেষ করে যেখানে যুক্তিনির্ভরতা আর বুদ্ধি দিয়ে কোনও কোনও সমস্যার সমাধান হয় না।

কালের ক্রম বিচার করলে নিয়তিবাদের উদ্ভব হয় উপনিষদের সমকালে। অন্য ভাবে বলা যায়, মননশীল স্তরের প্রধান অংশ তখন জ্ঞান এবং অধ্যাত্ম-রহস্যকেই জীবন ও বাস্তব সম্পর্কিত একমাত্র সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি রূপে, মোক্ষপ্রাপ্তির অদ্বিতীয় কার্যকরী ধর্মীয় উপায় রূপে ঘোষণা করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিপরীত তত্ত্ব সেই সময় দেখা গেল। অবশ্যই ঔপনিষদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য আর আংকাবাদী অ-দৃষ্ট উভয়ের অস্তিত্ব ভিন্ন মেরুতে। কিন্তু জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে, নিয়তিবাদ নিয়ে এল জ্ঞানের এক তাত্ত্বিক শূন্যতা। জ্ঞানকে নিক্ষেপ করল অন্ধগলি পথে যেখানে মানুষের ভবিষ্যৎ বাস্তবে অজানা, অজ্ঞেয় থেকে

যায়। জীবনে প্রত্যেকটি বিষয়ের যে পূর্বাভাস পাওয়া যায় না, সব কিছু পরিকল্পনা মতো হয় না, আয়ত্তে থাকে না এই সত্যকে নিশ্চিত করে নিয়তিবাদ। ক্রমবর্ধমান যুক্তিবাদনিয়ন্ত্রিত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের চেয়েও আকস্মিকতার ভূমিকাকেই সে অনেক বড় করে দেখায়। এই মনোভাব নিষ্ক্রিয়তার এবং উদ্যোগহীনতার জনক এবং কিছু দূর পর্যন্ত এই মনোভাব নির্দিষ্ট শক্তির স্বার্থ রক্ষা করে থাকে।

নিয়তিবাদ যে কোনও সংহত ধর্ম ব্যাখ্যার বিরোধী। যদি দেবতারা মানুষকে সত্য, শিব, সুন্দর ও পূর্ণতার পথের মঙ্গলজনক দিশা দেখান, তারই প্রতিনিধি হয়ে থাকেন তবে ভাগ্য যেখানে ক্রিয়াশীল হবে সেই শূন্যস্থান সৃষ্টি হয় না। মঙ্গলময় দেবতারা যখন মানুষের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করেন তখন তার পরিণতি হওয়া উচিত শুধু আনন্দময়। কিন্তু অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, জীবনের প্রতি এই আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক রুক্ষ বাস্তবের মোচড় আছে। সুতরাং, গ্রীণ যেমন বলেছেন, 'বস্তু জগতের মর্মে পুরাকাহিনির দেবতাদের মঙ্গলময়তা সম্পর্কে এমনকী নৈতিকতার কোনও মূল্য সম্পর্কে একটি গভীর সংশয়বোধ এমনকী নৈরাশ্যবাদ শুধুমাত্র পুরাণোক্ত দেবতাদের সম্বন্ধে নয়, কিন্তু নৈতিকতার মূল ভিত্তি সম্বন্ধেও অন্তর্নিহিত আছে।'[২০]

যদি সামগ্রিক ঘটনাপ্রবাহই শুভ শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে নিয়তিবাদকে কোথাও স্থান দেওয়া যায় না, বিশেষ করে যেহেতু নিয়তিবাদ স্বাধীন বিচারশক্তি ও পুরুষকারের ভূমিকা অস্বীকার করে। পূর্বনির্ধারণ এবং স্বাধীনবিচারের মতো, ক্যালভিনের পূর্বনির্ণয়বাদের মতো বিতর্কই ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণ সাহিত্যের দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় প্রধান হয়ে উঠেছে। পুনরায় এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হল গুরুত্বের আপেক্ষিকতা। একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে দৈব, পুরুষকার এবং কাল এই তিন শক্তি যুগপৎ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।[২১] আর এক জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে 'সমস্ত দুর্ভাগ্য এবং দুর্ঘটনা কালের নিয়ন্ত্রণাধীন; কাল যদি বিরুদ্ধে থাকে, ক্রুদ্ধ হয় তবে কী করে আমরা পরিত্রাণ পাব? এটা ব্রহ্মারই বিধি যে, সব কিছু প্রাণীকুলের ত্রিভুবনের সমস্ত শক্তি, কালের অধীন।[২২] আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে ধর্ম, কাল এবং মৃত্যু সর্বদা একত্রে বিচরণ করে।[২৩] মৃত্যুর বারো দিন পরে একজন মানুষকে যমপুরীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে মৃত্যু কাল ও অন্তকের মাঝে সে যমকে দেখতে পায়।[২৪] কালই সর্ব প্রাণীর সৃষ্টি ও ধ্বংসকর্তা, সকলেই কালের অধীন কিন্তু কাল কারও অধীন নয়।[২৫]

এই কালের প্রয়োজন নিয়তিবাদের ধারণার বিকাশকে পোষণ করার জন্য। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে সময় তা হল ভবিষ্যৎ এবং মহাকালের রূপ কল্পনা— অসীমের মূর্ত বিগ্রহ; সে হল ভবিষ্যতের প্রায় নির্ভুল রূপমূর্তি। পৌরাণিক অতিকথাগুলিতে শিব, যিনি যুগান্তের ভয়ংকর বিধাতা, তাঁকে বলা হয়েছে 'মহাকাল'— মৃত্যুর দেবতা। এই দেবতা ভূত-প্রেতের সঙ্গে বিচরণ করেন এবং তিনি যমেরই এক পরিবর্তিত রূপ। তাই যে সব পুরাকথাতে কাল, অন্তক, যম, ধর্মরাজ, ইত্যাদির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে তারা শিবকেও এঁদের সঙ্গে যুক্ত করে। শিবের মধ্যে এবং শিবের দ্বারা কাল ও সময় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

লৌকিক 'ধর্মপূজার' ক্ষেত্রে যে শিবকে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয় তা কোনও আকস্মিক সমাপতন নয়। এই ভাবে পুরাকথার উপযোগী ভাষায় ও ইঙ্গিতে এই বক্তব্যই প্রকাশিত হয় যে, কাল একজন ন্যায্য বিচারক, ধর্ম (ন্যায়), কাল (সময়) ও যম (মৃত্যু) একত্রে নৈতিকতা সম্মত কার্য বিধান করেন। মানুষকে তার ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত করার এটি একটি প্রচেষ্টা— তাকে আশ্বাস দেওয়া যে, কোনও কিছুই নিয়মবহির্ভূত নয়, কারণ দেবতারাই মানবজীবনে কর্তৃত্ব করছেন। কাজেই শেষ পর্যন্ত কোনও কিছুই ভুল হবে না, হতে পারে না। কিন্তু ধর্মতত্ত্বে বা অতিকথায় এ কথা কখনও স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করা হয়নি, ফলে সাধারণ মানুষের কাছে ভাগ্য অজ্ঞেয় ও অন্ধকারাচ্ছন্নই রয়ে গেছে।

ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ শেষ বিচারের আপাত বাহ্যরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে চিত্রগুপ্তের পৌরাণিক চরিত্রটিকে সৃষ্টি করে। এই চিত্রগুপ্ত মানুষের ন্যায়— অন্যায় কাজগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখেন, যাতে পরজন্মে সেই অনুযায়ী মানুষ শাস্তি বা পুরস্কার পায়।[২৭] এক অর্থে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অসংখ্য নিষেধাজ্ঞা আর নিয়তিবাদ পরস্পরের বিপরীতগামী: যদি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সফল তাৎপর্য থাকে, তবে একজনের কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বিকল্পে অন্য একজন করতে পারে এবং কর্মের প্রকৃত অনুষ্ঠাতার উপর থেকে নৈতিক দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়।

অভিশাপ এবং আশীর্বাদ, যা মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে, সেগুলি প্রায়ই আবেগতাড়িত বলে মনে হয় এবং কোনও প্রতীতিমূলক অধিবিদ্যাসংক্রান্ত তত্ত্বের সঙ্গে এগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায় না। অনুরূপ ভাবে যদি আত্মা ও প্রেত কোনও মানুষের জীবনকে সত্যই প্রভাবিত করতে পারে তবে তার কৃত ভাল ও মন্দ কাজের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং অকার্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

যদি অনুমান করা যায় যে অভিশাপ ও আশীর্বাদ, আত্মা ও প্রেত, শ্রাদ্ধ ও প্রায়শ্চিত্ত, এমনকী পুরস্কার ভাগ করে নেওয়া (পুরাণগুলি মধ্যে মধ্যেই আখ্যানের সাহায্যে এর উদাহরণ দেয়)— এই সব কিছুই পূর্বনির্দিষ্টতার পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে তখনই কর্ম তার গুরুত্ব হারিয়ে গৌণ হয়ে পড়ে। আর যদি এই নিয়তি অথবা পূর্বনির্দিষ্টতার তত্ত্ব নিজেই কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ওই সব অসংখ্য গৌণ মাধ্যমের কল্পনা অপ্রয়োজনীয়, এমনকী পরস্পরবিরোধী হয়ে পড়ে। সুতরাং নিয়তিবাদ বিষয়ে যুক্তিসংগত প্রতিতি উদ্ভাবনের চেষ্টা কখনও করা হয়নি।

তবুও এই নিয়তিবাদের সর্বব্যাপী অস্পষ্টতা হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মীয় পরিবেশকে গ্রাস করে রেখেছে। পুরোহিতদের স্বার্থেই নিয়তিবাদকে তার অসংখ্য প্রকার বহিঃপ্রকাশ আর বিভিন্ন মাধ্যমসহ মেনে নেওয়া হয়েছিল। বৃহত্তর জনসাধারণের আর্থিক অনুন্নত অবস্থা আর বিত্ত জগতেও তার বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবই নিয়তিবাদের অধিপত্যের কারণ। বিভিন্ন স্তরে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তার এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি— এ দুইয়ের মিলিত অবদানে যখন কুসংস্কারমুক্ত, নিয়তির প্রভাব মুক্ত জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি

কেবল বাস্তবায়িতই হবে না— অত্যাবশ্যক, অপরিহার্য হয়ে উঠবে, তখনই নিয়তিবাদের শিকড়গুলি সমাজের অভ্যন্তরীণ গঠন থেকে উচ্ছেদ হবে। কিছু দিন বাহ্যিক স্তরে এর প্রভাব অবশিষ্ট থাকতেও পারে কিন্তু ভয় আর বিস্ময়ের জাল বিস্তার করে লৌকিক চেতনাকে অধিকার করার ক্ষমতা তখন নিয়তিবাদ হারিয়ে ফেলবে। আর্থ সামাজিক অগ্রগতি এর মূলকে ধ্বংস করে হয়ে উঠবে সহজসাধ্য, নূতনতর বিকাশের সহায়ক।

সূত্রাবলি

১. Cato তাঁর কৃষি সংক্রান্ত লেখায় ভাল ফসলের জন্য জুপিটারের উদ্দেশে বলিদানের কথা বলেছেন।

২. ক্যালসিডিয়াস, *টিমেয়াম*, ১৪২ অধ্যায়

৩. কনফুসিয়াস ও মেনসিয়াস এর লেখাতে মিং অর্থ জগৎ। গদ্য রচনা *এড্ডা*তেও ভাগ্যের কথা বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। বেদ-পরবর্তী যুগের ভারতবর্ষেও বোধাতীত এবং ব্যাখ্যার অগম্য একটি ধারণার বিভিন্ন সূক্ষ্মভেদ অনুসারে বিভিন্ন নাম দেখা যায়।

৪. ধর্ম শাস্ত্রগুলিতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই মানুষেব মৃত্যুর পরের অবস্থা অনিশ্চিত রাখা হয়েছে: *বায়ুপুরাণ* বলে 'জানা অসম্ভব; ঋষিরাও এ কথা জানেন না, সাধারণ মানুষের কথা বলা বাহুল্য' ৫৫·৬৩

৫ তুলনীয় *মৎস্যপুরাণ*, ১০২; ২২; ১০৭·২৭; ১৩৫:৭৬; ১৩৬:৫; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮:৮০

৬ জারবান মতেও সময়ের ধারণাকে এক মহান দেবতার পর্যায়ে উচ্চ করে তোলা হয়েছে।

৭. তুলনীয় *মহাভারত* ত্রয়োদশ, ১০২:১৪, ১৫

৮. তুলনীয় *মহাভারত* ত্রিংশ. ৬

৯. মধ্যে মধ্যে কেবল চিত্রগুপ্তের অস্পষ্ট রূপকল্পনা যাঁকে শাসকের চেয়ে হিসাবরক্ষক রূপেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

৯ক. এই জন্মেব পাপ বা পুণ্যই পববর্তী জন্মের পরিবেশের ভাল মন্দ নির্ধারণ করে— *মৎস্যপুরাণ* পৃ. ৩৯·১৯ *বিষ্ণুপুরাণ* ১:১২, *ভাগবতপুরাণ* ৫:২২ পৌরাণিক যুগের প্রভাবের দুটি উদাহরণ।
পুবাণগুলিতে জ্যোতিষের গুরুত্ব বেড়েছে, সেখানে গ্রহদের ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। *অগ্নিপুরাণ* অধ্যায় ৫১, ১২৬, ১৩৬: *মৎস্যপুরাণ*-এ ঋতুনির্ধারণ করার জন্য গ্রহের গতিবিধি এবং প্রকৃতির উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব আলোচিত হয়েছে; অধ্যায় ১২৫, ১২৬। পববর্তীকালে মানবিক সাদৃশ্যের রূপ কল্পনায় গ্রহ-নক্ষত্রেব পূজাবিধি নিরুপিত হয়েছে। এই সব অনুষ্ঠানের নির্দেশ রয়েছে *অগ্নিপুরাণ* অধ্যায় ১৬৪, *মৎস্যপুরাণ* অধ্যায় ৫৪ ইত্যাদি, অধ্যায় ৭৩ এবং *অগ্নিপুরাণ* অধ্যায় ১৯৬, এই সব গ্রহ দেবতা ও তাদের পূজারই একটি শাখাভেদ হল রত্নের সঙ্গে গ্রহগুলির যোগসূত্র যার ফলে বত্নব্যবহাব কবে গ্রহের প্রকোপ নষ্ট করা যায়। *অগ্নিপুরাণ* অধ্যায় ১২১, ২৪৬, *কূর্মপুরাণ* অধ্যায় ৪২, এই নূতন 'বিজ্ঞানে'র উদাহরণ।

১১. তুলনীয় আত্মা এবং অধিকারের পরিচ্ছেদ *অগ্নিপুরাণ* ২৯৯ অধ্যায়— যেখানে দুষ্ট আত্মার ৩৮টি নাম আছে।

১২. *মার্কণ্ডেয়পুরাণ* ১১২ অধ্যায়ে রাজা পৃষধ্রকে শূদ্র হওয়ার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। *বিষ্ণুপুরাণ* ১:১৯ ইন্দ্র দুর্বাসার অভিশাপে পরাজিত হয়েছিলেন, *বিষ্ণুপুরাণ* ৫:৩৭ যদু বংশ ঋষির শাপে ধ্বংস হয়েছিল এবং *ভাগবতপুরাণ* ১১:১। *ভাগবত* ৪:২তে বলা হয়েছে দক্ষ ও শিব পরস্পরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। এবং *ভাগবত* ৬·৭-এ রাজা চিত্রকেতু পার্বতীর শাপে দানব বৃত্র হয়েছিলেন। দেবতা ও

অসুরদের বংশপরিচয় এবং আপাত বিচিত্র বহু ঘটনাই *রামায়ণ, মহাভারত*, পুরাণ এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে অভিশাপে ও আশীর্বাদের ফল বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৩. ডিয়েট্রিচ বি সি· ডেথ, *ফেট অ্যান্ড দি গডস*, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন ১৯৬৫৬, পৃ. ২৩৪

১৪. ডিয়েট্রিচ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

১৫. *মৎস্যপুরাণ* ২২৯-২৩৮ অধ্যায়ে বিভিন্ন দুর্লক্ষণের তালিকা আছে এবং ২৩৯ অধ্যায়ে এর প্রায়শ্চিত্ত আছে। ২৪১ অধ্যায়ে আছে এবং ২৪২ স্বপ্নতত্ত্ব। *বায়ুপুরাণ*-এ দুর্লক্ষণের কথা আছে ১৯.১৬-তে, *মার্কণ্ডেয়পুরাণ*-এ ৩৪ অধ্যায়ে, *অগ্নিপুরাণ* অধ্যায় ২২৯ এবং ১২৬ পুরাণের অষ্টম অধ্যাযে স্বপ্নকে বলা হয়েছে আগামী ঘটনার পূর্বাভাস বহনকারী। *অগ্নিপুরাণ* ২৩০-২৩৩ অধ্যাযে নারীপুরুষের মধ্যে শুভাশুভ লক্ষণের তালিকা দিয়েছে; এখানে দুর্লক্ষণের কথা বলা হযেছে ২৬৩ অধ্যাযে এবং এই সব লক্ষণজনিত বিপদ থেকে বাঁচবার উপায় রূপে আচার অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে ২৪৩-২৪৪ অধ্যায়ে।

১৬. *মার্কণ্ডেয়পুরাণ* ৫১, ৭০, ১১৭ অধ্যায়ে এবং অন্য অধিকাংশ পুরাণ গ্রন্থে জাদু এবং ডাকিনী সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা আছে।

১৭. ত্রয়োদশ· ৬·২৫

১৮. ত্রয়োদশ: ৬:২৯ এখানে ধ্রুবপদ— নিয়তিব দ্বারা কী বাধাপ্রাপ্ত হযনি?

১৯. ত্রয়োদশ: ৬:৪৪

২০. গ্রিন ডব্লু-সি: *ময়রা*; হার্পার অ্যান্ড রো ১৯৬৫ পৃ. ২১৮

২১. মৎস্য পুরাণ ২২১.৮

২২. মংস্য পু. ১৩৬:৫, ৬

২৩. মংস্য পু. ২১০:৫-৭, মৎস্য পু. ২১৩:৩-৭ বলা হয়েছে কাল, মৃত্যু, অন্তক, যম, বৈবস্বত এবং ধর্মরাজ এঁবা সকলেই এক।

২৪. *মার্কণ্ডেয়পুরাণ* ১০-৭৮

২৫. *কূর্মপুরাণ* ১২:১৭, দ্রঃ কূর্ম, উত্তরভাগ ৩১·৪৩ কাল বিষয়ক আলোচনা।

২৬. *প্রজাপতিপুরাণ*-এর যিনি সৃষ্টিকর্তা, কালরূপে জন্মেব সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁব সম্পূর্ণ বিপরীত ধাবণা।

২৭. *গরুডপুরাণ* ৩৪ অধ্যায়, এই জন্মের কার্যকলাপের সমতুল্য বা উপযুক্ত ফল প্রাপ্তিই এর বিষয় অধ্যায় ৪, ৫।

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৬
প্রকাশকক্ষ: সলিল কুমার গাঙ্গুলি, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
উৎসর্গ: প্রয়াত শ্রীসুধী প্রধান অগ্রজপ্রতিমেষু

প্রথম সংস্করণে লেখকের কথা

বছর কয়েক আগের কথা। একদিন অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী খুব বকাঝকা করলেন Women and Society in Ancient India বইটির পুনঃপ্রকাশের কোনও উদ্যোগ নিচ্ছি না কেন— এই বলে। তাঁর দাবি আগ্রহী পাঠকপাঠিকাদের কথা বাদ দিলেও অন্তত ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবেও আমার এ কাজটা করা উচিত। রণবীরের বক্তব্য, বইটি নাকি এই বিষয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ ভাবে প্রয়োজন এবং এর ইংরেজি সংস্করণটি নিঃশেষিত। সুদীর্ঘ শিক্ষকতার জীবন কাটিয়ে 'ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনে লাগবে'— এমন একটি কথাকে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে কনিষ্ঠের সে দিনের সেই তিরস্কার শিরোধার্য করে নিলাম। মনে মনে ভেবেছিলাম যদি বইটির একটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করা যেত তবে বহু ছাত্রছাত্রীর এবং বাংলা ভাষায় যারা এই ধরনের লেখা পড়তে আগ্রহী তাদের হয়তো কিছুটা সুবিধে হত। কিন্তু এই ভাবনার প্রায় অকালমৃত্যু ঘটতে চলেছিল কারণ নিজের লেখা অনুবাদ করার ধৈর্য বা উৎসাহ দুটোরই আমার যথেষ্ট অভাব ছিল। ফলে সেই আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছি এমন সময় ন্যাশনাল বুক এজেন্সির থেকে প্রস্তাব আসে বইটি বাংলা করার এবং ভাষান্তরের কাজটিও আমাকে করতে হবে না। বলা বাহুল্য এ হেন প্রস্তাবে পরম তৃপ্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু আবারও গেরো। গোটা বইটি অনুবাদের পর দেখা গেল তার একটি বাক্যও যথার্থ হয়নি। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। এ বার বইটির অপমৃত্যু আর কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু না, এ বার এগিয়ে এলেন আমার দুই প্রাক্তন ছাত্রী ড. বিজয়া গোস্বামী ও ড. নীলাঞ্জনা শিকদার দত্ত এবং ড. করুণাসিন্ধু দাস। অনুবাদের দায়িত্ব তাঁরাই নিলেন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সিও অত্যন্ত ধৈর্য ধরে সমস্ত কাজটি পরিচালনা করেন। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

শারীরিক অক্ষমতার জন্য বইটির প্রুফ দেখা বা অন্যান্য সম্পাদনার কাজ কোনওটাই আমার পক্ষে সম্ভব হল না। ফলে কোনও ত্রুটি যদি বইটিতে থেকে যায় তবে সে দায় একান্ত ভাবেই আমার।

পরিশেষে বলি, বইটি যদি সারস্বত সমাজে বা বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানুষের সংগ্রামে কিছুমাত্র কাজে লাগে তবেই এত জনের শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করব।

প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য

সূচি

ঋগ্বেদের দিনের মানুষ ২২৯
ঋগ্বেদে সৌরসূক্তে কাব্য ২৩৮
বৈদিক সমাজে নারীর স্থান ২৪২
যাজ্ঞবল্ক্য ও উপনিষদের যুগ ২৫৬
প্রাচীন ভারতে গণিকা ২৬৯
মহাকাব্য মহাভারত ২৮৯
নারীর স্থান রামায়ণে ও মহাভারতে ৩১৪
কালিদাস কাব্যে কয়েকটি আদিকল্প ৩৩৮
মৃচ্ছকটিক ৩৫১
শতক কাব্য ৩৬১
কাব্যে অলংকারে সীমা ৩৮৬
সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্লীলতা ৪১০
দুঃখান্ত পরিণতি ও সংস্কৃত সাহিত্য ৪১৫
চৌরপঞ্চাশিকা ৪২৬
সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্র ও নারীর চিত্র: পঞ্চম থেকে একাদশ শতক ৪৩৪
প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন ৪৫১

ঋগ্বেদ-এর দিনের মানুষ

পণ্ডিতেরা বলেন *ঋগ্বেদসংহিতা*-র রচনাকাল ১২০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। দেবতাদের স্তব ও তাঁদের কাছে প্রার্থনাই মুখ্যত এর বিষয়বস্তু। অধিকাংশ সূক্তই তৎকালে বা তার পরে যজ্ঞে প্রযুক্ত হত; যদিও চতুর্দশ শতকে বিজয়নগরে যজ্ঞের পুনঃপ্রাদুর্ভাব কালের ভাষ্যকার সায়ণাচার্যও বেশ কিছু সূক্তের কোনও যজ্ঞীয় প্রয়োগ নির্দেশ করতে পারেননি; অর্থাৎ সব সূক্তই যজ্ঞের উদ্দেশ্যে রচিত নয়, যজ্ঞে ব্যবহারও হত না। অধিকাংশ সূক্ত কবিতার মতো স্বতঃউৎসারিত; তাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, *ঋগ্বেদসংহিতা* পল্‌গ্রেভের *গোল্ডেন ট্রেজারি*-র ন্যায় একখানি কবিতা-সংকলনগ্রন্থ।

সূক্তগুলির গঠনবিন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গ্রিক স্তবের মতো এগুলিরও মূলত তিনটি অংশ:

১. দেবতার রূপবর্ণনা: যার মধ্যে দুটি অংশ; প্রথমত, দেবতার আকৃতি, বেশবাস, অলংকার, অস্ত্রশস্ত্র, রথ ও বাহনের বর্ণনা; দ্বিতীয়ত, দেবতার শৌর্য, কীর্তি ও পূর্বপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহের উল্লেখ।

২. আপ্যায়ন. এ অংশে ভক্ত কী নৈবেদ্যে দেবতার তুষ্টিবিধান করছেন— ভোজ্য পানীয়ে ও স্তোত্রে— তার বিবরণ। নূতন স্তব রচনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয় দেবতাকে, আবার প্রাচীন— পরীক্ষিত ও দৈবশক্তিযুক্ত— স্তবগানেরও উল্লেখ থাকে।

৩. প্রার্থনা: প্রার্থিত বস্তু সারা ঋগ্বেদ জুড়েই এক— বিজয়, শত্রুবিনাশ, পশুধন, স্বর্ণ, স্বাস্থ্য, শস্য, সন্তান, রোগমুক্তি এবং সর্বোপরি দীর্ঘ পরমায়ু। প্রায়ই শোনা যায়, একশো শরৎ বাঁচবার প্রার্থনা: দীর্ঘকাল যেন সূর্যকে দেখতে পাই— জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে, (১:২৩:২১) অথবা জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্, (১০:৬০:৬)। সূক্তগুলিতে সাধারণ ভাবে একটা আদানপ্রদানের ভাব থাকে; হব্যের বিনিময়ে দেবতা যেন এই পৃথিবীর জীবনকে নিরাপদ ও চিরায়িত করেন। মোটের ওপরে, প্রার্থনা সবই ঐহিক, জীবনমুখীন; পরবর্তীকালের জীবনবিমুখতার চিহ্নমাত্র নেই। এমনকী, স্বর্গের প্রার্থনা— যা পরবর্তীকালে সংযোজিত অংশে আছে— তা-ও ঐহিক জীবনের সুখের ও ভোগের অনিঃশেষ বিস্তার মাত্র।

স্তব ও প্রার্থনাই ঋগ্বেদের তিন-চতুর্থাংশ; এ ছাড়াও গোটা কুড়ি 'সংবাদ-সূক্ত' আছে— দুই বা ততোধিক ব্যক্তির (নদী, দেবতা, মানুষ, অপ্সরা এবং মনুষ্যেতর প্রাণীরও) সংলাপ। এগুলির বিনিয়োগ অর্থাৎ যজ্ঞগত প্রয়োগ নেই। কয়েকটি সূক্তে আছে সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরমাত্মা বিষয়ে অনুসন্ধান— কাল, হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, পুরুষ এবং সৃষ্টির

উপাদান ও প্রকরণ সম্বন্ধে। এগুলিতে পাই জীবনের তত্ত্ব সম্বন্ধে সে যুগের মানুষের চিন্তা, উপলব্ধি ও অনুসন্ধিৎসা।

এ ছাড়াও অন্য ধরনের কিছু সূক্ত আছে যাতে প্রাগ্‌ঋগ্বেদ যুগের অস্পষ্ট আভাস বিধৃত; যেমন আপ্রীসূক্ত। এগুলিতে অগ্নিকে বিভিন্ন নামে ও ভূমিকায় আহ্বান করা হচ্ছে। সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে আগুনের ব্যবহারে যে বিস্ময়, সহসা সভ্যতার যে প্রকাণ্ড, প্রবল যুগপরিবর্তন, নিরাপত্তা ও আত্মপ্রত্যয়ের যুগপৎ সম্ভাবনা, অগ্নিরক্ষী আদিম পুরোহিতের মর্যাদা এবং অগ্নির সাহায্যে প্রথম সংক্ষিপ্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান— এ সবই যেন আপ্রীসূক্তের মধ্যে অনুধাবন করা যায়।

ঋগ্বেদ-এর সম্পূর্ণ কোনও সূক্ত 'দানস্তুতি' নয়; অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে রচিত কয়েকটি সূক্তের কতকটা অংশ দানস্তুতি। এগুলি কিন্তু দানের স্তুতি নয়, দাতার প্রশংসা। প্রাচীনকালে কোন যজ্ঞে কোন রাজা কোন পুরোহিতকে কী কী দান করেছিলেন, তারই তালিকা; বলা বাহুল্য, ভাবী দাতাকে প্রচুরতর দানে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। সমস্ত *ঋগ্বেদ*-এ একটিমাত্র ঋকে দানক্রিয়ার প্রশংসা আছে।

'সূর্যাসূক্ত' (১০:৮৫)-তে বিবাহ সম্বন্ধে আচার-অনুষ্ঠান, প্রার্থনা, নববধূ সম্বন্ধে আশংসা (শ্বশুর শাশুড়ি ননদ দেবরের কাছে সম্রাজ্ঞী হয়ো) ও আশীর্বাদ আছে। 'অক্ষসূক্ত' (১০-৩৪)-তে শুনি জুয়াড়ির আত্মগ্লানি ও খেদ: তার স্ত্রীকে অন্যে নিয়ে গেছে, তার পিতামাতা তাকে অস্বীকার করেন, সে নিঃসম্বল, সমাজে অপাঙক্তেয় অতএব রাত্রিচর। 'মণ্ডুক সূক্ত' (৬:১০৩)-র যজ্ঞীয় বিনিয়োগ নেই। এতে শুনি অতি রাত্রে সোমযাগে যেমন ব্রাহ্মণরা বেদপাঠ করেন, তেমনিই বর্ষার ভরা পুকুরে ব্যাঙ ডাকছে। যজ্ঞে বেদপাঠ কি তখনই কতকটা যান্ত্রিক ও কৃত্রিম আবৃত্তি বলে মনে হচ্ছিল? *ঋগ্বেদ*-এর মানুষের বসতির চারি পাশ যে দুর্ভেদ্য অরণ্য পরিবেষ্টিত অঞ্চল ছিল 'অরণ্যানী সূক্তে' হয়তো তারই চিত্র: সে অরণ্যানী 'অঞ্জনগন্ধি, সুরভি, বহু-অন্না, কৃষকের সঞ্চরণরহিত, বন্যপশুর মাতৃস্বরূপিণী।'

ঋগ্বেদ-এ পাই নিসর্গ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম একটি বোধ ও স্বতঃউৎসারিত আনন্দ— আকাশ, সূর্য, রাত্রি, উষা, ঝড়-বৃষ্টি, তৃণভূমি, অরণ্য— সবই এক সহজ আনন্দের বার্তা বহন করত এদের কাছে। তারই সঙ্গে ছিল জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল ও বিস্ময়। সূর্য প্রত্যহ পূর্বাকাশে উদিত হয়ে গগন-পরিক্রমা-অন্তে পশ্চিমে অস্ত যায়। বেদের কবি বলেছেন, আকাশে বরুণ সুন্দর একটি সোনার দোলনা টাঙিয়ে রেখেছেন— বরুণশ্চক্র এতংদিবি প্রেঙ্খং হিরণ্ময়ং শুভোকম্। (৭:৮৭:৫) গো দোহনের পরে দুধে উষ্ণতা দেখে এরা বিস্মিত: কাঁচা গরু থেকে রাঁধা মিষ্টি দুধ আসছে। কালো গরুর থেকে উজ্জ্বল শাদা দুধ নামছে— আ গোরামা সচা মধুমৎ পক্কামগ্নে। কৃষ্ণা সতী রুশতা ধাসিনৈষা জামর্ষেণ পয়সা পীপায়॥ (৪:৩:৯) অথবা দেবতাকে কবি বলছেন, তুমি কৃষ্ণা ও পাটল গাভীতে উজ্জ্বল শুভ্র দুধ রেখেছ— ত্বমেদধারয়ঃ কৃষ্ণাসু রোহিণীষু চ। পরুষ্ণীষু রুশৎ পয়ঃ॥ (৮:৯৩:১৩)

গ্রামীণ জীবন নানা ভাবেই আপৎসংকুল। *ঋগ্বেদ*-এ ষোলটি ঋকের পুরো একটি সূক্ত (১:১৯১) সর্পবিষ নাশের উদ্দেশ্যে রচিত, নাম 'বিষনির্হরণী উপনিষৎ'। সাপ ছাড়া বিছে, বন্যা ও অন্যান্য বিপদের কথাও এখানে আছে। অন্যান্য বহু সূক্তের পটভূমিকায় দেখি শ্বাপদসংকুল হিংস্র বন্যপ্রকৃতি, আদিম অপরাজিত প্রতিকূল প্রকৃতির নানা অপঘাতের কালো পর্দাটা দুলছে, তারই মধ্যে অপর্যাপ্ত বিস্ময় ও আনন্দ। সজীব জীবনরসিক মানুষের মনের উচ্ছ্বাসে ঋগ্বেদ সমৃদ্ধ।

ঋগ্বেদ-এ দেবতারা যে যে কারণে প্রশংসিত হচ্ছেন মোটামুটি সেটা তৎকালীন সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা নির্ধারিত, একথা মনে করা যেতে পারে। প্রধান যে গুণটি প্রশংসা পাচ্ছে তা হল শৌর্য, যার দ্বারা শত্রুবিনাশ, লুণ্ঠন, শত্রুর স্বর্ণ, পশু, শস্য ও দাস অপহরণ এবং পরাভূতকে দলন ও হত্যা করা যায়। এই গুণেই ইন্দ্র *ঋগ্বেদ*-এর এক-চতুর্থাংশ সূক্তে স্তব পাচ্ছেন: যাযাবর আক্রমণকারী আর্যদলের সেনাপতি ও প্রধান যোদ্ধা ইন্দ্র। প্রচুর পরিমাণে মাদক সোম পান করে ইন্দ্র প্রাগার্য গোষ্ঠীর অগণ্য দলপতিকে হত্যা করে, দুর্গ ভেদ করে তাদের নগরে প্রবেশ করে, পশুধন ও অন্যান্য সম্পদ হরণ করে এনে আর্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। এরই জন্যে সারা সংহিতা জুড়ে তাঁর অক্ষয়-গৌরব কীর্তন করা হয়েছে। 'বায়ুবাতাঃ' ও 'পর্জন্য' স্পষ্টতই আর্য সেনাদলের কল্পচিত্র— প্রবল শক্তিমান, দ্রুতচারী, বিজয়ী। 'অশ্বিনৌ' পরোপকারী দুটি বৈদ্যের দেবায়ন— এঁরা বিপন্নকে, রোগীকে, জলমগ্ন বা অগ্নিবেষ্টিত ব্যক্তিকে দ্রুত উদ্ধার করেন। নিরুক্তকার যাস্কও মনে করেন এঁরা আদিতে পুণ্যকৃৎ রাজা ছিলেন। 'ঊষা' সুন্দরী চিরতরুণী। 'বরুণ' বিচারক— অজস্র নেত্র মেলে অহর্নিশ চেয়ে আছেন মানুষের দিকে, দুষ্কৃতকারীকে দণ্ড দেওয়ার জন্যে। 'যম' লোকান্তরিত মানবাত্মাদের নিয়ে তরুছায়াতলে আপ্যায়ন করেন। বলা বাহুল্য, এ-সব দেবচরিত্রে সমাজের ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভূমিকায় আসীন মানুষের প্রতিফলন দেখা যায়।

পরবর্তী কালে ভারতীয় সমাজে যে-নীতিবোধ *ঋগ্বেদ*-এ তার চিহ্নমাত্র নেই। উন্নততর কৃষিজীবী সভ্যতার অধিকারী সিন্ধু সভ্যতার মধ্যে যাযাবর পশুচারী আর্যরা তাদের অশ্ববাহিত রথ ও লোহার অস্ত্র বজ্রের জোরে যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রাগার্য গ্রামনগর দখল করে বসবাস করছে— এমন অবস্থায় নৈতিক মান স্বভাবতই পরবর্তী সামন্ততন্ত্র বা শিল্পযুগের মান থেকে স্বতন্ত্র হবে। এ সময়ের মূল্যবোধ যা কিছু যুদ্ধজয়, আত্মরক্ষা, লুঠ ও সমৃদ্ধি বিস্তারের অনুকূল, প্রাথমিক ভাবে তারই পরিপোষক হবে, তাই সমস্ত *ঋগ্বেদ*-এ অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে ছাড়া পরবর্তী কালের নীতিবোধ অনুপস্থিত। নীতির যা উদ্দেশ্য— সমাজের মঙ্গল ও সংহতিবিধান করা— তা সে যুগের মানুষের মতে যজ্ঞের দ্বারাই সম্পাদিত হত। প্রথম পর্যায়ে যজ্ঞ ছিল যৌথ, সমষ্টিগত অনুষ্ঠান, পুরো সমাজের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত। কাজেই যজ্ঞ করাই পুণ্য, যজ্ঞ না করা পাপ। এরা বিশ্বাস করত যজ্ঞের দ্বারাই প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়েছিল এবং পরবর্তী যজ্ঞগুলি সেই আদিম সৃষ্টিকৃতিরই অনুকরণ। যে পরাজিত প্রাগার্য গোষ্ঠী ও কৌমগুলিকে আর্যরা 'দাস', 'দস্যু', 'রাক্ষস' বা 'অসুর' বলে অভিহিত করত তাদের দ্বারা

প্রতিনিয়ত আক্রান্ত ও প্রতিক্ষণে ধ্বংস-সম্ভাবী এই সৃষ্টি যজ্ঞের দ্বারাই রক্ষিত হয়, অসুরশক্তি বিনষ্ট হয়ে শুভশক্তি জয়যুক্ত হয়, জীবনপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। যজ্ঞই পুণ্য, তাই আর্যবর্ণ যজ্ঞ করে, অযাজী অসুরবর্ণ তাই পাপী; এর বাইরে পানপুণ্যের বোধ নিতান্তই ক্ষীণ, অস্পষ্ট।

এই কারণে আজ যাকে পাক বা অন্যায় মনে করা হয় তার অনেক স্পষ্ট অসংকোচ উচ্চারণ *ঋগ্বেদ*-এ পাওয়া যায়। শত্রুমর্দনে অকুণ্ঠিত আনন্দ বহু ভাবে প্রকাশ পেয়েছে বৃত্র ও অন্যান্য অসুরদের প্রসঙ্গে; বৃত্রকে ইন্দ্র কুপিয়ে কেটেছেন যেমন করে কুঠার দিয়ে ছেদক গাছের ডাল কাটে। (১:৩২:৫) শত্রুর সম্পত্তি হরণ সম্বন্ধেও কোনও দ্বিধা নেই, বারবার বলা হয়েছে, ওদের সর্বনাশ কর। যারা আর্যব্রত (=যজ্ঞ) সম্পাদন করে না তারা মরুক, তাদের ধন আমাদের এনে দাও। (৮:৯৭:৩) জনজাতি কীকটদের গাভী থেকেই-বা কি হয়? আশির (সোমরস আর দুধ বা দইয়ের মিশ্রণ) হয় না, (প্রবর্গ্যযাগের) পাত্রে তাদের দুধও ফোটে না। হে মঘবন্, প্রমগন্দের ও নৈচাশাখদের (পতিত) ধন আমাদের এনে দাও। (৩:৫৩:১৪) বণিকদের মন ভেজাও, হে পূষন্, ওদের ধন আমাদের এনে দাও। (৭:৫৩:৬) তোমার 'আরা' অস্ত্র দিয়ে পণিদের হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ কর, ওদের ধন আমাদের এনে দাও। (৭:৫৩:৭)

পুরুষের বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। (১:৬২:১) ফলে, নারীর সপত্নীযন্ত্রণা ছিল, সে জন্যে তাকে বারেবারেই সপত্নীকণ্টক উদ্ধারের জন্যে দেবতাদের দ্বারস্থ হতে হত। (১০:১৪৫, ১০:১৬০) অবিবাহিতা কন্যার দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে থাকাটা সমাজ অনুমোদন করত না; এমনই এক মেয়ে 'ঘোষা' অশ্বীদের কাছে সে-দুঃখ নিবেদন করেছে। (১০:৩৯:৩) বিধবা নারী যখন গতপ্রাণ স্বামীর পাশে শুয়ে আছে তখন দেবর এসে বলবে: ওঠ, নারী, এই গতপ্রাণ মানুষের কাছে শুয়ে আছ, এস, জীবলোকের অভিমুখে চল। যে তোমার হাত ধরছে সে তোমার গর্ভে সন্তান এনে দেবে, তার অভিমুখে এস। (১০:১৮:৪) উপমাতেও দেখি, বিধবা নারী যেমন শয্যায় দেবরের অভিমুখিনী হয়... তেমনই, হে অশ্বীরা, বেদীর ওপরে কে তোমাদের অভিমুখী হয়?— কো বাং শযুত্রা বিধবের দেবরং মর্যোন ন যোষা কৃণুত সধস্থ আ। (১০:৪০:২) সহমরণ তো নয়ই, এমনকী, কঠোর বৈধব্যযাপনও নয়, সদ্য-বিধবাকে দেবর ডেকে ওঠাত, 'জীবলোকের অভিমুখে এস'— এই বলে। জীবনকে জয়যুক্ত করবার অভীপ্সা— এই পরিস্থিতিতেও— *ঋগ্বেদ*-এর জীবনমুখীনতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ঋগ্বেদ-এ সমাজচিত্র সরাসরি যত না পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যায় উপমা থেকে। সর্বজনপরিচিত বাস্তবজীবন থেকেই উপমান সংগ্রহ করেন কবি, কাজেই তার সত্যতা অভ্রান্ত। যেমন বলা হয়েছে: হে অশ্বিনৌ, তোমরা আমাদের অপর্যাপ্ত ধন দাও, যেমন দেয় পরস্ত্রীতে আসক্ত কামুক তার অভিলষিতাকে— জারঃ কনীন ইব চক্ষদানঃ। (১:১১৭:১৮) এমনই আবার পরনারীকে গভীর রাত্রে হরণ করতে চলেছে যে-নায়ক সে প্রার্থনা করছে: তার মা ঘুমোক, বাবা ঘুমোক, তাদের কুকুরটা ঘুমোক, জামাতা ঘুমোক, সমস্ত জ্ঞাতিরা ঘুমোক, চারি দিকের লোকেরা ঘুমোক। (৭:৫৫:৫-৮) কতকগুলি উপমার

মধ্যে অন্য, প্রাচীনতর, হয়তো ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায়ের সমাজচিত্র পাওয়া যায়। সে-যুগে স্ত্রী স্বামীর আগে আগে চলত, 'যেমন সূর্যের স্ত্রী উষা চলেছেন, বা সূর্য উষার পশ্চাতে আসছে, যেন স্ত্রীর পশ্চাতে পুরুষ— 'উষো যাতি স্বসরস্য পত্নী কিংবা মর্যো ন যোষামভ্যেতিপশ্চাৎ। (১:১১৫:২) বধূরূপে পাওয়ার জন্য নারীর পিছনে পিছনে ঘুরছে পুরুষ একথাও উপমায় পাই— বধূয়ুরির যোষণাম্। (৩:৬২:৮) বধূ স্বামীকে খুশি করার জন্যে সজ্জাপ্রসাধন করছে— জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ। (৪:৩:২) 'পুরুষ নিজের বাড়িতে যেমন সুখী'— এমন উপমা আছে— 'মর্য ইব স্ব ওক্যে'। (১:৯১:১৩) এর থেকে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের সুখশান্তির একটা আভাস হয়তো পাওয়া যায়। এই সমাজে বধূ গৃহের অলঙ্কারস্বরূপিণী ছিল— জায়েব যোনাবরম্। (১:৯১:১৩) পরবর্তী কালের রচনা দশম মণ্ডলে শুনি: তেমন বধূই সুকল্যাণী হয়, যে বহুজনের মধ্যে নিজের সঙ্গীকে বেছে নেয়— ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎ সুপেশাঃ। স্বয়ং সা মিত্রং বুনতে জনে চিৎ। (১০:২৭:১২) 'মরুৎ'রা নানা স্বর্ণাভরণে অঙ্গসজ্জা করে নেয়, যেমন বর নানা অলঙ্কারে সেজে নেয় বিয়ের দিনে— বরা ইবৈদ্রেবতাসো হিরণ্যৈরভি স্বধাভিস্তল্বঃ পিপিশ্রে। (৫:৬০:৪) কুৎসিত জামাতাকে বারবার ডাকলেও যেমন সে আসতে চায় না তেমন করেই যেন, হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের যজ্ঞে আসতে দেরি কোরো না— অশ্রীর ইব জামাতা। (৮:৭৬:১০) ইন্দ্র এবং অগ্নি, আমাদের প্রভূত পরিমাণে ধন দিও, যেমন দেয় নির্গুণ জামাতা কন্যার পিতাকে কিংবা শ্যালক দেয় ভগিনীর প্রীত্যর্থে। (১:১০৯:২) এখানে অধুনাপ্রচলিত বরপণের পরিবর্তে কন্যাপণের কথাই দেখতে পাই।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আর্যরা দাসদের প্রচণ্ড তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতেন, যেন তারা মনুষ্যেতর জীব। এ মনোভাব এবং আচরণকে সমর্থন করবার জন্যে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রই দাসদের সমাজে নিচু স্থান দিয়েছেন— যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ। (২:১২:৪) পুরুষসূক্তেও এর সমর্থন: ব্রাহ্মণরা পুরুষের মুখ থেকে, রাজন্য তাঁর বাহু থেকে, বৈশ্য তাঁর উরু থেকে এবং শূদ্র তাঁর পা থেকে সৃষ্ট হয়েছিল। (১০:৯০:১৫)

আমাদের অদ্ভুত একটা ধারণা আছে, বৈদিক যুগের ভারতবর্ষে এত প্রাচুর্য ছিল যে, সমাজে দুঃখী-দরিদ্র ছিল না। ঋগ্বেদের চিত্র এ-ধারণার পরিপোষক নয়। চোরদের কথা বারেবারেই আছে: চোররা যেমন নিজেদের পদচিহ্ন গোপন করে (৫:১৬:৫); আবার চোরের মতো চুপিসাড়ে চলাফেরার কথাও শুনি। (৬:১২:৫) আরও শুনি, সূর্য তাপ দিচ্ছে যেন চোরকে সাজা দিচ্ছে। (৫:৭৯:৯) মনে হয়, প্রচণ্ড তাপে তপ্ত করে— হয়তো ফুটন্ত তেলের কড়াইতে ফেলে বা লোহার কড়াইতে রাখা আগুন বইয়ে (যেমন পরবর্তী কালে উল্লেখ পাওয়া যায়) চুরির অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হত। চুরি ছিল, অভাব ছিল, অবস্থার প্রচণ্ড বৈষম্য ছিল বলে ধনীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অতি সাবধানে রাখতে হত। 'সোনায় ভরা কলসী যেমন লোকে পুঁতে রাখে তেমনি কুয়োয় পড়ে ছিলেন রেভ, অশ্বীরা তাঁকে উদ্ধার করলেন— হিরণ্যস্যৈব কলশং নিখাতম্'। (১:১১৭:১২) পথেঘাটে লোকে ডাকাতের হাতে পড়ত,

উপমায় পাই 'পরিপন্থী'র কথা, যারা ঠেঙাড়ের মতো পথিককে মেরেধরে লুঠ করে পালাত— পরিপন্থীব। (১:১০৩:৬) বুড়ো বাপের টাকাপয়সা ছেলেরা কেড়েকুড়ে নিয়ে নিত এমন কথাও পাই উপমার মধ্যে— পিতুর্ন জিব্রেবি বেদো ভরন্তঃ। (১:৭০:৯)

সমাজে চুরি যখন ছিল অভাবও ছিল; তার নজিরও আছে। অক্ষসূক্তে সর্বস্বান্ত জুয়াড়ি অনুতাপ করছে জুয়া খেলে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করার জন্যে, সংকল্প করছে এবারে সে কৃষিজীবী হবে। দারিদ্র্য নিবারণ করবার জন্য ভক্ত দেবতার দ্বারস্থ হচ্ছে এমন কথাও দেখছি। তবে যজ্ঞ ক্রমেই অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠছিল এবং কেবল ধনীরই সাধ্য হত এমন ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানের আয়োজন করার। তেমন লোকেরা অবশ্য সামগ্রিক কল্যাণের প্রার্থনা যজ্ঞে প্রয়োগ করবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত বা শ্রেণিগত ভাবে দুঃস্থের যন্ত্রণার গান ওই সব যজ্ঞে প্রযুক্ত হবে— এমন কথা মনে করার কোনও কারণ নেই। এমন বহু গান নিশ্চয়ই ছিল যা ধনীর বা ব্রাহ্মণের অনুমোদন পায়নি। সে-সব গান হারিয়ে গেছে; হয়তো সেগুলো লোকগাথার মতো দরিদ্রমহলে গাওয়া হত, প্রতিষ্ঠিত বিত্তশালী ব্রাহ্মণ রাজন্যমহলে তার কোনও সন্ধান পাওয়া যাবে না। তবু এক-আধটা চিহ্ন থেকে গেছে: বামদেব বলছেন, তিনি অভাবে পড়ে কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খেয়েছিলেন— অবর্ত্যা শুন আন্ত্রাণি পেচে। (৪:১৮:১৩) সোমযাগে রীতি ছিল, এক শূদ্র সোম বিক্রি করতে আসবে, একটি বাছুরের মূল্যে সোম কেনা হবে। কিন্তু শূদ্রটি যখন বাছুর নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হবে তখন মারধর করে তার কাছ থেকে বাছুরটা কেড়ে নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এটা নিশ্চয়ই সোমযাগের অনুষ্ঠান, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটায় সাধারণ ভাবে সামাজিক মনোভাবের ও আচরণের কোনও প্রতিফলন নেই— এ কথা মনে করা কি ঠিক হবে? যে-সমাজে শূদ্র দাস এবং তার একমাত্র কর্তব্য অন্য তিন বর্ণের সেবা সেখানে তার যে কোনও নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অধিকার থাকবে না তা সহজেই বোঝা যায়। ঈষৎ পরবর্তী কালের 'ব্রাহ্মণ' সাহিত্যে একথা স্পষ্টই প্রমাণিত। ঋক্‌সংহিতাকালে 'দাস' 'দস্যু' 'অবর বর্ণের' অর্থাৎ পরাজিত প্রাগার্য জাতি ও গোষ্ঠীগুলির স্থান অন্যরকম ছিল তা মনে করার কোনও কারণ নেই। দরিদ্র শ্রমজীবীর একটি চিত্র অমর হয়ে আছে: গরিব ছুতোর কাজ করার ক্লান্তি ও পিঠের ব্যথার কষ্টে হাই তুলছে— তষ্টেব পৃষ্ট্যাময়ী উজ্জিহীতে। (১:১০৫:১৮)

আর্যরা যাযাবর পশুচারী সভ্যতার স্তরে থাকবার সময়েই এসে পড়েছিল এদেশে; পরে প্রাগার্যদের কাছে শিখে কৃষিজীবী হয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে ও অতি ধীরে ধীরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোটছোট শহরের পত্তন করে নগর-কেন্দ্রিক গ্রামীণ জনপদের বিস্তার ঘটায়। আদিম কৃষিজীবী সভ্যতায় খাদ্যসংস্থানের কোনও স্থিরতা ছিল না— অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্লাবন পঙ্গপাল ইত্যাদিতে বারেবারেই শস্য উৎপাদন ব্যাহত বিপর্যস্ত হত। বলা বাহুল্য, এতে নিচের তলার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা অনেক বেশি মার খেত; তাদের কান্না ঋগ্বেদের সূক্তে ধরা পড়েনি। কিন্তু বড় রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যখন উৎপাদন নষ্ট হয়ে যেত, তখন আহার্যসংস্থানের অনিশ্চয়তা সমস্ত সমাজকেই স্পর্শ করত। তাই ঋগ্বেদ জুড়ে অন্নের জন্যে

দেবতার কৃপাভিক্ষা এবং অন্নকে প্রায় দেবত্বে উপনীত করা হয়েছে; প্রথম মণ্ডলের ৮৭তম সূক্তের এগারোটি ঋকে পাই অন্নের স্তব— স্বাদো পিতো মধো পিতো বয়ং ত্বা হবামহে। (১:৮৭:২)

সমাজে বাণিজ্য প্রচলতি ছিল এবং সেখানে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতারণা, শঠতাও ছিল। ইন্দ্রের মূর্তি নিয়ে কেনাবেচা চলছে; বিক্রেতা ক্রেতার কাছে গিয়ে পণ্য (ইন্দ্রমূর্তি) ফেরত চাইছে, নইলে আরো বেশি দাম চাইছে এবং ক্রেতা সেটা দিতে অস্বীকার করছে। ইন্দ্রমূর্তির মালিক ফেরি করছে মূর্তি: কে দশটা গরু দিয়ে এই ইন্দ্রকে কিনবে? শত্রুবিনাশ হলে পর আমাকে আবার ফেরত দিয়ে যাবে?— ভূয়সা বস্নমচরৎ কনীয়ঃ, অবিক্রীতো অকানিষং পুণর্যৎ/স ভূয়সা কনীয়ো নারিরেচীদ্দীনা দক্ষা বি দুহস্তি প্র বাণম/ক ইমং দশভির্মমেন্দ্রং ক্রীণাতি ধেনুভিঃ/যদা বৃত্রাণি জঙ্ঘনদথৈনং মে পুনর্দদাৎ॥ (৪:২৫:৯, ১০) এ ঠিক কেনাবেচাও নয়, ভাড়া খাটানো; ইন্দ্র শত্রুনাশে দক্ষ— এই বিশ্বাস যে, সমাজে ওতপ্রোত, সেখানে জাগ্রত একটি ইন্দ্রমূর্তি নিয়ে এ ভাবে ব্যবসা চলবে সেটা বেশ কল্পনা করা যায়।

পরবর্তী কালের সমাজে সুরাপান ও মাদকসেবন মহাপাতক বলে গণ্য হলেও দেবরাজ ইন্দ্রের সোমপানে অত্যধিক আসক্তি নিয়ে ঋগ্বেদে কোনো সংকোচ নেই। সৈনিক চিরকালই যুদ্ধকালে মাদক সেবন করে; বিজয়ী বীর আর্যসেনাপতি ইন্দ্রের সোমে রীতিমত নেশা হত। ইন্দ্রকে আহ্বান করা হচ্ছে: তৃষিত গৌরমৃগের মতো সোমপান কর। (১:১৬:৫) প্রলুব্ধ করা হচ্ছে: এই সোম তীব্র মধুমান, এই কাম্য সোম পান করে মত্ত হও। (২:৪১:১৪) ইন্দ্রের জঠর যেন সোমে পূর্ণ হ্রদ (৩:৩৬:৮), সোমপানের তৃপ্তিতে ইন্দ্র দাড়ি নাড়ছেন— প্রোধুবৎশ্মশ্রুষু প্রীণানঃ। (২:১১:১৭) ইন্দ্রের সোমের নেশা নিয়ে অতিশয়োক্তিও পাই: একবারে তিনি ত্রিশ সরোবর পরিমাণ সোম পান করেন— একয়া প্রতিধাপিবৎ সরাংসি ত্রিংশতম/ইন্দ্রঃ সোমস্য কাণুকা॥ (৮:৭৭:৪) সোমযাগ সমাজে বিস্তার লাভ করতে করতে সোম সম্বন্ধে উদ্দীপনা বাড়তে লাগল। সোমের নেশার চমৎকার বর্ণনা নবম (সোম) মণ্ডলে: যেখানে অজস্র জ্যোতি, স্বর্গ যেখানে নিহিত, যেখানে আনন্দ, মোহ, কাম, স্বধা, তৃপ্তি— হে সোম, সেখানে আমাকে অমৃত কর। (৯:১১৩:৭-১১) সোমপায়ীর মনে সোমের উন্মাদক প্রভাবে যে তুরীয় অবস্থা আসে সেই উপলব্ধিরই বর্ণনা এখানে। বলা বাহুল্য, সোমযাগের প্রচার ও প্রসারের মূলে সোমপানজনিত আনন্দ-উন্মাদনাও কার্যকরী ছিল। 'সত্র' হল দ্বাদশবর্ষব্যাপী সোমযাগ। আরও দীর্ঘতর সোমযাগেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু সত্র বেশ বহুল-অনুষ্ঠিত যজ্ঞ ছিল; সোমযাগের বাইরে অন্যান্য যজ্ঞ এত দীর্ঘকালব্যাপী নয়। এর থেকে সোমপান সম্বন্ধে আগ্রহের একটা পরিচয় পাওয়া যাবে। বেশ কিছু যজ্ঞে সোমের সঙ্গে বা স্বতন্ত্রভাবে সুরাও ব্যবহৃত হত; সাধারণত সে-যজ্ঞের যজমান থাকত ক্ষত্রিয়।

বৈদিক সমাজ বলতে যে সর্বসুখময়, আদর্শ, নিষ্পাপ সমাজের কল্পরূপ সাধারণ ভারতীয়দের মানসলোকে উদিত হয়, ঋগ্বেদ-সংহিতায় চিত্রিত সমাজে তার কোনও সমর্থন নেই। বস্তুত ঋগ্বেদের প্রধান ও অনন্য আকর্ষণ এইখানেই: সুখে দুঃখে পাপে পুণ্যে সাধারণ

সজীব সমাজের যে রূপটি এখানে প্রতিভাত তা ওই বাস্তবনিষ্ঠার জন্যেই এত মূল্যবান। অত প্রাচীনযুগের সমাজের এত পূর্ণায়ত আলেখ্য আমরা অন্যত্র পাই না, হোমারও এর অন্তত তিন শতক পরের। এ কথা সত্য যে *ঋগ্বেদ-সংহিতা*-য় তৎকালীন সমাজের পূর্ণচিত্র নেই। প্রথমত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমাজ— যেখানে চাষি চাষ করছে, রাখাল গরু চরাচ্ছে, অগণ্য মজুর খাটছে; বহু বিভিন্ন শ্রমশিল্পে— সেই বৈশ্যশূদ্রের সমাজ এখানে উপেক্ষিত; প্রাসঙ্গিক উল্লেখ বা উপমায় যেটুকু পাওয়া যায়, তা ছাড়া তাদের বিষয়ে কিছুই আমরা জানতে পারি না। ঐশ্বর্যবান্ রাজা যিনি যজমান, পুরোহিতদের যিনি দক্ষিণা দেবেন— তাঁর কথা ও তাঁর আশ্রিত ঋত্বিক পুরোহিতদের কথাই এখানে প্রধান ভাবে আছে। দেবচরিত্রের মধ্যে গৌণ অপ্রত্যক্ষ ভাবে সামাজিক মানুষই প্রতিফলিত, এ কথা সত্য। কিন্তু সে চিত্র অনেকটাই অনুমাননির্ভর, অস্পষ্ট। যেটুকু পাওয়া যায় তা অপেক্ষাকৃত বিদ্বান্ ও বিত্তশালীরই চিত্র।

আর পাঁচটা সমাজে যেমন আদর্শবাদ থাকে তেমনই এ সমাজেও ছিল; আবার অন্য-সব সমাজের মতো এখানে শঠতা, ক্রূরতা, ব্যসন, প্রতিহিংসাও ছিল; অর্থাৎ এখানে পাই সজীব মানুষের সমাজের রূপ। এরা দেবতাকে প্রলোভন দেখিয়ে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করে; এদের দেবতাও প্রলুব্ধ হন, যেমন বৃষাকপি সূক্তে ইন্দ্র বলছেন, বৃষাকপির বাড়িতে আমার জন্যে পনের-বিশটা ষাঁড়ের মাংস রাঁধা হচ্ছে তাই খাব আর সোমরসে জঠর পূর্ণ করব— উক্ষো হি মে পঞ্চদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম্/ইতাহমদ্মি পীব ইদুভা কুক্ষী পৃণন্তি মে॥ (১০:৮৬:১৪) তেমনই আবার এরা সৃষ্টিরহস্যের আদিবিন্দুতে পৌঁছবার জন্যেও ব্যাকুল। লক্ষ্য করি, তত্ত্বমূলক সূক্ত গুলিতে কি আত্যন্তিক উৎকণ্ঠা ঔৎসুক্য নিয়ে এরা জীবনরহস্যের শেষ আবরণখানিকে উন্মোচন করতে উদ্যত। বিত্তগত শ্রেণিবিভাগ, জন্মগত জাতিভেদ— এই বহুধাবিভক্ত সমাজে থেকেও অস্পষ্ট ভাবে একটা সংহতির সন্ধানে অনির্দেশ্য কোনও তত্ত্বগত বৃহতের মধ্যে ভেদাভেদ ঘুচিয়ে মিলে যাওয়ার স্বপ্নে এরা সৃষ্টি করেছে 'পুরুষ'কে, 'ব্রহ্মা'কে, 'বৃহস্পতি'কে, 'পরমাত্মা'কে। তেত্রিশ কোটি দেবতাকে (১:৪৫:২) হবির্দান করেও সন্ধান করেছে একক কোনও স্রষ্টার। সন্দেহ করে নেম ভার্গবের ভাষায় বলেছে: কে সেই ইন্দ্রকে দেখেছে? কার স্তব করি আমরা?— ক ঈং দদর্শ কমভি স্তবাম (৮:১০০:৩) কার উদ্দেশ্যে হবির্দান করব? কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। (১০:১২১ সূক্তের ধ্রুবপদ) কেই-বা নিঃসংশয়ে জানে, কে বলবে, কোথা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কোথায় উৎস এ সৃষ্টির... সে-ই হয়তো জানে, কিংবা সেও হয়তো জানে না— কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। ...সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ। (১০:১৩০:৬, ৭) মনে হয়, এই সংশয়ে ঋগ্বেদের ঋষি আমাদের কাছে অনেক বেশি সজীব ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেন, কারণ চক্ষুষ্মান্ মানুষ কোনও যুগেই অন্ধ বিশ্বাসে সব কিছু মেনে নিয়েছে এটা ভাবতে হলে হতাশ লাগত। এবং ঋগ্বেদে মানবিকতার চূড়ান্ত স্বাক্ষর তার জটিল দ্বিধাগ্রস্ত চৈতন্যে, এক ধরনের অক্ষয় মূল্য এই ক্রটিবিচ্যুতিশীল সংশয়ী মানুষের চিত্রণে। ভক্তির যুগ ছিল না সেটা, বরং ইষ্টসিদ্ধির জন্যে যে এক ধরনের বিশ্বাসের প্রয়োজন, তাই ছিল অধিকাংশের মনে বহুদিন পর্যন্ত। কিন্তু

নিশ্চয়ই বহু বহুবার যজ্ঞ করেও অভীষ্ট লাভ হয়নি অথবা কাকতালীয়বৎ লাভ হলেও মানুষের যে সন্দেহ করবার ক্ষমতার মধ্যে তার অগ্রগতির বীজ নিহিত সেই সংশয়, সেই ঐশী অতৃপ্তির পরিচয়েই সে-যুগের মানুষ আমাদের কাছে বাস্তবের চূড়ান্ত স্বীকৃতি পায়।

সমস্ত ঋকে সমস্ত যজ্ঞে *ঋগ্বেদ*-এর মানুষ চেয়েছে এই পৃথিবীতে দীর্ঘকাল ধরে সুস্থ নির্বিঘ্ন স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করতে। এই আকুতিই মধ্যযুগের শেষে ভারতবর্ষে আবার উচ্চারিত হয়েছে: আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। দুধভাতের সঙ্গে তার মননের ক্ষুণ্নিবৃত্তিও সে অপরিহার্যরূপেই চেয়েছে; জানতে বুঝতে উপভোগ করতে চেয়েছে জীবনকে পূর্ণ ভাবে, কারণ তা অভাব্য। *ঋগ্বেদ* কখনওই এ কথা বলেনি যে মর্ত্যজীবন বন্ধন, এর থেকে মুক্তিই পরম লক্ষ্য: বরং বারবার দ্বিধাহীন ভাবে ঘোষণা করেছে জীবন আনন্দের, যতদিন ধরে যত ভাবে এ আনন্দ ভোগ করা যায় তারই চেষ্টা করতে হবে। এই মানসভূমিতেই সে দিন রবীন্দ্রনাথ আবার একবার বলেছেন: মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। তিন হাজার বছর আগে ঋগ্বেদে উচ্চারিত হয়েছিল জীবনের লক্ষ্য: জীবাতবে ন মৃত্যবে— বাঁচবার জন্যে, মরবার জন্যে নয়। (১০:৬০:১০)

ঋগ্বেদ-এর সৌরসূক্তে কাব্য

ঋগ্বেদ-এর ধর্ম এক কথায় সূর্যোপাসনা। বৈদিক আর্যরা যে ধর্ম নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন তার মধ্যে নানা নামে, নানা আকৃতি ও প্রকৃতিতে সূর্যের স্তুতি আছে। এই স্তুতিগুলির একটা আনুষ্ঠানিক উপযোগিতাও ছিল এবং সেটা পুরোপুরি সাহিত্যের প্রয়োজনে নয়; তবু শুধু অনুষ্ঠানের জন্যই সূক্তগুলি রচিত হয়নি, তাই *ঋগ্বেদ*-এর এই সব মন্ত্রগুলির মধ্যে অনেকখানি স্বতঃ উৎসারিত আবেগ রয়ে গেছে।

মোটামুটি ১৫০০ থেকে ১০০০ বা ৯০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ হচ্ছে ঋক্‌মন্ত্রগুলির রচনাকাল। এ সময়ে সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও আলোচনা শুরু হয়নি, স্বতঃস্ফূর্তি ও স্বচ্ছতা এ কাব্যের প্রধান গুণ। 'ছান্দস' বা বৈদিক ভাষা আজ আমাদের দুর্বোধ্য ঠেকে। রচনা এত বাক্‌সংযত ও সংক্ষিপ্ত যে ভাষ্য ছাড়া বোঝা দুরূহ; কিন্তু সে দিন এ ভাষা কথ্যভাষা থেকে হয়তো বেশি দূরে ছিল না। সহজ আবেগকে তীক্ষ্ণতর ও মধুরতর করাই ছিল অলংকার প্রয়োগের উদ্দেশ্য। অলংকার তাই উপলব্ধির প্রকাশকে জটিলতর করে তুলত না, অর্থবোধে ব্যাঘাত জন্মাত না। উপলব্ধির মধ্যেও একটা ঋজু বলিষ্ঠতা এ রচনার বৈশিষ্ট্য। সমাসের প্রয়োগ অত্যন্ত পরিমিত, সন্ধি যথাসম্ভব সহজ ও সুবোধ্য। লেখা আবিষ্কারের আগেকার রচনা, তাই কণ্ঠস্থ করার সুবিধার জন্যে অনাবশ্যক জটিলতা সযত্নে পরিহার করা হত। স্বরে পাঠ করা হত অথবা সুরে গাওয়া হত— সেও একটা কারণ যার জন্যে এ কাব্য এত সুখপাঠ্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা *ঋগ্বেদ*-এ আর্যদের যে জীবনবোধ প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্যে এমন একটি অকৃত্রিম ও প্রবল আবেদন আছে যাতে মনের মধ্যে সোজাসুজি সংবেদনের সাড়া জাগায়।

সূর্য এদের কাছে ছিল জীবনের প্রতীক; যে জীবন চারিদিকে অন্ধকারের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও আলোর মধ্যে নিত্য জয়যুক্ত হচ্ছে সেই জীবন সূর্যের দান। কৃষিচারী সভ্যতা সূর্যকে অন্নদাতা বলে চিনেছে, বৃষ্টিনির্ভর কৃষির জন্যে তাই কৃষক সূর্যের কাছে যথাকালে বর্ষণ ভিক্ষা করেছে। পশুচারী সমাজ সূর্যের কাছে পশুপালনের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি প্রার্থনা করছে। রোগী রোগমুক্তি ও স্বাস্থ্য কামনা করছে সূর্যালোকের কাছে মুমূর্ষু দীর্ঘ মৃত্যুঞ্জয় জীবনের স্বপ্ন দেখছে চিরনবীন সূর্যের কাছে। সর্বোপরি সূর্য মানুষের কাছে জীবনের চরম বিজয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে; কারণ প্রতি রাত্রের অন্ধকারের পরে সূর্যের নিঃসংশয় উদয়ের দ্বারা জীবনের উপর মানুষের বিশ্বাস প্রত্যহ জয়যুক্ত হচ্ছে।

যদিও *ঋগ্বেদ*-এর সমস্ত সৌরদেবতাই হিরণ্যবর্ণ, স্বর্ণাভবেশ ও হিরণ্ময়রথে আরূঢ়, তথাপি তাঁদের প্রকৃতি ও কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। প্রথমেই ধরা যাক সূর্য। স্তবে বলা হয়েছে,

'উদুত্যদ্দর্শতং বপুর্দিব এতি প্রতিহুরো যদীমাশুর্বহতি/দেব এতশো বিশ্বস্মৈ চক্ষসে অরম্। (ঋগ্বেদ ৭:৬৬:১৪)— অন্তরীক্ষের কাছে সেই দর্শনীয় মূর্তি উদিত হচ্ছে, দ্রুতগামী অশ্বরা তাঁকে বহন করে; বিশ্বলোকের নয়নরঞ্জন সেই দেব।' 'শীর্ষ্ণোঃশীর্ষ্ণোর্জগতস্তস্থুষস্পতিং সময়া বিশ্বমা রজঃ/সপ্ত স্বসারঃ সুবিতায় সূর্যংবহন্তি হরিতো রথে (৭:৬৬:১৫)।— সূর্য শীর্ষদেশেরও শীর্ষস্থানীয়, অর্থাৎ ঊর্ধ্বতম লোকে বিরাজিত, সমস্ত স্থাবর জগতের অধিপতি অথচ সর্বলোকের নিকটবর্তী। জগতের কল্যাণের জন্যে সাতটি দ্রুতগতি অশ্ব তাঁকে রথে বহন করে আনছে।' 'তচ্চক্ষুর্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ পশ্যেম শরদঃ শথং জীবেম শরদঃ শতম্।' (৭:৬৬:১৬)— সূর্য দেবতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত চক্ষু, তাঁর স্তব করে আমরা একশ শরৎ দেখব, একশ শরৎ বাঁচব।' 'নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃতং সপর্যত/দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতনে দিবস্পুত্রায় সূর্যায় শংসত। (১০:৩৭:১)— মিত্র ও বরুণের সেই মহান্ চক্ষুকে যজ্ঞকর্মের দ্বারা উপাসনা কর, তিনি বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পান, দেবতারূপে জাত আকাশের পুত্র ও আকাশের কেতনস্বরূপ সেই সূর্যের স্তুতি কর।' 'সূর্য আকাশকে ঊর্ধ্বে ধরে রাখছে, যেমন সত্য ধরে রাখছে ভূমিকে। আদিত্যেরা স্থিতিলাভ করছে ঋতের দ্বারা, আর ঊর্ধ্ব আকাশে বিরাজিত সোম— সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌ। ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোম অধি শ্রিতঃ।।' (১০:৮৫:১)

সবিতা কথাটির মানে জন্মদাতা, সূর্যবাচক দেবতাদের জন্মদাতারূপে কল্পনা করা হয়েছে সবিতাকে, অর্থাৎ তিনি আলোকসর্বস্ব জ্যোতিষ্কদের উৎপত্তিস্থল। আলোকপূজারী ঋষিরা এঁর কাছে প্রার্থনা করছেন মঙ্গল, নিরাপত্তা ও দীর্ঘায়ুর জন্যে— 'সবিতা পশ্চাতাৎ সবিতা পুরস্তাৎ সবিতোত্তরাত্তাৎ সবিতাধরাত্তাৎ/সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিং সবিতা নো রাসতাং দীর্গমায়ুঃ। (১০:৩৬:১২)— সবিতা আমাদের পশ্চাতে, সম্মুখে, উপরে নিচে থাকুন, সর্বপ্রকার মঙ্গল ও দীর্ঘপরমায়ু দান করুন।' সবিতা হল প্রভাতের সেই মুহূর্তটি, পূর্বাকাশের সেই বিন্দুটি যেখানে সূর্যের উদয় সম্ভাবনারূপে নিহিত, রাত্রি ও রাত্রির সমস্ত অমঙ্গলের নিশ্চিত পরাজয় যেখানে সূচিত। তাই ঋক্‌মন্ত্রকার বলছেন— 'অদ্যা নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎ সাবীঃ সৌভগম। পরা দুঃস্বপ্ন্যং সুব।' (৫:৮২:৪)— হে দেব সবিতা প্রজাবৃদ্ধিরূপ সৌভাগ্য আজ আমাদের প্রদান কর, আর রাত্রির দুঃস্বপ্নকে দূরে প্রেরণ কর।' অন্ধকারভীরু দুঃস্বপ্নকাতর মানুষের এই প্রার্থনা আলোকের কাছে।

অর্যমার সঙ্গে আর্য নামটির সাদৃশ্য আছে। আর্য অর্থাৎ মার্জিত ও সুনীতিপায়ণ আচরণ যাঁদের, অর্যমা হয়তো আদিতে তাঁদের কুলদেবতা ছিলেন। দান সম্বন্ধে এক সূক্তে আছে— 'মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য/নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।। (১০:১১৭:৬)— মূর্খ কৃপণ যে তার অন্ন বৃথা, আমাদের সখা অর্যমাকে সে পুষ্ট করে না; যে একা অন্ন ভোজন করে সে একাই পাপ বহন করে।' এখানে অর্যমা দান করে ভাগ করে অন্ন ভোগ করবার আর্যজনোচিত আদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত; সূর্যের সঙ্গে এর সংযোগ অনেকটা বাঁকাপথে।

যেমন পূষার। পশুর সঙ্গে হয়তো ভাষাতাত্ত্বিক ভাবে পূষার নামের সংযোগ আছে, কার্যতও ইনি পশুর রক্ষা ও পুষ্টির সঙ্গেই সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত; সূর্যের সঙ্গে এঁর সংযোগ আপাতদৃষ্টিতে ক্ষীণ। দলছাড়া হারানো পশুকে পথ খুঁজে ফিরিয়ে আনেন পূষা, এই কারণেই পরলোকগত আত্মীয় সম্বন্ধে পূষাকে অনুনয় করে বলা হয়েছে তিনি যেন সেই অপরিচিত জগতে পথভ্রষ্টদের পথ দেখিয়ে দেন। পথের দেবতা পূষা; ইহলোকেও, পরলোকেও। 'পূষার সোনার নৌকাগুলি আকাশের সমুদ্রে চলাফেরা করে— যাস্তে পূষন্নাবোঃ অন্তঃ সমুদ্রের হিরণ্যয়ীরন্তরিক্ষে চরন্তি।' (৬:৫৮:৩ ক খ) এই পূষা প্রত্যক্ষ ভাবেই সূর্য; প্রাচীন মিশরের সূর্যদেবতা 'রা' যেমন সোনার নৌকায় আনাগোনা করতেন ইনিও তেমনি করেন।

বিষ্ণু পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান দেবতা হয়ে ওঠেন, কিন্তু *ঋগ্বেদ*-এ বিষ্ণুর স্থান গৌণ। 'ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা।' (১:২২:১৯ গ) ইন্দ্রের সহচারী সখা বিষ্ণু, স্বতন্ত্র ভাবে এঁর স্তব খুব কম আছে। ইনি অমিতবিক্রম, যেন পাহাড়ি সিংহ— 'প্রতদ্বিষ্ণু স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।' (১:১৫৪:২ ক খ) তাঁর তিনটি বিপুল পদক্ষেপে বিশ্বভুবন সমাশ্রিত— 'যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।' (১:১৫৪:২) সাধারণ ভাবে প্রাতঃসূর্য, মধ্যাহ্নসূর্য ও অস্তসূর্য আকাশের— এই তিনটি স্থান অধিক্রমণের জন্যে সূর্যের ত্রিপাদবিক্রমের কল্পনা। পরবর্তীকালে এরই ওপরে গড়ে উঠেছে বামনাবতারের কাহিনি। এঁর তৃতীয় পরমপদক্ষেপ মনীষীরা সর্বদা দেখতে পান। বিষ্ণু যেন আকাশে আয়ত একটি চক্ষু— 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ/দিবীব চক্ষুরাততম্।।' (১:২২:২০)

ঋগ্বেদ-এ সূর্যা বলে নারীরূপে একটি সৌর দেবতার সাক্ষাৎ পাই। প্রাচীন জার্মান উপকথায় ও উত্তর ইউরোপীয় দেবকল্পনাতেও এঁর দেখা পাওয়া যায়। ইনি সবিতার কন্যা; সোমের সঙ্গে এঁর বিবাহের বর্ণনা *ঋগ্বেদ*-এর শেষের দিকের একটি সূক্তে আছে। কিংশুকশল্মলি শোভিত সুদর্শন হিরণ্যবর্ণ, সুনির্মিত, সুচক্র রথে আরোহণ করে, সূর্যা, মঙ্গলময় অমৃতলোকে পতির কাছে যাও— 'সুকিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্/আ রোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব।।' (১০:৮৫:২০) বিবাহে সমাগত জনতাকে বলা হচ্ছে, এই সুমঙ্গলী বধূকে এসে দেখ, তোমরা ওকে সৌভাগ্য দান করে বাড়ি ফিরে যেও— 'সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত/সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়াথাস্তং বি পরেতন।' (২০:৮৫:৩৩) সূর্য ও চন্দ্রের বিবাহ একটি বহু প্রাচীন কল্পনা। সোমের এই সুন্দরী বধূটি সূর্যা; হিমের দেশে যখন আর্যরা বাস করত তখন উষ্ণতার আরামে যে তাঁদের পরিতৃপ্ত করত সে এই কল্যাণী সূর্যা।

ঋগ্বেদ-এর সৌরদেবতার স্তবে চরম কাব্যিকে উৎকর্ষ উষার বর্ণনায়। উষা সূর্যের সুন্দরী বধূ— 'উষো যাতি স্বসরস্য পত্নী।' (৩:৬১:৪) স্তুতিমতী অর্থাৎ স্তুতির অধিকারিণী নিম্নমুখী আরক্তবদনা এই যে রূপসী উষা, ইনি বিস্তৃত দশটি বাহুর মত দশটি দিক উদ্ভাসিত করে চলেছেন— 'ইয়ং যা নীচ্যর্কিণী রূপা রোহিণ্যা কৃতা/চিত্রেষু প্রত্যাদর্শায়ত্যর্ত্তদশসু বাহুষু।।' (৮:১০১:১৩) ভোরে যখন মানুষ লাঙলে নিয়ে ক্ষেতে চাষ করতে যায় তখন সূর্য উজ্জ্বলকান্তি

উষার পশ্চাদ্ধাবন করেন, যেমন সুন্দরী নারীর অনুধাবন করে পুরুষ— 'সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ/যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম।।' (১:১১৫:২)। কেমন দেখায় এই সুন্দরী উষাকে? 'সুসংকাশা মাতৃমৃষ্টেব যোষাবিস্তন্বং কৃণুষে দৃশে কম্ (১:১২৩:১১)— যেন মায়ের নিজের হাতে সাজিয়ে দেওয়া সুরূপা কন্যাটি মানুষের দৃষ্টির সামনে নিজের তনু প্রকাশ করছে।' পূর্ব আকাশে যখন প্রথম উষার শুভ্র আলোর আভা বিচ্ছুরিত হয় তখন মনে হয় আকাশের কন্যা উষা যেন রাত্রির আকাশে স্নান করে উঠে তার শুভ্র তনু আমাদের সামনে উদ্ঘারিত করছে। আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে অপধ্বস্ত করে জ্যোতির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে— 'এষা শুভ্রা ন তন্বো বিদানোর্ধ্বের স্নাতী দৃশয়ে নো আস্থাৎ/অপ দ্বেষো বাধমানা তমাংস্যুষো/দিবো দুহিতা জ্যোতিষাগাৎ।।' (৫:৮০:৫)

কিন্তু এই সুন্দরী উষার একটা নিষ্ঠুর দিক কবির চোখে পড়েছে; ঋগ্বেদ-এর কবি বারবার এই সুন্দর ও নিষ্ঠুরের দ্বন্দ্বের আভাস দিয়েছেন: যে উষা জীবকে পালন করে, যার আগমনে পাখি আকাশ ওড়ে, সেই প্রতিদিন মানুষকে জীর্ণ করে। অর্থাৎ নতুন দিনের মধ্যে গত দিনের অবসান নিহিত বলে প্রতি প্রভাতে উষা পরমায়ুর ক্ষয় সূচিত করে। কান্তিমতী রক্তবসনা সুন্দরী একদিকে মনোমুগ্ধকারিণী, অন্যদিকে সে অনায়াস ঔদাসীন্যে মানুষকে একদিন একদিন করে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেয়— 'আ ঘা যোষেব সুনর্যুষা যাতি প্রভুঞ্জতী জরয়ন্তী বৃজনম।।' (১:৪৮:৫) 'পুনঃপুনর্জয়মানা পুরাণী সমানং বর্ণমভিশুম্ভমানা/শ্বঘ্নীর কৃত্বির্বিজ আমিমানা মর্তস্য দেবী জরয়ন্ত্যায়ুঃ।। (১:৯২:১০)— পুনঃ পুনঃ উদিত হয়ে পুরাতনী উষা একই রূপমাধুর্যে প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু ব্যাধনারী যেমন করে তার শিকার করা পাখির ডানা ছিঁড়ে দেয়, তেমনই করে এই সুন্দরী মর্ত্যমানুষের আয়ু জীর্ণ করছে।' উষার চিরযৌবনের সঙ্গে মানুষের পরমায়ু-ক্ষয়ের এই উপলব্ধি হয়তো প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় কবিকল্পনার একটি সম্পদ, যার অন্যতম রূপায়ণ চিরনবীনা এয়স্ ও স্থবির টিথোনসের প্রেম-কাহিনির মধ্যে বিধৃত।

সমস্ত সৌরদেবতার কাছে পর্যায়ক্রমে প্রার্থনা করা হয়েছে মঙ্গল শান্তি ও শ্রী— 'শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা/শং ন ইন্দ্র বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।।' (১:৯০-৯) সূর্য যখন প্রত্যক্ষগোচর তখন মানুষ তাকে দেখছে বীর্যবান্, সুন্দর জীবন সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রত্যয়ের প্রতীক; আর সূর্য যখন মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত তখন মানুষ কল্পনা করেছে সেই অদৃশ্য লোকে সৌরদেবতা, বিষ্ণুর অধিষ্ঠান যেখানে মধুর উৎস— 'বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ।' (১:১৫৪:৫) সূর্যের মধ্যে আর্যরা পেয়েছিলেন এক পরম আশ্বাস, নিরাপত্তা, স্থিতি ও শ্রীবৃদ্ধি। তাই তাঁরা বলছেন, 'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ (১:১১৫:১)— স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা হল সূর্য।'

বৈদিক সমাজে নারীর স্থান

এক

মাঝে মাঝেই বক্তৃতায় বা বেতারে শুনি, প্রবন্ধে বা বইয়ে পড়ি প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীর স্থান খুব উঁচুতে ছিল। মুসলিম আক্রমণের পরই নাকি নারীর স্থান সমাজে নেমে যায়। এ সব মন্তব্যের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্যে আমাদের হাতে তথ্য আছে, বিশেষত বৈদিক সাহিত্যে। একেবারে প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক যুগেই নাকি নারীর স্থান খুব উঁচুতে ছিল। বৈদিক সাহিত্য ছাড়া তো সে যুগের কোনও ইতিহাস পৌঁছয়নি আমাদের কাছে, কাজেই সেই সাহিত্যের থেকেই খোঁজ করতে হবে সত্যি সত্যি নারীর স্থান কতটা উঁচুতে ছিল, এ প্রবন্ধে সেই অনুসন্ধানের চেষ্টা।

বৈদিক যুগ বলতে যে যুগে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল তাই বুঝতে হবে। এ সাহিত্য প্রধানত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্রসাহিত্য, অর্থাৎ, প্রধানত শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্মসূত্রই। আধুনিক সমস্ত পণ্ডিতই প্রাচীনতম বেদ অর্থাৎ *ঋগ্বেদ*-কে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে দশমের শেষ বা নবমের শুরুর রচনা বলে মনে করেন। *যজুর্বেদ* ও *সামবেদ* এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলি খ্রিস্টপূর্ব নবম থেকে সপ্তম শতকের। *অথর্ববেদ*-এর প্রাচীনতম অংশও এই সময়ের; বাকি অংশ ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও উপনিষদগুলি খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে পঞ্চম শতকের রচনা। সূত্রসাহিত্য সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের মধ্যে রচিত। তাহলে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে খ্রিস্ট্রিয় চতুর্থ শতক এই দেড় হাজারের কিছু বেশি সময়ের সাহিত্যে সমাজের যে চিত্র সংগ্রহ করতে পারি তারই মধ্যে খুঁজব নারীর স্থান। এটাও উল্লেখ করা যায় যে, এর শেষ হাজারখানেক বছরের ইতিহাসে সাহিত্য ছাড়াও অন্য উৎস আছে, যেমন প্রত্নতত্ত্ব, শিলালিপি, তাম্রশাসন, দুটি মহাকাব্য, প্রথম যুগের পুরাণ, বৌদ্ধ সাহিত্য, ইত্যাদি।

যাযাবর পশুচারী আর্যরা এল উত্তরভারতে— যেখানে সিন্ধুসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিন্ধু সভ্যতার লোকরা কৃষিজীবী এবং নগরসভ্যতার যুগে বাস করত, ধাতুর দিকে যুগটা ছিল ব্রোঞ্জ যুগ। ইতিহাসের সাক্ষ্য হল বৈদিক আর্যদের সঙ্গে লোহা ঢোকে ভারতবর্ষে। সম্ভবত ইন্দ্রের বজ্র, যার জোরে আর্যদলের সেনাপতি ইন্দ্র প্রাগার্যদের হারালেন, সেটা ছিল লোহার ফলকযুক্ত কোনও অস্ত্র, যার সামনে প্রাগার্যদের নরম ধাতু অস্ত্র দাঁড়াতে পারেনি। এছাড়াও আর্যদের ছিল ঘোড়ায় টানা রথ, প্রাগার্যদের হাতি তার মত দ্রুতগামী নয়। প্রাগার্য সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের যে বহির্বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল আর্যরা আসবার পরেই তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আবার শুরু হয় দু তিনশো বছর পরে।

যাযাবর পশুচারী আর্যরা এদেশে এসে ধীরে ধীরে এদের পরাজিত করে প্রায় সমস্ত আর্যাবর্ত অধিকার করে। প্রাগার্যদের সঙ্গে বিয়ে ও প্রতিবেশিত্বের মধ্যে দিয়ে আর্যরা ক্রমে চাষ করতে শেখে ও যাযাবর থেকে গ্রামীণ মানুষ হয়ে ওঠে। পোড়া ইটের বাড়ি তৈরি করতে শেখে ও থিতু হয়ে এক জায়গায় বসবাস করতে থাকে। যাযাবরদের সমাজসংস্থা ছিল গোষ্ঠী (tribe) ও কৌম (clan)-তে বিভক্ত। কৃষি শিখে কৃষিজীবী হওয়ার পর এ সমাজগঠন ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে। ক্রমে ক্রমে 'কুল'-এর প্রবর্তন হয়, অর্থাৎ একটা বাড়িতে তিন চার পুরুষের পল্লবিত বৃহৎ পরিবার। তারপর আসে যৌথ পরিবার, পুরুষের সম্পর্ক ধরে দু-তিন পুরুষের পরিবার। সবশেষে একক পরিবার, এক পুরুষের সংসার। এসবের সঙ্গেই উৎপাদন ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, কিন্তু একটি ব্যাপার ক্রমশ পরিণতির দিকে এগোচ্ছিল: সমাজে শূদ্র ও নারীর স্থানের অনিবার্য অবনমন, অর্থাৎ ক্রমেই নারীর স্থান সমাজে ও পরিবারে নেমে যাচ্ছিল। উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশ ক্রমেই কমে যাচ্ছিল। যদিও গৃহকর্মে তার পরিশ্রম ও দায়িত্ব যথেষ্টই ছিল তবু তাকে 'ভার্যা' অর্থাৎ অন্যের দ্বারা ভরণীয়া, স্বামীর অন্নে প্রতিপালিত এই সংজ্ঞা দেওয়া হল। মনে রাখতে হবে 'ভৃত্য' আর 'ভার্যা' শব্দ দুটোর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একই: যাকে ভরণ করতে হয়। স্ত্রী স্বয়ং অন্ন উৎপাদন করে না, তাই সে ভরণীয়া। (ইংরেজিতে মধ্যযুগ পর্যন্ত স্বামীকে লর্ড বলা হত; এই শব্দও স্ত্রী ও ভৃতে— উভয়ের পক্ষে একই। এবং এরও ব্যুৎপত্তি hlaf ward থেকে, অর্থাৎ অন্ন (hlaf loaf/রুটি)-র জন্য যার কাছে আশ্রিত (ward))।

বৈদিক যুগের শেষ দিকে অনেক বৈদেশিক আক্রমণ হয় তার ফলে নারীহরণের ও বর্ণসংকরের আশঙ্কায় নারীকে অন্তঃপুরে ঠেলে দেওয়া হয় ও তখন থেকে নারী অনেক বেশি অসূর্যম্পশ্যা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ঘরে-বাইরে যখন যেখানে কোনও বিপত্তি দেখা দিয়েছে তার দামটা দিতে হয়েছে শূদ্র এবং অথবা, নারীকে। নারীর ক্ষেত্রে সেটা কেন এবং কেমন করে ঘটল তাই দেখব এ প্রবন্ধে।

দুই

ঋগ্বেদ হল বৈদিক সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ। এখানে সরাসরি নারীর স্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উক্তি নেই। কিন্তু নানা বর্ণনা উপমান থেকে নারীর স্থান সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। *ঋগ্বেদ*-এর রচনায় কয়েকটি স্তর আছে, তার প্রথম স্তরের মন্ত্রগুলিতে নারী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচারিণী। দেবী উষা কোনও মন্ত্রে সূর্যের বধূ, কোথাও মাতা, কোথাও কন্যা; বিশ্বজনের দৃষ্টির সামনে আপন দেহশ্রী উদ্‌ঘাটন করছেন। (১:৪৬:৪) কখনও বা শুনি উষা স্মিতহাসিনী; নববধূ যেমন করে স্বামীর সামনে নিজেকে প্রকাশ করে, উষা তেমনই করেই নিজের আবরণ উন্মোচন করছেন। (১:১২৪:৭) সুন্দরী সুসজ্জিতা উষার দেহটি যেন মায়ের নিজের হাতে স্নান করিয়ে দেওয়া ও সাজিয়ে দেওয়া কন্যার দেহটি। (১:১২৩:১২) শুনতে পাই, অগ্নি তেমনই করে স্তোতার স্তবে খুশি হন যেমন করে প্রেমিক স্বামী তার বধূর সান্নিধ্যে আনন্দ

পায়। (৩:৬২:৮) অগ্নি তেমনই পবিত্র যেমন পবিত্র স্বামীর দ্বারা সম্মানিত বধূ। (১:৭৩:৩) দেখা যাচ্ছে, দেবতার আনন্দ দেবতার পবিত্রতার উপমান, মানবের প্রেম, মানবীর শুচিতা। এই যুগেই শুনি নারী নিজেই তার জীবনসঙ্গী বেছে নেয়— স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ। (১০:২৭:১২) আবার একটু পরের যুগে শুনি, প্রিয়া স্ত্রী যেমন প্রিয় স্বামীতে আনন্দ পায়, হে ভগদেব, তুমি যেন আমাতে তেমনই সুখী হও। (*তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* ২:৪:৬:৫৬) বহুবার একটি উপমা পাই, উপাসক তাঁর দেবতার কাছে আসছেন যেমন করে কোনও পুরুষ তার কাম্য নারীর কাছে আসে বা তার পেছনে পেছনে যায়— মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ। (*ঋগ্বেদ* ৭:৮০:২) আরও অনেক জায়গায় এই ধরনের কথা আছে। ঘৃতধারা সোমের দিকে ধাবিত হচ্ছে যেমন করে অলংকৃতা সুন্দরী তরুণী স্বামীর কাছে যায়। (*ঋগ্বেদ* ৪:৫৮:৯)

যাকে বলা হয় অবৈধ প্রণয়, তা নিয়ে ঋগ্বেদের ঋষির কোনও কুণ্ঠা নেই। অনাদিকাল থেকেই তা সকল সমাজেই আছে, তাই তা যেন সর্বজনস্বীকৃত একটি সামাজিক তথ্য। সেই জন্যে, 'জারো ন', উপপতির মত, এই উপমাটি বারেবারেই পাই। যমযমী সূক্ত (১০:১০)-তে ভাইবোনের ও নাভানেদিষ্ঠ সূক্ত (২০:৬১:৫-৭)-তে পিতাপুত্রীর আসক্তির কথা আছে, নাভানেদিষ্ঠে মিলনের উল্লেখও আছে। অর্থাৎ এটা প্রচলিত সমাজনীতির ব্যতিক্রম। মাঝে মাঝে সমাজে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মিলন দেখা যায় বলেই *ঋগ্বেদ*-এর ঋষিও অকুণ্ঠ ভাবে এর উল্লেখ করেছেন। সোম যজ্ঞপাত্রের দিকে যাচ্ছে যেমন কামুক তার বন্ধুপত্নীর দিকে যায়। (৯:৯৬:২২, ২৩; ১০১:১৪) নদীরা বিশ্বামিত্রের দিকে যাচ্ছে যেমন করে চুম্বনে উদ্যত পুরুষের কাছে নারী আনত হয়। (৩:৪৫:১) সোমরস বসতীবরীর জলে আনন্দিত হয় যেমন উত্তম নারীর সান্নিধ্যে পুরুষ আনন্দিত হয়। এমনই অসংখ্য দৃষ্টান্তে নারীপুরুষের প্রেম ও মিলনের অসংকোচ উল্লেখ উপমানে।

নারীর ইচ্ছাক্রমে বা অনিচ্ছাক্রমে নারীহরণের কথাও *ঋগ্বেদ*-এ মধ্যেমধ্যে আছে। পুরুমিত্রের কন্যাকে বিমদ হরণ করছেন। (১:১১২:৭; ১১৬:১) কোনও পুরুষ রাত্রে একটি নারীকে হরণ করতে যাবেন তাই প্রার্থনা করছেন, মেয়েটির ভাইয়েরা যেন জেগে না যায়, কুকুরগুলো যেন ডেকে না ওঠে। (৭:৫৫:৫-৮)

বিবাহের কন্যাপণের কথা পাওয়া যায়। ইন্দ্র আর অগ্নি ভক্তকে ধন দেন, অবাঞ্ছিত জামাতা যেমন প্রচুর ধন দিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকদের অনুকূল করে তাদের প্রীতিভাজন হয়। (১:১০৯:২) পুরুষের বহুপত্নীত্বের কথা কখনও স্পষ্টত (৭:২৬:৩) কখনও বা গৌণভাবে, সপত্নীনাশনের মন্ত্রগুলির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। কন্যার শরীরে ত্রুটি থাকলে একাধিকবার বরপণের কথা আছে। (৬:২৮:৫, ২০:২৭:১২) কুমারী কন্যার কথাও বেশ কয়েকবার আছে। এদের বলা হত অমাজু বা অমাজুরা, অর্থাৎ যারা বাপের বাড়িতেই বুড়ো হয়ে যায়। কিংবা কুলপা বা বৃদ্ধকুমারী বা জরৎকুমারী (১:১১৭:৭; ১০:৩৯:৩; ১০:৪০:৫) পরবর্তী কালে বিবাহ যেমন নারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছিল, *ঋগ্বেদ*-এর যুগে দেখছি তা ছিল না। *ঋগ্বেদ*-এ সহমরণ, পরবর্তী কালে যাকে সতীদাহ বলা হয়েছে, তার কোনও উল্লেখ নেই; বিধবা বেঁচেই

থাকত, কখনও বা দেওরের সঙ্গে তার বিয়ে হত, আর কখনও-বা আর বিয়ে হতই না। সে যাই হোক তার বেঁচে থাকার অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়া হয়নি, ধর্ম বা সমাজের দোহাই পেড়ে পুড়িয়ে মারাও শুরু হয়নি। দ্বিতীয়বার বিয়ের— দেওর ছাড়া অন্যকেও— অধিকারও স্বীকার করা হয়েছিল, কিছু পরেই তার প্রমাণ দেখতে পাব। বেদ রচনার উত্তরপর্বে অর্থাৎ *ঋগ্বেদ*-এর প্রথমাংশ রচনার পরে, প্রাগার্য প্রভাবেই হোক বা অন্য কোনও কারণে সামাজিক বিবর্তনের ফলেই হোক, প্রথম সহমরণের কথা শুনি *অথর্ববেদ*-এ। সেখানে এক জায়গায় শুনি, 'দেখলাম জীবিত নারীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃতের বধূ হতে।' (১৮:৩:৩২) কিংবা অন্যত্র 'এই নারী পতিলোকে যাচ্ছে, এ প্রাচীন রীতি অনুসরণ করছে।' (১৮:৩:১) প্রশ্ন থেকেই যায়, এ প্রাচীন রীতি আর্য না প্রাগার্য; কারণ ইন্দো-ইয়োরোপীয় অন্য সভ্যতাগুলিতে সহেমরণের কথা পাই না। এ প্রথা কত প্রাচীন? প্রাগার্য সিন্ধুসভ্যতার? বিধবা বেঁচে থাকলেই সব সময়ে তার জীবন সুখের হত না, তাই প্রার্থনা শুনি, 'যেন ইন্দ্রাণীর মত অবিধবা হই।' (*তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* ৩:৭:৫:৫১) এটা তো জানাই আছে, সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে 'যেন বিপত্নীক না হই' এমন প্রার্থনা কোথাও নেই। বরং এখন এর উল্টো কথাই শোনা যায়, 'ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার গরু।' সম্পত্তি হিসেবেও স্ত্রীর স্থান গরুর নিচে, কারণ নতুন গরু কিনতে টাকা লাগে, আর নতুন বৌ আনলে টাকা পাওয়া যায়। এই উত্তর-বৈদিক যুগে নারীর বহু বিবাহের কথাও শোনা যায়। *অথর্ববেদ*-এ শুনি, 'যে নারীর পূর্বে একজন পতি ছিল সে যখন দ্বিতীয় পুরুষকে লাভ করে তখন পঞ্চৌদন অজ দান করলে তার কোনো ক্ষতি হয় না।' (৯:৫:২৭) অন্যত্র শুনি, 'কোনো নারীর দশটি পতি থাকলেও সে যখন ব্রাহ্মণের পত্নী হয় তখন সেই ব্রাহ্মণই তার পতি, রাজন্য বা বৈশ্য পতিরা পতি নয়।' (৫:১৭:৮, ৯) এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য ব্রাহ্মণ পুরুষের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে অন্য বর্ণের হীনত্ব প্রতিপাদন করা। কিন্তু প্রসঙ্গত কোনও নারীর পক্ষে দশটি স্বামী গ্রহণের স্বীকৃতিও এতে আছে।

তিন

যজুর্বেদ-এর যুগেই সাহিত্যে আর্য প্রাগার্য সংমিশ্রণের স্পষ্ট চিহ্ন পড়েছে। অবশ্য *ঋগ্বেদ*-এর প্রথম মণ্ডলের প্রথমার্ধ ও দশমমণ্ডলেই এর সূত্রপাত। ততদিনে আর্যরা গ্রামীণ ও কৃষিজীবী; পোড়া ইঁটের ঘরবাড়ি তৈরি করছে; জনপদে, গ্রামে ও পুর বা শহরে বাস করছে। নানা বৃত্তি অবলম্বন করছে। সমাজে জটিলতা বেড়েছে, গোষ্ঠী ও কৌম ভাঙছে; ধীরে ধীরে যৌথ ও বৃহৎ পরিবারেই সমাজের ন্যূনতম সংগঠন দেখা দিচ্ছে। বহির্বাণিজ্য শুরু হয়েছে। ধনসম্পত্তি বাড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের সংখ্যা ও জটিলতা, পুরোহিতের সংখ্যা ও দক্ষিণার পরিমাণ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। এই সময়ে শুনি, 'দীক্ষার দিনে যজমান গণিকাসাহচর্য বর্জন করবেন, তার পরদিন পরস্ত্রীর এবং তৃতীয় দিনে নিজের স্ত্রীর।' (*তৈত্তিরীয় সংহিতা* ৬:৬:৮:৫) অর্থাৎ দীক্ষার দিনেও পরস্ত্রীর সাহচর্য নিষিদ্ধ ছিল না এবং গণিকাগমনের জন্যে দীক্ষার দিনে কোনও প্রায়শ্চিত্ত ছিল না।

যজ্ঞে যজমানের পত্নী পাশে থাকতেন, কিন্তু নিষ্ক্রিয় ভাবে। তাঁর উপনয়ন নেই, অতএব, 'ন স্ত্রী জুহুয়াৎ— নারী হোম করতে পারবে না।' (*আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ২:৭:১৫:১৭) অথচ অন্যত্র বারেবারে শুনি, 'পূর্বার্ধো বৈ যজ্ঞস্যাধ্বর্যুর্জঘনার্ধং পত্নী।' (*শতপথব্রাহ্মণ* ১:৯:২:২; ৩:৪:২২; ৫:২:১-১০) অর্থাৎ যজ্ঞের পূর্বার্ধ যজমান, উত্তরার্ধ যজমানপত্নী। কিন্তু এই অপরার্টি যজ্ঞে কোনও অংশগ্রহণ করত না; শুধু পাশে বসে থাকত। এতটাই নিষ্ক্রিয় তার ভূমিকা যে, রাম সোনার সীতা গড়িয়ে নিয়ে যজ্ঞ নিষ্পাদন করতে পেয়েছিলেন। *গৌতমধর্মসূত্র*-তে শুনি, 'অস্বতন্ত্রা ধর্মে স্ত্রী।— ধর্মাচরণে নারীর কোনও স্বাতন্ত্র্য নেই।' (১৮:১)

গৃহকর্ম ভিন্ন কোনও বৃত্তি কুলনারীর ছিল না। যে দু' একটি কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে পশম পাকানো ও বোনা, (*শতপথব্রাহ্মণ* ১২:৭:২:১১)— অন্যান্য কাজের সঙ্গেই তারা এটি করত। মেয়েদের শিক্ষার প্রসঙ্গে দেখি ব্রহ্মচর্য— যা বেদ অধ্যয়নের প্রবেশদ্বার— তা বহু প্রাচীন যুগেই নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ। অতএব শিক্ষালাভের পথ তার রুদ্ধ। *অথর্ববেদ* বলে, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা নারী স্বামী লাভ করে। (১১:৫:১৮)। মনে হয়, এ ব্রহ্মচর্য কোনও ব্রত, বা শিবপুজোর মতোই কিছু, স্বামীলাভই যার উদ্দেশ্য। *ঋগ্বেদ*-এ কিছু ঋষিকার নাম পাই, হয়তো তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষালাভের সুযোগ পেতেন; যেমন বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা, ও গোধা। পাণিনিতে আচার্যা ও উপাধ্যায়া শব্দের ব্যুৎপত্তিতে অধ্যাপনা রত নারীর উল্লেখ আছে; কাশিকাভাষ্যে কাশকৃৎস্না ও অপিশ্‌লার নাম পাই— মীমাংসা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত হিসাবে; অন্তৃণ ঋষির কন্যা বাক্, গার্গী, মৈত্রেয়ী, শাশ্বতী— এঁদের কথাও পাই। অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রমের মতো কোনও কোনও নারী শিক্ষার সুযোগ পেতেন। কিন্তু শাস্ত্রের নজির দেখলে বোঝা যায় নারীর শিক্ষার অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছিল। তাই শিক্ষিতা নারীর প্রসঙ্গে বলা আছে, 'স্ত্রিয়ঃ সতীঃ ত উ যে পুংসঃ আহুঃ।' (*তৈত্তিরীয় আরণ্যক* ১:১১:৪) অর্থাৎ নারী হয়েও তারা পুরুষ। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যুগ থেকে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়, ক্রমে যে অবস্থা দাঁড়াল তাতে গণিকা ছাড়া শিক্ষাতে আর কোনও নারীর অধিকার ছিল না। অনুমান করা যায়, সঙ্গীত নৃত্য ও চিত্রশিল্পে কিছু কিছু কুমারীর অধিকার ছিল, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা থেকে সাধারণ ভাবে সে বঞ্চিতই ছিল। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল; *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*-এ পণ্ডিত কন্যা পাওয়ার জন্যে পিতামাতার আচরণীয় অনুষ্ঠানের কথাও আছে (৬:৪:১৩); কিন্তু সে ব্যতিক্রমই।

সোমযাগের একটা পর্বে যজ্ঞের কয়েকটি পাত্রকে মাটিতে রাখা হয়, বাকি কয়েকটিকে ওপরে তুলে ধরা হয়; এ প্রসঙ্গে শুনি, 'সেইজন্যে সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে মাটিতে রাখা হয়, শিশুপুত্রকে তুলে ধরা হয়।' (*তৈত্তিরীয় সংহিতা* ৬:৫:১০:৩) সমাজে নারী জন্মাবধি এই স্থানই পায়— পুরুষের নিচে।

পুরুষের বহুবিবাহ *ঋগ্বেদ*-এর যুগ থেকেই চলে আসছে। তবে সে সময়ে নারীরও বহুপতিত্বে অধিকার ছিল, যদিও এ অধিকার সে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হারায়। *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ও *ব্রাহ্মণ*-এ পড়ি, 'যজ্ঞে একটি দণ্ডকে বেষ্টন করে থাকে দুটি বস্ত্রখণ্ড; তাই পুরুষ

দুটি স্ত্রী গ্রহণে অধিকারী; একটি বস্ত্রখণ্ডকে দুটি দণ্ড বেষ্টন করে না, তাই নারীর দ্বিপতিত্ব নিষিদ্ধ।' (*তৈত্তিরীয় সংহিতা* ৬:৬:৪:৩; *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* ১:৩:১০:৫৮) অন্যত্রও শুনি, 'একস্য পুংসো বহেব্যো জায়া ভবন্তি। এক পুরুষের বহু পত্নী হয়।' (*শতপথ ব্রাহ্মণ* ৯:৪:১৬) বলা বাহুল্য এই ধরনের শাস্ত্র হেতুনির্ণয়ের ছলে যজ্ঞের বিধিবিধানের দোহাই পাড়লেও আসলে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের প্রচলিত কিছু আচরণের শাস্ত্রীয় সমর্থন জোগানো। এবং, এ ধরনের ব্যাখ্যায় শুধু পুরুষের পক্ষে সুবিধাজনক আচরণেরই সমর্থন পাওয়া যায়। সম্ভবত পূর্ববর্তী কালে প্রচলিত নারীর বহুপতিত্ব এ সময়েই নিষিদ্ধ হতে শুরু হয়। তাই আপাত-যুক্তির মতো এক যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের অনুপুঙ্খকে হেতুরূপে উপস্থাপিত করা হল। এখানে পুরুষের দুটি স্ত্রী গ্রহণের কথা বলা থাকলেও কার্যত পুরুষের বহুবিবাহের অনেক নিদর্শন দেখতে পাই। (*ঋগ্বেদ* ৭:২৬:৩) রাজাদের তো বৈধ পত্নীই থাকত চারটি *যজুর্বেদ*-এর আমল থেকেই— মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তি (বা পরিবৃত্তী) ও পালাগলী। এ ছাড়াও বহু উপপত্নীও থাকত রাজ-অন্তঃপুরে। *মৈত্রায়ণী সংহিতা*-য় দেখি মনুর দশটি ও চন্দ্রের সাতাশটি স্ত্রী-র উল্লেখ আছে। বহু স্ত্রী থাকলেও তাদের প্রতি সমদর্শিতা নাকি প্রত্যাশিত ছিল, তাই চন্দ্র রোহিণীর প্রতি বেশি অনুরক্ত ছিলেন বলে তাঁর যক্ষ্মা হয়। সেইজন্যে যক্ষ্মার অন্য নাম 'জায়েন্য'। (*তৈত্তিরীয় সংহিতা* ২:৩:৫:১-৩) বিবাহে কন্যাকে দান করা হত। স্বামীকে নয়, স্বামীর পরিবারকে— 'কুলায় হি স্ত্রী প্রদীয়তে।' (*আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ২:১০:২৭:৩) এর কুফল আজও প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখা যায়— শ্বশুর শাশুড়ি ননদ ভাসুর দেওর সকলে মিলেই বধূকে যে নির্যাতন করে সে তো এই অধিকারেই।

চার

'নারী পুরুষের অপরার্ধ' শুনলে মনটা উল্লসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়। কারণ পরের অংশটা হল, 'সেজন্যে যতক্ষণ সে বধূলাভ না করে ও সন্তান না আসে ততক্ষণ পুরুষ অসম্পূর্ণ।' (*তৈত্তিরীয় সংহিতা* ৬:১:৮:৫) অর্থাৎ, সন্তানজন্মের জরুরি প্রয়োজনেই নারী পুরুষের অপরার্ধ, মানসিক বা সামাজিক কোনও সংজ্ঞায় নয়। *ঋগ্বেদ*-এ সদ্যোবধূকে আশীর্বাদ করা হচ্ছে, 'শ্বশুর শ্বাশুড়ি দেবর ননদ সকলের সম্রাজ্ঞী (বা অধীশ্বরী) হ'য়ো।' (১০:৮৫:৪৬) প্রথমত, বধূটির বাস্তবজীবনে সম্রাজ্ঞীত্ব দুর্লভ ছিল বলেই এ আশীর্বাদ। দ্বিতীয়ত, পরবর্তী অসংখ্য শাস্ত্রবচনে এর খণ্ডন আছে। তাই *অথর্ববেদ*-এ পড়ি, 'সূর্যোদয় হলে প্রেত তেমন করে ছুটে পালায় যেমন করে পুত্রবধূ শ্বশুরের সামনে থেকে ছুটে পালায়।' (৮:৬:২৪) কোনও সম্রাজ্ঞী প্রজার সামনে থেকে কবে এমন করে ছুটে পালিয়েছে? উত্তম নারীর সংজ্ঞা হল, 'যে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর কথার ওপরে কথা না বলে।' (*ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*, ৩:২৪:২৭) পরবর্তীকালে এমনই কথা দেখি *আপস্তম্বধর্মসূত্র*-তে (১:১০:৫১-৫৩) এ ছবি আর যাই হোক, কোনও কালে কোনও সম্রাজ্ঞী বা অধীশ্বরীর নয়; বরং দীনতম প্রজার বা দাসীর, যে পুরুষ প্রভুর ভয়ে সংকোচে নেপথ্যচারিণী।

বিবাহের সব ক'টি মন্ত্রেই উচ্চারণ করে বলা হয় স্ত্রী যেন চিন্তায় ও কাজে স্বামীর অনুবর্তিনী হয়, স্বামীর চিত্তের অনুগামিনী হয়; কোথাও বলা নেই, স্ত্রীরও চিত্ত বলে একটা কিছু আছে এবং স্বামীকে তার প্রতি অনুকূল হতে হবে। মধ্যে মধ্যে শোনা যায়, সুন্দরী বধূ স্বামীর প্রেম লাভ করে। (*শতপথ ব্রাহ্মণ* ১৩:১:৯:৬) এতে বধূকে দেহমাত্রসার করে দেখা হয় এবং তার যে অন্য কোনও আকর্ষণ থাকতে পারে সে কথা শাস্ত্রে কোথাও স্বীকৃতি পায়নি। সহজেই বোঝা যায়, সুন্দরী বধূরও রূপযৌবনে একদিন ভাঁটা পড়ে, তখন স্বামীর প্রেমে সে অধিকার হারায়। তাছাড়া ভাঁটা পড়বার আগেও সুন্দরীতরা নারী স্বামীর চোখে পড়লে তাকে এনে স্বামী পূর্ববর্তিনীর মর্যাদা খর্ব করে। তাই সপত্নীবিনাশের জন্যে, স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেম পাওয়ার জন্যে বা স্বামীকে বশীভূত করার জন্যে বহুতর অভিচারক্রিয়ার মন্ত্র দেখতে পাই *ঋগ্বেদ*-এ ও *অথর্ববেদ*-এ। এ বিপদ সে দিনের নারীর কাছে কত ভয়াবহ রকমে বাস্তব ও সর্বনাশা হয়ে দেখা দিত তা আজ কল্পনা করাও কঠিন।

নারীর স্থান ক্রমেই অন্তঃপুরের গহনে সরে গেছে। *ঋগ্বেদ*-এ যোদ্ধা নারী মুদ্‌গলিনী, বিশ্‌পলা, বধ্রিমতী, শশীয়সীর কথা পড়ি, যাঁদের কেউ যুদ্ধে আহত কেউবা যুদ্ধে বিজয়িনী। তবুও ঋগ্বেদের প্রথম যুগের পরে প্রকাশ্য সমাজ-জীবনে নারীর আর কোনও ভূমিকা রইল না (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ সালেও মেসেগা অবরোধকালে ভারতীয় নারী যোদ্ধার কথা কার্টিয়াস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, ততদিনে এ ভূমিকা ব্যতিক্রম, আপদ্ধর্মে পর্যবসিত)। ব্রাহ্মণের যুগেই নারীকে অবরোধে রাখার কথা শুনি, 'নইলে তার শক্তিক্ষয় হবে!' (*শতপথ ব্রাহ্মণ* ১৪:১:১:৩১) এ কোন্ শক্তি যা শুধু অবরোধে থাকলেই অক্ষুণ্ণ থাকে? অথর্ববেদে অনেকগুলি 'প্রতিষ্ঠাপন' সূক্ত আছে, এগুলি পলাতকা বা পলায়নে উদ্যতা স্ত্রীকে অন্তঃপুরে ধরে রাখবার জন্যে প্রয়োগ করা হত। কাজেই অন্তঃপুরবাসিনী ক্রমেই বন্দিনী হয়ে উঠছিল।

পাঁচ

গোষ্ঠীবদ্ধ, কৌমবদ্ধ সমাজ ভেঙে ধীরে ধীরে পরিবার-আশ্রিত বা 'কুল'-বদ্ধ সমাজ প্রবর্তিত হচ্ছিল। একটি বৃহৎ পরিবারের বাসগৃহের নাম 'কুল', এখানে তিন-চার পুরুষের সংসার। এ সংসারের ছোট ছোট বিভাগে একটি পুরুষকে ঘিরে তার নিজস্ব যে পরিবার সেখানে স্বামীই সর্বময় কর্তা। এবং ওই বৃহৎ যৌথ পরিবারের পরিবেশের মধ্যেই, গুরুজন এবং ছেলেমেয়েদের সামনেই, সে পুরুষ একে একে বহু নারীকে নিয়ে আসছে পত্নীরূপে। এই স্বাধীনতা কিন্তু তার স্ত্রীর নেই, কারণ, 'এক স্বামীর বহু স্ত্রী থাকলেও একটি স্বামীই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।' (*ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* ৩:৫:৩:৪৭) তেমনই খেয়ালখুশি মতো পুরুষ গণিকালয়ে যেতে পারত, তার উপপত্নী ও গণিকাসম্ভোগে সমাজ কোনও বাধা দেয়নি; কিন্তু স্বামীর হাজার দোষ থাকলেও নারী উপপতি গ্রহণ করলে সমাজে সেটা মহাপাতক বলে গণ্য করা হত। আর গণিকালয়ের মতো কোনও বিকল্প ব্যবস্থা তো নারীর জন্যে কখনওই কোথাও ছিল না।

বিবাহকালে বর বলে, 'এস আমরা মিলিত হই, যেন পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়, যে সন্তান দ্বারা সম্পত্তিবৃদ্ধি হবে।' এরই শেষাংশে প্রার্থনা আছে, পুত্র, পৌত্র, দাস, শিষ্য, বস্ত্র, কম্বল, ধাতু, বহু ভার্যা, রাজা, অন্ন ও নিরাপত্তার জন্যে। (*হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র* ১:৬:১২:১৪) লক্ষ্য করতে হবে যে প্রথমত, বিবাহের সময়েই, নব-বিবাহিত বধূর সঙ্গে এবং তার সামনেই 'বহু ভার্যা'র জন্যে প্রার্থনা করা হচ্ছে এবং দ্বিতীয়ত, কতকগুলি ভোগ্য বস্তুর সঙ্গে 'বহু ভার্যা'র উল্লেখ। ব্যতিক্রম পুত্র-পৌত্র, শিষ্য ও রাজা; এর মধ্যে পুত্র-পৌত্র নিজের ব্যক্তিসত্তারই সম্প্রসারণ,— কালে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরও যাতে বংশধারার বিলোপ না হয়; শিষ্য জীবিকার পক্ষে অত্যাবশ্যক, আর রাজা নিরাপত্তার পক্ষে। নইলে বস্ত্র, কম্বল, ধাতু, দাস ও 'বহু ভার্যা' সবই ভোগ্য বস্তু। কন্যা সম্প্রদানের সময়ে মাতামহ পিতামহের উল্লেখ আছে, মাতামহী পিতামহীর নেই, অথচ পিতামাতা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এঁদের অবলম্বন করেই। বিবাহে কন্যা সম্বন্ধে পুরুষের পাঁচটি কাম্যবস্তু, ধন, রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বংশ। এর মধ্যে বিদ্যা ও বুদ্ধির সত্যি কোনও উপযোগিতা আছে কিনা তা নিয়ে বিস্তর তর্ক আছে। (*মানবগৃহ্যসূত্র* ১:৭৬; অন্যত্রও আছে।)

স্ত্রীর প্রধান প্রয়োজন হল সে সন্তানের জননী এবং তার প্রধান কর্তব্য হল, পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়া। (*আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ১:১০-৫১-৫৩) নিঃসন্তান বধূকে বিবাহের দশ বছর পরে ত্যাগ করা যায়, যে স্ত্রী শুধু কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় তাকে বারো বছর পরে, মৃতবৎসকে পনেরো বছর পরে এবং কলহপরায়ণাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা যায়। (*বৌধায়ন ধর্মসূত্র* ২:৪:৬; *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ২:৫:১১-১৪, *মনুসংহিতা* ৯:৪) পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে না পারলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার বিধান বহু প্রাচীন; *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এই পড়ি, 'যা বা অপুত্রা পত্নী সা পরিবৃত্তী— যে অপুত্রা পত্নী সে পরিত্যক্তা'; (৫:২:৩:১৩) এবং পুত্রসন্তান না জন্মালে স্বামী আবার বিয়ে করতে পারবে। (*বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র* ২৮:২-৩) অপরপক্ষে মানবিকতার বোধে অনুপ্রাণিত শাস্ত্রবাক্যও আছে, যেমন 'কলহপ্রিয়া, অশুচি, গৃহত্যাগিনী, বলাৎকৃতা, চৌরগৃহীতা হলেও স্ত্রী ত্যাগ করা চলে না; ভ্রষ্টা স্ত্রীও প্রায়শ্চিত্তে শুচি হয়।' (*বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র* ২১:৮-১০) আপস্তম্ব বলেন স্ত্রীপরিত্যাগী স্বামীর কঠোর দণ্ডবিধান করা উচিত। (*আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* ১:১০-১৯, ২৮) স্ত্রীকে কটুকথা বললেও একদিন উপবাসের প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। (*বৌধায়ন ধর্মসূত্র* ২:২:৬৩, ৬৪) কিন্তু সমাজ এ-বিষয়ে কী ভাবত তার জন্যে উদাহরণ দেখা যেতে পারে। কোনও কোনও ধর্মশাস্ত্রে আছে বলাৎকৃতা নারীকে পরের মাস থেকে স্বামী শুচি জ্ঞান করবেন; বশিষ্ঠ বলছেন বলাৎকৃতা নারী প্রায়শ্চিত্তে শুচি হন। আপস্তম্ব বলছেন স্ত্রীকে কটুকথা বললেও প্রায়শ্চিত্তের জন্যে একদিন উপবাস করতে হবে। অবশ্য স্বামীকে কটুকথা বললে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ পরিত্যাক্তা হতেন।

সে যাই হোক, রামচন্দ্র তো নিশ্চয়ই এসব জানতেন, বিশেষত যখন শাস্ত্রকাররা তাঁকে আদর্শ চরিত্র বলেছেন। (রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ— রামের মতো আচরণ করা উচিত, রাবণের মতো নয়)। সেই রামচন্দ্র যদি সত্যি বিশ্বাসও করে থাকেন যে সীতা অশুচি,

তাহলেও তো শাস্ত্রানুসারে একমাস পরে তাঁকে শুচি স্নান করতে পারতেন। প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধত্ব সম্পাদন করতে পারতেন, এবং নিজে যে সব অন্যায় ও মিথ্যা কটুকথা সীতাকে বলেছিলেন তার জন্যে তাঁর উপবাস করা উচিত ছিল, এবং স্ত্রীপরিত্যাগী স্বামীর দণ্ডও তাঁর পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ সবের কিছুই তিনি করেননি, আশ্চর্য চরিত্র হয়েও কোনও দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্তও তাঁর হয়নি, কাজেই, অন্যে পরে কা কথা। অর্থাৎ ওইসব মানবিক নির্দেশ ছিল শুধু শাস্ত্রকারদের 'সমদর্শিতা' প্রতিপাদনের জন্যে, কার্যক্ষেত্রে পুরুষশাসিত সমাজে ওসব বইয়ের পাতাতেই থাকত। এই ধরনের শুনতে ভাল বিধান আরও আছে, 'ধর্ষিতা নারীকে ধর্ষণকারী বিয়ে না করলে বিধিমতে বিনা পণেই তার বিয়ে হতে পারে।' (*বৌধায়ন ধর্মসূত্র* ৪:১:১৫-১৬) কিন্তু সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে ভ্রষ্টা স্ত্রী সমাজের কাছে দণ্ডবিধান ছাড়া কোনও কিছুই পায়নি। তেমনই একাধিক ধর্মশাস্ত্রকার বলছেন ভ্রষ্টা স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করলে (তাহলে ওইসব উদার শাস্ত্রবাক্য সত্ত্বেও স্বামী তাকে পরিত্যাগ করত!) পুত্র তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। স্পষ্টই বোঝা যায়, তথাকথিত যৌন দুর্নীতি সম্বন্ধে সমাজে পরিষ্কার দু'ধরনের বিধান ছিল, একটি পুরুষের জন্যে একটি নারীর জন্যে। নারীর ক্ষেত্রেই যৌন অপরাধ অপরাধ, পুরুষের ক্ষেত্রে সমাজ অনেক প্রশ্রয়শীল ছিল। যে দেশে 'সতী' শব্দের ওই অর্থে কোনও পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দই নেই, সে দেশের সমাজে অন্য রকম কিছু আশা করাও যায় না।

'কুমারী কন্যার পিতা যথাকালে বিবাহ দিতে না পারলে সে তিন বছর (বা তিন মাস) পরে যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু বিয়ে তাকে কোনও রকম অধিকার দেবে না, সব অবস্থাতেই সে পুরুষের অধীন।' *বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র*-তে পড়ি, 'পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষিত যৌবনে/রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বতন্ত্র্যমর্হতি॥' (৫:১-২, ২:২, ৩, ৪৪, ৪৫) অর্থাৎ, নারীকে কুমারী অবস্থায় রক্ষা করবেন পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্ররা; নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়। কত আগে *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ দেখি, 'স্ত্রিয়ঃ পুংসো নুবর্ত্মানো ভাবুকাঃ।' (১৩:২:২৪) অর্থাৎ, নারীর পুরুষের অনুপথগামিনী হওয়া উচিত। *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*-এ পড়ি, 'পতিং বা অনু জায়া।' (১:৯:২:১৪) অর্থাৎ, স্ত্রী স্বামীর পশ্চাতে। মনে পড়ে যায়, *ঋগ্বেদ*-এ উষার বর্ণনা, 'উষো যাতি স্বসরস্য পত্নী— সূর্যের পত্নী উষা চলেছে।' (১:১১৫:২) কোথায়? সূর্যের বা স্বামীর আগে আগে। তার পরে নদীতে অনেক জল বয়ে গেছে, তখন ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যুগে স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী, অধীন। একদিকে বলা হচ্ছে, 'শ্রিয়া বা এতদ্রূপং যৎ পত্ন্যঃ' (*তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ* ৩:৯:৪:১৯), অর্থাৎ পত্নীই হল সমৃদ্ধির রূপ; অন্যদিকে শুনি, 'তদ্বৈ সমৃদ্ধং যস্য কনীয়াংসো ভার্যা আসন্ ভূয়াংসঃ পশবঃ— তারই হল সমৃদ্ধি, যার পশুপালের চেয়ে স্ত্রীরা সংখ্যায় কম। (*শতপথ ব্রাহ্মণ* ২:৩:২:৮) এক তো পশুপালের সঙ্গে একনিঃশ্বাসে উচ্চারিত হল স্ত্রী; দ্বিতীয়ত, কত সংখ্যায় স্ত্রী থাকার সম্ভাবনা থাকলে সে সংখ্যা পশুপালের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

ছয়

নারীকে যথেচ্ছ শাসন ও ভোগ করবার অধিকার শাস্ত্র পুরুষকে দিয়েছে, কিন্তু তার জন্যে দায়িত্ব যা দিয়েছে তা নেহাৎই নগণ্য। *বৌধায়নধর্মসূত্র*-তে অবশ্য পড়ি, 'সর্বেষাং বর্ণনাং বধূ রক্ষ্যতমা ধনাৎ', অর্থাৎ সমস্ত বর্ণেরই উচিত ধনের চেয়ে স্ত্রীকে রক্ষা করা। (২:৪২) কিন্তু কার্যত যে নীতি অনুসৃত হত তা হল চাণক্যের সেই চূড়ান্ত সুবিধাবাদী নীতিটি: 'আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি।— নিজেকে সর্বদাই রক্ষা করবে, প্রয়োজন হলে ধন বা স্ত্রীর বিনিময়েও।' বৈদিক বা পরবর্তী সাহিত্যে ধনের বিনিময়ে স্ত্রীকে রক্ষা করার কোনও নজিরই মেলে না। বৈদিক যুগের একেবারে প্রথম পর্বের পরে শিক্ষাতেও নারীর আর অধিকার নেই; কারণ দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া উপনয়নে তার অধিকার নেই। জন্মাবধি তার সম্বন্ধে সমস্ত সংস্কারই অমন্ত্রক; সে নিজে মন্ত্র উচ্চারণে বা হব্যদানে অনধিকারিণী; এবং সে যুগে বিদ্যা তো মন্ত্র দিয়েই হত, কাজেই বিদ্যা অর্জনে তার আর অধিকার রইল না। অমন্ত্রক বিদ্যা অর্থাৎ সামান্য কিছু গানবাজনা, সেলাইবোনা, হাতের কাজ আর যাবতীয় গৃহকর্ম, স্বামী সন্তান ও শ্বশুরকুলের উদয়াস্ত সেবাই ছিল তার কাজ। সন্তানের, মুখ্যত পুরুষসন্তানের জননী হওয়াতেই তার চূড়ান্ত চরিতার্থতা। অথচ অন্য সব দেশের মতো এখানেও কিছু পুরুষের শিক্ষিতা নারীর সান্নিধ্য পাওয়ার স্বাভাবিক সুস্থ আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হতে পারত একমাত্র গণিকালয়ে; কারণ একমাত্র গণিকাই ছিল শিক্ষিতা; এবং প্রাচীন ভারতে সে-ই একমাত্র স্বাধীন নারী ছিল। কুলবধূকে শিক্ষা থেকে সর্বতো ভাবে বঞ্চিত করে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে, গণিকাকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী করে সমাজ কুলনারীর প্রতি চূড়ান্ত অপমানের ব্যবস্থা করেছিল। সন্তানধারণে এবং লালনে, গৃহকর্মে এবং পরিচর্যায় হতশ্রী ও বিগতযৌবনা অশিক্ষিতা স্ত্রী যখন স্বামীর মনোরঞ্জনে অক্ষম, তখন স্বাধীনযৌবনা শিক্ষিত গণিকার দিকে খিড়কির দরজা খুলে রেখে সমাজ কুলনারীকে অসম্মানের পাত্রী করে তুলতে দ্বিধা করেনি।

সোমযাগের একটি প্রকরণ হল অগ্নি পত্নীবৎ। সেখানে আছে, 'বজ্র বা লাঠি দিয়ে নারীকে মেরে দুর্বল করা উচিত, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির ওপরে তার কোনও অধিকার না থাকে।' (*শতপথ ব্রাহ্মণ* ৪:৪:২:১৩) এখানে যজ্ঞের প্রসঙ্গে একটা অনুষ্ঠানে যজ্ঞীয় হবি-কে কেন লাঠি দিয়ে মারতে হবে তারই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথা এসেছে; কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় শাস্ত্র ওই ব্যাখ্যার ছলে স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে মারবার অবাধ অধিকার পুরুষকে দিচ্ছে। আর দিচ্ছে সমস্ত সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করবার অধিকার; এবং তার চেয়েও বড় কথা, তার নিজের দেহের ওপরেও তার কোনও অধিকার যেন না থাকে সে ব্যবস্থাও পাকা করছে। এতে প্রচলিত সামাজিক আচরণেরই শাস্ত্রীয় সমর্থন মেলে। সবচেয়ে বিখ্যাত এবং দীর্ঘ যে *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*, তাতে স্বয়ং ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন: 'স্ত্রী স্বামীর সম্ভোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে 'কেনবার' চেষ্টা করবে (যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল 'অবক্রীণীয়াৎ', যেন স্ত্রী পণ্যদ্রব্য), তাতেও অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে।' (৬:৪:৭) কাজেই স্পষ্টই দেখা

যাচ্ছে নারীর মন বলে কিছু আছে, এ কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে, তার দেহে তার কোনও অধিকার নেই এবং তাকে অসম্মান শুধু নয়, মারধর করারও পূর্ণ অধিকার স্বামীকে দেওয়া হল, যে-স্বামী বহু পত্নীকে ইচ্ছেমত আনলে, জারিণী বা উপপত্নী সান্নিধ্যে গেলে এমনকী গণিকালয়ে গেলেও স্ত্রী কোনও ভাবে উচ্চবাচ্য করতে পারবেন না। করলেই তাঁকে ত্যাগ করবার অধিকার স্বামীর আছে। মনে রাখতে হবে সমাজে এ ত্যাগের অর্থ ছিল কী—গণিকাবৃত্তি বা দাসীবৃত্তি ছাড়া পরিত্যক্তা নারীর কোনও গতি ছিল না। তার নিজের সম্পত্তি থাকত না এবং পিতা বা স্বামীর ধনে তার কোনও অধিকারও স্বীকৃত ছিল না। (*মৈত্রায়ণী সংহিতা* ১:১০:১১; ৩:৬:৩; *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ৪:৫:৮:৭) এবং, জীবনধারণের উপযোগী কোনও বৃত্তির শিক্ষা তাকে দেওয়া হত না। ফলে শুধু বেঁচে থাকার জন্যে তাকে সর্বতো ভাবে স্বামীর অধীনে থাকতে হত।

বারবার বলা হয়েছে যে নারীর সভায় যাওয়ার অধিকার নেই। (*মৈত্রায়ণী সংহিতা* ৪:৭:৪) কোনও শিক্ষা পাওয়ার, ধন অর্জন বা স্বাধীন ভাবে ভোগ করবার, এমনকী নিজের দেহটিকেও অবাঞ্ছিত সম্ভোগ থেকে রক্ষা করবারও অধিকার তার নেই। (*মৈত্রায়ণী সংহিতা* ৩:৬:৩; ৪:৬:৭; ৪:৭:৪; ১০:১০:১১; *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ৬:৫:৮:২) তার ছেলেমেয়েদের সামনেই তার স্বামী একাধিক পত্নী, উপপত্নী এনে অথবা গণিকাগমন করে তাকে অসম্মান করলে নিষ্প্রতিবাদে তাকে তা সহ্য করতে হবে, অথচ স্ত্রীর সামান্যতম পদস্খলনে সমাজ কঠোর ভাবে দণ্ড দেবে। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র* (২৩:৪) ও *হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র* (১:৪:১৪:২) ব্যভিচারিণী নারীর যে দণ্ডের বিধান দিয়েছে তা যেমন নিষ্ঠুর তেমনই ঘৃণ্য; উচ্চারণ করতেও জুগুপ্সা বোধ হয়। স্ত্রীর প্রেমিকাকে হত্যা করবার জন্যে শাস্ত্রে ধর্মীয় অভিচারক্রিয়ার বিধান ও নির্দেশ দেওয়া আছে। (*বৃহদারণ্যকোপনিষদ* ৪:৪:১২, ১৩; *হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র* ১:৪:১৪:৭) অথচ অনুরূপ ক্ষেত্রে পুরুষের কোনও দণ্ড নেই। সে তার বহু পত্নী, উপপত্নী এবং যথেচ্ছ গণিকালয় গমনের অবাধ অধিকার সযত্নে রক্ষা করেছিল। 'প্রাজাপত্য' নামে লঘু একদিনের নামমাত্র প্রায়শ্চিত্তের বিধান কোথাও কোথাও আছে রটে, কিন্তু সুবৃহৎ সংস্কৃত সাহিত্যে কোনও গণিকাগামী কখনও কোনও প্রায়শ্চিত্ত করেনি।

সাত

তাহলে বৈদিক ভারত নারীকে কি চোখে দেখেছিল? নারী অশুচি, স্বভাবত পাপিষ্ঠা ও অমঙ্গলের হেতু। চাতুর্মাস্যের অন্তর্গত বরুণপ্রঘাস যজ্ঞে প্রকাশ্য জনবহুল যজ্ঞসভায় প্রতিপ্রস্থাতা পুরোহিত যজমানপত্নীকে (যজমানকে নয় কিন্তু) প্রশ্ন করতেন, 'কেন সহ চরসি' (*তৈত্তিরীয় সংহিতা* ২:৫:২:২০), অর্থাৎ কার সঙ্গে ব্যভিচারিণী হয়েছ? এ প্রকাশ্য অপমান সহ্য করে তাকে উত্তর দিতে হত। নইলে যজ্ঞ নষ্ট হবে যে! *মৈত্রায়ণী সংহিতা* উচ্চারণ করেই বলেছে, 'নারী অশুভ'। (৩:৮:৩, *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-তেও একই কথা বলা হয়েছে ৬:৫:৮:২।) যজ্ঞকালে কুকুর, শূদ্র ও নারীর দিকে তাকাবে না। (*শতপথব্রাহ্মণ* ৩:২:৪:৬)

এ সব উক্তি এমনই স্পষ্ট যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কোনও অবকাশই নেই।

নারীর সর্বপ্রধান সংজ্ঞা দুটি, তার স্থানও ওই দুটিতেই সীমাবদ্ধ: সে পুত্রের জননী এবং সে ভোগ্যবস্তু। *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-তেই শুনি, 'তস্মাদু হ স্ত্রিয়ো ভোগমেব হারয়ন্তে— নারী সম্ভোগ আনে।' (২:৩:১০:৭) এটির রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক, তার মানে প্রায় তিন হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ নারীকে ভোগ্যবস্তু-রূপে দেখছে। পরবর্তীকালের *গৌতমধর্মসূত্র*-তে পড়ি, 'পশুভূমিস্ত্রীণামনতিভোগঃ,— পশু, ভূমি ও নারীর অধিক ভোগ নয়।' (১২:৩৯) শাস্ত্রকাররা বারবার নারীর ভোগ্যরূপ উল্লেখ করেছেন অকুণ্ঠ, নির্লজ্জ ভাবে। তাই নারী দক্ষিণার তালিকায় স্থান পায়। 'সারস্বতানাময়ন' যাগের দক্ষিণা হল একটি ঘোটকী এবং একটি সন্তানবতী দাসী। (*শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র* ১২:২৯:২১) ঘোড়া ব্যবহারে লাগবে, দাসীর পুত্র বড় হয়ে ভৃত্য হবে, দাসী স্বয়ং ভোগ্যবস্তু হবে অর্থাৎ দক্ষিণা বাবদে এগুলো বিনামূল্যে পাওয়া গেল। পেলেন কে? যজ্ঞের ব্রাহ্মণ পুরোহিত! অন্যান্য বহু যজ্ঞে নানা স্তরের নারী দক্ষিণা— সন্তানবতী, অপ্রসূতা ও অনূঢ়া— শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে। *রামায়ণ মহাভারত*-এর কাহিনিগুলি বৈদিক যুগের অল্প পরের সমাজেরই চিত্র বহন করে; সেখানে এবং পরবর্তী পুরাণগুলিতে অসংখ্যবার পড়ি অতিথিসৎকারে, উৎসবে, যুদ্ধে, যজ্ঞে, যৌতুকে, দানে ও দক্ষিণায় গাভী-স্বর্ণ-শস্য-রথ-গজ-অশ্বের সঙ্গেই অগণ্য নারী দান করা হচ্ছে। এমন দান সম্ভবই হত না যদি নারীকে বস্তু এবং মুখ্যত ভোগ্যবস্তু বলে না দেখা হত। নারী সম্পত্তি, তাই নারীকে জুয়াখেলায় পণ রাখা যাচ্ছে। সেই *ঋগ্বেদ*-এর সময় থেকে (অক্ষসূক্ত ১০:৩৪:৪) *মহাভারত* পর্যন্ত।

'কন্যা অভিশাপ' (*ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* ৬:৩:৭:১৩); তাই সন্তানসম্ভবা নারীর একটি আবশ্যিক অনুষ্ঠান হল 'পুংসবন', যার উদ্দেশ্য হল যাতে গর্ভস্থ সন্তানটি পুরুষ হয়। *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র*-তে পড়ি, 'নারীং ন হৃদয়েন প্রার্থয়েৎ।' (১:২৭৭:১-১০) অর্থাৎ, হৃদয় দিয়ে নারীকে প্রার্থনা করা উচিত নয়; কিন্তু যথেচ্ছ ভোগ করার কোনও বাধা নেই। 'নারী মিথ্যাচারিণী, দুর্ভাগ্যস্বরূপিণী, সুরা বা দ্যূতক্রীড়ার মত একটি ব্যসনমাত্র।' (*মৈত্রায়ণী সংহিতা* ১:১০:১১; ৩:৬:৩) খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের কাছাকাছি রচনা এই সংহিতা; এবং অত আগেই নারী ব্যসনে পর্যবসিত হয়ে গেছে। 'নারী রাত্রে স্বামীকে মুগ্ধ করে নিজের ইষ্টসিদ্ধি করে নেয়' (কাঠকসংহিতা ৩১:১: ওই সময়েরই রচনা।) অর্থাৎ, নারী ছলনাময়ী, স্বার্থপর; যেন পুরুষ উৎকৃষ্টতর জীব, এ সব দোষ তার নেই। 'সর্বগুণান্বিতা শ্রেষ্ঠ নারীও তাই অধমতম পুরুষের থেকে হীন।' (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬:৫:৮:২) অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা কী? 'স্ত্রী, শূদ্র, কুকুর, কাল পাখি— এদের দেখো না; নইলে শ্রী ও পাপ, জ্যোতি ও অন্ধকার, সত্য ও মিথ্যা মিশে যাবে।' (*শতপথব্রাহ্মণ* ১৪:১:১:৩১১) স্ত্রী স্বামীর পরে খাবে— 'ভক্তোচ্ছিষ্টং বধ্বৈ দদাৎ, — খেয়ে এঁটোটা স্ত্রীকে দেবে। (খাদির গৃহ্যসূত্র ১:৪:১১) এর থেকে স্পষ্ট করে নারীর স্থান নির্ণয় করা কঠিন। যেখানে দাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে জীর্ণ জুতো কাপড় দাসকে দেবে এবং স্ত্রী সম্বন্ধে বলা হয়েছে খেয়ে এঁটোটা স্ত্রীকে খেতে দেবে— সেখানে স্ত্রীকে কোন্

পর্যায়ে দেখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনও সংশয়েরও অবকাশ আর রইল না। এ কথা সবচেয়ে স্পষ্ট করে বলা আছে *আপস্তম্ব ধর্মসূত্র*-তে: 'কালো পাখি, শকুনি, নেউল, ছুঁচো ও কুকুর হত্যা করলে যে প্রায়শ্চিত্ত, নারীহত্যা ও শূদ্র হত্যাতেও সেই একই প্রায়শ্চিত্ত', অর্থাৎ মাত্র একদিন কৃচ্ছসাধন। (১:৯:২৩, ৪৫)

পরবর্তী সাহিত্য যে নারীকে ভোগ্যবস্তু ও পণ্যদ্রব্য বলতে সাহস করেছে তার জোরটা জুগিয়েছে বৈদিক সাহিত্যই। ক্রমেই অবশ্য ওই ভোগ্যত্ব ও পণ্যত্বেই জোর দেওয়া বেড়েছে। রামচন্দ্র সীতাকে প্রত্যাখ্যান করবার সময়েও বলেছেন পরহস্তগতা নারীকে তিনি 'ভোগ' করতে পারবেন না; এই হল প্রাচীন ভারতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল কথা। ক্রমেই অবরোধের দুর্ভেদ্য অন্তরালে নারীকে সরে যেতে হয়েছে। কেন এমন হল? কেন ধীরে ধীরে নারীর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে সে বস্তুতে পরিণত হল? এর বিস্তৃত বিশ্লেষণ এখানে করব না, শুধু একটা দিকের কথাই বলব। সম্পত্তিতে গোষ্ঠীগত সত্ত্বাধিকার থেকে যখন ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল অর্থাৎ গোষ্ঠী ও কৌম ভেঙে 'কুল' বা যৌথ পরিবারই সমাজের ন্যূনতম সংগঠন হল ততদিনে সমাজে আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে। উৎপাদনে কিছু উদ্বৃত্ত ধনের সৃষ্টি হয়েছে এবং সে উদ্বৃত্ত ধন মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যে বিভক্ত হচ্ছে। এই ধন, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্ষরিক অর্থে স্বোপার্জিত নয়— নিচের দিকের মানুষের শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে, শোষণ করে পাওয়া গেছে— তা যেহেতু কোনও ব্যক্তিগত গুণ বা যোগ্যতার দ্বারা লব্ধ নয়, তাই সে সম্বন্ধে ধনাধিকারীর যেন একটি অতিরিক্ত স্বত্ত্বাধিকারবোধ জন্মায়। এবং, তারই সঙ্গে একটা আতঙ্কও আসে, পাছে সেটা তার নিজের এবং নিজের সন্তান বা বংশধারার দখলের বাইরে চলে যায়। ব্যক্তির পরমায়ুর তো সীমা আছে, তারপরে? তার পরেও যাতে সে-ধন তারই বংশধররা ভোগ করতে পারে সে সম্বন্ধে ভীষণ একটা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ জন্মায়। এ ধন কার হাতে দিয়ে যাওয়া যায়, নিশ্চিত ভাবে নিজেরই সন্ততি ছাড়া? কেমন করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় সন্তানটি ঠিক তারই কিনা? স্ত্রীকে চোখে চোখে রেখে। যথাসম্ভব পর পুরুষের সম্পর্ক থেকে দূরে রেখে। এই কারণেই নারীর বহুপতিত্ব সমাজে নিষিদ্ধ হয়ে গেল, কারণ তাতে সন্তানের পিতৃপরিচয় সংশয়িত থেকে যায়।

ভুলে গেলে চলবে না, এ যুগের পূর্বযুগে যখন সমাজ গোষ্ঠী ও কৌমবদ্ধ ছিল তখন সকল সন্তানই কৌম বা গোষ্ঠীর সন্তান বলে পরিচিত ছিল; তখন পিতৃত্ব বা পতিত্বের সীমা এমন সুস্পষ্ট মোটা দাগে আঁকা ছিল না। এ ব্যাপারটা তখনও জীবিত স্মৃতির মধ্যেই ছিল তাই আরও আতঙ্ক। গোষ্ঠীযুগে সব নারীই গোষ্ঠীর বা কৌমের সব পুরুষের ভোগ্যা ছিল, সব পুরুষও সব নারীর। নারীর সে ধরনের স্বাধীনতার যুগে স্ত্রীর বা সন্তানের পরিচয় একটি পুরুষের সঙ্গে এমন একান্ত ও অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিল না। সে যুগ সদ্য পেরিয়ে এসে ব্যক্তিগত মালিকানার দিনে সম্পত্তি যখন একান্ত ও নিশ্চিত ভাবে নিজেরই সন্তানের জন্যে রেখে যাওয়ার উগ্র বাসনা জাগল, তখন যাতে ঔরসজাত সন্তানটিকে নিশ্চিত ভাবে চিহ্নিত করতে পারা যায় তাই স্ত্রীকে অন্য সব পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখার এমন প্রয়োজন

বোধ হল। তাছাড়া স্ত্রীও তো তখন সম্পত্তি, অতএব সে যাতে অন্যের ভোগ্যা না হয়, তার ওপরে ব্যক্তিগত মালিকানা তাই ষোল আনা জাহির করা চাই। আরও একটা কারণ ছিল; পুরুষের যথেচ্ছ পরনারী সম্ভোগের অধিকার তখন সমাজ মেনে নিয়েছে; সে তখন বৈধ বিবাহে— অনুলোম ও প্রতিলোমে— বহু পত্নীর স্বামী, আরও বহু উপপত্নীর উপপতি, এবং এ ছাড়াও তার খিড়কির দুয়ার খোলা গণিকালয়ের দিকে। এই জীবনে অভ্যস্ত পুরুষ স্বভাবতই তার একান্ত-ভোগ্য পত্নীটিকেও সেই রকম সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখবে, কারণ 'আত্মবন্মন্যতে জগৎ'। তাই তার স্ত্রীর সম্বন্ধে তার পাহারা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে গেল যখন নারী হল কয়েদি এবং স্বামী তার প্রহরী। এই হল উত্তর-বৈদিক যুগের সমাজচিত্র। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সে ব্যতিক্রমই। পরবর্তী দুটি সহস্রাব্দে শেকলগুলো দৃঢ়তর হয়ে নারীকে পাকে পাকে ফেরে ফেরে বেঁধেছে, তালা আরও মজবুত হয়েছে। এর মধ্যে কখন যে প্রহরী নিজেই বন্দি হয়েছে তার স্বৈরাচারজনিত সংশয়ের ক্রূর বন্ধনে, কখন যে সে তার বন্ধু ও সহচারিণীকে হারিয়ে ফেলে তার বদলে পেয়েছে নিরক্ষর নিষ্প্রাণ এক যন্ত্রতুল্য দাসীকে, তা সে নিজেই জানে না। নিরঙ্কুশ শাসন ও শোষণ মানুষ কখনও চিরদিন মানে না। যে-বঞ্চনা করতে পুরুষ এত আটঘাট বেঁধেছিল সে-বঞ্চনা শেষ পর্যন্ত তাকেও বঞ্চিত করেছে। আর, যে পরিমাণে নারী সে-বঞ্চনাকে নিজের মধ্যে নিষ্প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে সে পরিমাণে সেও তার স্বরচিত শৃঙ্খলে বন্দিনী। বৈদিক ভারতবর্ষে নারীর মর্যাদা ছিল না, মানুষ বলে তার কোনও স্বীকৃতিই ছিল না। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাতেও ছিল না, তবে তাদের উত্তরপুরুষেরা এখন সে-কথা স্বীকার করে— বলে, নারী এই শতাব্দীতেই প্রথম অধিকারসচেতন হয়েছে, আগে সে অত্যাচারিতা বন্দিনীই ছিল। শুধু আমাদের এখানেই জোর করে বলবার চেষ্টা হয়, বৈদিক যুগে নারী নাকি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এতে শুধু যে সত্যের অপলাপ হয় তা নয়, অতীতকে যথার্থ ভাবে না দেখতে পাওয়ার জন্যে অতীতের যে বিষ বর্তমান সমাজদেহে সঞ্চারিত, তাকে চিনতে, তার প্রতিষেধ করতে এবং সুস্থ এক ভবিষ্যতের প্রস্তুতি বিধান করতে অনাবশ্যক দেরি হয়ে যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য ও উপনিষদের যুগ

যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্রের বংশধর; এঁর পিতা চারায়ণ, দেবরাত, ব্রহ্মরাত, যজ্ঞবল্ক, বাজসনি, ইত্যাদি নানা নামে প্রসিদ্ধ; জননীর নাম সুনন্দা। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী; কাত্যায়নীর পুত্র কাত্যায়ন। *শতপথব্রাহ্মণ*-এ বলা আছে *শুক্লযজুর্বেদ* যাজ্ঞবল্ক্যের রচনা বলে আখ্যাত। অর্থাৎ ইনি *বাজসনেয়ী সংহিতা*-র রচয়িতা; *শতপথব্রাহ্মণ*, *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*ও এঁরই রচনা। একখানি 'শিক্ষা' গ্রন্থও যাজ্ঞবল্ক্যের নামে অভিহিত, দুই-একটি অন্য ক্ষুদ্র উপনিষদও এঁর নামে প্রচলিত, অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারা গঠনের ব্যাপারে যাজ্ঞবল্ক্যের দান প্রচুর ও তাৎপর্যপূর্ণ।

শুক্লযজুর্বেদ-এর টীকায় প্রথম দিকে টীকাকার মহীধর যাজ্ঞবল্ক্য ও *যর্জুবেদ* প্রসঙ্গে একটি কাহিনি বলেছেন:

> ব্যাসের শিষ্য ঋষি বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যার পাতকী হয়ে প্রায়শ্চিত্তের জন্যে শিষ্যদের কৃচ্ছ্রসাধনের নির্দেশ দিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য একাই সকলের হয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করতে চাইলেন। বৈশম্পায়ন এটাকে অসহ্য অহমিকা মনে করে অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে আদেশ দিলেন অধীত বেদ প্রত্যর্পণ করতে। অগত্যা যাজ্ঞবল্ক্য অধীত বেদ বমন করলেন; তখন বৈশম্পায়নের অপর শিষ্যরা তিত্তিরির রূপ ধারণ করে সেই বমনকৃত *যজুর্বেদ* ভক্ষণ করেন। এ *যজুর্বেদ* কৃষ্ণ, অর্থাৎ অশুচি, কারণ তা যাজ্ঞবল্ক্যের বমন-করা বেদ; তিত্তিরিপক্ষীর রূপে অন্য শিষ্যরা তা গ্রহণ করেছিলেন বলে তার নাম তৈত্তিরীয়।

লক্ষণীয়, যে-বেদ যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর কাছে লাভ করেছিলেন এ কাহিনির অন্তরালে তাকে শুচি, শুক্ল বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং সেইটিই তাঁর নামে অভিহিত শুক্ল *যজুর্বেদ*-এর বাজসনেয়ী সংহিতা। বাজসনি যাজ্ঞবল্ক্যের পিতার নাম, তাই যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয় এবং তাঁর লব্ধ সংহিতা বাজসনেয়ী। কাহিনিটি আক্ষরিক ভাবে সত্য নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রাচীন ভারতে যাজ্ঞবল্ক্যের চরিত্র ও কীর্তি সম্বন্ধে কী ধারণা চলিত ছিল তা এতে স্পষ্টই বোঝা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য উদ্ধত, হয়তো কতকটা দাম্ভিকও— সমস্ত শিষ্যের করণীয় প্রায়শ্চিত্ত একাই করতে চাওয়ার প্রস্তাবে আত্মশক্তিতে প্রত্যয়ের সঙ্গে হয়তো কতকটা ঔদ্ধত্যও চোখে পড়ে। অন্তত গুরু সেইটিই দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের পরার্থপরতাও তো আছে— সকলের হয়ে কৃচ্ছসাধনের চেষ্টা একা স্বীকার করতে চাওয়ার মধ্যে কি কিছু পরিমাণ মহত্ত্বও নেই? কাহিনিকার সে দিকটায় জোর দেননি, কিন্তু প্রসঙ্গত সে-কথাও কি বলা হয়নি! তিনি যে-সংহিতার প্রবক্তা তা শুক্ল; যা উদ্‌গীরণ করলেন এবং অন্য শিষ্যরা ভক্ষণ করল সেটা

কৃষ্ণ। আজ আমরা জানি, *শুক্লযজুর্বেদ* শুদ্ধ মন্ত্রমাত্রের সংকলন বলেই 'শুক্ল' বলে অভিহিত, আর *কৃষ্ণযজুর্বেদ*-এ মন্ত্রের সঙ্গে অঙ্কুর-রূপে 'ব্রাহ্মণ'-সাহিত্যধর্মী প্রচুর গদ্যনির্দেশের মিশ্রণ আছে বলেই তাকে বলে 'কৃষ্ণ'। কিন্তু সে দিন এই কাহিনিতে যাজ্ঞবল্ক্যকে শুচিতর সংহিতার রচয়িতা বলেই নির্দেশ করা হয়েছিল।

শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা-র শেষাংশে *শতপথব্রাহ্মণ*, তারও শেষাংশ *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*— একাধারে আরণ্যক ও উপনিষদ্; যাজ্ঞবল্ক্য এ সমস্ত ধারাটিরই রচয়িতা। *শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা*-র বৈশিষ্ট্য তেমন কিছু নেই; কিন্তু সমস্ত 'ব্রাহ্মণ'-সাহিত্যের মধ্যে *শতপথ* বিশিষ্টতম ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্‌সমূহের মধ্যে *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* একখানি তাৎপর্যপূর্ণ স্বতন্ত্র রচনা। এগুলিকে সম্যক ভাবে বিশ্লেষণ করা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু যাজ্ঞবল্ক্য চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ-উপনিষদের যুগটিকে আরও একটু স্পষ্ট করে বোঝাবার চেষ্টা করতে চাই। মহীধরের কাহিনির মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যকে অবাধ্য উদ্ধত ধরনের মানুষরূপে দেখানো হয়েছে; বস্তুত ব্রাহ্মণ-উপনিষদে প্রতিফলিত যাজ্ঞবল্ক্যের যে-চরিত্র তার দ্বারাও এ-ধারণা সমর্থিত।

প্রচলিত সংস্কারকে অস্বীকার করতে যাজ্ঞবল্ক্যের বাধেনি। তাঁর রচিত *শতপথব্রাহ্মণ*-এ আছে: ধেনু বা অনড়ুহ্ (ষাঁড়)-মাংস ভক্ষণ করলে পতিত হতে হয়। কিন্তু ঠিক তার পরেই যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, 'আমি কিন্তু (গোমাংস) ভক্ষণ করব যদি সেটা সুসিদ্ধ (নরম) হয়।'[১] প্রাচীন ভারতে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল— সে অতি সত্য কথাটাকে চাপা দেওয়ার জন্যে আজকাল কত-না ছলকৌশলের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে; যাজ্ঞবল্ক্য টের পাননি তাঁর উত্তরপুরুষকে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে তাই অসংকোচেই বলে গেছেন: যজ্ঞের জন্যে যে-সোম কেনা হল তা হল অতিথির, তাই রাজার জন্যে ব্রাহ্মণের জন্যে মানুষের হব্য হিসেবে যেমন বড় ষাঁড় বা বড় হাতি বা বড় ছাগল রাঁধা হয় দেবতাদের জন্যেও এঁকে (সোমকে) এই আতিথ্যই করা হয়।[২] আবার *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*-এ পড়ি: গৌরবর্ণ পুত্রকামনায় পিতা একটি বেদ পড়বেন, স্ত্রীকে ক্ষীরান্ন ভোজন করাবেন; কপিল পিঙ্গল পুত্রকামনায় দুটি বেদ পড়বেন ও স্ত্রীকে দধিযুক্ত অন্ন ভোজন করাবেন; শ্যাম-বর্ণ লোহিতাক্ষ পুত্রকামনায় তিনটি বেদ পড়বেন ও স্ত্রীকে জলে-সিদ্ধ অন্ন ভোজন করাবেন; পণ্ডিত দুহিতা কামনা করে স্ত্রীকে তিলমিশ্রিত অন্ন ভোজন করাবেন; এবং পণ্ডিত যশস্বী, সভায় সুপ্রতিষ্ঠিত সবাক্ পুত্রকামনায় চতুর্বেদ পাঠ করবেন ও স্ত্রীকে বলদের বা বৃষভের মাংসযুক্ত অন্ন ভোজন করাবেন।[৩] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*-এর শেষাংশে একটি কাহিনির অন্তে বলা আছে পাঁচটি পশু ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য, কারণ এদের মধ্যে থেকে মেধ (যজ্ঞে হব্যরূপে ব্যবহার্যতা) বেরিয়ে গেছে। এই পাঁচটি হল: মানুষ, অশ্ব, গৌ, মেষ এবং অজ।[৪] স্পষ্ট বোঝা যায় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলি এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অনুশাসনে প্রাণীহত্যা সম্বন্ধে নিষেধবাক্য ও অহিংসার ব্যাপক প্রচারই এ নির্দেশের মূলে। লক্ষণীয়, মানুষ এ তালিকায় বিধৃত, সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক আদিমপ্রথা (যুদ্ধে পরাজিতকে হত্যা করে ভক্ষণ)-এর স্মরণে; কিংবা হয়তো মানুষ সর্বত্রই

অভক্ষ্য জীবের তালিকায় অগ্রগণ্য, কিন্তু অশ্ব ও গৌ নিশ্চয়ই ভক্ষ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল যেমন মেষ বা অজ; এবং নিষেধ যখন এল তখন সচরাচর-ভক্ষিত মাংসের প্রায় সবগুলির ওপরেই এল। বাকি রইল এণ (হরিণ)-মাংস, শশমাংস ও বাধ্রীণস (গণ্ডার)-মাংস, অর্থাৎ যেগুলি মৃগয়ালব্ধ, অতএব অনিশ্চিত। কিংবা হয়তো-বা মৃগয়া রাজাদের বিলাস বলে তার প্রতি কতকটা প্রশ্রয় দেওয়া রইল। আরও লক্ষণীয়: যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণকেই শুধু অমেধ্য মাংস ভক্ষণে বিরত থাকতে বলেছেন, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র তখনও অশ্ব গৌ মেষ ও অজ-মাংস ভক্ষণ করতে পারে। শুধু যজ্ঞে এগুলি ব্যবহার হতে পারবে না, এবং ব্রাহ্মণ খাবে না। অনুমান করা হয়তো অন্যায় হবে না যে, পূর্বে এ নিষেধ না থাকায় উল্লিখিত প্রাণীগুলি অত্যন্ত অধিক পরিমাণে যজ্ঞের জন্যে নিহত হওয়াতে সমাজে পশুধনের অভাব ঘটছিল; গোধন ক্ষয় হচ্ছিল, অশ্বের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল। দেশের পশুসম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যও হয়তো এ-নির্দেশের একটি কারণ।

নারী সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, জায়া নিজের (অর্থাৎ পুরুষের) অর্ধাংশ।[৫] বিবাহে সম্প্রদানের প্রসঙ্গে বলছেন, কে দান করেছিল? কাকে দান করেছিল? কাম দিয়েছেন, কামকেই দিয়েছেন। কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা।[৬] অর্থাৎ কামনাই বিবাহের ভিত্তি, কামনাই একটি পুরুষ ও একটি নারীকে অনুপ্রেরিত করে পরস্পরের কাছে আত্মদান করতে। এ উক্তির মধ্যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির দৃষ্টির স্বচ্ছতাই চোখে পড়ে। আবার শুনি সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটন করছেন ঋষি: একা থাকলে কেউ সুখ পায় না তাই লোকে একাকী না থেকে দ্বিতীয়ের সন্ধান করে। গাঢ়-আলিঙ্গনে-বদ্ধ নারী-পুরুষের মতো তিনি নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন, তখন পতি পত্নী সৃষ্টি হল; তাই এই (যুগল) দ্বিদল বীজের মতো।

নারীপুরুষের প্রেমকে যাজ্ঞবল্ক্য চূড়ান্ত মর্যাদা দিয়েছেন *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*-এ একে ব্রহ্মোপলব্ধির উপমানরূপে উপস্থাপিত করে: যেমন প্রিয় স্ত্রীর দ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের বাহ্যজগতের কিছুরই বোধ থাকে না তেমনই ব্রহ্মজ্ঞান হলে বাহ্যবস্তুর কোনও বোধই থাকে না।[৮] নিজের স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলছেন: স্বামীর কামনাতে স্বামী প্রিয় নন, তাঁর মধ্যে (স্ত্রী) নিজেকে অভিস্থাপন করতে পারে বলেই স্বামী প্রিয় হন।[৯] এ-ও এক মোহমুক্ত দৃষ্টির প্রমাণ এবং মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মজ্ঞানের পরিচায়ক: স্বামী বন্ধু পুত্র এরা ততটাই প্রিয় হয় যতটা নিজেকে তাদের মধ্যে অনুভব করা যায়। নারীর দুর্বলতা সম্বন্ধেও ঋষি অবহিত, বলছেন: যে পুরুষ নাচতে গাইতে পারে তার প্রতিই নারী সব চেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়।[১০]

যজ্ঞেরও অপরার্ধ যজমানপত্নী।[১১] পত্নীকে সহধর্মচারিণী বলা হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ যজ্ঞে পত্নীর করণীয় নিতান্তই গৌণ। মনে হয়, আর্যদের এ দেশে আসবার অব্যবহিত পরে এ অবস্থা ছিল না।[১২] যজ্ঞও দুই যজমান দম্পতির কৃত্য ছিল। পরবর্তীকালে প্রাগার্য নারীকে বিবাহ করলে নবাগতাকে আর্য সমাজ সামাজিক স্বীকৃতি দেয় কিন্তু, জন্মসূত্রে সে ভিন্নধর্মী বলে যজ্ঞে তাকে অধিকার দিতে সমাজ কুণ্ঠা বোধ করে, যার ফলে যজ্ঞে যজমানপত্নীর অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হতে থাকে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য মনে করিয়ে দিতে চাইছেন যে, যজ্ঞে

পুরুষের একাধিপত্য নেই, নারীও পূর্বে যজ্ঞের অর্ধাংশরূপে গণ্য হত। তাঁর সময়ে যজমানপত্নীর অধিকার যৎসামান্য তবু তার ভাবগত অধিকার তিনি স্বীকার করেছেন।

নিজের জীবনে নারীর সঙ্গে তাঁর দুটি সংলাপের কথা আছে *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*-এ। একবার ব্রহ্ম সম্বন্ধে গার্গীর সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের কথা আছে। তখন গার্গীর শেষতম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আর বেশি প্রশ্ন কোরো না, গার্গি, তোমার মাথা খসে পড়বে।[১৩] বলা বাহুল্য, এই সতর্কবাণীর মধ্যে এক ধরনের পরাজয়স্বীকার অন্তর্নিহিত আছে; প্রকাশ্যে নারীর কাছে পরাজয় স্বীকার না করে তিনি গার্গীকে প্রকারান্তরে অস্বস্তিকর প্রশ্ন করা থেকে বিরত হতে বললেন। দ্বিতীয় উপাখ্যানে নিজের স্ত্রী মৈত্রেয়ীর সঙ্গে তাঁর সংলাপ। তপশ্চর্যার জন্যে বনে যাওয়ার পূর্বে তাঁর সম্পত্তি দুই স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইলে কাত্যায়নী স্পষ্টতই সন্তুষ্ট হলেন; কিন্তু মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করলেন: 'যা দিয়ে যাচ্ছ তাতে কি আমি অমর হব?' সত্যনিষ্ঠ স্বামী প্রতারণা করলেন না, বললেন, 'অমরতার লেশমাত্র সম্ভাবনা এতে নেই।' মৈত্রেয়ী বললেন, 'যাতে অমর হব না তা দিয়ে কী করব?' তখন তিনি আচার্যের দৃষ্টিতে মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ অধিকারিণী জেনে অকুণ্ঠচিত্তে অকৃপণ ভাবে এই নারীকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিলেন।

যজ্ঞকালে ঋত্বিক্ প্রতিপ্রস্থাতা যজমানপত্নীকে প্রশ্ন করবেন, 'কার সঙ্গে ব্যাভিচারিণী হয়েছ?' সেই নারী বরুণের কাছে অপরাধিনী হন, যিনি একজনের (স্ত্রী) হয়ে অন্যের সঙ্গে ব্যভিচার করেন, তাই যজ্ঞকালে (এই গোপন তথ্য) অন্তরে শল্যের মতো যেন না থাকে সে জন্যে তিনি স্বীকার করেন। না স্বীকার করলে তাঁর আত্মীয়দের প্রতি অন্যায় করেন।[১৪] বলা বাহুল্য, প্রতিপ্রস্থাতার প্রশ্ন এবং যজমানপত্নীর উত্তর যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্ভাবন নয়, যজ্ঞে আচরিত বিধিমাত্র। উদ্ভাবন ব্যাখ্যাটুকু। গোপন পাপ অন্তরে শল্যের মতো বহন করে যেন সে নারী আত্মীয়দের কাছে অপরাধিনী না হয় তাই এ স্বীকারোক্তি। লক্ষণীয়, যজমানপত্নী ব্যভিচারিণী হওয়া সত্ত্বেও যজ্ঞে অধিকারচ্যুতা নন, স্বীকারোক্তির দ্বারাই তিনি শুচি। এ কথা সত্য যে, যজমানকে অনুরূপ কোনও প্রশ্ন করা হত না, অর্থাৎ নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক নৈতিক মানদণ্ড তখনই সমাজে আছে। তবু, সমাজের স্থিতিস্থাপতা এবং যাজ্ঞবল্ক্যের এই বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি বিস্ময় উৎপাদন করে। কোনও শাস্তির কথাই নেই, শুধুমাত্র স্বীকারোক্তি; মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা সম্বন্ধে নীতিবাগীশের মতো কোনও উত্তুঙ্গ মনোভাব দেখা গেল না ঋষির, বরং 'অন্তঃশল্যা' শব্দটার মধ্যে যেন অপরাধিনীর মঙ্গলচিন্তাই আছে।

যজ্ঞ করা ধর্মাচরণ কিন্তু মানুষ যজ্ঞ কেন করে সে বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, পুরাকালে ঋষিরা কামনার বশেই যজ্ঞ করেছিলেন, 'এই আমাদের কামনা, এটি পূর্ণ হোক'— এই বলে।[১৫] যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টিতে দেবতা ও মনুষ্য নিতান্ত পৃথক নয়, দেবতারা মানুষের উপরে নির্ভরশীল, পৃথিবীর হবির্দানেই দেবতারা বেঁচে থাকেন।[১৬] মানুষ যেমন অসুরদের বঞ্চিত করতে চায় তেমনই দেবতারাও মানুষকে স্বর্গ থেকে বঞ্চিত করতে চান। মানুষ পশু লাভ করে সমৃদ্ধ হয় এটা দেবতারা পছন্দ করেন না।[১৭] দেবতারা মানুষ সম্বন্ধে ঈর্ষাকাতর এমন আভাস প্রায়ই পাওয়া যায়।

মানুষ প্রজাপতির সব চেয়ে কাছের (জীব), সে শতায়ু, শততেজা, শতবীর্য।[১৮] স্বর্গ আগে মর্তের অতি নিকটে স্পর্শলভ্য ছিল, দেবতারা চাইলেন স্বর্গ ও মর্ত পৃথক ও পরস্পর থেকে দূরবর্তী হোক, তাই হল।[১৯] এই সেই ঈর্ষা যা নিত্যবিদ্যমান মানুষ ও অসুরের মধ্যে; দেখা যাচ্ছে, যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টিতে দেবতারাও তা থেকে মুক্ত নন। যাজ্ঞবল্ক্য দেবতাদের নির্দোষ বা স্বনির্ভর মনে করেননি, বরং এমন কথাও বলেছেন যে দেবতারা মানুষের চেয়ে কনীয়ান্, কারণ দেবতারা মানুষের তুলনায় সংখ্যালঘু।[২০] দেবতারা সত্য কথা বলতে বলতে দরিদ্র ও তুচ্ছ হয়ে যান, মানুষেরও তাই হয়, তবে অন্তিমে সত্যবাদী মানুষ শ্রীলাভ করে, যেমন দেবতাদেরও সমৃদ্ধিলাভ ঘটেছিল।[২১] এ দেবতা তো মানুষের চেয়ে খুব উঁচু স্তরের জীব নয়, এদের ক্ষুধা তৃষ্ণা দারিদ্র্য তুচ্ছতা ঈর্ষা দ্বেষ উত্থানপতন সবই আছে; অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টিতে দেবতারা মানুষের খুব কাছাকাছি স্তরের জীব। এতে দেবতার গৌরব ততটা ক্ষুণ্ন হয়নি যতটা মানুষের মর্যাদা বেড়েছে।

বর্ণবিভক্ত সমাজে বর্ণগুলির নির্দিষ্ট স্থান ও আপেক্ষিক মর্যাদা সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য খুবই সচেতন, বিশেষত রাজার সঙ্গে বৈশ্য ও ব্রাহ্মণের সম্পর্ক নিয়ে। স্বচ্ছদৃষ্টি ঋষি স্পষ্টই দেখছেন প্রজার সম্পত্তি নানা ভাবে রাজকোষে আসছে। তাই বারবার বলছেন, প্রজা অন্ন, ভোক্তা ক্ষত্রিয় (অর্থাৎ রাজন্য)।[২২] শ্রেণি হিসাবে এ সময়ে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যই চোখে পড়ে। রাজ্যচালনায় ব্রাহ্মণ অযোগ্য এ কথা স্পষ্টই বলা আছে।[২৩] খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের পর থেকেই উত্তর ভারতে বহু খণ্ড-রাজ্যের অভ্যুত্থানের যুগ— সে-সব রাজ্যের রাজারা নিজেদের সীমানার মধ্যে একচ্ছত্র অধিপতি। ফলে রাজন্য এবং ক্ষত্রিয় শ্রেণি হিসাবে ক্রমেই শক্তিমত্ত হয়ে উঠছে। রাজকোষ সমৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এঁরা নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন এবং যাজক ব্রাহ্মণ যজমান ক্ষত্রিয়কে অন্নদাতা ও প্রতিপালকরূপে দেখছে। ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে ব্রাহ্মণের শ্রেণিসত্তা নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি লাভ করছে। অতএব ক্ষত্রিয়ের শ্রেণিগৌরব ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে তখন। এই কথাই পুরাকল্পরূপ পাচ্ছে: পূর্বে কেবল ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) ছিলেন; একাকী কর্মসম্পাদনে অসমর্থ হয়ে তিনি শ্রেয়োরূপে দৃষ্টি করলেন ক্ষত্রিয়কে। দেবতাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় হলেন ইন্দ্র বরুণ সোম রুদ্র পর্জন্য যম মৃত্যু ঈশান। তাই ক্ষত্রিয়ের অধিক আর নেই, তাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে নীচে থেকে উপাসনা করে রাজসূয় যজ্ঞে;ক্ষত্রিয়ে যশ আধান করে।[২৪] রাজসূয় যজ্ঞে আসন্দীতে উপবিষ্ট রাজা ঋত্বিককে ব্রহ্মন্ সম্বোধনে আহ্বান করেন। উত্তরে ঋত্বিক্ বলেন হে, রাজন, আপনিই ব্রহ্মা। এ-সব নির্দেশে মনে হয় ক্ষত্রিয় রাজা এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মধ্যে ক্ষমতার আপেক্ষিকতা নিয়ে একটা অন্তর্নিহিত আন্দোলন তখনই সমাজে দেখা দিয়েছে। স্মরণীয় যে, তৎকালীন সমাজে এঁরা দুজনেই ক্ষমতার শিখরে সমারূঢ়। মধ্যযুগের ইয়োরোপে চার্চ ও স্টেটের যে দ্বন্দ্ব তা হয়তো অঙ্কুররূপে এখানে এ ভাবে প্রকটিত; বিশেষত যখন উপনিষদের যুগ ক্ষত্রিয় অভ্যুত্থানেরই যুগ।

শুধু যে প্রতাপ-পরাক্রমে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ তা নয়, জ্ঞানেও, এমনকী, ব্রহ্মজ্ঞানেও ক্ষত্রিয়ই

প্রথম অধিকারী ও প্রবক্তা। শ্বেতকেতু আরুণেয় বললেন, 'গৌতম...এই বিদ্যা এর আগে কোনো ব্রাহ্মণে বাস করেনি।'[২৫] ক্ষত্রিয় রাজা জনক যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে 'কামপ্রশ্ন' বর লাভ করেন, অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যকে যখন যা ইচ্ছা সেই প্রশ্ন তিনি করতে পারেন।[২৬] যাজ্ঞবল্ক্য জনকের ক্ষুরধার বুদ্ধিকে ভয় পেলেন, বিশেষত সৃষ্টির অন্তর্নিহিত শেষ তত্ত্বটি সম্বন্ধে যদি ওই বুদ্ধিমান রাজা অনুনয় করেন বসেন।[২৭] জরৎকারু আর্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে মিনতি করেন একটি প্রশ্নের উত্তরের জন্যে: মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় থাকে। তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে নিরালায় নিয়ে গিয়ে 'কর্ম' সম্বন্ধে আলোচনা করেন।[২৮] রাজা প্রবাহণ জৈবলির কাছে প্রশ্নে পরাস্ত হয়ে শ্বেতকেতু আরুণেয় পিতা গৌতমের কাছে এসে অনুযোগ করলেন পিতা তাঁকে যথেষ্ট জ্ঞান দান করেননি। নিজের অপূর্ণতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে গৌতম স্বয়ং প্রবাহণ জৈবলির কাছে বিদ্যার্থী হয়ে এলেন। ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণ ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীকে এ কথা বাইরে প্রকাশ করতে নিষেধ করে বললেন: এ বিদ্যা তোমার পূর্বে ব্রাহ্মণদের কাছে যায়নি, তাই সর্বলোকে ক্ষত্রিয়েরই প্রশাসন।[২৯]

ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* খুবই তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ; এখানে যাজ্ঞবল্ক্য এ-তত্ত্বের প্রবক্তা রূপে উপস্থাপিত। মূল উপনিষদ্‌গুলি প্রত্যেকটিরই প্রধান বিবক্ষিত বিষয় ব্রহ্মবাদ। কিন্তু বহু পরবর্তীকালের শংকরভাষ্য থেকে দৃষ্টি মুক্ত করে নিলে সব-কটি উপনিষদের তত্ত্বদৃষ্টির মধ্যে খুব সাধারণ একটা ঐক্য থাকলেও পরস্পরে প্রচুর পার্থক্যও চোখে পড়ে। প্রবক্তাদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টি যেমন স্বচ্ছ তেমনই কবিত্বপূর্ণ। তত্ত্বের দিকের আলোচনা এ প্রবন্ধের পরিসরের বাইরে, এখানে শুধু দ্রষ্টার বোধ ও সংবেদনশীলতাই দেখবার চেষ্টা করছি। 'আত্মা কী?' 'প্রাণ দ্বারা যে প্রাণিত হচ্ছে সেই তোমার আত্মা। সব কিছুরই সে অভ্যন্তরবর্তী।'[৩০] পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্য সব কিছুরই অন্তরতর যা, তাই আত্মা।[৩১] যে পৃথিবীতে থেকে পৃথিবীর অন্তরালে, পৃথিবী যাকে জানেনি, পৃথিবী যার শরীর, যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে (থেকে) নিয়ন্ত্রিত করছে, এই সেই তোমার আত্মা— অন্তর্যামী, অমৃত।[৩২] বিদগ্ধ শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করছেন: কা প্রিয়তা যাজ্ঞবল্ক্য?

উত্তর দিচ্ছেন ঋষি: প্রাণ এব সম্রাট্।[৩৩]

রাজা জনক প্রশ্ন করছেন, 'পুরুষের জ্যোতি কি?'

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর, 'সূর্য'।

'সূর্য অস্ত গেলে?'

'চন্দ্রমা'। 'চন্দ্রমা না থাকলে?'

'অগ্নি'।

'তাও না থাকলে?' 'বাক্'।

'তাও নীরব হয়ে গেলে?'

'আত্মাই পুরুষের জ্যোতি'।[৩৪] এই আত্মার লীলাই লোকে দেখে, তাকে কেউ দেখে না।[৩৫]

এই আত্মাই ব্রহ্ম— এ কথাই উপনিষদের কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য। ব্রহ্ম মানে বৃহৎ। মানুষ

নিজেকে চেনে ব্যষ্টিসত্তায় ও সমষ্টিসত্তায়— অর্থাৎ ব্যক্তিরূপে এবং পরিবারে সমাজে ও দেশে। এর পরেও একটি দৃষ্টি আছে, তা হল: অতীতে অনাগত সৃষ্টির তাবৎ মানুষের মধ্যে নিজের সত্তাকে ভাবলোকে সম্প্রসারিত করে দিয়ে তার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়া। উপনিষদের ঋষি এই বৃহৎকেই ব্রহ্ম বলে অভিহিত করেছেন, বলেছেন, এ-ই মানুষের চরম সত্তা। মনে রাখতে হবে, আর্যরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে এসেছেন, এবং প্রথম পর্বের যুদ্ধের পরে যথাসম্ভব শান্তিতে বিনা রক্তপাতে প্রাগার্যদের সঙ্গে সহবসতি করেছেন। বিবাহসূত্রে বহু প্রাগার্য নারী ও পুরুষ আর্যসমাজে অনুপ্রবিষ্ট; এঁরা সঙ্গে এনেছেন প্রাগার্য ধর্মমত, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি। আর্যরা ধীরে ধীরে সেগুলি আত্মস্থ করে সমৃদ্ধ করে তুলছেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম উপাসনা ও দর্শন। বিনা রক্তপাতে এই যে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিপ্লব, যাতে আর্য জীবনযাত্রার ধারা বিশ্বাস আচার— সবই গভীর ভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হল, এটিকে সার্থক করার জন্য আর্য মনীষীরা এক দিকে যেমন আর্য দেবমণ্ডলীর মধ্যে প্রাগার্য দেবতাদের স্থান দিলেন, অন্য দিকে তেমনই ভাবদৃষ্টি সম্প্রসারিত করে এমন একটি চিন্তাধারার প্রবর্তন করলেন যার মধ্যে বিভেদ গৌণ হয়ে ঐক্যই মুখ্য হয়ে উঠল।[৩৬] আর্যাবর্তে বহু খণ্ড-রাজ্য, নানা রাষ্ট্রব্যবস্থা, নানা জাতি মত ও আচার, এগুলিকে কল্পলোকে উপনিষদ্ একটি সংহতি দিয়ে বলল, সবই সেই একক সত্তার প্রকাশ, সত্য সেই এক, সেই বৃহৎ ব্রহ্ম, সেই পরম-সত্তা আত্মা, স্ব-রূপ।

সমাজে অনুষ্ঠিত বহু সম্প্রদায়ভেদগত অন্যায়ের একটি কাল্পনিক ক্ষতিপূরণের এ চেষ্টার যে ত্রুটি, ভারতবর্ষের সমাজ তার পূর্ণ মূল্য আজও শোধ করছে। কিন্তু সে দিন সম্ভবত এ বোধের উদয় হয়েছিল জীবনকে তার স্বরূপে বুঝে নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তাকে বৃহৎ সমষ্টিসত্তার অন্তর্গতরূপে জেনে তার যথার্থ তাৎপর্য খুঁজে পাওয়ার জন্যে। যাজ্ঞবল্ক্যের চোখে এ জানাটা খুবই জরুরি; তাই বলছেন: 'গার্গি, এই অক্ষয়কে না জেনে যে এই পৃথিবী থেকে চলে যায় সে কৃপার পাত্র, যে এই অক্ষয়কে জেনে পৃথিবী থেকে যেতে পারে সেই ব্রাহ্মণ।'[৩৭] ব্রাহ্মণ কেন? ব্রহ্ম বা বৃহৎকে সে জেনেছে, তাই। এই পৃথিবীতে থেকেই সে (তত্ত্ব)-টিকে আমরা জানব, নইলে মহতী বিনষ্টি। যারা তা জানে তারা অমৃত হয়, অন্যেরা দুঃখ পায়।[৩৮] এই তোমার আত্মা সব কিছুরই অভ্যন্তরে, এর বাইরে সব কিছু আর্ত।[৩৯] এর বাইরে কী আছে? আছে বিচ্ছিন্ন এককের বোধ, যে বোধে আমরা শুধুই স্বতন্ত্র, শুধুই খণ্ডিত একটি ব্যক্তি মাত্র। সেই একক সত্তার বোধও মিথ্যা নয়, তবে সে-বোধ অসম্পূর্ণ, সে-বোধে ব্যক্তির মৃত্যু আত্যন্তিক; তাই সে-বোধ মৃত্যুর চরম আর্তিতে ক্লিষ্ট। মানুষের আত্মা তো তার একার শুধু নয়, সমগ্র মানবজাতিরই। সেইখানে সে পূর্ণ; তার বাইরে সে দ্বীপমাত্র, বিচ্ছিন্ন, তুচ্ছ, খণ্ডিত, একান্তবিধ্বংসী। এই সত্তাই যে মানুষের চূড়ান্ত সত্তা নয় সেইটুকু জানার দ্বারাই মানুষ তার মৃত্যুসীমা উত্তরণ করে তার পরম মানবসত্তায় অমরতা লাভ করে।

উপনিষদে এই বৃহৎ বা ব্রহ্মের উপরে যে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে তার আর-একটা কারণ হয়তো এই যে, এখানে সমস্ত চিন্তার আদিম প্রেরণা আসছে মৃত্যু থেকে। ব্যক্তিসত্তার

এই একান্ত বিলুপ্তি, মানবজীবনের সমস্ত তাৎপর্যের এই আপাত প্রবল অস্বীকৃতি, জীবিতের পক্ষে একে স্বীকার করাই যেন এক ধরনের পরাজয়। কোনও-না-কোনও ভাবে তাই মানুষ চিরদিনই বলতে চেয়েছে মৃত্যুতে সব শেষ হয় না। জন্মান্তরবাদে মৃত্যুর দ্বারা বিনাশ আপেক্ষিক বা আপাতরূপে প্রতিভাত। কিন্তু উপনিষদে আরও সার্থক ভাবে মৃত্যুর সঙ্গে অমরতার সমন্বয় করা হয়েছে। মৈত্রেয়ী যখন বললেন, 'যাতে অমর হব না তা দিয়ে আমি কী করব' তখন তার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে যে উপদেশ দিলেন তা হল: আপন ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্বসত্তার মধ্যে স্থাপিত করে স্ব-রূপে তাকে জানো; সেই সত্তাই আত্মা, সেই ব্রহ্ম। প্রকারান্তরে বলা হল, এই সেই জ্ঞান যা অমর করে মানুষকে; কারণ ব্যক্তির নাশ হয় 'মানুষের' ধ্বংস নেই। ইতিহাসের আদিপর্ব থেকে যে-মানুষের অভিযান নানা দেশে নানা কালে অনাগতের অভিমুখে, তার বিনাশ নেই; সেই 'পুরুষ', সেই ব্রহ্ম, মানুষের ভাবসত্তায় সে-ই আত্মা। সেইটে জেনে এ-পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার দিনে মানুষ আশ্বস্ত হয়ে যেতে পারে যে, নিরবধি কাল ও বিপুল পৃথ্বীতে সে অক্ষয়, অমর। বহু জাতি ও সংস্কৃতির সার্থক সমন্বয়ের ঐকান্তিক প্রয়াসেই এ-তত্ত্বটির উদয় হয়েছিল।

উপসংহারে উপনিষদের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বারেবারেই দেখা যায় ব্রহ্মোদ্য বা তত্ত্বজিজ্ঞাসার উপক্রমণিকারূপে অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে: কোথাও দুর্ভিক্ষের সময়ে হস্তিপকগ্রামে ব্রহ্মবাদী হীনবর্ণের উচ্ছিষ্ট কুল্মাষ (খারাপ মাষকলাই) ভক্ষণ করছেন, কোথাও শকটের নীচে বসে গাত্রকণ্ডুয়ন করছেন, কোথাও দরিদ্র ঋষির কাছে যজ্ঞের ঋত্বিকের আহ্বান এসে পৌঁছচ্ছে, কোথাও বৃদ্ধ শীর্ণ গাভী দক্ষিণার জন্যে সাজানো আছে, কোথাও-বা পিতৃপরিচয়হীন বালক আচার্যের কাছে বিদ্যার্থী হয়ে এসেছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসার ভূমিকা হিসেবে এগুলি অপরিহার্য নয়; আচার্য ও জিজ্ঞাসুর সংলাপ সরাসরিই আরম্ভ হতে পারত, যেমন অধিকাংশ মূল উপনিষদে হয়েছে। যে-সাহিত্য কথ্য ও শ্রব্য— যেমন উপনিষদ্— তাতে শব্দবাহুল্য সর্বদাই পরিহার করা হয়, কাজেই ধরে নিতে হবে এ-সব ভূমিকার কোনও তাৎপর্য আছে। মনে হয়, উপনিষদ্‌কাররা বলতে চেয়েছেন, এই দৈনন্দিন তুচ্ছতা— দৈন্য কুশ্রীতা অভাব কার্পণ্য ও হীনতা— এ-সবের মধ্যেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, এ-সবের জন্যেই প্রয়োজন। এ-সবের থেকে পলায়ন করবার জন্যে উপনিষদ্ নয়, ক্ষুদ্রতার পরিবেশে থেকেও ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে সেই-বৃহৎকে জানবার জন্যে উপনিষদ্, যে-বৃহতের মধ্যে বিচ্ছিন্ন খণ্ড ক্ষুদ্রও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আদিত্যবর্ণ মহান্ 'পুরুষ' সর্বমানবের প্রতিভূ। দেশে কালে সীমাবদ্ধ, জাতি আচার সংস্কৃতিতে খণ্ডিত, হীনতায় দৈন্যে কুশ্রীতায় ক্লিষ্ট একক মানুষ, জরামরণশীল অসহায় ব্যক্তি মানুষ, একটি অবিনশ্বর মর্যাদা লাভ করে তার সেই ভাবরূপে— সেই পুরুষে, অনাদ্যন্ত কালের মানুষের যিনি কল্পরূপ। এখানে যাজ্ঞবল্ক্য আদর্শবাদী বা ভাববাদী,[৪০] কিন্তু বেদান্তের এই প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতবর্ষের জাতি-ধর্ম-বর্ণ- সংস্কৃতির ভেদ সত্ত্বেও একটি সংহতি দেওয়র চেষ্টায় এ-দর্শনের হয়তো একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল।

একবার বিদেহের রাজা বসে আছেন এমন সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য এলেন। জনক তাঁকে বললেন, 'যাজ্ঞবল্ক্য কী প্রয়োজনে এসেছেন— পশুধনলাভের আশায়, না সূক্ষ্মতত্ত্বের সন্ধানে?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'উভয়ের জন্যই সম্রাট।'[৪১] আর-একবার ব্রহ্মতত্ত্ববিচারে বেদজ্ঞদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ হবেন, তাঁর উদ্দেশে বিদেহরাজ জনক সোনায়-শিং-মোড়া এক হাজার গাভী বেঁধে রাখলেন। যাজ্ঞবল্ক্য নিজের শিষ্যকে বললেন, 'সোমশ্রবা, গোরুগুলোকে বাড়ি নিয়ে চল।' ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হলেন; তাঁদের মধ্যে অশ্বল বললেন, 'যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই বুঝি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ (ব্রহ্মজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ)?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'ব্রহ্মিষ্ঠকে আমরা নমস্কার করি (আজ এখানে) আমরা তো গোধনের কামনায় (এসেছি)।'[৪২] শ্বেতকেতু, সোমশুষ্ম ও যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার জন্যে জনকের কাছে এলেন; একদিন আলোচনার পর ঠিক হল, পরদিন ব্রহ্মোদ্যে (ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনায়) নিষ্পত্তি হবে। যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণদের বললেন, 'আমরা ব্রাহ্মণ, ইনি রাজন্য; যদি আমরা এঁকে জয় করি তবে আর কাকে জয় করলাম বলব? ইনি যদি আমাদের জয় করেন তবে কিন্তু 'রাজন্য ব্রাহ্মণদের পরাজিত করেছে— এই কথাই লোকে আমাদের বলবে, (কাজেই) এ-ব্যাপারে উৎসাহ ত্যাগ করো।'[৪৩]

এ ক'টি উপাখ্যানে যে-যাজ্ঞবল্ক্যকে দেখি, তাঁর ঋষিজনোচিত তুরীয় ভাব নেই তাতে। বরং, তাঁর সাধারণ বুদ্ধি এবং কাণ্ডজ্ঞান প্রবল আর প্রবল তাঁর অসংকোচ সত্যনিষ্ঠা। উপনিষদে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে কোনও কৃত্রিম সংকোচ নেই। বেঁচে থাকার জন্যে অর্থের প্রয়োজন আছে, পশু দরকার, স্বর্ণশৃঙ্গ গাভী পেলে নিতে হয়— এবং বড় বড় ব্রহ্মজ্ঞ যা স্বীকার করতে পারেননি যাজ্ঞবল্ক্য অনায়াসে তা উচ্চারণ করলেন: রাজসভায় যাঁরা সমবেত তাঁরা ব্রহ্মের জন্যে আসেননি, এসেছেন সোনা আর গরুর জন্যে। রাজাকে তেমনই সহজেই তিনি জানাতে পেরেছিলেন যে শুধু ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার জন্যেই আসেননি পশুধন লাভের প্রত্যাশাও তাঁর আছে। পরবর্তীকালে ঐহিকজীবন সম্বন্ধে অনীহা প্রকাশ এমনই ব্যাপক হয়ে উঠল যে, এই অকুণ্ঠিত সত্যভাষণের সাহস বিরল হয়ে এল। দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলো মায়া নয়, অত্যন্ত জরুরি তাদের তাগিদ এবং সে তাগিদ মেটানোতে যে পাপও নেই, লজ্জাও নেই, যাজ্ঞবল্ক্যের আচরণে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'কেউ বলেন অন্ন ব্রহ্ম, কেউ বলেন প্রাণ ব্রহ্ম; প্রাণ এবং অন্ন দুটি দেবতা এক হয়ে পরমতা প্রাপ্ত হয়; অন্নে এই সমস্ত প্রাণী আশ্রিত।'[৪৪] উপনিষদ্‌গুলিতে অসুরদের চেয়েও প্রবলতর শত্রু দুটি: অশনায়া (বুভুক্ষা) ও মৃত্যু। যজ্ঞের প্রাথমিক প্রয়োজন অন্ন সৃষ্টি ও রক্ষার জন্যে। বারবার ঋষিরা বলছেন, অন্নকে উপেক্ষা কোরো না, অন্নকে রক্ষণ করো, তার বৃদ্ধি করো।

মানুষের সকলের বড় এবং অমোঘ শত্রু মৃত্যু। বস্তুত বহু তত্ত্বচিন্তার সূত্রপাতই হয়েছে মৃত্যুসচেতনতায়। জীবনের তাৎপর্য বুঝতে শুরু করলে প্রথম ধাক্কাই আসে মৃত্যু থেকে: মৃত্যুতে এসে যা ঠেকে যায় তার আত্যন্তিক মূল্য কী? সমস্ত উপনিষদ্ জুড়ে তাই কেবলই বলা হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান জাগলে মৃত্যু পরাভূত হয়, মানুষ মৃত্যুকে পেরিয়ে যায়। কেমন করে? খণ্ড ব্যক্তিসত্তা যেখানে নশ্বর, সামগ্রিক জাতিসত্তায় মানুষসংজ্ঞিত জীবের অনাদ্যন্ত ইতিহাস

সেখানে শাশ্বত। 'আমি মরব, কিন্তু আমরা মানুষরা কখনও নিঃশেষিত হব না'— এই প্রত্যয়েই অমরতা, এতেই জীবনের তাৎপর্য। একক জীবনে যে উদ্যম অর্থহীন, মানবজাতির দূর-প্রসারী সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে তা মূল্যবান। মনে হয়, এই বৃহতের চেতনা থেকেই ব্রহ্মকল্পনার উদ্ভব, এ বৃহতের ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই।

যাজ্ঞবল্ক্যকে বৈদিক যুগের শেষার্ধের একটি যুগমানব বলে ধরা যায়। তাঁর মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলির উপরে সচরাচর বেশি গুরুত্ব অর্পণ করা হয় না, অথচ মনে হয়, এগুলি উপনিষদ্-যুগেরই বৈশিষ্ট্য। ইহজীবনকে মায়া বলে উড়িয়ে না দিয়ে তাকে স্বীকার করে, বৃহতের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তিসত্তার সীমা অনাদি-অনন্ত কালে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে, তার ক্ষুদ্রতা নশ্বরতাকে অতিক্রম করে, ভাবগত মানবসত্তার মধ্যে তার অমৃতরূপকে উপলব্ধি করা— সমস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে সংহত ভাবে দেখলে এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিভাত হয়। শংকরভাষ্য-নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত উপনিষদ্‌কে মিলিয়ে দেখলেও এই বোধটিই স্পষ্ট ভাবে চেতনায় সঞ্চারিত হয়।

স্বাভাবিক ভাবেই, উপনিষদের সব ঋষির দৃষ্টিভঙ্গি এক রকম নয়, তাঁরা সুসম্বদ্ধ কোনও দর্শনপ্রস্থান রচনার চেষ্টামাত্র করেননি, শুধু ক্রান্তদর্শীর দৃষ্টি নিয়ে অব্যবহিত উপলব্ধি ও ঐকান্তিক মননের মাধ্যমে একাগ্র নিষ্ঠায় জীবনকে গভীর ভাবে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁদের দৃষ্টির মধ্যে দার্শনিক সংহতি থাকার কথাই নয়, ছিলও না। শংকরাচার্য নিজের দার্শনিক মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে উপনিষদগুলিকে ব্যবহার করেছেন মাত্র। তাঁর রচনায় তাই উপনিষদ্ পাই না, পাই শংকরদর্শন, যা উপনিষদ্ যুগের দেড় হাজার বছর পরের দর্শন এবং অন্তর্বর্তীকালের সমস্ত মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। এই কারণে উপনিষদ্‌কে তার নিজস্ব চিন্তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার পক্ষে শংকরদর্শনের উপযোগিতা যৎসামান্য। শংকরদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেদান্তপ্রস্থান; কিন্তু তার কৃতিত্ব শংকরাচার্যেরই, তার মধ্যে উপনিষদের বোধ খুঁজতে যাওয়া নিষ্ফল। উপনিষদ্‌কার ঋষিদের দৃষ্টির মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। তবু, যেহেতু একই অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত এবং একই সামাজিক ঐতিহাসিক বোধের সংঘর্ষ ও সমন্বয়চেষ্টায় এদের সৃষ্টি, সেই হেতু মতগুলির মধ্যে এক ধরনের অন্তর্নিহিত মিল— অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে হলেও— আছে। ফলে, খুব সাধারণ ভাবে উপনিষদের ভাবধারা বলতে আমরা কয়েকটি কথা বুঝি। সেই প্রধান কয়েকটি বিষয়ের একজন মুখ্য-প্রবক্তা বৃহত্তম উপনিষদ্‌টির রচয়িতা যাজ্ঞবল্ক্য। তাই যাজ্ঞবল্ক্যে যখন দেখি জীবনবিমুখতা নেই, বরং এ-জীবনকে সর্বতো ভাবে স্বীকার করেই বৃহত্তর পটভূমিকায় তাকে অর্থপূর্ণ করে দেখার প্রচেষ্টা আছে তখন সমস্ত উপনিষদের যুগটিই আমাদের কাছে অন্য ভাবে প্রতিভাত হয়।

গুরুর প্রদত্ত বেদবিদ্যা প্রত্যর্পণ করেও যাজ্ঞবল্ক্য 'শুক্ল' বেদের ঋষি; নারী ও প্রেমকে তিনি গৌরবে মণ্ডিত করে দেখেছেন; গোমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে অহেতুক নিষেধ মানতে তিনি রাজি নন বরং তার উপযোগিতা অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করেছেন; ক্ষত্রিয়কে ব্রহ্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠ

আচার্য বলে অনায়াসে স্বীকার করেছেন; মৈত্রেয়ী নারী হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ অধিকারিণী জেনে অকাতরে তাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেছেন; গোকামনা ধনকামনা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই; উপযক্ত পুত্র ও কন্যা লাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে মেনে নিয়ে ভাবী পিতাকে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; যৌনজীবনের স্খলনকে উগ্র ভাবে আক্রমণ না করে মমত্বপূর্ণ ভাবে প্রতিকার নির্দেশ করেছেন; ক্ষুধা ও মৃত্যুকে পরম শত্রু বলে অভিহিত করেছেন; দেবতাদের মানুষের অনুজ ও মানুষ সম্বন্ধে ঈর্ষাকাতর বলে বর্ণনা করেছেন— এক কথায়, সুস্থ স্বচ্ছন্ন ঐহিক জীবনযাত্রাকে স্বীকার করে মানুষকে মহত্ত্বে ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সমস্তই সে-যুগ ও যুগপ্রতিভূ যাজ্ঞবল্ক্যের উপরে নূতন এক আলোকপাত করে। আমরা বুঝতে পারি, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অভ্যুত্থান ও বহু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কী গুণে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল: জীবন সমাজ সংসার সব-কিছুরই স্বীকৃতি ছিল এর মধ্যে— শুধু ছিল না সংকীর্ণ বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির। যাজ্ঞবল্ক্যও বললেন অনাদিকালের ভূমিকায় মানুষকে তার স্বরূপে না জেনে মৃত্যুতে ব্যক্তির বিনাশের আতঙ্কে মুহ্যমান হয়ে যে ইহলোক থেকে প্রস্থান করে সে কৃপার পাত্র। এ পৃথিবীতে থেকেই উপলব্ধি করতে হবে যে একের মৃত্যুতে একই শেষ হয়— 'মানুষ' শেষ হয় না। অতএব একের জন্যে জীবনধারণ করা চূড়ান্ত ব্যর্থতা, মহতী বিনষ্টি।

'এই পৃথিবী সমস্ত প্রাণীর মধু, সমস্ত প্রাণী এ পৃথিবীর মধু।'[৪৫] পৃথিবীর ধূলিও যেন মধুমান্ হয়— সংহিতার ঋষি এমন প্রার্থনা করেছেন। উপনিষদের ঋষিও পার্থিব এই-জীবনকে তাচ্ছিল্য করেননি। আয়ু সুখ ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ জীবনের তৃপ্তি— কোনওটাই উপেক্ষণীয় নয়, কিন্তু একক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে— মৃত্যু যেখানে অনিবার্য ও চূড়ান্ত সত্য, সেখানে— এ সব সুখই নিরতিশয় ভঙ্গুর। তাই সাহস করে সত্যের উপরকার সোনার আবরণখানি খসিয়ে নিরঞ্জনরূপে তাকে দেখতে হবে সেখানেই, যেখানে প্রতিষ্ঠিত-মানব-জাতি, যা 'ক্ষুদ্র-আমার' জন্মের পূর্বেও ছিল এবং 'ক্ষুদ্র-আমার' মৃত্যুর পরেও থাকবে। তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এই আপাত-নিরর্থক জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে হবে। তখন এক দিকে যেমন পার্থিব সুখ বর্জনীয় মনে হবে না, অন্য দিকে তেমনই তা একান্ত হয়ে উঠবে না। এই জ্ঞানই বৃহতের জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান। যাজ্ঞবল্ক্য এই ব্রহ্মবিদ্যারই পরম প্রবক্তা, তাই ব্যবহারিক জীবন থেকে পলায়নের পরামর্শ তিনি দেননি, ব্যবহারিক উপলব্ধি অভিজ্ঞতাকে, সুখসম্ভোগকে বৃহতের পটভূমিকায় স্থাপনা করাই তাঁর কীর্তি, কারণ এর মধ্যেই জীবনের চরম মূল্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে।

টীকা

১. যো ধেন্বনড়ুহোরশ্মীয়াদশুগতিরিব... পাপী... তস্মাদ্ধেন্বনড়ুহোর্নাশ্মীয়াত্তদু হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোহ শ্মাম্যেবাহমংসলং চেত্ত্বতীর্তি। *শতপথ ব্রাহ্মণ* ৩:১:২:২১

২. অতিথির্বা এষ এতস্যা আগচ্ছতি যৎ সোমঃ ক্রীতস্তস্মা এতদ্ যথা রাজ্ঞে বা ব্রাহ্মণায় বা মহোক্ষং বা মহাগজং মা মহাজং বা পচেত্তদহ মানুষং হবির্দেবানামস্মা এতদাতিথ্যং করোতি। প্রাগুক্ত ৩:৪:১:২

৩. ...ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা। *বৃহদারণ্যকোপনিষদ* ৬:৪:১৪-১৮

৪. এতে পঞ্চ পশবঃ অভবংতে অত উৎক্রান্তমেধা অমেধ্যা অযজ্ঞিয়াস্তেষাং ব্রাহ্মণো নাম্নীয়াত্তান্। প্রাগুক্ত ৭:৫:২:৩৭

৫. অর্ধো বা এষ আত্মনো যজ্জায়া। *শতপথ ব্রাহ্মণ* ৫:২:১:১০

৬. কোহদাৎ কস্মা অদাৎ কামোহদাৎ মামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা। প্রাগুক্ত ৪:৩:৪·৩৩

৭. স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব। প্রাগুক্ত ১:৪:৩

৮. যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো নবাহ্যং কিঞ্চন বেদ...। *বৃহদারণ্যকোপনিষদ* :৩:২১

৯. ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। প্রাগুক্ত ২:৪:৫

১০. য এক নৃত্যতি যো গায়তি তস্মিন্নেবৈতা নিমিশ্লতমা ইব। *শতপথ ব্রাহ্মণ* ৩:২:৪.৬

১১. জঘনার্ধো বা যজ্ঞস্য যৎ পত্নী। প্রাগুক্ত ৩:৪:২.২

১২. গৃহের অধিপতি ছিলেন দম্পতী (মৌলিক অর্থ দম=গৃহ, তার পতী অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী)।

১৩. গার্গি মাতিপ্রাক্ষীর্মা তে মূর্ধা ব্যপপ্তৎ। *বৃহদারণ্যকোপনিষদ* ৩:৬.১

১৪. স পত্নী মুদানেষ্যন্ পৃচ্ছতি কেন চসরীতি। বরুণ্যং বা এতৎ স্ত্রী কবোতি যদন্যস্য সত্যন্যেন চরত্যথো নেন্মেহস্তঃশল্য জুহবদিতি... সা যন্ন প্রতিজানীতে জ্ঞাতিভ্যো হাস্যৈ তদহিতং স্যাৎ। *শতপথ ব্রাহ্মণ* ২:৫:২:২০

১৫. কামৈর্হ স্ম বৈ পুরর্ষয়ঃ সত্রমাসতে... অসৌ নঃ কামঃ স সমৃধ্যতামিতি। প্রাগুক্ত ৪·৬:৯:২৩

১৬. ইতঃ প্রদানাদ্ধি দেবা উপজীবন্তি। প্রাগুক্ত ১:৩:১:১৫

১৭. তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ। *বৃহদারণ্যকোনিষদ* ১·৪:১০

১৮. পুরুষো বৈ প্রজাপতের্নেদিষ্ঠঃ সোহয়ং শতায়ুঃ শততেজাঃ শতবীর্যঃ। *শতপথ ব্রাহ্মণ* ৪ ৪:১.৯

১৯. সমন্তিকমিব হ বা ইমেহগ্রে লোকা আসুরিত্যুন্মৃশ্যা হৈব দ্যৌরাস। প্রাগুক্ত ১:৪·১·২২

২০. কনীয়াংসো হি দেবা মনুষ্যেভ্যঃ। প্রাগুক্ত ২:৩·২:১৮, ২:৩:৩:১৮

২১. প্রাগুক্ত ৯:৫:১:১৩-১৬

২২. অত্তা বৈ ক্ষত্রিয়য়োহন্নং বিট্। প্রাগুক্ত ৮.৭:১:২, ৮:৭:২·২, ৯.৪:৩:৫

২৩. ন বৈ ব্রাহ্মণো রাজ্যায়ালম্। প্রাগুক্ত ৫:১:১:১৩

২৪. ব্রহ্মা বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্রে এব তদ্ যশো দধাতি। প্রাগুক্ত ১.৪:১১-১৫

২৫. ইয়ং বিদ্যেতঃ পূর্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস। *বৃহদারণ্যকোপনিষদ* ৬:২:৪

২৬. প্রাগুক্ত ৪:৩:১

২৭. যাজ্ঞবল্ক্য হ বিভয়াঞ্চকার মেধাবী রাজা সর্বেভ্যো মাহস্তেভ্য উদরৌৎসীৎ। প্রাগুক্ত ৪.৩.৩৩

২৮. তৌ হ যদূচতুঃ কর্ম হৈব তদুচতুঃ। প্রাগুক্ত ৩:২:১৩

২৯. যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তো পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমিতি। প্রাগুক্ত ৫:৩:৬

৩০. যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্বান্তরঃ। প্রাগুক্ত ৩:২·১১

৩১. প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাত্তরতরং যদয়মাত্মা তদেব। প্রাগুক্ত ১:৪:৮

৩২. যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরে যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তোরো যময়ত্যেষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ। প্রাগুক্ত ৩:৭:৩

৩৩. প্রাগুক্ত ৪:১:৩

৩৪. প্রাগুক্ত ৪:৩:১১:১২

৩৫. আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চন। প্রাগুক্ত ৪:৩:১৪

৩৬. এই সামগ্রিক সত্তাকে কালে ব্যাপ্ত করে দেওয়ার একটি উপায় হল জন্মান্তরবাদ। এই তত্ত্ব অনুসারে একই সত্তা বহুজন্মে নানা রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। ব্রাহ্মণ শূদ্র নারী পুরুষ হস্তী মেষ নানা বিচিত্র প্রকাশ তার; অর্থাৎ আত্মসত্তার কেন্দ্রসূত্রে জীবের বিভিন্নরূপে আত্মোদ্‌ঘাটন এবং তা দীর্ঘকালে বহুদূরে পরিব্যাপ্ত। এর দ্বারা ভাবলোকে শ্রেণিসম্প্রদায় প্রাণীর প্রকারভেদ সবই একটি অলক্ষ্য কেন্দ্রসূত্রে বিধৃত হয়ে রইল। সমাজে তখন জাতিভেদ ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছে; হয়তো ভাবলোকে সে-অপরাধবোধের একটি প্রায়শ্চিত্ত জন্মান্তরবাদের এই দিকটায়।

৩৭. খ এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ। প্রাগুক্ত ৩:৮:১০

৩৮. ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ। যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যাথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি। প্রাগুক্ত ৪:৪:১৪

৩৯. এষ ত আত্মা সর্বান্তারাহতোঽন্যদার্তম্। প্রাগুক্ত ৩:৪:২

৪০. Uddalaka and Yajnavalkya, the first representing the earliest naturalistic point of view recorded in Indian literature and the latter the most important early idealistic view to be ultimately consummated in the Vedanta philosophy...the first famous idealistic philosopher of India was Yajnavalkya. Dale Riepe: *The Nuturaliatic Tradition in* Indian *Thought*, Motilal Banarasidas, 1964, pp. 27-28, 30.

৪১. জনকো হ বৈদেহ আসাঞ্চক্রেহথ হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ। তং হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থমচারীঃ পশূনিচ্ছন্নশ্বন্তানিতি। উভয়মেব সম্রাড়িতি হোবাচ। প্রাগুক্ত ৪:১:১

৪২. নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্মো গোকামা এব বয়ম্। প্রাগুক্ত উ. ৩:১:২

৪৩. ব্রাহ্মণা বৈ বয়ং স্মো রাজন্যবন্ধুরসৌ যদ্যমুং বয়ং জয়েম কমজৈষ্মেতি ব্রূয়ামাথ যদ্যসাবস্মান্ জয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ রাজন্যবন্ধুরজৈষীদিতি নো ব্রূয়ুর্মেদমাদৃঢব ম্। *শতপথ ব্রাহ্মণ* ১১:৬:২:৫

৪৪. অন্নং ব্রহ্মেত্যেক আহস্তন্ন...প্রাণো ব্রহ্মত্যেক আহস্তন্ন...এতে হ ত্বেব দেবত্বে একধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতঃ...অন্নে হীমানি সর্বানি ভূতানি বিষ্টানি। *বৃহদারণ্যকোপনিষদ* ৫:১২:১

৪৫. ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু। প্রাগুক্ত ২:৫:১

প্রাচীন ভারতে গণিকা

প্রাচীন ভারতের সমাজে গণিকার কী পরিচয় ও স্থান ছিল তা বিচার বা বিশ্লেষণ করার পূর্বে দেখা যেতে পারে প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে গণিকার সংজ্ঞা ও পর্যায়বাচক কী কী শব্দ ছিল। এই প্রতিশব্দগুলির মধ্যে দিয়েই সমাজ গণিকাকে কোন চোখে দেখত তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ঋগ্বেদই ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য এবং এখানেই গণিকাবাচক বেশ কয়েকটি শব্দ পাই: হস্রা, অগ্রু। (৪:১৬:১৯:৩০; ৪:১৯:৯); সাধারণী (১:১৬৭:৪; ২:১৩:১২, ১৫, ১৭) এর কিছু পরে অথর্ববেদে আছে পুংশ্চলী। (১৫:১:৩৬; ২০:১৩৬:৫) *শুক্ল যজুর্বেদ*-এর বাজসনেয়ী সংহিতায় সাধারণী ও সামান্যা; (৩০:১২) *কৃষ্ণ যজুর্বেদ*-এর তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও এ শব্দ দুটি পাওয়া যায়। (৩:৪৭) আরও কিছু পরে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নতুন দুটি শব্দ পাই, অতিস্কন্দরী ও অপস্কন্দরী, যে (নিয়ম) উল্লঙ্ঘন করে। (৩:৪:১১:১) আর পাই ব্রজয়িত্রী, যে আনন্দ দেয় (*বাজসনেয়ী সংহিতা* ৩০:১; *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*, ৩:৪:৭:১) পালি *বিনয়পিটক*-এ একটি শব্দ পাই মুহুত্তিয়া (সংস্কৃত মুহূর্তিকা), যে ক্ষণকালের সঙ্গিনী, (৩:১৩৮) জাতকে পাই রূপদাসী, বণ্ণদাসী, বেশ্যা, নারিষের, গামনী ও নগরশোভিনী ইত্থি (১:৪৩) এবং জনপদকল্যাণী। এদের মধ্যে রূপদাসী ও বণ্ণদাসী অন্য প্রধানা গণিকার অধীনে অথবা স্বতন্ত্র ভাবে প্রার্থীকে আপ্যায়ন করতে পারত (*অর্থশাস্ত্র* ২:২৭); *জাতক*-এও এদের কথা পাই। (২:৩৮০; ৩:৫৯-৬৩, ৬৯-৭২; ৪৭৫:৮)

এর পরবর্তীকালে গণিকার প্রতিশব্দ সংখ্যায় বেড়েই চলে। মহাকাব্যে পুরাণগুলিতে ও সাহিত্যে যাদের দেখা পাই তাদের নানা নাম— কুলটা, স্বৈরিণী, বারাঙ্গনা, বারস্ত্রী, বারবনিতা, স্বতন্ত্রা ও স্বাধীনযৌবনা। নটী ও শিল্পকারিকাও মাঝে মাঝে গণিকার প্রতিশব্দ হিসেবে দেখা দিয়েছে, যেমন দিয়েছে কুত্তদাসী এবং পরিচারিকাও। বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*-তে গণিকা ও রূপাজীবা (৭:৬:৫৪) নাম পাই। জটাধরের *শব্দরত্নাবলী* অভিধানে পাই শালভঞ্জিকা, বারবাণী, বর্বটী, ভণ্ডহাসিনী, কামরেখা, শূলা এবং বারবিলাসিনী। *শব্দমালা* অভিধানে পাই লঞ্জিকা। *বৈশিকতন্ত্র*-তে আরও কিছু নাম এসেছে: বৃষলী (যার অভিধাগত মুখ্য অর্থ শূদ্রা এবং যার গৌণ একটি অর্থ গণিকা: শূদ্রনারীকে অন্য বর্ণের ভোগ্যা মনে করা হত, তাই এতে স্পষ্ট)। এ ছাড়া পাংশুলা (মলিনা), লঞ্জিকা, বন্ধুরা, কুম্ভা (শূলার মতো এও একটি বিদ্ধ করার অস্ত্র), কামরেখা, বর্বটী ও রণ্ডা (এ বিটের রক্ষিতা)। হেমচন্দ্রের *অভিধানচিন্তামণি*-তে পাই সাধারণস্ত্রী, পণ্যাঙ্গনা, ক্ষুদ্রা, ভুঞ্জিকা ও বারবধূ। *রাজনির্ঘণ্ট* অভিধানে আছে ভোগ্যা ও স্মরবীথিকা এবং *অমরকোষ*-এ পাই বেশ্যা, বারস্ত্রী, গণিকা ও রূপজীবা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

বলে পতিব্রতা হল একপত্নী, স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের প্রতি আসক্ত নারী কুলটা, তিন জনের প্রতি হলে বৃষলী বা পুংশ্চলী, চার থেকে ছ'জনের প্রতি হলে বেশ্যা; সাত আট হলে যুঙ্গী, তদূর্ধ্বে মহাবেশ্যা; কোনও বর্ণের লোকই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। (প্রকৃতি খণ্ড, অধ্যায় ২২৭-২৮)

বলা বাহুল্য, এই প্রায় পঞ্চাশটি প্রতিশব্দের উদ্ভব এক সময়ে হয়নি, এক স্থানেও হয়নি, ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ও কালিক বিকল্পের মধ্যেই নামগুলি সৃষ্ট হয়েছিল। প্রশ্ন করা যেতে পারে, ভারতবর্ষে গণিকাবৃত্তি কত প্রাচীন? এর উত্তরে বলা যায়, ভারতবর্ষে শুধু নয়, তখন থেকে সর্বত্রই গোষ্ঠী ও কৌম ভেঙে পরিবারের পত্তন হচ্ছিল। অর্থাৎ, নারীর উপর যখন পুরুষের স্বত্বাধিকার সমাজ মেনে নিতে শুরু করেছে তখন থেকেই আছে গণিকাবৃত্তি। তখন থেকেই পরিবারের নির্দিষ্ট সীমার বাইরে কোনও নারী যখন অন্য পুরুষকে অর্থ বা বস্তু প্রাপ্তির বিনিময়ে দেহদান করে তখনই সে গণিকা বলে চিহ্নিত হয়। এর মধ্যেও প্রথম পর্যায়ে নিশ্চয়ই নানা স্তর ছিল: দু'জনের সম্মতিক্রমে বিবাহগণ্ডির বাইরে পুরুষ বা নারীর এমন সম্বন্ধ ঘটলে তারা 'জার' বা 'জারিণী' বলে অভিহিত হত। এ শব্দ দুটি ঋগ্বেদে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে, এমনকী উপমায় উপমানরূপেও। কাজেই ঋগ্বেদের সমাজ নিশ্চয়ই বিবাহিত নরনারীর 'অবৈধ' প্রণয় একটি পরিচিত ঘটনাই ছিল। এছাড়াও সেখানে নানা বিকল্প সম্পর্কের চিহ্ন পাওয়া যায়। উপহারের বিনিময়ে মিলনেও গণিকাবৃত্তি না-ও থাকতে পারে, যেহেতু উপহার প্রীতির চিহ্নও হতে পারে। সে উপহার কখন মূল্যের বিকল্প তা নির্ধারণ করা কঠিন, কারণ প্রাক-মুদ্রা সমাজের অর্থনীতিতে বস্তু অর্থের বিকল্প, এবং এ-বস্তু মূল্যরূপেও দেওয়া যায় প্রীতি উপহাররূপেও দেওয়া যায়। কাজেই মনে করা যেতে পারে, বিবাহ সম্পর্কের বাইরে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা নারী যখন বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধানের 'মূল্য' রূপে অর্থ বা উপহার গ্রহণ করে তখন সেইটিই গণিকাত্বের লক্ষণ, সে মূল্যগ্রহণ মধ্যে মধ্যেই হোক অথবা নিয়মিত বৃত্তিরূপেই হোক। কাজেই গণিকাবৃত্তি 'বিবাহবন্ধনের বাইরে' একটি নিয়ামক লক্ষণ এবং 'মূল্যগ্রহণ'— এ দুটির দ্বারা চিহ্নিত। *ঋগ্বেদ*-এর জার বা জারিণী, উপপতি বা উপপত্নী কিংবা অবৈধ প্রণয়ী বা প্রণয়িনী, মূল্য দান বা গ্রহণ অনুপস্থিত বলেই এই সম্পর্কে গণিকাবৃত্তির অন্তর্গত নয়।

কবে কীভাবে মূল্যের বিনিময়ে নারী দেহদান করতে শুরু করে তার ইতিহাস উদঘাটন করা আজ বোধহয় সম্ভব নয়; তবে সম্ভবত বলা চলে যে, সমাজে বিবাহ ও পরিবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে, নারী যখন স্বাতন্ত্র্য হারায় তখন থেকেই এর শুরু (এ ব্যাপারটা সূত্রসাহিত্যে দেখতে পাই, সেখানে শুনি 'পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে/রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বতন্ত্রমহর্হতি।' অর্থাৎ কৌমারে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র নারীকে রক্ষা করে; নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়)। এবং পিতা স্বামী বা পুত্রের রক্ষণীয়া অর্থাৎ যথাক্রমে লালনীয়া ভোগ্যা-ভরণীয়া এবং পোষণীয়া হয়ে ওঠে তখন এ বন্ধনের বাইরে মূল্য দিয়ে যাকে পাওয়া যায় সে-ই গণিকা। এরই সঙ্গে বা অনুক্রমে আরও একটা ব্যাপার গণিকাবৃত্তির

প্রসারে সহায়তা করে। তা হল সমাজে কিছু মানুষের হাতে উদ্বৃত্ত বিত্তের সঞ্চয়, যা সে জীবনধারণের প্রয়োজন মেটাবার পর বিলাসে সম্ভোগে ব্যয় করতে পারে।

আগে আমরা যে পঞ্চাশটি প্রতিশব্দ পেলাম, খুঁটিয়ে দেখলে তার সব কটিই পর্যায়শব্দ নয়; তাদের মধ্যে স্তরবিভাগ আছে। *কুরুধম্মজাতক* অনুযায়ী রাষ্ট্রে সবচেয়ে নিচু কর্মচারী হল দ্বারিক (দরওয়ান) এবং তারও নিচে গণিকা। আবার গণিকাই কিন্তু ওই বৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেণির নাম। আর এক নাম নগরশোভিনী বা জনপদকল্যাণী। একটা সম্পূর্ণ জনপদের (প্রাচীনকালে জনপদের জনসংখ্যা হয়তো খুব বেশি ছিলও না) সাধারণ ভাবে ভোগ্যা নারীর নাম জনপদকল্যাণী। (কল্যাণ শব্দের আদিমতম অর্থ সুন্দর, গ্রিক Kale-র পর্যায়বাচক। মনে হয় জনপদের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী যাতে কেবলমাত্র একজনের ভোগ্যা না হয়, তাই সে-ই জনপদকল্যাণী ছিল সাধারণী।[১] অর্থশাস্ত্র, কামসূত্র এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে যা তথ্য পাই তাতে দেখি গণিকার স্থান সবচেয়ে ওপরে, রূপে যৌবনে শিক্ষাদীক্ষায় সেই শ্রেষ্ঠ। (*কামসূত্র* ১:৩:২০) তার নিচে রূপাজীবা যে শিক্ষাদীক্ষা ও রূপযৌবন, ধনসম্পদ এবং সামাজিক প্রতিপত্তিতে গণিকার চেয়ে নিচে। তারও নিচে বেশ্যা— নাম শুনেই বোঝা যায় তার মূলধন বস্ত্রালংকারে, সাজগোজে। গণিকা যখন গণিকালয়ে বাস করত তখন রাষ্ট্র তার শিক্ষার ব্যয়বহন করত, তার আয় থেকে নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় করত এবং কৌটিল্য বার্ধক্যে তাকে কিছু বৃত্তি দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব এং অধিকার দুই-ই তার ছিল। রূপাজীবার শিক্ষার দায় তার নিজের বা তার মায়ের অথবা তার গ্রাহকের, এ ছাড়া ছিল অবরুদ্ধা অর্থাৎ রক্ষিতা, যার সমস্ত দায়িত্ব তার পৃষ্ঠপোষকের অর্থাৎ যে তার আর্থিক সব দায়িত্ব বহন করত এবং বিনিময়ে সে একাই তার কাছে আসতে পারত, এর স্বাচ্ছন্দ্য এবং আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণই ওই একজন পৃষ্ঠপোষকের অবস্থা এবং মর্জির ওপরে নির্ভর করত। এর নিচে আমরা নানা রকম বৃত্তিধারিণীর কথা শুনি যেমন সৈরিন্ধ্রী, শিল্পকারিকা বা শিল্পদারিকা, কৌশিকস্ত্রী, কুম্ভদাসী, বল্লদাসী, রূপদাসী, নটী, ক্ষুদ্রা, ভুঞ্জিকা, ইত্যাদি। এরা রাজপ্রাসাদে বা ধনীর প্রাসাদে নিজের শিক্ষা অনুসারে কায়িক শ্রম করে জীবিকানির্বাহ করত কিন্তু এদের প্রত্যেকেই গৃহস্বামীর ভোগ্যও ছিল।

এর বাইরে ছিল অশিক্ষিতা, অর্ধশিক্ষিতা, রূপহীনা, কখনও বা বিগত যৌবনা, নির্বিত্ত বৃহৎ একটি রূপোপজীবিনীর দল, এদের পরিচয় পুংশ্চলী, কুলটা, স্বৈরিণী, বারবণিতা (বারমুখ্যা, বারাঙ্গনা, বারস্ত্রী সবই পর্যায়বাচক শব্দ, অর্থাৎ বার [= পালা] অনুসারে যারা পারিশ্রমিক নিত) আয়ের পরিমাপে কতকটা সামাজিক অবস্থান বোঝা যায়: গণিকা রাষ্ট্র থেকে মাসিক ১০০০ পণ পেত, তার চতুঃষষ্টিকলা শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র নিজ ব্যয়ে বিভিন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করত। বৌদ্ধসাহিত্যে দেখি গণিকা সালাবতীর জন্যে তার মা সিরিমা একরাত্রে ১০০০ কাহাপণ (কার্যাপণ=স্বর্ণমুদ্রা) নিত।[২] সামাজাতকে পড়ি কাশীর গণিকা সামার ৫০০ অনুচারিণী ছিল (*জাতক* ৩:৫৯-৬৩), এরাই সম্ভবত গণিকাদাসী। গণিকা অম্বাপালীর দক্ষিণা নিয়ে রাজগৃহ ও বৈশালীর মধ্যে রীতিমতো কলহই হয়ে গিয়েছিল। *জ্ঞাত ধর্মকথা* নামে

জৈন গ্রন্থে দেখি সর্বাঙ্গসুন্দরী ও শিক্ষিতা গণিকার প্রতি রাত্রের আয় ছিল সহস্র কার্ষাপণ। মৃচ্ছকটিকে পড়ি বসন্তসেনাকে একবার নিয়ে যাওয়ার জন্য দশ হাজার টাকার গহনাসমেত গাড়ি পাঠিয়েছে রাজশ্যালক শকার। কাজেই ওপরের দিকে রূপযৌবন-যশ-অর্থে প্রখ্যাত গণিকার আয়ের কোনও লেখাজোখা ছিল না। এঁদের দানের পরিমাণ দেখলেই সেটা কতকটা বোঝা যায়— কেউ বা বুদ্ধ ও একসহস্র শিষ্যকে আহারে আমন্ত্রণ করছেন ও পরিতৃপ্ত অতিথিদের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন অর্থ দিয়ে, কেউ বা আমবাগান দান করছেন, কেউ বা মঠ, কেউ বিহার, কেউ কানন, চৈত্য, স্তূপ, সেতু, কূপ আবার কেউ বা চিত্রশালা। অবরুদ্ধা গ্রাসাচ্ছাদন ছাড়াও মাসে এক পণ নগদ পেত। উল্টোদিকে বিগত যৌবনা রূপহীনা অশিক্ষিতা যে বৃহৎ দলটি ছিল, গণিকাজগতেও তারা অপাঙক্তেয় ছিল। এই পুংশ্চলী স্বৈরিণীদের কাছে যারা আসত তারা যা দিত তাই এদের নিতে হত। এরা সংখ্যায় বেশি, আকর্ষণ কম, কাজেই চাহিদা এবং মূল্যও কম। ফলে এরা অধিকাংশই খুব দরিদ্র ছিল, অধিকাংশের কাচে গ্রাসাচ্ছাদনটাই ছিল বড় সমস্যা।

এ ছাড়া ছিল দেবদাসী যার অন্য নাম ত্রিদশালয়বনিতা। প্রাচীন গ্রিস, রোম, মিশর, ফিনিশিয়া, কলডিয়া, ব্যাবিলন এবং ভারতবর্ষ সর্বত্রই মন্দিরগণিকার একটা ভূমিকা ছিল। যেখানেই নগর-সভ্যতার পত্তন হয়েছে এবং কোনও কোনও মন্দির সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে সেখানেই দেবদাসীর প্রাদুর্ভাব ছিল। মন্দিরপুরোহিত রাষ্ট্র থেকে বৃত্তি পেতেন, তা দিয়ে তিনি দেবদাসীদের ভরণপোষণ করতেন, কখনও কখনও দেবদাসীরাও বৃত্তি পেতেন। দামোদরগুপ্তের *কুট্টনীমতে* দেবদাসীদের রাষ্ট্র থেকে বৃত্তি পাওয়ার কথা আছে, আবার *সংযুক্তনিকায়*-তে দেখি তারা খাদ্যশস্য পায়। জোগিমারা গুহালিপিতে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের) রূপদক্ষ দেবদত্তের দেবদাসী সুতনুকার প্রতি প্রেমের উল্লেখ পাই। দেবদাসীদের কাজ ছিল পূজা আরাত্রিকের সময়ে মন্দিরে বা মন্দির প্রাঙ্গণে দেবতার উদ্দেশ্যে নৃত্য করা; এটিই তাদের মুখ্য করণীয়, এরই বিনিময়ে তারা বৃত্তি, খাদ্যশস্য বা ভরণপোষণ পেত। তাদের গৌণ অথচ সর্বজনবিদিত ভূমিকা ছিল পুরোহিতের কামনা চরিতার্থ করা। এই জন্যেই ১৯২৯ সালে মাদ্রাজে দেবদাসী প্রথার উচ্ছেদমূলক আইন প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল এ-প্রথা দেশে বহাল ছিল। ১৯৪৭ সালে আবার আইন করে এটা উচ্ছেদ করার চেষ্টা হয়, তথাপি দেশের আনাচে-কানাচে নানা মন্দিরে এখনও দেবদাসী প্রথা ভোল পাল্টে রয়েছে।

দেবদাসী তরুণী, সুন্দরী ও নৃত্যকুশলা হলেই চলত কিন্তু গণিকা বা রূপজীবার এবং কখনও কখনও অবরুদ্ধার পাঠ্যতালিকা দীর্ঘ ছিল। জৈন গ্রন্থ *বৃহৎকল্প* (পুণ্যবিজয়জি ভাবনগর রচিত, ১৯৩৩-৩৮) গ্রন্থে দেখি এদের শিখতে হত লেখা, গণিত, নানা রকম শিল্প, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র (বীণা, পটহ, বংশী, ইত্যাদি), দ্যূতক্রীড়া অক্ষক্রীড়া, কাব্যরচনা (সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ), গন্ধযুক্তি (আতর তৈরি) অলংকারনির্মাণ, সজ্জা, অলংকরণ, সুলক্ষণ ও দুর্লক্ষণ পুরুষ ও নারীর বিচার, অশ্ববিদ্যা, হস্তীবিদ্যা, রন্ধনবিদ্যা, রত্নপরীক্ষা, বিষনির্ণয় ও প্রতিবিধান,

স্থাপত্য, শিবির নির্মাণ, সেনা সন্নিবেশ, যুদ্ধবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, নিমিত্তনিদান, ইত্যাদি মোট বাহাত্তরটি বিষয়। (*মনুসংহিতা*-তেও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু নির্দেশ আছে। ২:৬৭)

গণিকা ও রূপাজীবা যেমন রাষ্ট্রকে আয়কর দিত তেমনই বিনিময়ে সামান্য কিছু নিরাপত্তার ব্যবস্থাও পেত।। গণিকাকন্যাকে ধর্ষণ করলে ৫৪ পণ ও তার মায়ের আয়ের ১৬ গুণ অর্থদণ্ড দিতে হত। গণিকার বিদেশি প্রার্থীকে তার নির্দিষ্ট মূল্য ছাড়া পাঁচ পণ বেশি দিতে হত। পুংশ্চলী বা কুলটার নির্দিষ্ট কোনও মূল্য ছিল না, কিন্তু সে যদি বেশি টাকা আদায়ের চেষ্টা করত, তাহলে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকেও সে বঞ্চিত হত। রূপাজীবার বার্ষিক বৃত্তি ছিল আটচল্লিশ পণ; অভিনেতা, অন্নবিক্রেতা, মাংসবিক্রেতা বা বৈশ্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকত। গণিকা বা রূপাজীবা যদি টাকা নেওয়ার পরে আপত্তি করে তাহলে তার প্রাপ্যের দ্বিগুণ অর্থ তার দণ্ড, আর টাকা নেওয়ার আগে আপত্তি করলে প্রাপ্য থেকে সে বঞ্চিত হত। *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি* (২:২৯৫) অনুসারে গণিকার শারীরিক নিরাপত্তার জন্যেও নানা রকম দণ্ড ছিল যার পরিমাণ এক হাজার থেকে আটচল্লিশ হাজার পণ। অন্য দিকে ব্যতিক্রমও প্রচুর পাই; মনু বলেছেন সব গণিকাই চোর ও প্রতারণাপরায়ণ (৯:২৫৯-৬০) আর ধর্মসূত্রকার গৌতম বলেছেন বেশ্যাকে হত্যা করা দণ্ডনীয় অপরাধই নয় (গৌতমধর্ম সূত্র ২২:২) কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-তে দেখি গণিকাকে প্রকাশ্যে অপমান করার দণ্ড চব্বিশ পণ, শারীরিক অত্যাচার করার দণ্ড আটচল্লিশ পণ, কান কেটে নিলে পৌনে বাহান্ন পণ ও সেই সঙ্গে কারাবাস। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি বলে, গণিকাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করার দণ্ড পঞ্চাশ পণ এবং বহুজনে পরপর ওই ভাবে ধর্ষণ করলে তাদের প্রত্যেকের দণ্ড চব্বিশ পণ। (২:২:৯৩)

গণিকা কী ধরনের প্রার্থী খুঁজবে তারও নির্দেশ দিয়েছেন বাৎস্যায়ন; তরুণ, ধনী, পারিবারিক দায়িত্ব যার নেই, উচ্চপদস্থ, সদ্বংশজাত, প্রাণবান, শিক্ষিত, কবি, গাথা-কাহিনি-উপাখ্যানে কুশল, বাগ্মী, নানা কলায় পারদর্শী, সুরাসক্ত, বন্ধুভাবাপন্ন, নারীসঙ্গমকারী কিন্তু কোনও নারীর বশংবদ নয়, নিষ্ঠুর বা ঈর্ষাকাতর নয় (*কামসূত্র* ৬:১:১০, ১২) রাজার হুকুমে ছাড়া অন্য কোনও কারণেই তার ওপরে কোনও প্রার্থী চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। রাজার প্রেরিত প্রার্থীকে বিমুখ করলে তার দণ্ড পাঁচশো পণ এবং এক হাজার বেত্রাঘাত। কাজেই দেখছি, তার দেহের উপরে তার আত্যন্তিক কোনও অধিকার নেই। *অর্থশাস্ত্র* অনুযায়ী (৪:১৩) কোনও একজন পুরুষের প্রতি দীর্ঘকাল আসক্ত থাকা গণিকার উচিত নয়। (*কামসূত্র* ৬:৫:১-৬) দরিদ্র প্রার্থীকে সে সর্বদাই প্রত্যাখ্যান করবে (কামসূত্র ৬:৬:৩১) এবং প্রার্থীর আগ্রহ কমে যাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে অবহিত থাকবে, তার লক্ষণগুলিও বলা আছে। (*কামসূত্র* ৬:৩:২৮-৩১) কলাবিলাস গ্রন্থে যে চৌষট্টি রকমে গণিকা তার প্রার্থীকে ঠকাতে পারে তার তালিকা দেওয়া আছে।

দ্বাদশ শতকের গ্রন্থ *মৃন্ময়সুন্দরীকথা*-তে দেখি গণিকার আয়ের শতকরা পঁচিশ থেকে ত্রিশ ভাগ ছিল রাষ্ট্রের প্রাপ্য অর্থাৎ রাজস্ব। বৌদ্ধ গ্রন্থে গণিকার 'ভট্টি' (সংস্কৃত 'ভৃতি') অর্থাৎ বেতন এবং পরিব্বয়' (সংস্কৃত পরিব্যয়ম্) খরচের উল্লেখ পাই। মথুরার বাসবদত্তার

পারিশ্রমিকও অত্যন্ত উচ্চহারের ছিল।[৩] রাজগৃহের সালাবতী প্রতি রাত্রে একশো কার্যপণ উপার্জন করত। এ ছাড়াও ইতস্তত খুব উচ্চহারের উপার্জনের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পত্তির— অন্তত স্থাবর সম্পত্তির উপরে তাদের একান্ত অধিকার ছিল না।[৪] শিশু, দাস ও গণিকার সম্পত্তিতে অধিকার নেই এ কথা *মহাভারত*-এ বারবার আছে। (আদিপর্ব ১৮২:২২, সভাপর্ব ৭১:১; উদ্যোগপর্ব ৩৩:৬৪) গণিকা ও তার বিকল্প, প্রতিগণিকা মাসিক বৃত্তি পেত সরকার থেকে; নিজস্ব উপার্জনের কোনও কোনও অংশে তার অধিকার ছিল এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে সে দানও করতে পারত। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে তার কন্যার অধিকারে মায়ের সম্পত্তি যখন আসত তখন সে-ও ওই জীবনসত্ত্বের মধ্যে; বন্ধক, বিক্রয়, দায় ও পরিবর্ত এ সবে তার অধিকার থাকত না। রাষ্ট্রের বিপদ হলে তার আয়ের অর্ধেকই বাজেয়াপ্ত হত; (*অর্থশাস্ত্র* ৫:২) প্রয়োজন হলে তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। (*অর্থশাস্ত্র* ১:২০) রক্ষিতা বা অবরুদ্ধার ওপরে একটি পুরুষ— তার ভরণকর্তারই একান্ত অধিকার ছিল, সেখানে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করলে তার দণ্ড ছিল আটচল্লিশ পণ। (*অর্থশাস্ত্র* ৩:২০) গণিকাকে গণিকাত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল দু' রকম: প্রথমত, রাজা ইচ্ছা করলে যে কোনও গণিকাকে কুলনারী বলে ঘোষণা করতে পারতেন, তখন সে গণিকাত্বের সামাজিক গ্লানি ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেত এবং কুলনারীর প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার পেত। (*মৃচ্ছকটিক* নাটকের দশম অঙ্কে গণিকা বসন্তসেনা রাজা আর্যকের প্রসাদে কুলনারীতে পরিণত হয় এবং চারুদত্তের সঙ্গে বিবাহিত হয়ে কুলবধূ বলে গণ্য হয়)। দ্বিতীয়ত, যে ভাবে সে গণিকাত্ব থেকে মুক্তি পেত তা হল নিষ্ক্রয়, অর্থাৎ কোনও পুরুষ তাকে বিবাহ করতে চাইলে বা মুক্তি দিতে চাইলে গণিকালয়ের কর্ত্রীকে চব্বিশ হাজার পণ দিলে সে মুক্ত হত। (*মৃচ্ছকটিক* নাটকে গণিকা মদনিকার প্রেমিক শর্বিলক নিষ্ক্রয়মূল্য অর্জন করবার কোনও পথ খোলা না পেয়ে অলংকার চুরি করে।)

নানা স্তরের গণিকার কার্যক্রমেরও পার্থক্য ছিল— রাজার, বণিকের বা ধনীর প্রাসাদে নানা ভূমিকায় দেখা যেত গণিকাকে। গান্ধারী গর্ভবতী হলে ধৃতরাষ্ট্রের গণিকার প্রয়োজন হয়েছিল। (*মহাভারত*, আদিপর্ব ১১৫:৩৯)। জৈন গ্রন্থ *বাসুদেবহিণ্ডি*-তে স্ত্রীর বিকল্পের কাহিনি আছে, সেখানে কৌমপতি ভরতের প্রাসাদে স্ত্রী ছাড়াও একটি ভোগ্যা নারী থাকত। একবার কৌমের অধীনের সকলেই নিজের নিজের মেয়েকে ভরতের কাছে পাঠালেন এবং এরা সকলেই এক সঙ্গে ভরতের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন; তখন নারী চলে যেতে উদ্যত হলেন। তারপরে ঠিক হল যে এরা অন্তঃপুরের বাইরে রাজার পরিচর্যা করবে এবং পরে এদের 'গণ' বা গোষ্ঠীর কাছে দেওয়া হবে; তখন এরা গণিকা হবে। এ যেন গণিকা শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি উপাখ্যান রচনা করা হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতে গণিকার নানা ভূমিকার কথা পড়ি। যুদ্ধযাত্রার সময়ে পাণ্ডবসেনার সঙ্গে যুদ্ধের উপকরণ ও বহু গণিকা গাড়িতে ছিল। (*মহাভারত* উদ্যোগপর্ব ১৯৫:১৮-২৯) যুদ্ধের আগে যুধিষ্ঠির গণিকাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। (উদ্যোগপর্ব ১৫:৫১-৫৮) বনে যাওয়ার সময়েও পাণ্ডবদের সঙ্গে

রথ, পণ্যদ্রব্য ও গণিকারা ছিল, সম্ভবত সৈন্যদের বিনোদনের জন্যে। (বনপর্ব ২৩৮ থেকে) যুদ্ধে জয়লাভ করবার পরে বিরাট রাজা সুন্দরী নারীদের সুসজ্জিত হয়ে এসে সমবেত জনতার মনোরঞ্জন করার নির্দেশ দেন। (বিরাটপর্ব ৬৪:২৪-২৯) স্পষ্ট যে, এ ধরনের মনোরঞ্জন করার আদেশ কুলনারীকে দেওয়া সম্ভব ছিল না, শুধু গণিকাকেই দেওয়া চলত। কৃষ্ণ যখন যুদ্ধনিরোধের চেষ্টায় হস্তিনাপুরে গেলেন, দুর্যোধন তাঁর আপ্যায়নের যে ব্যবস্থা করেছিলেন তার মধ্যে ছিল একটি বিরামাগার ও সেখানে পরিচর্যারত বহু নারী। এবং, ধৃতরাষ্ট্র আদেশ দেন যেন বেশ্যারা তাঁর পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণকে প্রত্যুদগমন করে। রামায়ণে বিলাসের উপকরণের তালিকায় বেশ্যা ও গণিকার নামের উল্লেখ আছে। স্পষ্টই বোঝা যায় গণিকা ছিল ঐশ্বর্যের পরিচায়ক এবং তাদের সংখ্যাও থাকত গৃহস্বামীর সম্পদের অনুপাতে এবং এটা সম্ভব হয়েছিল সমাজে এক শ্রেণির বিত্তবান লোকের হাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত অর্থের সঞ্চয়ের দ্বারা। নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ও বাণিজ্যের প্রসার হওয়ার আগে এ অবস্থা আসা সম্ভব ছিল না। শস্য, গোধন, সোনাদানা যেমন ধনীর বিজ্ঞাপন, ক্রীতদাস ও ভোগ্যা নারীর সংখ্যাও তেমনই আর একটি বিজ্ঞাপন। রাজার বা ধনীর প্রাসাদে এই যে শত শত নারী থাকত তারা সকলেই মুখ্যত বেশ্যাপরিচয়ে থাকত না, নানা রকম বৃত্তিই ছিল তাদের সামাজিক পরিচয়। কিন্তু, তারা ভুজিষ্যা, যার শ্রম ভোগ করে তারা প্রভু; এবং সে শ্রম শুধু বৃত্তিরই হত না। ছত্রধারিণী, চামরগ্রাহিণী, সংবাহিকা, তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী ছাড়াও এরা গৃহস্বামীর এবং পরিবারের অন্যদেরও স্নান, অভ্যঞ্জন, বস্ত্রালংকারধারণ, ইত্যাদিতে পরিচর্যা করত। শিল্পদারিকা, সৈরিন্ধ্রী, কৌশিকস্ত্রী, কুম্বদাসী, ইত্যাদি দানা বৃত্তি অবলম্বন করে এরা রাজা বা ধনীর অন্তঃপুরে আসত।

গণিকার ভূমিকা সম্বন্ধে *কামশাস্ত্র*-তে পড়ি যে, রাজা অথবা ধনী নাগরিকের দলবলের সঙ্গে কাব্য নাটক শিল্প ইত্যাদির আলোচনা করা; ধনীর গৃহে অনুষ্ঠিত উৎসব 'গোষ্ঠী'তে অংশগ্রহণ করা— এ সব ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। ভিন্ন ভিন্ন বণিক বা ধনী নাগরিকের গৃহে এই গোষ্ঠীর আয়োজন হত। সেখানে প্রচুর পানভোজনের ব্যবস্থা থাকত এবং গণিকাদেরই প্রথমে পরিবেশন করা হত— যেন তারাই প্রধান অতিথি। মাঝে মাঝে সমস্ত দলটাই যানবাহনের সাহায্যে নগরের বাইরে যেত। সেখানে মোরগের বা ভেড়ার লড়াই অথবা অভিনয় হত; সন্ধেয় সকলে ফিরে আসত। গ্রীষ্মকালে জলক্রীড়া, বসন্তে বসন্তোৎসব, ইত্যাদি বিভিন্ন ঋতু উপযোগী উৎসব হত। (কামসূত্র ১:৪:৩৪-৪১, ৪২) গ্রামবাসীরা এদের উৎসব দেখে বর্ণনা করবে ও অনুকরণ করবে। (কামসূত্র ১:৪:৪৯) এই সব উৎসব গণিকারাও নিশ্চয়ই উপভোগ করত; কিন্তু এগুলো অনুষ্ঠিত হত প্রধানত রাজা, বণিক বা ধনী নাগরিকের স্বার্থে ও নির্দেশে। গণিকারা ছিল কতকটা অলংকরণ, কতকটা মার্জিত বিনোদনের উপকরণ।

এ কথা ভুললে চলবে না যে, সমাজে কুলনারীর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না; মনুসংহিতায় পড়ি নারীর পক্ষে বিবাহই উপনয়ন, পতিসেবা বেদাধ্যয়ন এবং পতিগৃহে বাস হল গুরুগৃহে বাস। (২:৬৭) অতএব বিদ্যাশিক্ষার কোনও সুযোগই কুলনারীর ছিল না, গৃহকর্ম ও সন্তানের

জন্ম দেওয়া, শ্বশুরবাড়ির সকলের এবং স্বামী ও সন্তানদের পরিচর্যায় তার দিন কাটত। ফলে, রূপযৌবন চলে গেলে তার সাহচর্য হয়তো অনেক স্বামীর পক্ষে চিত্তাকর্ষক হত না। অন্য দিকে গণিকার শিক্ষাতালিকা প্রকাণ্ড— স্বয়ং কাব্যনাটক রচনা, গীতবাদ্য অভিনয় এবং সকল শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা করার ক্ষমতাও তার থাকত। কাজেই ফ্রান্সের 'সালঁ'গুলির অধিকর্ত্রীর মতো বা জাপানের সুশিক্ষিতা 'গেইশা' নারীদের মতো এদের মানসিক উৎকর্ষ পুরুষকে আকর্ষণ করত। উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার অভাবে এ ভাবে আকর্ষণ করার যোগ্যতা কুলনারীর থাকত না। গণিকার শিক্ষা হত রাষ্ট্রের ব্যয়ে এবং সে শিক্ষার মানও যথেষ্ট উন্নত থাকত, অর্থাৎ রাষ্ট্রের পরিচালকদের উদ্দেশ্যই ছিল মার্জিত রুচি এবং শিক্ষার অধিকারী যে মানুষ সে যেন গণিকার কাছেই মানসিক সাহচর্য পায়, বধূর কাছে নয়। প্রথমত, রাষ্ট্র গণিকার কাছে উচ্চহারে রাজস্ব পেত, দ্বিতীয়ত, গণিকারা রাষ্ট্রের চরের কাজও করত। শিক্ষাদীক্ষা-রুচির উৎকর্ষে রূপ যৌবনের মাদকতায় শত্রুপক্ষীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করে গুপ্ত সংবাদ জেনে গণিকাধ্যক্ষ মারফত রাষ্ট্রের মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া, প্রয়োজন মতো শত্রুকে ধরিয়ে দেওয়াও এদের করণীয়ের অন্তর্গত ছিল। কাজেই গণিকা এবং গণিকালয় রাষ্ট্রের স্বার্থই সিদ্ধ করত।

এ ছাড়াও ধর্মগ্রন্থে ও সাহিত্যে বারে বারে দেখছি দক্ষিণার বস্তুসম্ভারের তালিকায় হস্তী, অশ্ব, রথ, ভূমি, অলংকারের সঙ্গেই উল্লেখ নারীর। লক্ষণীয় এ দক্ষিণা দেওয়া হত যজ্ঞের পুরোহিতকে এবং দেওয়া হত শয়ে শয়ে, হাজার হাজারে। এর নানা পৃথক শ্রেণিও ছিল, যেমন, সন্তানবতী, নিঃসন্তানা, বিবাহিতা ও কুমারী। মনে প্রশ্ন আসে ঋত্বিক পুরোহিত কী করত এতগুলি নারী নিয়ে? অবশ্যই কিছু সংখ্যককে ভোগ্যবস্তুর মতোই ভোগ করত, কিন্তু বাকিরা? ক্রীতদাসী বা গণিকায় পরিণত হওয়া ছাড়া কি গতি ছিল তাদের?

উদ্দ্যোতন সূরির রচিত *কুবলয়মালা* গ্রন্থে দেখি স্বর্গে ইন্দ্রের অপ্সরারা ভৃঙ্গারবহন করত; ছত্র, মুকুর, ব্যজন, বীণা, বস্ত্র, মুরজ, ইত্যাদিও বহন করত। *ললিতবিস্তার* বইতে পড়ি পূর্ণকুম্ভ, মাল্য, অলংকার, সিংহাসন, ছত্র, চামর, গন্ধবারিকুম্ভ, ইত্যাদি বহন করছে প্রাসাদের গণিকারা। বাণভট্টে গণিকারা রাজাকে স্নান করাচ্ছে। নানা স্থানে এদের নানা নাম: মন্দিরে দেববেশ্যা, প্রাসাদে রাজবেশ্যা, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবেশ্যা, তীর্থে তীর্থগা। *ব্রহ্মপুরাণ*-এ পড়ি একাস্রতীর্থে বহুসংখ্যক বেশ্যার বাস। (৪০:৩০-৩৫) বৌদ্ধ সমাজ বা উৎসবে, যুদ্ধ যাত্রায়, বিজয়োৎসবে, রাজার বিবাহ বা পুত্রজন্ম, যজ্ঞ বা অন্য উপলক্ষে সব সময়েই গণিকারা দলে দলে সমবেত অতিথিদের বিনোদনে নিযুক্ত থাকত। যুধিষ্ঠির যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন তখন অন্যান্য বন্ধুরাজারা যজ্ঞের নানাবিধ উপকরণের সঙ্গে বহু নারীও পাঠালেন। (আশ্বমেধিকপর্ব ৮৫:১৮) যুধিষ্ঠির নিজেও সেই যজ্ঞে দানে দক্ষিণায় বহু শত নারীকে দিচ্ছেন অতিথিরাজাদের আপ্যায়নেও। (আশ্বমেধিকপর্ব ৮০:৩২) রাজা শশবিন্দু তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে হাজার হাজার নারী দান করেছেন। (দ্রোণপর্ব ৬৫:৬) ভগীরথও হাজারে হাজারে সুসজ্জিত সুন্দরী নারী দক্ষিণা দিয়েছিলেন। (দ্রোণপর্ব ৬০:১, ২; শান্তিপর্ব ২৯:৬৫) শ্রাদ্ধের দক্ষিণার তালিকাতেও

বহু নারী দেওয়ার কথা আছে। (আশ্রমবাসিকপর্ব ১৪:৪; ৩৯:২০, মহাপ্রস্থানপর্ব ১ স্বর্গারোহণপর্ব ৬:১২, ১৩) বীরের মতো যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলে স্বর্গে পুরস্কার পাওয়া যায় অসংখ্য সুন্দরী। (বনপর্ব ১৮৬৮৭, কর্ণপর্ব ৪৯:৭৬-৭৮; শান্তিপর্ব ৬৪:১৭, ৩০; ৯৬:১৮, ১৯, ৮৩, ৮৫-৮৬, ৮৮, ১০৬; *রামায়ণ* অযোধ্যাকাণ্ড ৭১:২২, ২৫, ২৬; সুন্দরকাণ্ড ২০:১৩) পরবর্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্যেও এ ধরনের কথা বিস্তর পাওয়া যায়। (*কুমারসম্ভব* ১৬:৩৬, ৪৮; *রঘুবংশ* ৭:৫০; *কিরাতার্জুনীয়* ৯:৫১; *শিশুপালবধ* ১৮:৬০, ৬১) এছাড়া সুবন্ধুবাণ এবং অন্যত্র এর বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

গণিকার পরিবারের অণুক্রম কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। গণিকার মাতাই হল গণিকালয়ের কর্ত্রী; তার বোন হত প্রতিগণিকা, অর্থাৎ প্রয়োজন হলে তার বিকল্প। ভাইকে গীতবাদ্যে কুশল অথবা অভিনেতা হতে হত এবং রাষ্ট্রের পরিচালিত মঞ্চে অন্তত আট বছর অভিনয় করতে অথবা সংগীতে বাদ্যে অংশগ্রহণ করতে হত; তার শিক্ষার ব্যবস্থা এবং আর্থিক দায়িত্বও রাষ্ট্রই বহন করত। তার মুক্তির মূল্য গণিকার চেয়েও বেশি, তার অবস্থা গ্রিক বা রোম সাম্রাজ্যের ক্রীতদাসের মতোই ছিল— অন্তত ওই আট বছর। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গণিকার বিবাহের কথাও পাওয়া যায়; গণিকার স্বামীকেও সংগীতে ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে হত; এ অভিনয় গণিকালয়ে রাষ্ট্রের ব্যয়ে ও নির্দেশনাতেই হত (*কামসূত্র* ৭:২৩, ২৪)। কখনও কখনও গণিকার বিবাহ শুধুমাত্র একটা প্রতীকী অনুষ্ঠান মাত্রেই পর্যবসিত হত। *নারদস্মৃতি* বলে অব্রাহ্মণের পক্ষে নিম্নবর্ণের স্বৈরিণী, বেশ্যা, দাসী বা নিকাশিনীর (অর্থাৎ যে অন্তঃপুরচারিণী নয়) সঙ্গে সম্পর্ক— যদি তারা অন্যের স্ত্রী না হয়— দোষের নয়; (৭৪, ৭৯) অর্থাৎ, তাঁরা অন্যের স্ত্রী হতে পারত। *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি*ও এতে কোনও দোষ দেখে না। (২:২৯০) স্কন্দপুরাণ বলে বেশ্যা এক স্বতন্ত্র জাতি, তার স্ববর্ণের বা উচ্চতর বর্ণের কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটলে সে ক্ষেত্রে পুরুষটি দণ্ডনীয় নয়, যদি না সে অবরুদ্ধা অর্থাৎ একটি পুরুষের রক্ষিতা হয়। যদি হয় তারও প্রায়শ্চিত্ত এবং কোনও বেশ্যাগামীর প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করার কোনও নজির সাহিত্যে মেলে না। বাৎস্যায়নের কাছে গণিকার জীবনে প্রেমের সম্ভাবনাও তাত্ত্বিক ভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। (*কামসূত্র* ১:৬২-৬৫) অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেও তার মধ্যে মানবীসুলভ আবেগের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া হয়নি, যেমনটা হয়েছে পরবর্তীকালের শাস্ত্রে। অশ্ব ঘোষের একটি অংশত প্রাপ্ত নাট্যখণ্ডে এবং শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* নাটকে গণিকার প্রেমের কথা আছে এবং সে প্রেম যথার্থ খাঁটি আবেগ, তাতে কোনও সন্দেহে অবকাশ থাকে না। আরও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাহিত্যে, *কথাসরিৎসাগর*, *কলাবিলাস* এবং অন্যত্রও এ কথা আছে।

কলাবিলাস-এ একটি উপাখ্যান আছে। রাজ্যচ্যুত রাজা বিক্রম নিরাশ্রয় হয়ে অবশেষে এসে পড়লেন গণিকা বিলাসবতীর কাছে। দু'জনের প্রেমের বর্ণনা আছে সবিস্তারে। বিলাসবতী বিত্তশালিনী, সে তার সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে বিক্রমকে তাঁর লুপ্ত রাজ্য ফিরে পেতে সাহায্য করল। কৃতজ্ঞতায় বিক্রম তাকে বিবাহ করলেন। একদিন তাকে বিমর্ষ দেখে বিক্রম

তার কারণ জানতে চাইলে বিলাসবতী স্বীকার করল তার এক পূর্বপ্রণয়ী আছে, তাকে পাওয়ার জন্যেই তার চিত্ত ব্যাকুল। রাজার আনুকূল্যে প্রেমিকযুগল মিলিত হল। কিন্তু তারপরে রাজার মনে পড়ল মন্ত্রীর সতর্কবাণী; গণিকাকে কখনও বিশ্বাস কোরো না। এ কাহিনিতে গণিকার প্রতি সমাজের তাচ্ছিল্য, বিদ্বেষ ও বিরূপতা তার চিত্তচাঞ্চল্য সম্পর্কে দ্বিধাহীন বিশ্বাস সবই প্রকাশ পেয়েছে, পায়নি শুধু কাহিনির পূর্বার্ধে রাজার মঙ্গলের জন্য তার অকুণ্ঠিত এবং অযাচিত স্বার্থত্যাগ; শেষ পর্যন্ত রাজা তার মনস্কামনা পূর্ণ না-ও করতে পারেন এই সম্ভাবনা মনে রেখেও সে অকৃপণ ভাবে রাজার জন্যে আত্মত্যাগ করেছিল। সমাজের স্বার্থসর্বস্ব অকৃতজ্ঞতার এটি একটি ভাল নিদর্শন।

গণিকালয়ের কর্ত্রী গণিকামাতার কাজ ছিল গণিকা যাতে কোনও ভাবে প্রতারিত বা লাঞ্ছিত না হয় তা দেখা। এবং যথাসম্ভব সর্বপ্রকারে তার স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা। নানা গ্রন্থে (যেমন *কুট্টনীমত*, *দেশোপদেশ*) এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে যার অনেকটাই হল সাধ্যমত প্রার্থীকে বঞ্চিত করা— কন্যা অসুস্থ, পরিশ্রান্ত, বিমর্ষ, ইত্যাদি বলা বা অন্য কেউ আরও বেশি পারিশ্রমিক বস্ত্রালংকার দিতে প্রস্তুত সে কথা জানানো কিংবা কন্যার ঋণ, অভাব, অসুবিধার খবর দেওয়া। (*দশরূপক* ২:৩৪, *সময়মাতৃকা* ১:৪-০, ৪৫, *কামসূত্র* ৭:১:১৩-১৭) এ ছাড়াও ছিল কুট্টনী, সে গণিকামাতা না হলে বৃদ্ধা গণিকাও হতে পারত। তার প্রধান কর্তব্য ছিল উপযুক্ত ধনী, উদার, সৎ এবং বাঞ্ছনীয় প্রার্থীর সন্ধান করা— উভয়ের মধ্যস্ততা করা, কলহ ঘটানো এবং মেটানো, গণিকার স্বার্থে প্রার্থীকে বঞ্চনার ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। কুট্টনী বা শম্ভলী বিগতযৌবনা গণিকা, স্বয়ং গণিকাবৃত্তিতে উপার্জন করবার বয়স পেরিয়ে গেলেও এই বিকল্প বৃত্তিতে সে ভরণপোষণ এবং কিছু কিছু উপার্জনও হয়তো করতে পারত। *কামসূত্র*-তে কুট্টনীর উল্লেখ আছে চণ্ডালী, মুণ্ডিতা ও বৃদ্ধা গণিকার সঙ্গে; *কুট্টনম*-তেও তাই। (৫৩২) *সময়মাতৃকা* (৮:১০২, ৩, ১২) এবং *শার্ঙ্গধর পদ্ধতি*-তেও এদের উপার্জন অক্ষমতা ও দারিদ্র্যের কথা আছে। সব বৃদ্ধা গণিকাই তো কুট্টনী বা শম্ভলী হতে পারত না, যারা ওই পদ পেত না তারাই সংখ্যায় বেশি এবং তাদের দুর্দশা অকল্পনীয়। এর উপার্জনের সুদিনে কতকটা আরামে হয়তো বা অল্প কিছু বিলাসেও অভ্যস্ত ছিল, যৌবনের অন্তে যখন উপার্জনের ক্ষমতা গেছে তখন এদের জন্যে কোথাও কোনও ব্যবস্থা নেই। শুধু ওপরের দিকের কিছু সুপরিচিতা রূপবতী ও গুণবতী বা ধনবতী হিসেবে যারা প্রখ্যাত ছিল সম্ভবত তাদের জন্যেই বিকল্প বৃত্তি (রান্নাঘর, পশম বা তুলো বোনার কাজ)-তে বা রাষ্ট্র থেকে অর্থদানের ব্যবস্থা ছিল। সহজেই অনুমান করা যায় রাষ্ট্র যদি এ কর্তব্যপালনে বিমুখ হয় তো জরতী গণিকার কিছুই করবার থাকে না। একে তো সেযুগে শ্রমিকসঙ্ঘের ব্যবস্থার দ্বারা সাধারণ শ্রমিকেরই স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা দুর্লভ ছিল তার ওপরে গণিকাবৃত্তি এতই ঘৃণিত যে বৃদ্ধা গণিকাকে সমাজ আবর্জনা ছাড়া অন্য কিছুই মনে করত না। ফলে আইনে ব্যবস্থা থাকলেও তা আদায় করার উপায় তার ছিল না। আর অর্থশাস্ত্র ছাড়া অন্যত্র আইনের ব্যবস্থারও উল্লেখ নেই।

দেশোপদেশ-এ দেখি ষাট বছরের বৃদ্ধা গণিকা তরুণী সেজে ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়ে নিগ্রহ ভোগ করছে। (৩:৩৩) সবচেয়ে করুণ কাহিনি পাই *সময়মাতৃকা*-য় দীর্ঘ একটি উপাখ্যানে।

> কঙ্কালী নামে এক সরাইখানার মালিকের মেয়ে শৈশবে, সাত বছর বয়সেই বাজারে বিক্রি হয়ে যায়। সমস্ত যৌবনকাল কাটে হার-ফেরতা হতে হতে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে। রূপ যৌবন যখন নিঃশেষিত তখন পর পর নানা বৃত্তি অবলম্বন করে গ্রাসাচ্ছাদন করার দুশ্চেষ্টার পালা শুরু হল। সে তীর্থক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে ধরা পড়ে যায় ও জেল খাটে। সেখানে কারারক্ষীকে হত্যা করে পালিয়ে যায় এক মঠে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আয়াসের জীবনে অভ্যস্ত বলে মঠের কষ্ট সহ্য হয় না, তাই ভিক্ষা করে দিনযাত্রা নির্বাহ করতে থাকে। এমন সময়ে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ, বন্ধ হয়ে গেল ভিক্ষা পাওয়া। তখন একটি শিশুকন্যার ধাত্রীর চাকরি নেয়। অনভ্যাসে এবং প্রৌঢ় শরীরে পরিশ্রম সইছিল না বলে একদিন শিশুটির সোনার হার চুরি করে পালায়। হার বিক্রির টাকা ফুরোলে জুয়ো খেলার ঘুঁটি নিয়ে প্রতারণা করে রোজগার শুরু করে। কিছুদিন বেশ চলে, কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেল, তখন আবার ভিক্ষা। অসহ্য হলে খিদের জ্বালায় এক মন্দিরে লুকিয়ে থেকে দেবতার নৈবেদ্য চুরি করে উদরপূর্তির ব্যবস্থা করে। সেখানেও ধরা পড়ে যায়, তখন শুরু করে মদ বিক্রি। তাতে পোষাল না যখন তখন তাকে দেখা গেল গণৎকারের ভূমিকায়। তাতেও ধরা পড়ে, তখন অভিনেত্রী হয়ে চালায় কিছুদিন। কিন্তু তার পক্ষেও যোগ্যতা নেই বলে নিরুপায় হয়ে পাগলীর ভান করে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ মাথায় একটা কূটকৌশলের উদয় হয়; কঙ্কালী ঘোষণা করে যে শত্রুসৈন্যকে জাদুবলে পক্ষাঘাতে অসাড় করে দিতে পারে। আশ্চর্য নয়, এতে স্বয়ং রাজা তাকে সাগ্রহে প্রাসাদে স্থান দিলেন। বেশ চলল কিছুকাল, হঠাৎ খবর এল সে রাজ্য আক্রান্ত হতে চলেছে। কঙ্কালী বুঝল এখন যঃ পলায়তে স জীবতি। দেশে ফিরে অগত্যা কুট্টনীবৃত্তিতে দিনপাত করতে শুরু করল। (*সময়মাতৃকা* ২:২৮-৮০)

বোঝাই যায় একাধিক বৃদ্ধা গণিকার অভিজ্ঞতার সমাহার পাওয়া যায় এই কঙ্কালী উপাখ্যানে। এ-কাহিনিতে কৌতুকের অন্তরালে একটি অসহায় বৃদ্ধার শুধুমাত্র বেঁচে থাকার চেষ্টা এবং সমাজের কোনও দরজা খোলা না পেয়ে কুট্টনীবৃত্তিতে ফিরে আসার করুণ ইতিহাসটি বিধৃত আছে। অল্প বয়সে রূপযৌবনের দিনে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার তরুণ কায়িক পরিশ্রমের অভ্যাস তাদের থাকে না; বেশি বয়সে আর নতুন করে তা পারে না; ফলে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও রাস্তাই খোলা থাকে না বৃদ্ধা গণিকার। কঙ্কালীর সেদিক থেকে ভাগ্য ভাল, কুট্টনীর পদ পেল সে; কিন্তু শতকরা নিরানব্বইটি বৃদ্ধা গণিকার সহায় সম্বল, আত্মীয়বল, সঞ্চয় বা অর্থোপার্জনের উপযুক্ত বিকল্প কোনও বৃত্তির শিক্ষা থাকে না; ফলে বার্ধক্যে জীবনসংগ্রামে তারা তরঙ্গতাড়িত কাষ্ঠখণ্ডের মতোই ভেসে বেড়ায়।

কুট্টনী ছাড়াও গণিকার সহায়ক থাকে— পীঠমর্দ ও বিট। পীঠর্মদ হল নাগরকের শিক্ষক ও সহচর; তার ইপ্সিত নারীকে লাভ করাতে সহায়তা করে। (দশরূপক ২:৮) বিট নাগরকেরও

থাকত, গণিকারও থাকত। গণিকার বিট হত ধনীগৃহের সন্তান, অপচয়ের ফলে দরিদ্র; শিক্ষিত, বাগ্মী, গণিকার পরিচর্যায় কুশল, মধুরস্বভাব, বুদ্ধিমান; কোন কথা উচ্চারণ করে বলবার আর কোনটা নয় তা জানে, অনুক্ত কথাও প্রয়োজন মতো বুঝতে পারে। সে প্রার্থী ও গণিকার মিলন ঘটায়, কলহ মেটায়, গণিকার সব রকম স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সচেষ্ট থাকে, কথায় ও কাজে তার আনুকূল্য করে। *চতুর্ভাণী* ও অন্যান্য ভাণ গোত্রের একাঙ্ক একচরিত্রক নাটকে বিটের ভূমিকা বেশ বোঝা যায়। *মৃচ্ছকটিক* নাটকেও বসন্তসেনার বিট এক তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র।

বৈদিক যুগ থেকেই সাহিত্যে গণিকার দেখা পাওয়া যায়; *শাঙ্খায়ন আরণ্যক*-এ পুংশ্চলী ও ব্রহ্মচারীর আলাপ ও *অথর্ববেদ*-এর ব্রাত্যসূক্তে পুংশ্চলীর সঙ্গে মাগধের উপস্থিতির কথা আছে। পরবর্তী সাহিত্যে গণিকার উৎপত্তি বিষয়ে নানা কাল্পনিক উপাখ্যান পাই। মহাভারতের মৌষলপর্বে দেখি যাদব-বৃষ্ণিবংশের নারীদের দস্যুরা হরণ করে নিয়ে যায়, ফলে তারা গণিকা হয়ে যায়। ঋষি দাল্‌ভ্যচৈকিতায়ন ও শ্বেতকেতুর ভ্রাতুষ্পুত্র অষ্টাবক্র মদ্র-অধ্যুষিত কুরুপাঞ্চাল ও সিন্ধুসৌবীর অঞ্চলে কামশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, এর একটি অংশ গাণিক্য বা গণিকাবিষয়ক। *মহাভারত*-এ (কর্ণপর্ব ২৭:৩০, ৫৭:৫৯) ও *মৎস্যপুরাণ* (৭০ অধ্যায়)-এ গণিকার উদ্ভব সম্বন্ধে অন্য উপাখ্যান পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর *সময়মাতৃকা* গ্রন্থে বলেছেন দুশ্চরিত্রা জননীরা পরপুরুষের দ্বারা ভুক্ত তাদের কন্যাদের অন্যদেরকে দান করত; এরাই গণিকা হয়ে যেত। (*সময়মাতৃকা* ৩:১৮)

ঠিক কেমন করে গণিকা সমাজে গণিকারূপে দেখা দিল তা আজ নির্ণয় করা কঠিন; তবে সাহিত্যে কিছু কিছু সূত্র পাওয়া যায় যার থেকে অনুমান করা যায় গণিকারা সমাজের কোন কোন পথ ধরে আসত। যেমন বাৎস্যায়ন তাঁর *কামসূত্র*-তে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন কেমন করে কুলকন্যাকে কোনও পুরুষ প্রলুব্ধ করে নিজের অনুকূলে এনে ভোগ করতে পারে। (কামসূত্র ৩:৫:১৪-১৬) ভোগের পরে এই কন্যাদের সমাজে কী স্থান হতে পারে? সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাদের অধিকাংশই গণিকালয়ে যেতে বাধ্য হত। সংস্কৃতে দুটি শব্দ আছে; জায়াজীবী ও জায়োপজীবী, অর্থাৎ যে পুরুষ স্ত্রীর উপার্জনে দিনপাত করে। এ উপার্জন গণিকাবৃত্তি থেকে। জায়াজীবীর পাপটা গুরুতর নয়, উপপাতক মাত্র। সামান্য চন্দ্রায়ণ ব্রতেই তার প্রায়শ্চিত্ত হত। (*বিষ্ণুপুরাণ* ৩৭ অধ্যায়; *যাজ্ঞবল্ক্য* স্মৃতি ২৪০) এই স্ত্রীরা বাড়িতে থেকেই গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করে উপার্জন করে পরিবারের ভরণপোষণ করত। উৎসবে, যুদ্ধজয়ে, যজ্ঞে, দানে, দক্ষিণায়, নারীকে বস্তুর মতোই দান করা হত। এদের মধ্যে এমনও দুর্ভাগিনী আছেন যাঁদের দেহের বিনিময় মূল্যে অন্য একজন পুণ্য অর্জন করছে (মহাভারতে উদ্যোগপর্বে ১১৪-১৮)। আবার এক ধনী শ্রেষ্ঠীর কথা শুনি তাঁর অসামান্য রূপবতী কন্যারা একরাত্রে যে মূল্য নিরূপণ করেন তা সমগ্র কাশীরাজ্যের রাজস্ব; ফলে কোনও প্রার্থীই পাওয়া যায় না। শেষে কন্যা তার মূল্য অর্ধেক বলে ঘোষণা করায় তার নাম হল 'অর্ধকাশী'। কাজেই দেখছি শুধু জায়াজীবীর স্বামী নয়, দুস্থ, হতভাগ্য বা অর্থলোভী, নিষ্ঠুর পিতাও গণিকাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে দেখলে দেখি দানে দক্ষিণায়

যাদের বিতরণ করা হত তারাই যথার্থ ভাবে গণিকাবৃত্তির সংখ্যাবৃদ্ধি করত কারণ এরা সত্যিই অগণ্য। নারীকে, প্রধানত সুন্দরী তরুণীকে, যজ্ঞে, যৌতুকে, শ্রাদ্ধে, যুদ্ধজয়ে, দানে ও দক্ষিণায় দেওয়ার অসংখ্য উল্লেখ *রামায়ণ*-এ আছে। (অযোধ্যাকাণ্ড ১১, ২২, ২৫, ২৬; কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২০:১৩; ২৪, ৩৪) *মহাভারত*-এও (বনপর্ব ১৮৬:৭, কর্ণপর্ব ৪৯:৭৬-৭৮; শান্তিপর্ব ৯৮:৪৫; অনুশাসনপর্ব ৯৬:১৮, ১৯, ৮২) গণিকা সভামণ্ডনা এবং যুদ্ধে ও মৃগয়ায় বিনোদিনী। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এ দ্বিতীয় অঙ্কে দুষ্যন্তের মৃগয়াসহচারিণী যবনীদের কথা পাই। *কুমারসম্ভব*-এ (১৬:৩৮, ৪৮) *রঘুবংশ*-তে (৭:৫০) এবং পরবর্তীকাব্যে বিলাসের উপকরণরূপে বহুবার নারীকে দেখা যায়। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরাজিতপক্ষের নারীদের জয়লব্ধ অন্যান্য সম্পদের মতোই নিয়ে আসেন। (বনপর্ব ৮:২৭) বিরাটরাজা অর্জুনের শৌর্যে এবং জয়ে প্রীত হয়ে পারিতোষিক দিয়েছিলেন বহু সুন্দরী তরুণী। (বিরাটপর্ব ৩৪:৫) যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ ঘোষণা করেছিলেন, যে অর্জুনকে চিনিয়ে দেবে তাকে একশত সুন্দরী দান করবেন। (দ্রোণপর্ব ৩৮:৪ থেকে) যে রাজা সুন্দরী নারী দান করেন না তাঁর নিন্দাসূচক নাম 'রাজকলি', অর্থাৎ রাজাদের মধ্যে কলিস্বরূপ (শান্তিপর্ব ১২:৩৬৬)। দ্রৌপদীর বিবাহে যৌতুকের সঙ্গে একশত সুন্দরী তরুণী ছিল; (আদিপর্ব ১৯৮:১৬) সুভদ্রার বিবাহে এক হাজার সুন্দরী তরুণী অতিথিদের স্নান, সুরাপান, ইত্যাদির সহচরী ছিল। (আদিপর্ব ২২১:৪৯, ৫০) যুধিষ্ঠির, শশবিন্দু, ভগীরথ, সগর,— সকলেই সুন্দরী কন্যাদের 'বিতরণ' করেছিলেন। এমন কথাও শুনি যে, সুন্দরী তরুণী ব্রাহ্মণদের দান করা অতি প্রশস্ত। (বনপর্ব ৩১৫:২, ৬; ২৩৩:৪; বিরাটপর্ব ১৮-২১; শান্তিপর্ব ৬৮:৩৩, ১৭১:৫, ১৭৩:১৬) এর দ্বারা দাতা স্বর্গে প্রচুর পুরস্কার লাভ করে, অর্থাৎ স্বর্গে বহুসংখ্যক অপ্সরা তার তৃপ্তিবিধান করে (অনুশাসন পর্ব ১৪৫:২)।

স্পষ্ট, এই ধরনের পুণ্য ও পুরস্কারের লোভ দেখানোর দ্বারা ব্রাহ্মণরা বহু সুন্দরী নারীকে দান হিসেবে লাভ করতেন; দাতাকে অবশ্য প্রতীক্ষা করতে হত মৃত্যু পর্যন্ত স্বর্গের অপ্সরার সঙ্গ লাভের জন্যে। সহজেই বোঝা যায়, পৃথিবীর গণিকার কাল্পনিক রূপায়ণ স্বর্গের অপ্সরার মধ্যে। পিতা বা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধেও দানসামগ্রীর তালিকায় হাজারে হাজারে সুন্দরী তরুণীর উল্লেখ আছে। পেতেন পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা। (আশ্রমবাসিবপর্ব ১৪:৪, ২, ৩৯; মহাপ্রস্থানপর্ব ১:৪; স্বর্গারোহণপর্ব ৬:১২, ১৩) সহজেই বোঝা যায় এই সব অগণিত নারীর কী পরিণতি হত। বোঝা যায় ঋত্বিক-পুরোহিতদের সাধ্য ছিল না এতগুলি নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়ার। অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও তো এদের সংখ্যা শঙ্কাবহরূপে বেশি, কাজেই কিছুদিন পরেই এরা ক্রীতদাসী বা গণিকায় পরিণত হত। এবং ব্যাপারটা ঘটত ধর্মযাজকদের মাধ্যমেই, কারণ, এ সব দক্ষিণার গ্রহীতা তাঁরাই। অন্য যাঁরা, অতিথি বন্ধু প্রিয়জন, উৎসবে বা কোনও উপলক্ষে দানস্বরূপে অনেক নারী লাভ করতেন তাঁরাও নিশ্চয়ই এদের অনেককেই বিক্রি করতেন দাসীত্বে বা গণিকাত্বে। এ ছাড়াও অন্য বহু সূত্র ধরে নারী আসত গণিকালয়ে। বিবাহে নারীর কৌমার্য— পুরুষের নয়(!)— যখন অত্যাবশ্যক মানদণ্ড হয়ে উঠেছে তখন

যে কোনও কারণে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে তরুণীর কৌমার্য নষ্ট হয়েছে সে বিবাহের অযোগ্য বলে পরিগণিত হত। এবং বিবাহ যে নারীর পক্ষে কেমন অলঙ্ঘনীয় বিধান হয়ে উঠেছিল— খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক বা তারও বহু আগে থেকে— তার প্রমাণ মহাভারতের বহু কাহিনিতে আছে, যেখানে বৃদ্ধা তপস্বিনীকে শুনতে হয়েছে অন্তত একরাত্রির জন্যে কোনও পুরুষের ভার্যাত্ব না স্বীকার করলে স্বর্গে তার প্রবেশও নিষেধ। এ ক্ষেত্রে বিবাহিত জীবনের বাইরে নারীর কোনও ভূমিকাই ছিল না; দু-একটি ব্রহ্মবাদিনী বা পণ্ডিতকৌশিকীর উল্লেখ করে এ সত্য খণ্ডন করা যায় না। অতএব যে হৃতকৌমার্য নারী বিবাহের জগতে অচল বলে গণ্য হল, তার অন্য যে প্রশস্ত পথটি খোলা ছিল তা গণিকালয়ের অভিমুখে। যে সমাজ নারীর 'সতীত্ব' সংরক্ষণে এতই তৎপর সেই সমাজই এ ভাবে অনিবার্য করে তুলেছিল নারীর গণিকাত্ব স্বীকার করা। এর পিছনে তার স্বার্থও ছিল, তা পরে আলোচনা করছি। এ ছাড়াও, রাজারও অধিকার ছিল গ্রামের বা শহরের সুন্দরী তরুণীকে যথেচ্ছ ভোগ করার। বিদর্ভে রাজারা কয়েক দিনের জন্যে সুন্দরী তরুণীদের ভোগ করে পাঠিয়ে দিত; বৎসগুল্ম রাজ্যে মন্ত্রীপত্নীদের রাজা প্রাসাদে ডেকে পাঠলেই যেতে হত। এরা ফিরে এলে, ধরে নেওয়া যায় কখনও কখনও রাজার অনুগত কেউ কেউ এদের বিয়ে করত; কিন্তু বাকি অধিকাংশের পরিণতি কী হত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সুন্দরী নারী কিনে দেবালয়ে উপহার দিলে দাতার পুণ্য হয়; অতএব দেবদাসী দানের পুণ্য অর্জনের জন্যে দুস্থ পিতামাতার কন্যাদের কিনে দলে দলে মন্দিরে পাঠিয়ে পুরোহিতের ভোগ্যা করে তুললে দু'বার পুণ্য হয়: দেবতা প্রীত হন, পুরোহিতও। যুদ্ধে পাওয়া বন্দিনী নারী অনাদিকাল থেকে সকল সমাজেই গণিকালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। অবশ্য এরা অনেক সময়েই অনেকটা ঘুরপথে এসে পৌঁছত। প্রথমে সেনাপতি বা রাজার অন্তঃপুরে অন্যান্য বহু নারীর সঙ্গে একান্ত একটি পুরুষের ভোগ্যবস্তু হয়ে দিন কাটাত; পরে গৃহস্বামীর অন্যান্য পুরুষ আত্মীয়দের; এবং সবশেষে গণিকালয়ে এসে পৌঁছত এরা। যুদ্ধ ছাড়াও দেশের দুর্দিনে দুর্ভিক্ষে বা রাষ্ট্রবিপ্লবে দুস্থ পিতামাতা ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে কখনও কখনও কন্যা বিক্রয় করতেন প্রথমে তারা ধনীগৃহে, রাজঅন্তঃপুরে, মন্দিরে স্থান পেত এবং রূপযৌবন খানিকটা ম্লান হলে গণিকালয়ে আসত। আবার সরাসরি গণিকালয়েও কন্যা বিক্রয় করার ব্যবস্থা ছিল।

গণিকার কন্যারাও গণিকাই হত। পুত্ররা বন্ধুল। মৃচ্ছকটিক নাটকে বড় করুণ ভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছে বন্ধুলরা: 'পরের গৃহে লালিত, পরের অন্নে পুষ্ট, পরপুরুষের দ্বারা পরনারীতে জন্ম আমাদের।' এ পরিচয় গণিকাকন্যারও; কাজেই তার কাছে সমাজে সদর রাস্তা সবই বন্ধ, গণিকাবৃত্তিই তার জীবনধারণের একমাত্র উপায়। কখনও সে গণিকা, কখনও রূপাজীবা, কখনও অবরুদ্ধা এবং রূপ-যৌবন বিদ্যা গুণ না থাকলে সাধারণ বেশ্যা।

যে সমাজে 'সতী' শব্দের পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ ছিল না, যেখানে 'চরিত্র' বলতে শুধু যৌন শুচিতা'ই বোঝায় এবং যেখানে চিরকাল পুরুষের যৌন মাধুকরীবৃত্তিকে বহু ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে এসেছে, সেখানে নারীর সামান্যতম পদস্খলন বরাবরই চূড়ান্ত ভাবে দণ্ডিত

হয়ে এসেছে। সমাজের কঠোর দণ্ডে, আত্মধিক্কারে পিতৃগৃহ ও স্বামীগৃহের দরজা যখন সহজেই বন্ধ হয়েছে তথাকথিত 'ভ্রষ্টা' নারীকে সেখানে মুহূর্তের ভ্রান্তির চড়া দাম শোধ দিতে হয়েছে গণিকালয়ে জীবন অতিবাহিত করে। বিশেষত, সমাজ যেখানে প্রায় দু' হাজার বছর ধরে নারীকে অর্থকরী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে এসেছে, এবং ফলে, সসম্মানে সৎপথে থেকে জীবিকা অর্জন তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব সেখানে এই বৃত্তি তাকে গ্রাসাচ্ছাদনের একটা আশ্বাস দিত। দানে দক্ষিণায় যৌতুকে (স্মরণীয়, শর্মিষ্ঠা দেবযানীর উপাখ্যান) যে নারী অন্যের ভোগ্যা হয়ে উঠত সেখানে গ্রাসাচ্ছদন ছাড়া আর কিছু পাওয়ার তার অধিকার থাকত না, একমাত্র গণিকারূপেই সে অর্থমূল্য পেত।

কিন্তু মানুষ হিসেবে সমাজের কাছে তার পাওনা ছিল অবিমিশ্র অবজ্ঞা, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য। ধরা যাক *মৃচ্ছকটিক*-এর নায়িকা বসন্তসেনার কথাই (একমাত্র তারই পূর্ণাবয়ব চিত্র আমরা সাহিত্যে পাই)। রূপে যৌবনে সে অতুলনীয়া, শিক্ষাদীক্ষায়, রুচিতে চরিত্রে মহানুভবতায় সে অনন্যা— উজ্জয়িনীর নগরলক্ষ্মী। কিন্তু তার নিজের অনুচর বিটই বারে বারে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, সে শ্মশানের জুঁই গাছের ফুলের মতোই, কোনও শুভকাজে লাগে না; সে বেশ্যা, সর্বজনভোগ্যা, পণ্যদ্রব্যের মতোই, তার পছন্দ-অপছন্দ ভাললাগা-মন্দলাগা থাকতে পারে না। এই তাচ্ছিল্য যদি গণিকাশ্রেষ্ঠা বসন্তসেনার প্রাপ্য হয় তবে অন্যদের কথা না বলাই ভাল। যার নাম নগরশোভনা, নগরমণ্ডনা, জনপদকল্যাণী তার অন্যান্য নামগুলির মধ্যে প্রগাঢ় অবজ্ঞা ঘৃণা প্রকাশ পায়। গণিকা সম্বন্ধে সমাজের এ দ্বৈধমনস্কতা একটা লক্ষণীয় ব্যাপার।

গণিকাগমনে পাপ, যদিও প্রায়শ্চিত্ত যৎসামান্য। গণিকাসংসর্গের পাপের জন্যে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান অনেক ধর্মশাস্ত্রকারই দিয়েছেন। (বিষ্ণুপুরাণ ১০৩:৪; অত্রিসংহিতা ২৬৭; সংবর্তসূত্র ১৬১; পরাশর সংহিতা ১০:১৫) *মহাভারত*-এও শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্বে গণিকা সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা আছে এবং গণিকাসংসর্গে পাপ হয় এ কথাও বলা হয়েছে। গণিকার অন্নগ্রহণে পাপ, গণিকাস্পর্শ বর্জনীয়। লেখা আছে নগরের দক্ষিণ দিকে, যমের দিকে গণিকালয় নির্মাণ করতে হবে; *মানসোল্লাস* নামে মধ্যযুগের এক গ্রন্থ বলে, গ্রাম বা নগরের প্রত্যন্তদেশে, অর্থাৎ লোকালয়ের সীমান্তের বাইরে থাকবে গণিকালয়। (গ্রিসে কিন্তু নগরের সুন্দরতম অঞ্চলে থাকত গণিকালয়। *মৃচ্ছকটিক* নাটকেও মনে হয়, নগরের মধ্যেই ছিল বসন্তসেনার সাতমহলা প্রাসাদ; *চতুর্ভাণী*-তেও সেই ধারণা হয়।) 'গণিকা' পদ পাওয়া যেত রূপ গুণ বিদ্যাবুদ্ধি আকর্ষণী মাধুরী ইত্যাদির সমন্বয়ে। (*কামসূত্র* ১:৩:২০) কৌটিল্য বলেন, মার্জিত, গুণবতী সুন্দরী তরুণীকেই গণিকাধ্যক্ষ 'গণিকা' আখ্যা দেবেন। (*অর্থশাস্ত্র* ২:২৭) সেই গণিকারই সমাজের দৃষ্টিতে এই স্থান, তাহলে রূপাজীবা বেশ্যা স্বৈরিণীদের কী চোখে দেখা হত তা তো স্পষ্টই বোঝা যায়।

গণিকার প্রধান প্রত্যক্ষ অপরাধ হল এই যে সে তার রূপেগুণে শিক্ষাদীক্ষায় কুলপুত্রকে প্রলুব্ধ করে। দ্বিতীয় অপরাধ হল সে কুলপুত্রের অর্থ শোষণ করে নানা ছলে ও কৌশলে।

প্রায় সব বৈশিকতন্ত্র জাতীয় গণিকাসম্বন্ধীয় গ্রন্থই বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে কী ভাবে ছলনা করে গণিকামাতা বা গণিকালয়ের কর্ত্রী বা গণিকা স্বয়ং তার প্রার্থীর কাছ থেকে অর্থ নিষ্কাশন করে নিতে পারে। *কামসূত্র*-তে বাৎস্যায়ন স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন গণিকা নাগরকের কাছে নিজের এবং নাগরকের বস্ত্র ও অলংকার চুরি হয়ে যাওয়ার মিথ্যা গল্প করবে; সে যে অভাবগ্রস্ত তা বারে বারে বলবে; অন্য নাগরক তাকে আরও বেশি অর্থ, বস্ত্র ও অলংকার দিতে প্রস্তুত এ কথাও সুযোগ মতো শোনাবে, যাতে নাগরক তাকে এমনিতে যা দিত তার চেয়ে বেশি দেয়। (৬:২:৩-২৩) এ সব শিক্ষা পুরুষের রচিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, বাৎস্যায়নের এই সুদীর্ঘ নির্দেশাবলির পিছনে যে চেতনা সক্রিয় তা হল গণিকার প্রবঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা— তাকে যে নিজের স্বার্থ নিজেকেই দেখতে হবে সর্ব উপায়ে যথাসম্ভব বেশি অর্থাগমের চেষ্টা করতে হবে তার বর্তমানের দিনপাতের জন্যে এবং অসমর্থ বার্ধক্যের জন্যেও এই বোধ।

গণিকাবৃত্তির মূল কথাটা একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং *অর্থশাস্ত্র*-তে বণিককে তার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে যে ভাবে উপদেশ দেওয়া যেতে পারত, *কামশাস্ত্র*-তে গণিকার স্বার্থরক্ষার জন্যে সেই রকমই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ সব গ্রন্থ গণিকার রচিত নয়, পুরুষেরই রচিত এবং বহু-অনুপুঙ্খযুক্ত নির্দেশাবলির একটিই উদ্দেশ্য: প্রার্থীকে প্রতারণা করে বা যথাসম্ভব বঞ্চিত করে অর্থ সংগ্রহ করা। গণিকা যখন এই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করে তখন তার ওপরে বর্ষিত হয় ভর্ৎসনা ও নিন্দা। অন্য দিকে আইনের দিকে যখন তাকাই তখন দেখি গণিকার স্বার্থরক্ষার জন্যে যে আইন আছে অর্থদণ্ডের তার ভিন্ন ভিন্ন ধারায় কত নির্যাতনের কথা আছে। গণিকা এবং তার কন্যাকে অনিচ্ছায় ধর্ষণ থেকে শুরু করে অপমান, লাঞ্ছনা, অঙ্গচ্ছেদ (হাত বা কান কেটে দেওয়া), অন্যান্য শারীরিক অত্যাচার, সম্পত্তিহরণ, ইত্যাদি নানা রকম নির্যাতন ও লাঞ্ছনাই তার কপালে জুটত। সমাজে তার মূল্য বা স্থান নেই; উপার্জনই তার একমাত্র ভরসা এবং সে উপার্জনও ধূর্ত লম্পটের কবল থেকে নিরাপদ নয়। তার রোগে দেখবার কেউ নেই, বার্ধক্যে ভরণ করবার কেউ নেই, আত্মীয়বান্ধবদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে সে যে সর্বতো ভাবে নিজের সম্পত্তিটুকু বজায় রাখবার এবং বাড়াবার চেষ্টা করবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এবং কী ভাবে সে তা করতে পারে, নানা গ্রন্থ তাকে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছে। তার তবে করণীয় কী? নিজের স্বার্থ, ভবিষ্যৎ ও গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানের চেষ্টা না করা? এটা তো স্পষ্ট যে তাকে ঠকাবার জন্যে কুলপুত্রের কোনও দ্বিধা নেই। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটারই প্রতিষ্ঠা পারস্পরিক প্রতারণার ওপরে, কিন্তু গঞ্জনা জোটে গণিকারই ভাগ্যে, কুলপুত্রের নয়।

সময়প্রদীপ গ্রন্থে অনুকূল যাত্রার যে সমস্ত লক্ষণ দেওয়া আছে তার মধ্যে বৎসযুক্তা ধেনু, বৃষ, অশ্ব, রথ, দক্ষিণাবর্তবহ্নি, দেবীপ্রতিমা, পূর্ণকুম্ভ, মাল্য, পতাকা, শ্বেততণ্ডুল, ইত্যাদির সঙ্গেই আছে 'দ্বিজনৃপগরিকাঃ'। এ গুলি 'দ্রষ্ট্র বা শ্রুত্বা পঠিত্বা চ, ফলমিহ লভতে মানবো গন্তু কামঃ— দেখে, শুনে, পড়ে, যাত্রায় উদ্যত ব্যক্তি ফললাভ করে' (*বিষ্ণুস্মৃতি* ২৯-এও আছে)।

তেমনই দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণের জন্যে যে যে স্থানের মৃত্তিকা সংগ্রহ করতে হয় তার মধ্যে গণিকাগৃহের মৃত্তিকা একটি আবশ্যিক উপাদান। এ রহস্যের কতকটা সমাধান হয়তো হয় যখন মনে পড়ে মহাব্রতা যাগে পুংশ্চলীর সঙ্গে ব্রহ্মচারীর সংলাপ কিংবা ব্রাত্যস্তোমে পুংশ্চলী ও মাগধ হচ্ছে ব্রাত্যের সহচর। নৃতত্ত্বের গ্রন্থে দেখি— যা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হত— ক্ষেত্রকে ফলপ্রসূ করার একটি প্রণালী হল ক্ষেত্রের ওপরেই নারীপুরুষের মিলন। যৌনশক্তির প্রতীক হিসেবেই গণিকা এই সব যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে স্থান পেয়েছে; ক্রমে সে যৌনতারই প্রতীক হয়ে উঠেছে; তাই তার গৃহমৃত্তিকা শস্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী দুর্গার মূর্তি নির্মাণে অপরিহার্য, এবং অন্যান্য শুভবস্তুর সঙ্গে তারও উল্লেখ যাত্রায় সুলক্ষণ হিসেবে। এই শ্লোকে মূল শব্দ ক'টি লক্ষণীয়: ফলমিহ লভতে। যদিও গণিকার জননীত্ব গৌণ তবু তার যৌনত্বই উর্বরতার আবহ বহন করে বলে বেদ থেকে দুর্গাপূজা পর্যন্ত কৃষিজীবী সমাজে তার এই স্থান।

সমাজের এই দ্বৈধমনস্কতা সত্যিই খুব তাৎপর্যপূর্ণ: কোনও মতেই সমাজের কর্তারা স্থির করতে পারছে না গণিকা সম্বন্ধে তাদের মনোভাব কী হবে। *কামসূত্র* ও *অর্থশাস্ত্র*-তে দেখি রাজা, ধনী, বণিক, নাগরক সকলে অকুণ্ঠ ভাবে গণিকাসঙ্গ করেন, শাস্ত্র তার নির্দেশ দেয়। গ্রামীণ ও নাগরিকরা এই 'গোষ্ঠী' উৎসব দেখে আনন্দ অনুষ্ঠানের, ভোগবিলাসের প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করবে ও অনুকরণ করবে। পুরাণ গণিকার জন্যে স্বতন্ত্র এক ব্রতেরও বিধান দেয়, এর নাম অনঙ্গব্রত (*বিষ্ণুপুরাণ* ৭০ অধ্যায়) যাতে তার বৃত্তি সাফল্যযুক্ত হয়। অতএব সমাজে স্পষ্ট দুটি মনোভাব যেন বিদ্যমান। প্রথমটি হল গণিকা একটি প্রয়োজনীয় অশুভবৃত্তি আর দ্বিতীয়টি হল গণিকা সর্বতো ভাবে অশুভ ও পরিহার্য।

মানুষ তো জানে অন্য সব বৃত্তির মতোই এ বৃত্তিরও সৃষ্টি হয়েছে সমাজের একটি অংশের পুরুষের প্রয়োজন মেটাতে। কোনও শিশুকন্যাই জন্মাবধি গণিকা হয় না, সমাজই তাকে গণিকায় পরিণত করে নিজের প্রয়োজন মেটাতে। যদিও অধিকাংশ গণিকাবৃত্তিধারিণীই ছিল রূপেগুণে হীন অতএব উপার্জনে দীন, তবুও যে ক'জন শিক্ষিতা নারীর মোহে কুলপুত্র আকৃষ্ট হয় তাদের সম্বন্ধে বিদ্বেষের ভাব থাকে, কারণ গৃহে স্ত্রীপুত্রকে অবহেলা করে অর্থ ও অনুরক্তি অন্য এক নারীকে উৎসর্গ করার মধ্যে গ্লানি ও অপরাধবোধ থাকে। এর জন্যে সে নিজেকে দোষ দেয় না, দেয় গণিকাকে কারণ সে-ই নরকের দ্বার। সমস্ত প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে যে মৌলিক বহু অন্যায় নিহিত তা তার চোখে ধরা পড়ে না, যদিও সম্ভবত অবচেতন মনে সে অবহিত বলেই তার চেতন সত্তা সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব গণিকার ওপরে চাপিয়ে নিজের দোষস্খালনের চেষ্টা করে। নিজের স্ত্রীতে তৃপ্তি নেই বলে যে পুরুষ অন্য নারীর সঙ্গ কামনা করে সে-তো জানে নিজের স্বামীতে যে নারী চরিতার্থ বোধ করে না সমাজ তার জন্যে কোনও বিকল্প ব্যবস্থা রাখেনি। ব্যবস্থা থাকলেও সম্পত্তিতে অধিকার নেই যে নারীর তার পক্ষে বাসনা চরিতার্থ করার মতো অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। কাজেই এই অসম সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও তো পুরুষের একটা আত্মগ্লানির হেতু ছিল। তৃতীয়ত, এবং প্রধানত, যে

সমাজ ব্যবস্থা একটি নারীর সুস্থ জীবনযাত্রার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে তাকে এই বিকৃত জীবনযাপনে বাধ্য করে, যে বৃত্তিতে তার সুস্থ হৃদয়বৃত্তির এবং সর্বোপরি তার মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অপমান ঘটছে— সে সমাজ অগত্যাই নিজের সমস্ত কলঙ্কের বোঝা চাপিয়েছে গণিকার প্রতিকারহীন বৃত্তির ওপরে। চাহিদা না থাকলে গণিকা সৃষ্টিই হত না; চাহিদা এসেছে পুরুষের কাছ থেকে; শুধু তাই নয় প্রধানত উদ্বৃত্তভোগী অপেক্ষাকৃত ধনী পুরুষের কাছ থেকে। এ চাহিদা মেটানোর মধ্যে এক দিকে যেমন সম্পূর্ণ অসহায় কুলস্ত্রীর অপমান অন্য দিকে তেমনই আর একটি অসহায় নারীর—গণিকারও মনুষ্যসত্তার ঐকান্তিক অপমান ঘটেছে। সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যে এ অপমানের কোনও উল্লেখমাত্র নেই। বাৎস্যায়ন স্পষ্টই বলেছেন অর্থীর সন্ধানে যাওয়ার সময়ে গণিকা ভাল করে সাজগোজ করে যাবে 'কারণ সে পণ্যদ্রব্য'। (*কামসূত্র* ৬:১:৪) একটি ব্যক্তিকে দ্রব্যে পরিণত করার মধ্যে তো সমাজব্যবস্থারই কলঙ্ক; কিন্তু সে বোধের কোনও চিহ্নমাত্রও ছিল না। শিক্ষা এবং অর্থের অসম বণ্টনের ফলেই ব্যক্তি ও তার শ্রম হয়ে ওঠে অপরের ভোগ্যবস্তু। এই অসাম্য এক দিকে সৃষ্টি করেছে দাস, ক্রীতদাস, অন্য দিকে গণিকা। অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য যে, কুলবধূর অবস্থাও খুব ঈর্ষা করার মতো ছিল না— বহু সুযোগ-সুবিধা ও মানবিক মর্যাদা থেকে সে-ও বহু ভাবে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু সে বঞ্চনার বিনিময়ে গণিকার এই অতিরিক্ত কলঙ্ক ও গ্লানি থেকে সে মুক্ত ছিল, তার সঙ্গ প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ নয়, তার অন্নগ্রহণ করা চলত এবং তার স্পর্শও বর্জনীয় ছিল না (পরপুরুষের পক্ষে ছাড়া)।

গ্রিসে ও রোমে এরিস্টোফেনিস, মিনাণ্ডার বা টেরেন্সের নাটকে কিংবা সংস্কৃত ভাণগুলিতে গণিকা সম্পর্কে এত লাঞ্ছনার চিত্র নেই। কিন্তু 'ভাণ' হল সমাজের নিচের তলার সাহিত্য; হয়তো তাই তাদের পক্ষে যা বাস্তবে আছে, সমাজ যাকে নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছে, নিজের গরজে চালু রেখেছে তাকে স্বীকার করা আরও একটু সহজ হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের মূল সম্ভ্রান্ত ধারার মধ্যে ওই দ্বৈধমনস্কতা, গণিকার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য অথচ সমাজে যে গণিকা আছে তার স্বীকৃতি বারেবারেই দেখা দিয়েছে— দুটি আদি মহাকাব্যে ও পুরাণে তো বটেই, কালিদাস, ভারবি, মাঘ, নৈষধ, বল্‌হণ, ইত্যাদিতেও। অবৈধ প্রণয়ের হাজার হাজার সরস বিবরণ যেখানে অলংকারশাস্ত্রের প্রতি পৃষ্ঠা অলংকৃত করেছে সেখানে গণিকা সম্পর্কে এই কৃত্রিম উন্নাসিকতা কৌতুকাবহ। যে উচ্চতর শ্রেণির স্বার্থে সম্ভ্রান্ত সাহিত্য সৃষ্টি হয়, গণিকালয়ে যাওয়ার মতো বিত্ত তাদেরই আয়ত্তে এবং তারা তার প্রভূত্ব সদ্ব্যবহার করত এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ আছে।

এই দ্বৈধমনস্কতার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে, গণিকা যদি পাপীয়সীই হয় তো তার পাপের অর্থে দেওয়া দান তো সমাজের প্রত্যাখ্যান করাই উচিত— পাপের সংস্পর্শ পরিহার করার নীতিতে। কিন্তু বাস্তবে দেখি তার অর্থের ফল ভোগ করতে সমাজের কোনও দ্বিধা নেই। গণিকা অর্ধকাশী বহু জনহিতকর কাজে তার বিপুল সম্পত্তি দান করে এবং বহু অর্থ এনে বুদ্ধের

পদতলে অর্পণ করে। বুদ্ধ বা উপকৃত জনতা কেউই কিছু প্রত্যাখ্যান করেনি। জৈন গ্রন্থ *বৃহৎকল্পভাত*-এ দেখি এক গণিকা একটি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করেন, অন্যেরা দরিদ্রদের এবং জৈন মঠে প্রচুর অর্থ দান করেন। ধনী গণিকারা সেতু, কূপ, উদ্যান, মন্দির, মঠ, চৈত্য, কুঞ্জ, পুষ্করিণী, ইত্যাদি দিয়ে দেবদাসীর উপকার করেন। দেবদাসীরাও অনেকে জনহিতকর অনেক কাজ করেছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে গণিকা আম্রপালী বুদ্ধ ও তাঁর ভক্তদের উদ্দেশ্যে আম্রকানন দান করেন। বলাই বাহুল্য এ সবই সমাজের লোক যথাবিধি ভোগ করেছে যদিও এদের স্পর্শ করলে তাদের পাপ হত, এদের অন্ন গ্রহণ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত।

অসম্মান বঞ্চনা অত্যাচার ও লাঞ্ছনার মধ্যেই যারা জীবননির্বাহ করত তাদের পুরোপুরি মানুষ বলে কখনও গ্রহণ করা হয়নি। অথচ যে পুরুষ এত ধার্মিকমন্য, এত পুণ্যচরিত্র যে সে বারেবারে গণিকাকে পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছে সেই পুরুষেরই অপ্রতিহত কামনা নারীকে গণিকায় পরিণত করেছে। বহির্বাণিজ্যের দীর্ঘ পথটির ধারে ধারে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ জনপদ ও নগর। বিত্তবান ধনিকের হাতে সঞ্চিত হয়েছে উদ্বৃত্ত অর্থ। বিশেষত বাণিজ্য ও যুদ্ধের দায়ে যে পুরুষকে দীর্ঘদিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রবাসে থাকতে হয় সে তার উদ্বৃত্ত কাঁচা টাকার বিনিময়ে যেমন বিদেশে খাদ্যবস্তু ক্রয় করে তেমনই ভোগ্য নারীও ক্রয় করে। তারই আনাগোনার পথের দু'ধারে সমৃদ্ধ রাজধানী ও নগরে প্রতিষ্ঠিত হয় বিলাসের সাহচর্যে, তাকে নাম দেয় মুহূর্তিকা, ক্ষণকালের সঙ্গিনী। এবং এ সব প্রখ্যাত গণিকাপল্লীর থেকে অনেক দূরে নগরের ও গ্রামের প্রত্যন্তদেশে ছিল অপেক্ষাকৃত রূপযৌবনহীনা শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিতা কুলটা স্বৈরিণী বারাঙ্গনা। এদের আকর্ষণও যেমন কম উপার্জনও তেমনই কম। নিরাপত্তাও অনিশ্চিত। নিরাপত্তার জন্য যে সব আইন জরতী গণিকার জন্য সেই ভৃতির বা বৃত্তির ব্যবস্থা ওই অসহায় দরিদ্র উপহাস্য গণিকার হয়ে রাষ্ট্রের কাছ থেকে কে তাদের প্রাপ্য আদায় করবে? কাজেই ধরে নেওয়া চলে যে, এই প্রান্তবাসিনীদের জীবনে জীবনসংগ্রাম কঠোরতম রূপে দেখা দিত। যে দেশে কুলকামিনীর স্থান ছিল পুরুষের পায়ের তলায় সেখানে রূপযৌবনে ও শিক্ষাদীক্ষায় সমৃদ্ধা গণিকা যদিবা পেত ঘৃণামিশ্রিত এক জটিল আকর্ষণ, কিন্তু সহায় সম্বলহীনা কুরূপা বা বর্ষীয়সী বেশ্যার ভাগ্যে ছিল সমাজের পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও অবজ্ঞা এবং এরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। যে বৃত্তি কুলপুত্রের বা অন্য স্বাধীন পুরুষের কামনায় সৃষ্টি এবং তাদের নিরন্তর সাহচর্য ছাড়া সম্পূর্ণই অচল হয়ে উঠত, সেই পুরুষেরা সমাজে অর্থে শিক্ষায় ও প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠিতই থাকত বরং গণিকাসাহচর্য তাদের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলত, কিন্তু তারা যে গণিকার সাহচর্য করত তার ভাগ্যে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। রোগে, শোকে, নিঃসঙ্গতায়, বার্ধক্যের অক্ষমতায় নিরাপত্তার কোনও আশ্বাসই তার ছিল না, তার ওপরে ছিল সমাজে প্রায় অস্পৃশ্যতা এবং দুরপনেয় গ্লানি। সমাজ যেখানে নিজের স্বার্থে এই অত্যন্ত অসুস্থ এবং অপমানজনক বৃত্তিটিকে জিইয়ে রেখেছিল সেখানে গণিকা সম্বন্ধে তার কিছু দায়িত্বও ছিল যা সমাজ পালন করেনি।

টীকা

১. *দীঘনিকায়র* রাহুল সাংকৃত্যায়নকৃত হিন্দি সংস্করণ; বারাণসী, ১৯৩৬, পৃ. ৭৩-৭৪। মজ্ঝিমনিকায়, ঐ ১৯৬৪, পৃ. ২০-২৫, সংযুত্তনিকায় ৪৭:২০:২৩

২. *ধম্মপদটীকা*, পালি টেক্সট সোসাইটি, লন্ডন, ১৯০৬-১৪, পৃ. ৩০৮-৯

৩. শ্রী পি এল বৈদ্যের সংস্কবণের দিব্যাবদান, ২১৮ পৃষ্ঠা

৪. "There is every likelihood that their palatial establishments and gardens were state property with life interest." Moti Chandra, 1973. *The World of Courtesous*, Bombay, Vikash, p-48

মহাকাব্য *মহাভারত*

এ আলোচনার মুখ্য লক্ষ্য হল পৃথিবীর মহাকাব্যগুলির মধ্যে *মহাভারত*-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। আলোচনার প্রধান অংশটিতে এই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নির্ণয়ের চেষ্টা আছে। কিন্তু তার আগে কতকগুলি প্রাথমিক কথা আছে, মূলত *মহাভারত* রচনা প্রসঙ্গে। গত চল্লিশ বছর ধরে পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন যে, *মহাভারত* রচনায় অন্তত তিনটি স্তর আছে। এর প্রথমটি হল মূল ক্ষত্রিয়কাহিনি। তার পরে তার সঙ্গে সংযোজিত হল কতকগুলি চিরন্তন নৈতিক কাহিনি: দয়া, ক্ষমা, অহিংসা, আশ্রিতবাৎসল্য, সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংযম, ইত্যাদি চিরন্তন মানবিক গুণগুলিকে প্রতিপাদন করে এমন কিছু কাহিনি ক্ষত্রিয়কাহিনিতে সন্নিবিষ্ট হল। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকাহিনি যথেষ্ট পরিমাণ যশ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করার পরে মূল কাহিনিটিকে জনশিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করার উদ্দেশেই এই কাহিনিগুলির সংযোজন। এ কাহিনিগুলি বহু শতাব্দী ধরে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতস্তত গাথা ও আখ্যানরূপে লোকমুখে সঞ্চারণ করছিল; সেই কারণে সামান্য রূপান্তরে এদের দেখা পাই বৌদ্ধ ও জৈন ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে।

পণ্ডিতেরা বলেন *মহাভারত* রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের মধ্যে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল (যদি বাস্তবে সে যুদ্ধ কখনও ঘটে থাকে) মোটের উপর খ্রিস্টপূর্ব নবম শতকে। আখ্যানে গাথায় কাহিনিটি যখন ছোট ছোট খণ্ডে সাহিত্যিক রূপ পরিগ্রহ করছিল তখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, উপনিষদের ভাবধারা এবং নানা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানে ও বৈদেশিক আক্রমণে ভারতবর্ষের অন্তর্জগতে প্রকাণ্ড কতকগুলি ঢেউ এসে লাগছিল। এরই মধ্যে এক সময়ে মূল যুদ্ধকাহিনি মহাকাব্য রূপ পেল এবং নৈতিক কাহিনিগুলির সংযোগে নিটোল একটি আকৃতি ও প্রকৃতি লাভ করল, কারণ নৈতিক কাহিনি তো কোনও শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের নয়, চিরন্তন ও মানবিক; ফলে তার দ্বারা ক্ষত্রিয় কাহিনির স্বতন্ত্র চরিত্রটি নষ্ট হল না। মনে হয়, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের পূর্বেই এ দুটি মিলে একটি পূর্ণাবয়ব মহাকাব্য হয়ে ওঠে। খ্রিস্টিয় প্রথম ও চতুর্থ শতকের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের এক বিপুলায়তন সংযোজন শুরু ও শেষ হয়, একে বলা হয় ব্রাহ্মণ্য সংযোজন। কলেবরগত ভাবে যুদ্ধকাহিনি ও নৈতিককাহিনি মিলে সম্পূর্ণ *মহাভারত*-এর এক তৃতীয়াংশেরও কম, ব্রাহ্মণ সংযোজন দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি। এই শেষতম অংশে কিছু কিছু আছে মানুষের মুখে চলে আসা কয়েকটি অমর কাহিনি, যেমন রুরু-প্রমদ্বরা, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনি, রামোপাখ্যান, শকুন্তলা, দুষ্যন্ত কথা ইত্যাদি; এগুলি রসোত্তীর্ণ এবং সাহিত্যিক গৌরবে

সমৃদ্ধ। কিন্তু পরিমাণগত ভাবে এ ধরনের উপাখ্যান পুরো ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের খুব বড় অংশ নয়। বাকি অধিকাংশ কাহিনি সাম্প্রদায়িক দেবতার মহিমা, তীর্থমাহাত্ম্য, আচার অনুষ্ঠান, পতিব্রতাধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, কিছু দর্শন, দৈব, কর্ম ও জন্মান্তরবাদ এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণের মহিমাকীর্তন; অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে রুষ্ট করলে কী ভয়াবহ পরিণতি হয় এবং তুষ্ট করলে ইহলোকে-পরলোকে কী রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য হয় তার বিবরণ। সাহিত্যিক নিরিখে এ অংশের রচনা নিকৃষ্ট, বিষয়গত ভাবে একে বলা যায় অভিপৌরাণিক, অর্থাৎ যে ধরনের কথা পরবর্তী যুগে পুরাণ নামে স্বতন্ত্র সাহিত্য হয়ে উঠবে তারই সূচনা এতে।

পুনের সংশোধিত সংস্করণে মহাভারতে পঁচাশি হাজারেরও বেশি শ্লোক আছে, আঞ্চলিক সংস্করণের কোনও কোনওটিতে তার চেয়ে অনেক বেশি শ্লোক ছিল, তাই মহাভারতের একটি নাম শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকী। (২১৪ গুপ্ত সনে অর্থাৎ ৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাগেলখণ্ডে রাজা সর্বনাথের খোহ শিলালিপিতে *মহাভারত*-কে শতসাহস্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফ্লিট-এর *কর্পাস অব ইনস্ক্রিপশন্স*, ৩য় খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)। মহাভারত রচনা যে তিনবার সম্পূর্ণ হয় সে কথা মহাভারতেই আছে: চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্/ উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।। (১:১:৬১) ক্ষত্রিয় কাহিনির আদি সংস্করণে চব্বিশ হাজার শ্লোক ছিল (লক্ষণীয়, *রামায়ণ*-এও চব্বিশ হাজার শ্লোক)। অন্যত্র শুনি: মন্বাদি ভারতং কোচিতাস্তীকাদি তথাপরে/তথোরিচরাদন্যে বিপ্রাঃ সমগধীয়তে।। (১:১:৫০) দেখতে পাচ্ছি, মনুর কাহিনি দিয়ে আরম্ভ বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে আস্তিকের কাহিনি দিয়ে শুরু আদিপর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে এবং উপরিচর থেকে শুরু ছাপ্পান্ন অধ্যায় থেকে; তিনটি আরম্ভ তিনবারের। অধ্যাপক সুখ্‌থংকর বলেন, শেষবারের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের রচয়িতা ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণরা। (ভি এস সুখথংকর: *ক্রিটিকল স্টাডিজ ইন দ্য মহাভারত*। পুনা/১৯৪৪)

প্রথম ক্ষত্রিয়কাহিনি— যেটি আদি ও অকৃত্রিম বীরকথা— তার নাম ছিল *জয়*, এটি ছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটি কাব্যময় ইতিহাস। অথবা, রচনার পরে যখন ইতিহাসটি কাব্যগুণে ভাস্বর হয়ে উঠল তখন মানুষ তার নাম দিল *জয়*: 'জয়ো নামেতিহাসোহয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা-- 'যিনি জয়কামনা করেন এই জয় নামক ইতিহাস তাঁর শোনা উচিত।' (১:৫৬:১৯) কিছু পরে শুনি: 'যথা সমুদ্রো ভগবান যথা চ হিমবান গিরিঃ/খ্যাতুবুভৌ রত্ননিধি তথা ভারতমুচ্যতে।।— ভগবান সমুদ্র ও হিমাচল যেমন রত্ননিধি, তেমনই রত্ননিধি ভারত।' (১:৫৬:২৭) মনে হয় ক্ষত্রিয়কাহিনি ও নৈতিককাহিনির সংযোগে মহাকাব্য যে-রূপটি পরিগ্রহ করে তাকেই ভারত নাম দেওয়া হয়েছে। বাকি সর্বত্রই এর নাম *মহাভারত*: 'ত্রিভির্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ/মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমুত্তমম।।— তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি এই উত্তম *মহাভারত* রচনা করেন।' (১:৫৬:৩২)

নানা ভাবেই *মহাভারত*-এর তিনটি পর্যায়ের কথা উঠেছে এবং মিলিয়ে দেখলে মনে হয় চব্বিশ হাজার শ্লোকে *জয়* নামক যুদ্ধকাহিনি রচনা করে ব্যাস তাঁর চার শিষ্যকে শোনান

ও প্রধান শিষ্য শুক বৈশম্পায়নকে বিশেষ করে শেখান (বিশম্পার পুত্র শুক; ভাবে কণ্ঠস্থ করতে পারতেন বলেই কি শুক নাম?)। তার পরে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে ঋষি ও ব্রাহ্মণদের অনুরোধে বৈশম্পায়ন সে কাহিনি বিবৃত করেন। মনে হয়, এই সময় মহাকাব্যে যুক্ত হয়েছিল ঋষিকাহিনিগুলি— যেগুলি চিরন্তন মানবিক গুণ ও নীতিকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশে রচিত। যুদ্ধ তখন দূর অতীতের স্মৃতি, কিন্তু সেই জনপ্রিয় যুদ্ধকাহিনির সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের কাহিনিগুলোকে যুক্ত করে সমগ্র কাব্যটিকে জনশিক্ষার বাহন করে তোলা হল; এবার তার নাম হল *ভারত*, ভারতবংশের ইতিহাস। এই কাব্যটি রসোত্তীর্ণ সুসংহত একটি কাহিনি, এটি লোকমুখে ছড়াতে লাগল কয়েক শতাব্দী ধরে। গুপ্তযুগের সূচনার দুই এক শতাব্দীর মধ্যে এর শেষতম, অর্থাৎ বর্তমান রূপটি নির্মিত হয় ভৃগুবংশীয় উগ্র ব্রাহ্মণদের হাতে; সাম্প্রদায়িক দেবতা ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাঠোর অনুশাসন-সংবলিত দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট রচনা এই ব্রাহ্মণ সংযোজন। এ অংশে উগ্র ব্রাহ্মণ্যতার নীরস অংশ পরিণামে এত বেশি যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকেই অবজ্ঞাভরে *মহাভারত*-কে 'শিথিলকলেবর অপাঠ্য গ্রন্থ' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আগেই বলেছি, এই প্রক্ষেপেরও একটি অংশে আছে কয়েকটি অমর কাহিনি যা শিল্পোত্তীর্ণরূপে জনমানসে দীর্ঘকাল প্রোথিত ছিল, এবার গাথা-উপাখ্যানের বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করে মূল কাহিনির সঙ্গে তাদের গেঁথে দেওয়া হল। এই সংযোজন খ্রিস্টিয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকেই মোটের ওপর শেষ হয়েছিল, যদিও আঞ্চলিক প্রক্ষেপ হয়তো আরও কিছু কাল ধরে চলেছিল। এই শেষ কাব্যরূপটির আখ্যাতা সৌতি উগ্রশ্রবা লোমহর্ষণি (লোমহর্ষণের পূত উগ্রশ্রবা), যিনি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়নের *ভারত*-কাব্য আবৃত্তিকালে একজন শ্রোতা ছিলেন। শৌনকের দ্বাদশবর্ষব্যাপী সোমযাগ সত্রে সমবেত জনতার অনুরোধে ইনি এই বিপুলকলেবর কাব্যটি শোনান; তখন এর নাম *মহাভারত*। মোটের ওপরে আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বের সামান্য অংশ এবং উদ্যোগ থেকে স্ত্রী পর্ব পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে হল *জয়*, অর্থাৎ প্রথম ক্ষত্রিয় মহাকাব্যের রূপ। *ভরত* অংশে এই পর্বগুলির মধ্যে এবং হয়তো শান্তিপর্বের কিছু অংশের নৈতিক কাহিনিগুলি অনুপ্রবিষ্ট হয়। আদি থেকে বিরাটের বাকি অংশ এবং শান্তি থেকে স্বর্গারোহণ সম্পূর্ণতই দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের সংযোজন, তার পরে এর নাম *মহাভারত*।

মহাভারত নিজেকে অন্য অনেক নাম দিয়েছে, কিন্তু কখনও মহাকাব্য বলেনি; একবার শুধু বলেছে, কাব্যং পরমপূজিতম (১:১:৬১); মহাকাব্য আখ্যাটি পরবর্তী যুগের প্রণতি সূচিত করে। *মহাভারত* নিজের সম্বন্ধে বলেছে, 'অর্থশাস্ত্রমিদং পুণ্যং ধর্মশাস্ত্রমিদং পরম/মোক্ষশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতে বুদ্ধিনা।। *মহাভারত* নিজেকে অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র' বলে অভিহিত করেছে।' (১:৫৬:২১) নিজেকে পুরাণও বলেছে: দ্বৈপায়নেন্ যৎ প্রোক্তং পুরাণং পরমর্ষিণা; (১:১:১৫) বলেছে ইতিহাস, ভারতস্যেতিহাস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্; (১:১:১৭) অথবা, ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসূতঃ; (১:১:৫২) বলেছে সংহিতা, সংহিতা শ্রোতুমিচ্ছামো ধর্মাং পাপভয়াপহাম; (১:১:১৯) বলেছে বেদ, বেদমিমং বিদ্বান; (১:১:২০৫)

বলেছে উপনিষদ, অত্রোপনিষদং পুণ্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোহব্রবীৎ (১:১:১৯১); আর বলেছে আখ্যান, যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান সাঙ্গোপনিষদান্ দ্বিজঃ/ন চাখ্যানমিমং বিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ ।।(১:১:২৩৫) কিংবা ইদং সর্বৈঃ কবিবৈরাখ্যানমুপজীব্যতে (১:১:২৪১), অর্থাৎ শাস্ত্রগ্রন্থ ও ইতিহাসরূপেই মহাভারত পরিচিত হতে চেয়েছে। কারণ, তখনকার ভারতবর্ষ জ্ঞান ও উপলব্ধির যে দুটি প্রকাশকে চিনত— শাস্ত্র ও ইতিহাস, সেই দুটি আখ্যাই সে মহাভারতকে দিয়েছে। কয়েক শতাব্দী পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন স্মৃতি ও কিংবদন্তীতে পর্যবসিত ও শতশত উপাখ্যানে পল্লবিত, তখন স্বভাবতই সমস্ত মহাকাব্যটিকেই একটি সুবিস্তৃত আখ্যান বলে মনে হবে; আখ্যান ছিল ইতিহাসেরই অঙ্গ।

মহাভারত রচনা করে ব্যাস তাঁর চার শিষ্য পৈল, জৈমিনি সুমন্ত ও বৈশম্পায়নকে শোনান ও বৈশম্পায়নকে বিশেষ ভাবে শেখান। ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্বং শুকমধ্যাপয়দ্দিবজঃ; (১:১:৬৩) নারদ শোনান দেবতাদের, অসিত দেবল পিতৃপুরুষদের, আর শুক গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষসদের— নারদোহশ্রাবয়দ্দেবানসিতো দেবলঃ পিতৃন/গন্ধর্বযক্ষরক্ষংসি শ্রাবয়ামাস বৈ শুকঃ। (১:১:৬৪)/এ গ্রন্থের মহিমা বোঝাতে বলা হয়েছে, চত্বার একতো বেদা ভারতং চৈবমেকতঃ— 'একদিকে চারটি বেদ আর একটি মহাভারত' (১:১:২০৮); অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বেদ ও *মহাভারত* তুল্যমূল্য। এতে কী আছে? ভারতানাং মহজ্জন্ম মহাভারতমুচ্যতে; (১:৫৬:৩১) অথবা, কুরুণাং চরিতং মহৎ— ভরতবংশের বা কুরুকুলের মহনীয় চরিতকথাই *মহাভারত*।' (১:৫৬/১)

মাত্র একটি স্থানে *মহাভারত*তার নামের ব্যুৎপত্তি বলেছে: মহত্ত্বাদ্ভারত্বচ্চ মহাভারতমুচ্যতে— মহত্ত্ব এবং ভারততত্ত্ব থাকার জন্যেই এর নাম মহাভারত।' (১:১:২০৯) স্পষ্টতই ব্যুৎপত্তি নির্বাচন বা ব্যাকরণশাস্ত্রমতে এটা ভুল, কারণ ভারবত্ত্ব থেকে 'ভারত' হতে পারে না। তবে কেন একথা বলা হয়েছে? এখানে ছন্দে, কিছু গদ্যেও সংলাপে, বর্ণনায়, আখ্যানে, নাটকীয় ঘটনার বর্ণনায় কাহিনির বিবরণে, তর্কে, উপদেশে, প্রহেলিকায়, তত্ত্বলোচনায়, নানা ভঙ্গি ও বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তুর সমাবেশ। এছাড়া কলেবরগত ভাবে, বিষয়মাহাত্ম্যে, স্থানের পরিসরে, কালের ব্যাপ্তিতে, নানা জাতি উপজাতির উপাখ্যানে মহৎ এক যুদ্ধবর্ণনায়, মহৎ এক বংশের অভ্যুত্থান, সমৃদ্ধি ও অবক্ষয়ে বর্ণনায় এর মহত্ত্ব তো স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু ভারবত্ত্ব? এও কি সেই বিস্তার, ইত্যাদিরই ভার? তা মনে হয় না; মনে হয় এত ভার— গুরুত্বের, গৌরবের, ব্যাপ্তির গভীরতার— পৃথিবীর আর কোনও মহাকাব্যেই নেই। সেই জন্যে ভ্রান্তি ব্যুৎপত্তি দিতেও দ্বিধা নেই কবির। তাঁর এ সাহসের কারণ হল, ব্যাকরণে না হোক অন্য স্তরে এই ভারবত্ত্ব শব্দটি চূড়ান্ত সার্থকতায় মণ্ডিত।

মহাকাব্য কাকে বলে সে সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই খানিকটা ধারণা আছে। তবু সামান্য সমালোচনার প্রয়োজন এই জন্যে যে *রঘুবংশ*, *প্যারাডাইস লস্ট*ও মহাকাব্য, আবার *মহাভারত*ও মহাকাব্য। অথচ এদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য আছে এবং হয়তো সে পার্থক্যেরও নানা পর্যায় আছে। পরবর্তীকালের মহাকাব্যগুলির মধ্যে *রঘুবংশ*, *কুমারসম্ভব*, *রাবণবধ*,

কিরাতার্জুনীয়, *শিশুপালবধ*, *বেও উলফ*, *প্যারাডাইস লস্ট*, *ফাউস্ট*ও দ্বাদশ শতকের স্পেনের (রাড্রিগো ডিয়াথ অব হ্বিহ্বার-এর) *এল সিড*, ইত্যাদি একটি স্তরের, পরস্পরের মধ্যে বেশি কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও। এগুলির ঊর্ধ্বে হয়তো দ্বাদশ শতকে অস্ট্রিয়ায় রচিত জার্মান মহাকাব্য *নিবেলুঙ্গেনলিড*, কয়েক শতাব্দী পরের ফিনল্যান্ডের *কালেহ্বালা*, নরওয়ের *সাগাগুলি*, দশম শতকের স্ক্যান্ডিনেভিয়ার গদ্য *এজ্জা* ও পরবর্তী কালের ছন্দ-*এড্ডা*। এগুলির ঊর্ধ্বে স্থান হয়তো খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের ভার্জিলের *ঈনীড* এবং কাব্যমূল্যে এরই সগোত্র হয়তো খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে রচিত পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য সুমেরীয় *গিলগামেশ*। কাব্যের দিক থেকে বাল্মীকির *রামায়ণ* ও হোমারের *অডিসি* সম্ভবত এগুলির ঊর্ধ্বে স্থান পায় এবং তাদের ঊর্ধ্বে *ইলিয়াড*। কিন্তু মনে হয়, তারও বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত *মহাভারত*। জানি, এ স্তরবিন্যাস নিরাপদও নয়, নিরঙ্কুশও নয়; শুধু বলতে চাই, মহাকাব্য হিসেবে *মহাভারত* পৃথিবীর আর সব মহাকাব্যের বহু ঊর্ধ্বে। কিসে? মহাত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ।

বিষয়গাম্ভীর্য, বর্ণনাকৌশল, চরিত্রচিত্রণ ইত্যাদিতে অন্যান্য দেশের মহাকাব্যও যথেষ্ট উৎকর্ষের পরিচয় দেবে। *প্যারাডাইস লস্ট*-এ স্যাটান ও ঈশ্বরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে অবশ্যই যথেষ্ট মহনীয়তা আছে; দুটি চরিত্রই বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। *রঘুবংশ*-তে একটি বংশের বিমূর্ত কল্পনা নায়কের স্থান নিয়েছে এবং ধীরে ধীরে বীররস পৌঁছেছে উদাস শোক ও চূড়ান্ত অবক্ষয়ের গ্লানি ও বিষণ্ণতায়। *নিবেলুঙ্গেনলিড*-এ, শৌর্য, সম্মানবোধ, প্রতিহিংসা ইত্যাদি বীরকাহিনির উপজীব্যের মাধ্যমে একটি গৌরবযুক্ত জীবনবোধ ফুটে উঠেছে। গদ্য *এড্ডা* ও *গিলগামেশ*-এ সৃষ্টিতত্ত্ব ও মানুষের জীবন সম্বন্ধে ভূয়োদর্শিতা ও কাব্যগত মহিমা অবশ্যই আছে। দান্তের *দিহিনা কম্মেদিয়া* ও *ইনফের্নো*-তে মরণোত্তর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধ ও জীবনের নানা উপলব্ধির সার্থক তাৎপর্যপূর্ণ রূপায়ণ আছে। যেমন *ঈনিড*-এ রোম রাজ্য গঠনের প্রাক-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বীর ঈনিয়াসের নিঃসঙ্গ, আপাতবঞ্চিত জীবনপরিক্রমার কাহিনি গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত। *রামায়ণ*-এ এবং *অডিসি*-তেও নানা বঞ্চনার আবহের মধ্যে দুটি বীরের চরিতকথায় আশ্রয় পেয়েছে বেশ কিছু চিরন্তন উপাদান। *ইলিয়াড* তাৎক্ষণিক আবেদনগুলিকে অতিক্রম করে আমাদের নিয়ে যায় নানা বীরের জীবনের উত্থানপতনের অন্তরালে নিহিত কয়েকটি মানবিক সত্যের সীমানায়।

আর *মহাভারত*? কাব্যমূল্যেই সে অনন্য। মনে রাখতে হবে, দুই তৃতীয়াংশের বেশি যে ব্রাহ্মণ্য সংযোজন তার অধিকাংশই কাব্যমূল্যে যৎসামান্য; তা সত্ত্বেও *মহাভারত* কাব্যমূল্যেই অনুপম। সেই কাব্যমূল্যের কয়েকটি দিক দেখাবার চেষ্টা এ প্রবন্ধে। প্রকৃতিবর্ণনাই হোক আর মানুষের রূপবর্ণনাই হোক, শুধু বর্ণনামাহাত্ম্যে কোনও কাব্য মহাকাব্য হয়ে ওঠে না। তবু বর্ণনার বিভিন্ন ধরনের উৎকর্ষ সব মহাকাব্যেই আছে। *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও হোমারে এর একটি স্বতন্ত্র স্বাদ আছে: বর্ণনা সেখানে সতেজ, স্পষ্ট, সবল; ঋজুতাই তার বৈশিষ্ট্য। কখনও কখনও বিচিত্র অভিজ্ঞতার একত্র সমাবেশের ফলে এই বর্ণনাগুলিতে নতুন একটি মাত্রা আসে। *মহাভারত*-এর প্রকৃতি বর্ণনায় এমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই যা *রামায়ণ*-এ বা পুরাণে

অনুপস্থিত। নদীগিরিবন, সূর্যচন্দ্রের উদয়-অস্ত, দুর্গম, ভয়াল অরণ্য, উত্তুঙ্গ পর্বত এবং প্রকৃতির কান্তকোমল রূপ প্রসঙ্গক্রমে বহুবার *মহাভারত*-এ বর্ণিত হয়েছে। কখনও কখনও দু-একটি বর্ণনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে; যেমন, 'দেবদারুবনরাজি যেমন মেঘকে ধরবার জন্যে পাতা একটি জাল— বনানি দেবদারুণআং মেঘানামিব বাগুরা।' (৩:১৭৮:১০) হোমারের মতো *মহাভারত*-এও কয়েকটি অপরিবর্তিত বিশেষণ বা বিশেষণাশ্রিত বাক্যাংশ বর্ণনাকে মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত করে তোলে। ভীষ্মের শৌর্যব্যঞ্জক আকৃতি, অর্জুনের বীরকান্তি, ভীমসেনের প্রাকার-তোরণের মতো স্কন্ধদেশ ও বলিষ্ঠ বাহু, যুধিষ্ঠিরের স্থির গম্ভীর ভাব, গান্ধারীর তেজস্বিনী মূর্তি ছোটখাট, বিশেষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সত্যবতী অসিতলোচনা, কালো তাঁর চোখ দুটি। প্রমদ্বরা জ্বলন্তীমির চ শ্রিয়া, সৌন্দর্যে যেন জ্বলছে তাঁর দেহকান্তি। শকুন্তলা শ্রীরিব রূপিণী শ্রীমতী চারুহাসিনী। জুয়ায় দ্রৌপদীকে পণ রাখবার সময়ে যুধিষ্ঠির তাঁর বর্ণনা করেছেন: নৈব হ্রস্বা ন মহতী ন কৃশা নাতিরোহিণী/ নীলকুঞ্চিতকেশী চ.../ শারদোৎপলপত্রাক্ষ্যা শারদোৎপলগন্ধয়া/ শারদোৎপলসেবিন্যারূপেণ সীসমানয়া ।।(২:৬৫:৩৩, ৩৪)— তিনি শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী নীলকুঞ্চিতমূর্ধজা।... নীলোৎপলসমো গন্ধো যস্যাঃ ক্রোশাৎ প্রবায়তি (১:১৫৫:৪২, ৪৩), শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশনেত্রা, নীল তরঙ্গিত কেশ, নীলপদ্মের সুরভি যেন লেগে আছে তাঁর সর্বাঙ্গে।' দুঃশাসন দ্যুতসভায়— দীর্ঘেষু সীলেস্বথ চোর্মিমৎসু জগ্রাহ কেশেষু নরেন্দ্রপত্নীম— দীর্ঘ নীল ঢেউ-খেলানো কেশরাশি ধরে রাজবধূ দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করেছিলেন।' (২:১৭:২৯) এই দীর্ঘদেহ শ্যামাঙ্গী নীলকুঞ্চিতকেশা মেয়েটিকে যেন চোখে দেখা যায়। দ্রৌপদীর বর্ণনায় তাঁর দীর্ঘ দেহ, তরঙ্গিত কেশ, নীলপদ্মের মতো চোখ, অঙ্গে পদ্মগন্ধ আর নীলপদ্মের নানা অনুষঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে। স্বর্গে গিয়ে যুধিষ্ঠির যখন তাঁকে দেখলেন তখনও তিনি কমলোৎপলমালিনী, জানালেন তিনি স্বয়ং পদ্মা। অর্থাৎ কবির মনের মধ্যে শ্যামাঙ্গী দীর্ঘদেহা পদ্মনেত্রা দ্রৌপদীর রূপের সঙ্গে কোথায় যেন নীলপদ্মের শোভা মিশে গিয়েছিল।

মহাভারতের বর্ণনায় মাঝে মাঝে সামান্য অলংকারের স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বর্ণনীয় বস্তু: যুদ্ধের সময়ে কুরুকুল ভস্ম হয়ে যাচ্ছে অর্জুনের শরবর্ষণের প্রবলতায়— মহাবনে মৃগগণা দাবাগ্নিত্রাসিতা যথা— যেন মহাবনে দাবাগ্নির ভয়ে ব্যাকুল জন্তুরা।' (৮৮:৮০:১৯) অথবা সঞ্জয় বলছেন, 'বিশাল পর্বতগাত্রে বেণুবন যেমন দাবানলে রাত্রে জ্বলে ওঠে, সশব্দে ফেটে যায় বাঁশগাছগুলো, তেমনই ধৃতরাষ্ট্র, তোমার পক্ষের সৈনিকরা শরপীড়িত হয়ে বিনষ্ট হচ্ছে— মহাগিরৌ বেণুবনং নিশি প্রজ্বলিতং যথা/তথা তব মহাসৈন্যং প্রাস্ফুটচ্ছরপীড়িতম।। (৮:৮০:৮০) ভীষ্মের কাছে ভীষ্মের মৃত্যুর উপায় জানতে চাইলেন যুধিষ্ঠির; ভীষ্ম উত্তর দিলেন; মৌন ভাবে, 'যেন পরলোকে যাওয়ার জন্য দীক্ষিত হয়ে— তথোক্তবতি গাঙ্গেয়ে পরলোকায় দীক্ষিতে। (৬:১০৭:৯০) সঞ্জয় যুদ্ধরত দ্রোণের বর্ণনা করেছেন দুর্যোধনের কাছে: আকর্ণপলিতশ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ/রণে পর্যচরদ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ।। 'পঁচাশি বছর বয়স দ্রোণের কানের কাছে পর্যন্ত চুল পেকে গেছে; দুর্যোধন, এই বৃদ্ধ (তোমার জন্যে)

যোলো বছরের কিশোরের মতো যুদ্ধ করছেন।' (৭:১৬৫:১০৩) কৃপ কর্ণকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ধৃষ্টতা: 'ডান হাত তুলে তর্জনী দিয়ে ক্রুদ্ধ বিষাক্ত সাপের মুখ খুলে তাঁর বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে চাইছ?— আশীবিষস্য ক্রুদ্ধস্য পারিখমুদ্যম্য দক্ষিণম/অবমুচ্য প্রদেশিন্যা দংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি।' (৪:৪৯:১৩) রূপকটি বিবক্ষিত বিষয়টিকে যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষগোচর করে তুলেছে। যুদ্ধে দ্রোণ 'নির্ধূম অগ্নির মতো জ্বলতে লাগলেন।— ররাজ স মহারাজ বিধূমোগ্নিরি জ্বলন।' (৮:১৯:৩৫)

যুদ্ধ করতে করতে যখন ক্ষত্রিয়বীরের মৃত্যু হয় তখন *মহাভারত*-এ বারেবারেই বর্ণনা পাই— বসন্তকালে ফুলে ভরে-ওঠা একটি বনস্পতি যেন ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল। কর্ণের পুত্র বৃষসেনের মৃত্যুর বর্ণনা: স পার্থবাণাভিহতঃ পপাত রথাদ্বিবাহুর্বিশিরা ধরায়াম/সুপুষ্পিতো বৃক্ষবরোহকিতায়ো বাতেরিতঃ শাল ইবাদ্রিশৃঙ্গাৎ॥— নববসন্তে ফুল ফোটা প্রকাণ্ড একটি শালতরু যেন গিরিশৃঙ্গ থেকে উন্মূলিত হল।' (৮:৮৫:৩৬ বঙ্গবাসী সংস্করণ। সংশোধিত সংস্করণে বর্জিত হলেও বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় বঙ্গবাসী সংস্করণে পাঠ থেকে এ প্রবন্ধে মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন মতো উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। বিশেষত প্রখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ এই পাঠেরই টীকা করেছেন। বঙ্গবাসী বলে উল্লিখিত না হলে বাকি সমস্ত উদ্ধৃতিই পুনে সংশোধিত সংস্করণ থেকেই দেওয়া হয়েছে।) কর্ণের মৃত্যু: তদুদ্যদাদিত্যসমানর্বচং শরন্নভোমধ্যগভাস্করোপমম/ বরাঙ্গমূর্ব্যামপতচ্চমুপতের্দিবাকরোহস্তাদিব রক্তমণ্ডলঃ॥ (৮:৬৭:২৪)... যথা কদম্বকুসুমং কেশরৈঃ সর্বতো বৃতম/চিতং শরশতৈঃ কর্ণং ধর্মরাজো দদর্শ সঃ ॥ (৮:৯৬:৩৩ বঙ্গবাসী)— মাঝ-আকাশ থেকে নির্মেঘ শরতের উজ্জ্বলন্ত সূর্যমণ্ডল যেন রক্তাক্ত হয়ে অস্তাচলে ঢলে পড়ল. যেন কেশরাচ্ছন্ন কদম ফুল মাটিতে খসে পড়ল।' ভীম ও দুর্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাক্ত দেহে যুদ্ধ করছেন: দদৃশাতে হিমবতি পুষ্পিতৌ কিংশুকাবিব (৯:৫৭:৩১)— হিমালয়ে (লাল) ফুলফোটা দুটি কিংশুকতরুর মতো দেখাচ্ছে দুজনকে। বারে বারে ক্ষত্রিয় বীরের মৃত্যুর সঙ্গে বসন্তের ফুলফোটা কর্ণিকার, কিংশুক, শাল্মলী, অশোক বা পলাশের মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপমা পাই। বসন্তের পুষ্পতরুর চূড়ান্ত সার্থকতা তার রক্তপুষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে বিকশিত হয়ে ওঠার লগ্নে, তেমনই ক্ষত্রিয়বীর যখন সর্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাতের রক্তাক্ত চিহ্ন নিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে দিন তারও চরম সার্থকতার লগ্ন।

ভরদ্বাজের শরবর্ষণে পীড়িত পাণ্ডবরা কাঁপছে, 'যেমন কাঁপে শীতকালে কৃশ গাভীরা— শিশিরে কাম্পমান বৈ কৃশা গাব ইব প্রভো। (৭:১৩০:৬)। ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জপর্বার নিষ্প্রাণ দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে গেল, 'যেন দুর্ভাগার ব্যর্থ মনোরথের মতো— অভাগ্যস্যৈব সংকল্পস্তন্মোঘমপতদ্ভুবি। (৭:১৫৪:৭৯ বঙ্গবাসী) যুদ্ধে সেনাপতি কর্ণের ওপরেই যখন কৌরবদের সমস্ত ভরসা তখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হলে সকলে তাঁকে দেখল 'যেমন করে শীতে কাতর মানুষ দেখে সূর্যকে— শীতার্তা ইব ভাস্করম। (৮:২২:১৪) এর মধ্যে সূর্যের উপমাটিতে ব্যঞ্জনাও আছে, কারণ কর্ণ সূর্যেরই সন্তান। অর্জুন কর্ণকে বিদ্রূপ করে বলছে, 'শৃগালও যদি বনে শশ-পরিবৃত হয়ে বাস করে তবে সে নিজেকে সিংহ বলে মনে

করে; কিন্তু কতক্ষণ? যতক্ষণ সিংহকে না দেখে— শৃগালোহপি বনে কর্ণ শশৈঃ পরিবৃতো বসন/মন্যতে সিংহমাত্মানং যাবৎ সিংহং ন পশ্যতি।।' (৮:২৭:৪৫)। নকুল বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে দুঃখসন্তপ্ত হয়ে সরবে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন 'যেন কলসীর মধ্যের সাপ— কুম্ভস্থ ইব পন্নগঃ।' উদ্যোগপর্বে বিদুর উপাখ্যানে বিদুর তাঁর নিশ্চেষ্ট পুত্র সঞ্জয়কে ধিক্কার দিয়ে বলছেন, 'অলাতং তিন্দুকস্যেব মুহূর্তপতি হি জ্বল/মা তুষাগ্নিরিবানর্চির্ধূমায়স্ব জিজীবিষুঃ।।— তিন্দুক (কেন্দু) কাঠের আগুনের মতো অন্তত এক মুহূর্তও সতেজে জ্বলে ওঠ, শুধু বেঁচে থাকতে চেয়ে তুষের আগুনের মতো স্ফুলিঙ্গহীন ভাবে দীর্ঘকাল ধূমায়িত হয়ো না।' (৫:১২৬:১৮) ক্ষত্রিয়পুরুষের নিশ্চেষ্টতায় ক্ষত্রিয়নারীর ক্ষুব্ধহৃদয়ের সমস্ত ধিক্কার ওই দুটি উপমায় প্রকাশিত। স্ত্রীপর্বে মৃত দ্রোণাচার্যকে দেখে গান্ধারী বলছেন, 'প্রচণ্ড অগ্নির মতো যিনি শত্রুসেনা দহন করতে করতে এগিয়ে যেতেন, তিনি আজ নিহত হয়ে ভূপতিত, যেন নির্বাপিত অগ্নি— শান্তর্চিরিব পাবকঃ।' (১১:২৩:৩০) স্বর্গারোহণপর্বে মৃত যোদ্ধাদের বিষয়ে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রকে প্রশ্ন করছেন, 'আর সেই সব মহারথ যোদ্ধারা কোথায় যাঁরা যুদ্ধের আগুনে শরীর আহুতি দিলেন?— জুহুবুর্যে শরীরানি রণবহ্নৌ মহারথাঃ।' (১৮:২:২) যুদ্ধের সঙ্গে বারেবারেই অগ্নি, অগ্নিকাণ্ড ও দাবানলের উপমা দেখা দিয়েচে, এর তাৎপর্য পরে আলোচনা করছি।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দুর্যোধন এক নিরস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধ করতে করতে বলছেন সর্বোপকরণৈহীনং বর্মশস্ত্রাদিবর্জিতম্/একাকিনং যুধ্যমানং পশ্যন্তু দিবি দেবতাঃ।।— বর্ম, অস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত উপকরণ চলে গেছে, তবু আমি একাকী যুদ্ধ করছি, আকাশের দেবতারা চেয়ে দেখুন আমাকে।' (৯:৩৩:৫৩) এই শৌর্যে দুর্যোধন সে দিন যেন দেবতাদেরও অতিক্রম করে গেলেন। শিখণ্ডির আড়াল থেকে অর্জুন শরনিক্ষেপ করছেন, ভীষ্ম অস্ত্রত্যাগ করে বললেন, 'এ বাণ ত শিখণ্ডীর নয়, এ অর্জুনের; কাঁকড়াবিছের ছানা যেমন করে মাকে দংশন করে মেরে ফেলে সেই ভাবে এ বাণ আমার মর্মমূল বিদ্ধ করছে।' (১২:১১৯:৬৫ বঙ্গবাসী)। অপত্যধর্ম পদদলিত, আড়াল থেকে অর্জুন পিতামহকে মৃত্যুবাণ হানছেন, তাই এ বাণের বিষ শুধু ভীষ্মের শরীরকে নয়, তাঁর হৃদয়কেও বিদ্ধ করছে দুঃসহ জ্বালার যন্ত্রণায়।

সম্পূর্ণ নিরালংকার কবিত্ব, হৃদয়াবেগের কাছে যার সরাসরি আবেদন নেই, তেমন নিদর্শনও মহাভারতে প্রচুর পাই। শল্যপর্বে বলরাম অর্জুনকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন: 'অন্যায় ভাবে ধার্মিক রাজা দুর্যোধনকে হত্যা করে তুমি পৃথিবীতে অপযশস্বী হবে শঠ যোদ্ধা বলে— হত্বাধর্মেণ রাজানং ধর্মাত্মানং সুযোধনম্/ জিষ্মযোধীতি লোকেহস্মিন্খ্যাতিং যাস্যসি পাণ্ডব।।' ৯:৫৯:২৩) যুদ্ধকালে দ্রোণ অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ শুনে যখন উন্মাদের মতো পাণ্ডবদের হত্যা করে চলেছেন তখন ভীম তাঁকে বলেছেন: 'একটি পুত্রের মৃত্যুর প্রতিহিংসায় অধর্মপথে বহু সৈন্য হত্যা করছেন, ক্ষাত্রধর্মে থেকে যাঁরা যুদ্ধ করছেন আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করছেন, আপনার লজ্জা হয় না, আচার্য?— একস্যার্থে বহূন্ হত্বা পুত্রসাধর্মবিদ্যয়া/স্বকর্মস্থান বিকর্মস্থো ন ব্যাপত্রপসে কথম্।।'(৭:১৬৫:২১)। যুদ্ধের শেষদিন দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন:

গচ্ছ ভুঙ্ক্ষ ত্বং রাজেন্দ্র পৃথিবীং নিহতেশ্বরাম্/হতযোধাং নষ্টরত্নাং ক্ষীণবপ্রাং যথাসুখম্।।— পৃথিবীর যশস্বী রাজারা ও যোদ্ধারা আজ মৃত। বসুন্ধরার ঐশ্বর্য নিঃশেষিত, এর পরিখাও নষ্ট হয়ে গেছে; যাও মহারাজ, এই পৃথিবীকে যথেচ্ছ ভোগ করে সুখী হও।' (৮:৩১:৫১) এ কথায় কি শুধুই শ্লেষ? এক ধরনের অতলান্ত বিষাদ, গ্লানি ও আত্মধিকারও তো এতে ধ্বনিত হচ্ছে; জয়ী হলে এই পৃথিবীকেই তো কৌরবরা নিজেরা পেতেন, যাতে ভোগ করবার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, যার কোনও ঐশ্বর্য, কোনও গৌরব নেই। আশ্রমবাসিক পর্বে বনে চলে যাওয়ার আগে নিজের ও গান্ধারীর হয়ে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলছেন: বৃদ্ধোহয়ং হতপুত্রোহয়ং দুঃখিতোহংয় নরাধিপঃ/পূর্বরাজ্ঞাশ্চ পুত্রোহয়মিতি কৃত্বানুজানথ।। ইয়ঞ্চ কৃপণা বৃদ্ধা হতপুত্রা তপস্বিনী/গান্ধারী পুত্রশোকার্তা যুস্মান্ যাচতি বৈ ময়া।। তেষামস্থিরবুদ্ধীনাং লুব্ধানাং কামচারিণাম্/কৃতে যাচেহদ্য বঃ সর্বান্ গান্ধারীসহিতোহনঘান্।।— এই হতপুত্র বৃদ্ধ রাজা, আমি পূর্ব রাজাদের বংশধর; এ কথা মনে রেখে আমাকে বনে যাওয়ার অনুমতি দাও। দুর্ভাগিনী অসহায় পুত্রশোকার্তা বৃদ্ধা গান্ধারী ও আমি, নির্দোষ তোমাদের কাছে মিনতি করছি।' (১৫:৯:৭-৯, বঙ্গবাসী) এখানে কবিত্বের সূত্রটি আছে প্রকরণে: অন্ধ বৃদ্ধ, রাজা ও রুদ্ধনয়না গান্ধারী, দুজনেই শতপুত্রের মৃত্যুতে মুহ্যমান, জীবনে বিতৃষ্ণ, পুত্রদের স্বেচ্ছাচারের গ্লানিতে পরম কুণ্ঠিত, বিজয়ী ভ্রাতুষ্পুত্রদের কাছে দীন ভাবে শুধু একটি প্রার্থনাই করছেন: বাকি কটা দিন অরণ্যে বাস করব, সেই অনুমতিটুকু দাও। এর আর্তিও যেমন মর্মস্পর্শী, প্রার্থনার অকিঞ্চিৎকর দৈন্যও তেমনই।

মহাভারত-এর বহু চিরন্তন সত্যের প্রকাশ আছে অসংখ্য শ্লোকে; এগুলি নানা যুগের নানা অঞ্চলের ভূয়োদর্শিতার ফসল। এ প্রাজ্ঞভাষিতের কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বাঝা যাবে এক ধরনের নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনকে যাঁরা দেখতে পেরেছিলেন তাঁরাই সমকালের ক্ষুদ্র সমস্যাকে পেরিয়ে জীবনে কিছু মৌলিক সত্যে পৌঁছতে পেরেছিলেন। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির ভীমকে বলেন, 'যে রাজা অখিল পৃথিবীকে শাসন করবেন তাঁরও তো মাত্র একটিই উদর; কী তুমি যুদ্ধের প্রশংসা করছ, ভীম?— য ইমামখিলাং ভূমিং শিষ্যাদেকো মহীপতিঃ /তস্যাপ্যুদরমেকং বৈ কিমিদং ত্বং প্রশংসসি।।' (১২:১৭:৩) 'পাপ করে ফেলে নিজেকে অমানুষ মনে করা উচিত নয়; সূর্য যেমন রাত্রিশেষে উদিত হয়ে অন্ধকারকে বিনষ্ট করে তেমনই সৎকর্মের দ্বারা দুষ্কর্ম বিনষ্ট করা যায়।' (১২:১৪০:৩১-৩৩) 'কেউ এক খণ্ড কাঠের ওপর ভর করে গভীর মহানদী পেরিয়ে যাচ্ছে, সে তো কাষ্ঠখণ্ডটিকেও নদী পার করাচ্ছে।' (১২:১৩৬:৬০) 'মহাসমুদ্রে যেমন দুটি কাষ্ঠখণ্ড ভাসতে ভাসতে কাছাকাছি আসে, আবার একটু পরে ভাসতে ভাসতে দুদিকে চলে যায়, এ পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগও সেই রকম— যথা কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ/সমেত্য চ ব্যাপেয়তা তদ্বদ্ভূতঃ। (১২:২৮:৩৬)

যুদ্ধের মহাকাব্য, যেখানে বিপদকে শিরে নিয়ে ক্ষত্রিয়ের জীবন কাটে সেখানে স্বভাবতই শুনি, 'ন সংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রাণি পশ্যাতি/সংশয়ং পুনরারুহ্য যদি জীবতি পশ্যাতি।।— সশংয়কে স্বীকার না করে কেউ মঙ্গল লাভ করে না; সংশয় পেরিয়ে যদি বেঁচে থাকে তবেই

মঙ্গলের দেখা পায়।' (১২:১৩৮:৩৪) কোন শত্রু সবচেয়ে ভয়াবহ এ বিষয় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, 'সাহসভরে যারা যুদ্ধে উদ্যত, যারা প্রাণের আশা একেবারে ছেড়েছে, তাদের সামনে দাঁড়াবার সাধ্য স্বয়ং ইন্দ্রদেবেরও নেই— সাহসোৎপতিতানাঞ্চ নিরাশানঞ্চ জীবিতে/ন শক্যমগ্রতঃ স্থাতুং শত্রুণাপি ধনঞ্জয়।। (৯:৫৯:১৬ বঙ্গবাসী) অনুরূপ কথা, পুনে সংশোধিত সংস্করণে উশনা-গীতায়: পুনরাবর্তমানাং ভগ্নানাং জীবিতৈষিণাম্/ ভেতব্যমরিশেষাণামেকায়নগতা হি তে।।' (৯:৫৭:১৩)। পিতৃহত্যায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ অশ্বত্থামাকে কৃপ যখন রাত্রে ঘুমোতে বললেন তখন অশ্বত্থামা বললেন, 'আতুর, ক্রুদ্ধ, অর্থচিন্তাকারী বা প্রেমার্ত মানুষের ঘুম কই?— আতুরস্য কুতো নিদ্রা নরস্যামর্ষিতস্য চ/অর্থাংশ্চিন্তয়তশ্চাপি কাময়ানস্য বা পুনঃ।। (১০:৪:২১) দ্রোণপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের অনুশোচনা শুনে সঞ্জয় বললেন, 'এখন অনুতাপে কী হবে? প্লাবন ভেঙে আসবার পর সেতু বাঁধবাদ্দর চেষ্টার মতোই নিষ্ফল এ বিলাপ— গতোদকে সেতুবন্ধো যাদৃগয়ং তব/বিলাপো নিষ্ফলো রাজন্ মা শুচ ভরতর্ষভ।।' (৭:৬২:২) জনক রাজা বলেন, 'আমার সম্পদ্ অনন্ত, কারণ আমার কিছুই নেই; আমার রাজধানী মিথিলা নগরী দগ্ধ হলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না— অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন/মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন।।' (১২:২৩:১৫ বঙ্গবাসী) 'অন্যমনস্কে ফুল তুলছে যে মানুষটি, মৃত্যু তাকেও সহসা গ্রাস করে, যেমন নেকড়ে বাঘ টেনে নিয়ে যায় ভেড়ার ছানাকে— পুষ্পাণীব বিচিন্বন্তমন্যত্র গতমানসম্/বৃকীবোরণমাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি।।' (১২:১৭৫:১৩ বঙ্গবাসী) 'বুড়ো মানুষের চুল, দাঁত, চোখ, কান জীর্ণ হয় না, জীর্ণ হয় শুধু তৃষ্ণা— জীর্যন্তি জীর্যতঃ কেশা দন্তা জীর্যন্তি জীর্যতঃ/চক্ষুঃশ্রোত্রে চ জীর্যেতে তৃষ্ণৈকা নতু জীর্যতে।।' (১৩:২০:২১ বঙ্গবাসী) 'অপ্রিয় অথচ হিতকর কথার বক্তাও দুর্লভ, শ্রোতাও দুর্লভ— প্রিয়স্য হি পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।' (২:৬৪:১৭ বঙ্গবাসী) বাল্যবন্ধু দ্রুপদ রাজা হলে পর দ্রোণ রাজসভায় গিয়ে তাঁকে 'সখা' সম্বোধন করে কথা বলতে শুরু করতেই দ্রুপদ থামিয়ে দিয়ে বললেন: 'ন দরিদ্রো বসুমতো নাবিদ্বান্ বিদুষঃ সখা/হূরস্য ন সখা ক্লীবঃ সখিপূর্বং কিমিষ্যতে।।— দরিদ্র কখনও ধনীর বন্ধু হয় না, অপণ্ডিত পণ্ডিতের বা নির্বীর্য বীরের সখা হয় না; তুমি 'সখা' সম্বোধন করতে চাইছ কেন?' (১:১২২:৭) জীবনে মানুষকে অনুরূপ অভিজ্ঞতার সামনে বারবার আসতে হয়, কিন্তু এখানে কী নিরাবরণ নিষ্ঠুর প্রকাশ সে সত্যের। এমনই জীবনের নানা ক্ষেত্র, নানা সংকট ও অবস্থা সম্বন্ধে ভুয়োদর্শীদের অসংখ্য প্রাজ্ঞভাষিত ছড়িয়ে আছে সারা *মহাভারত*-এ।

এ পর্যন্ত দেখা গেল *মহাভারত*-এ নানা ধরনের কবিত্ব পরিমাণগত ভাবে কত প্রচুর এবং কাব্যমর্যাদায় কত সমৃদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এত অজস্র উদাহরণ আছে যে নির্বাচন করাই দুঃসাধ্য, তাই অল্প কয়েকটি উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হতে হল। এই যে এ পর্যন্ত যা দেখানো হল তা প্রায় মহাকাব্যেই অল্পবিস্তর আছে এবং তার দ্বারা *মহাভারত*-এর কাব্যত্বই প্রতিপন্ন হয়, মহাকাব্যত্ব নয়। *মহাভারত*-এর প্রকৃত উৎকর্ষ অন্যত্র।

এই উৎকর্ষের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলে প্রথমেই চোখে পড়ে যে *মহাভারত*-এ মূল

ক্ষত্রিয়কাহিনিতে ঘটনার মধ্যে অতিলৌকিকতার কোনও প্রভাবই নেই। *ইলিয়াড*-এর সঙ্গে এখানে মহাভারতে প্রকাণ্ড একটা প্রভেদ আছে। যদিও *ইলিয়াড*-এর ঘটনার গতি অতিলৌকিকতাকে বাদ দিয়েও একই খাতে প্রবাহিত হতে পারত তথাপি *ইলিয়াড*-এর কাহিনির মধ্যে দেবতাদের হস্তক্ষেপ ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত হয় আছে। *মহাভারত*-এ তৃতীয় অংশে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে দেবতারা খুব প্রত্যক্ষ ভাবেই বিদ্যমান এবং কখনও কখনও নেপথ্য থেকে ঘটনার কর্ণধারের ভূমিকাতেও দেখা দিচ্ছেন। কিন্তু যেহেতু মূল মহাকাব্য রচনার অনেক পরবর্তী কালের সংযোজন এ অংশ, সে জন্যে এই অতিলৌকিক উপাখ্যানগুলি কাহিনির মর্মে প্রবেশ করেনি। তাই মূল (ক্ষত্রিয়) কাহিনি একান্ত ভাবে দেবতানিরপেক্ষ ও মানবিক সীমার মধ্যে নিহিত। ফলে দেবতার ভূমিকা মূল কাহিনির ক্ষেত্রে আগন্তুক বা আপতিক এবং সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য। মানুষের চরিত্রের অন্তর্নিহিত শুভ ও অশুভবুদ্ধি, নৈতিক জয়পরাজয়ই কাহিনিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। শেষতম ব্রাহ্মণ্য সংযোজনেই কৃষ্ণ প্রবেশ করেন *মহাভারত*-এ, প্রধান দেবতারূপে। মূল মহাকাব্যে তিনি পাণ্ডবদের সখা, অর্জুনের পরম সুহৃদ ও যুদ্ধক্ষেত্রে সারথি। এ কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা, যদুবংশের বৃষ্ণিবীর; মানবিক পরিসরের বাইরে এঁর কোনও অস্তিত্ব তখনও ছিল না, এবং ক্ষত্রিয়কাহিনিতে তার কোনও প্রয়োজনও ছিল না (লক্ষণীয় অপর ক্ষত্রিয় মহাকাব্য *রামায়ণ*-ও তার আদিমতম রূপে সম্পূর্ণ ভাবে মানবিক। আদিকাণ্ডে তার নায়ক নির্বাচন প্রসঙ্গে শুনি, যে সব গুণ এ নায়কের প্রয়োজন তা দেবতাদের মধ্যেও দুর্লভ, তাই এতে রইল 'নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রের কাহিনি')। মহাকাব্যের প্রকৃত তাৎপর্যই তো এখানে; সে মানুষের সমস্যা মানুষেরই নৈতিক আত্মিক ও আবেগনিষ্ঠ উপলব্ধির সাক্ষ্য বহন করে, সেই জন্যেই এক যুগের কাহিনি সর্বযুগের আত্মিক সম্পদের ভাণ্ডার হয়ে ওঠে। মহাভারতে কৃষ্ণ প্রধান দেবতারূপে অবতীর্ণ হওয়ার পর জয়-পরাজয় আর বীরনিষ্ঠ রইল না, কৃষ্ণনিষ্ঠ হয়ে উঠল: যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ। ক্ষত্রিয়ের নীতি পদদলিত হল; কৃষ্ণের পরামর্শে প্রত্যেকটি কৌরব মহারথীকে অন্যায়-সমরে প্রাণ দিতে হল। মানবিক ও ক্ষাত্রনীতির ওপরে আরোপিত হল অন্য এক নীতি: কৃষ্ণই পরিমাপক হলেন ন্যায়-অন্যায়ের, নিয়ামক হলেন শুভ-অশুভের। মানবায়ত্ত মূল্যবোধ কৃষ্ণে প্রতিহত হল। বর্তমান প্রবন্ধ মূল ক্ষত্রিয় কাহিনিকে অবলম্বন করে রচিত, তাই কৃষ্ণ মহাকাব্যে দেবাতিদেব ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহাভারতের যে রূপটি ছিল তারই বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধে।

যদিও মহাকাব্যটি যুদ্ধকেন্দ্রিক তবু এর অন্তর্গূঢ় রসটি বীর বা রৌদ্র নয়। আনন্তবর্ধন বলেছেন মহাভারতের মূল রসটি শান্তরস (এই তথ্যটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি অধ্যাপক হেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী)। এ কাব্যের এতটা অংশ জুড়ে যুদ্ধ-হানাহানি আছে যে এর মূল রসকে শান্ত বললে সহসা বিস্মিত লাগে। কিন্তু তলিয়ে ভাবলেই এ কথার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়। মূল মহাকাব্যের ঘটনাতে যুদ্ধ, কিন্তু ক্রান্তদর্শী কবির যে নির্ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কাব্যটি জন্ম নিয়েছে যুদ্ধ সেখানে নিতান্তই বহিরঙ্গ, যে ধীর ও গভীর দৃষ্টিতে সেখানে জীবন-পর্যবেক্ষণ তা শান্তরসেই গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আপাত-প্রতীয়মান স্তরে যুদ্ধ এখানে

নিন্দিত এবং আরও গভীর স্তরে কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম যেখানে মানুষের চিত্তপটে শ্রেয় ও প্রেয়ের সংঘাতের প্রতীক, সেখানেও শেষ পর্যন্ত রস তো শান্তই। এ সংগ্রাম চিত্তের গভীরে অনুষ্ঠিত হয়, এর জয় পরাজয় নৈতিক এবং যে সমাহিত জীবনবোধে এর পর্যবসান তা যথার্থই শান্তরসেরই অনুষঙ্গ বহন করে।

মহাভারত-এর চরিত্রচিত্রণে কয়েকটি বৈশিষ্ট চোখে পড়ে। প্রথম বৈশিষ্ট্যটিকে এক কথায় বলা যেতে পারে বাস্তবানুগতা; কারণ জীবনে যেমন, *মহাভারত*-এও তেমনই, অবিমিশ্র ভাল বা অবিমিশ্র মন্দ চরিত্র নেই। দুটি মাত্র ব্যতিক্রম: বিদুর ও শকুনি; যেমন জীবনেও লক্ষ্যে এমন ব্যতিক্রম হয়তো বা দু' একটি দেখা যায়। নায়কের ভূমিকায় আমরা হয়তো নিজের অগোচরে অবিমিশ্র ভাল চরিত্রই আশা করি; কিন্তু *মহাভারত*-এ তেমন চরিত্র নেই। না, যুধিষ্ঠিরও নয়; যদিও ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের গ্রন্থকার একমাত্র তাঁকেই সশরীরের স্বর্গে নিয়ে গেছেন। শাস্ত্রে দ্যূতক্রীড়াকে ব্যসন বলা হয়েছে; সে দিক থেকে পাশা খেলায় আসক্তি তাঁর অপরাধ। তাছাড়াও শুধু যে দ্রোণাচার্যকে প্রাণঘাতী মিথ্যা বলেছিলেন তা নয়, পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রীকে একা পণ রাখবার অধিকারও তাঁর ছিল না। এ সব ছাড়া আরও ছোটখাট ত্রুটি হয়তো তাঁর চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়; অন্যদের ক্ষেত্রে এ কথা আরও সত্য। কিন্তু ভাল-মন্দে দোষেগুণে মিলিয়ে চরিত্রসৃষ্টি এ তো *রামায়ণ*, *ইলিয়াড* ও অন্যান্য কয়েকটি মহাকাব্যেও আছে। কারণ এ ভাবে উপস্থাপিত করলে তবেই চরিত্রগুলি শ্রোতা বা পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, পাঠকের বুদ্ধি এবং আবেগের সংবেদন সহজে চরিত্রগুলিকে ঘিরে আবর্তিত হতে পারে।

মহাভারত-এ চরিত্রচিত্রণের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর প্রত্যেক মুখ্য চরিত্রই দ্বিধাগ্রস্ত। এখানেও ব্যতিক্রম ওই বিদুর ও শকুনি। অন্যান্য মুখ্য চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন এবং প্রত্যেকেই একা নিজের বোধ ও বুদ্ধি দিয়ে সমস্যার সমাধান করেছে। এই দ্বিধা কোথাও ভাল ও মন্দের মধ্যে, শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে, কোথাও বা শ্রেয় ও শ্রেয়স্তরের মধ্যে। ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব পুত্রস্নেহ ও ন্যায়বিচারের মধ্যে, অর্থাৎ শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে। তিনি হেরে গেছেন নৈতিক সংগ্রামে; সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় পরাজয় মেনে নিয়েছেন। গান্ধারী একই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে হার মানেনি; বিদুর ও সঞ্জয়ের মতো তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রকে কর্তব্য সচেতন করে দিতে চেয়েছেন। পারেননি— এই তাঁর মর্মন্তুদ ব্যর্থতা ও বেদনা। বিদুর, সঞ্জয়, গান্ধারী ও যুধিষ্ঠির মিলে মহাভারত রচনার প্রথম পর্বে ধর্মের ভূমিকায় অবতীর্ণ। পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে এলেন কৃষ্ণ; সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের এক মাত্রা যুক্ত হল *মহাভারত*-এ। যুধিষ্ঠিরের দ্বন্দ্ব ক্ষাত্রধর্ম ও মানবধর্মের সংঘাত, অর্থাৎ শ্রেয় ও শ্রেয়স্তরের সংঘাত। দুটিই ধর্ম, কোনও একটিকে বেছে নিলেই তিনি নিন্দনীয় হন না, অপরাধীও হন না। কিন্তু বুদ্ধোত্তর ভারতে বেছে নেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে: ক্ষত্রিয়কুলে জন্মে যিনি মনেপ্রাণে যথার্থ অহিংস এবং অহিংসাকেই যিনি শ্রেয়স্তর জ্ঞান করেন তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্যিই মর্মান্তিক। সিংহাসনে অধিকার যতই বিসংবাদিত হোক সে অধিকার সর্বপ্রযত্নে

রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্যকর্তব্য। এতাবৎকাল সব ক্ষত্রিয়ই এই নীতি মেনে বিনা দ্বিধায় যুদ্ধ করেছেন; কেউ জিতেছেন, কেউ বা হেরেছেন, তবে দুটিই শুভ পরিণতি, কারণ, 'জয়ে স্যাদ্বিপুলা পৃথ্বী/ধ্রুবঃ স্বর্গঃং পরাজয়ে।' (৮:৮৪:১৫) *কালেহ্বালা, এল সিড, নিবেলুঙ্গেনলিড, ঈনীড, ইলিয়াড*, এমনকী *অডিসি*-তেও এই অধিকারের জন্যে সংগ্রাম এবং শৌর্যধর্মে এ সংগ্রাম অবশ্যকর্তব্য। যুধিষ্ঠিরের সমস্যা হল তাঁর অন্তর্নিহিত মানবিকতা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী এবং আত্মীয়কুলের রক্ত পেরিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করাটাকে কোনও মতেই ন্যায়ধর্ম বলে স্বীকার করতে পারছে না। রাজ্যে অধিকার তাই তাঁর কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে। তাই উভয়পক্ষ যখন যুদ্ধে উদ্যত, শুধু শঙ্খধ্বনি হলেই যুদ্ধ শুরু হবে, তখন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, জয়লাভ হলে যিনি সিংহাসনটি পাবেন তিনি ছুটে গিয়ে আচার্যদের পায়ে পড়ছেন: এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করুন। পারলেন না রক্তপাত রোধ করতে; তাই যুদ্ধের শেষে দুর্যোধনের মৃত্যুর সময়ে অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে দুর্যোধনকে বলছেন: 'নাত্মানুশোচনীয়স্তে শ্লাঘ্যো মৃত্যুস্তবাধুনা/ বয়মেবাধুনা শোচ্যাঃ সর্বাবস্থাসু কৌরব।।— 'দুর্যোধন, তুমি অনুশোচনায় কষ্ট পেও না, তোমার মৃত্যু তো বরণীয়, এখন আমরাই সর্ব অবস্থায় শোচনীয় হয়ে রইলাম।' (৯:৫৯:২৭ বঙ্গবাসী) এই অন্তর্দ্বন্দ্ব অল্পকালের জন্যে অর্জুনকেও স্পর্শ করেছিল, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে। শ্রীকৃষ্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা ও অতিলৌকিক জাদু দিয়ে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে অর্জুনের অন্তঃসংঘাতের অবসান ঘটান।

কুন্তীর অন্তর্দাহের গভীর যন্ত্রণা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলে এসেছিলেন জ্যেষ্ঠ কানীন পুত্র কর্ণের কাছে, যাঁর সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত তাঁর পাণ্ডব পুত্ররা; কর্ণ তাঁর অনুরোধ রাখেননি। তাই কি যুধিষ্ঠির সিংহাসন লাভ করলে হতপুত্রা কর্ণমাতা হতপুত্রা গান্ধারীর সঙ্গে আশ্রমবাসে গেলেন? কর্ণ তাঁর সূতকুলে জন্ম যেন মনে থেকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর অন্তরে বহুবিধ সংঘাত, দুর্যোধনের থেকে তিনি নিজেকে শৌর্যবান ও কৃতী মনে করতেন, অথচ জন্মসত্ত্বে তাঁর হীন পরিচয়, পদে পদে তা নিয়ে লাঞ্ছনা। ভীষ্মের চেয়ে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলে মনে করতেন, অথচ ভীষ্ম, দ্রোণের মৃত্যু না হলে সেনাপতি হতে পারবেন না। সহজাত কবচকুণ্ডল ইন্দ্র হরণ করলেন, দানবীররূপে কর্ণের অভিমানের সুযোগ নিয়ে, তাঁর মাথার ওপরে খড়্গের মতো উদ্যত ছিল গুরু পরশুরামের অভিশাপ। কর্ণ যেন নিজের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা জানতেনই এবং এই জানার পরিপ্রেক্ষিতেই উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে তাঁর অতুলনীয় বীরত্ব। পরাজয় আসন্ন জেনেও দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ না করাতেই নৈতিক সংগ্রামে তাঁর জয়ের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। কর্ণ তাঁর দানবীরত্বের, যোদ্ধা হিসেবে তাঁর যোগ্যতার বা শৌর্যের কোনও মর্যাদাই পাননি।

দ্রোণ শক্তিমানের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন দ্রুপদের ওপরে প্রতিশোধ নিতে; পরে শক্তিমান অন্যায়কারী জেনেও আর পক্ষত্যাগ করতে পারেননি। প্রিয়শিষ্য অর্জুনের অভিমান দূর করতে একলব্যকে নিষ্ঠুর শাস্তি দেন, হয়তো বিবেকের বিরুদ্ধেই। যুদ্ধের আরম্ভে তাঁকে অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত হতে দেখি

ভীষ্ম প্রথম জীবন থেকেই নৈতিক সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছিলেন; পিতাকে সুখী করতে নিজের সব সুখের সম্ভাবনা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন, শ্রেয় এবং প্রেয়ের দ্বন্দ্বে জয়ী হন। পরে সত্যবতীর অনুরোধেও প্রতিজ্ঞাচ্যুত হননি। জীবন তাঁকে বিশেষ কিছুই দেয়নি, ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদের অভিভাবকের পদটি ছাড়া এবং এখানেই তাঁর ব্যর্থতার সূচনা— দুর্যোধন যে ন্যায়নীতি বর্জন করেছেন, ধৃতরাষ্ট্র যে অন্ধ পিতৃস্নেহে অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছেন এ সব জেনেও তিনি তাঁদের সঙ্গেই রইলেন। কৌমার্যটুকু অক্ষুণ্ণ রাখা ও মাঝে মাঝে সৎপরামর্শ দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনও কৃতিত্ব নেই। মহাকাব্যে তাঁর ভূমিকা প্রায় নেপথ্যেই রইল, তাঁর সৎপরামর্শে কেউ কোনও দিন কর্ণপাতও করেনি। বস্তুত, আশ্রমবাসই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, তাতে তিনি অন্যায়ের সাহচর্য এড়াতে পারতেন। সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থেই তিনি দুর্যোধনের সহকারী হলেন, ধৃতরাষ্ট্রের নৈতিক অন্ধত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন। এই সব অপরাধের তীক্ষ্ণ অনুশোচনায় তাঁর শরশয্যা তো পাতা হয়েছে বহু দিন পূর্বেই।

কুন্তী রাজমাতা রাজবধূ, কিন্তু তাঁরও জীবন কেটেছে গ্লানি ও বঞ্চনায়। মাদ্রী ব্যর্থযৌবনা তরুণী, সুন্দরী রাজবধূ; অকালে সহমৃতা হলেন বিনা দোষে, কিন্তু স্বেচ্ছায়। মহাকাব্যের আদিতেই সত্যবতীকে কেন্দ্র করে ভাগ্যের নিষ্করুণ পরিহাস সুপরিস্ফুট। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা যা নিয়ে ঘটল— সিংহাসনে অধিকার— আরম্ভ থেকে সে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলে ভাগ্যের বিদ্রূপ বোঝা যায়। সত্যবতীকে কামনা করলেন শান্তনু; সুযোগ বুঝে সত্যবতী দাবি করলেন, তাঁর পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হবে। শান্তনু ক্ষুব্ধ হলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবব্রতেকে কোন অপরাধে বঞ্চিত করবেন তার ন্যায্য অধিকার থেকে? এ সমস্যার সমাধান করলেন দেবব্রত নিজেই, আমরণ কুমার থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এই নিষ্ঠুর মূল্যে পাওয়া অধিকার কী ভোগ করতে পারলেন সত্যবতী? চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্যের জননী কত দিন দুটি তরুণী বিধবা পুত্রবধূ নিয়ে প্রাসাদে ব্যর্থ দিন যাপন করলেন। কিন্তু কী অদম্য আকূতি তাঁর রাজমাতা হওয়ার! সংকোচ ত্যাগ করে সেই বঞ্চিত ভীষ্মকেই অনুরোধ করলেন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী দিতে; ভীষ্ম অসম্মত হলে ব্যাস। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বা পাণ্ডু কারও ঔরসপুত্রই তো শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে এলেন না, এলেন কুন্তীর গর্ভের ক্ষেত্রজ পুত্র যুধিষ্ঠির।

দ্রৌপদী রাজনন্দিনী, রাজকুলবধূ, পঞ্চ মহাবীরের পত্নী, দুরূহ এক সমদর্শিতার পরীক্ষা তাঁকে দিতে হয়েছে সারা জীবন ধরে। তাঁর মনে ক্ষত্রিয় বীর সম্বন্ধে যে আদর্শ ছিল স্বামীদের আচরণে তার নানা ব্যত্যয় দেখে তিনি বারে বারে প্রতিবাদ করেছেন, ফলে প্রচলিত অর্থে পতিব্রতা ধর্মের সঙ্গে তাঁর চরিত্রগত বিরোধ ছিল। প্রয়োজন মতো স্বামীদের, এমনকী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও, তিনি ভর্ৎসনা করেছেন। প্রচণ্ড অপমান সহ্য করেছেন অসহায়ের মতো: নাথবতী অনাথবৎ। জীবন কি অর্থহীন বোধ হয়নি এই তেজস্বিনী বীরাঙ্গনার কাছে? তাঁর বহু উক্তিতে তাঁর অন্তর্দাহের তীব্র জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে।

দেখতে পাচ্ছি, *মহাভারত*-এ কোনও চরিত্রই চরিতার্থ নয়। যা তাঁরা চেয়েছেন তা কেউই পাননি, অথবা যখন যেমন ভাবে চেয়েছেন তখন তেমন ভাবে পাননি। সেই দিক থেকে

দুর্যোধনের মৃত্যুবরণ যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন লাভের চেয়ে অনেক সহজ ছিল। দুর্যোধন প্রথম থেকেই জানতেন জয়ের কোনও আশাই নেই তাঁদের পক্ষে। শৈশব থেকেই ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র বারংবার পাণ্ডবদের কাছে শৌর্যে পরাহত হয়েছে। দুর্যোধন রাজপুত্র, সিংহাসনে তাঁর এ রকম দাবি ছিলই। সে দাবির স্বীকৃতির জন্যে তিনি আমরণ যুদ্ধ করে গেছেন। দ্যূতসভার প্রকাশ্য অন্যায় অনুষ্ঠানের পর থেকেই তাঁর বিবেক নীরব হয়েছে, কাজেই যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর নতুন কোনও নৈতিক সমস্যা ছিল না, ক্ষত্রিয়বীরের মতো যুদ্ধ করেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন এবং প্রত্যেক কৌরব মহারথীর মতো অন্যায় সমরেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। যুদ্ধের পূর্বে দু' পক্ষই প্রতিশ্রুত ছিলেন, প্রতিপক্ষ সময় চাইলে তাকে আক্রমণ করবেন না এবং কখনওই অধোনাভি আঘাত করবেন না। কর্ণ সময় চেয়ে পাননি; ভীষ্ম অস্ত্রত্যাগ করলেন অর্জুনের রথে শিখণ্ডিকে দেখে, কারণ ক্ষত্রিয় স্ত্রীহত্যা করে না; দ্রোণ পুত্রের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে অস্ত্রত্যাগ করেন; ক্লান্ত দুর্যোধনকে দ্বৈপায়ন হ্রদ থেকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করে তুলে এনে অধোনাভি আঘাত করে হত্যা করা হল।

বিদুর ও সঞ্জয়ও ব্যর্থ চরিত্র, ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠাকল্পে এঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থকাম হন। শকুনিও ব্যর্থ; সিংহাসনে দুর্যোধনের অধিকার প্রতিষ্ঠা তো হলই না, সমগ্র কুরুকুলই ধ্বংস হল। ব্যাসের পৌত্ররাই কৌরব-পাণ্ডবরূপে দু'পক্ষে যুধ্যমান এবং ব্যাস নিজে সে কাহিনি রচনা করেছেন! সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনে কী দুঃসহ গ্লানি। সব মুখ্য চরিত্রের জীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত এবং এইখানে *রামায়ণ*, *অডিসি*, *ইলিয়াড*, *নিবেলুঙ্গেনলিড* ও *গিলগামেশ*-এর সঙ্গে *মহাভারত*-এর মিল: স্বল্প সুখভোগের পরেই দুঃখের ছায়া নেমে আসে প্রত্যেকটি নায়কের জীবনে। কারণ, মহৎ কাব্য সুখ দিয়ে সৃষ্ট হয় না, সুখে জীবনজিজ্ঞাসা নেই। এবং এই জীবনজিজ্ঞাসাতেই কাব্য প্রকৃত তাৎপর্য লাভ করে, সমকালকে অতিক্রম করে সর্বদেশের, সর্বকালের মানুষের কাছে কথা বলতে পারে।

কী সেই কথা? না, জীবনের অর্থ কী, কেন বাঁচি। তলিয়ে ভাবলে জীবনের নিজস্ব ও আত্যন্তিক কোনও মূল্যই নেই। কিন্তু এ কথা স্বীকার করা মাত্রই মানুষ অন্য একটি দুরতিক্রম্য দায়িত্বের সম্মুখীন হয়, তা হল: জীবনকে অর্থবহ করে তোলাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। এই দায়িত্ব যে যত পরিমাণে পালন করতে পেরেছে, তার মনুষ্যজীবন ততটাই সার্থক। মনে পড়ে, *মহাভারত*-এর বনপর্বের সেই উপাখ্যান, যেখানে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবীর সন্ধানে বেরিয়ে চিরঞ্জীব মার্কণ্ডেয় এলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে। তাঁর নির্দেশে প্রাবারকর্ণ উলুকের কাছে। সেখান থেকে নাড়ীজঙ্ঘ বকের কাছে এবং তার নির্দেশে অকূপার কচ্ছপের কাছে। অবশেষে অমরতার একটি সংজ্ঞা পাওয়া গেল: 'দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যস্য কর্মণঃ/যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে॥— পুণ্যকাজ বা সুকৃতির যশোধ্বনি আকাশ ও পৃথিবীকে স্পর্শ করে, সে শব্দ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই পুরুষ পুরুষ বলে অভিহিত হয়।' (৩:১৯৮:১৩) শুভকাজ, মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর কাজের দ্বারাই মানুষ অমরত্ব লাভ করে এবং সে পুণ্য বা শুভকর্মের স্মৃতি যতদিন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে ততদিনই শুভকারী অমর।

চরিত্রচিত্রণে *মহাভারত*-এর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, প্রত্যেক মুখ্য চরিত্রই ব্যর্থকাম, ভাগ্যের হাতে নিপীড়িত, অনেকটা গ্রিক নাটকের নায়কের মতো। অথচ গ্রিক মহাকাব্যের মতো দেবতারা এখানে মুখ্য ঘটনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সক্রিয় নন; অন্তত মূল ক্ষত্রিয়কাহিনিতে তো নয়ই। এখানে মানুষ নিজের কৃত ন্যায়-অন্যায়ের ফল ভোগ করে, জয়-পরাজয় দেবতাদের পক্ষপাতিত্বে নির্ণীত হয় না। দেবতাদের মধ্যস্থতা বা হস্তক্ষেপের সব কটি কাহিনিই পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে আছে। কিন্তু মূল কাহিনির সব মুখ্য চরিত্র সম্বন্ধেই বলা চলে তাঁরা যা চেয়েছিলেন তা পাননি এবং প্রত্যেকেই গভীর নিষ্প্রতীকার মর্মযন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন। ভবভূতির ভাষায় আমাদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, 'ভগবান ব্যাস, এবং কিং তে কাব্যার্থঃ?' এই কি তোমার কাব্যার্থ? এই নিরন্ত অতল ব্যর্থতা দেখাবার জন্যেই কী এ মহাকাব্যের অবতারণা? এক অর্থে সত্যই এ-ই *মহাভারত*-এর প্রতিপাদ্য। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে, 'মানুষের জীবনকে দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে/ডান হাতে পূর্ণ কর, সুধা/বামহাতে চূর্ণ কর পাত্র/দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে/মহৎ জীবনে যার অধিকার।' (পৃথিবী, *পত্রপুট*)

কিন্তু *মহাভারত* শুধু ব্যর্থতাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে আড়াই হাজার বছর ধরে এই অম্লান মহিমায় এ কাব্য ভারতবর্ষের চিত্তলোকে বিরাজ করত না। এই অতল ব্যর্থতার সঙ্গে আরও দুটি বস্তু আছে। একটি হল, প্রত্যেক মুখ্য চরিত্রই একান্ত নিঃসঙ্গ। অর্জুন, চরিত্রের দিক থেকে যাঁর গৌরব বেশি নেই, একমাত্র তিনিই পেয়েছিলেন একটি অন্তরঙ্গ সুহৃৎকে, কৃষ্ণকে তিনি মনের কথা বলতে পারতেন। কিন্তু আর সকলেই একাকী; ইংরেজিতে যাকে বলে ট্র্যাজিক আইসোলেশন, তা এঁদের জীবনের প্রথম থেকেই আছে। কুন্তী প্রথম দিকেই পাণ্ডু ও মাদ্রীকে হারালেন, আর সকলেই মনের দিকে তাঁর দূরের মানুষ। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর মধ্যে বিবেকের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, তার দু'পারে দু'জনেই একা। দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ আপন আপন ভূমিকায় স্বতন্ত্র ভাবে নিঃসঙ্গ; তাঁদের মনের কাছাকাছি কেউ নেই। যুধিষ্ঠির যে-অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত তাকে বোঝবার সাধ্যই তাঁর আশপাশের কারও ছিল না, সাহচর্য দেওয়া তো দূরের কথা। পঞ্চ মহাবীরের বধূ দ্রৌপদী স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ্যভেদী অর্জুনের কণ্ঠে মাল্যদান করবার সময়ে ওষ্ঠে স্মিতহাস্য ও হাতে শ্বেতপুষ্পমালাটি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তাঁর চাওয়া ও পাওয়ার মিল হল না, তাঁর নিঃসঙ্গতা হয়ে রইল অপরিমেয়।

এই ব্যর্থতাবোধ, এই গভীর নিঃসঙ্গতা এর অবতারণা করবার সার্থকতা কী? নিঃসংশয়ে বলা চলে মহাকবি এ সব দেখাতেন না যদি না এ সব অতিক্রম করে আরও কিছু দেখাবার অভীপ্সা ও সাধ্য তাঁর থাকত। মহাকাব্যটি যে স্তরে গিয়ে এ সবকে অতিক্রম করেছে সেখানেই সে মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব অর্জন করে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। শান্তিপর্বে নিঃসঙ্গতার প্রসঙ্গে একবার শুনি, শ্রূয়তে ত্রিলোককৃত ব্রহ্মা প্রভুরেকাকী তিষ্ঠতী— 'শোনা যায় ত্রিভুবনের স্রষ্টা ব্রহ্মা একাকী বিরাজ করেন।' এ হল তুষারমৌলি হিমালয়ের একাকিত্ব; যে-মানুষ পৃথিবীকে বরণীয় কিছু দেয় তারও নিত্যসঙ্গী এই একাকিত্ব। একাকিত্ব দেখানোর একটি

স্মরণীয় প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে: যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির নৈতিক দ্বিধায় দোলাচলচিত্ত, রাজা হয়ে সিংহাসন ভোগ করতে অনীহা তাঁর। নিজের অপরাধবোধ ও রাজত্বে অনীহা প্রকাশ করলে ভীমসেন তাঁকে বললেন: 'যত্র নাস্তি শরেঃ ন মিত্রৈন চ বন্ধুভিঃ/আত্মনৈকেন যোদ্ধব্যং তত্ত্বে যুদ্ধং সমায়াতম্...এতজ্জিত্বা মহারাজ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ।।— 'যে যুদ্ধে শরনিক্ষেপ নিষ্ফল, মিত্র, বন্ধু থেকেও লাভ নেই, সে যুদ্ধ উপস্থিত। এ যুদ্ধে জয়লাভ করে তবেই তুমি কৃতকাম্য হবে।' (১২:১৬:২১, ২২)

চরিতার্থতার এই সংজ্ঞা *মহাভারত*-এ: সকলের অলক্ষ্যে নিজের বিবেকের সঙ্গে একক সংগ্রামে জয়লাভ করা। এই যুদ্ধই এ মহাকাব্যে চরম ও অন্তিম যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে যুধিষ্ঠির এ যুদ্ধের সম্মুখীন হলেন; আগেও হয়েছিলেন, কিন্তু এই শেষবার। প্রত্যেক প্রধান চরিত্রের জীবনেই বাইরে রণক্ষেত্রের যুদ্ধের চেয়ে এটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম। প্রতিপক্ষ এখানে নিজের মধ্যেই বাস করে: লোভ, দম্ভ, ঈর্ষা, অহমিকা, নৈতিক অন্ধত্ব এ সবের সঙ্গে যে সংগ্রাম সেখানে মানুষ সম্পূর্ণ একা; সে সংগ্রাম কঠোর, মরণান্তিক। এই সংগ্রামের রূপায়ণের মধ্যে মহাভারত কাব্যমূল্যে চিরন্তন সমুজ্জ্বলতা অর্জন করেছে। সম্পূর্ণ অন্য এক ধরনের কাব্য নিহিত আছে এই স্তরে।

যুদ্ধের সময়ে ভীষ্ম কৌরব পক্ষ সমর্থন করেছেন, নিজে বীরের মতো যুদ্ধ করে বহু পাণ্ডব বীরকে হত্যা করেছেন। সেই ভীষ্ম মৃত্যুকালে দুর্যোধনকে বলছেন, 'যুদ্ধং মদন্তমেবাস্তু তাত সংশাম্য কৌরবৈঃ— আমার মৃত্যুর সঙ্গেই যুদ্ধ শেষ হোক, বৎস, কৌরবরা শান্ত হোক।' (৬:১১৬:৪৬) আরও বলেছেন— 'পৃথিব্যাং সর্বরাজানো ভবন্ত্বদ্য নিরাময়াঃ— পৃথিবীর সব রাজা আজ রোগমুক্ত হোক।' (৬:১১৭:২) রোগ হল যুদ্ধের বাসনা। পিতামহ ও প্রথম সেনাপতি বৃদ্ধ ভীষ্ম ক্ষমা চাইলেন কর্ণের কাছে, রুষ্ট ভাবে তাঁকে কঠোর কথা বলার জন্যে; কর্ণ যুদ্ধ করার অনুমতি চাইলে বললেন, 'বলবীর্যকে আশ্রয় করে যুদ্ধ কর, কিন্তু মনে কোনও অহংকার রেখো না— যুদ্ধস্ব নিরহংকারো বলবীর্যব্যপাশ্রয়ঃ'। ৬:১১৭:৩২) যুদ্ধে লোকক্ষয় দেখে আত্মগ্লানিতে তাঁর নিজের অহংকার চলে গেছে, সমস্ত বৈরভাব ঘুচে গেছে। জিঘাংসা, লোভ ও প্রতিহিংসাকে স্বরূপে দেখেছেন বলেই নম্র ভাবে উদ্ধত কর্ণের কাছে ক্ষমা চাইতে আজ তাঁর বাধল না।

দ্রোণ মৃত্যুর আগে বলছেন, 'পাণ্ডবদের মঙ্গল হোক, আমি শস্ত্রত্যাগ করলাম।' (৭:১৬৫:২৫২) যিনি প্রবল বিক্রমে কৌরব সেনাপতির ভূমিকায় যুদ্ধ করেছেন দিনের পর দিন তিনি মৃত্যুর আগে 'একাগ্রচিত্ত হয়ে সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করলেন— অভয়ং সর্বভূতানাং প্রদদৌ যোগযুক্তবান্।' (৭:১৬৫:২৫) কর্ণের রথচক্র কাদায় বসে গেছে, সময় চেয়ে পেলেন না, 'ক্রোধে তাঁর চোখে জল এল— গ্রস্তচক্রস্তু রাধেয়ঃ কোপাদশ্রূণ্যবর্তয়ৎ।' (৮:৬৬:৬০)। দুর্যোধন নিজের সুখী ও কৃতী জীবন স্মরণ করে মৃত্যুকালে বারবার বললেন, 'আমার চেয়ে ভাল মৃত্যু আর কার?— কো নু স্বস্ততরো ময়া।' (৯:৬৩:১৯-২৫) কিন্তু প্রচণ্ড লোকক্ষয়ে তাঁরও মনে দুঃখগ্লানি এসেছিল, তাই মৃত্যুর পূর্বাহ্নে জীবিত আত্মীয়দের

দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার সৌভাগ্য এই যে এই জনক্ষয় থেকে তোমরা ক'জন বেঁচে আছো দেখে যেতে পারছি।' (৯:৬৪:২৬) ধৃতরাষ্ট্র আগেই জানতেন যে পাণ্ডবদেরই জয় হবে। আদিপর্বে তাঁর সেই দীর্ঘ বিলাপের ধ্রুবদই ছিল, 'তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।' কিন্তু যেটা জানতেন না তা হল যুদ্ধের অবসানে তাঁর নিজের জীবনটাই তাঁর কাছে অর্থহীন ও দুর্বহ হয়ে উঠবে। বলছেন, 'কিং নু বন্ধুবিহীনস্য জীবিতেন মমাদ্য বৈ/লুনপক্ষস্য ইব মে জরাজীর্ণস্য পক্ষিণঃ।।— বন্ধুবিহীন অবস্থায় এই প্রাণটা দিয়ে আমার আর কী হবে? আমি যেন আজ ডানা-ভাঙা একটা বুড়ো পাখি।' (৯:১:১১)

অত্যন্ত দৃপ্ত, বলগর্বিত ভীম যুদ্ধের শেষে অধোনাভি আঘাত করে দুর্যোধনকে হত্যা করার জন্য গান্ধারীর কাছে ক্ষমা চাইছেন: 'অধর্মো যদি বা ধর্মস্ত্রাসাত্তত্র ময়া কৃতঃ। আত্মানং ত্রাতুকামেন তন্মে তং ক্ষন্তুমর্হসি।।— ধর্মই হোক অর্ধমই হোক তখন যা করেছি তা ভয়ে, আত্মরক্ষার জন্যেই করেছি। আমার সে অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।' (১১:১৪:২) শৌর্যে দাম্ভিক ভীম আজ তাঁর প্রাণভয়ে আত্মরক্ষার জন্য কৃত অপরাধ স্বীকার করছেন, ক্ষমা চাইছেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির গান্ধারীকে বলছেন: 'পুত্রহন্তা নৃশংসহোহম্ তব দেবি যুধিষ্ঠিরঃ/শাপার্হঃ পৃথিবীনাশ হেতুভুতঃশপস্ব মাম্।।— আমি নৃশংস, আপনার পুত্রদের হত্যাকারী যুধিষ্ঠির, পৃথিবীর ধ্বংসের নিমিত্ত আমি, আমি অভিশাপের যোগ্য, আমাকে অভিশাপ দিন।' (১১:১৫:৩) কোথায় রইল সারা জীবনের সঞ্চিত একটিমাত্র অভিমান— ধর্মপুত্রত্বের? নিজের পক্ষের রাজ্যলোভ দমন করতে না পারার সমস্ত দায় একা মাথা পেতে নিলেন। এই স্বীকারোক্তি বক্তা শ্রোতা উভয়ের পক্ষে মর্মন্তুদ; জীবনের নিরাবরণ রূপ যেন উদ্‌ঘাটিত হল ধর্মপুত্রের আত্মসমালোচনার মধ্যে। যাঁকে পরম ধার্মিক বলে সকলে জেনেছিল, নিজেকে তিনি আজ অপরাধী বলে মেনে নিলেন। এ হল সত্যের নিরঞ্জন রূপ, যেমন কঠিন তেমনই উজ্জ্বল।

দ্রৌপদী, যিনি বীর ক্ষত্রিয় স্বামীদের নিরুদ্যম দেখে বারেবারে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়েছেন, পরুষবাক্যে তাঁদের ধিক্কার দিয়েছেন তিনিও আগে বুঝতে পারেননি যে যুদ্ধে জয় হলেও, পাঁচটি স্বামী জীবিত থাকলেও, সম্রাজ্ঞীপদে তাঁর প্রতিষ্ঠা আসন্ন হলেও জীবন তাঁর কাছে সর্বরিক্ততায় বিবর্ণ, মলিন হয়ে যাবে। গান্ধারীকে বলেছেন, 'কিং রাজ্যেন বৈ কার্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্মম— পুত্রহীনা আমার রাজ্য দিয়ে কী হবে?' (১১:১৫:১৩) সমস্ত কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার অন্তরালেও কী মর্মান্তিক বঞ্চনা ও ব্যর্থতা। মৃত দুর্যোধনের দেহের পাশে দাঁড়িয়ে গান্ধারী বলছেন, 'যুদ্ধে যাওয়ার আগে সে আমার কাছে জয়ের আশীর্বাদ চাইতে এসেছিল— অস্মিন্ জ্ঞাতিসমুদ্ধর্ষে জয়মস্বমা ব্রবীতু মে।' (১১:১৭:৫) আমি পারিনি দিতে; বলেছিলাম যে পক্ষ ধর্ম, জয় সেই পক্ষেই। সেই সত্যনিষ্ঠা আজ মৃত পুত্রের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবার সময়ে মাতৃহৃদয়কে দুঃসহ যন্ত্রণা দিচ্ছে। যুদ্ধশেষে ধর্মনিষ্ঠা গান্ধারী আজ কৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনও সংকোচ রাখলেন না। দুর্যোধনের সত্যকার স্বার্থও ছিল, দাবিও কতকটা ছিল, কিন্তু কৃষ্ণের তো তা ছিল না, তাই গান্ধারী বললেন: 'যস্মাৎ পরস্পরং ঘ্নতো জ্ঞাতয়ঃ কুরুপাণ্ডবাঃ/উপেক্ষিতাস্তে গোবিন্দ তস্মাদ্ জ্ঞাতীন্ বধিষ্যসি।।/হতজ্ঞাতির্হতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ/কুৎসিতেনাভ্যুপায়েন নিধনং

সমবাপ্স্যাসি।।— জ্ঞাতি কুরুপাণ্ডবরা সকলে মারা যাবে। তোমরা জ্ঞাতিরা মৃত, অমাত্যেরা মৃত, পুত্রেরা মৃত এমন অবস্থায় বনে বিচরণ করতে করতে কুৎসিত ভাবে তোমার মৃত্যু হবে।' (১১:২৫:৪০, ৪১) এত কঠিন কথা গান্ধারী কখনও বলেননি। পাণ্ডবদের তিনি ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে ক্ষমা করেননি। তাঁর অভিযোগ যে সম্পূর্ণ সত্য সে কথা মহাভারতকার প্রতিপাদন করেছেন: অভিশাপটি অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। শতপুত্রের মৃত্যুতে নয়, স্বজনহত্যার মতো নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে কৃষ্ণের প্রতি তাঁর এই অসহিষ্ণু উষ্মা। তাঁর চিত্তে এই হত্যাকাণ্ডের হেতু, অনিবার্যতা, এর অপরিমাণ নৃশংসতা, ইত্যাদি আবেগ গভীর ভাবে মথিত হচ্ছিল, তাই কতকটা যেন স্বভাববিরুদ্ধই তাঁর এই ক্রুর অভিশাপ, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভাবে ন্যায়সঙ্গতও বটে। দেখছি, মুখ্য চরিত্রগুলির মধ্যে বাইরের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় অন্তর্লোকে এক প্রবল বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল।

এই হল জীবনের পুনর্মূল্যায়ন, যার চেয়ে মহত্তর উদ্দেশ্য সাহিত্যের আর হতে পারে না। এই মূল্যায়ন ঘটে কঠিন তাপে, বেদনায়; এতে মানুষের চরিত্রের, তার শ্রেষ্ঠ সত্তার রূপান্তর ঘটে। কারণ, 'অসন্তপ্তস্তু যদ্‌তরু প্রত্যেতি প্রকৃতিং পুনঃ— যে কাঠ সন্তপ্ত হয়নি সে তার পূর্বরূপে পুনর্বার ফিরে যায়; পরিবর্তিত বা বিবর্তিত হয় না।' (২৩:১০২:৩১, বঙ্গবাসী) জয়দ্রথ দ্রোণাচার্যকে প্রশ্ন করছেন, কুরুপাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা ও অস্ত্রগুরু তো একই, তবু পাণ্ডবরাই সর্বদাই জয়ী হয় কেন? দ্রোণাচার্য বললেন: 'সমমাচার্যকং তাত তব চৈবার্জুনস্য হি। যোগাদ্দুঃখোচিতত্বাচ্চ তন্মাত্ত্বতোত্তাধিকোহর্জুনঃ।।— তোমার ও অর্জুনের আচার্য একই, কিন্তু, অর্জুনের শিক্ষার সঙ্গে আছে যোগ, আর বিদ্যাকে সে অর্জন করেছে দুঃখের মূল্যে, এইখানেই অর্জুন তোমার চেয়ে বড়।' (৭:৭২:২৩ বঙ্গবাসী) সঞ্জয় নিরন্তর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন, 'তোমার আত্মীয়বিনাশ বর্ণনা করছি, তুমি শান্ত হয়ে দুর্ধর শোককে ধারণ কর— হন্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি সর্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান/শুশ্রূষস্ব স্থিরো ভূত্বা তব হ্যাপনয়ো মহান্।।' (৭:৬২:১)

এই ভাবে সমস্ত যুদ্ধের বর্ণনা, কৌরবপক্ষের বীরপুত্র ও আত্মীয়বন্ধুদের বিনাশের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের প্রায়শ্চিত্ত চলছিল আঠারো দিন ধরে। মোহ ছিন্ন হলে, যুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির তাঁকে সসম্মানে প্রাসাদে রাখলেও তাঁর মনে হল অরণ্যই এখন তাঁর যথার্থ আশ্রয়। তাঁর অন্তর্দাহ বাড়িয়ে তুলবার জন্য সঞ্জয় তাঁকে বলেছিলেন, 'স্বয়ং পীত্বা মহারাজ কালকূটং সুদুর্জয়ম/তস্যোদানীং ফলং কৃৎস্নমবাপ্নুহি নরোত্তম।।— দুঃসহ কালকূট বিষ তুমি স্বেচ্ছায় পান করেছ, মহারাজা এ বারে তার ফল ভোগ কর।' (৭:১৩৩৩:২ বঙ্গবাসী) আবার স্ত্রীপর্বে যুদ্ধের অবসানে, 'জনপদিকং দুঃখমেকঃ শোচিতুমর্হসি— সমস্ত জনপদের এ শোক, এ কি তুমি একা বহন করতে পার মহারাজ? সে চেষ্টাও কোরো না।' (১১:২:১৬) দ্রোণপর্বে শুনি, 'পৃথিবীকে পাওয়ার জন্যে পৃথিবীপতি রাজারা যুদ্ধ করেছেন, আজ মৃত্যুর পরে সেই পৃথিবীকে প্রিয়বধূর মতো আলিঙ্গন কবে নিদ্রিত আছেন— পৃথিব্যাং পৃথিবীহেতোঃ

পৃথিবীপতয়ো হতাঃ/পৃথিবীমুপগৃহ্যাঙ্গৈঃ সুপআঃ কান্তামিব প্রিয়াম।।' (৭:১৪৬:৪৭ বঙ্গবাসী) কী নিষ্ঠুর শ্লেষ! এই কী তাঁদের পৃথিবীকে লাভ করা?

যুদ্ধে কার লাভ? 'যথা বরাহস্য শুনশ্চ যুধ্যতোস্তয়োরভাবে শ্বপচস্য লাভঃ— বরাহ ও কুকুর যুদ্ধ করে মরলে লাভ চণ্ডালের।' (৭:১৮০:৮ বঙ্গবাসী) কোনও মোহ নেই কবির। যুযুধান জাতিরা চিরকালই ভুলে যায় যে, যুদ্ধে লাভ সম্পূর্ণ অন্য এক শ্রেণির মানুষের। তাই ভীষ্ম ও দ্রোণ দুর্যোধনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'পৃথিবীং ভ্রাতৃভাবেন ভুজ্যতাং বিজ্বরো ভব— পৃথিবীকে ভ্রাতৃ ভাবে ভোগ কর, তোমার জ্বর ছেড়ে যাক।' (৫:১২৬:১৮) লক্ষ করি লোভকে জ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, অর্থাৎ এটা সুস্থ অবস্থা নয়। 'যে একা, ভাল খায়, ভাল পরে, ভৃত্যাদের তার ভাগ দেয় না, তার চেয়ে নৃশংসতর আর কে আছে?— একঃ সম্পন্নমশ্নাতি বস্তে বাসশ্চ শোভনম্/যোহসংবিভজ্য ভৃত্যেভ্যঃ কঃ নৃশংসতরস্ততঃ।।' (৫:৩৩:৪৫) এই লোভ থেকেই সে দিন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছিল, আজও জ্বলে। ক্ষত্রিয় মহাকাব্যে স্বর্গের কল্পনা হল, 'যেখানে শত্রুতা নেই'— স্বর্গোহয়ং নেহ বৈরানি ভবন্তি মানুষাধিপ।' (১৮:১:১৮)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রথম দিন দু'পক্ষ সসজ্জ ভাবে উপস্থিত, শঙ্খধ্বনি হলেই যুদ্ধ শুরু হবে; হঠাৎ যুধিষ্ঠির ছুটে গিয়ে একে একে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য সকলের পায়ে ধরে শান্তিভিক্ষা চাইলেন। বললেন, বন্ধ করুন এ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। প্রত্যেকে সে দিন তাঁকে একই উত্তর দিলেন: অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ/ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোহস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ/অতস্ত্বাং ক্লীববদ্ধাক্যং ব্রবীমি কুরুনন্দন/ভৃতোহস্ম্যর্থেন কৌরব্য যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি।।— 'পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়; এইটিই সত্য; মহারাজ, অর্থের জন্যে বাঁধা পড়েছি কৌরবদের কাছে। তাই, যুধিষ্ঠির, ক্লীবের মতো এ কথা তোমাকে বলছি, অর্থে কৌরবরা আমাদের ভরণ করেছে, যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু চাও তো বল।' (৬:৪:৪১, ৪২) এঁরা প্রত্যেকেই শস্ত্রবিৎ, শাস্ত্রবিৎ, বিচক্ষণ ও শ্রদ্ধেয়, কিন্তু কোনও না কোনও স্বার্থে এঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের সভায়। দ্রোণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে, ভীষ্ম স্ববংশের টানে, কৃপ শিষ্যবাৎসল্যে— এবং পরে অন্যায় জেনেও আর কৌরবপক্ষ ত্যাগ করতে পারেননি। কাজেই দুস্তর নৈতিক সংকট যখন উপস্থিত তখন যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত অনুরোধ রাখতে পারলেন না। ক্লীবের মতো বলতে বাধ্য হলেন, টাকায় বাঁধা পড়েছি, কৌরবরা ভরণ করেছে, আমরা তাদের অন্নদাস; এখন পরাজয়, মৃত্যু তাদের সঙ্গেই হবে আমাদের; সমস্ত অন্যায় জেনেও সেখান থেকে আর সরে আসতে পারব না। ক্ষুদ্র ঐহিক স্বার্থে একবার বিবেক বিসর্জন দিলে কি মর্মান্তিক গ্লানির মধ্যে তার মূল্য শোধ করতে হয় এর চেয়ে তার ভাল উদাহরণ আর চোখে পড়ে না। দুটি কর্তব্যের বিরোধ: এক দিকে অন্নঋণ ও আনুগত্য আর ন্যায়, ধর্ম, শান্তির চেষ্টা আর এক দিকে। কিন্তু পূর্বকৃত অপরাধ তাঁদের সৎপথে ফেরার পথ রুদ্ধ করেছে। জীবনের পুনর্মূল্যায়নে এঁদের জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের ও সমস্যার কত বিবর্তনই দেখতে পাওয়া গেল।

শিখণ্ডির আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করছেন অর্জুন; তখন, 'শ্ময়মানস্তু গাঙ্গেয়স্তান্ বাণান্ জগৃহে তদা— উষ্ণার্তো হি নরো যদ্বজ্জলধারাঃ প্রতীচ্ছতি। তথা জগ্রাহ গাঙ্গেয়ঃ শরধারাঃ শিখণ্ডিনঃ ।।— প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহের পরে যে দিন প্রথম বৃষ্টি নামে তখন মানুষ যেমন (ছুটে বাইরে গিয়ে) সারা দেহে সে-ধারাপাতের আরাম উপভোগ করে তেমনই করেই ভীষ্ম ঈষৎ হেসে সারা দেহ পেতে দিয়ে অর্জুনের শরধারা গ্রহণ করলেন।' (৬:১১৭:২৩, ২৪) দেখতে পাচ্ছি, পলিতকেশ বৃদ্ধের কী মর্মান্তিক উপলব্ধি, জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে। পুত্রপৌত্রপ্রতিম যোদ্ধাদের হত্যা করতে হচ্ছে দিনের পর দিন; অথচ এ স্বজনঘাতী যুদ্ধ তো অনিবার্য ছিল না। সভাপর্বে বৃদ্ধ পিতামহ ক্লীবের মতো রাজকুলবধূ দ্রৌপদীর নির্মম লাঞ্ছনা দেখেছেন নিষ্প্রতিবাদ নীরবতায়, যুদ্ধের পূর্বক্ষণে যুধিষ্ঠিরের ঐকান্তিক মিনতি প্রত্যাখ্যান করেছেন ক্লীবের মতো দৈন্যে; তাই যেন ক্লীববৎ শিখণ্ডির আড়াল থেকে আজ মৃত্যুবাণ আসছে। জীবনের রৌদ্রদাহে তপ্ত ভীষ্ম আসন্ন মৃত্যুকে দেখছেন কাঙ্ক্ষিত দাহশান্তির মতো, পরমা মুক্তির মত। জীবনের যে সব অমীমাংসিত নৈতিক সংঘাতে তিনি পরাস্ত আজ মৃত্যু তার সমাধান আনছে। ইচ্ছামৃত্যুর বর সফল হতে চলল; মৃত্যু আজ তাঁর কাম্য, জীবনই দুর্বহ। ভীষ্মের জীবন যেন কুরুকুলের প্রতীক; নিঃশেষ হয়ে তবে সে জীবনের সব ঋণ শোধ করে দেবে।

যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র, তাঁর ধর্মবুদ্ধিকে সকলে আদর্শস্থানীয় মনে করেছে, অথচ অন্তরের দিকে কত বিধ্বস্ত এই মানুষটি। গীতায় শুনি, 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি— 'কল্যাণকারীর কখনও দুর্গতি হয় না।' (৬:৬:৪০) আপাত অর্থে এ কথা তো সত্য হতেই পারে না: কুন্তী, দ্রৌপদী, পঞ্চপাণ্ডব, গান্ধারী এঁরা সকলেই তো কল্যাণকারী, অথচ জীবনে এঁরা কী পেলেন? মনে হয়, মহাভারত দুর্গতির অন্য এক সংজ্ঞা মেনেছে; বলেছে, 'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ/আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী কৃতস্যাপ্যকৃতস্য চ ।।— মানুষের অন্তরাত্মাই তার বন্ধু, শত্রুও সে, তার কৃত ও অকৃত কাজের সাক্ষীও তার অন্তরাত্মা।' (১৩:৭:২৪) অর্থাৎ মানুষের শেষ জবাবদিহিটা তার নিজের কাছেই। এইখানে যে কল্যাণকারী তার দুর্গতি নেই। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি: 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে/সে পায় তোমার হাতে/শান্তির অক্ষয় অধিকার।' সমস্ত কল্যাণকারীই এই শান্তিতে অবিচল। শ্রেয় ও প্রেয়ের সংঘাতে যে মানুষ সমষ্টির স্বার্থের কাছে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে বলি দিতে পেরেছে বলে নির্মল বিবেকের অধিকারী, তার লাভ চূড়ান্ত ও অনিঃশেষ। 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিত্বা ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ।।— যে বস্তু লাভ করে মানুষ অন্য কোনও লাভকে তার চেয়ে বড় মনে করে না, যাতে স্থিতিলাভ করে সে গুরুভার দুঃখেও বিচলিত হয় না।' (৬:৬:২২)

মহাভারত যদি ধর্মের অন্বেষণ করে থাকে, যে ধর্ম মানুষকে ধারণ করে তার সুখেদুঃখে সর্বসঙ্কটে; সকল নৈতিক সংশয়ে, শ্রেয় ও প্রেয়ের সংঘাতে তার পথ আলোকিত করে ও তার আত্মাকে আশ্রয় দেয় তবে এই সে ধর্ম। বাকি সবই এ মহাকাব্যে বহিরঙ্গ। 'বহুজনহিতায়

বহুজনসুখায় লোকানুকম্পয়ৈ মহতো জনকায়স্যার্থায়...' *ললিতবিস্তার*-এ সত্যসন্ধানী বুদ্ধ ধর্মের এই মানদণ্ড স্থাপনা করেছেন, 'বহুজনের মঙ্গলে, বহুজনের সুখে, লোকের প্রতি অনুকম্পায় সকল মানুষের কল্যাণে যা নিযুক্ত।' এই ধর্মের জন্যে সংকীর্ণ স্বার্থকে যে ত্যাগ করতে পেরেছে সে বাইরে যতই বঞ্চিত হোক না কেন, 'কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে/শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে/আপন ভাণ্ডারে।'

ধৃতরাষ্ট্র উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠেছেন যুদ্ধের পূর্বরাত্রে, ব্যাস তাঁকে দিব্যদৃষ্টির বর দিতে চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন, 'ন রোচয়ে জ্ঞাতিবধং দ্রষ্টুং ব্রহ্মর্ষিসত্তম— জ্ঞাতিবধ দেখার অভিরুচি আমার নেই।' সে রাত্রে ঘুম আসছে না, সঞ্জয়কে বললেন, দিব্যদৃষ্টি পেয়েছ, সঞ্জয়, বল এই সপ্তদ্বীপা বসুমতীর কথা। জম্বুদ্বীপের প্রসঙ্গে একে একে বর্ষগুলির কথা উঠতে বললেন, 'যদিদং ভারতং বর্ষং যত্রেদং মূর্ছিতং বলম /যত্রাতিমাত্রলুব্ধোহয়ং পুত্রো দুর্যোধনো মম। যত্র লুব্ধাঃ পাণ্ডুপুত্রাঃ— এই যে-ভারতবর্ষ যেখানে বাহুবল অস্ত্রবল নিজেকে প্রকাশ করেছে, যেখানে আমার পুত্র দুর্যোধন অতিমাত্র লুব্ধ। যেখানে পাণ্ডুপুত্ররাও লুব্ধ।' এই পর্যন্ত শুনে মনে হয় ধৃতরাষ্ট্র এ বার ধিক্কার দেবেন এই দেশকে যেখানে বাহুবল, অস্ত্রবল এবং লোভের এত নির্লজ্জ প্রকাশ। কিন্তু তিনি কথা শেষ করলেন কী বলে? 'যত্র মে সজ্জতে মনঃ— যেখানে আমার মন আসক্ত।' কী দুঃসাহসিক সত্যনিষ্ঠা! সমস্ত অন্যায় ও অমঙ্গল এখানেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তবু এই আমার দেশ, মন আমার এখানেই আসক্ত।

স্বর্গারোহণ পর্বে যুধিষ্ঠির কৌরব পাণ্ডব ভাইদের দেখতে চাইলে ইন্দ্র বিদ্রূপ করে বললেন, 'কিং মানুষং স্নেহমদ্যপি পরিকর্ষসি'— পৃথিবীর মানুষের প্রতি মানুষের যে টান তাকে তুমি স্বর্গেও টেনে এনেছ?' (১৮:৩:৩১) যুধিষ্ঠির বললেন, তারা যেখানে সেই আমার স্বর্গ, তাদের ছেড়ে এ স্বর্গে আমার বিন্দুমাত্র রুচি নেই। মহাপ্রস্থানের সময়ে ভক্ত সহচর কুকুরটিকে ছেড়ে আসবার প্রস্তাবে যুধিষ্ঠির বললেন, 'সবাই জানে মৃতের সঙ্গে জীবিতের সন্ধিও নেই, বিগ্রহও নেই; এটি তো আমার জীবিত ভক্ত, একে ছাড়ব কেন?— ন বিদ্যতে সন্ধিরথাপি বিগ্রহো মৃতৈর্মর্ত্যৈরিতি লোকেষু নিষ্ঠা।' (১৭:৩:১১) 'তেমন শ্রীবৃদ্ধি যেন আমার ন হয় যার জন্যে অনুগতজনকে পরিত্যাগ করতে হয়'— মা মে শ্রিয়া সংগমনমস্তু যস্যাঃ কৃতে ভক্তজনং ত্যজেয়ম্।' (১৭:৩:৯) এ হল পৃথিবীর চোখে স্বর্গ দেখা, পৃথিবীর স্নেহমমতার বন্ধন এখানে চূড়ান্ত স্বীকৃতি পেয়ে জয়যুক্ত হয়েছে; এ হল প্রাণীর প্রতি প্রাণের টানের জয় ঘোষণা। এর ঊর্ধ্বে যুধিষ্ঠির উঠতে চাননি এবং দেবদূত বা ইন্দ্র শেষ পর্যন্ত তাঁর মানবিক আকর্ষণ ও আনুগত্যের মর্যাদা দিতে বাধ্য হলেন। মহাকাব্যের ভাষায় কুকুরটি সাক্ষাৎ ধর্ম। মানুষ যাকে আত্যন্তিক প্রয়োজনে জীবনের শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সঙ্গে রেখে গৌরবান্বিত করে এবং নিঃশেষ মূল্যে মর্যাদা দেয় তাই তো ধর্ম।

পরিশেষে *মহাভারত*-এর কয়েকটি রূপকের আলোচনা করব যেগুলি সবই প্রত্যক্ষ ভাবে রূবক না হলেও রূপক ব্যঞ্জনা বহন করে। প্রথমত দ্যূতসভা। বৈদিক যুগে রাজসূয় যজ্ঞের আগে ভাবী রাজাকে জুয়া খেলতে হত; এই আনুষ্ঠানিক কৃত্যটি মহাভারতে অন্য তাৎপর্য

নিয়ে আসে। ক্ষত্রিয় যোদ্ধার কাছে সমস্ত জীবনটাই একটা বড় রকম জুয়াখেলা, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর; পরিণত বয়সে আত্মীয়বন্ধু পরিবৃত শয্যায় দেহত্যাগ করা তার ভাগ্যে কমই ঘটত। তাকে সারা জীবন প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হত, যা তার ন্যায্য প্রাপ্য তা অর্জন করতে, যা তার শক্তির আয়ত্ত তা জিতে নিতে এবং যার ভোগ্য তা রক্ষা করতে। এতে কখনও জয়, কখনও বা পরাজয় এবং মৃত্যু। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্তর্লীন ভাগ্য পরীক্ষা ও তার অনিশ্চিত ফলাফলের ছায়া দেখা যায় এই দ্যূতসভায়। এটি ঘটনাও বটে, প্রতীকও বটে।

মৌষলপর্বে এক গর্হিত কৌতুকের অপরাধে যদুবংশ ধ্বংস হল, লৌহ মুষলের আঘাতে। লক্ষণীয়, মুষল এখানে যেন স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রের ভূমিকা নিয়েছে। এর পিছনে অবশ্যই গান্ধারীর অভিশাপ আছে, কিন্তু বর্ণনাটি প্রতীকী। যদুবংশীয়েরা উন্মত্তের মতো নিজেদের আত্মীয়বন্ধুদের নিজেরাই হত্যা করতে লাগল; অস্ত্র যেন এখানে অস্ত্রধারীর ভূমিকায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও তো ভ্রাতৃঘাতী, সেখানে কৃষ্ণের প্ররোচনায় পাণ্ডবরা ক্ষত্রিয়োচিত এবং বীরোচিত সমস্ত প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে কৌরব মহারথীদের হত্যা করেছিল। মনুষ্যত্ব সে দিন অবনমিত হয়েছিল। মৌষলপর্বে মারণাস্ত্র যেন প্রাণবন্ত হয়ে গান্ধারীর অভিশাপ সফল করল আর এক ভ্রাতৃঘাতী হত্যাকাণ্ডে; কৃষ্ণের বংশের বিনাশেই যেন কুরুক্ষেত্রের যথার্থ উপসংহার।

শান্তিপর্বে একটি কাহিনি আছে: সৃষ্টির পরে ব্রহ্মা যখন সৃষ্টিরক্ষা নিয়ে চিন্তিত তখন একটি নারী দেখা দিল। ব্রহ্মা তাকে সৃষ্টি ধ্বংস করতে বললে সে অশ্রুপাত করল। ব্রাহ্মা করপটে সে অশ্রু ধারণ করলেন, এগুলি ব্যাধি। নারীটি তপস্যায় গেল, ব্রহ্মা তাকে আবার সৃষ্টি ধ্বংসের ভার দিলেন। সে মৃত্যু ভিক্ষা চাইল: মানুষের রিপুই যেন তার ধ্বংসের কারণ হয়, ব্রহ্মা বললেন, তথাস্তু। (১২:২৪৮-২৫০ বঙ্গবাসী) এ-কাহিনি নিশ্চয়ই সব মৃত্যুর ব্যাখ্যা নয়, তবু এই রূপকের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সর্বব্যাপী ধ্বংসের একটি রূপক সূত্র নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

তৃতীয় একটি রূপক অগ্নিদাহ; এটি তিনবার এসেছে। প্রথমে জতুগৃহ দাহে, সেখানে উদ্দিষ্ট দাহ্যব্যক্তি অর্থাৎ পাণ্ডবরা ও কুন্তী মুক্তি পেলেন, কিন্তু নিরপরাধ এক নিষাধ পরিবারের ছ'টি মানুষ কুন্তীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে প্রাণ হারাল। দ্বিতীয় অগ্নিকাণ্ড খাণ্ডবদহনে; সেখানেও কৃষ্ণ ও অর্জুনের উদ্যোগে বহু নিরপরাধ অরণ্যবাসী প্রাণী প্রাণ হারায়; বেঁচে থাকে তক্ষক, প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে। তৃতীয় অগ্নিদাহ আশ্রমবাসিক পর্বে; সেখানে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের মৃত্যু ঘটে দাবানলে। কিন্তু এ সবের অন্তরালে আর একটি বৃহত্তর অগ্নিকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে, যেটির প্রতীক বাকি সব অগ্নিকাণ্ডগুলি। কুরুক্ষেত্রে কৌরবকুল ও পাণ্ডবকুল ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, মাৎসর্য ও দম্ভের অগ্নিতে আঠারো দিন ধরে জ্বলে নিঃশেষ-প্রায়। সেই দাবদাহের অন্যতম মুখ্য কর্তা ধৃতরাষ্ট্র, আশ্রমে দাবানলে তাঁর মৃত্যু হল। নিরপরাধ গান্ধারী ও সঞ্জয়ও দগ্ধ হলেন কারণ জীবন তো এমনই, সে কৃপা করে না কৃপাপাত্রকে। আর কুন্তী? নিজের সন্তানদের বাঁচাতে তিনি জতুগৃহে বলি দিয়েছিলেন নিষাদী ও তার সন্তানদের; অগ্নিদাহে মৃত্যু তো তাঁর পাওনাই ছিল জীবনের

কাছে। সমস্ত যুদ্ধ বর্ণনার প্রধানত উপমান হল অগ্নি— তার তেজ, দাহিকাশক্তি, শিখা, স্ফুলিঙ্গ, ধূম, দীপ্তি ও প্রলয়ঙ্কর রূপ। এ সব কি শুধু অস্ত্রের ও বীরত্বের উপমান? মনে হয় না; বরং মনে হয়, একটা আগুন সারা মহাকাব্য জুড়েই জ্বলেছে, কখনও প্রতীকে প্রচ্ছন্ন ভাবে তুষাগ্নির মতো, কখনও প্রকাশ্যে দাবাগ্নির মতো। এবং পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংঘাতে লোভের, ক্রোধের ইন্ধনে জ্বলে-ওঠা এই আগুনের দুঃসহ জ্বালার ভেতরে জ্বলে জ্বলে জীবনের শ্যামিকা বা খাদ পুড়ে সৃষ্টি করেছে এই অনুপম স্বর্ণসমুজ্জ্বল জীবনবোধের। বিরুদ্ধে আগেবের যুগপৎ সমাবেশ ও অন্তর্নিহিত আততিই (tension) সৃষ্টি করে মহৎ কাব্যকে। আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাত, চরিত্র ও ভাগ্যের সংঘর্ষ, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান, যোগ্যতা ও সার্থকতার পার্থক্য— এই সবের মধ্যে নিহিত সেই আততি যা সৃষ্টি করেছে: এ মহাকাব্যের অন্তর্গূঢ় চাপ ও তাপ, যার থেকে উৎসারিত এর মহত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব।

স্ত্রীপর্বে একটি রূপক পাই। যুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির যখন অন্তরে বাহিরে সর্বস্বান্ত বোধ করছেন ও বেঁচে থাকার কোনও সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন:

> এক গভীর অরণ্যে একটি কূপ আছে, এক ব্রাহ্মণ সেই তৃণাচ্ছন্ন কূপটি না দেখতে পেয়ে তার মধ্যে পড়ে গেল। পড়বার সময়ে কুয়োপাড়ের একটি লতাকে ধরে লম্বিল হয়ে রইল, পা ঊর্ধ্বে, মাথা নীচে। কুয়োর পাড়ে একটি প্রকাণ্ড মহাগজ ধীরে ধীরে সে দিকে এগোচ্ছে। এ দিকে যে লতাটিকে অবলম্বন করে লোকটি ঝুলে আছে ইঁদুরে তার গোড়া কাটছে, অর্থাৎ যে-কোনও মুহূর্তে লতাটি উন্মুলিত হবে এবং তখনই লোকটির অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, কারণ কুয়োর নীচে এক মহাসর্প। ...ওপরে লতার পুষ্পিত শাখায় মৌচাক, মৌমাছির ঝাঁক আনাগোনা করছে। এই বিপৎসঙ্কুল অবস্থায় লোকটি নিরুপায় ভাবে লম্বিত আছে... শুধু মধ্যে মধ্যে ওপরের মৌচাক থেকে বিন্দু বিন্দু মধু তার মুখে ঝরে পড়ছে। তাতে তার তৃষ্ণা মিটছে না, বরং বেড়েই চলেছে।

বিদুর উপসংহারে বললেন, এই হল জীবন, মহারাজ।

মনে রাখতে হবে মূল মহাভারতের আদি সংস্করণ স্ত্রীপর্বেই শেষ হয়েছিল। জীবনে বিতৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উপলক্ষ্য করে জীবন সম্বন্ধে চিরন্তন তাৎপর্যপূর্ণ এই প্রলম্বিত রূপকটি তাই মূল মহাভারতের অন্তভাগেই স্থান পেয়েছে। রোগব্যাধি,জরা, নানা রিপুর আনাগোনা, নিরন্তর প্রাণসংশয়, আসন্ন অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, এ সবের মধ্যে জীবন মানুষকে কী দিয়ে মুগ্ধ করে রাখে? ওই মধু। প্রত্যেক জীবনেই কোনও না কোনও উৎস থেকে বিন্দু বিন্দু মধু এসে পড়ছে, তাই এই সর্বতো ভাবে বিপন্ন ও অনিশ্চিত জীবনেও এত আসক্তি মানুষের।

যে দেশ জীবনকে মায়া বলেছে এ তো তার বাণী নয়; ওই মধুটুক তো সম্পূর্ণ সত্যই। তা না হলে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের কালো পর্দাটার সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের এই জয়গান আসে কোথা থেকে?— *মহাভারত*-এ মানুষ যে বলছে: 'জীবন আমাকে কিছু দেবে বলে নয়, আমার শ্রেষ্ঠ সত্তা থেকে আমি জীবনকে কিছু দেওয়ার স্পর্ধা রাখি, এ স্পর্ধা আমার সমস্ত মানুষের হয়ে।' একমাত্র মানুষই সমস্ত মানুষের ঊর্ধ্বে উঠে জীবনকে মহিমান্বিত

করতে পারে। গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কের মতো বাইরে তার অবধারিত পরাজয় থাকলেও চরম বিজয়ের উৎস তার অন্তরাত্মার মধ্যেই নিহিত; সেখানে সে নিত্যবিজয়ী।

সব মহাকাব্যেই জীবনজিজ্ঞাসা কোনও না কোনও রূপে প্রতিফলিত, যদিও সব মহাকাব্যে তার ব্যাপ্তি বা গভীরতার পরিমাণ এক নয়। আদি মহাকাব্য *গিলগামেশ* থেকেই দেখি এই জীবন জিজ্ঞাসাই মহাকবির মুখ্য প্রেরণা। কিন্তু *মহাভারত*-এ যে জিজ্ঞাসা, জীবনের মূল্যবোধের অন্বেষণা এবং চরিত্র, ঘটনা ও উপলব্ধির মধ্যে সে বোধের যে পুনর্মূল্যায়ন, তার প্রসার ও গভীরতা অন্য কোনও মহাকাব্যেই নেই। বোধহয় এ কথা বললেও খুব অত্যুক্তি হবে না যে, বাকি সবকটি মহাকাব্য মিলে মানবিক মূল্যবোধের যে মাননির্ণয়ের চেষ্টা, এক *মহাভারত*-তেই তা পূর্ণ ভাবে বিকশিত। সুপ্রচুর অবান্তর প্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও যেখানে মূল মহাকাব্যের জীবনজিজ্ঞাসা প্রতিবিম্বিত, সেখানে তা জীবনবিমুখ নয়, জীবনমুখীন। *মহাভারত*-এ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দার্শনিকতা, বৈরাগ্য, ত্যাগের, অনাসক্তির প্রচুর উপদেশ, বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের জীবন সম্বন্ধে অনীহার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ সব ছাপিয়ে তো একটি অপরিম্লান ছবি থেকে যায়: চতুর্দিকে বিপৎসঙ্কুল কূপের মধ্যে আলম্বিত ওই মানুষটি, যার মুখে বিন্দু বিন্দু মধু ঝরে পড়ছে বলেই যে জীবনের সব বঞ্চনা, সব দুঃসহ দুঃখ-বিপদ-গ্লানি সইতে পারছে।

মহাভারত বলেছে, 'গুহ্যং ব্রহ্ম যদিদং তে ব্রবীম্যি ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরম হি কিঞ্চিৎ— গোপন একটি তত্ত্ব তোমাকে বলি: মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নেই।' (১২:২৮৮:২০) *মহাভারত*-এর বিরাট অংশ জুড়ে মায়াবাদ ও বৈরাগ্যের এত যে রাশি রাশি শুকনো পাতা সবই উড়ে গেল উপলব্ধির এক প্রবল ঝড়ে। রয়ে গেল শাশ্বত মানুষ— তার দৈন্য, কুশ্রীতা, অপূর্ণতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আদর্শ, তার সাধ-স্বপ্ন-বেদনার মর্মান্তিক টানাপোড়েন নিয়ে। তাহলে দেবতা? রবীন্দ্রনাথের বোধে 'নিদারুণ দুঃখরাতে/মৃত্যুঘাতে/মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা/তখনও দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?' নিদারুণ দুঃখ সংশয়ের সংঘাতের মধ্যে, নিষ্ঠুর বঞ্চনা ও ব্যর্থতার মধ্যে আপন আন্তর তেজে এসব কিছুকেই জয় করে মানুষ তার মর্ত্যসীমা লঙ্ঘন করে দেবতা হয়ে উঠেছে। বহু চরিত্রে, বহুতর ঘটনার বিন্যাসে এ সত্য প্রতিপাদন করেছে *মহাভারত*; তাই মহাকাব্যের বিচারে এর স্থান পৃথিবীর সমস্ত মহাকাব্যের শীর্ষস্থানে। প্রথম অধ্যায়েই এ মহাকাব্যের পরিচয়: 'ভারতস্য বপুর্হ্যেতৎ সত্যঞ্চামৃতমেব চ— *মহাভারত* হল ভারতের কলেবর, সত্য ও অমৃত।' (১:১:২০১)

নারীর স্থান: *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এ

রামায়ণ

রচনাকালের দিক থেকে দেখলে *রামায়ণ* খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় থেকে খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের মধ্যে রচিত; *মহাভারত* রচনা সম্ভবত শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতক থেকে এবং শেষ হয় খ্রিস্টিয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে। অর্থাৎ বুদ্ধের পরের আট বা ন'শ' বছরের মধ্যে এ দুটি মহাকাব্য রচিত হয়; এদের মধ্যে *মহাভারত* আগে শুরু হয়ে পরে শেষ হয়; *রামায়ণ* পরে শুরু হয়ে আগে শেষ হয়; আগে পূর্ণকলেবর মহাকাব্যের রূপ পায় বলেই সম্ভবত এর নাম আদিকাব্য। মনে রাখতে হবে, রামায়ণ শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে; কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*, বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*, *শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা* এবং *মনুসংহিতা*, এই ক্রান্তিকালের রচনা। এর কিছু পরেই শুরু হয়ে যায় পুরাণগুলির রচনা। *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এ পরবর্তী সংযোজিত অংশগুলি অভিপৌরাণিক, অর্থাৎ পুরাণে প্রতিফলিত যে সামাজিক মূল্যবোধ ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সমাবেশে ভারতীয় ধর্মচিন্তা তার বিবর্তিত রূপে ক্রমে 'হিন্দুধর্ম' বলে অভিহিত হল, এই অভিপৌরাণিক অংশেই আমরা সেগুলির সাক্ষাৎ পাই। এ দিকে *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর মূল কাহিনি দুটি সম্ভবত অনেক প্রাচীনকাল থেকেই গাথায় ও আখ্যানে জনমানসে সঞ্চরণ করছিল; ফলে মহাকাব্য দুটিতে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের দুটি চিত্র পাই: একটি মূল কাহিনির আর একটি সংযোজিত বা প্রক্ষিপ্ত অভিপৌরাণিক অংশের।

প্রথমে *রামায়ণ*-এর কথাই ধরা যাক। যেহেতু এর রচনা শুরু হয় পরে, সে জন্যে এর মূল অংশের মধ্যেই ওই অভিপৌরাণিক অংশের কিছু অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তবু দেখি কৈকেয়ীর সাহস হয় রাজাকে পূর্ব প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করতে; লক্ষ্মণ বনগমন করলেও ঊর্মিলা তাঁর সঙ্গে না গিয়ে প্রাসাদেই থেকে গেলেন; দশরথের মৃত্যুর পরে রানিরা 'সতী' হননি, বিধবা অবস্থায় বেঁচেই রইলেন। মন্দোদরী বিলাপ করবার সময়ে স্বামীকে নিন্দা করে বলছেন:

> ন কুলেন ন রূপেণ ন দাক্ষিণ্যেন মৈথিলী।
> ময়াধিকা বা তুল্যা বা তত্ত্ব মোহান্ন বুধ্যসে।।

সীতা বংশগৌরবে, রূপে বা দাক্ষিণ্যে (কিছুতেই) আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, এমনকী আমার তুল্যও নয়, তুমি মোহবশে সে কথা বুঝলে না। (৬:১১১:২৮)

স্বামীগর্বে অনেক প্রশংসা করলেন রাবণের রূপ, গুণ, শৌর্য ও চরিত্রের। কিন্তু দোষও দিলেন:

ত্বয়া কৃতমিদং সর্বমনাথং রাক্ষসং কুলম্।
সুহৃদাং হিতকামানাং ন শ্রুতং বচনং ত্বয়া।।

তুমি এই সমগ্র রাক্ষসকুলকে অনাথ করেছ; হিতৈষী বন্ধুদের কথা তুমি শুনলে না। (৬:১১১:৭৬)

শুধু যে রাক্ষসনারী বলে মন্দোদরীই নিন্দা করেছেন স্বামীর তা নয়, রামচন্দ্র প্রত্যাখ্যান করার পরে সীতাও বলেছিলেন:

মদধীনং তু যত্তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী।।

আমার নিজের আয়ত্তে আমার যে মন তা তো তোমাতেই আছে, আমার যে শরীরটা পরাধীন সেটার সম্বন্ধে অক্ষম আমি কি করব। (৬:১১৬:৯)

আগেও রামচন্দ্রকে বলেছিলেন: স্বেন চারিত্রেণ তে শপে— আমার চরিত্রের শপথ করে বলছি। (৬:১১৬:৬) আরও বললেন:

সহ সংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেণ চ মানদ।
যদি তেহহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্।।

তুমি আমি একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি সেই (এত দিনের) সংসর্গেও যদি তুমি আমাকে না জেনে থাক তবে তো চিরদিনের জন্যেই আমি হতভাগিনী। (৬:১১৬:১০)

এই সীতা, রামায়ণে যিনি শুধুই মুখ্য নয়, বলতে গেলে একমাত্র নারীচরিত্র, তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলেই রামায়ণে নারীর স্থান সম্বন্ধে একটা ধারণা হবে। রাক্ষস অকম্পন সীতার বর্ণনা করেছিল:

নৈব দেবী ন গন্ধর্বী নাপ্সরা ন চ পন্নগী।
তুল্যা সীমন্তিনী তস্যা মানুষী তু কুতো ভবেৎ।।

দেবী, গন্ধর্বী, অপ্সরা, নাগিনী কোনও নারীই সীতার সমকক্ষ নয়, মানুষী বা কেমন করে তাঁর তুল্য হবে? (৩:৩১:৩০)

এই অনন্যা নারী স্বামীর বনগমনের সংবাদ পেয়েই তৎক্ষণাৎ মনস্থির করলেন তিনিও বনে যাবেন। মূল কাহিনিতে সম্ভবত সীতা স্বামীর বিরহের আশঙ্কাতেই বনে যেতে চেয়েছিলেন, পরে যে-সব সংযোজন হল তার মধ্যে সেই অভিপ্রায়টিকে চিনে নেওয়া যায়; যেমন সীতা বলছেন:

ত্বয়া বিনা নরব্যাঘ্র নাহং তদপি·রোচয়ে।
বা, ত্বদ্বিয়োগেন মে রাম ত্যক্তব্যমিহ জীবিতম্।
অথবা, উদ্ভ্রিতায়াস্ত্বয়া নাথ তদৈব মরণং বরম্।
ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্তমপি নোৎসহে

হে নরব্যাঘ্র তোমাকে বাদ দিয়ে আমার স্বর্গেও রুচি নেই। (২:২৭:২১) তোমার বিরহে রাম, আমাকে প্রাণ ত্যাগ করতে হবে। (২:২৮:৫) তুমি পরিত্যাগ করলে আমার মৃত্যুই ভাল। (২:৩০:২০) এ-শোক আমি এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারব না। (২:৩০:২১)

এ সব কথা প্রেমের; যে প্রেম অদর্শন বিচ্ছেদ সহ্য করার সম্ভাবনার চেয়ে মৃত্যুকেও বরণীয় জ্ঞান করে। এ সীতা প্রাচীনতর উপাখ্যানের নায়িকা, যিনি পতিব্রতা বলে নয়, রামকে ভালবাসতেন বলেই স্বেচ্ছায় সানন্দে তাঁর সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন, কর্তব্য বা পতিব্রতাধর্ম পালন করছেন বলে নয়। কিন্তু, এরই সঙ্গে প্রায় ওতপ্রোত ভাবে মিশে রয়েছে পরবর্তীকালের পতিব্রতাধর্ম, যা ম্লান করে দিয়েছে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের মহিমাকে। এইখানেই শুনি, 'শ্রুতির্হি শ্রূয়তে পুণ্যা ব্রাহ্মনাণাং যশস্বিনাম্— যশস্বী ব্রাহ্মণদের পুণ্য উক্তি শোনা যায়।' কী সেই উক্তি? না, 'ভর্তা হি পরমদৈবতম্— স্বামীই পরম দেবতা।' (২:২৯:১৬) কিংবা:

ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা
অথবা, প্রাসাদাগ্রে বিমানৈর্বা বৈহাহসগতেন বা।
সর্বাবস্থাগতা ভর্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে।।

ইহজগতে ও পরলোকে সর্বদাই পতিই হল নারীর একমাত্র গতি। (২:২৭:৬) সে প্রাসাদের ওপরে, বিমানে, আকাশে যেখানেই হোক স্বামীর পদচ্ছায়ার বিশিষ্ট স্থান। (২:২৭:৯) বিদায়কালে সীতা কৌশল্যাকে বলছেন:

নাতন্ত্রী বাদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধতে যা স্যাদপি শতত্মজা।।

তন্ত্রীহীন বীণা বাজে না, চক্রহীন রথ হয় না। পতিহীনা নারী শতপুত্রের জননী হলেও সুখ পায় না। (২:৩৯:২৯)

অথবা রামকে বলছেন:

গতিরেকা পতির্নার্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজংশ্চতুর্থী নৈব বিদ্যতে।।

নারীর একটি গতি স্বামী, দ্বিতীয় পুত্র, তৃতীয় আত্মীয়রা, চতুর্থ কোনও গতি তার নেই। (২:৬১:২৪)

রাবণ যখন সীতাকে হরণ করতে এলেন তখন সীতা তাঁকে যে ভাষায় প্রত্যাখ্যান ও তিরস্কার করছেন তার অনেকটাই প্রেমে ও স্বামিগর্বে বলা, শুধু পতিব্রতাধর্ম থেকে নয়। বলছেন, 'নৃসিংহং সিংহসংকাশমহং রামমনুব্রতা/— আমি সিংহসদৃশ সেই নরসিংহ রামের অনব্রতা।' (৩:৭৪:৩৩) প্রচণ্ড ধিক্কার দিচ্ছেন রাবণকে তার ধ্রুবপদ যেটি বারেবারে উচ্চারণ করছেন তা হল,

'রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যাং যস্ত্বমিচ্ছসি রাক্ষস।— তুমি রামের প্রিয় বধূকে চাইছ, রাক্ষস।'
আশীবিষস্য বদনাদ্দংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি।...

কালকূটং বিষং পীড়া স্বস্তিমান্ গন্তুমিচ্ছসি।...
সূর্যাচন্দ্রমসৌ চৌভৌ পাণিভ্যাং হর্তুমিচ্ছসি।...
অগ্নিং প্রজলিতং দৃষ্ট্বা বস্ত্রেণাহর্তুমিচ্ছসি।

সাপের মুখ থেকে দাঁত নিতে চাইছ; কালকূট বিষ পান করে স্বস্তিতে চলে যেতে চাইছ; সূর্য ও চন্দ্রকে হাত দিয়ে হরণ করতে চাইছ, জ্বলন্ত আগুনকে বস্ত্র দিয়ে নিয়ে যেতে চাইছ? (৩:৪৭:৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩) শুধু পতিব্রতের কথা এ নয়, এর মধ্যে আছে সীতার গভীর প্রেমের প্রকাশ। আর রামচন্দ্রকে নিয়ে গর্ব, যে গর্বে তিনি রাবণকে বলেন, 'তোমার সঙ্গে রামচন্দ্রের পার্থক্য হল: বনে সিংহ এবং শৃগালের যে পার্থক্য, সোনার সঙ্গে সীসা-লোহার যে পার্থক্য, গরুড়ের সঙ্গে কাকের যে পার্থক্য তাই:

যদন্তরং সিংহশৃগালয়োর্বনে...
যদন্তরং কাঞ্চনসীসলোহয়োঃ...
যদন্তরং বায়সবৈনতেয়য়োঃ... (৩:৪৭:৪৫, ৪৬, ৪৭)

তাই 'ইন্দ্রের ভার্যা শচীকে অপহরণ করেও বাঁচা সম্ভব কিন্তু রামের ভার্যা আমাকে নিয়ে গিয়ে তুমি স্বস্তি পাবে না।

অপহৃতা শচীং ভার্যাং শক্যমিন্দ্রস্য জীবিতুম্।
ন হি রামস্য ভার্যাং মামানীয় স্বস্তিমান্ ভবেৎ।। (৩:৪৮.২৩)

এ কথা অহংকারের, যে অহংকার তাঁর রামকে নিয়ে, রামের শৌর্য ও পত্নীপ্রেমে বিশ্বাস থেকে যে অহংকার জন্মায়।

এই সহজ অনুভূতির মহিমাকে বারে বারে ক্ষুণ্ণ করেছে ধর্মীয় ও সামাজিক বিধান, যা যত্রতত্র প্রক্ষিপ্তরূপে মিশে আছে এই মহাকাব্যে। আগে মনে করা হত *রামায়ণ*-এর প্রক্ষেপ শুধু বাল ও উত্তরকাণ্ডে; এখন গবেষণায় যা জানা যায় তা হল ও দুটি কাণ্ড প্রায় সম্পূর্ণই প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু অন্যান্য কাণ্ডেও প্রচুর পরিমাণে প্রক্ষেপ আছে। জে. এল বুকিংটন-এর প্রামাণ্য বই *দ্য রাইটিয়াস রাম* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪)-তে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন একটি ক্ষত্রিয় বীরের কাহিনি কী ভাবে ধীরে ধীরে ধর্মগ্রন্থে পরিণত হল এবং ক্ষত্রিয়বীর কী ভাবে অবতারে পরিণত হল। এই বিবর্তনে অভিপৌরাণিক প্রক্ষেপগুলির ভূমিকা খুবই স্পষ্ট। রাবণ যখন ছল করে রামের মৃত্যু ঘোষণা করলেন তখন সীতা ভাবলেন:

নূনং মমৈব শোকেন স বীরো লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
দেবলোকমিতো যাতস্ত্যক্ত্বা দেহং মহীতলে।।

নিশ্চয়ই আমারই শোকে বীর রামচন্দ্র দেহত্যাগ করে দেবলোকে চলে গেছেন। (৫:২৬:৩৮)

হনুমানের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর দীর্ঘ এক প্রশ্নমালায় রামের কুশলসংবাদ জেনে নিলেন। প্রশ্ন করলেন, 'কচিৎস্মাং ব্যসনাদশ্মান্মোক্ষয়িষ্যতি রাঘবঃ— রামচন্দ্র আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন তো?' (৫:৩৬:২০)

এই সীতাকে দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর রামচন্দ্র যখন প্রথম দেখলেন তখন কী বললেন?— 'যুদ্ধ করে যে জয়লাভ করেছি সে তোমার জন্যে নয়— ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ।' (৬:১১৫:১৫) তাহলে কেন করলেন? 'প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গঞ্চ পরিমার্জতা— নিজের বিখ্যাত বংশের কলঙ্ক মোচনের জন্য করেছি।' (৬:১১৫:১৬)

প্রাপ্তঃ চারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়া।।
তদ্ গচ্ছ ত্বানুজানেহদ্য যথেষ্টং জনকাত্মজে।
এতা দিশ দিশো ভদ্রে কার্যমস্তি ন মে ত্বয়া।।
কঃ পুমাংস্তু কুলে জাতঃ স্ত্রিয়ং পরগৃহোহিষতাম্।
তেজস্বী পুনরাদদ্যাৎ সুহৃল্লোভেন চেতসা।।
রাবণাঙ্কপরিক্লিষ্টাং দুষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা।
কথং ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যাপদিশন্মমহৎ।।
যদর্থং নির্জিতা মে ত্বং সো য়মাসাদি ময়া।
নাস্তি মে ত্বয্যভিষ্বঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতি।।

তোমার চরিত্রে (আমার) সন্দেহ, আমার সামনে তুমি আছ এতে আমি (তোমার প্রতি) প্রতিকূল বোধ করছি যেমন চোখের রোগীর সামনে দীপ থাকলে (তার কষ্ট) হয়। অতএব এই দশদিকের যেখানে ইচ্ছা তুমি যাও, তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তোমাতে আর আমার কোনও প্রয়োজন নেই। সদ্বংশজাত কোন তেজস্বী পুরুষ, পরগৃহে বাস করেছে এমন নারীকে বন্ধুত্বের লোভে পুনর্বার গ্রহণ করবে? রাবণের অঙ্ককলঙ্কিতা, তার দুষ্ট দৃষ্টিতে দূষিতা যে তুমি, সেই তোমাকে কেমন করে আমি পুনর্বার গ্রহণ করব আমার মহৎ বংশকে দূষিত করে? যে কারণে তোমাকে উদ্ধার করেছি সে উদ্দেশ্য আমার সিদ্ধ হয়েছে; তোমাতে আমার আর কোনও আসক্তি নেই। যেখানে ইচ্ছে চলে যাও। (৬:১১৫:১৭-২১)

এতেও যথেষ্ট হল না, সীতার ভবিষ্যতের পথও দেখিয়ে দিচ্ছেন রাম:

তদস্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিনা।
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্।।

আজ সুবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে তোমাকে বলে দিলাম, হে ভদ্রে, লক্ষ্মণ অথবা ভরত যাতে তোমার সুখ হয় তাকেই বরণ কোরো। (৬:১১৫:২২)

মনে রাখতে হবে, বনগমনের পূর্বে লক্ষ্মণ যখন সুমিত্রাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন তখন সুমিত্রা তাকে বলেছিলেন:

ক্ষরামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটকীংবিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম।।

রামকে দশরথ বলে মনে কোরো, সীতাকে মনে কোরো আমি, অরণ্যকে অযোধ্যা জ্ঞান কোরো, যথাসুখে চলে যাও বৎস।

এই নির্দেশের জন্যে লক্ষ্মণ সীতার পায়ের অলংকার ছাড়া আর কিছু চিনতে পারেননি, কারণ প্রণাম করার সময়ে শুধু পা-ই দেখতে পেতেন। আজ সেই লক্ষ্মণকেও অপমান করলেন রামচন্দ্র; সীতাকে তো চূড়ান্ত ভাবেই করলেন। কয়েকটি *রামায়ণ*-এর সংস্করণে প্রত্যাখ্যানের সময়ে আরও কিছু কথা রামের মুখে দেওয়া আছে; আর *মহাভারত*-এর বনপর্বে রামোপখ্যানে তো সংশোধিত সংস্করণেও তা রক্ষিত আছে। সেখানে রাম বলছেন:

গচ্ছ বৈদেহি মুক্তা ত্বং যৎ কার্যং তন্ময়া কৃতম।।
মামাসাদ্য পতিং ভদ্রে ন ত্বং রাক্ষসবেশ্মনি।
জরাং ব্রজেথা ইতি মে নিহতো য়ং নিশাচরঃ।।
কথং হ্যস্মদ্বিধো জাতু জানন্ ধর্মবিনিশ্চয়ম্।
পরহস্তগতাং নারীং মুহূর্তমপি ধারয়েৎ।।
সুবৃতত্তামসুবৃত্তাং বাপ্যহং ত্বামদ্য মৈথিলি।
নোৎসাহে পরিভোগায় শ্বাবলীঢ়ং হবির্যথা।।

যাও, বৈদেহি, তুমি মুক্ত। যা করণীয় ছিল তা আমি করেছি। আমাকে স্বামিরূপে পেয়ে, ভদ্রে, তুমি রাক্ষসের গৃহে জরাগ্রস্ত যাতে না হও তাই আমি রাক্ষসকে বধ করেছি। আমার মতো লোক যে ধর্মাধর্ম-বিনিশ্চয় জানে সে পরহস্তগতা নারীকে কেমন করে এক মুহূর্তের জন্যেও ধারণ করবে? তুমি সচ্চরিত্রই হও বা দুশ্চরিত্রই হও, মৈথিলি, তোমাকে আমি আজ ভোগ করতে পারি না, তুমি (এখন) সেই ঘিয়ের মতো যা কুকুরে লেহন করেছে। (*মহাভারত* ৩:২৭৫:১০-১৩)

এখানে কয়েকটি বিষয় বিশ্লেষণ করলেই তৎকালীন সমাজে নারীর স্থান, বিশেষত ওই অধিপৌরাণিক অংশ সংযোজিত হওয়ার পর, তার স্থান কী ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, 'তুমি মুক্ত'— কী থেকে মুক্ত? বিবাহবন্ধন থেকে? এত সহজ তা? ধর্মসূত্রে আছে ধর্ষিতা নারীকেও পরের মাস থেকে স্বামী শুচি জ্ঞান করবেন। এবং *রামায়ণ* রচনা বেশ কয়েকটি ধর্মসূত্রের সমসাময়িক, আর কয়েকটির পরবর্তী। কাজেই এ শাস্ত্র রামের অজানা থাকার কথা নয়। তবু সীতা পরিত্যাগে রামের কোনও দ্বিধা নেই। তারপর রাম ব্যাখ্যা করে রূঢ় সত্যটি বলছেন, যুদ্ধটা তিনি কেন করলেন: ঈক্ষ্বাকুবংশের মর্যাদা রক্ষার জন্যে এবং নিজের বীরখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে। রামের স্ত্রী হয়ে সীতা রাবণের প্রাসাদে জরাপ্রাপ্ত হলে সেটা রামের শৌর্যের হানি ঘটায়, তাই যুদ্ধ করেছেন। সে যুদ্ধ সীতার জন্যে নয়। রামের মতো সূক্ষ্ম ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি পরহস্তগতা নারীকে মুহূর্তের জন্যেও বা কি করে ধারণ করবেন? অতএব সীতা সচ্চরিত্রই হোন বা দুশ্চরিত্র,-রামের পক্ষে তাঁকে 'ভোগ' করা সম্ভব নয়। প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান ওই 'পরিভোগায়' শব্দে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেন ভোগে লাগবেন না সীতা? কুকুরে-চাটা ঘি যেমন যজ্ঞে ব্যবহার করা যায় না, তেমনই পরহস্তগতা নারীও তার স্বামীর ভোগে লাগে না। মনে রাখতে হবে, এতটা অপরাধ সীতার প্রতি স্বয়ং রাবণও করেনি। রাবণ সীতাকে ধর্ষণ করেছে কিনা জেনে নেওয়ারও প্রয়োজন

নেই এবং সীতার কোনও অধিকার নেই তাঁর অদর্শনের কালে রাম কী করেছেন সে প্রশ্ন করবার। প্রাচীন ভারত নারীর 'সতীত্ব' খুব ভাল বুঝত, 'সতী' শব্দের ওই অর্থে কোনও পুংলিঙ্গ শব্দও সৃষ্টি করেনি। অর্থাৎ স্বামীর একনিষ্ঠতার অভাব সমাজের চোখে গর্হিত ছিল না, স্ত্রীকে শুধু সন্দেহের বশেই ত্যাগ করা চলত। এত বড় অন্যায় অপমানের পরে সীতা লক্ষ্মণকে চিতা নির্মাণ করতে বললেন।

অপ্রীতেন গুণৈর্ভর্ত্রা ত্যক্তায়া জনসংসদি।
যা ক্ষমা মে গতির্গন্তুং প্রবেক্ষ্যে হব্যবাহনম্।।

স্ত্রীর গুণে যে প্রীত নয় এমন স্বামী যখন জনসভায় স্ত্রীকে ত্যাগ করে তখন সেই স্ত্রীর যে পথে যাওয়া সম্ভব তাই করব; অগ্নিপ্রবেশ করব। (৬:১১৬:১৯)

জনসভায় সকলের প্রত্যাশা রাম লক্ষ্মণকে সীতার চিতা রচনায় বাধা দেবেন, কিন্তু:

ন হি রামং তদা, কশ্চিৎ কালান্তকযমোপমম্।
অনুনেতুমথো বক্তুং দ্রষ্টুং বাপ্যশকৎ সুহৃৎ।।

রামকে তখন কাল অন্তক ও যমের মতো দেখাচ্ছিল, তাঁকে অনুনয় করা, তাঁকে কিছু বলা বা (এমনকী) তাঁর দিকে চেয়ে দেখার সাধ্যও কোনও বন্ধুর ছিল না। (৬:১১৬:২২)

রামের এই নৈতিক আত্মতুষ্টি ও দুষ্কৃতকারীর শাস্তিবিধানের ভূমিকাটি এসেছিল তৎকালীন সমাজের স্ত্রী-পুরুষের আপেক্ষিক মূল্যবোধ থেকে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরপরাধ স্ত্রীকে সন্দেহের বশে ত্যাগ করা যে কোনও রকম অন্যায়ই নয় এই দৃঢ় ধারণা।

এর পরে সীতা বললেন:

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ।।
কর্মণা মনসা বাচা যতা নাতিচরাম্যহম্।
রাঘবং সর্বধর্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ।।
আদিত্যো ভগবান্ বায়ুর্দিশশ্চন্দ্রস্তথৈব চ।
অহশ্চাপি তথা সন্ধ্যে রাত্রিশ্চ পৃথিবী তথা।।
যথান্যেপি বিজানন্তি তথা চারিত্রসংযুতাম।।

যেহেতু আমার হৃদয় রামচন্দ্র থেকে কখনও সরে যায়নি, অতএব লোকসাক্ষী অগ্নি আমাকে সর্বদিকে রক্ষা করুন। কাজে, মনে, কথায় যেহেতু সর্বধর্মজ্ঞ রামকে কখনও লঙ্ঘন করিনি, সেহেতু অগ্নি আমাকে রক্ষা করুন। ভগবান, আদিত্য, বায়ু, দিকগুলি, এবং চন্দ্র, দিন, সন্ধ্যা, রাত্রি ও পৃথিবী এবং অন্যেরাও যেহেতু জানেন আমি এই রকম চরিত্রবতী। (৬:১১৬:২৫, ২৭, ২৮)

এই শপথ করে অগ্নিপ্রবেশ করার দুটি দিক আছে একটির নাম 'সত্যক্রিয়া'। কোনও ব্যক্তির প্রতি অন্য কেউ সন্দেহ করলে সে নিজের নির্দোষিতা প্রতিপাদন করবার জন্যে

প্রকৃতির নিত্যস্থায়ী শক্তিগুলিকে সাক্ষী মানে। অন্য দিকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ রকম অবস্থায় চার রকমের বিচার আছে: বিষ, অগ্নি, জল ও তুলা অর্থাৎ নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি নিরপরাধ হয় তাহলে বিষভক্ষণ করলে শরীরে বিষক্রিয়া হয় না, অগ্নিপ্রবেশ করলে দগ্ধ হয় না, জলে ডুবলে মৃত্যু হয় না এবং তুলাদণ্ডে তার ওজনের তুলনায় সে লঘুভার হয়ে যায়। সীতা এই শপথ করে অগ্নিপ্রবেশ করে যখন দগ্ধা হলেন না তখন ধর্ম এবং রাষ্ট্রের বিচারের দৃষ্টিতে তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণ হল। বলা বাহুল্য, তৎকালীন বিশ্বাসের পটভূমিকায় এ শপথ করতে পারত একমাত্র সম্পূর্ণ নিরপরাধ ব্যক্তিই— মনে, কথায় ও কাজে যে শুচি।

অযোধ্যায় ফিরে স্বল্পকাল সুখভোগের পর লোকেরা রামের বিষয়ে বলতে লাগল:

কীদৃশং হৃদয়ে তব সীতাসম্ভোগজং সুখম্।
অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতম।।

রাবণ যাকে অঙ্কে আরোপণ করে সবলে হরণ করেছিল, সেই সীতার সম্ভোগে তোমার হৃদয়ে কেমন সুখ হয়? (৭:৪৩:১৭)

লক্ষণীয়, সীতার অগ্নিপরীক্ষার সাক্ষী অন্তত দুজন ছিলেন, রাম এবং লক্ষ্মণ। দেবতারা, বিশেষত ব্রহ্মা এসে সীতার শুচিতা ঘোষণা করেছিলেন— এ সব কিছুই উল্লেখ করা হল না। প্রজাদের শ্লেষযুক্ত বাক্য শুনে রাম বিচলিত হলেন, কারণ প্রজারা বলল:

অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্তন্তে।।

(এমন হলে) আমাদের স্ত্রীদেরও (এই অপরাধ) সহ্য করতে হবে। রাজা যেমন করে প্রজা তারই অনুবর্তন করে। (৭:৪৩:১৯)

রাম বললেন, এই পৌরাপবাদ তাঁর মর্ম ছেদন করছে। লক্ষ্মণকে বললেন সীতা তাঁর শুচিতার প্রমাণ দিয়েছেন (৭:৪৪:৬-১০), তবু, অকীর্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্তির্লোকেষু পূজ্যতে— দেবতারা অকীর্তির নিন্দা করে, পৃথিবীতে কীর্তি পূজিত হয়। (৭:৪৪:১৩)

অতএব সীতা পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। পরিত্যক্তা সীতা লক্ষ্মণের মুখে রামকে বলে পাঠালেন:

যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদসমুত্থিত।
ময়া চ পরিহর্তব্যং ত্বং হি মে পরমা গতি।।

এই অপবাদ থেকে তোমার যে নিন্দা রটেছে সেটা পরিহার করাই আমার কর্তব্য, কারণ তুমি আমার পরম গতি। (৭:৪৮:১৩, ১৪)

সমাজে নারীর তখন এই স্থান, নারীর পরমা গতি হন স্বামী। স্ত্রীর প্রতি অন্যায় অভিযোগ, মিথ্যা সন্দেহ খণ্ডন করার দায় নেই স্বামীর, কিন্তু স্বামীর নিন্দা সর্বতো ভাবে পরিহার করাই স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য।

রাজসভায় দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে সীতাকে নিজের শুচিতা আবার প্রতিপাদন করবার আদেশ দিলেন রাম। সভায় সীতা কিছু বলার আগেই বাল্মীকি বললেন,

বহ্বর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী।।
মনসা কর্মনা বাচা ভূতপূর্বং ন কিল্বিষম্।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপপা যদি মৈথিলী।।
ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা।

বহু সহস্র বৎসর আমি তপস্যা করেছি, সীতা যদি দুশ্চরিত্র হন তবে সেই তপস্যার ফল আমি ভোগ করব না। মনে, কাজে, কথায় কখনও অন্যায় করিনি, সীতা যদি নিষ্পাপ হন তবে আমি তার ফল ভোগ করব। এই (সীতা) শুদ্ধচরিত্রা, নিষ্পাপ, পতিই এর দেবতা। (৭:৯৬:২০, ২১, ২৩)

বাল্মীকির এত বড় শপথই রাম এবং প্রজাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ হওয়ার কথা। নিষ্পাপ যে ঋষি বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করেছেন তাঁর পক্ষে চূড়ান্ত যা শপথ হতে পারে, তাই তিনি বারে বারে প্রকাশ্যে রাজসভায় ঘোষণা করলেন। সমাজে নারীর স্থান কোথায় নেমে গেলে এর পরেও প্রজাদের সন্দেহ ঘোচাবার জন্যে সীতার আবার অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে? শেষ পর্যন্ত বাল্মীকিও বললেন সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে। সীতা বললেন:

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামমভ্যর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।

রাঘব ছাড়া অন্য কাউকে যদি মনেও না চিন্তা করে থাকি, তবে মাধবী দেবী (পৃথিবী) আমাকে বিবরে (আশ্রয়) দিন। মনে, কাজে কথায় যদি রামকেই অর্চনা করে থাকি, তবে মাধবী দেবী বিবর দিন। রাম ছাড়া আর কাউকেই জানি না। এ কথা যদি সত্য বলে থাকি তবে মাধবী দেবী বিবর দিন। (৭:৯৮:৭, ৮, ৯)

এ সীতার শেষ সত্যক্রিয়া। এখানে যেটা লক্ষণীয় তা হল সীতা নিজের শুচিতার প্রমাণের বিনিময়ে কি চাইছেন। একবারও বলছেন না, যে আমি রামের প্রতি বিশ্বাসিনী হয়ে থাকলে যেন তিনি এবং প্রজারা আমার প্রতি সন্দেহ ত্যাগ করেন; আমি আবার রামের প্রিয়বধূ হয়ে তাঁর সান্নিধ্যে থাকি; সিংহাসনে তাঁর পাশে স্থান পাই। সে সব সাধ তাঁর সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে; বেশ বুঝতে পারছেন, প্রজারা আবার সন্দেহ করতে পারে এবং রাম কোনও দিনই তাঁর পক্ষ সমর্থন করবেন না, বারে বারেই তাঁকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। যে

সমাজে নারীর এই স্থান, তাকে সন্দেহ করতে গেলে যুক্তি তথ্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না, বিশ্বাস করতে গেলে সমাজ ক্ষুব্ধ হয়— সেখানে নারী রাজসুখ পেলেও সম্মান ও মানুষের মর্যাদা কোনও দিনই পাবে না। সেই জন্যে, আত্মমর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে একটি চরম সত্যক্রিয়ার শপথ গ্রহণ করে নিজের শুচিতা প্রমাণ করলেন; কিন্তু রামের কাছে, সমাজের, জীবনের কাছে আর কোনও প্রার্থনা বা প্রত্যাশা তাঁর নেই। সারাজীবন ধরে অনন্যচিত্তে যে রামকেই তিনি চিন্তা করেছেন, ভালবেসেছেন, অনুগমন করেছেন রাম তাঁর কী মূল্য দিলেন? পৃথিবী সীতাকে নিয়ে যাওয়ার পরে রাম 'ক্রোধশোকসমাবিষ্ট' হয়ে পৃথিবীকে বললেন: 'আনয় ত্বং হি তাং সীতাং মত্তো হং মৈথিলীকৃতে— সেই সীতাকে তুমি নিয়ে এস, মৈথিলীর জন্যে আমি উন্মাদ।' (৭:৯৮:৯)

বিরহে তাঁর কষ্ট হয়ে থাকতেই পারে, আর বিবাহও তিনি করেননি কিন্তু তার তো একটা কারণ পৃথিবী সীতাকে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই সীতার সম্পূর্ণ নির্দোষিতা প্রমাণিত হয়েছিল, ফলে সর্বজনসমক্ষে রাম তো এক রকম অপরাধী প্রতিপন্ন হয়েইছিলেন। অন্তত কতকটা অপ্রতিভ তো হওয়ার কথাই। বিশেষত, বাল্মীকির অত গুরুতর শপথবাক্যের পরে তো তিনি অগ্নিপরীক্ষার আজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে পারতেন। করেননি বলেই বাল্মীকি সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বললেন। করেননি, এই ক্ষোভেই সীতা জীবনে এমনকী রাম সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ হয়ে পৃথিবীতে আশ্রয় চাইলেন। এর পরে রামের বিরহকে খুব গুরুত্ব দেওয়া যায় না। সীতাহরণের পরে রাম এত উন্মাদের মতো আচরণ করেছিলেন যে ছোট ভাই লক্ষ্মণ তাঁকে বারে বারে আতিশয্য প্রকাশ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। অথচ যাঁর অত বিরহোন্মাদ তিনি দীর্ঘ অদর্শনের পর প্রথম দেখেই সীতাকে বললেন, 'তোমার জন্যে যুদ্ধ করিনি, নিজের সম্মানের জন্যেই করেছি। যাও তুমি, তুমি সচ্চরিত্রই হও অসচ্চরিত্রই হও, তোমাকে 'ভোগ' করতে পারিনে, তুমি কুকুরে চাটা ঘি। লক্ষ্মণ ভরত যাকে হয় গ্রহণ কর।' মনে রাখতে হবে সেদিন লঙ্কায় সীতার চরিত্রে রাম ছাড়া আর কেউই সন্দেহ করেনি রাম ছাড়া। অর্থাৎ লোকাপবাদের কথা ওঠবার আগেই রাম নিজে সর্বপ্রথমে সীতাকে অপবাদ দিলেন। অসহায় নারীকে পরপুরুষ স্পর্শ করেছে, এই হল অমার্জনীয় অপরাধ। সীতা বললেন, ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি, তুমি কি চেননি আমাকে? বললেন, আমার মতে তো তুমিই একমাত্র; যে দেহটার ওপরে আমার কর্তৃত্ব ছিল না সেটাই কি এত বড় হয়ে উঠল? মনের শুচিতা ও দেহের শুচিতাকে সমাজ সেদিনও পৃথক করে বিবেচনা করেনি, আজও করে না। তাই অশোকবনে থাকার সময়ে ইন্দ্র এসে সীতাকে দিব্য ক্ষীর খাইয়ে গেলেন, যাতে রাবণের অন্ন তাঁকে না গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ভবভূতির ভাষায় 'যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ— সংসারে লোকে বাক্য ও নারীর শুচিতা মানতে চায় না।'

ওই যে পতি দেবতা, পতি নারীর একমাত্র গতি, পতির স্ত্রীকে সন্দেহ করবার অবাধ অধিকার এবং সে সন্দেহবশে স্ত্রীকে ত্যাগ করবার অধিকার, জনসাধারণের নারীর চরিত্রে সন্দেহ করবার এবং সে সন্দেহবশে নিরপরাধা নারীকে দণ্ড দেওয়ার অধিকার— এ সবই

এসেছে অভিপৌরাণিক যুগের সামাজিক মূল্যবোধ এবং নারীর স্থান নিরূপণের একতরফা অধিকার থেকে। লক্ষণীয় যে, লঙ্কায় সীতাকে আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলতে দেওয়া হয়নি। প্রশ্নও করা হয়নি তাঁর আচরণ সম্বন্ধে। তাঁর একমাত্র অপরাধ রাবণ হরণ করবার সময়ে তাঁকে স্পর্শ করেছিল। পরপুরুষের স্পর্শ তখন এতবড় অপরাধ হয় যখন নারী একান্ত ভাবে অন্তঃপুরচারিণী হয়ে ওঠে। একটিমাত্র পুরুষ— স্বামী— ছাড়া অন্য কারও সঙ্গ তার পক্ষে তখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তার বিচারের পদ্ধতি হল: নির্দোষিতা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত ধরে নেওয়া হবে সে যে দোষী। সমাজের অনুরূপ কোনও একনিষ্ঠতার দাবি পুরুষের কাছে নেই। এবং নারী একনিষ্ঠতা, শুচিতা দিয়েও সমাজে সসম্মানের আসন অর্জন করতে পারে না। আমরণ পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

নারীর অবস্থার এই অবনমন *রামায়ণ*-এ অত্যন্ত স্পষ্ট। কাহিনির মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে আছে পূর্বতন যুগে নারীর কতকটা স্বাধীন আচরণ যেমন শবরী একাকিনী আশ্রমে বাস করেন। কিন্তু তার পাশাপাশি দেখি গৌতম অহল্যাকে মর্মান্তিক শাপ দেন। অর্থাৎ নারীর সামান্যতম স্খলন সমাজ ক্ষমা করে না। যদিও পুরুষের স্খলন সম্বন্ধে সে অনেক সহিষ্ণু।

মহাভারত

মহাভারত-এ এ-চিত্র আরও প্রত্যক্ষ, ব্যাপক এবং নিঃসন্দিগ্ধ। যেহেতু *মহাভারত*-এর কলেবর *রামায়ণ*-এর চতুর্গুণ (*রামায়ণ*-এ শ্লোকসংখ্যা চব্বিশ হাজার, *মহাভারত*-এ এক লক্ষের কিছু কম এবং যেহেতু *মহাভারত*-এর রচনাকালের ব্যাপ্তি *রামায়ণ*-এর অন্তত দ্বিগুণ, সে জন্যে এখানে সমাজের যে চিত্রটি পাই তার পরিসর ব্যাপকতর। অতএব এর মধ্যে প্রাচীনতর কালের সমাজচিত্রও যেমন আছে, *রামায়ণ*-এর বহু পরবর্তীকালের চিত্রও তেমনই আছে। ফলে মহাকাব্যের কাহিনির সৃষ্টির আদিমতম যুগের— হয়তো বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরবর্তী যুগের— যে চিত্র পাই, স্বভাবতই, তা *রামায়ণ*-এর চেয়ে অনেক প্রাচীন। এবং যেহেতু এর শেষতম সংযোজনটি *রামায়ণ*-এর শেষাংশের চেয়ে অন্তত দুশ' (তিনশ'ও হতে পারে) বৎসর পরের, সেহেতু এতে অভিপৌরাণিক সংযোজনগুলি আরও প্রত্যক্ষ ভাবে পুরাণধর্মী।

মহাভারত-এর আদিমতম অংশ থেকে শেষতম অংশের ব্যবধান অন্তত আটশত বৎসর; এই দীর্ঘকালের মধ্যে সমাজ তো একই অবস্থায় থাকেনি ফলে বিবর্তনের চিত্রও *মহাভারত*-এ স্পষ্টতর। আদি ক্ষত্রিয়কাহিনি রচনার পরে কিছু নৈতিক কাহিনির সংযোজন হয়, যেগুলি সার্বজনীন; দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে বিরাজিত। শেষতম অর্থাৎ দ্বিতীয় সংযোজনের কর্তা ভৃগুবংশীয় ঋষিরা, এটি ব্রাহ্মণ্য সংযোজন বলে খ্যাত। নারী ও শূদ্রের অবনমনের স্পষ্টতম চিত্র পাই এই অংশে।

আদি ক্ষত্রিয় কাহিনি যখন গাথারূপে রচিত হয় সেই প্রাচীন যুগে নারীর কতকটা স্বাধীন সঞ্চরণের ও আচরণের কিছু চিহ্ন *মহাভারত*-এ রয়ে গেছে। গান্ধারী বারে বারে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুযোগ করছেন, ধিক্কার দিচ্ছেন, বলছেন দুর্যোধনকে শাসন করতে, শাসন না মানলে

ত্যাগ করতে; ধৃতরাষ্ট্র নিজে যে পন্থাকে ন্যায় বলে বিবেচনা করেন তার অনুসরণ করছেন না— কাপুরুষতা ও অন্ধ পুত্রস্নেহের কারণে। (২:৭৫:৮-১০; ৫:১২২:৯)। প্রকাশ্য রাজসভায় স্বামীকে ভর্ৎসনা করে সমস্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্যে তাঁকে দায়ী করছেন। এখানে প্রচলিত অর্থে তিনি পতিব্রতা স্ত্রী নন। নারী হয়ে কৃষ্ণকে প্রকাশ্যে অভিশাপ দিচ্ছেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তিনি নিবারণ করতে পারতেন অথচ করেননি বলে সবংশে নিধনের শাপ দিলেন তাঁকে। (১১:২৫:৪২) কুন্তী প্রচলিত অর্থে স্নেহময়ী জননী, কিন্তু, যখন তাঁর মনে হল পুত্রেরা ক্ষত্রিয়োচিত আচরণ করছে না, তখন তিনি বিদুলার উপাখ্যানটি কৃষ্ণের মুখে বলে পাঠালেন, যে উপাখ্যানে বিদুলা তাঁর পুত্র রাজা সঞ্জয়কে ক্লীবোচিত নিষ্ক্রিয়তার জন্যে ধিক্কার দিচ্ছেন। (৫:১৩২-১৩৫) দ্রৌপদী তাঁর স্বামী স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে জীবনের নৈতিক, রাষ্ট্রিক ও দার্শনিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে প্রচণ্ড তর্ক করেছিলেন। (৩:৩৭, ৩০, ৩২, ৩৭) প্রচলিত অর্থে এবং পরবর্তী অনুশাসনের দৃষ্টিতে পতিব্রতার উপযুক্ত আচরণ এটা নয়। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে কুন্তী যখন অরণ্যবাসের বাসনা জ্ঞাপন করলেন তখন পুত্রদের কোনও যুক্তি ও অনুরোধ তিনি মানেননি। (১৫:১৬-১৭) যদিও শাস্ত্র বলে, 'রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রাঃ,— বার্ধক্যে নারীর রক্ষা করবে পুত্ররাই।' দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে আশ্রমে রেখে চলে গেলেন। কয়েক বৎসর পরে শকুন্তলা বালকপুত্রটিকে নিয়ে রাজসভায় এসে প্রচুর কটুবাক্য বলে রাজাকে ভর্ৎসনা করলেন। (১:৬৯:১-২৭)। নারীর মুখে পুরুষের প্রতি এত কঠিন ধিক্কারবচন ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে অকল্পনীয়।

মহাভারতে নারী সোমপান করেন; (১৫:১৭:১৭) প্রকাশ্যে চলাফেরা করেন এবং নিজেদের সম্বন্ধে বহু সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেন। পিতৃমতী কন্যা পিতার অনুমতি ব্যতীত পুরুষের সঙ্গে মিলিত হন (শকুন্তলা, সত্যবতী এবং আরও অনেকেই); প্রয়োজন হলে নিজের ঈপ্সিত পুরুষটিকে পাওয়ার জন্যে প্রকাশ্য রাজসভায় পিতা রাজার সঙ্গে তর্ক করে নিজের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন, যেমন সাবিত্রী। ভীষ্ম যখন অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকাকে হরণ করে আনেন তখন অম্বা তাঁকে জানান যে তিনি শাল্বরাজকে কামনা করেন। শুনে ভীষ্ম তাঁকে শাল্বের কাছে পাঠান। পরবর্তীকালের নারী সাহসই পেত না নিজের গোপন প্রেমের কথা পরপুরুষকে জানাতে; এবং সে পুরুষও তার প্রেমের মর্যাদা দিত না। পাণ্ডু কুন্তীকে বলেন ঋতুকালে নারী যে কোনও পুরুষের সঙ্গে সহবাস করতে পারে, তাতে কোনও দোষ নেই। (১:১১৩:২৫-২৬); এবং কুন্তী পর্যায়ক্রমে তিনজনের সঙ্গে মিলিত হন। দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে নল যখন চলে যান এবং দীর্ঘকাল যখন তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় না তখন, বয়ঃপ্রাপ্ত দুটি সন্তানের জননী দময়ন্তী অসংকোচে মা-কে বলেন নলের বিরহে তাঁর পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব নয় (৩:৫৩-৭৮), অতএব পুনর্বার যেন দময়ন্তীর স্বয়ম্বর আহ্বান করা হয়।

পরের যুগে এমন একটা ব্যাপার কল্পনাও করা যায় না। কচ যখন দেবযানীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেন তখন দেবযানী তাঁকে শাপ দেন। সে শাপ ফলে যায়, এর দ্বারা *মহাভারত*-কার যেন বলছেন এ শাপ দেওয়ার অধিকার দেবযানীর ছিল। পরে শর্মিষ্ঠার বিবাহের যৌতুকরূপে

সে যযাতির গৃহে আসে এবং সেখানে নিজের অনুরোধক্রমে যযাতির গোপন প্রেমিকা ও তাঁর সন্তানের জননী হয়। (১:৫৯) পরে শর্মিষ্ঠা যখন সব জানতে পারে তখন দেবযানী যযাতিকে মিথ্যাবাদী ও মূর্খ বলে তিরস্কার করে। রুরুর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে প্রমদ্বরা তাকে বিবাহ করেন। হিড়িম্বা ভীমসেনকে সম্মত করান তাঁর প্রেম গ্রহণ করতে ও তাঁকে বিবাহ করতে। তেমনই উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাও উপযাচিকা হয়ে অর্জুনকে প্রেম নিবেদন করেন, এঁদের বিবাহ করেন অর্জুন কিন্তু উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করেন। নারী স্বয়ং প্রেমপ্রার্থিনী হয়ে পুরুষকে যুক্তি ও মিনতির দ্বারা সম্মত করাচ্ছে— এ চিত্র পরে বিরল হয়ে আসে। প্রথম যুগের রচনায় পুরুষ যখন নারীর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে প্রার্থনা জানায় তখন নারী নিজের শক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শর্ত স্থাপন করে এবং পুরুষ তা স্বীকার করে; সত্যবতী, গঙ্গা, শকুন্তলা এর দৃষ্টান্ত। কৌরবদের মধ্যে নারীর বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এমন কথাও শুনি দ্রৌপদীর বিবাহের সময়ে বাদপ্রতিবাদে। (১:১২২:৭) জটিলা এবং বাক্ষীও বহুপতিকা ছিল এমন উল্লেখ আছে। (১:১৯৬:১৪-১৫) নারী নিজের অভিরুচিমত কুমারী থেকে পস্যা করতে পারত তার দৃষ্টান্তও আছে। সিদ্ধা, শিবা (৫:১০৯:১৯) এবং শাণ্ডিলের তাপসী কন্যার (৯:৫৪:৬-৮) উল্লেখই তার প্রমাণ। পরে নারীর এ অধিকার সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হয়। ঋষি অত্রির স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে তপস্যা করতে যান। তাঁর তপস্যায় প্রীত শিব তাঁকে সন্তানের বর দেন এবং তিনি সেখানেই শুধুমাত্র দৈব-বরেই সন্তানবতী হন। (১৩:১৪)

ব্রাহ্মণ সংযোজনে যেখানে নারী সর্বতো ভাবে গৌণ এবং পুরুষের অধীন, পূর্বতন অংশে পড়ি, যে প্রলুব্ধ করতে আসে সতী স্ত্রীর অশ্রু অগ্নি হয়ে তাকে দগ্ধ করে। (১:১৮২:৬) এতে সতীত্বের মাহাত্ম্য ঘোষণার সঙ্গেই আছে, যে কোনও নারীকে নির্বিচারে ভোগ-অধিকারের অস্বীকৃতি, যা পরে তেমন ভাবে আর থাকেনি। তবুও, পূর্ববর্তী অংশে তার অশ্রুর অগ্নিতে পরিণত হওয়ার অপেক্ষা নেই, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রেমেরই সে শক্তি আছে; যে ব্যাধ দময়ন্তীকে কামনা করেছিল সে দময়ন্তীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হওয়ামাত্রই ভস্মে পরিণত হল। এ নারী শক্তিমতী, এ অশ্রুপাত করে না, অন্যায়ের সামনে ক্রোধে জ্বলে ওঠে। সৈরিন্ধ্রীরূপিণী দ্রৌপদী কামুক কীচককে পদাঘাত করে, অপরাধীর দণ্ডের জন্যে অতি প্রাকৃতের প্রতীক্ষা করে না, অশ্রুপাতও করে না। (৪:১৬:১৯-২০) নারীর চরিত্র ও আচরণ নিয়ে শাস্ত্র যেখানে বহু নির্দেশ দিয়েছে সেই অংশে দৈবশক্তিতে দেবতার মধ্যস্থতায় অপরাধী দণ্ডিত হয়েছে; তার আগে অসংযত কামুকের প্রলোভন প্রতিহত করেছে নারী নিজেই উদ্যত ক্রোধ ও ঘৃণা দিয়ে তর্ক করেছে, যুদ্ধ করেছে, অভিশাপ দিয়েছে, ভর্ৎসনা করেছে, পদাঘাত করেছে আত্মরক্ষার জন্যে।

মহাভারত-এ কামনায় প্রণোদিত হয়ে নারীপুরুষের মিলনের বিরুদ্ধে বিস্তর নিষেধ রয়েছে। বিবাহ ক্রমে ক্রমে প্রেমের একমাত্র আশ্রয়ভূমি হয়ে উঠল; কন্যা আর বেদের অনুশাসনে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজের রুচিমত সঙ্গী বেছে নেয় না— 'স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনেচিৎ নির্দেশ মেনে'; বরং কন্যাকে এখন পিতা দান করেন তাঁর রুচিমত পাত্রে। ব্যাপারটা ব্যক্তিগত

থেকে কুলগত হয়ে উঠছে; ধর্মশাস্ত্রও বলেছে, কুলেই প্রদান করা হয় কন্যাকে। অথচ পূর্বতন অংশে বারবার দেখছি প্রেমে নারীর স্বাতন্ত্র্য ছিল, আপন জীবনসঙ্গীকে সে নির্বাচন করতে পারত, পুরুষের মতোই প্রেমে, প্রেমনিবেদনে এবং প্রেমাস্পদকে নিজের অনুকূল করার চেষ্টা করার অধিকার তার ছিল, এর জন্যে সে নিন্দিত হত না। স্বয়ং ভীষ্মও অম্বার প্রেমের কথা শুনে তাকে ধিক্কার দেননি।

ব্যভিচারের অপরাধে নারী পুরুষের সমান দণ্ডের কথা দু-একটি স্থলে দেখা যায়; (১২:১৬৫:৬৩) এমনকী ব্যভিচারে নারী নির্দোষ, কারণ পুরুষ বলাৎকার করলে নারী অসহায় এমন কথাও আছে। (১২:২৬৫:৪০) *মহাভারত*-এর প্রথম অংশে এমন বহু ব্যভিচারের কাহিনি আছে যার সম্বন্ধে বিচার বা দোষারোপ নেই, যেন তথ্যই পরিবেশিত হচ্ছে শুধু। এমনই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নরনারীর মিলনের ফলে *মহাভারত*-এর বহু মুখ্য নায়কেরই জন্ম— বেদব্যাস, ভীষ্ম, কর্ণ, পঞ্চপাণ্ডব এবং বহু উপনায়কের এ ভাবেই জন্ম। এত অসংকোচ এ ঘটনাগুলির বিবরণ এবং সে বিবরণে ওই মিলনের ধর্মীয়তা প্রতিপাদনের কোনও চেষ্টামাত্রই নেই। মনে হয় এমন বহু ঘটনা লোকমুখে চলিত ছিল এবং সমাজে যে এমন ঘটনা ঘটে থাকে সে সম্বন্ধে সমাজ অবহিত ছিল। তার সমর্থন বা নিন্দা কোনওটাই প্রকট ছিল না।

এই নিন্দা যখন উগ্র হয়ে উঠল তার আগে নারীর স্থান সমাজে অনেক মেনে গেছে; সে তখন কোনও পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি— হয় পিতার, নয় স্বামীর। কন্যা বা পত্নী ছাড়াও সমাজে নারী আছে— সেই নারীসাধারণ সম্বন্ধে স্পষ্ট, উচ্চারিত বোধটি হল: নারী নরকের দ্বার। মোহিনীরূপে দেখা দেয় সে, পুরুষের কামনার উদ্রেক করে, অতএব পুরুষ প্রলুব্ধ হলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নারীরই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে ওঠার পরই তো 'না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করা'-র প্রশ্ন ওঠে। ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের বহু পূর্ব হতেই এ সময়ের সূচনা, যদিও এই সময়কার মনোভাব স্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ হয় ব্রাহ্মণ্য সংযোজনেই। এই অংশে দেখি নারী অশুভ, সমস্ত অমঙ্গলের হেতু, কন্যা দুঃখের। (১:১৫৯:১১) শান্তিপর্বে মুমূর্ষু ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, 'নারীর চেয়ে অশুভতর আর কিছুই নেই, বৎস, নারীর প্রতি পুরুষের কোনও স্নেহমমতা থাকা উচিত নয়। (১২:৪০:১; ১৩:৪৩:২৫) পূর্বজন্মের পাপের ফলে এ-জন্মে নারী হয়ে আসতে হয়। (৬:৩৩:৩২) বা, নারী সর্পের মতো, পুরুষের তাকে কখনওই বিশ্বাস করা উচিত নয়। (৫:৩৭:২৯) ত্রিভুবনে এমন কোনও নারীই নেই যে স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য। (১২:১০:২০) এতেও বোধ হয় যথেষ্ট হল না, তাই দেবতার দোহাই পাড়া হল: প্রজাপতির ইচ্ছা যে নারী স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য নয়। (১২:২০:১৪) যে ছ'টি বস্তু এক মুহূর্তের অসতর্কতায় নষ্ট হয় তা হল: গাভী, সৈন্য, কৃষি, স্ত্রী, বিদ্যা এবং শূদ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ। (৫:৩৩:৯০) নারী একা ধর্মাচরণে অধিকারিণী, শুধুমাত্র স্বামীর সঙ্গেই সে ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে। (৮:৪:১৩) এইটি অবশ্য বৈদিক যুগের শেষ পর্যায় থেকেই আছে, সম্ভবত যখন থেকে উপনয়নে তার অধিকার প্রত্যাহৃত হল তখন থেকেই। এবং তাও হল আর্যরা যেহেতু প্রাগার্য নারী বিবাহ করতে থাকেন অতএব আর্যবর্ণ ছাড়া অন্য কাউকে উপনয়ন

দেওয়া কার্যত বন্ধ হয়ে গেল, দু-চারটি ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও।

বহু স্থানে সতী ও কর্তব্যপরায়ণা নারীর প্রশংসা আছে, (১:১১০ এবং অন্যত্র) তার চূড়ান্ত চরিতার্থতা হল ভক্তিতে স্বামীকে প্রসন্ন করা এবং তাঁর সন্তান ধারণ করা। কর্মনিষ্ঠ পতিব্রতা নারী হল তপস্বিনী, (১৩:১৪৬:৪৮-৫১) গৃহিণীর ভূমিকায় সার্থকতায় পুণ্য আছে এবং এ পুণ্যের প্রশংসায় মহাভারতের ব্রাহ্মণ্য অংশ মুখর। প্রাচীনতর অংশে বহু বিধবা আছে। সত্যবতী, কুন্তী এবং বহু মৃত বীরের ও কৃষ্ণের স্ত্রীদের উল্লেখ আছে, এঁরা কেউই সহমৃতা হননি; শুধু মাদ্রী একাই সহমৃতা হন এবং সেও সমাজের নির্দেশে নয়, ব্যক্তিগত অপরাধবোধে। এঁরা কেউই পুনর্বার বিবাহ করেননি, কিন্তু অম্বিকা, অম্বালিকা নিয়োগপ্রথার দ্বারা সন্তান ধারণ করেছিলেন। প্রোষিতভর্তৃকার জন্যে কঠোর নির্দেশ আছে, যাতে তার আচরণে শুধু চাপল্য নয় কোনও রকম সজীবতাও না প্রকাশ পায়। (১২:১২৩:১৬, ১৭) স্বামী কাছে থাকলে যথাসম্ভব মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে স্ত্রী তার সেবা করবে। যে স্ত্রী মধুরভাষিণী তার প্রশংসাও যেমন আছে, (৫:৩৩:৮৬) যে পরুষভাষিণী তার নিন্দাও তেমনি আছে। (৫:৩৩:৮৪)। যে বধূর শাশুড়িকে গৃহকর্ম করতে হয় অথবা যে শাশুড়ির কোনও রকম নিন্দা করে তার পাপ হয়। (১৩:৯৩:১৩১) পতিব্রতা সতীর এমনই মাহাত্ম্য যে ধর্মব্যাধের উপাখ্যানে তপস্বীকে আসতে হল পতিব্রতার কাছে ধর্মে শিক্ষা নিতে। (৩:২০৫)

পরবর্তীকালে বিবাহিতা নারী শিবিকায় আরোহণ করে যাতায়াত করতেন (১:৭৩:২১, ৮০:২১; ৩:৬৯:২৩; ১৫:২৩:১২)। লঙ্কাকাণ্ডে যুদ্ধের শেষে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে সীতাও আসছিলেন শিবিকায়। তাঁরা পুরুষ সহযাত্রীর তত্ত্বাবধানে যাতায়াত করতেন এবং অন্তঃপুরেও বসনে আবৃত, অবগুণ্ঠিত হয়ে বাস করতেন। (৫:৮৬:১৬; ১৫:১৫:১৩) সভায় যখন আসতেন তাঁদের বসবার জন্যে স্বতন্ত্র একটি অংশ থাকত। (১:১৩৪:১২) বিবাহিতা নারী দীর্ঘদিন পিত্রালয়ে বাস করলেও সেটা নিন্দনীয় বলে গণ্য করা হত, এতে নাকি তার যশ, চরিত্র ও গুণ নষ্ট হয়ে যায়। (১:৭৪:১২) অর্থাৎ ক্রমেই বিবাহিতা নারীর একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল শ্বশুরালয়। পিত্রালয়ে দীর্ঘকাল বাস করলে নারী কলঙ্কিনী হয়। (৫:৩৯:৮০) কারণটা সহজেই অনুমান করা যায়, তেমন নারীকে স্বামী-পরিত্যক্তা বা স্বামী ও শ্বশুরকুলের অপ্রীতিভাজন বলে মনে করা হত এবং তার চেয়ে বড় কলঙ্ক কমই ছিল। স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নারীর নিন্দা করে বলেছেন নারী হল সমস্ত অমঙ্গলের মূল; (১২:৬) ভীষ্ম বলেছেন নারীর দ্বারা বংশ কলঙ্কিত হয়; (১২:৪-৮); কৃষ্ণ বলেছেন নারী কলঙ্কিতা হলে বর্ণসংকর হয় এবং তার থেকে চূড়ান্ত সর্বনাশ হয়। (৬:২৩:৪১)

ক্রমে ক্রমে কৈশোরের পরে নারীর বিবাহ বাধ্যতামূলক বলে গণিত হল, কুমারী নারীর কথা বড় একটা আর শোনা যায় না। কুণিগর্গের কন্যা বহুদিন তপস্যা করার পরে যখন স্বর্গে উত্তম স্থান লাভ করার জন্য দেহত্যাগ করতে উদ্যত হলেন তখন নারদ এসে তাঁকে বললেন কুমারী কন্যার জন্যে স্বর্গে কোনও সম্মানের আসন নেই, কারণ, সে অশুচি। অগত্যা ওই বর্ষীয়সী তাপসীকে বিবাহ করে তার পরে প্রাণত্যাগ করতে হল। (৯:৫২:১) ওই অধ্যায়েই

আর একটি অনূঢ়া নারীর কাহিনি আছে। যৌবনে তিনি বিবাহের অনেক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন কারণ কোনওটিই তাঁর মনের মতো ছিল না। বহুদিন তপস্যা করার পরও তাঁকেও শুনতে হল অবিবাহিতা নারী অশুচি, অতএব একরাত্রির জন্য তাঁকে গালবের স্ত্রী হতে হল যাতে তিনি স্বর্গে স্থান পান। তপস্বিনী সুলভা যখন রাজা জনকের সভায় দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনার জন্য আসেন তখন জনক নানা বিদ্রূপাত্মক কঠোর বাক্যে তাঁকে আলোচনা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। নিতান্তই জ্ঞানান্বেষণায় এসে এত রূঢ় কথা শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি পরদিনই সভা ত্যাগ করে চলে যান। (১২:৩২০) মনে পড়ে, গার্গীর প্রশ্নে কোণঠাসা হয়ে যাজ্ঞবল্ক্যও তাঁকে নিবৃত্ত করার প্রয়াসে বলেন, অতিরিক্ত প্রশ্ন কোরো না, গার্গি, তোমার মাথা খসে পড়বে। এমন কথা কোনও পুরুষ বিদ্যার্থীকে তো জনক বা যাজ্ঞবল্ক্য বলেননি কখনও। এ-কাহিনিগুলি থেকে বোঝা যায়, প্রথমত, অবিবাহিতা নারীকে নিয়ে সমাজ স্বস্তি পেত না, বিবাহ তার পক্ষে তাই বাধ্যতামূলক হয়ে উঠল। জরৎকারু ঋষির ক্ষেত্র ভিন্ন, সেখানে তিনি বিবাহ করে পুত্রসন্তান উৎপাদন না করলে পূর্বপুরুষদের পিণ্ড-তর্পণের ব্যবস্থা হয় না, তাই তাঁর বিবাহের প্রয়োজন; তাঁর নিজের স্বর্গপ্রাপ্তির বাধা হত না তপস্যায়। বস্তুত শাস্ত্রে, সাহিত্যে আমরা বহু অকৃতদার তপস্বীর কথা পাই যাঁদের কৌমার্যের জন্যে স্বর্গলাভে কোনও ব্যাঘাত হয়নি। দ্বিতীয়ত, শিক্ষিতা নারী সংখ্যায় নিতান্তই মুষ্টিমেয় ছিল বলে সহসা কোনও বিদুষী ও বুদ্ধিমতী নারীর সামনে এলে পুরুষ কিছু বিচলিত বোধ করতেন। ব্রহ্মজ্ঞানের ফল যে সমদর্শিতা সেটা তো নারী ও শূদ্রে এসে বরাবরই ঠেকে গেছে, শিক্ষিতা নারী তাই প্রতিপক্ষ পুরুষের উষ্মাই জাগাত, শিক্ষার্থিনী হয়ে এলেও পুরুষ হয়তো নিরাপদ বোধ করত না।

নারীর কাছে সমাজের প্রত্যাশা হল সে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ও গৃহকর্মনিপুণা হবে স্বামী ও শ্বশুরকুলের জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করবে, সন্তান, মুখ্যত পুত্রসন্তানের জন্ম দেবে। তাদের লালন এবং স্বামী ও তার আত্মীয়দের সেবা করবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তার মন, চিন্তা, ব্যক্তিত্ব থাকবে না। সে ছায়ানুগামিনী হবে তার স্বামীর। যদিও তেমন স্ত্রীর ভাগ্যেও সন্দেহ ও লাঞ্ছনা জুটবে, এ আমরা সীতার ভাগ্য থেকেই জানি। নারীর, বিশেষত স্ত্রীর প্রতিশব্দগুলি, লক্ষ্য করলেও খানিকটা বোঝা যায় সমাজে তার স্থান কী ছিল। *রামায়ণ মহাভারত*-এই বর্ণনা ও সম্বোধনে প্রথম এ শব্দগুলির দেখা মেলে; পরবর্তী সাহিত্যে এই জাতীয় বিশেষণাত্মক শব্দ চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে থাকে। কয়েকটি দেখলেই বোঝা যাবে কোন সংজ্ঞায় নারী সমাজে ও সাহিত্যে আবির্ভূত— ভার্যা, যাকে ভরণ করা হয়, ভৃত্যের সঙ্গে এর পার্থক্য শুধু প্রত্যয়টিতে। এইখানেই পুরুষের জোর স্পষ্টত, নারীকে সে অন্ন জোগায়, নারীকে কারণ নিজের ভরণপোষণ অর্জন করার মতো বিদ্যা তাকে দেওয়া হত না। বৃত্তিতে বা সম্পত্তিতে তাকে অধিকারও দেওয়া হত না; তাই সে একান্তই নির্ভরশীল ছিল স্বামীর ওপরে। কামিনী, রমণী, কান্তা— শেষের দুটি শব্দ পুংলিঙ্গে 'প্রিয়' বোঝায়, অর্থাৎ একটি নারীর পক্ষে যে পুরুষ প্রিয় সে তারই রমণ ও কান্ত; কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিনিরপেক্ষ এই সংজ্ঞা, যেন তার ধর্মই পুরুষের তৃপ্তিবিধান করা। আর একটি প্রতিশব্দ, জায়া, যাতে পুরুষ সন্তানরূপে জাত হয়। এছাড়াও

বর্ণনাত্মক সম্বোধনগুলির অধিকাংশই দেহের অনুষঙ্গ বহন করে— যেমন রম্ভোরু, সুশ্রোণী, পীনস্তনী, ইত্যাদি (আরও নিচে, কতকটা অপমানসূচক অথচ বহুলব্যবহৃত শব্দ বরারোহা, ইত্যাদিও আছে।) মুখ্যত যৌনসম্ভোগের বস্তুরূপেই নারীর পরিচয়।

নারীকে সমাজে স্থান দেওয়ার প্রশ্নই যাতে না ওঠে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা ছিল। যেমন দুই একটি ব্যতিক্রম বাদে সাধারণ ভাবে শিক্ষায় নারীর অধিকার ছিল না। এই সময়কারই রচনা মনুসংহিতা। পুত্রের শিক্ষাব্যবস্থার বিধান দেওয়ার পর বলেছে, কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ, কন্যাকেও এই রকম শিক্ষা দিতে হবে এবং অতি যত্নে পালন করতে হবে। কিন্তু ঠিক তার পরেই বলা আছে, নারীর পক্ষে বিবাহ হল উপনয়ন, পতিগৃহে বাস হল গুরুগৃহে বাস এবং পতিসেবা হল বেদাধ্যয়ন। (মনুসংহিতা ২:৬৭) অর্থাৎ বিবাহ করে পতিগৃহে থেকে পতিসেবা করাই তার বেদপাঠের বিকল্প, তাতে একই ফল লাভ করবে। ফল যাই লাভ করুক না কেন বিদ্যা তো সে লাভ করল না। এটা ঠিক যে,

পুরাকল্পে তু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।।

পুরাকল্পে কিন্তু নারীদের উপবীত ধারণ, বেদ অধ্যাপনা এবং সাবিত্রী পাঠ (প্রবর্তিত) ছিল। (*স্মৃতি চন্দ্রিকা*, সংস্কারকাণ্ড, মহীশূর সংস্করণ, ৬২ পৃষ্ঠা)

কিংবা *হারীত ধর্মশাস্ত্র*-তে পড়ি, দ্বিবিধা স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ— নারী দু-প্রকারের, ব্রহ্মবাদিনী ও সদোবধূ। তৎসত্ত্বেও সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের ব্রহ্মবাদিনীদের আঙুলে গোণা যায়। বাকি সবই তো বধূ, যাদের পতিসেবাই হল বেদাভ্যাস। শিক্ষা ছাড়াও সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ছিল না। এর ফলেও সমাজে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে স্থান পাওয়াও তার পক্ষে কঠিন ছিল, কারণ ভরণপোষণের জন্য তাকে পরমুখাপেক্ষী হতেই হত, তা সে পিতাই হোক বা স্বামীই হোক। তৃতীয়ত, কোনও অর্থকরী বৃত্তির শিক্ষা বা ব্যবহার তার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; হয়তো সমাজের একেবারে নিচের স্তরের মেয়েরা কুটিরশিল্প, ইত্যাদি বৃত্তিকরী বিদ্যার চর্চা করে সংসারে সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্য করতে পারত। কিন্তু, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত স্তরে নারীর কোনও বৃত্তির কথা *রামায়ণ* বা *মহাভারত*-এ (বা অন্যত্র কোথাও বড় একটা) পাওয়া যায় না। ফলে সে পুরুষের ওপরে আর্থিক ভাবে নির্ভরশীল হতে বাধ্য হত। চতুর্থত, সমসাময়িক শাস্ত্রে ও সাহিত্যে দেখি, নারীর নিজের দেহের ওপরেও কোনও অধিকার ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম গণিকা, যার শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করত। তার দেহের ওপরে বেশ খানিকটা স্বাধীনতা তার ছিল এবং সে অন্নবস্ত্রের জন্যে কোনও পুরুষের দয়ার ওপরে নির্ভর করত না। যত গর্হিতই হোক তার বৃত্তি— এবং নিঃসংশয়ে তা অত্যন্ত গর্হিত ছিল— তার দ্বারা সে স্বাধীন ভাবে উপার্জন করতে পারত।

গণিকাই হোক কুলবধূই হোক, পুরুষের মনোরঞ্জনের দ্বারাই নারীর ভরনপোষণের সংস্থান হত। মর্তের গণিকা স্বর্গের অপ্সরারূপে চিত্রিত— তাদের বিবরণ যা পাই তা থেকে সমাজে রূপোপজীবিনীর আচরণ, ভূমিকা ও স্থান জানা যায়। *রামায়ণ মহাভারত*-এ সর্বত্রই অপ্সরা

আসে ঋষির ধ্যানভঙ্গ করতে বা অন্য ভাবে ইষ্টসিদ্ধি করতে— যেমন ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানে। এরা রূপসী তরুণী, কিন্তু এদের ভূমিকা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়; ইন্দ্র বা অন্য দেবতারা কোনও ঋষির তপে বা যজ্ঞে অসহিষ্ণু ও বিচলিত বোধ করলে অপ্সরা পাঠিয়ে তাদের ধ্যানভঙ্গ ঘটাতেন। ইষ্টসিদ্ধি হলে পর এরা স্বর্গে ফিরে আসত। এই যে চিত্তবৃত্তিবর্জিত দেহসর্বস্ব তরুণীর কল্পনা, মোটের ওপর এ-ই ছিল নারীর কাছে পুরুষের প্রত্যাশা। সে যেন শুধুই ভোগ্যবস্তু; তা না হলে রাম উচ্চারণ করে সীতাকে বলতে পারতেন না, 'নোৎসাহে পরিভোগায়— (তোমাকে) ভোগ করতে পারি না।'

নারীর এই ভোগ্যবস্তু ভূমিকা *রামায়ণ মহাভারত*-এ নানা ভাবে চিত্রিত আছে। প্রথমত উপাখ্যানে। অসংখ্য উপাখ্যানে নারী এই ভূমিকায় অবতীর্ণ। একটি কাহিনি উল্লেখ করা যেতে পারে:

> ঋষিকুমার গালব যযাতির কাছে এলেন। গুরুদক্ষিণা দেওয়ার সংগতি নেই। তাই রাজা যদি তাঁকে অর্থ সাহায্য করেন। ঠিক সেই সময়ে যযাতির অর্থসংকট ছিল, তাই গালবকে বললেন, তুমি আমার এই সুন্দরী তরুণী কন্যা মাধবীকে নিয়ে যাও। কোনও রাজার কাছে এক বৎসরের জন্যে একে দিলে রাজা এর কাছ থেকে যে পুত্রসন্তান লাভ করবেন তার বিনিময়ে তোমাকে অর্থ দেবেন। গালব মাধবীকে নিয়ে পরপর তিনজন রাজাকে এক এক বছরের জন্যে ভাড়া দিলেন। বিনিময়ে যে অর্থ পেলেন তা দিয়ে অবশেষে তাঁর গুরুদক্ষিণার উপযুক্ত অর্থ সঞ্চিত হল। তখন তিনি মাধবীকে পিতা যযাতির কাছে এনে ফিরিয়ে দিলেন। (মহাভারত ৫:১১৮-২২)

এ কাহিনিতে নারীর স্থান মর্মান্তিক রূপে স্পষ্ট। প্রথমত পিতা নিজে অর্থদান করতে না পেরে কুমারী কন্যাকে প্রায় গণিকাবৃত্তিতে ঠেলে দিচ্ছেন, নিজে ব্রাহ্মণকুমারকে গুরুদক্ষিণার অর্থ দেওয়ার পুণ্যটি লাভ করবার জন্যে। দ্বিতীয়ত সমাজে এমন অন্তত তিন জন রাজা পাওয়া গেল যারা সুন্দরী তরুণী কুমারীটির দেহ এক বৎসরের জন্য ভাড়া করতে দ্বিধা করেন না; পুত্রসন্তান লাভ করার কি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন উপায়। তৃতীয়ত ব্রাহ্মণ ঋষিকুমার অনায়াসে এ-কদর্য উপায়ে লব্ধ অর্থ নিলেন এবং নিজের উদ্যমে তিন জন রাজার কাছে মাধবীকে বাঁধা দিয়ে সে অর্থ সংগ্রহ করলেন। চতুর্থত, এই ভাবে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে গুরুদক্ষিণা দিতে তাঁর বাধল না। কাহিনিটির কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এই ভাবে যে মেয়েটির লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ হল যযাতি তাকে বিবাহ করতে বললেন, সে সম্মত হল না, তপস্যা করতে গেল। যযাতি স্বর্গে যাওয়ার সময়ে দেখা গেল তাঁর সঞ্চিত পুণ্যে কিছু কম পড়ছে, তখন মাধবীর পুণ্য থেকে সেটুকু পুরণ করে তিনি স্বর্গে গেলেন। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ঐহিক পারমার্থিক সর্বপ্রকার বঞ্চনাই মাধবীর ভাগ্যে জুটল। এ সবের পশ্চাতে সমাজমানসে যে বোধটি সক্রিয় ছিল তা হল: নারী ব্যক্তি নয়, বস্তু এবং ভোগ্যবস্তু।

এই বোধ বারে বারে প্রমাণিত হয় যখন দেখি হস্তী, হিরণ্য, রথ, অশ্ব, ভূমি, ইত্যাদির সঙ্গে নারীও যুক্ত হচ্ছে দানের তালিকায়। (১:১৯৮:১৬, ৮১; ৮১:৩৭; ২২১:৪৯; ৪:৩৪:৫; ১৫:১৪:৪ এবং অন্যত্র বহু স্থানে) এ দান বিবাহে, শ্রাদ্ধে, বিজয়োৎসবে, অতিথি

আপ্যায়নে যজ্ঞে এবং সামাজিক নানা অনুষ্ঠানে। অর্থাৎ নারীর দেহ ও শ্রম পুরুষের ভোগ্যবস্তু, এ নিয়ে শাস্ত্রকারদের কিছুমাত্র কুণ্ঠা নেই। এবং এ প্রথা চলে আসছিল বৈদিক কাল থেকেই। *মহাভারত*-এ একাধিক কাহিনি আছে যেখানে অতিথিকে আপ্যায়ন করতে গৃহস্বামী আপন স্ত্রীকে পাঠাচ্ছেন তার শয়নকক্ষে। কখনও বা অতিথির স্বরূপ পরে ধ্যানযোগে জানা যাচ্ছে যে তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম; কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়; স্ত্রীকে পাঠাবার সময়ে (বা গুরুর অবর্তমানে শিষ্য যখন গুরুপত্নীকে অতিথির কাছে পাঠায়) তখন তো জানা ছিল না যে, অতিথি সাক্ষাৎ ধর্ম, তখন মানুষ জেনেই তো পাঠানো হয়েছিল।

নারী যে প্রলোভন সে কথা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার জন্য এক নারী অপ্সরা পঞ্চচূড়াকে দিয়েই বলানো হয়েছে নারীর কামবৃত্তি স্বভাবতই পুরুষের থেকে অধিক। (১৩:৩৮) অপ্সরা হল গণিকার স্বর্গের প্রতিরূপ; তাহলেও এ আখ্যান উদ্দেশ্যমূলক তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন, আদিকালে পুরুষ এতই ধর্মপরায়ণ ছিল যে দেবতাদের ঈর্ষা হল। তাঁরা তখন নারীর সৃষ্টি করলেন পুরুষকে প্রলুব্ধ করে ধর্মচ্যুত করবার জন্য। (১৩:৪২) *বাইবেল*-এ ঈভের ভূমিকা স্মরণীয়। তবু ঈভ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আদমকে প্রলুব্ধ করেনি, স্বয়ং শয়তান তাকে প্রেরণা দিয়েছিল। *মহাভারত*-এ নারীর স্বভাবই হল পুরুষের অধঃপতন ঘটানো। স্বয়ং দেবতারা তাঁকে এ কাজের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম যুগের রচিত অংশে নারী পুরুষের সমকক্ষ না হলেও অনেক অংশে তার আচরণের স্বাধীনতা ছিল; তার চিন্তা করার ক্ষমতা এবং স্বতন্ত্র মানসিকতা স্বীকৃত হয়েছিল। অর্থাৎ তখন সে ব্যক্তি ছিল, বস্তুতে পরিণত হয়নি, যদিও তার চেতনার গভীরে ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল পুরুষের তুলনায় সে হীনতর জীব এবং তার ওপরে পুরুষের যেন এক বিধিনির্দিষ্ট অধিকার আছে। একটি উপাখ্যান অনুধাবন করলে এটি স্পষ্ট হয়। দ্যূতসভায় যুধিষ্ঠির যখন জুয়াতে একে একে সব সম্পত্তি, ভাইদের এবং নিজেকেও বাজি রেখে হারলেন, আর কিছুই যখন অবশিষ্ট রইল না তখন কৌরবদের প্ররোচনায় দ্রৌপদীকে বাজি রেখে খেললেন, এবং হারলেন। কৌরবদূত যখন অন্তঃপুরে দ্রৌপদীকে এ সংবাদ দিল, মনস্বিনী নারী তাকে প্রশ্ন করলেন, 'যুধিষ্ঠির কি আগে নিজেকে বাজিতে হেরেছেন, না আগে আমাকে বাজি রেখে হারিয়ে পরে নিজেকে হেরেছেন?' অর্থাৎ আগে নিজেকে হারলে তো দ্রৌপদী তখন আর তাঁর সম্পত্তি নন। এ প্রশ্নের মধ্যে দ্রৌপদীর স্বাধীন চিন্তার পরিচয় আছে। কিন্তু ওই তেজস্বিনী নারীও অবহিত ছিলেন না যে, আগে হোক পরে হোক তাঁকে বাজি রাখার অধিকারই যুধিষ্ঠিরের ছিল না। এই ধরনের ছোটখাট উক্তি ও ঘটনার মধ্যেই ধরা পড়ে সমাজে নারীর স্থান তখনই এতটাই অবনমিত যে চেতনায় নারী অধীন হয়ে রয়েছে।

সাবিত্রীর উপাখ্যানে নারীর পূর্বতন কিছু স্বাধীনতা দেখতে পাই। রাজা অশ্বপতি পুত্রের জন্য বর চেয়ে পেলেন তেজস্বিনী কন্যা, সাবিত্রী। সাবিত্রী যৌবনে উপনীতা হলে অশ্বপতি সেই 'জ্বলন্তীমিব তেজসা' কন্যাকে বললেন:

ইদং মে বচনং শ্রত্বা ভর্তুরন্বেষণে ত্বর।
দেবতানাং যথা বাচ্যো না ভবেয়ং তথা কুরু।।

আমার এই কথা শুনে স্বামীর সন্ধানে ত্বরান্বিত হও, যাতে আমি দেবতাদের কাছে নিন্দিত না হই। (৩:২৭৭:২৬)

তখন সাবিত্রী বৃদ্ধ সচিবদের সঙ্গে নিয়ে রথে চড়ে রাজর্ষিদের তপোবনে অন্বেষণ করতে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন সভায় নারদ অশ্বপতিকে অনুরোধ করছেন কন্যার বিবাহের জন্যে। অশ্বপতি সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে তিনি নির্বাচন করেছেন। নারদ সত্যবানের নানা গুণের প্রশংসা করে বললেন তাঁর একমাত্র দোষ হল, তার পরমায়ু মাত্র এক বৎসর। শুনেই অশ্বপতি সাবিত্রীকে বললেন, তুমি অন্য কাউকে বরণ কর, সাবিত্রী। সাবিত্রী বললেন:

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ।।
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নিগুণোপি বা।
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্।।
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ।।

(অংশবিভাগের সময়ে) ভাগ একবারই পড়ে; কন্যাকে একবারই সম্প্রদান করা হয়; 'দান করলাম' এ কথা একবারই বলা হয়— এ তিনটি একবার একবারই হয়। দীর্ঘায়ু অথবা অল্পায়ু হোন, গুণবান অথবা নির্গুণ হোন, একবার স্বামীকে বরণ করেছি, দ্বিতীয় কাউকে বরণ করব না। লোক মনে নিশ্চয় করে, কথায় উচ্চারণ করে বলে, পরে (সেটা) কাজে করে; এ ব্যাপারে আমার মনই প্রমাণ। (৩:২৭৮:২৫-২৭)

এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে, পিতা অশ্বপতি এবং দেবর্ষি নারদ দুই মান্যজনের নির্দেশ পরামর্শ উপেক্ষা করে, প্রকাশ্য রাজসভায়, সাবিত্রী যাঁকে ভালবেসেছেন তাঁকেই বিয়ে করবেন এই মর্মে তর্ক করলেন এবং তাঁর মত উপেক্ষিত হল না। তিনি যাঁকে চেয়েছিলেন তাকেই বরণ করতে পারলেন। সমাজের এই স্থিতিস্থাপকতা, যা গান্ধর্ববিবাহেও স্বীকৃত, তা ক্রমেই লুপ্ত হয়ে গেল। এই সব নারীরা— সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী— এঁরা গভীর প্রেমের বশে স্বামীর জন্যে যে ত্যাগস্বীকার করেছেন, পরবর্তী যুগে সেইটে পতিব্রতাধর্মের অনুশাসনে পরিণত হল কিন্তু যে শক্তিতে তাঁরা তা করতে পেরেছেন সেই মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের সার্বভৌমতা, তার কোনও স্বতঃস্ফূর্তি স্বীকার করবার শক্তি সমাজে আর রইল না।

ফলে পতিব্রতাধর্ম কতকগুলি যান্ত্রিক নির্দেশের সমাহারে পরিণত হল। এর খুব ভাল একটি দৃষ্টান্ত বনপর্বে যেখানে সত্যভামা দ্রৌপদীকে প্রশ্ন করছেন, পাঁচটি স্বামীকে তুমি কী উপায়ে তুষ্ট এবং বশীভূত রেখেছ?

তব বশ্যা হি সততং পাণ্ডবাঃ প্রিয়দর্শনে।
মুখাপেক্ষাশ্চ তে সর্বে তত্ত্বমেতদ্‌ব্রবীহি মে॥

অয়ি প্রিয়দর্শনে, পাণ্ডবরা যে সর্বদাই তোমার বশে আছে, তোমার মুখাপেক্ষী হয়ে আছে তার রহস্যটি আমাকে বল। (৩:২২২:৫)

সত্যভামা জানতে চাইলেন কোনও রাসায়নিক চূর্ণ বা মন্ত্র দ্রৌপদী ব্যবহার করেন কিনা। দ্রৌপদী বললেন:

ন জাতু বশগো ভর্তা স্ত্রিয়াঃ স্যান্মন্ত্রকারণাৎ (৩:২২২:১২)

ওইসব যারা ব্যবহার করে,

পাপানুগাস্তু পাপাস্তাঃ পতীনুপসৃজন্ত্যুত।
ন জাতু বিপ্রিয়ং ভর্তুঃ স্ত্রিয়াঃ কার্যং কথঞ্চন॥

তারা পাপিষ্ঠা, পাপের অনুসরণ করে স্বামীদের ক্ষতি করে। স্বামীর অপ্রিয় কিছু করা স্ত্রীর কখনও উচিত নয়। (১৬)

পরে দ্রৌপদী বললেন কি করে তিনি পাঁচটি স্বামীকে তুষ্ট রাখেন:

দুর্ব্যাহৃতাচ্ছঙ্কমানা দুঃখিতাদ্দূরবেক্ষিতাৎ।
দুরাসিতাদ্দুর্বজিতাদিঙ্গিতাধ্যাসিতাদপি॥
না ভুক্তবতি নাস্নাতে নাসংবিষ্টে চ ভর্তরি।
ন সংবিশামি নাস্নামি সদা কর্মকরেষ্বপি॥
নিরতাহং সদা সত্যে! ভর্তৃণামুপসেবনে।
পত্যাশ্রয়ো হি মে ধর্মো মতঃ স্ত্রীণাং সনাতনঃ।
সব দেবঃ স গতির্নান্যা তস্য কা বিপ্রিয়ং চরেৎ॥

মন্দ কথা বলতে আমার শঙ্কা হয়, দুঃখিত হয়ে অপ্রিয় ভাবে দৃষ্টিপাত করতেও, অপ্রিয় ভাবে থাকতে, চলতে, ইঙ্গিত করতে, আসন গ্রহণ করতেও শঙ্কা হয়। (২০) স্বামীর এবং ভৃত্যদের ভোজন সাঙ্গ না হলে আমি আহার করি না, স্নান সমাপ্ত না হলে স্নান করি না, তিনি না উপবেশন করলে বসি না। (২৩) সত্যভামা, আমি অহরহ স্বামীদের সেবায় নিরত। আমার মতে স্ত্রীদের সনাতন ধর্ম পতিকে অবলম্বন করেই। (২৮) স্বামীই দেবতা, স্বামীই গতি, এমন যে স্বামী কে তার অপ্রিয় আচরণ করবে? (৩৫) নিজের আচরণ সম্বন্ধে দ্রৌপদী আরও বলছেন:

অহং পতীন্নাতিশয়ে নাত্যশ্নে নাতিভূষয়ে।
নাপি পরিবদে শ্বশ্রূং সর্বদা পরিযাস্ত্রিতা॥

আমি স্বামীদের চেয়ে বেশি শয়ন, ভোজন ও অলংকরণ করি না। শাশুড়ির সঙ্গে তর্ক করি না, সর্বদা বশবর্তিনী হয়ে থাকি। (৩৬)

এই দ্রৌপদী প্রাথমিক ক্ষত্রিয়কাহিনির দ্রৌপদী নন, আর কিছু না হোক স্বামীদের বিশেষত জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মজ্ঞ স্বামী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তিনি শুধু তর্ক করেননি, প্রচুর ধিক্কার এবং

অনুযোগ করেছেন। দ্রৌপদীর এত বশংবদ রূপ মূল কাহিনিতে পাওয়া যায় না; ব্রাহ্মণ্য অংশের রচয়িতা যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য এক দ্রৌপদী সৃষ্টি করলেন। এঁর শক্তির আর একটি উৎস ওইখানেই দেওয়া আছে:

সর্বংরাজ্ঞঃ সমুদয়মায়ং চ ব্যয়মেব চ।
একাহং বেদ্মি কল্যাণি! পাণ্ডবানাং যশস্বিনাম্।।
একাহং বেদ্মি কোশং বৈ পতীনাং ধর্মচারিণাম্।।

কল্যাণি! রাজার ও যশস্বী পাণ্ডবদের সমস্ত আয় এবং ব্যয় একা আমিই জানি। (৫১) ধর্মচারী স্বামীদের ধনভাণ্ডারের বিষয়ে একা আমিই জানি। (৫৪)

এ দ্রৌপদী মূল কাহিনির, যার ব্যক্তিত্বকে নানা ভাবে সম্মান দেখিয়েছেন কবি। পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের কালে শেষ দিকের ধর্মসূত্রগুলির চাপে সম্পত্তিতে নারীর কোনও অধিকার ছিল না। অবশ্য এখানেও দ্রৌপদী আয়ব্যয়ের অধিকারিণী, সে কথা বলা নেই। বলা আছে, তিনি শুধু সব কিছুর খবর এবং হিসাব রাখেন। তবু ধর্মসূত্রে যেখানে স্বামীর ধন স্বামীর প্রবাসে থাকাকালে স্ত্রী শুধু প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারেন, দান করতে পারেন না, সে যুগের পরে স্বামীরা আয়ব্যয়ের সমস্ত ব্যাপার স্ত্রীর গোচর করে রাখতেন এমন মনে করবার কোনও হেতু নেই। মনু এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রকাররা এ ব্যাপারে রূঢ় ভাবেই স্পষ্টভাষী। দ্রৌপদী ক্ষত্রিয়কাহিনির নায়িকা, তিনি কিছু কিছু অধিকারে স্বামীদের কাছে সমতা ভোগ করতেন— এ সেই প্রথম যুগের নারীর বর্ণনা। তাঁর সঙ্গে তুলনা কুন্তীর, গান্ধারীর, যাঁরা প্রয়োজন মতো স্বামীর সঙ্গে তর্ক করেছেন, স্বামীকে দোষারোপ করেছেন, গঞ্জনা দিয়েছেন। অর্থাৎ এ সেই যুগের চিত্র যখনও নারীকে সর্বতো ভাবে পুরুষের বশ্যতাস্বীকার করতে হয়নি। মানুষ হিসেবে, সমাজে ব্যক্তি হিসেবে কিছু মর্যাদা তার অবশিষ্ট ছিল।

ব্রাহ্মণ্য সংযোজন

যাকে এখন আমরা হিন্দু ধর্ম বলি ধর্মসূত্র ততটা তার ধর্মগ্রন্থ নয়, যতটা দুটি মহাকাব্য, কুড়িটি ধর্মশাস্ত্র, আঠারোটি মহাপুরাণ এবং বেশ কয়েকখানা উপপুরাণ। এর মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতই আদিমতম পর্বের গ্রন্থ এবং প্রথমেই দেখেছি দুটিরই অন্তত দুটি স্পষ্ট ভাগ— মূল ক্ষত্রিয়কাহিনি ও ব্রাহ্মণ্য সংযোজন। মূল অংশ মনে হয় রচনার বেশ কয়েকশো বছর পূর্ব হতেই গাথা ও কাহিনিরূপে জনমানসে বিদ্যমান ছিল; ভাটচারণদের গানে আবৃত্তিতে লোকমুখে সঞ্চরমাণ ছিল। ফলে পরবর্তী সংযোজকরা এ অংশে বিশেষ হস্তক্ষেপ করতে পারেননি। ইচ্ছার অভাবে নয়, শুধু কাহিনির যে-রূপটি দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে কাব্যগুণে অমর হয়ে ছিল তার পরিবর্তন সাধারণ শ্রোতা মেনে নেবে না বলে। সে জন্যে যখন মূল মহাকাব্য দুটি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তখন এই পর্যায়ের সংযোজকরা এ দুটিকে পর পর হাতে নিলেন তাঁদের বক্তব্য, বিধিনিষেধ, অনুশাসন এই জনপ্রিয় আধারে ভরে দেওয়ার জন্যে। এতে তাঁদের শ্রোতা হন সমগ্র সমাজ। *রামায়ণ-মহাভারত*-এর কাব্যরসে যাঁরা মুগ্ধ

তাঁরা এখন বাধ্য হয়েই মহাকাব্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এই সব প্রক্ষিপ্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিপৌরাণিক তত্ত্ব শুনতে লাগলেন। এগুলি অভিপৌরাণিক, কারণ পুরাণে যে সামাজিক তথা ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রচারিত তার প্রথমতম রূপ এই প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতে পাই। এগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কারণ এগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের তদানীন্তন নবতম যে বিবর্তন পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম আখ্যা পেল তার নিজস্ব যে মূল্যবোধ তার প্রকাশ এখানে; এ মূল্যবোধের দুটি প্রধান দিক প্রথমত শূদ্রের দ্বিতীয়ত নারীর অবমূল্যায়ন। তৃতীয়ত ব্রাহ্মণের মহিমাকীর্তন, চতুর্থত সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রবর্তন যথা শৈব, বৈষ্ণব, ইত্যাদি। এগুলি যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা এদের বক্তব্যেই স্পষ্ট এবং এগুলির অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক পুরোহিতের রচনা যারা সকলে শিক্ষিত ছিল না। ফলে এ অংশগুলি কাব্যমূল্যে নিকৃষ্ট।

নারীর অবমূল্যায়ন সমাজ নানা কারণে প্রয়োজনীয় মনে করেছিল। এখন যুক্তি উপস্থাপিত করা হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত বহু বহিঃশত্রুর আক্রমণে তখন উত্তর ভারত বিপর্যস্ত, তাদের মধ্যে অনেকেই দস্যু, যাদের আক্রমণ থেকে নারীকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য ছিল তাই অবরোধ প্রথা বিস্তৃতি ও কঠোরতা লাভ করে। এ যুক্তি তুর্কি আক্রমণ সম্পর্কেও দেওয়া হয়। নারী শিক্ষিত, স্বাবলম্বী হলে যতটা অসহায় হয় অশিক্ষিত পরমুখাপেক্ষী হলে অবশ্যই অনেক বেশি হয়; কাজেই এই সব কুযুক্তি নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যেই সৃষ্ট। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজে যখন বাড়তে লাগল তখন বিশেষ সুবিধাভোগী একটি শ্রেণি সৃষ্ট হল, যে শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্যেই নারী তার পূর্বেকার অধিকার থেকে উত্তরোত্তর বঞ্চিত হতে লাগল। এই স্বার্থ হল সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্যে। পরিবারের পুরুষ কর্তা একাগ্র ভাবে কামনা করতে লাগল যাতে একমাত্র ঔরস পুত্রের জন্যেই সে তার সব সঞ্চয় রেখে যেতে পারে। এখন কি করে নিশ্চিত হওয়া যাবে পুত্রটি সত্যিই তারই ঔরস পুত্র কিনা? যদি স্ত্রীকে অন্য সমস্ত পুরুষের সাহচর্য থেকে পুরোপুরি সরিয়ে রাখার নিশ্চিত ব্যবস্থা করা যায় একমাত্র তখনই গৃহকর্তা আশ্বস্ত হতে পারে পুত্রটি তারই। এই স্বার্থপ্রণোদিত কামনা যে কতটা উদগ্র এবং উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল তার একটি প্রমাণ মহাভারতের একটি শ্লোকে আছে:

ন চন্দ্রসূর্যৌ ন তরুং পুন্নাম্নো যা নিরীক্ষতে।
ভর্তৃবর্জং বরারোহা সা ভবেদ্ধর্মচারিণী।।

যে নারী স্বামী ব্যতীত কোনও পুংলিঙ্গান্ত (নামের বস্তু), চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষও দর্শন করে না সেই ধর্মচারিণী। (১২:১৪৬:৮৮)

এ অবরোধ ব্যবস্থা পর্দাপ্রথার এক চূড়ান্ত ও উন্মত্ত সংস্করণ। পুরুষের সান্নিধ্য থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখতে পারলে গৃহস্বামী আশ্বাস পায় যে পুত্রটি তার, অতএব তার সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পত্তি ভোগে সে অধিকারী। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশের অনুপাতে নারী তার স্বাধীনতা হারায়। বলা বাহুল্য, এ অপচেষ্টা সর্বত্র সার্থক হয়নি— হয় না বলেই। অলংকারশাস্ত্রের অধিকাংশ উদাহরণ শ্লোকে অবৈধ প্রণয়েরই দৃষ্টান্ত। 'জার' ও 'জারিণী'

ঋগ্বেদ থেকেই অসংখ্যবার ব্যবহৃত। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বাৎস্যায়ন *কামসূত্র* রচনা করলেন, তাতে অসংকোচে পরস্ত্রী ও অনূঢ়া কুমারীকে কী ভাবে প্রলুব্ধ করে অনুকূল করে এনে ভোগ করা যায় তার অনুপুঙ্খ সবই দিলেন। কাজেই এ কথা অনুমান করলে ভুল হবে না যে কুলস্ত্রী মাত্রেই অবরোধের মধ্যে থাকলেই সতীসাধ্বী থাকত। এর ফলে সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত পুরুষ স্ত্রীর জীবন বিষাক্ত করে তুলত এবং যখন আশ্বস্ত থাকত তখন নিশ্চয়ই কখনও কখনও তার যত্নে-উপার্জিত সম্পত্তি গিয়ে পড়ত স্ত্রীর উপপতি বা প্রেমিকের জারজ সন্তানের হাতে। এর ফলে, বিশেষত সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর জীবন বিষময় হয়ে উঠল। সমাজ মানসে রামচন্দ্র যে সন্দেহের বিষ ঢেলে দিলেন, যে অন্যায় অবিচারের প্রবর্তন করলেন তার ফল এখনও অব্যাহত আছে। এখনও সন্দেহে পরিত্যক্ত অসংখ্য নারী দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে। সন্দেহে পরিত্যাগ ছাড়াও সত্যকার পদস্খলনে পরিত্যক্তা ছিল— আরও সহজে হতে পারত এটা। তা ছাড়াও ছিল পুত্রসন্তানকামনায় পরপর বিবাহ করা— অম্বিকা, অম্বালিকা ও দাসীর গর্ভে ব্যাসের সন্তান উৎপাদন। কুন্তীর স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষদের (কাহিনিতে তারা দেবতা হয়ে উঠেছে অবশ্য) দ্বারা ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্ম দেওয়ার মধ্যে রয়েছে ওই পুরুষ বংশধরের জন্য অদম্য আকুতির ফল।

নারীর মনুষ্যত্বের অবমাননার বহুপ্রকার ব্যবস্থা এই সময়ে শুরু হয়। যজ্ঞে দক্ষিণার তালিকায় সে আগে থেকেই ছিল; *রামায়ণ-মহাভারত*-এ আরও কয়েকটি কারণে নারী দান করা হত: প্রথমত, অতিথি আপ্যায়নে, যে কোনও বৃহৎ ক্রিয়াকর্মে— শ্রাদ্ধে, উৎসবে, যুদ্ধযাত্রায়, যুদ্ধজয়ে, যৌতুকে— নারী দান ও ভোগ্যসামগ্রীর তালিকায় স্থান পেল। দ্বিতীয়ত অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে সুন্দরী তরুণী নারী দান করতে পারা দাতার সামাজিক প্রতিপত্তির পরিচায়ক হয়ে উঠল; অর্থাৎ ধনী আত্মপ্রচারের জন্যে নিরপরাধ বহু নারীকে অসম্মান করতে দ্বিধা করত না। রাজঅন্তঃপুরের দাসীও রাজপরিবারের পুরুষের ভোগ্যবস্তু ছিল, এমন কাহিনিও পাই; অর্থাৎ এই দরিদ্র নারীদের শ্রমের সঙ্গে দেহও দান করতে হত। বহুপত্নীত্বেও নারীর অসম্মান ছিল এবং এ অসম্মান অনুষ্ঠিত হত পরিবারের মধ্যে, যেখানে সন্তানরা দেখত তাদের জননীর অসম্মান, এবং যেখানে বন্ধ্যা, বিগতযৌবনা এবং শ্রীহীনা বধূ জানতই যে তরুণীতরা এবং সুন্দরীতরা নারীকে এনে গৃহস্বামী পূর্বপরিণীতার সম্মান ধুলিতে লুটিয়ে দেবেন— পরিবারের বৃহৎ পরিসরে তাবৎ আত্মীয়পরিজনের সামনেই।

পুরাণে নারীর যে চূড়ান্ত অবমাননা নির্লজ্জ অসংকোচে অসংখ্যবার উচ্চারিত হয়েছে *রামায়ণ-মহাভারত*-এ তার সূচনা মহাকাব্য দু'টির ব্রাহ্মণ্য প্রক্ষেপে। ক্ষত্রিয়কাহিনির নারীর যে চিত্র আগে থেকে ছিল তা যথাসম্ভব তেমনই রাখা আছে; রসোত্তীর্ণ যে সাহিত্য সমাজের স্মৃতিতে ভাস্বর, তাকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা তাই ব্যর্থ হত। কিন্তু ওই রসোত্তীর্ণ সাহিত্যকেই জনশিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করল সমাজের ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধের প্রবক্তারা, জনগণকে যে নানাবিধ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল ক্রমে ক্রমে তার মধ্যে মুখ্য একটি শিক্ষা: ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি— স্বাধীনতায় নারীর কোনও অধিকার নেই।

কালিদাস-কাব্যে কয়েকটি আদিকল্প

কাব্য রচনাকালে কবির মানসপটে যে চিত্রকল্প (ইমেজ)-গুলি আনাগোনা করে— শুধু বাক্যগত নয়, সমগ্র আলেখ্যকে ব্যাপ্ত করেও— তাদেরই আদি-উৎসকে বলছি আদিকল্প (আর্কিটাইপ)। সাহিত্যের মাধ্যমে কবি তাঁর উপলব্ধি শ্রোতার মানসে সঞ্চার করতে চান। কিন্তু রচনার পূর্বে তাঁর উপলব্ধির জন্যে তাঁকে কয়েকটি বস্তুকে মনে-মনে আশ্রয় করতে হয়— কখনও সচেতন ভাবে, কখনও-বা অবচেতনার অনুপ্রেরণায়। এগুলিই সাহিত্যের উপাদান। উপাদানের মধ্যে যেমন ভাষা, ছন্দ আর অলংকারের বহু বিচিত্র উপকরণ আছে, তেমনই আছে কথাবস্তু। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কালিদাস-সাহিত্যে কয়েকটি আদিকল্পের সন্ধান।

প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় সাহিত্যে কয়েকটি আদিকল্প পরবর্তী কালের মানুষের মগ্নচৈতন্যে সংরক্ষিত ছিল; সেগুলি নবরূপ ধারণ করেছে কালিদাস-সাহিত্যে। যেমন, ভারতীয় সাহিত্যে বিক্রমোর্বশীয় কাহিনির সংলাপ-রূপ রয়েছে *ঋগ্বেদ*-এর একটি সংবাদ-সূক্তে; (১০:৯৫) *শতপথব্রাহ্মণ*-এ (১১:৫:১) এটি পূর্ণতর রূপ পেয়েছে। কিন্তু নিশ্চয়ই এটি অনেক প্রাচীন কাহিনি, তাই এটি অন্যান্য ইন্দো-ইয়োরোপীয় দেশের সাহিত্যশিল্পে নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। *সোয়ান্ লেক্* নামে রুশ ব্যালেতে তাই এর দেখা পাই। ম্যাথু আরনলডের *দ্য ফর্‌সেকন মারম্যান্* এবং অন্যত্র বহু সাহিত্যে তাই এ কাহিনি ফিরে-ফিরে এসেছে। *ঋগ্বেদ*-এ উর্বশীর হংসীরূপপরিগ্রহ আছে: তা আতয়ো ন তন্বঃ শুম্ভন্ত স্বাঃ— তাদের শরীর হংসীর মতো শোভা পাচ্ছিল। (১০:৯৫:৯) *শতপথব্রাহ্মণ*-এ দেখি: তদ্ধ তা অপ্সরস আতয়ো ভূত্বা পরিপপ্লুবিরে— সেখানে সেই অপ্সরারা হংসীরূপে জলে ভাসছিল। (১১:৫:১:৪) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় কাহিনিতেও উর্বশীর হংসীরূপে হ্রদে বিহার করার কথা ছিল বলে মনে করার হেতু রয়েছে। নাটকে বাস্তবানুগ হতে গিয়ে কালিদাস এ অংশটি পরিহার করেছেন, কিন্তু এটি যে তাঁর অবচেতনে আনাগোনা করছিল তার ইঙ্গিত রয়ে গেছে *বিক্রমোর্বশীয়* নাটকের কয়েকটি চিত্রকল্পে। মনে রাখতে হবে, মূল কাহিনিতে নায়ক যখন বিরহার্ত, তখনই নায়িকা হংসীরূপে দেখা দিচ্ছে। *বিক্রমোর্বশীয়*-র প্রথম তিনটি অঙ্কে হংসের চিত্রকল্প সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে, অর্থাৎ বিরহের রূপায়ণের প্রবেশক থেকেই হংসীর চিত্রকল্প নানা ভাবে আসছে:

সহচরীদুঃখালীঢ়ং সরোবরে স্নিগ্ধম্।
বাষ্পাববদ্ধিতনয়নং তাম্যতি হংসীযুগলকম্।।

সহচরীর দুঃখে কাতর অবস্থায় সরোবরে স্নিগ্ধ বাষ্পসজলনেত্রে হংসীযুগল ক্লিষ্ট হচ্ছে।

এর কিছু পরেই:

চিন্তাদূনমানসিকা সহচরীদর্শনলালসিকা।
বিকসতি কমলমনোহরে বিহরতি হংসী সরোবরে।

চিন্তাক্লিষ্ট মানসে সহচরীকে দেখবার জন্যে উৎসুক হংসী পদ্মসরোবরে বিহার করছে।

নাটকের অন্তিম শ্লোকেও শুনি:

প্রাপ্তসহচরীসঙ্গমঃ পুলকপ্রসাধিতাঙ্গেঃ।
স্বেচ্ছাপ্রাপ্তবিমানো বিহরতি হংসযুবা।।

সহচরীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পুলকিতদেহ হংসযুবা স্বেচ্ছায় আকাশে উড়ে যাচ্ছে।

কাজেই দেখছি, ইন্দো-ইয়োরোপীয় কাহিনির এই অংশটিকে কবি নাটকের কাহিনির মধ্যে স্থান না দিলেও চিত্রকল্পে সেটিকে উপস্থাপিত করেছেন। এটি যে প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় কাহিনি, তার প্রমাণ— অন্য ইরোরোপীয় সাহিত্যেও এর সাক্ষাৎ মেলে। আয়ারল্যান্ডের প্রাচীন লোককথায় বারেবারেই হংসীরূপ নারীতে আরোপিত হয়েছে, এবং এর অনুষঙ্গ হল ইহলোক-পরলোকের মধ্যে আনাগোনা করার ক্ষমতা, যেমন হংস জলস্থলে আর আকাশের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিহার করতে পারে।

> 'The form of a Swan-perhaps because it is that of a creature of land, water and land, a creature whose milleu has no boundaries—is appropriate for communication between two worlds" (Alwyn Rees and Brinley Rees: *Celtic Heritage*, Thames and Hudson, London, 1961, P-236.) (হংসের রূপ সম্ভবত এই কারণে যে, এই প্রাণী স্থলের, জলের ও স্থলের এবং যার বিচরণক্ষেত্রের কোনও সীমারেখা নেই; দুই পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগে যথোপযুক্ত।)

ওয়েলশ কাহিনিতে দেখি, লীন ই ফান নামে জলচারিণী দেবী প্রেমিকের উপহার প্রত্যাখ্যান করতে থাকে, শেষে একদল রাজহংসী তাদের হংসবেশ ত্যাগ করে হ্রদের জলে নামলে প্রেমিকটি তাদের মধ্যে সুন্দরীতমার বেশ হরণ করে, আর তাকে মেয়েটির পিতার কাছে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। আয়ারল্যান্ডে এওখেইড আর এতেইনের কাহিনি, এবং সুপ্রসিদ্ধ কুখুলেইন্ন আর তার রাজংসীরূপিণী প্রেমিকার কাহিনিতেও এই একই কল্পচিত্র। ইয়োরোপের অন্যান্য লোককথাতেও এ কাহিনির নানা প্রতিরূপ পাওয়া যায়; কাজেই মনে হয়, এটির একটি প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় আদিকল্প ছিল। কালিদাস এটি পেয়েছেন *ঋগ্বেদ* আর *শতপথব্রাহ্মণ*-এর কাহিনি থেকে।

এই কাহিনির একটি দিক হচ্ছে মানব আর অপ্সরার প্রেম। *শতপথব্রাহ্মণ*-এ এ প্রেমের একটি সম্ভাব্য সংকটের সমাধান দেওয়া হয়েছে: পুরূরবা মর্ত্য মানব, উর্বশী নভশ্চারিণী অপ্সরা; একদিন পুরূরবার মৃত্যু ঘটবে, উর্বশী কিন্তু চিরজীবিনী। *শতপথব্রাহ্মণ*-এ পুরূরবা একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গন্ধর্ব হয়ে উর্বশীর সঙ্গে দীর্ঘকাল মিলিত হতে পারলেন।

কালিদাসের নাটকের শেষ অঙ্কে দেবতার অনুগ্রহে উর্বশীকে তাঁর প্রিয়তমের বিচ্ছেদ সহ্য করতে হল না, তাঁরা দুজনেই আমরণ মর্ত্যে মিলিত জীবনযাপন করবার অধিকার পেলেন। এই সমস্যা খুব স্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হয়েছে প্রাচীন গ্রিক দেবকাহিনিতে। দেবী এয়স্ (উষস্, বা লাতিন অরোরা) প্রেমে পড়লেন মর্ত্য তরুণ টিথনসের সঙ্গে। টিথনসের মিনতিতে দেবী এয়স্ তাঁকে বর দিলেন অমরতার। কিন্তু দুজনেই ভুলে গেলেন যে অমরতা বার্ধক্য নিবারণ করবে না। টিথনস স্থবির, পঙ্গু, জরাগ্রস্ত হয়ে গুহায় শুয়ে থাকেন অমরতার অভিশাপ নিয়ে; আর প্রতি প্রত্যুষে চিরতরুণী এয়স্ তাঁকে দেখে যান। এই সমস্যার সমাধানে *শতপথব্রাহ্মণ*-এ একটি যজ্ঞ আছে, যার দ্বারা পুরূরবা গন্ধর্বত্ব আর অমরত্ব লাভ করেন; পুরাণে শুনি এঁরা একষট্টি হাজার বছর মিলিত জীবনযাপন করেন! কালিদাস এ সমস্যার অন্য সমাধান দিয়েছেন: পঞ্চম অঙ্কে নারদ স্বর্গ থেকে দেবতাদের নির্দেশ জানান, 'ইয়ঞ্চ উর্বশী যাবদায়ুঃ তব সহধর্মচারিণী ভবত্বিতি— এই উর্বশী পূর্ণ আয়ুষ্কাল ধরে তোমার সহধর্মচারিণী হোক।'

দ্বিতীয় যে আদিকল্পের কথা মনে আসে সেটির উৎস ইন্দো-ইয়োরোপীয় যুগের থেকেও প্রাচীনতর কাল থেকে সভ্য মানুষের চিত্তের গহনে প্রোথিত। কালিদাসে এর প্রকাশ রতিবিলাপে। সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরূপ একটি বিলাপ পাই *মৈত্রায়ণী-সংহিতা*-য় যমীর বিলাপে। (১:৫:১২) যম-যমী ভাইবোন, আবার প্রণয়ী-প্রণয়িনী। যমের মৃত্যুতে যমীর শোক কোনও প্রবোধ মানে না; সান্ত্বনা দিতে গেলে যমী কেবলই বলেন, 'এইমাত্র তো যম মারা গেল।' যম তখনও মর্ত্য (যো মমার প্রথমো মর্ত্যানাম্; অথর্ববেদ ১৮:৩:১৩)। কাজেই তাঁর মৃত্যু আছে, কিন্তু যমী তা মানতে পারছেন না। তাই দেবতারা পরামর্শ করে রাত্রির সৃষ্টি করলেন; পরদিন যমী কিছুটা শান্ত হয়ে বললেন, 'যম কাল মারা গেছে।' এ কাহিনির লাতিন প্রতিরূপ পাই খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকের কবি আপুলেইয়ুসের গ্রন্থ *দ্য গোলডেন অ্যাস*-এর সপ্তম থেকে নবম অধ্যায়ে। অনবদ্য কবিত্বের সঙ্গে সেখানে একটি কাহিনির উপস্থাপনা ঘটেছে যা প্রত্যক্ষ ভাবে মূল কাহিনির সঙ্গে অন্বিত নয়। সুন্দরীতমা দেবী ভেনাসের পুত্র কিউপিড্ (= মদন) প্রেমে পড়েছেন সাইকির সঙ্গে, যে সাইকি রূপে ভেনাসের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। মর্তে ভেনাসের পূজা অবহেলিত, কিউপিড্ মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছেন এবং সাইকি কিউপিডের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছেন। তাই ভেনাসের শাপে অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ দেখা দিল। সাইকি কেঁদে-কেঁদে বিরহযাপন করে। অনেক দুঃখের পথ পেরিয়ে তাঁদের পুনর্মিলন ঘটল।

বাইবেল-এর 'সঙ্স অব সলোমন'-এও ভাইবোন প্রণয়-প্রণয়িনী। সেখানেও প্রণয়িণীর বিরহ রূপ পেয়েছে অমর শোকগাথাতে:

> By night in my bed I sought him whom my soul loveth. I sought him but I found him nought. I will rise now and go about the city in the streets and in the broadways. I will seek him whom my soul loveth. I sought him but I found him not. ('Song of Solomon' Ch. 3, Verses 1-3) (নিশীথশয্যায় আমি তাকেই খুঁজি আমার হৃদয় যাকে ভালবাসে। তাকে খুঁজি কিন্তু পাই না। এখন আমি শয্যা ছেড়ে

বেরোবো— শহরের পথে রাজপথে তাকে খুঁজতে আমার হৃদয় যাকে ভালবাসে, তাকে চাই, কিন্তু পাই না।)

সম্ভবত এ কাহিনির প্রাচীনতর সংস্করণ সুমেরীয় দেব কল্পনায়। ইনান্না-দেবী (যাঁর আসিরীয় নাম ইশ্‌তার)-র প্রেমিক ছিলেন দুমুজি (আসিরীয় তম্মুজ)। দুমুজির মৃত্যুর পরে ইনান্না কেঁদে-কেঁদে তাঁর সন্ধান করে বেড়ালেন, দুমুজির সন্ধানে পরলোকে দেবমণ্ডলীতে উপস্থিত হয়ে তাঁর জীবন ভিক্ষা করলেন— দুমুজি পুনরুজ্জীবিত হলেন। (সম্ভবত এরই একটি প্রতিরূপ পাই মনসামঙ্গলের বেহুলা-উপাখ্যানে।) কিন্তু এরও পশ্চাতের অতীতে হয়তো এ কাহিনির সূত্রপাত মিশরীয় দেবকথার অসিরিস-আইসিস-উপাখ্যানে। এঁরাও ভাইবোন এবং প্রেমিক-প্রেমিকা। লোভী ভাই সেথ-এর চক্রান্তে অসিরিসের মৃত্যু ঘটল। আইসিস কেঁদে ফেরেন দেশে-দেশান্তরে। পনেরো শ' খ্রিস্ট পূর্বাব্দের আমেনমোসের গাথায় আছে— দুপুরের চিলনির মতো কেঁদে সে বেড়িয়েছে সারা মিশর, মৃত অসিরিসের পুনরুজ্জীবনের আশায়। লক্ষণীয়, মিশরে এ কাহিনির সঙ্গে অনুষ্ঠান ছিল, প্যালেস্টাইনেও ছিল, এবং উভয়ত্রই সে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য— শস্যক্ষেত্রে এবং প্রাণিজগতে উর্বরতা এবং বীর্যবত্তার বৃদ্ধিসাধন। কালিদাসও রতিবিলাপকে ব্যবহার করেছেন এবং রতিকে বিরহিণী রেখেছেন হরপার্বতীর মিলন পর্যন্ত। তারপরে দেবতাদের অনুনয়ে মহাদেব মদনকে সঞ্জীবিত করেন: তস্যানুমেনে ভগবান্ বিমন্যুর্ব্যাপারমাত্মন্যপি সায়কানাম্— বিগতক্রোধ ভগবান আপনার প্রতি তার শরসন্ধান ব্যাপার অনুমোদন করলেন। (কুমারসম্ভব, ৭:৯৩)

অতিপ্রাচীন আর-একটি আদিকল্প পাই *রঘুবংশ*-এ, যার পূর্বরূপ আছে *রামায়ণ*-এ রামচন্দ্র যুদ্ধশেষে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করবার পরে দশরথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে, যেমন ঘটেছিল *রামায়ণ*। গ্রিক *ইলিয়াদ* আর লাতিন *ঈনীড*-এও মৃত পিতার সঙ্গে উত্তরপুরুষের সাক্ষাৎকারের কাহিনি আছে।

অন্য-এক ধরনের আদিকল্প কালিদাস পান লোকসাহিত্য থেকে, এবং নানা বিচিত্র রূপে এগুলি তিনি ব্যবহার করেছেন। লোকসাহিত্যের দুটি বৈশিষ্ট্য: অতিশয়োক্তি এবং অতিলৌকিকতার আশ্রয়গ্রহণ। কালিদাস সত্যকার শিল্পী, তাই অতিশয়োক্তি তিনি পরিহার করেছেন, কিন্তু অতিলৌকিক উপাদান গ্রহণ করে কাব্যানুগরূপে ব্যবহার করতে তিনি বিমুখ নন। অতিলৌকিক উপাদান কালিদাস-সাহিত্যে বহুরূপে অনুপ্রবিষ্ট। প্রথমত, ধরা যাক অতিলৌকিক বস্তু: যেমন *বিক্রমোর্বশীয়* সংগমনীয় মণি, স্পর্শমণিরই অন্য-এক সংস্করণ— যার সাহায্যে পুরূরবার আলিঙ্গনে লতারূপিণী উর্বশী নারীদেহ ফিরে পেলেন। কিংবা *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এ রক্ষাকরণ্ডক— যা অবাঞ্ছিত ব্যক্তির স্পর্শে সাপ হয়ে যায়, তারই মাধ্যমে দুষ্যন্ত পুত্র সর্বদমনকে পেলেন। অথবা *রঘুবংশ*-এর সেই মালাটি, যার স্পর্শে ইন্দুমতীর প্রাণনাশ ঘটল। *রঘুবংশ*-এ শুনি, প্রার্থী কৌৎসের জন্যে রাজা অজ যেই কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত, ওমনি, 'হিরন্ময়ীং কোষগৃহস্য মধ্যে বৃষ্টিঃ শশংসুঃ পতিতাং নভস্তঃ:— রাজকোষের মধ্যে আকাশ থেকে স্বর্ণময় বৃষ্টিপাতের খবর পাওয়া গেল।' (৫:২৯) *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এ

চতুর্থ অঙ্কে পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে শকুন্তলার বসনালংকারপ্রপ্তিও তেমনই একটি অতিপ্রাকৃত উপাদান। রূপান্তরে অতিলৌকিকের দ্বিতীয় একটি পরিচয় আছে। যেমন, *রঘুবংশ*-এ মতঙ্গে শাপে প্রিয়ংবদের গজরূপপ্রাপ্তি; (৫:৫৩) স্বরূপ ফিরে পাওয়ার পর ইনি অজকে একটি সম্মোহন-অস্ত্র দেন যার সাহায্যে ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের পরে অজ সমবেত যুদ্ধোদ্যত রাজমণ্ডলীকে পরাস্ত করেন। *বিক্রমোর্বশীয়*-তে উর্বশীর কুমারবনে লতায় পরিণত হওয়াও একটি লোকসাহিত্যের উপাদান। *রঘুবংশ*-এ রাজা দিলীপ দেবধেনু নন্দিনীর সেবা এবং প্রাণের বিনিময়েও নন্দিনীকে রক্ষা করার চেষ্টার দ্বারা যখন তাকে তুষ্ট করেন, তখন পুত্রহীনতার শাপ থেকে তাঁর মুক্তি ঘটে— সেও একটি অলৌকিক ঘটনার সাহায্যে। নন্দিনী বলেন, 'দুগ্ধ। পয়ঃ পত্রপুটে মদীয়ং পুত্রোপভুঙ্ক্ষেতি তমাদিদেশ— পুত্র, আমার দুগ্ধ পত্রপুটে দোহন করে পান করো!' (২:৬৫) আমরা জানি, বহু রূপকথায় এই রকমই মন্ত্রপূত ফল বা শেকড় যথাবিধি সেবন করে অপুত্রক পুত্র লাভ করে। দশরথের মহিষীদের চরুভক্ষণের কাহিনি তো *রামায়ণ*-এ ছিলই।

রঘুবংশ-এর সূচনাতেই লোকসাহিত্যের একটি পরিচিত কথা পাই— রাজা দিলীপের সবই আছে: একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ— পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য, তরুণ বয়স, সুন্দর দেহ। নেই কেবল পুত্রসন্তান, রাজসিংহাসনে বা রাজবংশে উত্তরাধিকারী। ঠিক যেমন শুনি রূপকথায়; রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, সুন্দরী রানি— কিন্তু রাজার ছেলে হয় না। এবং *রঘুবংশ*-তে এর সমাধানও এল রূপকথারই রূপ ধরে; সেবায় প্রীত নন্দিনীর দুগ্ধপান। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এ রাজার সবই আছে, নেই কেবল পুত্রসন্তান। *বিক্রমোর্বশীয়*-তে কাহিনির অন্ত্যপর্বে অপুত্রক রাজা পুত্রবান হন। এখানেও ঠিক এমনই আর-একটি রূপকথার সূত্র পাই: জটিল সমস্যার চূড়ান্ত মুহূর্তে সমাধান আসে অলৌকিকের পথ ধরে। যেমন, অজ যখন কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত তখন স্বর্ণবৃষ্টি হয়ে সমাধান হল, অথবা শাপের অবসানে যখন উর্বশীর স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের দুর্লগ্ন উপস্থিত তখন নারদের মুখে ইন্দ্রের নির্দেশে আসন্ন বিপদ নিবারিত হল। রূপকথাতেও ঠিক এমনই ঘটে: ডাকাতরা যখন বন্দিকে দেবীর সামনে বলি দিতে খাঁড়া তোলে, তখনই দৈবনিয়ন্ত্রণে ঘটনার গতি আমূল পরিবর্তিত হয়।

দৈববাণী লোকসাহিত্যের আর-একটি উপাদান। অত্যন্ত সংকটময় কয়েকটি মুহূর্তে কালিদাস দৈববাণীর আশ্রয় নেন। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এ কণ্ব অগ্নিগৃহে দৈববাণী শোনেন যে শকুন্তলা দুষ্যন্তের পরিণীতা বধূ, এবং তাঁরই সন্তানের জননী হতে চলেছেন। মানুষের মুখে এ কথা শুনলে সম্পূর্ণ সংশয়চ্ছেদ হত না এবং ঋষি শকুন্তলাকে ওই ভাবে অভিনন্দিত করতেন না। নাটকের পক্ষে অত্যাবশ্যক এই দৈববাণী। *কুমারসম্ভব*-এর পার্বতী যে হরবধূ হবেন সে সম্বন্ধে নারদের ভবিষ্যদ্বাণী শুনি; (১:৫০) কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ দৈববাণী শুনি চতুর্থ সর্গে যখন রতি সহমৃতা হওয়ার জন্য চিতারোহণে উদ্যত। দৈববাণীই তখন জানিয়ে দেয় যে মদন পুনরুজ্জীবিত হবেন— হরপার্বতীর মিলনের পরে। (৪:৪৮)

পৃথিবীর সব লোকসাহিত্যেই এক কল্পলোকের চিত্র আছে যেখানে নিত্যসুখ— জরা-মৃত্যু-বেদনা, মর্তজীবনের অপূর্ণতা যেখানে অনুপস্থিত। ভারতীয় সাহিত্যের আদিপর্বে শুনি:

যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।
স্বধা যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামৃতং কৃধি।।
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধি।।

যেখানে কামনার তৃপ্তি, যেখানে স্বধা ও তৃপ্তি সেখানে আমাকে অমর করো। যেখানে আনন্দ, আমোদ, হর্ষ ও প্রকৃষ্ট হর্ষ আছে, কামনার যেখানে চরিতার্থতা, সেখানে আমাকে অমর করো। (*ঋগ্বেদ* ৯:১১৪:১০-১১)

মহাভারত-এ উত্তরকুরুর বর্ণনা, সত্যযুগের বর্ণনা— অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী পুটকে পুটকে মধু: হলকর্ষণে পৃথিবীতে শস্য উৎপাদন করতে হয় না, প্রতি পত্রপুটে যেখানে মধু পাওয়া যায়। এরও পশ্চাতে আমরা অন্যান্য প্রাচীনতর সাহিত্যে এমনই স্বপ্নস্বর্গের চিত্র পাই। এ স্বর্গ দূরে— হয় স্থানে, নয় কালে, কিংবা উভয়তই। বোধহয় পৃথিবীর প্রাচীনতম স্বপ্নস্বর্গের বর্ণনা পাই মধ্যপ্রাচ্যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম ভাগের নিপ্পুরের এক শিলালেখে দিলমুনের বর্ণনায়:

> Where the croak of the raven was not heard, the bird of death did not utter the cry of death, the wolf did not rend the lamb, the dove did not mourn, there was no widow, no sickness, no old age, no lamenation. (যেখানে কাকের কর্কশধ্বনি ছিল না; মৃত্যুপক্ষী যেখানে ডাকত না মরণের ডাক; ভেড়াকে ছিঁড়ে খেত না নেকড়ে বাঘ; পারাবত গাইত না দুঃখগীতি; যেখানে বিধবা ছিল না; অসুখ ও বার্ধক্য ছিল না, ছিল না কোনও দুঃখ।)

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য *গিলগামেশ*-এর কাহিনিতেও অনুরূপ একটি কল্পচিত্র পাই। গিলগামেশ যাচ্ছে উতনপিশতিমের কাছে:

> There was the garden of the Gods, all round him stood bushes bearing gems...there was fruit of carnelian with vine hanging from it beautiful to look at: lapis lazuil leaves hung thick with fruit, sweet to see. For thorns there were haematite and rare stone, agates and pearls out of the sea. (The *Epic of Gilagamesh*, Penguin, Ch. IV) (সেখানে ছিল ঈশ্বরের বাগান, তার চাদ্দিকে ঘিরে ছিল রত্নের ঝাড়... সুন্দর দেখতে লতা থেকে ঝুলে থাকা ফল; লাপিস লাজুহল পাতার ফাঁকে ঝুলে থাকা ফল। কাঁটার বদলে ছিল গৈরিক লৌহ আকর এবং দুষ্প্রাপ্য পাথর— সমুদ্র থেকে উঠে আসা চুনি পান্না।)

বাইবেল-এ এ স্বর্গ আছে সৃষ্টির আদিতে আর প্রলয়ের অন্তে। সৃষ্টির আদিতে গার্ডন অব ঈড্‌ন্‌-এ অভাব, জরা, মৃত্যু, অতৃপ্তি নেই। আবার বুক অব রেহ্‌লেশন-এ পড়ি:

> And I saw a new heaven and a new earth...and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. (Ch. XXI: 1, 4) (আমি এক নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী দেখলাম... এবং ঈশ্বর তাদের চোখ থেকে সব অশ্রু মুছে দেবেন; এবং সেখানে কোনও মৃত্যু থাকবে না, দুঃখ ও কান্না থাকবে না? আর এগুলো যেহেতু থাকবে না তাই কোনও যন্ত্রণাও থাকবে না।)

কালিদাসের সাহিত্যে এই কল্পচিত্রটি নানা রূপে ফিরে-ফিরে দেখা দিয়েছে। *কুমারসম্ভব*-এর প্রথম সর্গের হিমালয়বর্ণনায় একটি দুঃখবিনির্মুক্ত দেবস্থান আনন্দভূমিরূপে বর্ণিত। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এ মারীচের আশ্রমও প্রায় তাই: সৎকল্পবৃক্ষ বন, কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশ জল, রত্নশিলাগৃহ, ইত্যাদির বর্ণনা শেষ করছেন কবি— 'যৎকাঙ্ক্ষতি তপোভিঃ:— মানুষ তপস্যার ফলরূপে যা চায়।' (৭:১২) *কুমারসম্ভব*-এ ওষধিপ্রস্থের সুদীর্ঘ বর্ণনাও এই পর্যায়ের। সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত ভোগ্যবস্তুর সমাহারে মানুষের ভোগবাসনা এখানে কল্পনায় চরিতার্থ হয়: 'যৌবনান্তং বয়ো যস্মিন্নান্তকঃ কুসুমায়ুধাৎ— বয়স যেখানে যৌবন ছাড়ায় না, যেখানে মদন (প্রেমে) ছাড়া অন্য মৃত্যু নেই।' (৬:৪৪) এত সুখ যে 'স্বর্গাভিসন্ধিসুকৃতং বঞ্চনামিব মেনিরে:— স্বর্গসুখের পুণ্যকে তাঁরা বঞ্চনার মতো মনে করেন।' (৬:৪৭)

কিন্তু কালিদাস-কাব্যে সার্থকতম স্বপ্নস্বর্গ বোধহয় *মেঘদূত*-এর উত্তরমেঘের অলকাবর্ণনায়। এখানেও পৃথিবীর বঞ্চিত ব্যর্থকাম মানুষের, ব্যাধিবেদনা-জরা- মৃত্যু-জর্জরিত মানুষের স্বপ্নের অভিপ্রসারণ একটি পরমভোগ্য নিত্যসুখের কল্পলোকে। ঐশ্বর্য সৌন্দর্য সম্ভোগ বৈচিত্র এবং অনায়াসলব্ধ অবিচ্ছিন্ন সুখের একটি স্বপ্নধাম কবি উত্তরমেঘের প্রথম এগারোটি শ্লোকে নির্মাণ করেছেন। এর মধ্যে একটিতে প্রেমের চিত্রায়ণে সিদ্ধহস্ত কবি মানুষের প্রেমিক সত্তার জন্যে চিরন্তন কাম্যস্বর্গ সৃষ্টি করেছেন:

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈর্নান্যস্তাপঃ
কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তির্বিত্তেশানাং ন
চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি।।

যেখানে অশ্রু শুধু আনন্দেরই, অন্য কোনও কারণের নয়, প্রেমের তাপ ছাড়া অন্য তাপ যেখানে নেই এবং সে তাপও প্রিয়মিলনে নির্বাপিত হয়; প্রণয়-কলহ ছাড়া যেখানে বিরহ নেই, এবং যক্ষদের যেখানে যৌবন ছাড়া অন্য বয়সই নেই।

এর মধ্যে *কুমারসম্ভব*-এর ওষধিপ্রস্থের বর্ণনার 'যৌবনান্তং বয়ো যস্মিন্নান্তকঃ কুসুমায়ুধাৎ'-এর প্রতিধ্বনি আছে। লক্ষণীয়, উত্তরমেঘের এই শ্লোকের সমস্ত ঝোঁকটা পড়ে

'বিপ্রয়োগোপপত্তি' শব্দটির ওপরে। বিরহভীরু প্রেমিকের স্বর্গের কল্পনা তো এমনই এক নিত্যমিলনের ধামের মধ্যেই চরিতার্থ। তাই *রঘুবংশ*-এ রামচন্দ্র পরিত্যাগ করলে পর সীতা পরজন্মের জন্যে একটিমাত্র কামনা উচ্চারণ করেন, 'ভুয়ো যথা মে জননান্তরেহপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ— পরজন্মে আবার যেন তোমাকেই স্বামী পাই, আর যেন বিচ্ছেদ না হয়।' (১৪:৬৬) তাই যক্ষ মেঘকে আশীর্বাদ জানায়, 'মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ— (তোমার বধূ) বিদ্যুতের সঙ্গে যেন তোমার এক মুহূর্তের বিচ্ছেদও না হয়।'

কালিদাস-সাহিত্যে প্রেমের যে চিত্র তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেকেই বলেছেন যে, কবি দেহনিষ্ঠ প্রেমকে তপস্যার দ্বারা শোধন করে স্থায়ী মিলনে উত্তীর্ণ করেছেন। কিন্তু মনে হয়, কবির চিত্তের গহনে যে চিত্রকল্পটি সক্রিয় ছিল তা তপস্যা নয়, যজ্ঞ। উদাহরণে বলা যায়, *কুমারসম্ভব*-এ মদনের মৃত্যুর হেতুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে,

> অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বসুতামকরোৎ প্রজাপতিঃ।
> অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তঃ ফলমেতদন্বভূৎ।।

প্রজাপতিকে নিজের দুহিতার প্রতি অভিলাষী করে (মদন)...সেই কারণে অভিশাপে তাকে এর ফল ভোগ করতে হয়। (৪:৪১)

মেঘদূত-এ স্বাধিকারপ্রমত্ত যক্ষ তার বিচ্যুতির পূর্ণ মূল্য শোধ করেছে তীব্র বিরহের মর্মযন্ত্রণায়। *মালবিকাগ্নিমিত্র*-তে বিরহ নেই বললেই হয়; মালবিকা আর অগ্নিমিত্রের পরস্পরের অদর্শনে যে ব্যাকুলতা তা অনেকটা লঘু স্তরেই চিত্রিত হয়েছে। অগ্নিমিত্র মধ্য যৌবনে উত্তীর্ণ, তাঁর পিতা আর পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত, তিনি অন্তঃপুরে একটি সুন্দরী তরুণীকে দেখেই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। এ মনোভাবকে প্রেম বললেও এ প্রেম অগভীর, এবং নাটকের শেষ পর্যন্ত তা কোনও গভীরতায় পৌঁছয়নি। এ প্রেমের বাধাও যেমন অকিঞ্চিৎকর, তার নিরাকরণও তেমনই লঘু স্তরের। *বিক্রমোর্বশীয়*-এ কিন্তু চিত্রটি অন্য রকম— এখানে নায়ক-নায়িকার বিরহ দুবার; প্রথম বার দ্বিতীয় অঙ্কে ইষ্টজনকে লাভ করবার ব্যাকুলতা, প্রথম প্রেমের উন্মাদনায় চঞ্চল। দ্বিতীয় বার চতুর্থ অঙ্কে, যেখানে পুরূরবার বিরহ মর্মস্পর্শী। পুরূরবা প্রমোদবনে এসেছেন, রাজকার্য সচিবদের হাতে অর্পণ করে; উর্বশী এসেছেন একমাত্র পুত্রকে পিতামাতার কাছ থেকে নির্বাসন দিয়ে, দুজনেই এসেছেন নিরঙ্কুশ সম্ভোগের আশায়। এই উদ্বেল কামনার ধ্বংসবীজ তার নিজের মধ্যেই নিহিত ছিল, তাই অহেতুক ঈর্ষায় উদভ্রান্ত হয়ে উর্বশী অসতর্কে কুমারবনে প্রবেশ করে লতায় পরিণত হলেন এবং পুরূরবা কেঁদে-কেঁদে উন্মত্তপ্রায় হয়ে তাঁকে খুঁজে ফিরলেন। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এও বিরহ দুটি পর্যায়ে— প্রথম বার দ্বিতীয় আর তৃতীয় অঙ্কে অদর্শনের ক্ষোভে আর হতাশায়, এবং দ্বিতীয় বার ষষ্ঠ অঙ্কে দুষ্যন্তের নিরন্ত মর্মযন্ত্রণায়। নেপথ্যে শকুন্তলারও, যার পরিচয় সপ্তমে পাই, 'বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ —ধূলিধূসর দুখানি বস্ত্র পরণে, ব্রতশীর্ণ মুখ, (বিরহদিনের) একটি বেণী ধারণ করে আছেন।'

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অভিশাপ প্রকট বা প্রচ্ছন্ন এবং তা এসেছে কর্তব্যে বিচ্যুতির অপরাধেই। নায়ক বা নায়িকার মর্মন্তুদ যন্ত্রণার মধ্যে প্রতিকার বা পুনর্মিলন ঘটেছে।

এই যন্ত্রণাভোগ প্রায়শ্চিত্ত যাগ আর কাম্যেষ্টির মিলিত প্রতীক। মনে রাখতে হবে, কালিদাসের কাল ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগ, যজ্ঞ তখন মহাসমারোহে বারংবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গুপ্তরাজারা নতুন করে যজ্ঞ করছেন, এমন কথা শিলালেখেও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, যাঁর রাজত্বকালেই সম্ভবত কালিদাসের আবির্ভাব, তিনি মথুরা শিলালেখে বলছেন, 'চিরোৎসন্নাশ্বমেধাহর্তুর্মহারাজশ্রীগুপ্তপৌত্রস্য... দীর্ঘকাল যা অনুষ্ঠিত হয়নি সেই অশ্বমেধের সম্পাদক মহারাজ শ্রীগুপ্তের পৌত্র'... ইত্যাদি।

গুপ্তযুগ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাদুর্ভাবকাল; সমগ্র কালিদাস-সাহিত্যে যজ্ঞের কথা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। *রঘুবংশ*-এর শুরুতেই রঘুবংশীয় আদর্শ বর্ণনা হচ্ছে, 'যথাবিধিহুতাগ্নীনাম্— যাঁরা যথানিয়মে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়ে থাকেন। (১:৬) রাজা রঘুর বিষয়ে, 'দুদোহ গাং সা যজ্ঞায়, শস্যায়, মঘবা দিবম্— যিনি পৃথিবীকে দোহন করেন যজ্ঞের জন্য, ইন্দ্র আকাশকে দোহন করেন শস্যের জন্য।' (১:২৬) দিলীপের পত্নী সুদর্শনার বর্ণনা, 'অধ্বরস্যেব দক্ষিণা— তিনি যেন যজ্ঞের দক্ষিণা।' (১:৩৯) বশিষ্ঠকে দিলীপ বলছেন:

হবিরাবর্জিতং হোতস্ত্বয়া বিধিবদগ্নিষু।
বৃষ্টির্ভবতি শস্যানামবগ্রহবিশোষিণম্।

হে হোতা, তুমি যথানিয়মে হব্য এনেছ অগ্নির উদ্দেশ্যে, (তাই) অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক শস্য বৃষ্টি পায়। (১:৬২)

রঘুবংশীয়দের পরিচয়, এঁরা 'ইজ্যাবিশুদ্ধাত্মা— যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন।' (২:৭৫) দিলীপের পুত্র রঘু বিশ্বজিৎযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দশরথের বর্ণনায় শুনি, 'ঋষিদেবগণাস্বধাভুজাং শ্রুতযাগপ্রসবৈঃ স পার্থিবঃ— স্বধাভোজী ঋষি ও দেবগণের জন্যে বহু বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এই রাজা।' (৮:৩০) ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে অনুপরাজের বর্ণনা, 'অষ্টাদশদ্বীপনিখাতযূপাঃ— আঠারোটি দ্বীপে তাঁর (যজ্ঞে পশুবলির) যূপ প্রোথিত।' রাজা কুশের পুত্র অতিথির বর্ণনা: তিনি অনুষ্ঠান করেন, 'প্রচুরদক্ষিণাযুক্ত বহু যজ্ঞের— যজ্ঞাঃ পর্যাপ্তদক্ষিণাঃ।' (৭:১৭)। *মালবিকাগ্নিমিত্র*-এর বিষ্কম্ভকে নাটকের বর্ণনা: 'দেবানামিদমামনন্তি মুনয়ঃ শান্ত ক্রতুং চাক্ষুষম্— মুনিরা বলেন, নাটক দেবতাদের শান্ত চক্ষুগ্রাহ্য যজ্ঞ।' (১:৪) এই নাটকের অন্তে এক অশ্বমেধযজ্ঞের উল্লেখ আছে (চতুর্থ অঙ্কে)। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এর সূচনাতেই, 'যা স্রষ্টুঃ সৃষ্টিরাদ্যা বহতি বিধিহুতাং যা হবির্যা চ হোত্রী— যিনি স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি, যিনি যথানিয়মে (অগ্নিতে) প্রদত্ত হব্য বহন করেন, যিনি হবিঃ, যিনি হোতা।' (১:১) দুষ্যন্তের বর্ণনা করছে সারথি, 'মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্— যেন মৃগরূপধারী যজ্ঞের অনুসরণকারী শিবকেই সাক্ষাৎ দেখছি।' দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষিদের ইষ্টিবিঘ্নের কথা আছে। যজ্ঞ সমাধা হলে পর দুষ্যন্ত চলে গেছেন— 'অদ্য স রাজর্ষিরিষ্টিং পরিসমাপ্য ঋষিভির্বিসর্জিতঃ— আজ যজ্ঞ শেষ হওয়ার পরে ঋষিরা সেই রাজাকে বিদায়

দিয়েছেন।' চতুর্থ অঙ্কে কণ্ব শকুন্তলাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, 'দিষ্ট্যা ধূমাকুলিতদৃষ্টেরপি যজমানস্য পাবক এবাহুতিঃ পতিতাঃ— সৌভাগ্যক্রমে ধূমে আকুলিতদৃষ্টি যজমানের আহুতি ঠিক অগ্নিতেই পড়েছে।' ষষ্ঠ অঙ্কে সানুমতী বলছেন, 'শ্রুতং ময়া শকুন্তলাং সমাশ্বাসয়ন্ত্যা মহেন্দ্রজনন্যা মুখাদ্ যজ্ঞভাগোৎসুকা/দেবাস্তথা করিষ্যন্তি যথাচিরেণ ধর্মপত্নীং ভর্তা অভিনন্দিষ্যতি।— ইন্দ্রের জননী যখন শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন তখন তাঁর মুখে শুনেছি যে যজ্ঞভাগের জন্যে উৎসুক দেবতারা এমন (ব্যবস্থা) করবেন যাতে অচিরেই ধর্মপত্নীকে তাঁর স্বামী অভিনন্দিত করবেন।' নাটকের শেষে তাই মারীচ দুষ্যন্তকে আশীর্বাদ করছেন, 'ত্বমপি বিততযজ্ঞং বজ্রিণং প্রীতয়ালম্— তুমিও যজ্ঞবিস্তার করে বজ্রধারী ইন্দ্রকে প্রীত করো।' স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়া উপমানেও ফিরে-ফিরে এসেছে যজ্ঞ। শকুন্তলা, সর্বদমন আর দুষ্যন্ত যেন 'শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি— শ্রদ্ধা, ধন ও (যজ্ঞের) বিধান।' এ রকম অনেক উদাহরণ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কালিদাসের চিত্তে তৎকালীন সমাজে যজ্ঞের পুনরনুষ্ঠান, বহুদিনের অচলিত যজ্ঞের পুনঃপ্রবর্তন বিশেষ একটি তাৎপর্য বহন করত।

যজ্ঞ দ্বারা মানুষ তার অভীষ্ট লাভ করে এবং কৃত দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে। তপস্যার মতো যজ্ঞেও যজমান কৃচ্ছ্রসাধন করেন, শুদ্ধাচারী থেকে উপবাস আর নিয়ম পালন করেন এবং ভোগ্যবস্তুর ভোগ থেকে বিরত থাকেন। এখানে যজ্ঞের সঙ্গে তপস্যার মিল; কিন্তু যজ্ঞে অগ্নিক্রিয়া প্রত্যক্ষ, অভিধাগত— তপস্যায় ব্যঞ্জনাগত। বিরহের যন্ত্রণা এই দাহের, অগ্নিক্রিয়ার রূপকল্প। *কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র*-র ভাষ্যে আছে: 'উদ্দিশ্য দেবতাং দ্রব্যত্যাগো যাগঃ'— দেবতার উদ্দেশে দ্রবত্যাগই যজ্ঞ।' তপস্যায় ত্যক্ত দ্রব্যের পুনর্ভোগ নেই, যজ্ঞে আছে। যজ্ঞের আগে আর পরে যজমানের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, তপস্যায় সাধারণত তা নয়। ব্রত কাম্যেষ্টির মতোই, কিন্তু এতে অগ্নিক্রিয়া নেই এবং এর দ্বারা ভোগ্যবস্তুর শুদ্ধিসম্পাদন হয় না। এইখানেই কালিদাস-সাহিত্যে যজ্ঞের রূপকল্পের সার্থকতা। যজমান হব্যের একাংশ দেবতাকে দেন, যজ্ঞের আগুনে সে-অংশ ভস্মসাৎ হয়, এবং কেবলমাত্র তখনই হব্যের বাকি অংশ হুতশেষ বা প্রাশিত্র হয়, তা যজমান গ্রহণ করেন।

কালিদাস-সাহিত্যে প্রথম প্রেমের উন্মাদনায় বিহ্বল নায়ক-নায়িকার কর্তব্যে ত্রুটি ঘটে। প্রেম এমনই একান্ত হয়ে ওঠে যে তা সম্ভোগসর্বস্ব রূপে প্রতীয়মান হয়। কিছুকালের জন্যে নায়ক বা নায়িকা বঞ্চিত হয় প্রিয়মিলন থেকে। এই বিরহের যন্ত্রণা তার প্রায়শ্চিত্ত— আত্মবিস্মৃতির, কর্তব্যে বিচ্যুতির। এই বঞ্চিত হওয়ার দ্বারা তার বাকি জীবনে সেই প্রেম হুতশেষরূপে দেখা দেয়। *বিক্রমোর্বশীয়* চতুর্থ অঙ্কে বিরহ এবং মিলনের পরেই উর্বশী পুরূরবাকে বলছেন:

মহান্ খলু কালস্তব প্রতিষ্ঠানান্নির্গতস্য।
কদাচিদসূয়িষ্যন্তি মহ্যং প্রকৃতয়ঃ তদেহি নির্বর্তাবহে।।

বহুদিন হল তুমি প্রতিষ্ঠান-নগর থেকে বেরিয়ে এসেছ, হয়তো প্রজারা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবে, তাই চলো ফিরি।

এ নাটকের শেষ অঙ্কে তাঁদের পুনর্মিলিত জীবনের বর্ণনা:

প্রবিশ্য নগরমিদানীং সসৎকারোপচারৈঃ
প্রকৃতিভিরনুরজ্যমানো রাজ্যং করোতি।

নগরে প্রবেশ করে এখন প্রজাদের দ্বারা বহু উপচারের সম্মান আর অনুরাগ পেয়ে তিনি রাজত্ব করছেন।

এবারে সেই উদ্দাম প্রেম আপন সীমার মধ্যে সুষমা লাভ করেছে, আর তা কর্তব্যে বিচ্যুতি ঘটায় না, বরং কর্তব্যে প্রেরণা জোগায়। এবারে সে প্রেম হয়েছে হুতশেষ, তার আতিশয্য দগ্ধ হয়ে বাকিটুকু পরিণত হয়েছে প্রাশিত্রে, যার মধ্যে ভোগ আর ত্যাগ একটি সামঞ্জস্যের মধ্যেই বিধৃত।

এর ব্যতিক্রম উনমানবের ক্ষেত্রে, যেমন তাড়কার কামনাসর্বস্ব আবেগ। তার মধ্যে ত্যাগ নেই বলে কোনও শুভকে তা বহন করে না। মানুষের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম অগ্নিবর্ণে, যার কামনার আলেখ্য বিভীষিকাময়: রাজদর্শনে আগ্রহী প্রজাদের জন্যে যিনি দুটি পদতল প্রসারিত করে রাখেন, কারণ অবিচ্ছিন্ন সম্ভোগ থেকে এক মুহূর্তও তিনি বিরত হতে প্রস্তুত নন। এর পরিণাম ক্ষয়, অকালমৃত্যু; এ ভোগসর্বস্ব কামনা অভিশপ্ত। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে যখন প্রেম আসে না তখন তার রূপ উগ্র, কামনাসর্বস্ব। (রবীন্দ্রনাথের *চণ্ডালিকা* নাটকে এ প্রেম অভিচার আর উচাটনকে আশ্রয় করে সার্থকতা খুঁজেছে।)

কালিদাস মুখ্যত পুরুষেরই বিরহ বর্ণনা করেছেন— রামচন্দ্র, দুষ্যন্ত, পুরূরবা, যক্ষ, অজ। এঁদেরই বিলাপ তাঁর কাব্যনাট্যতে নানাসুরে অনুরণিত। সীতা, শকুন্তলা, উর্বশী, যক্ষবধূ— এঁরা নেপথ্যে বিরহ যাপন করেছেন। দেবতার বেলাতেই শুধু ব্যতিক্রম; উমার বিরহের মর্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছেন কবি, রতিবিলাপ কুমারসম্ভবের কেন্দ্রস্থলে। মদন-রতির উপাখ্যান কালিদাসেরই উদ্ভাবন। পরবর্তী পুরাণগুলি খুব সম্ভব মহাকবির কাব্য থেকেই এ কাহিনি পেয়েছে। কাহিনিটি অসামান্য তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, প্রেম সম্বন্ধে কালিদাসের যে উপলব্ধি আর বোধ, তা এই প্রতীকী কাহিনিতেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রেমের অধিদেবতা মদন তাঁর উচ্ছৃঙ্খল শরসন্ধানের বিলাসে প্রজাপতিকে গর্হিত কামনায় অনুপ্রেরিত করেছিলেন। পরে, দ্বিতীয় বারে, উদাসীন শিবকে লক্ষ্য করে যখন কার্মুকে জ্যা আরোপণ করলেন তখন, 'স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্নোঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পাপাত— সহসা তাঁর তৃতীয় নেত্র থেকে স্ফুলিঙ্গ-জ্বলা অগ্নি নির্গত হল।' (৩:৭১) সে অগ্নিতে মদন ভস্মসাৎ হলেন, রতির আর্ত বিলাপে আকাশ বাতাস শিহরিত হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রতির আত্মহত্যা নিবারিত হল পুনর্মিলনের আশ্বাসে, দৈববাণীতে। এর অব্যবহিত পরের সর্গেই আর-এক দেবীর বিরহের বর্ণনা— পার্বতীর সুকঠোর তপস্যা।

মদন-রতির উপাখ্যানে কালিদাস প্রেম সম্পর্কে তাঁর শিল্পীর উপলব্ধিকে একটি প্রতীকী রূপ দিয়েছেন। মদনের ভস্ম হয়ে যাওয়া যজ্ঞে হব্যবস্তুর দগ্ধ হওয়ারই প্রতীক। কিন্তু দগ্ধ হলেও মদন দেহবিনির্মুক্ত অমূর্তভাবে বিদ্যমান ছিলেন, তাই হরপার্বতীর মিলন সম্ভব হল—

কিন্তু তা হল সম্পূর্ণ অন্য এক স্তরে। বিবাহে এ মিলন যখন অন্য স্তরে উন্নীত হতে চলেছে, তখন মদন ভস্মদেহ থেকে পুনর্বার স্বমূর্তি পরিগ্রহ করলেন এবং তখনই পার্বতী হৃতশেষরূপে ফিরে পেলেন তাঁর প্রেমকে, তাঁর প্রিয়তম শিবকে। কালিদাসের ইষ্টদেবতা শিব। তাই হরপার্বতীর প্রেমের আর মিলনের প্রসঙ্গেই প্রেম সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধিটিকে মূর্ত করে, প্রত্যক্ষ করে তুললেন মদন-রতির উপাখ্যানে। কালিদাস-সাহিত্যে প্রেমের রূপায়ণে তাই এই উপাখ্যানটিই কেন্দ্রবিন্দুরূপে অবস্থিত। তাঁর উপলব্ধি এখানে প্রতীকী হলেও সম্পূর্ণ ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রতি যেখানে প্রেমের আর্তিতে বিহ্বল, প্রায় উন্মাদ, পার্বতী সেখানে কঠোর নিষ্ঠাভরে আহুতি দিচ্ছেন তাঁর রূপযৌবন আর সম্ভোগকামনাকে, একাগ্রচিত্তে চাইছেন তাঁর শিবকে, জীবনের সঙ্গী-রূপে। আহুতি সমাপ্ত হলে তাপসরূপী শিব এলেন তাঁর তপস্যার দ্বারদেশে, হৃতশেষ হয়ে উঠল প্রেম। মদন যখন ভস্মীভূত তখনই এ প্রেম পরস্পরের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পেল। এর সূচনায় মদন ছিল উন্মাদনারূপে, মাঝে সেই প্রেমদেবতার পূর্ণতর সত্তার উদ্দেশে পার্বতী নিবেদন করলেন তাঁর মনোহারিণী শক্তিকে, মদনের স্বেচ্ছাচারকে। তারপর তাঁরা যখন মিলিত হলেন তখন দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব মদনকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। কালিদাস জানেন, যত মহৎই হোক প্রেম, তার মধ্যে কামনা থাকবেই, আসঙ্গলিপ্সাকে সে কখনওই পরিহার করবে না। যে কোনও বনস্পতিই অদৃশ্য মূলের সাহায্যে মাটির নিচে রসসন্ধান করে, রসশোষণ করে, এই মূলকে বাদ দিয়ে সে বাঁচে না। কিন্তু শিকড় থাকবে যথাস্থানে, মাটির নিচে; অগোচরে তার আহৃত রস সঞ্চারিত হবে সমস্ত তরুদেহে; তবেই ফুল ফুটবে উপরের শাখায়; ফলভারে আনত হয়ে আসবে শাখা; সার্থক হবে তার তরুজন্ম। তাই সংযত মিলনের প্রহরেই পুনরুজ্জীবিত হয় মদন। তাই যক্ষ নির্মল শরৎকালে পরিণতচন্দ্রিকা রাত্রিতে মিলিত হবে যক্ষবধূর সঙ্গে; পুরূরবা নতুন করে পাবেন হৃতশেষরূপে তাঁর প্রেমকে; অপুত্রক রাজা নিজেকে ফলবান দেখবেন আয়ুর মধ্যে— বধূ আর সন্তান নিয়ে কর্তব্যে অবিচল থেকেই প্রেমের ঐশ্বর্য অনুভব করবেন। দুষ্যন্ত দীর্ঘ বিরহানলে হব্যের মতো প্রেমের দাহ্য অংশটুকু আহুতি দিয়ে প্রাশিত্ররূপে ফিরে পাবেন যা তাঁর ভোগ্য সেই প্রেমকে; অপুত্রক দুষ্যন্ত পাবেন সর্বদমনকে আর কল্যাণী বধূকে। এই আহুতি যে দিতে পারল না তার প্রেম দুরন্ত কাম হয়ে জ্বলে মরল অতৃপ্ত জ্বালায়। সে কাম অগ্নিবর্ণের ক্ষয়রোগ আনে, চিতানলে অকালে পুড়িয়ে দেয় তার সমস্ত জীবনকে। আহুতি নেই, তাই হৃতশেষও রইল না।

গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বোধহয় পরিমিতিবোধ। এ যুগের বিষ্ণুমূর্তি সূর্যমূর্তি দেখলে শিল্পীর সুষমাসৃষ্টির ক্ষমতায় চিত্ত শ্রদ্ধাপ্লুত হয়। মূর্তিগুলি একটি অস্ফুট স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল; এ হাস্যটি রেখামাত্রসার; একটু কম হলে মূর্তি হত গম্ভীর, একটু বেশি হলে হত উচ্ছল। এই পরিমিতিবোধই কালিদাসেরও সবচেয়ে বিস্ময়কর কৃতিত্ব। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে এ আর দ্বিতীয় বার দেখা দেয়নি; পরবর্তী সাহিত্য আতিশয্যদুষ্ট, একা কালিদাসই

প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে একে জয় করতে পেরেছেন। সৌষম্যবোধ তাঁর শিল্পকে নতুন করে একটি মাত্রা দিয়েছে। তাঁর কাব্যনাটকে এর একটি পরিচয় মেলে প্রেমের রূপায়ণে। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রেমের তরুটির মূল ভূমির গভীরে প্রোথিত, কাণ্ডশাখাপল্লবে তার বিস্তার দৃষ্টিগোচর; বসন্তের অজস্র সমারোহে তার পুষ্পসম্ভার ঊর্ধ্বে প্রসারিত; ফলের ঋতুতে ফলোদ্গমে তার পূর্ণ পরিণতি। প্রেমের আত্মত্যাগ যজ্ঞক্রিয়ার মতো নিষ্পাদিত হলে পর নতুন পর্বে প্রেমের যে বিকাশ তাতে ঐশ্বর্য আছে, আতিশয্য নেই; ভোগ আছে কিন্তু তা একান্ত হয়ে ওঠেনি; কর্তব্যের সঙ্গে তার আর সংঘাত নেই।

এই বিশেষ বোধটি নানা বিচিত্র রূপকল্পে চিত্রিত হয়েছে, এবং এটি কবির নিজস্ব উপলব্ধি থেকে সঞ্জাত। মিশর-ব্যাবিলন-গ্রিসের বিরহিণীর বিলাপগাথা বাণিজ্যপথে ভারতে অনুপ্রবেশ করে থাকলেও কালিদাস-সাহিত্যে মদন আর রতির প্রেমকাহিনি যে তাৎপর্য বহন করে তার কোনও আদিকল্প অন্যত্র নেই। এ উপলব্ধির পশ্চাতে আছে গুপ্তযুগের শিল্প আর বিজ্ঞানের যুগপৎ প্রসার এবং উন্নতি, বহির্বাণিজ্য আর আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা থেকে যে নিরাপত্তার বোধ আর আত্মপ্রত্যয় আসে তা-ও আছে, এবং সর্বোপরি আছে একটি দৃঢ় প্রত্যয়: প্রেম বিদেহ নয়, কিন্তু দেহসর্বস্বও নয়; এবং পূর্ণতম বিকাশের স্তরে কল্যাণের সঙ্গে তার আত্যন্তিক বিরোধ নেই। দেহের মধ্যে থেকেই একটি ঊর্ধ্বশিখ প্রদীপ হয়ে তা জ্বলতে পারে। এই প্রত্যয়টি কালিদাসের কাব্যে একটি কেন্দ্রীয় আদিকল্প, এবং এর স্রষ্টা তিনি স্বয়ং।

মৃচ্ছকটিক

নাটকের প্রকারভেদ অনুসারে *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণ। ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্র*-তে বলেছেন, কবি নিজের শক্তিতে যখন উদ্ভাবিত কাহিনি ও নায়ক সৃষ্টি করে নাটক রচনা করেন তখন সেটি প্রকরণ হয়। প্রকরণ দুই প্রকারের: শুদ্ধ ও সংকীর্ণ। নায়িকা কুলস্ত্রী হলে প্রকরণটি শুদ্ধ, গণিকা থাকলে সংকীর্ণ। (যত্র কবিরাত্মবুদ্ধ্যা বস্তু শরীরঞ্চ নায়কমেব চ/ঔৎপত্তিকং প্রকুরুতে প্রকরণমিতি তদ্‌বুধের্জ্ঞেয়ম্‌।। নাট্যশাস্ত্র ২০:৪৮) প্রায় দেড় হাজার বছর পরে খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকে বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে বলেছেন, প্রকরণের ঘটনা হবে লৌকিক, কবিকল্পিত; মূল রস— শৃঙ্গার; নায়ক— বিপ্র, অমাত্য অথবা বণিক যিনি ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের চর্চায় নিরত এবং ধীরপ্রশান্ত। নায়িকা কখনও কুলনারী, কখনও বেশ্যা কখনও বা দুজনেই থাকবে। (ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লোকিকং কবিকল্পিতম/শৃঙ্গারোইঙ্গী নায়কস্তু বিপ্রোমাত্যোথবা বণিকঃ /সাপায়ধর্মকামার্থপরো ধীরপ্রশান্তকঃ/নায়িকা কুলজা ক্বাপি বেশ্যা ক্বাপি দ্বয়ং ক্বচিৎ।। ৬:২৫৩-৫৪) দেখা যাচ্ছে ভরত ও বিশ্বনাথের মধ্যে যে কালের ব্যবধান তার মধ্যে কিছু কিছু প্রকরণ রচনা হয়েছে এবং প্রকরণের সংজ্ঞা আরও স্পষ্ট অনুপুঙ্খতা অর্জন করেছে; ফলে নায়কের সামাজিক পরিচয় ও চরিত্র, একই নাটকে কুলনারী ও বেশ্যার যুগপৎ উপস্থিতি এবং মূল রসের প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্টতর নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ভরত ও বিশ্বনাথ দুজনেই বলেছেন কাহিনি কবিকল্পিত হবে; বিশ্বনাথ যোগ করলেন 'লৌকিক', তাই নায়ক এখানে রাজা নয়, অমাত্য বা বণিক এবং বিপ্র (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য), উন্নতচরিত্র ও ধর্মপরায়ণ।

মৃচ্ছকটিক-এর কাহিনি বা 'বস্তু' সম্পূর্ণই লোকায়ত। *বৃহৎকথা*-য় এ কাহিনির সংক্ষিপ্ত বীজ আছে, *কথাসরিৎসাগর*-এও তার বিভিন্ন অংশের সূত্র আছে। *কথাসরিৎসাগর*-এ গণিকা কুমুদিকার প্রতি আসক্ত উজ্জয়িনীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। (৫৮:২) ওই গ্রন্থেরই অন্যত্র পাই রূপণিকা নামে গণিকা এক ব্রাহ্মণের প্রতি আসক্ত। (১২:৪) গণিকা মদনিকার প্রাসাদের সঙ্গে বসন্তসেনার প্রাসাদের বর্ণনা মেলে; (৩৮:২০-২৭) যেমন এর অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখি জুয়াড়িরা মন্দিরে ঢুকে পড়ছে। *মৃচ্ছকটিক*-এর নয় অঙ্কের রাজা পালক ও দশম অঙ্কের নতুন রাজা গোপালপুত্র আর্যক; *কথাসরিৎসাগর*-এ প্রদ্যোত ও অঙ্গারবতীর দুই পুত্রের নাম গোপাল ও পালক। ভাসের বিখ্যাত নাটক *চারুদত্ত*চার অঙ্কে সমাপ্ত, সেখানকার কাহিনি *মৃচ্ছকটিক*-এর পঞ্চম অঙ্কের কাহিনি পর্যন্ত। মনে হয়, নাট্যরচনায় এই নাটকটিই শূদ্রককে প্রণোদিত করে। *কাব্যালংকারসূত্র*-এর রচয়িতা বামন তাঁর গ্রন্থের উদাহরণে যে শ্লোক ও উক্তিগুলি উদ্ধৃত

করেছেন তার মধ্যে দুটি চারুদত্ত ও মৃচ্ছকটিকে আছে। প্রথম, 'যাসাং বলি সপদি মদ্‌গৃহদেহলীনাম্; দ্বিতীয়, 'দ্যূতং হি নাম পুরুষস্যাসিংহাসনং রাজ্যম্; তৃতীয় একটি, 'ব্যসনং হি নাম সোচ্ছ্বাসং মরণম্'— ভাসে আছে এবং এর প্রতিধ্বনি পাই মৃচ্ছকটিকে।

সূক্তিমুক্তাবলী-তে একটি শ্লোক আছে, শূদ্রককথাকার ছিলেন রামিল ও সোমিল। এঁদের কাব্য ছিল অর্ধনারীশ্বরের মতো। (তৌ শূদ্রককথাকারৌ রম্যৌ রামিলসোমিলৌ/কাব্যং যয়োর্দ্ধয়োরাসীদর্ধনারীনরোপমৌ।।) এর এক অর্থ হতে পারে এঁদের একজনের কাব্য অপরের কাব্যের পরিপূরক ছিল, অথবা অন্য অর্থ হতে পারে এঁরা দুজনে যৌথ ভাবে একখানি *শূদ্রককথা* রচনা করেছিলেন। এ কাব্য পাওয়া যায় না তবে একটি *শূদ্রককথা*-র অস্তিত্ব ওই শ্লোক থেকে জানা যায়।

শূদ্রকের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে আজও বিতর্কের অবসান ঘটেনি। প্রথম বা দ্বিতীয় শিবমার রাজা (সপ্তম থেকে অষ্টম শতকের), আভীর রাজা শিমুক (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের), শিশুক, শিংশুক, ইত্যাদি নানা নামে, নানা স্থানে ও নানা যুগে নাট্যকারকে স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণে আমরা শিমুক, শিশুক, সিন্ধুক ও শিপ্রক, ইত্যাদির নামের রাজাদের কথা পাই। কিন্তু শূদ্রক যদি সাতবাহন বংশীয় হন তবে ওই বংশের রাজারা ব্রাহ্মণ্যগর্বিত ছিলেন। বাণভট্ট *কাদম্বরী*-তে এক শূদ্রক রাজার উল্লেখ করেছেন যিনি জন্মান্তরে চন্দ্রাপীড় ও চন্দ্র ছিলেন (দণ্ডী তাঁর *দশকুমারচরিত*-এ শূদ্রকের বহু জন্মের কথা উল্লেখ করেছেন)। তার থেকে মনে হয় খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীতেই— বাণভট্টের যুগে— এই শূদ্রক এক ইতিহাস-বিখ্যাত রাজা ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের এক রাজা দ্বিতীয় শিবমার *কল্পনারত্ন* নামে একটি হস্তিশিক্ষার গ্রন্থ রচনা করেন, এঁর পৌত্র শিবমার সম্বন্ধে ৭২৬ খ্রিস্টাব্দের বারদুর শিলালেখে পাই যে ইনি শতায়ু ছিলেন (স্মৃত্যাবিরোধেন বর্ষশতপূর্ণায়ুঃ)। *বেতাল পঞ্চবিংশতি*-র বীরবরোপাখ্যানে শূদ্রক এক বিজয়ী রাজা; তাঁর কর্মচারী বীরবর রাজার মৃত্যু আসন্ন জেনে নিজের পুত্রকে বলি দিয়ে শূদ্রকের জন্য শতবর্ষ পরমায়ু বর দেন। *মৃচ্ছকটিক*-এও রাজা শূদ্রকের শতবর্ষ পরমায়ুর উল্লেখ আছে, তিনি হস্তিশিক্ষাবিৎ এমন কথাও আছে। এ সব থেকে মনে হয় নাটকে শূদ্রক-পরিচিতির শ্লোকগুলিতে বহু প্রখ্যাত রাজার গুণাবলী একত্র করে নাট্যকার শূদ্রকে আরোপিত হয়েছে। এ শূদ্রক সম্ভবত *কাদম্বরী*-তে উল্লিখিত রাজা শূদ্রক, যাঁর কথা অষ্টম শতকের আলংকারিক বামন তাঁর *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি*-তে শ্লেষগুণের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, এবং একাদশ শতকে কল্‌হণ তাঁর *রাজতরঙ্গিণী*-তে যাঁকে বলেছেন বিক্রমাদিত্যের তুল্য। *রায়মুকুট*-এ 'শূদ্রকবধ' নামে এক পরিকথা, পঞ্চশিখরচিত *শূদ্রকচরিত* এবং *বিক্রমান্তশূদ্রক* নামে এক নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তামিলনাড়ুতে প্রাপ্ত দণ্ডীর *অবন্তীসুন্দরীকথা*-র এক পাণ্ডুলিপিতে একটি শ্লোক পাওয়া যায় যার অর্থ হল: শূদ্রক স্বচ্ছ অসিধারে বার বার পৃথিবী জয় করে তারপরে আত্মচরিতার্থক রচনায় পৃথিবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। (শূদ্রকেণাসবৃজ্জিত্বা স্বচ্ছয়া খড়্গধারয়া/জগদ্‌ভুয়োহভ্যবষ্টব্ধং বাচা স্বচরিতার্থয়া।।) এখানে সম্ভবত শূদ্রক-বিরচিত কোনও অধুনালুপ্ত আত্মচরিত অথবা *শূদ্রকরচিত* নামক লুপ্ত

রচনাটিরই উল্লেখ পাচ্ছি। বামন তাঁর *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি*-তে 'শূদ্রক বিরচিতেষু প্রবন্ধেষু' (৩:২:৪) লিখেছেন; বহুবচন থেকে মনে হয় শূদ্রক মৃচ্ছকটিক ছাড়া অন্য গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

শূদ্রক নামটিতেও বৈশিষ্ট্য আছে; শুনেই বোঝা যায় এ নাম পৈত্রিক নয় (অশূদ্র পিতামাতা সন্তানের এ নামকরণ করবেন না, শূদ্র পিতামাতাও করবেন না)। হয়তো এটি উপাধিরূপেই ব্যবহৃত। মনে হয় কোনও শূদ্রজাতীয় রাজা বা/এবং নাট্যকার যশস্বী হওয়ার পরে তাঁর শূদ্র-পরিচয় স্বার্থিক 'ক'-প্রত্যয়যোগে বিশেষণরূপে ব্যবহার করেন। একাদশ শতকের *ভাগবতপুরাণ*-এ পড়ি দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রভৃত্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শিমুক ছিলেন বৃষল অর্থাৎ শূদ্র। ইনি নাট্যকার না-ও হতে পারেন তবে নাটকটি দাক্ষিণাত্যের, এমন অনুমানের কিছু কিছু ভিত্তিও আছে; নানা আচার সংস্কার ও দাক্ষিণাত্যের কিছু কিছু শব্দ এতে আছে (যথা কর্ণাটকলহ, দেবী সহ্যবাসিনী, খুণ্টমোড়ক, বরগুলম্বুক, ইত্যাদি শব্দ বা বীরকের উক্তি 'বয়ং দাক্ষিণাত্যাঃ', ইত্যাদি)।

নাটকের নাট্যকারের কাল নিয়ে যেমন বিসংবাদ স্থান নিয়েও তেমনই। ভাষায় সামাজিক পটভূমিকার কিছু অংশে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব স্পষ্ট, অথচ মুখ্যত এ নাটকে ঘটনা ঘটছে উজ্জয়িনীতে, নাটকে উজ্জয়িনী সম্বন্ধে বহু গর্বিত উক্তিও আছে। এমন হতে পারে যে, উজ্জয়িনীর ঘটনা হিসেবেই নাট্যবস্তু পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল, তাই দক্ষিণী নাট্যকার উজ্জয়িনীতেই এর স্থাপনা করেন, তবু দাক্ষিণাত্যের কিছু কিছু চিহ্ন এতে থেকে যায়। অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত সম্ভাবনাও খণ্ডন করা কঠিন। ভাষা থেকে নিঃসংশয়ে কিছু বোঝা যায় না। চারুদত্ত, শর্বিলক, আর্যক, অধিকরণিক, দর্দুরক এবং পঞ্চমাঙ্কে একবার বসন্তসেনাও সংস্কৃত বলছেন। শৌরসেনী, যা মুখ্য নাটকীয় প্রাকৃত তাতে কথা বলছেন বসন্তসেনা, সূত্রধার, বীরক, চন্দনক, শ্রেষ্ঠীকায়স্থ, মদনিকা, ধূতা ও বসন্তসেনার মা। মৈত্রেয় বলছেন প্রাচ্যা; সংবাহক, কর্ণপূরক, বর্ধমানক, স্থাবরক, রদনিকা এরা বলছে মাগধী এবং সংস্থানক বলছে নিকৃষ্টতম প্রাকৃত, শাকারী।

দশম অঙ্কে রাজনৈতিক পটভূমিকা পরিবর্তনের ফলে যে-আর্যক রাজা হলেন নাটকে তিনি গোপালদারক। এ শব্দের একটি অর্থ গোয়ালার ছেলে; কিন্তু এ-অর্থ সংগত মনে হয় না, কারণ, প্রথমত, সংস্কৃত নাটকে গোয়ালার ছেলে সংস্কৃত বলে না, প্রাকৃত বলে। দ্বিতীয়ত, গোয়ালার ছেলের নাম আর্যক হওয়া, খুব অপেক্ষিত নয়। তৃতীয়ত, দশম অঙ্কের ৫০ সংখ্যক শ্লোকে পড়ি আর্যক তাঁর বংশমর্যাদা রক্ষা করেছেন, এ কথা গোয়ালার ছেলে সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে প্রযুক্ত হত না। কাজেই এখানে গোপালদারক মানে আর্যকের পিতার নাম গোপাল।

নাটকটির নামকরণেও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রকরণের নাম হবে নায়ক-নায়িকার নামে, যেমন *মালতীমাধব*। সে হিসেবে এ নাটকের নাম হওয়ার কথা 'চারুদত্তবসন্তসেনা', কিন্তু হল *মৃচ্ছকটিক*। এ নামের সূত্র ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথমে একটি আপাতগৌণ ঘটনায় নিহিত। পূর্বরাত্রে প্রিয়সঙ্গমের পরে সকালে বসন্তসেনা যাবেন উদ্যানে চারুদত্তের কাছে; চারুদত্ত আগেই

সেখানে গেছেন। সকালে বাড়িতে চারুদত্তের পুত্র রোহসেনের কান্না শুনে দাসীকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে বসন্তসেনা জানতে পারলেন, রোহসেন প্রতিবেশীর ছেলের সোনার খেলনাগাড়ি নিয়ে তার সঙ্গে খেলছিল। সে ছেলেটি তার গাড়ি নিয়ে বাড়ি গেছে, তাই কান্না। তাকে ভোলাতে দাসী একটি মাটির গাড়ি নিয়ে আসে, তাতে রোহসেনের মন ওঠে না, কান্নাও থামে না। শুনে বসন্তসেনার চোখে জল এল। দেখে রোহসেন বলল, 'তুমি কে?' বসন্তসেনা বললেন, 'আমি তোমার মা হই।' ছেলে বললে, 'না, আমার মা এত গয়না পরেন না।' তখন বসন্তসেনা সাশ্রুনেত্রে একে একে নিজের অঙ্গ থেকে অলংকারগুলি খুলে রোহসেনের মাটির গাড়িতে দিয়ে বললেন, 'যাও, বাবা, এগুলো দিয়ে সোনার খেলনাগাড়ি গড়িয়ে নিও।'

এই খেলার মাটির গাড়িই সংস্কৃতে 'মৃৎ-শকটিক', তার থেকেই নাটকের নাম। এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার কারণ হল, নামকরণে শূদ্রক প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে এই ঘটনাটি দিয়েই যখন নামকরণ করেছেন তখন নিশ্চয়ই এর কোনও গূঢ় নিহিতার্থই তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল।

এক অর্থে এই নিহিতার্থই নাটকের মূল বিবক্ষিতের রূপক-চুম্বক। এ নাটকের প্রথম পাঁচ অঙ্কের ঘটনা ভাসের *চারুদত্ত* নাটকের চার অঙ্ক থেকে নেওয়া। নায়িকা নায়কের অভিসারে যাচ্ছেন, এখানে তাঁদের আসন্ন মিলনের সংকেতের মধ্যে ভাসের নাটকের পরিসমাপ্তি। কিন্তু *মৃচ্ছকটিক*-এ নাট্যবস্তুর যা কিছু গৌরব তা নিহিত আছে ষষ্ঠ থেকে দশম অঙ্কে। নাটকের অন্তর্নিহিত সমস্যা দেখা দেয় ষষ্ঠে, জটিল হয়ে ওঠে সপ্তম থেকে নবমে, দশমে তার চূড়ান্ত পরিণতি। কাজেই *মৃচ্ছকটিক* যেখানে নাটকীয় তাৎপর্যের গভীরতা অর্জন করছে তার সবটুকু কৃতিত্ব শূদ্রকেরই। এবং ষষ্ঠ অঙ্ক থেকেই সে অংশের সূচনা। এই ষষ্ঠ অঙ্কের শুরুতেই এই ঘটনা, এবং এরই মধ্যে নামকরণের উৎস।

নাট্যকার এখানে মঞ্চে একটি দৃশ্য দেখালেন, সালংকারা বসন্তসেনা অলংকার খুলে মাটির গাড়িতে ভরে দিয়ে নিরাভরণা হলেন, কারণ, অলংকৃতা অবস্থায় রোহসেন তাঁকে মা বলে মানতে পারেনি; এতে চারুদত্তের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধেরও যেন প্রচ্ছন্ন অস্বীকৃতি রয়ে যাচ্ছিল। এখানে দুটি ঘটনা ঘটল যার রূপক তাৎপর্য আছে: একটি, বসন্তসেনার অলংকার মোচন; দ্বিতীয়টি, মাটির গাড়ি সোনায় ভরে ওঠা।

সমাজে ভালমন্দের যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আছে তা যেন একটি সাংকেতিক রূপকল্প হয়ে এখানে দেখা দিল: রাজা পালক ও তার শ্যালক শকার ধনী, তারা দুজনেই শক্তিমান ও দুর্জন। চারুদত্ত, শর্বিলক, সংবাহক, দর্দুরক, স্থাবরক, বর্ধমানক, মদনিকা, রদনিকা, গোহ, আহীন্ত এরা সকলেই সৎ ও দরিদ্র। ব্যতিক্রম একজনই ছিলেন, বসন্তসেনা। ইনি ধনী কিন্তু সৎ। ষষ্ঠ অঙ্কে যখন তিনি নিরলংকার হলেন তখনই যেন তিনি দরিদ্র চারুদত্তের পাশে এসে দাঁড়াতে পারলেন। আর, মঞ্চের ওপরে যখন একটা মাটির গাড়িতে সোনার গহনা ভরে দেওয়া হল তখন সেই গাড়িটাই নাটকের সৎ চরিত্রগুলির প্রতীক হয়ে উঠল, বাইরে যাদের

দৈন্য ও ভঙ্গুরতা (যেমন, বসন্তসেনার গণিকাকুলে জন্ম, চারুদত্ত ও অন্যান্য সৎ চরিত্রগুলির দারিদ্র) অথচ অন্তরের চরিত্রবল যাদের খাঁটি সোনা, তাদের প্রতীক হয়ে উঠল ওই মৃৎ-শকটিকা। এই একটি রূপকের মধ্যে নাটকের মূল কথাটুকু বিধৃত হয়ে রইল এবং এর দ্বারাই নাটকের নামকরণের যথার্থতা প্রতিপন্ন হল।

যদিও অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকে রাজাই নায়ক, *মৃচ্ছকটিক*-এ কিন্তু রাজা নেপথ্যেই থাকে। এ নাটকের অন্য চরিত্রগুলি সমাজের সব স্তর থেকে সংকলিত হয়েছে এবং বহু সামাজিক অবস্থা ও বৃত্তি চরিত্রগুলিতে প্রতিফলিত। নেপথ্যে রাজা, প্রকাশ্যে একদা-ধনী চারুদত্ত, ধনবতী বসন্তসেনা, কুলপুত্র শর্বিলক ও সংবাহক, সহসা-ধনী সংস্থানক, অধুনাদরিদ্র দর্দুরক, দরিদ্র চারুদত্তের বান্ধব মৈত্রেয়, গণিকা মদনিকা, ভৃত্য স্থাবরক, বর্ধমানক, দাসী রদনিকা ও দরিদ্র চণ্ডাল। বৃত্তির দিক থেকে গণিকা, বণিক, বিট, চেট, অধিকরণিক, শ্রেষ্ঠীকায়স্থ, দাস-দাসী, চোর, সংবাহক, শ্রমণ, হাতির মাহুত, প্রবহণিক, জুয়াড়ি, চণ্ডাল— সবাই আছে। বর্ণের দিকে আছে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ ও চণ্ডাল। মধ্যে মধ্যে একই বৃত্তিধারী ব্যক্তিদের মধ্যে ভিন্ন চরিত্রের মানুষ বৈচিত্র্য এনেছে; যেমন, দুই বিট, বীরক-চন্দনক, গোহ-আহীন্ত।

নায়ক হিসেবে যেমন চারুদত্তের চরিত্রে, নায়িকা হিসেবে তেমনই বসন্তসেনার চরিত্রে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আছে। চারুদত্ত বিবাহিত পুত্রবান এবং স্ত্রী ধূতার প্রতি উদাসীন নন; কিন্তু তাঁর জীবনে একটি নতুন ও প্রবল প্রেম দেখা দিয়েছে সামাজিক নিয়মে যার চরিতার্থতার পথ রুদ্ধ, কারণ গণিকাকে ধন দিয়েই পাওয়া যায় এবং তিনি বর্তমানে নির্ধন। বসন্তসেনা গণিকা; চারুদত্তের প্রতি তাঁর প্রেম অন্ধগলিতে মাথা কুটে মরে কারণ তাঁর কাছে আসবার মতো অর্থসম্বল চারুদত্তের নেই। কিন্তু এ প্রেমে বসন্তসেনার জন্মান্তর ঘটে গেছে, তাই কায়মনোবাক্যে তিনি গণিকাবৃত্তি পরিহার করেছেন। যে-অলংকার ক'টি নাটকের নামকরণে এত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে প্রথম অঙ্কে বসন্তসেনা কৌশলে সেগুলি চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রাখেন যাতে আবার তাঁদের দেখা হয়। সে গহনা চুরি করেও দৈবক্রমে চোর শর্বিলক মদনিকার নিষ্ক্রয়মূল্য হিসেবে অলংকারগুলি বসন্তসেনাকেই এনে দেয় এবং চুরির অপবাদ ঘোচাতে বিদূষক ধূতার বহুমূল্য মুক্তামালা এনে দিলেন বসন্তসেনাকে। বসন্তসেনা বলে পাঠালেন সেই সন্ধ্যাতেই চারুদত্তের কাছে যাবেন।

নানা প্রাসঙ্গিক বস্তুর (sub-plot) মাধ্যমে চারুদত্ত ও বসন্তসেনা যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকা নন, সেখানে তাঁদের মনুষ্যত্বের ও মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং এই একটি নাটকে অন্তত চারুদত্ত ও বসন্তসেনা শুধু পরস্পরের রূপমুগ্ধ নন, গুণে অভিভূত। পঞ্চম অঙ্কে এঁদের ক্ষণিক মিলন। ষষ্ঠ থেকে দশমে বিরহ ও বহু প্রতিকূল অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে দুজনে দুঃখের মূল্য দিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে প্রেমকে জীবনের গভীরে অর্জন করলেন।

যদিও এ নাটকে বহু পার্শ্বচরিত্রের তাৎপর্য আছে (যেমন আর্যক, স্থাবরক, শর্বিলক, সংবাহক, চন্দনক ও বসন্তসেনা-মাতা) তথাপি সংক্ষেপে অন্তত দুটি গৌণ চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন মৈত্রেয়, বিদূষক। সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের

একটি সুপরিচিত ভূমিকা আছে— সে ভাঁড় ও ঔদরিক। মৈত্রেয় কোনওটিই পুরোপুরি নন, অথচ দুটি লক্ষণই তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান, তিনি ভোজনরসিক ও পরিহাসপ্রিয়। প্রথম পরিচয়েই দেখি মৈত্রেয় তাঁর অপেক্ষিত ভূমিকাকে লঙ্ঘন করে গেলেন; যে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলে বন্ধু চারুদত্তের দারিদ্র্য প্রকাশ্যে অবমানিত হয় তা তিনি অনায়াসে ও সগর্বে প্রত্যাখ্যান করলেন। নাটকে তাঁর প্রধান পরিচয়, তিনি অনায়াসে ও সগর্বে প্রত্যাখ্যান করলেন। নাটকে তাঁর প্রধান পরিচয়, তিনি চারুদত্তের বন্ধু— যে বন্ধু দুর্দিনে রাষ্ট্রবিপ্লবে ও শ্মশানে পাশে থাকে, যে বন্ধু বন্ধুর মৃত্যুর পরে প্রাণধারণ করার কথা ভাবতেই পারে না, যে বন্ধু চারুদত্তের সম্মান রক্ষার জন্যে নিত্য উদ্যত, চারুদত্তের স্বার্থের কাছে যাঁর আর সবই গৌণ হয়ে যায়।

সংস্থানকের যে বিট তাঁর চরিত্রেও বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্থানকের বৃত্তিভোগী সহচর তিনি। দারিদ্র্যের চাপে একটি অমানুষের পার্শ্বচর হওয়ার যে গ্লানি সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে অবহিত। সংস্থানক শুধু মূর্খ নয়, সে ধূর্ত, নিষ্ঠুর, কামুক, স্বার্থপর ও অত্যাচারী। তবু দুর্দৈবক্রমে তারই স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সচেষ্ট থাকার চেরাচরিত ভূমিকাতেই বিট অভ্যস্ত ছিলেন এবং মনিব সংস্থানকের স্বার্থে বারবার নিষ্ঠুর ভাবে বসন্তসেনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ধনী সংস্থানকের ইচ্ছাপূরণে আপত্তি করা একান্ত অসংগত। গণিকার উচিত প্রিয়-অপ্রিয় সঙ্গপ্রার্থীর সঙ্গে সমান ভাবে আচরণ করা, কারণ সে পথের পাশের লতা, যে-কেউ তার ফুল ছিঁড়ে নিতে পারে। কিন্তু এই বিট যে মুহূর্তে শুনলেন বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রতি অনুরক্তা তৎক্ষণাৎ তাঁর মনোভাবে গভীর পরিবর্তন এল, বসন্তসেনার প্রেম তাঁর কাছে সম্ভ্রমের বস্তু হয়ে উঠল এবং বসন্তসেনা-চারুদত্তের মিলনের জন্যে সর্বতো ভাবে আনুকূল্য করা ও মনিব সংস্থানকের কামুকতার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করাই তাঁর কাছে একান্ত কর্তব্য হয়ে উঠল। শকার যখন বসন্তসেনার গলা টিপে ফেলে রেখে গেল তখন তাঁকে মৃত জেনে সাশ্রুনেত্রে বিটের সেই আশীর্বাদ: সুন্দরি, এর পরজন্মে নির্মল কোনও বংশে জন্মিও, তোমার গণিকাজন্মের যন্ত্রণার যেন এখানেই অবসান ঘটে। আমাদের মনে হয়, বৌদ্ধভিক্ষুর পরিচর্যায় যখন বসন্তসেনা পুনরুজ্জীবিত হন তখন যেন বিটের আশীর্বাদ সফল হল: সত্যই যেন বসন্তসেনার এক নবজন্ম ঘটল। আগেই তিনি ঐশ্বর্যের সমস্ত চিহ্ন মোচন করে এসেছেন, এবার এই নবজন্মে সেই নিরাভরণা বসন্তসেনা, নাটকে যাঁকে বারবার বলা হয়েছে বসন্তশোভার মতো সুন্দরী, তিনি যেন প্রেমের মহিমায় অন্য এক সর্বশুচিলোকে উদিত হলেন। আসন্ন মৃত্যুর সামনেও যিনি অকুণ্ঠ ভাবে প্রেমের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন, তিনি এবার সত্যই সহধর্মিণী হলেন চারুদত্তের, যিনি নিজেও প্রেমের জন্যে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এ নাটকে ঘটনা দ্রুত ঘটেছে, বহু বিচিত্র উপকাহিনি অঙ্গাঙ্গী ভাবে মূল ঘটনার সঙ্গে সুগ্রথিত হয়ে সংহত একটি নাট্যবস্তু সৃষ্টি করেছে। দু-একবার ছাড়া সংলাপ বা বর্ণনার দ্বারা ঘটনার গতি কখনওই প্রতিহত হয়নি (বসন্তসেনার গৃহবর্ণনায়; হয়তো এটি পরবর্তীকালের সংযোজন। এছাড়া দারিদ্র্য বা বর্ষার বর্ণনায় বহু শ্লোকের সমাবেশেও ঘটনার গতি ব্যাহত হয়, কিন্তু স্পষ্টতই এগুলি সব শূদ্রকের রচনা নয়, বহু কবির রচনা প্রক্ষিপ্ত হয়েড় নাট্যগতিকে

মন্থর করে তুলেছে)। প্রথম অঙ্কের ঘটনা প্রথম দিন সন্ধ্যা থেকে রাত্রি, দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় দিন দিনের, তৃতীয়ে দ্বিতীয় রাত্রির, চতুর্থে তৃতীয় দিন দিনের, পঞ্চমে তৃতীয় দিন রাত্রির, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টমে চতুর্থ দিন দিনের ঘটনা ও দশমে পঞ্চম দিন দিনের। অর্থাৎ দশ অঙ্ক মিলে মাত্র চার দিনের ঘটনা, এতেই বোঝা যায় ঘটনার গতি কত দ্রুত ও অপ্রতিহত।

মৃচ্ছকটিক নাটকটি পাশ্চাত্য জগতে খুবই সমাদর লাভ করেছে। তার কিছু কিছু কারণ এতক্ষণ দেখা গেল— যেমন নামকরণ, অতিলৌকিকের অনুপস্থিতি, বৃহৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিসর, সমাজের বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের সমাহার, কয়েকটি ভাবকল্প ও রূপক অনুষঙ্গের উপস্থিতি, ঘটনার দ্রুত গতি ও চরিত্রচিত্রণে বৈশিষ্ট্য।

মৃচ্ছকটিক-এ মূলকাহিনি ছাড়াও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বস্তু আছে, যেমন জুয়া খেলা, চুরি, বেয়াড়া হাতির কাহিনি, ইত্যাদি। এইগুলি নানা ভাবে মূল নাট্যবস্তুকেই পুষ্ট করে। কিন্তু মূল বা আধিকারিক (main plot) এবং প্রাসঙ্গিক বস্তু সব কটির মধ্যেই কতকগুলি রূপকের অনুষঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে, তার মধ্যে একটি হল তাড়া করা। প্রথম অঙ্কেই দেখি সংস্থানক বসন্তসেনাকে তাড়া করছে, তারপরে সংবাহককে তাড়া করছে জুয়াড়ি ও সভিক, খুঁটিভাঙা হাতি তাড়া করছে সন্ন্যাসীকে, সপ্তম অঙ্কে আর্যককে তাড়া করছে রাজপ্রহরীরা।

আর একটি হল আশ্রয় প্রার্থনা: প্রথম অঙ্কে বসন্তসেনা চারুদত্তের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আশ্রয় পাচ্ছেন, দ্বিতীয়ে, সংবাহক আশ্রয় পায় বসন্তসেনার কাছে এবং সপ্তমে আর্যক আশ্রয় পেলেন চারুদত্তের কাছে। অন্য একটি রূপক-অনুষঙ্গ হল বিপর্যাস— প্রবহণ বিপর্যাস বা গাড়িবদলের ফলে বসন্তসেনা এসে পড়লেন শকারের মুঠোর মধ্যে এবং এরই পরিপূরক বিপর্যাসটির ফলে আর্যক রক্ষা পেলেন রাজরোষ থেকে, চারুদত্তের আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়ে; এবং এ দুটিই নাটককে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে দেয়। তাড়া করার ব্যাপারে লক্ষ্য করি ভালকে মন্দ তাড়া করছে, আশ্রয়দানে ভালকে ভাল আশ্রয় দিচ্ছে আর বিপর্যাসের ক্ষেত্রে দৈব সক্রিয়। অর্থাৎ নাটকটি যে ভাবরূপের জগতে চলাফেরা করছে সেখানে মুখ্যত মানুষই ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করছে, দৈবের ভূমিকা যেটুকু সেখানেও মানুষের প্রতিরোধ উদ্যমে সংকট কেটে যাচ্ছে। সংস্কৃত নাট্যজগতে এ ঘটনা অত্যন্ত বিরল।

সংস্কৃতে অন্য যে বিখ্যাত প্রকরণটি আছে, ভবভূতির *মালতীমাধব* সেখানে দৈব নাটকের গতি ও পরিণতির পক্ষে অপরিহার্য (সৌদামিনীর যোগসিদ্ধির দ্বারা আকাশপথে ভ্রমণ)। তন্ত্রাচারের জন্যে সেখানে কাপালিক অঘোরঘণ্ট ও তার শিষ্যা কপালকুণ্ডলার দ্বারা মালতীর অপহরণ, হতাশ মাধবের নিজের দেহমাংস দিয়ে দেবীকে প্রসন্ন করার উদ্যোগ— এ সব নাটকটিকে সম্পূর্ণ লৌকিক স্তর থেকে কতকটা সরিয়ে নিয়ে যায়, অথচ এগুলি মূল কাহিনির অপরিহার্য অংশ। অর্থাৎ এখানে নায়ক-নায়িকার মিলনের বাধাও যেমন কতকটা অতিলৌকিক জগৎ থেকে আসছে, তার নিরসনও তেমনই ঘটছে অলৌকিক শক্তির দ্বারা। এ ছাড়া দৈব ও অলৌকিকের প্রভাব দেখি *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এ ঋষিশাপ, অগ্নিগৃহে দৈববাণী, আশ্রমবৃক্ষ থেকে বধূসজ্জা লাভ, মাতলির অলৌকিক শক্তিতে বিদূষকের অদৃশ্য হওয়া, পুষ্পক রথে

দুষ্যন্তের স্বর্গে যাওয়া, সর্বদমনের অলৌকিক রক্ষাকরণক, ইত্যাদি। তেমনই *বিক্রমোর্বশীয়*-এ উর্বশীর তিরস্করিণী বিদ্যার শক্তিতে অদৃশ্য হওয়া, কুমারবনে প্রবেশমাত্র লতায় পরিণত হওয়া, 'সংগমনীয় মণি'-র সাহায্যে স্বরূপ ফিরে পাওয়া ইত্যাদি; এবং এ সবই নাটকের পরিণতির পক্ষে অপরিহার্য। অন্যান্য নানা নাটকে দৈবশক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বহু উদাহরণ আছে। সে দিক থেকে *মৃচ্ছকটিক*-এর সংঘাত সমস্যা ও তার নিরসন, সবই ঘটছে সম্পূর্ণ মানবিক জগতে। এ নাটকে অন্যায়ের, অমঙ্গলের দায়িত্বও যেমন মানুষের, তার প্রতিকারের দায়িত্বও তেমনই মানুষই নিয়েছে— কখনও একক ভাবে, কখনও বা যৌথ ভাবে। সামাজিক স্তরে একক ভাবে অন্যায় করেছে শকার, প্রতিকার করেছেন মুখ্যত চারুদত্ত, নেপথ্যে বসন্তসেনা, মৈত্রেয়, বিট ও অন্য কয়েকজন। রাষ্ট্রিক স্তরে দুষ্কৃতকারী রাজা পালক ও তার সহচরবৃন্দ, তার প্রতিকার করেছেন আর্যক, শর্বিলক, দর্দুরক, রেভিল, সংস্থানকের বিট— রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা। নেপথ্যে সাহায্য করেছেন চারুদত্ত, মৈত্রেয়, চন্দনক, এঁরা। এ রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে কতকগুলি সামাজিক অন্যায়েরও প্রতিকার হল: যেমন, বসন্তসোনার বধূত্বলাভ, সামাজিক ও আর্থিক ভাবে চারুদত্তের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, শর্বিলকের যশ ও অর্থলাভ, চন্দনকের পদোন্নতি, সংবাহকের শ্রমণ-প্রধানের পদপ্রাপ্তি ও শকারের প্রকাশ্য লাঞ্ছনা। অর্থাৎ সমাজের অন্যায়মোচনের দায়িত্ব এ নাটকে মানুষ একাই নিয়েছে। বিচারক যেখানে যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে সুবিচার করতে অক্ষম, প্রজারা যেখানে অন্যায়কারী রাজার দুঃশাসনে পীড়িত, অপদার্থ অত্যাচারী শকারের অপ্রতিহত প্রতাপে যেখানে সৎ দরিদ্র বণিক, বৌদ্ধভিক্ষু ও সুন্দরী গণিকা থেকে অধিকরণিক পর্যন্ত সকলেই সন্ত্রস্ত, সেখানে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই, সমবেত উদ্যোগে রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা এ অন্যায় রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাজাকে হত্যা করে সৎ ও বীর এক রাষ্ট্রনায়ককে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে।

মৃচ্ছকটিক-এর কবিত্বেও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যদিও পরবর্তীকালের বহু প্রক্ষেপ নাটকের প্রচুর ক্ষতি করেছে তবু কবিত্বের বিচারে মূল ও প্রক্ষেপকে পৃথক করে নেওয়া দুরূহ নয়। স্বভাবোক্তির সাহায্যে অনলংকৃত ব্যঞ্জনা-ঋদ্ধ কাব্য নির্মাণ করা শ্রেষ্ঠ কবিরই সাধ্য; *মৃচ্ছকটিক*-এ মধ্যে মধ্যে এ ধরনের কবিতার দেখা মেলে। পঞ্চম অঙ্কে যখন বসন্তসেনা বর্ষাভিসারে এসেছেন চারুদত্তের বাড়িতে তখন বিট সে-খবরটা বাড়ির মধ্যে পাঠাচ্ছেন:

> চারুদত্তকে গিয়ে বলো, বনে বনে যখন কদম বকুল ফুটে উঠেছে তেমন এক দিনে ইনি প্রেমের আনন্দে প্রেমাস্পদের বাড়িতে এসেছেন। এঁর কেশভার সিক্ত, পথে আসতে বিদ্যুৎ-স্ফুরণে ও মেঘগর্জনে ইনি চমকে চমকে উঠেছেন, তবু চারুদত্ত, আপনাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষায় ইনি এসেছেন; এখন দ্বারদেশে দুটি পায়ের নূপুরের কাদা ধুয়ে নিচ্ছেন।

একটু আগে আমরা লাল শাড়ি ও বর্ষার শাদাফুলের অলংকারপরা সুন্দরীতমা বসন্তসেনাকে অভিসারিকাবেশে ঘনান্ধকার পথে দেখেছি। এখন দেখছি চারুদত্তের গৃহের দ্বারদেশে, প্রফুল্লমুখে নিচু হয়ে নূপুরের কাদা ধুয়ে নিচ্ছেন। পরনে রক্তবসন ও বর্ষার শ্বেতপুষ্পের আভরণ; সিক্ত তাঁর কেশ বেশ এবং এই নিচু হয়ে নূপুর ধোওয়ার ভঙ্গিটি— সব মিলে

একটি ছবি হয়ে উঠেছে। অথচ নানা ব্যঞ্জনার অনুরণন এ শ্লোকে নিহিত। প্রথম অঙ্কের শেষ শ্লোকে কাদা ছিল তাঁর সামাজিক মালিন্যের প্রতীক, আজ মিলনের পূর্বমুহূর্তে এই ধুয়ে ফেলা যেন সে কথারই রেশ বহন করে। তাছাড়া মিলন-মুহূর্তে নূপুরের নিক্কণটুকুও না বাদ যায়। চতুর্থ অঙ্কের শেষ থেকে অকাল দুর্দিনের ব্যঞ্জনা ছিল তাঁদের প্রেমের পথে সামাজিক অন্তরায়। এখন প্রবল মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ ও বর্ষণের মধ্যে অভিসারে আসবার বর্ণনায় শুধু যে চারুদত্তকে দেখবার জন্যে তাঁর গভীর আকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে ও 'হৃষ্টা' শব্দে প্রেমের আনন্দ ফুটে উঠেছে তা-ই নয়, প্রেমের অপরাজেয় শক্তিতে আর সব বাধাকে পরাস্ত করার ইঙ্গিতও সূচিত হচ্ছে।

এ নাটকের মূল অংশে অলংকার প্রয়োগের আতিশয্য নেই, তবু তার মধ্যে কবিত্বের কয়েকটি নিদর্শন বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম অঙ্কে রাত্রের অন্ধকারে ত্রস্ত বসন্তসেনা ছুটে চলেছেন, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, তাঁর লাল আঁচলের ঝিলিক দেখে মনে হচ্ছে যেন মনঃশিলার গুহায় টাঙির ঘায়ে মনঃশিলা চূর্ণ উড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন অন্ধকারে কেউ মুঠো মুঠো রক্তপদ্মের কুঁড়ি ছড়িয়ে দিচ্ছে।' কিংবা সদ্বংশজাত বুদ্ধিমান দুর্জন যেন সার-দেওয়া খেতের কাঁটাগাছ। অথবা, প্রখর গ্রীষ্মের পর গাঢ় অন্ধকার বর্ষাদিনে যখন সকাল থেকে বাদল এসে বেলা ফুরিয়ে যায় তেমনই একটি দিনের বর্ণনা: 'প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপে তপ্ত পৃথিবী যেন মেঘভবনে মেঘের ছত্রের নিচে এক ধারাগৃহে জলধারার নিচে বসে শীতল স্নিগ্ধ আরামে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়েছে।' পরিচিত জগৎ থেকে উপমান সংগ্রহ মাঝে মাঝে বেশ সার্থক, যেমন শকারের মুখে, 'গাছের ডালে বাঁদর ঝুলছে যেন ফলন্ত কাঁঠাল।' কিংবা, 'প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরে তপ্ত মাটি যেন শতপুত্রের মৃত্যুতে সন্তপ্তা গান্ধারী।'

অন্য এক ধরনের গভীরতর, সমৃদ্ধতর কবিত্ব মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ নাটকটির উপরে নূতন আলোকপাত করে, তার একটি হল মাটির গাড়িতে সোনা— আমরা আগেই দেখেছি। অন্য এক জায়গায়, সপ্তম অঙ্কে, দেখি আর্যক চারুদত্তের প্রবহণে নিরাপদে চলে যাওয়ার ঠিক আগে চারুদত্ত-আর্যকের মুখে খণ্ডিত শ্লোকের সেই সংলাপটি, যার পরস্পরের পরিপূরক বাক্যাংশে সমস্ত নাটকটি একটি উজ্জ্বল মহিমা লাভ করে। এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ চারুদত্ত ও আর্যকের মুখে চারটি অর্ধচরণে পরিণত হয়েছে।

চারুদত্ত আর্যককে বলছেন: পথে চলবার সময়ে দেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন;
আর্যক: আপনিই তো আমাকে রক্ষা করলেন;
চারুদত্ত: নিজের ভাগ্যই তোমাকে বাঁচিয়েছে;
আর্যক: সেখানেও আপনিই তো হেতু।

লক্ষ্য করা যায়, দেবতার স্থানে মানুষ এখানে অভিষিক্ত; ভাগ্য বা দৈবকেও নাট্যকার মানুষের কাছে গৌণ করেছেন যেন মানুষই একান্ত হয়ে ওঠে। যেন মানুষই সংসারে মঙ্গলের বিধায়ক দেবতা নয়।

অষ্টম অঙ্কে শকার যখন বিটকে বলছে, 'এই নির্জন বাগানে বসন্তসেনাকে মেরে ফেললে কে দেখতে পাবে?' উত্তরে বিট বলছেন, 'সূর্য-চন্দ্র আকাশ-বাতাস দশ দিক আমার অন্তরাত্মা ও পাপপুণ্যের সাক্ষী এই পৃথিবী— এরা সবাই দেখবে।' এর অন্তর্নিহিত অর্থটি হল, মানুষ সত্য আচরণের জন্যে সমস্ত চরাচরের কাছেই দায়বদ্ধ এবং শেষ জবাবদিহিটা বাকি থাকে নিজের অন্তরাত্মার কাছে, সেখানে মিথ্যাচরণ হল আত্মপ্রবঞ্চনা।

সাহিত্যের চূড়ান্ত বিচার জীবনের পুনর্মূল্যায়নে; সেই মানদণ্ডে *মৃচ্ছকটিক*-এর স্থান অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকের ঊর্ধ্বে, তার কারণ এখানে জীবনবোধের গভীর মূল্যায়নের চিহ্ন রয়েছে। চারুদত্তের জীবনে এক দিকে দাম্পত্য সম্পর্ক, দারিদ্র্য অন্য দিকে গণিকার প্রতি প্রেম; গণিকা বসন্তসেনার চারুদত্তের প্রতি প্রেম, অন্য দিকে গণিকাবৃত্তি ও শকারের প্রলোভন; মৈত্রেয়ের প্রচলিত বিদূষকের ভূমিকা ও আপন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে চারুদত্তের প্রতি গভীর অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি; নিরুপায় শর্বিলকের অভ্যস্ত নৈতিক মূল্যবোধে চৌর্যে অনিচ্ছা ও মদনিকার প্রতি গভীর প্রেমে চৌর্যে প্রবৃত্ত হওয়া; মদনিকার প্রেম ও বসন্তসেনার প্রতি আনুগত্যে ও আপন সততায় অন্যায়ের মূল্যে নিষ্ক্রয় অর্জনে আপত্তি; শকারের বিটের প্রচলিত বিটসুলভ কর্তব্য ও মানবিক দায়িত্ব; চন্দনকের রাজকার্য ও বিবেক; চারুদত্তের রাজদ্রোহিতার শঙ্কা ও নিরপরাধ শরণাগতকে আশ্রয়দান; বসন্তসেনার মায়ের কন্যার প্রতি স্নেহ ও নিরপরাধ চারুদত্তকে রক্ষা করার দায়িত্ব; এমনকী দুই চণ্ডালের মধ্যেও রাজনিয়োগ ও বিবেকবোধের সংঘাত— এই ভাবে বহু পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধের সংঘাতের মধ্যে নাটকটির প্রাণবস্তু নিহিত আছে। সংস্কৃত নাটকে সাধারণত চরিত্রগুলি আগাগোড়া একটি নির্দিষ্ট ছকে গঠিত হয়, (যেমন নায়কের ছক হল ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত, ইত্যাদি)। তাই চরিত্রের মধ্যে বিবর্তন বা পরিবর্তনের বিশেষ অবকাশ থাকে না। কিন্তু শকারের বিট, সংবাহক, চন্দনক, বসন্তসেনা-মাতা এঁরা সকলেই নৈতিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়ে নিজেরা প্রচলিত মূল্যবোধকে যাচাই করে পরিবর্তিতরূপে তাকে অর্জন করতে পেরেছেন; এইখানে চরিত্রগুলি জীবন্ত ও বিশ্বসনীয় হয়ে উঠেছে।

এ নাটকে বহু বিচিত্র সুর লেগেছে। বিভিন্ন ধরনের মানুষ— রাজা থেকে চণ্ডাল, শিশু থেকে বৃদ্ধ, ধনী থেকে নির্ধন, সজ্জন থেকে দুর্জন— নানা ধরনের ভাষা, নানা ধরনের কবিত্ব, নানা ধরনের হাস্যরস— ভাঁড়ামি, শ্লেষ সামাজিক ব্যঙ্গ ও ব্যক্তিগত বিদ্রূপ— বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ বহু স্বার্থের সংঘাত নানা রসের আনাগোনা, সব মিলে নাটকটি যে শুধু সমাজের ও মানব-জীবনের একটি সুবৃহৎ বৃত্তাংশকে সার্থক ভাবে প্রতিফলিত করেছে তা নয়, জীবনের নানা আবেগসঞ্জাত উপলব্ধি ও নীতিগত মূল্যবোধের অবতারণা, বিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়নও করতে পেরেছে। এবং সমস্তটাই করেছে লোকায়ত স্তরে, অবিশ্বাস্য অতিলৌকিককে পরিহার করে, যা সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। এইখানেই *মৃচ্ছকটিক* অনন্য।

শতক কাব্য

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রগুলিতে শ্রব্য কাব্য বলতে প্রধানত মহাকাব্য ও চম্পূ'র কথাই আছে; স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে খণ্ডকাব্যকে ধরা হয়নি; অথচ নানা শ্রেণির খণ্ডকাব্য সাহিত্যে আছে। কালিদাসের *মেঘদূত*-ই সম্ভবত প্রথম খণ্ডকাব্য, তার পরে আছে বেশ কিছু শতক কাব্য। মেঘদূতের অনুকরণে দীর্ঘকাল ধরে রচিত আরও অনেক দূতকাব্য এগুলির মধ্যে বিখ্যাত ধোয়ীর *পবনদূত*; এ ছাড়াও *পিকদূত, কাকদূত, তুলসীদূত, চন্দ্রদূত, নেমিদূত, হংসদূত, মনোদূত, ভৃঙ্গদূত*, প্রভৃতি) এবং নানা স্তোত্র সংকলন, যেগুলি একটি বিষয়ের দ্বারা গ্রথিত কিছু শ্লোকের সমাহার। এছাড়াও ষোলটি, দশটি, সাতটি এমন ছোট ছোট শ্লোক সংকলন (যেমন *ঘটকর্পর* কাব্য, *দারিদ্রসপ্তক*, কিছু কিছু অষ্টক ইত্যাদি) পাওয়া যায় এবং একেবারে অন্তিম পর্যায়ে পাই একক শ্লোকের সংকলন গ্রন্থগুলি, যেমন *সুভাষিতাবলী, শার্ঙ্গধরপদ্ধতি সুভাষিতরত্নকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত*, ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে মহাকাব্যের পর ওই দৈর্ঘ্যের কাব্য ক্রমে অচলিত হয়ে আসতে থাকে— যদিও শতক ইত্যাদি রচনা কালেও এবং এই সেদিন পর্যন্ত কবিদের মহাকাব্য রচনার আগ্রহ কমেনি কবিদের। *নৈষধচরিত*-এর পরে রচিত কোনও মহাকাব্যই আর খ্যাতিলাভ করেনি, এর থেকে বোঝা যায় শক্তিমান কবিরা তখন আর মহাকাব্য রচনার জন্য লেখনী ধারণ করেননি, বরং খণ্ডকাব্য রচনার দিকেই তখন তাঁদের আগ্রহ বেশি। এই খণ্ডকাব্যগুলির মধ্যেও *মেঘদূত* ও *পবনদূত* বাদ দিলে আর কোনও কাব্য তত বিখ্যাত হয়নি। যেমন হয়েছিল কয়েকটি শতককাব্য।

প্রায়ই দেখা যায় কোনও একটি সাহিত্যিক ভঙ্গি বা প্রকারভেদ তার চরম উৎকর্ষ লাভ করার পর অন্তত কিছুকালের জন্য তা পরিত্যক্ত হয়, তখন বিকল্প কোনও প্রকারভেদ দেখা দেয় সাহিত্যে। এই নিয়মেই মহাকাব্যের পরে এল খণ্ডকাব্য। খণ্ডকাব্যের মধ্যে দূতকাব্য ও বিচ্ছিন্ন শ্লোকের সংকলন বাদ দিলে যেটি প্রধানত উল্লেখযোগ্য তা হল শতককাব্য। বলা বাহুল্য, মহাকাব্য রচনার শেষ পর্যায়েই কবিদের প্রেরণা ক্ষীণ ও উদ্ভাবনী শক্তি দীন হয়ে আসছিল যার ফলে কাব্যগুলি ভঙ্গীসর্বস্ব হয়ে উঠছিল। দীর্ঘ কবিতায় এ দোষ যত প্রকট হয় খণ্ড খণ্ড শ্লোকে বা শ্লোকগুচ্ছে ততটা নয়। সম্ভবত সে-ও একটা কারণ যার জন্য শতককাব্য জনপ্রিয় হয়েছিল। এর পরিসর ছোট বলেই শ্রোতা বা পাঠকের প্রত্যাশাও এর কাছে কম, ছোট ছোট শ্লোক বা শ্লোকগুচ্ছে কোনও একটি ভাবের বিন্যাসই প্রত্যাশিত। চরিত্র, ঘটনা, দীর্ঘায়ত বর্ণনা, অঙ্গী ও অঙ্গরসের সঞ্চারের দ্বারা পরস্পরের পরিপূরণ ও সর্বোপরি কোনও প্রকার জীবনবোধ এখন আর কবিরা দিতে পারেন না, ফলে পাঠকও চায় না। এই

পরিপ্রেক্ষিতেই খণ্ডকাব্য ও তার অন্তর্গত শতককাব্যের বিচার হতে পারে। খণ্ডকাব্য লিরিক বা গীতিকাব্যধর্মী, শতককাব্যও তাই। ছোট কাব্যখণ্ডে কোনও রসের বা চিন্তার বর্ণনা বা বিস্তার, এই হল শতককাব্যের উপজীব্য। অলংকারশাস্ত্রে যে খণ্ডকাব্য বা শতককাব্যের আলোচনা নেই তার প্রধান কারণ মনে হয় এ কাব্যগুলি পাঠকচিত্তকে তেমন ভাবে নাড়া দিতে পারেনি, যেমনটা মহাকাব্য পেরেছিল। নইলে প্রখ্যাত অলংকারশাস্ত্রগুলি রচনার শেষ পর্যায়ে বেশ কিছুদিন ধরেই খণ্ডকাব্য রচনা চলছিল। *মেঘদূত*-এরও কোনও স্বতন্ত্র আলোচনা কোনও অলংকার গ্রন্থে নেই। মহাকাব্যই যে শুধু আলংকারিকদের আলোচনার কেন্দ্রস্থলে তারও একটি কারণ হয়তো মহাকাব্যের আলোচনাও নাটককে মনে রেখেই করা এবং ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর আলোচনাই অলংকার সাহিত্যে মহাকাব্য সম্বন্ধে আলোচনার গতি ও লক্ষ্য স্থির করে দেয়। তাই পরবর্তীকালে যখন *মেঘদূত*-এর মতো উৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য রচনা হল তখন ওই মহাকাব্যের ছাঁচের মধ্যে তাকে ধরানো গেল না বলে কোনও স্বতন্ত্র আলোচনায় তা স্থান পেল না। অথচ চম্পু'র মতো মোটামুটি দো-আঁশলা রচনারও আলোচনা হল, কারণ গদ্য, পদ্য ও গদ্যপদ্যমিশ্র এই ভঙ্গীগত জাতিভেদের মধ্যে চম্পুর একটা স্থান হয়। যাই হোক, খণ্ডকাব্য যে কাব্যখণ্ড নয় তা এর যে কোনও ধরনের রচনাই প্রমাণ করে, প্রথম প্রখ্যাত খণ্ডকাব্য *মেঘদূত*-এই তার স্বতন্ত্র ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

কালিদাসের পরে মহাকাব্যের ইতিহাস অবক্ষয়ের ইতিহাস, কারণ, পরবর্তীরা তাঁর মতো শক্তিমান শিল্পী ছিলেন না, তাঁদের প্রেরণাও ছিল দুর্বল। ধীরে ধীরে মহাকাব্য নিষ্প্রাণ ও ভঙ্গীসর্বস্ব হয়ে উঠল। তখন স্বাভাবিক নিয়মেই কবিরা অন্য পথে রচনায় প্রবৃত্ত হলেন; শতককাব্য সেই অন্য পথগুলির অন্যতম। প্রথম উল্লেখযোগ্য শতককাব্য বাণভট্টের *চণ্ডীশতক*। উপজীব্য এসেছে *মহাভারত* ও পুরাণ থেকে, ভঙ্গী হল অতিরঞ্জিত বর্ণনার। বিষয়: চণ্ডীর মহিষাসুরবধ— বাম চরণের ও শূলের একটিমাত্র আঘাতে দুর্জয় মহিষাসুরের জীবনাবসান। এ শতকের প্রত্যেকটি শ্লোকই আশীর্বাদ বহন করে: দেবী চণ্ডী তোমাদের মঙ্গল করুন। সরাসরি এই ভাবেই না হলেও বিজয়ের এক একটি প্রতীককে উল্লেখ করে বলা আছে সেটি তোমাদের মঙ্গল করুক। কখনও সেটি দেবীর বাম চরণ, কখনও ভ্রূভঙ্গ, কখনও অস্ত্র, কখনও নূপুর, ইত্যাদি। মঙ্গলকামনাটির সঙ্গে যুক্ত অসুরবিনাশে দেবীর একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী। কবির দৃষ্টির কেন্দ্রে কখনও দেবী স্বয়ং, কখনও তাঁর পুত্র, কখনও স্বামী কখনও-বা বন্ধুদেবতারা যাঁরা ছুটে এসেছেন এই দৃশ্য দেখতে। কখনও কবি দেবীর অসুরনিধন সরাসরি বর্ণনা না করে তির্যক ভঙ্গীতে করেছেন। যথা, চণ্ডীর পূর্বেই অন্যান্য দেবতারা একের পর এক মহিষাসুরকে বধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। তাঁদের ব্যর্থতা বর্ণনার মধ্যে দেবীর সার্থকতা রূপ পেয়েছে তির্যক অথচ সার্থক বর্ণনারীতিতে। কখনও-বা কবি বধ্য অসুরটিকেই স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণনা করে দেখিয়েছেন সে কত ভয়াবহ ও শক্তিশালী; এ যেন প্রতিনায়কের প্রবলতার বর্ণনার দ্বারা নায়কের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। অবশ্য গৌণ এক স্তরে প্রবল ও প্রতিষ্ঠিত পুরুষ দেবতাদের অসুরবিজয়ে অক্ষমতার বর্ণনাও এই উদ্দেশ্যেই।

প্রথম তিনটি শ্লোকে অসুরবধের সময়ে দেবীর যে পদাঘাত তারই বর্ণনা। প্রসঙ্গক্রমে যে বাম চরণের আঘাতে অসুর নিহত সেই চরণটিরও বর্ণনা: মহিষের পৃষ্ঠকে দেবীর ভ্রম হল তাঁর বাসভূমি বিন্ধ্যপর্বত বলে, মহিষের যে গর্জন সমুদ্রের তরঙ্গনিনাদকেও পরাস্ত করে তা সহসা ডুবে গেল মহিষের পৃষ্ঠে দেবীর পদাঘাতের সময়ে উত্থিত নূপুর-নিক্কণে। মহিষের পৃষ্ঠ হতে নির্গত রক্তধারা দেখে দেবীর ভ্রম হল এ বুঝি তাঁরই চরণের অলক্তরেখা। এমনই ভাবে সম্পূর্ণ অবহিত না হয়েই দেবী (অনায়াসে) অসুরকে বধ করেন; তাঁর সেই চরণ তোমাদের রক্ষা করুক। (*চণ্ডীশতক* ২) দেবীর চরণের অসম শক্তির বর্ণনাকেও আচ্ছন্ন করেছে দেবীর সম্পূর্ণ অনবধান; যে অসুরকে প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত শক্তিমান বৈদিক দেবতারাও হত্যা করতে পারলেন না, দেবী সম্পূর্ণ হেলায় তা করলেন।

বহু শ্লোকে দেবতাদের অক্ষমতা, পরাভব ও বিমর্ষতার বর্ণনা পাই যেগুলির মধ্যে তাঁদের প্রতি অনুচ্চারিত একটা শ্লেষের পরিচয় আছে:

> দেবী যিনি শত্রুকে বিনাশ করেছেন তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। এর পর চণ্ডীর সঙ্গী জয়া হেসে দেবতাদের বললেন, 'হরি ভয় পেলেন নাকি? অবশ্য ঘোড়ারা (হরির রথের বাহন) বরাবরই মহিষকে ভয় পায়। চন্দ্রে কি অতিরিক্ত একটা কলঙ্ক লাগল নাকি? সমুদ্র (ক্ষীণ) শশিকলা দেখেই ধৈর্য হারিয়েছে! বায়ু, তোমার নয় অন্য কারও শিহরিত হওয়ার কথা (বায়ুই সকলকে কম্পিত করে)। যম, তুমি তোমার বাহন মহিষটিকে এবারে সরিয়ে নাও (মহিষাসুরের মৃত্যুতে সে চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে)।' (১৫)

এই সুরে বেশ কয়েকটি শ্লোক আছে (১, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪২, ৮০, ৯০ ও ৯৮) যে গুলির উদ্দেশ্য হল মুখ্য দেবতাদের অপ্রতিভ হওয়ার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে চণ্ডীর মাহাত্ম্যকীর্তন। চণ্ডীর স্বামী স্বয়ং মহাদেব ও পুত্র দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ও বাদ যাননি। এই সব পুরুষ দেবতারা প্রায় প্রত্যেকেই অসুরবিনাশের জন্যই যশস্বী, প্রত্যেকেই মহাবলী, অসমসাহসী ও অস্ত্রনিপুণ। এঁদের প্রতি শ্লেষের মধ্যে বাণভট্টের সমাজের একটা নতুন দিক প্রকাশিত হয়েছে, তা হল প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের পাশাপাশি, কতকটা বা তাদেরই স্থানে মাতৃকার আবির্ভাব। নব্যব্রাহ্মণ্যধর্ম যা গুপ্তযুগে প্রথম লক্ষ্যগোচর হয় এবং পুরাণগুলিকে অবলম্বন করে যা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে বর্তমানে 'হিন্দুধর্ম' নামে পরিচিত, এ তার একটি প্রধান লক্ষণ। বাণ এ-ধর্মের প্রথম যুগের এক পুরোধা ও উদ্‌গাতা: যে প্রবল উল্লাসে তিনি পুরুষদেবতাদের পরাভব ও চণ্ডীর বিজয় বর্ণনা করছেন তাও এ যুগের, এ ধর্মের একটি লক্ষণ।

অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও এই প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— দেবপত্নীরাও চণ্ডীর সামনে নিষ্প্রভ:

> 'তুমি কি পালিয়ে গেলে, ইন্দ্রাণী? কুবেরবধূ, তোমার সখী পার্বতীর বীরকীর্তি দেখ। শান্ত হও, স্বাহা, তোমার স্বামী (অগ্নি) এখনও অমৃত পান করেন। বৃথাই রোদন করছেন রোহিণী (চন্দ্রের পত্নী); লক্ষ্মী, তুমি তোমার স্বামীর শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষে আবার হেলান দেবে।'

এই কথাগুলি বলে জয়া দেবীদের সান্ত্বনা দিলেন। চণ্ডী, যিনি এই কার্যে আলজ্জিতা, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। (৩৩)

দেবতারা মহিষাসুরবধে উদ্যোগী হয়ে, অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করেন, কিন্তু অসুরের গায়ে আঁচড়ও লাগে না।

যে দেবী স্থির ছিলেন, যখন অসুরের দেহে শূল এসে পড়ল, যখন তীর এসে লাগল তখনও যার চোখে পলক পড়েনি, কণ্টকিত শর নিক্ষিপ্ত হতে যিনি হাস্য করেন, বজ্র নিক্ষিপ্ত হলেও যিনি বিচলিত হননি, বর্শা নিক্ষিপ্ত হলেও যাঁর চাঞ্চল্য ছিল না, চক্র নিক্ষেপের সময়ে তিনি অনবনতই ছিলেন, গদাক্ষেপের সময়েও স্থির ছিলেন, যিনি বাম চরণের স্পর্শে মহিষাসুর বধ করেন সেই দেবী তোমাদের শুচি করুন। (৫২)

মহিষাসুর যখন প্রখ্যাত দেবতার বাহুবল ও শস্ত্রবলের দ্বারা পরাভূত হল না তখন তাঁরা বিচলিত হলেন:

মহিষাসুর বলল, 'প্রথমে বিষ্ণুর চক্র পুনরাবর্তিত হল, তারপর দেবসেনা পশ্চাৎপদ হল, ইন্দ্র ও শিবের ধনুর জ্যা শিথিল হয়ে চ্যুত হল, এই শিশু কার্তিকেয়ের শক্তি অস্ত্র আমাকে কী করে আঘাত করবে?' যে পার্বতী এই শক্রকে বধ করে সমস্ত দেবমণ্ডলীর শক্তিকে পরিহাস করেছেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। (৬৫)

দেবতাদের পরাভব ও অবমাননা নানা ভাবেই বর্ণিত হয়েছে: মহিষকে বধ করতে এসে তাঁরা সরাসরি পরাহত হয়েছেন এ বর্ণনায়, আবার তাঁদের প্রতি তাঁদের অস্ত্রের প্রতি ও তাঁদের পরাজয়কে উদ্দেশ করে দেবী বা তাঁর সঙ্গীর বিদ্রূপের মাধ্যমেও তাঁদের অবমাননা।

এই মহৎ শৌর্যের কথা শুনে মহাদেব দূর থেকে এলেন, দু'বাহু প্রসারিত করে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, যাঁর গাঢ় প্রশ্বাসে নক্ষত্ররা শিহরিত হচ্ছিল। দেবতারা ভিড় করে এলেন, লজ্জানতা দেবী করসঞ্চালনে নিষেধ করলেন তাঁদের। এই যে দেবী যিনি পৃথিবীর আনন্দের অপহারক দৈত্যটিকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। (৮৭)

এই ভাবেই কবিতাটি অগ্রসর হয় দেবীর কীর্তি, শক্তি, অস্ত্র, শৌর্য ও মহিমার স্তবের মধ্যে দিয়ে, এরই মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ দেবতাদের পরাজয়ের গ্লানি। এই দেবীর মধ্যে বৈদিক, বেদোত্তর, মহাকাব্যিক ও পৌরাণিক দেবীর, শুভ ও অশুভ শক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক মহিমাময়ী দেবীর অভ্যুত্থান। তাঁর পূর্ববর্তী সকল দেবতার গুণ ও কীর্তি তাঁর মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে; এ কীর্তিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল দানব-দলন। সেইটিকে তাই এত অতিরঞ্জন ও আড়ম্বরের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এই যুগ তন্ত্রশাস্ত্র রচনার যুগ; তন্ত্রে বর্ণিত দেবীর পূর্বগামিনী এই পৌরাণিক দেবী, বাণ তাঁর সূক্তকার। *চণ্ডীশতক*-এ তন্ত্রের 'মহাশক্তি' শাস্ত্রে নয়, অবতীর্ণা হলেন সাহিত্যে। বিদগ্ধ ভাষা, অপরিচিত প্রতিশব্দ, দুরান্বয়, অলংকারবাহুল্য জটিল শব্দবিন্যাস, অস্বচ্ছ ভাব, কষ্টকল্পনা, যমক ও অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি— এ সবই বাণভট্টের শৈলীর চিহ্ন। কালিদাসের পরবর্তী আলংকারিকরা সাহিত্যে কৃত্রিমতার সমর্থন জুগিয়েছেন, পাঠকশ্রোতাও তখন কাব্যে বৈদগ্ধ্য ও ভঙ্গীভণিতিরই প্রত্যাশা করেন;

এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যশস্কাম কবিরাও তাঁদের এই বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করে চলেন। কাব্য-স্বাচ্ছন্দ্য যেখানে প্রসাদগুণ ও প্রেরণার দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হল, সেখানে সে ক্ষতিপূরণ করতে চাইল এক গুরুভার অলংকৃত সমাসবহুল কৃত্রিম শৈলীতে। এই কৃত্রিমতার যুগে সম্ভবত বাণভট্টই একমাত্র কবি যাঁর মধ্যে সত্যকার কবিত্বের প্রেরণা ও শক্তি ছিল; তাঁর গদ্যকাব্যে মাঝেমাঝেই স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বের ঔজ্জ্বল্য পাঠককে চমকিত করে তোলে। কিন্তু ছন্দকাব্যে তাঁর দক্ষতা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; সমালোচকরা বলেছেন: 'যাদৃগ্ গদ্যবিধৌ বাণঃ পদ্যবন্ধে ন তাদৃশঃ— গদ্যরচনায় তাঁর যত কুশলতা পদ্যরচনায় তত নয়।' নিজের শক্তির সীমা তিনি জানতেন বলেই প্রধান দুটি রচনা তিনি গদ্যেই করেন। যে ধরনের রচনায় যথার্থ কবিত্বের কোনও অবকাশ নেই, সেই জন্যে পাঠকের দাবি প্রেরণা ও স্বতঃস্ফূর্ততার কণ্ঠরোধ করল। ঠিক তেমনই যমকে, অনুপ্রাসে, সমাসে-দূরান্বয়ে, অলংকারে ও দুরূহ শব্দ প্রয়োগে কবিত্বের অভাবটা ঢাকা পড়ল না, শুধু রচনারীতি কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হয়ে উঠল।

তাছাড়া, এই *চণ্ডীশতক*-এ যেখানে উপজীব্য হল চণ্ডীর মহিষাসুরবধ, সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বের অবকাশ অল্পই, যেটুকু আছে বাণ তা নিঃশেষে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই বিষয়বস্তুই তাঁকে প্রায় বাধ্য করেছে অতিশয়োক্তির দ্বারা তুচ্ছ অনুপুঙ্খগুলিকে অতিরঞ্জিত করতে এবং পূর্বের দেবতা ও দেবপত্নীদের লাঞ্ছনার দ্বারা চণ্ডীকে মহিমান্বিত করতে। এ তুচ্ছ কাজ একশোটি শ্লোকে করতে হলে স্বভাবতই পুনরুক্তি ও অত্যুক্তির আশ্রয় নিতে হয়, বাণও তা নিয়েছেন। ফল যা পাওয়া গেল তা যেমন কৃত্রিম তেমনই পুনরুক্তিবহুল। তাই পুরুষ দেবতাদের তুলনায় চণ্ডীর শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করতে বাণকে উনিশটি শ্লোক রচনা করতে হয়েছে। (১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৯, ৩৩, ৩৬, ৩৮, ৪২, ৫৭, ৬০, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৭৩, ৮০, ৯০, ৯২, ৯৮) এর দ্বারা সমস্ত উদ্যমটির আত্যন্তিক নিরর্থকতা এবং ভাবের সর্বস্বান্ততাই সূচিত হয়।

শ্লেষ ও দ্ব্যর্থবোধক রচনা সম্বন্ধে বাণের পক্ষপাতিত্ব মধ্যে মধ্যে কুরুচিপূর্ণ রচনায় পর্যবসিত হয়। ৭৫, ৭৬ ও ৭৭ সংখ্যক শ্লোকে এই শ্লেষ নিহত মহিষাসুর ও মহাদেব উভয়ের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হয়; এর দ্বারা হয়তো চণ্ডীর মহিমাবৃদ্ধি হয়, কিন্তু শ্লেষের মধ্যে মহাদেব ও মহিষাসুরের ব্যঞ্জনাগত সাদৃশ্যে সাহিত্যিক রুচির অতি নিম্নমান সূচিত হয়। তেমনই সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যে মাতৃকামূর্তির বর্ণনায় যথেষ্ট সংযম থাকার কথা। বাণভট্ট চণ্ডীর দেহ বর্ণনা এমন ভাবে করেছেন যে, তাতে তিনি তাঁকে সাধারণ কাব্যের নায়িকায় পরিণত হয়েছেন: নায়িকার দেহের বর্ণনায় যা সঙ্গত, কিন্তু জননীরূপে কল্পিত দেবীর বর্ণনায় অচল তেমন বহু উল্লেখ *চণ্ডীশতক*-এ পাওয়া যায় (লক্ষণীয় ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৭, ৮১ ও ৮৫ সংখ্যক শ্লোক)। এর ফলে শুধু যে অশালীনতা প্রশ্রয় পেয়েছে তাই নয়, আরও গভীর স্তরে রুচিগত অপরাধ ঘটেছে, কারণ, রসের মধ্যে অনুচিত মিশ্রণ ঘটেছে: বর্ণনার ব্যঞ্জনায় শৃঙ্গাররসের আভাস আছে, অথচ কাব্যের উদ্দিষ্ট মূলসুর ভক্তির। সম্ভবত তৎকালীন মন্দির গাত্রের ভাস্কর্যে মাতৃকামূর্তির অবয়ব-সন্নিবেশের যে শাস্ত্রীয় নির্দেশ কার্যকরী ছিল তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই

বাণভট্ট চণ্ডীর দেহবর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর ফলে সাহিত্যে যে বাঙ্ময়ী প্রতিমা নির্মিত হল তাতে রসবিরোধ ও রসসংকর ঘটল এবং পাঠকের চিত্তে বিভ্রান্তির উদয় হল; সেটা রচনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। *চণ্ডীশতক*-এর চণ্ডীর বর্ণনা বাণের গদ্যকাব্যের নায়িকার বর্ণনার মতোই; ফলে বাণের অভিষ্ট রসের হানি ঘটেছে এখানে।

বাণের শব্দপ্রয়োগ, তাঁর গদ্যকাব্যে সুবন্ধুর তুলনায় সরল হলেও কালিদাস বা ভারবির তুলনায় দুরূহ ও অপ্রচলিত। তাঁর বাক্যবিন্যাস বা বন্ধরীতি গদ্যে গৌড়ীয় অর্থাৎ সমাসবহুল। প্রথম যুগের আলংকারিক দণ্ডী সমাজবহুলতাকে ওজোগুণের বৈশিষ্ট্য বলেছেন এবং ওজোগুণবিশিষ্ট গৌড়ীয় রীতিকে গদ্যেরই প্রাণ বলেছেন— 'ওজঃ সমাসভূয়স্তমেতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্।' (কাব্যাদর্শ-১:৮০) কাজেই *কাদম্বরী* ও *হর্ষচরিত*-এ গৌড়ী রীতি ঠিকই ছিল। মুশকিল হল *চণ্ডীশতক*-এ। এ তো কাব্য, এখানে ওই সমাসবহুল রীতি অস্থান-প্রযুক্ত, শ্রুতিকটু ও রসহানিকর। তার উপরে আছে দুরূহ বাগ্‌ভঙ্গী: ভ্রমরের একটি প্রতিশব্দ ষট্‌পদ; বাণভট্ট *চণ্ডীশতক*-এ বললেন— 'দ্বাদশার্ধাঙ্‌ঘ্রি (৯৫)। শ্রুতিকটুত্ব বাদ দিলেও এ প্রয়োগে কবিতায় মাধুর্যের গুরুতর অভাব ঘটে, প্রসাদগুণেরও। তাছাড়া এর হাস্যকর দিকও একটা আছে— ওই শ্রুতিকটু এবং তির্যক ভঙ্গি দিয়ে যা প্রকাশিত হল তা তো সাধারণ ভ্রমর ছাড়া কিছুই নয়। তেমনই ৯২ সংখ্যক শ্লোকে দু-তিনটি শ্লেষযুক্ত শব্দের ব্যবহারে আপাত যে দুরূহতা এসেছে তা শুধুমাত্র দ্ব্যর্থবোধক শব্দের থেকেই, ভাবে বা উপলব্ধিতে নয়; ফলে রসবিচারে এগুলি অপাঙ্‌ক্তেয়, সুস্থ রুচি ও রসবোধকে অকারণ আঘাত করে মাত্র।

বাণের যুগেই শুরু হল সাহিত্যে সেই বিষক্রিয়া, যার ফলে কবিরা প্রেরণার স্থলে অভিষিক্ত করলেন ভঙ্গিকে। চণ্ডীশতকের পশ্চাতে কোনও আন্তর উপলব্ধি নেই, নতুন কোনও মননও নেই, এর বিষয়বস্তু যৎপরোনাস্তি অকিঞ্চিৎকর। তাকে অবলম্বন করে ছোট একটি স্তোত্র রচনা হতে পারত, একশোটি শ্লোকে রচনা করবার মতো মূলধন তাঁর ছিল না। অনিবার্য ভাবেই শতকের মধ্যে বাণভট্ট তাঁর পাণ্ডিত্য, আঙ্গিকসর্বস্ব, রচনাকুশলতা, দুরূহ শব্দ প্রয়োগের ক্ষমতা, অলংকার বহুলতা, বিশেষত রূপক ও শ্লেষের ব্যবহারে দক্ষতা এবং তির্যক বাগ্‌ভঙ্গিতে রচনার শক্তির প্রকাশ করেছেন। মহিষাসুরবধের মতো একটি ক্ষীণ বক্তব্যের ওপরে এত ওজন সয় না, ফলে রুচিমান পাঠকের কাছে অসহিষ্ণু লাগে আঙ্গিকের এই গুরুভার, এই কষ্টকল্পনার প্রাচুর্য। বৈদগ্ধ্য নিয়ে এর প্রহেলিকাগুলির সমাধান করলেও এমন কিছু পাওয়া যায় না, যা রসের বা বোধের দ্বারা ক্ষতিপূরণ করতে পারে। সত্যকার জটিলতা, যা কবির উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত তার দ্বারা সৎকাব্য সৃষ্ট হতে পারে, তা-ও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। ইংরেজিতে ডান বা তৎকালীন কবিদের রচনায় যে অন্তর্নিহিত উপলব্ধিগত দুরূহতা আঙ্গিকে কতকটা জটিলতার সৃষ্টি করেছে তার কথা মনে পড়ে এবং ক্ষোভ হয়। শুধু যদি ভঙ্গির ফুলঝুরির মোহ ত্যাগ করে উপলব্ধির গভীরে প্রবেশ করতে পারতেন তবে হয়তো স্থায়ী সম্পদ পেতাম তাঁর কাছে, যেমন পেয়েছি, খুব হলেও মাঝে মাঝে, তাঁর গদ্যকাব্য দুখানিতে। কিন্তু তার জন্যে বিষয়গৌরবও প্রয়োজন। চণ্ডীর মহিষাসুরবধ তেমন বিষয় নয়।

হয়তো বাণভট্ট যে যুগে জন্মেছিলেন তখন পাঠকের রুচি এমন ছিল যে গভীরতা, উপলব্ধির ঐশ্বর্য বা জীবনবোধ কবিতার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। কলাকৌশলের জাদুতেই মুগ্ধ ছিল পাঠক; গভীরতর কিছু সৃষ্টি করতে গেলে বাণভট্টকেও হয়তো ভবভূতির মতোই নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর দিকে চেয়ে আমরণ প্রতীক্ষা করতে হত, জীবৎকালে হয়তো স্বীকৃতিই মিলত না। তাই কি পাঠকের রুচিকে গড়ে তোলবার অপেক্ষাকৃত আয়াসসাধ্য ব্রত ত্যাগ করে আপাতযশের নগদবিদায়ের প্রত্যাশী হলেন কবি? না কি গদ্যে তাঁর যে অধিকার পদ্যে তা ছিল না, তাই এই রচনা? অথবা *চণ্ডীশতক*-এর বিষয়টির তুচ্ছতাই তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি উভয়কেই সীমায়িত করেছে? কারণ যা-ই হোক, *চণ্ডীশতক* কবিতা হিসেবে সার্থক নয়, রসোত্তীর্ণ নয়। এর কতকটা ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্য ছিল, কিন্তু যেখানে এর অন্তিম বিচার সেই শিল্পবিচারে এর মূল্য নগণ্য কারণ আঙ্গিকের প্রচুর আড়ম্বর সত্ত্বেও কাব্যটি রসে পৌঁছয়নি।

ময়ূরভট্ট বাণভট্টের সমকালীন কবি, জনশ্রুতি, তাঁর কুটুম্ব। ইনি রচনা করেছিলেন *সূর্যশতক*। কিংবদন্তী হল, ময়ূরভট্ট কোনও একটি অশালীন কবিতা রচনার ফলে অভিশপ্ত হয়ে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন, সূর্যের স্তবরচনা করার ফলে তাঁর রোগমুক্তি ঘটে, কারণ সূর্য আরোগ্যদাতা। (প্রচলিত শ্লোকে আছে, 'আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ— সূর্যের কাছে আরোগ্য চাইবে।') গল্পটি সম্ভবত সূর্যের আরোগ্যদাতারূপে প্রসিদ্ধি থেকেই তৈরি। *সূর্যশতক*-এ একশো একটি শ্লোক, সূর্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে সেগুলি বিভক্ত। প্রথম স্তবকে তেতাল্লিশটি শ্লোকে সূর্যের দীপ্তির বর্ণনা, দ্বিতীয় স্তবকে ছ'টি শ্লোকে সূর্যের অশ্ব, তৃতীয় সূর্যসারথি অরুণ এগারোটি শ্লোকে, চতুর্থের এগারোটিতে সূর্যের রথ, পঞ্চমে আটটিতে সূর্যগোলক এবং শেষ কুড়িটিতে সাধারণ ভাবে সূর্যের বর্ণনা ও স্তব। শেষ শ্লোকটি কবির নিজের কথা এবং কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি।

বাণের গদ্যে এবং কাব্যে সপ্তম যে পল্লবিত রচনার ভঙ্গি দেখি, ময়ূরের কাব্যেও ঠিক তেমনই বহু বিচিত্র অনুপুঙ্খের সমাবেশ। মূল বর্ণনীয় বস্তু হল সূর্য, যে সূর্য বেদের যুগ থেকেই দেবতা, সপ্ত-অশ্ব-বাহিত রথে সমারূঢ়, যাঁর সারথি ক্ষীণকায় অরুণ। এই সূর্য ময়ূরের বহুপূর্ব হতে জনমানসে বহু কাহিনি ও বর্ণনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আরোগ্যদাতারূপে। ময়ূরের মুখ্য বিবক্ষিত বস্তু সূর্যের ঔজ্জ্বল্য। ময়ূরের বর্ণনায় অলংকার ও অতিশয়োক্তি প্রচুর থাকলেও কাব্যের নিজস্ব জটিলতা বিশেষ কিছু নেই; সমাস অলংকার বুঝলে আর কোনও দুর্বোধ্যতা নেই। অর্থাৎ উপলব্ধি নিতান্ত সরল। দুরূহতা এসেছে শ্লেষ থেকে, যার উপর ময়ূরের বিশেষ পক্ষপাত। (শ্লেষের ছড়াছড়ি দেখি ৩, ৪, ৯, ১৮, ২১, ২৫, ৩১, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৬, ৬৪, ৯২ ও ৯৩ সংখ্যক শ্লোকে।) শ্লেষ ছাড়াও ময়ূরের দুর্বলতা অনুপ্রাস সম্বন্ধে; প্রতি শ্লোকে অনুপ্রাসের প্রাদুর্ভাব, এদিকে তাঁর এত পক্ষপাত যে, প্রসাদগুণ তাঁর কাব্য থেকে অন্তর্হিত; দুরূহ প্রতিশব্দ ও বাক্যবিন্যাস এসেছে অনুপ্রাসের খাতিরে। অতি সহজ ভাবের কাব্য দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগে এবং ওই শব্দগুলি এসেছে অনুপ্রাসের

প্রয়োজনে। দু-একটা উদাহরণে স্পষ্ট হবে:

ভূত্বা জন্তুস্য ভেত্তুঃ ককুভি পরিভবারম্ভভূঃ শুভ্রভানো-
র্বিভ্রাণা বভ্রুভাবং প্রসভমভিনবা ম্ভোজজৃম্ভাপ্রগল্‌ভাঃ।
ভূষা ভূয়িষ্ঠশোভা ত্রিভুবনভবনস্যাস্য বৈভাকরী প্রাগ্-
বিভ্রান্তি ভ্রাজমানা বিভবতু বিভবোদ্ভূতয়ে সা বিভা বঃ।। (৩৩)

যমকও মাঝে মাঝে দেখা দেয়, যেমন—

সানৌ সা নৌদয়ে নারুণিতদলপুনর্যৌবনানাং বনানা-
মালীমালীঢ়পূর্বা পরিহৃতকুহরোপান্তনিম্না তনিম্না।
ভা বোভাদৌপশান্তিং দিশতু দিনপতের্ভাসমানা সমানা
রাজী রাজীবরেণোঃ সমসময়মুদেতীব যস্যা বয়স্যা।। (৩৮)

এ-ধরনের রচনা কবিতা না ধাঁধাঁ তা নিয়ে সংশয় জাগে। এতে বাহাদুরি বিস্তর আছে কিন্তু কবিত্ব? তার কোনও অবকাশও নেই। আরও লক্ষণীয়, এত অনুপ্রাস ও যমক অর্থাৎ শব্দালংকারের এত আড়ম্বর সত্ত্বেও ওই বাহাদুরির লোভে মাধুর্য নেই ময়ূরের রচনায়। ওই বাহাদুরির লোভে শব্দালংকার তার প্রাথমিক দায়িত্বই পালন করেনি, যা বাণভট্টে প্রচুর পরিমাণে আছে। *সূর্যশতক*-এর রচনা গুরুভার অস্পষ্ট ও কৃত্রিম। ভাবে বা প্রকাশভঙ্গিতে যথার্থ কোনও গাম্ভীর্য নেই এ কাব্যে, যদিও তাঁর বিষয়বস্তুর মধ্যেই নিহিত ছিল গাম্ভীর্যের উপাদান। খুব মধ্যে মধ্যে একটুখানি ব্যতিক্রম আছে, যেমন ১৭ সংখ্যক শ্লোকে। বাংলায় এর অর্থ হল: 'সূর্যকিরণ অবিলম্বে অন্ধকার ধ্বংস করে অসীম আকাশকে ও দশদিককে প্রকাশ করুক। সমুদ্রের অশান্ত তরঙ্গরা তটে এসে সবেগে লাগছে। বহু পর্বত, নগর, বৃক্ষ দৃশ্যমান হওয়াতে পৃথিবীকে বিপুলায়তন দেখাচ্ছে। এই সূর্যকিরণে পদ্ম প্রস্ফুটিত হচ্ছে; এই কিরণ দ্রুত তোমাদের সব অমঙ্গল দূর করুক।' ৫৮ নং শ্লোকে সূর্যসারথি অরুণের বর্ণনা ঠিক বাণভট্টের ভঙ্গিতে; অর্থাৎ *চণ্ডীশতক*-এ যেমন মহিষাসুরকে অন্য কোনও দেবতা বধ করতে না পারায় চণ্ডীর সামনে সকলে নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন, এই বর্ণনার মাধ্যমে চণ্ডীর মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনই এখানেও অগ্নি, যম, বরুণ, পবন, কুবের, মহাদেব, ইত্যাদি সকলকে নিষ্প্রভ বর্ণনা করে সূর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। (এই কথাই প্রতিপাদিত হয়েছে ১৬, ৫৮, ৭১, ৭৬, ৮৮ ও ৯৯ নং শ্লোকে।) আরও ছ'টি শ্লোকেরই বক্তব্য এই কথা, ফলে কিছু ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে একই কথার পুনরুক্তি, বৈশিষ্ট্য শুধু ভঙ্গিবৈচিত্র্যে।

বাণভট্টে যেমন মাতৃকা চণ্ডীর অভ্যুত্থানই *চণ্ডীশতক*-এর প্রেরণার উৎস, ময়ূরের *সূর্যশতক*-এর প্রেরণাও তেমনই সপ্তম শতকে নবপর্যায়ে সূর্যোপাসনার প্রবর্তনায়। হর্ষবর্ধন যে ধর্মসভা আহ্বান করেন সেখানে তিনটি দেবতা সর্বাধিক গৌরবের পদ পান— বুদ্ধ আদিত্য ও শিব। বর্ধন-রাজবংশের শিলালিপিগুলি থেকে বোঝা যায় এ তিনটি দেবতাই ওই রাজবংশের উপাস্য; বুদ্ধ শুধু হর্ষবর্ধনের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পরে আসেন এই দেবমণ্ডলীতে, বাকি দুজন

পূর্ব হতেই ছিলেন। (স্মরণীয়, হর্ষবর্ধন যে নাম দেন— শীলাদিত্য— তাতেও সূর্যেরই স্বীকৃতি।) কিছুকালের জন্যে হর্ষের রাজত্বকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমান মর্যাদা লাভ করে এবং যেহেতু তন্ত্রের মাধ্যমে শিব বৌদ্ধের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং বুদ্ধ ধীরে ধীরে দশাবতারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিলেন (এই যুগেই প্রথম তন্ত্রশাস্ত্রগুলি রচিত হয়); তাই দুটি সম্প্রদায়ই এমন তিনটি দেবতাকে পেলেন যাঁরা তাঁদের উভয়েরই আরাধ্য। (মিশরে টুটান্‌খামেন এবং বহু পরবর্তীকালে ভারতে আকবর যখন সর্বজনগ্রাহ্য ধর্ম প্রবর্তনে উদ্যোগী হন তখন দুজনেই হর্ষবর্ধনের মতো সূর্যকে কেন্দ্রীয় উপাস্যরূপে উপস্থাপিত করেন, যাতে বহু ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসক সম্প্রদায়গুলি এক দেবতার ছত্রতলে মিলিত হতে পারেন।) হর্ষবর্ধনের এ-উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কিন্তু সূর্য-উপাসনার জন্যে একটি স্তব প্রয়োজন ছিল; ময়ূরের *সূর্যশতক* সেই অভাব মেটায়। কিন্তু এ শুধু বিদ্বৎসমাজেই গ্রাহ্য স্তব, সম্ভবত রাজসভাতেই কবি সমাদৃত হন *সূর্যশতক*-এর কবি রূপে এবং হয়তো তা-ই তাঁর অভীষ্ট ছিল। নতুবা এই দীর্ঘসমাসবদ্ধ, বহু-অলংকৃত, যমকে-অনুপ্রাসে খচিত এ কাব্য যে কখনওই জনপ্রিয় হতে পারেনি সে বিষয়ে কোনও সংশয়ই নেই।

সূর্য ময়ূরকে কাব্য রচনার প্রেরণা দেয় কিন্তু কবিত্বশক্তি দিতে পারেনি, ফলে ময়ূর এমন কোনও কল্পকাহিনি সৃষ্টি করতে পারেননি যার দ্বারা *সূর্যশতক* পাঠককে মুগ্ধ করতে পারে। বাণভট্টের রচনায় আতিশয্য, কৃত্রিমতা, অলংকারবাহুল্য থাকা সত্ত্বেও চণ্ডীর একটা কাহিনি ছিল— মহিষাসুরবধ উপাখ্যানে, যাকে অবলম্বন করে বাণের কবিত্ব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বেদেও সূর্য সম্বন্ধে তেমন কোনও কাহিনি গড়ে ওঠেনি আর মহাকাব্য দুটিতে তো সূর্য গৌণ দেবতা। অনেক পরের *সাম্বপুরাণ*-এর আগে সূর্য আর প্রাধান্য পায়নি। অসুরবধ বা শাপ অথবা বর দেওয়ার কোনও কাহিনির সঙ্গে সূর্য সম্পৃক্ত নন। তাই কল্পকাহিনির একটা বড় ফাঁক রয়ে গেছে, যা ভরে দেওয়ার মতো কবিত্বশক্তি ময়ূরের ছিল না। শুধু আরোগ্যদাতা সূর্যের বিষয়ে মহৎ কোনও সৃষ্টি করার সাধ্য তাঁর ছিল না। ফলে ময়ূরের সমস্ত ঝোঁকটা পড়েছে সূর্যের তেজ ও দীপ্তির উপর। কল্পকাহিনির ফাঁক ভরাতে ময়ূর এনেছেন সূর্যের রথ, সারথি, ঘোড়া, তার অবয়ব এবং সূর্যগোলকটির তেজ— বহু অলংকারে, আড়ম্বরে, সবিস্তারে, পুনরুক্তি দিয়ে এই সবই ময়ূর বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাব্যবিন্যাস জটিল, অনুপ্রাসে ও যমকে বৈদগ্ধ্য যত আছে মাধুর্য তত নেই; অলংকারপ্রয়োগে আড়ম্বর যত, রুচির প্রমাণ তত নেই। কৃত্রিম অলংকারে কাব্যের ভার বেড়েছে, সৌন্দর্য আসেনি।

ময়ূরের একটাই সুবিধে ছিল: সূর্য স্বয়ং। মহাবিশ্বের অনন্ত বিস্তারের মধ্যে সূর্যের উজ্জ্বল প্রতাপ আপনিই মনে সম্ভ্রম জাগায়। এই উপাদান মহৎ কবির হাতে যা হয়ে উঠে পারত ময়ূরের হাতে তা অবশ্যই হয়নি; কিন্তু সপ্তম শতকের পাঠক কবির কাছে যা প্রত্যাশা করত— পাণ্ডিত্য— তা ময়ূরের যথেষ্টই ছিল। কখনো সখনো মাত্র দু-একবার ময়ূর যথার্থ কাব্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। ৬৯ সংখ্যক শ্লোকে শুনি:

আকাশে সূর্যের রথ যখন ধাবমান, তখন দেবতারা সারি বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে নমস্কার করতে। সারথি অসতর্ক নিষ্ঠুরতায় অগণ্য নক্ষত্রকে রথচক্রতলে পিষ্ট করে উজ্জ্বল চূর্ণে পরিণত করছেন। রথের অশ্বগুলির হ্রেষাধ্বনি, চক্রনেমির গুরুধ্বনি দূরের গুহায় গম্ভীর প্রতিধ্বনি জাগাচ্ছে। সূর্যের যে রথ এই ভাবে ছুটে চলেছে তা আমাদের রক্ষা করুক।

মনে হয় এই শ্লোকটির তির্যক প্রভাব পড়েছে 'শেষের কবিতা'র শেষ কবিতাটির একটি পঙ্‌ক্তিতে— 'চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দনে।'

খাঁটি স্তোত্রকাব্যের সুর লেগেছে ৭৩ সংখ্যক শ্লোকে: 'যে (সূর্য) দিনের মহান বীজ, ক্লান্ত নেত্রের পক্ষে স্নিগ্ধ কজ্জল, মুক্তির তোরণ, সর্বজ্যোতির একক আধার, বর্ষাবারির উৎসস্থল, সমস্ত পৃথিবীর রসসুধার একমাত্র পানপাত্র,— সেই সূর্যমণ্ডল আমাদের মঙ্গল বিধান করুক।' ভঙ্গির প্রতি এই অত্যধিক মনোযোগের ফলে বৈদগ্ধ্য ও জটিলতার জাল ভেদ করে পাঠক কতকটা প্রবঞ্চিত বোধ করেন, কারণ প্রায় কখনওই কাব্যটি রসে উত্তীর্ণ হয় না। আবেগ ও ব্যঞ্জনার একান্ত অভাব এতে, এমনকী মননের দিকেও নতুন কিছু মেলে না। ময়ূরের কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সুর লাগে খুবই কদাচিৎ, *সূর্যশতক* তাই সর্বপ্রকার কৃত্রিমতার উদাহরণস্বরূপ। দুরূহ প্রতিশব্দের ছড়াছড়ি, যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ, ইত্যাদি কৃত্রিম অলংকারের বহুল প্রয়োগ, দূরান্বয়, দীর্ঘসমাস, তিযর্ক বাগ্‌ভঙ্গি, ইত্যাদির মধ্যে কাব্যটি যেন বহু-অলংকৃত একটি প্রতিমা, যাতে শেষ পর্যন্ত প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি।

সংস্কৃত শতককাব্যের ইতিহাসে ভর্তৃহরির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর তিনটি শতক— *নীতি*, *বৈরাগ্য* ও *শৃঙ্গার*; বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ-তিনটি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিংবদন্তীতে ভর্তৃহরি এক বিস্ময়কর মানুষ, থেকে থেকেই তাঁর মত ও পথ আমূল পালটে গেছে, ধর্ম ও দর্শনে তিনি শৈব, বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ মত অবলম্বন করেছেন জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে; গৃহী ও সন্ন্যাসী জীবনে একাধিকবার আনাগোনা করেছিলেন এমন কথাও শোনা যায়। ভোগের ও ত্যাগের অভিজ্ঞতা যে ছিল তা অনুমান করা যায় তাঁর কাব্য থেকে, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের চিহ্ন আছে এবং তার অনেকগুলিতেই খাঁটি সুর লেগেছে।

নীতিশতক-এর বিষয়বস্তু নামেই প্রকাশ, এ কাব্যে কবিত্বের অবকাশ সবচেয়ে অল্প। তবু মাঝে মাঝে কবির আন্তরিকতা ও গভীরতা বিস্মিত করে পাঠককে। বিষয়বস্তু অনুসারে কাব্যটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি শ্লোকেই কবির বিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে। নানা অলংকারের প্রয়োগে কবি দেখিয়েছেন সহজাত অজ্ঞতা কত দূরপনেয়: 'কুমীরের দাঁত থেকে কেউ যদিও বা রত্ন উদ্ধার করতে পারে, বিষধর সাপকে ফুলের মতো মস্তকে ধারণ করতে পারে তবু মূর্খকে কেউ কখনও সন্তুষ্ট করতে পারে না।' (৪ নং) তেমনই বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে পূর্ণ আনন্দ লাভ করার একমাত্র উপাদানই হল বুদ্ধি: 'ক্রূর নিয়তি হংসকে পদ্মবনে সঞ্চরণের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে পারে কিন্তু, দুধ ও জলের মধ্যে পার্থক্য বোঝবার (সহজাত) শক্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।' (১৫ নং) যোগ্য ব্যক্তির গর্ব ছোট একটি শ্লোকে খুব স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত: 'প্রকৃত যোগ্য ও আত্মসম্মানবিশিষ্ট মানুষের

স্থান পুষ্পেরই মতো যথার্থ ভাবে দুটি স্থানেই মাত্র হতে পারে— হয় তাঁরা অন্য মানুষের মস্তকে শোভা পাবেন, নতুবা অরণ্যে অনাদৃত হয়ে থাকবেন।' (২৬ নং) মানুষের ভোগ্য সম্পদ পূর্ব হতেই ভাগ্য নির্ধারণ করে রাখে: 'কূপে মগ্ন কলসের দিকে চেয়ে দেখ, তার যতটুকু সাধ্য মাত্র ততটুকু জলই সে ধারণ করতে পারে।' (৪১ নং) 'পণ্ডিত হলেও দুর্বৃত্তকে পরিহার করা উচিত। মস্তকে মণি ধারণ করলেও সর্প কি বিষধর থাকে না?' 'সজ্জনের চিত্ত সম্পদের দিনে পদ্মের মত কোমল, কিন্তু বিপদের দিনে প্রস্তরের মত কঠিন।' ধৈর্যের গুণ সম্বন্ধে ভর্তৃহরির সুন্দর উক্তি 'ধীর ব্যক্তি নির্যাতিত হলেও ধৈর্য হারান না, অগ্নিকে নিচু করে ধরলেও তার শিখা কখনও নিম্নগামী হয় না।' (৭৭ নং) দৈব যদিও সর্বশক্তিমান তবু মানুষের প্রধান গৌরব তার কর্তব্যপালনে; দেবতারাও আপন আপন কর্তব্যে অবিচল: 'ব্রহ্মাও কুম্ভকারের মতো সৃষ্টিতে, নানা নির্মাণকার্যে ব্যাপৃত, বিষ্ণু দশটি অবতারের দুর্বিপাকে বদ্ধ, নরকপাল হাতে নিয়ে শিব ভিক্ষা করে বেড়ান। কর্মই এ সব নিয়ন্ত্রণ করে, কর্মকে নমস্কার।' (৯৩ নং)। এ সব কাব্যে আছে জীবন সম্বন্ধে ভর্তৃহরির অভিজ্ঞতার ফল, এ শুধু তত্ত্বাগীশের উপদেশ নয়, বুদ্ধিমান ও সহৃদয় ব্যক্তির প্রণিধান করে জীবনকে দেখা।

বৈরাগ্যশতক-এর সঙ্গে *নীতিশতক*-এর বেশ কিছু মিল আছে, কারণ মোটের ওপর একই ধরনের জীবনবোধ থেকে এ-দুটির উদ্ভব। কিন্তু *নীতিশতক*-এর উক্তিগুলি সামাজিক মানুষের অভিজ্ঞতার প্রকাশ, *বৈরাগ্যশতক*-এর উদ্দিষ্ট মানুষ সংসারত্যাগী বা সংসারত্যাগে উদ্যত। হয়তো নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে কবির যখন জীবনে বিতৃষ্ণা জেগেছে, শান্তি পাওয়ার জন্যে যখন তিনি উৎসুক হয়ে উঠেছেন, তখনই *বৈরাগ্যশতক*-এর কবিতাগুলির সৃষ্টি। জীবনের ঘূর্ণাবর্তের বাইরে এসে তিনি শান্তির সন্ধান করেছেন, সেই সন্ধানেই এ কবিতগুলি জন্ম নিয়েছে। 'আমি বহু দুর্গম প্রদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, বিনিময়ে কিছুই পাইনি। পরিবার ও বংশের যথার্থ গৌরব বর্জন করে (অযোগ্য) প্রভুর সেবা করেছি; বৃথাই কাকের মতো ভয়ে ভয়ে পরগৃহের অন্নে প্রাণধারণ করেছি। অয়ি তৃষ্ণা, মানুষকে নীচ ও হীন কর্মে প্রবৃত্তি দিয়ে থাক তুমি, এতেও কি তোমার তৃপ্তি হয়নি?' (২ নং শ্লোক) 'দিনে একবার মাত্র ভিক্ষার অন্ন আহার করি, ভূমি আমার শয্যা, নিজের দেহই আমার একমাত্র আত্মীয়, বসন হল জীর্ণ চীর; হায়, তবু তো তৃষ্ণা আমাকে ত্যাগ করে না।' (১৫ নং) এই বিতৃষ্ণার মনোভাবের কবিতাতেও মাঝে মাঝে খাঁটি সুরটি লাগে, সে সুর ঐকান্তিক বৈরাগ্যেরই: 'সুখভোগ হল মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ক্ষণিক চমকের মতো; বায়ুতে আন্দোলিত পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতোই তার পরমায়ু, এই কথা উপলব্ধি করে মানুষের সংযম অভ্যাস করা উচিত।' (৩৫ নং) কিন্তু তবু তো মানুষ এ কথা উপলব্ধি করে না, বরং মাতালের মতো আচরণ করে: 'পরমায়ু প্রতিদিন সূর্যে দয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে আসছে, নানা কর্তব্য ও দায়িত্বের চাপে কালের গতি লক্ষিত হয় না। জন্ম, জরা, বিপদ ও মৃত্যু দেখেও মানুষের ভয় নেই। সংসার মদিরায় সে মত্ত, নেশার ঘোরে যেন উত্তাল।' (৪৩ নং) 'স্বল্পস্থায়ী শৈশবের পরে মানুষ পূর্ণ যৌবন লাভ করে— স্বল্পকালের জন্যেই। স্বল্পকালই সে দরিদ্র, ধনীও হয় স্বল্পকালের জন্যই। অবশেষে

বলিচিহ্নিত জরায় জীর্ণ দেহ নিয়ে টলতে টলতে সে মৃত্যুর রাজ্যে প্রবেশ করে।' (৫০ নং) মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশী অতৃপ্তির পরিচয় একটি সুন্দর শ্লোকে; 'যদি সব ঈপ্সিত বস্তু লাভ করে থাকো, যদি শত্রুদের মস্তকে চরণ স্থাপন করতে পেরে থাকো, যদি বিত্তের বিনিময়ে মিত্র অর্জন করতে পেরে থাকো, যদি দীর্ঘ যুগ ধরে জীবিত থাকতে পেরে থাকো, তাতেই বা কী, তাতেই বা কী?' (৬৭ নং) এ শ্লোকের প্রতি চরণের শেষে আছে 'ততঃ কিম্'— এই পুনরাবৃত্তির দ্বারা এ সব লাভেরই আত্যন্তিক অসারতা প্রতিপন্ন হয় কবিত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনার দ্বারা। যে উন্নত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষ তৃষ্ণাকে প্রশ্ন করতে পারে, প্রতিটি সার্থকতাকে ওজন করে লঘুভার বলে প্রতিপন্ন করতে পারে, জগতের সমস্ত লাভ ও লব্ধব্যের প্রতি এই উদ্ধত ঔদাসীন্য এ-মনোভাবের এত সার্থক প্রকাশ কমই হয়েছে। 'চন্দ্রকিরণ সুন্দর, বনভূমি রমণীয়, সজ্জনের সঙ্গ উপভোগ্য, সৎকাব্য চিত্তগ্রাহী, ক্রুদ্ধ প্রিয়ার অশ্রুপূর্ণ নেত্র সুন্দর— এ সবই সুন্দর ততক্ষণই যতক্ষণ না মানুষ উপলব্ধি করে যে জীবনই ভঙ্গুর।' (৭৯ নং) নির্বেদও উপভোগ্য কবিতার উপজীব্য হয়ে উঠেছে: 'পৃথিবী তার প্রসারিত শয্যা, বাহু দুটি তার আয়ত উপাধান, আকাশ তার চন্দ্রাতপ, স্নিগ্ধ বায়ু তাকে বীজন করে, শরতের চন্দ্র তার প্রদীপ, বধূ বিতৃষ্ণার সঙ্গসুখে মুনি যেন অক্ষুণ্ণবিভব সম্রাটের মতোই সানন্দে শয়ন করে।' (৯৪ নং) যে শান্তরসের রসত্বই বিসংবাদিত তাকে অবলম্বন করেও ভর্তৃহরি মোটের ওপরে সার্থক কিছু শ্লোক রচনা করেছেন।

নীতিশতক ও *বৈরাগ্যশতক* মূলত কতকটা যেন একই মনোভাবের দুটি স্তরকে প্রতিফলিত করে। *নীতিশতক*-এ সংসারে থেকেই সংসারকে নিস্পৃহ ও নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখে যথাযথ আচরণ করবার নির্দেশ আর *বৈরাগ্যশতক*-এ কবির নিস্পৃহতা আরও উচ্চগ্রামে পৌঁছে তাঁকে সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ করে তুলেছে। দুটিতেই সংসারে আসক্ত মানুষের থেকে অনেকটা দূরত্বে কবির অবস্থান। *নীতিশতক*-এর আবেদন বুদ্ধির ও যুক্তির কাছে, উৎস ভূয়োদর্শিতা। *বৈরাগ্যশতক*-এর আবেদন আবেগের ভারসাম্যে স্থিত শান্তরসের উপলব্ধিতে, উৎস নির্বেদ। দুটি শতকেই প্রত্যেকটি শ্লোকেই স্বতন্ত্র একটি ভাব বা আবেগের রূপায়ণ— বিষয়ের সাম্যই এদের শতকরূপে গ্রথিত করেছে।

শৃঙ্গারশতক-এ কিন্তু শ্লোকের বিন্যাস অন্য রকম। এখানে শ্লোকগুলিতে শৃঙ্গার সম্পর্কে বিভিন্ন মনোভাবের অভিব্যক্তি; সাতটি গুচ্ছে শ্লোকগুলি বিভক্ত: স্ত্রীপ্রশংসা, সম্ভোগবর্ণন, পক্ষদ্বয়নিরূপণ (নারীসঙ্গ ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে দোলায়মান মনোভাব), কামিনীগর্হণ (নারীনিন্দা), সুবিরক্তপদ্ধতি (নারী সম্বন্ধে নিরাসক্তির উপায়), দুর্বিরক্তপদ্ধতি (নারী সম্বন্ধে নিরাসক্তির অসম্ভাব্যতা) ও ঋতুবর্ণন। বিষয়গুলির তালিকা থেকেই বোঝা যায় ভর্তৃহরির চিত্ত কত সংবেদনশীল ও অস্থির ছিল, কত বিভিন্ন ভাবে তাঁর চিত্তে সাড়া জাগত এবং নিরন্তর একটি আততির মধ্যে থাকার ফলে তাঁর চিত্তবৃত্তি কখনওই স্থায়ী স্থিতিলাভ করতে পারেনি। হয়তো চায়ওনি। নারী ও প্রেম সম্বন্ধে তাঁর মন কোনও একটি বিন্দুতে পৌঁছে বিরাম লাভ করেনি, সর্বদাই দোলাচল অবস্থায় পরস্পরবিরোধী দুটি কোটির মধ্যে আনাগোনা

করেছে। 'সূর্য, অগ্নি, নক্ষত্র ও চন্দ্র থাকা সত্ত্বেও সেই মৃগনয়ন দুটি না থাকলে আমার পৃথিবী অন্ধকারে।' (১৪ নং) আবার নিরাসক্তির মেজাজে বলছেন, 'এই মোহময়ীরা স্বভাবতই (সৌন্দর্য দিয়ে) মুগ্ধ করে; কেবলমাত্র মূর্খরাই তাদের হাবভাবে প্রভাবিত হয়। পদ্ম রক্তবর্ণ (নিজের গুণে নয়), প্রকৃতি তাকে রক্তবর্ণ করেছে বলেই, তবুও ভ্রমর তারই কাছে ঘোরাফেরা করে।' (৪৭ নং) 'মদন নারীকে ব্যবহার করেন পুরুষকে আকর্ষণ করবার জন্যে। জীবনের সমুদ্রে ধীবরের মতো মদন নারীকে বঁড়শির মতো নামিয়ে দিয়েছে, মৎস্যের মতোই পুরুষ তার ওষ্ঠাধরের টোপে আকৃষ্ট হয়ে উঠে এসে কামের অনলে দগ্ধ হয়।' (৫২ নং) শ্লোকের পর শ্লোকে পুরুষকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে সুন্দরীর আকর্ষণ ও ক্ষণিক প্রেমে সে দিগ্‌ভ্রান্ত না হয়। কবিতার বিচারে এগুলি উন্নত মানের নয়, কারণ এক হিসেবে এগুলিও *নীতিশতক*-এর শ্লোকের মতো উপদেশমূলক ও বেশ নীরস। এদের পিছনে অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, কিন্তু হয় সে অভিজ্ঞতা কবির আবেগকে গভীরে স্পর্শ করেনি, নয়তো বিরুদ্ধ আবেগের উপলব্ধির সামনে এগুলি তাঁর নিজের কাছেই অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ ও দুর্বল ঠেকেছে। যে কারণেই হোক এ কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি।

কবির সংবেদনশীল মনের সবলতর, দৃঢ়তর অভিজ্ঞতার প্রকাশ অন্য ধরনের কবিতাগুলিতে। এগুলিতে কবি বলছেন, নারীই জীবনকে বহনীয়, সহনীয় করে তোলে। ঈষৎ তির্যক ভঙ্গিতে কবি স্বীকার করেছেন প্রেমের অভিজ্ঞতায় একমাত্র বেদনাই হল বিরহ: 'নারীর বাইরে অমৃতও নেই, হলাহলও নেই; মিলনে সে-ই অমৃত, বিরূপ হলে সে-ই বিশুদ্ধ হলাহল।' (৪৪ নং) কিংবা, 'দৃষ্টিপথে থাকলে সে সুধা, দৃষ্টির বহির্ভূত হলে বিষের চেয়েও বিষম।' (৪৩ নং) কখনও বা সুতীব্র তিক্ততা নিয়ে কবি নারীকে প্রলোভনের নাগপাশ ও নরকের দ্বার বলে অভিহিত করেছেন। (২৯, ৭৭ নং) কিন্তু এগুলিতে *শৃঙ্গারশতক*-এর কবির যথার্থ পরিচয় নেই, আছে সেই সব শ্লোকে যা নারীর নিন্দা বা প্রশংসার ঊর্ধ্বে; স্থায়ী কাব্যসুষমায় মণ্ডিত সেইসব ছোট ছোট শ্লোকগুলি যাতে প্রেমের দুর্জয় ও দুরধিগম্য আকর্ষণ ভাষা পেয়েছে। নারীনিন্দার শ্লোকগুলি অপেক্ষাকৃত অগভীর এবং অনান্তরিক, দেশের বাতাসে সঞ্চরণ করে যেসব গতানুগতিক নারীনিন্দা, পুরুষশাসিত সমাজের সাহিত্যে যা এক সনাতন উপজীব্য, নানা ভঙ্গিতে তারই উচ্চারণ। তেমনই নারীপ্রশংসার শ্লোকগুলিও অতিশয়োক্তিতে বিবর্ণ ও সাহিত্যবিচারে বেসুর ও ব্যর্থ। কিন্তু যে কটি শ্লোকে প্রেমের অপরাজেয় শক্তি স্নিগ্ধতা মাধুর্য ও সুধা রূপ পেয়েছে সে কটি সত্যিই অবিস্মরণীয়। 'জীবন, তোমার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে পরিক্রমা সত্যিই অসাধ্য হত, যদি না এই নারীরা না থাকত যাদের নয়নে ভরা মদিরা।' (৩৩ নং) দুর্গম বিপৎসংকুল পথপরিক্রমার ক্লান্তি অপনোদন করতে যাত্রায় শ্রান্ত পথিক যেমন সুরাপানে শক্তি সঞ্চার করে নিজের দেহে, তেমনই নারীনয়নের মদিরায় জীবনপথিকেরও প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয়। 'সপ্তলোকের একটিমাত্র সত্য উচ্চারণ করি: নারীর মতো এমন মনোহারী আর কিছুই, এমন দুঃখহেতুও আর কিছু নেই।' (৩৫ নং) সবচেয়ে মর্মস্পর্শী শ্লোকটি বোধহয়: 'এই অসার সংসারে জীবিকার জন্য কুনৃপতির ভবনদ্বারে

সেবা করার কলঙ্ক ও গ্লানি আত্মসম্মানবিশিষ্ট মানুষ কেমন করে ধৈর্য ও স্থৈর্য অক্ষুণ্ণ রেখে সহ্য করতে পারত যদি না স্তনভরে আনতকটি বিকশিতমেখলা এই পদ্মনয়নারা চন্দ্রকিরণের দ্যুতি ধারণ করত?'

ভর্তৃহরির কাব্যে লক্ষ্য করি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ। ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে এটাই রীতি, উত্তমপুরুষে রচনা প্রায়ই থাকে না যদি না প্রসঙ্গটি উত্তমপুরুষের হয়, যেমন চৌরসুরতপঞ্চাশিকায়। তবু ভর্তৃহরির নৈর্ব্যক্তিকতার আড়ালটি খুবই সূক্ষ্ম, অন্তরালে কবিকে দেখা যায়। মুগ্ধ কবির নারীস্তুতি, প্রেমের উপলব্ধির গভীরে তাঁর নিমজ্জন, পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস, বিরহের মর্মবিদারী দীর্ঘশ্বাস যেন স্পষ্ট শোনা যায়। কখনও বা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নারীর প্রতি তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা, যে নারী জীবনের বহু দুঃখশোকে বন্ধুর মরুযাত্রাকে সহনীয় করে তোলে। এই শেষের কবিতাই নতুন সুর এনেছে সংস্কৃত কাব্যে। প্রকৃত বিচারে ভর্তৃহরি খুব উচ্চমানের কবি নন, *মেঘদূত* বাদে কোনও খণ্ডকাব্যই সেই অর্থে তেমন রসোত্তীর্ণ নয়। সার্বজনীন ও চিরন্তন সত্য বলার নেশায় পেয়ে বসেছিল কবিদের, এতে তত্ত্ব থাকে প্রচুর, কাব্য হয়ে ওঠে খুব কম শ্লোক।

অমরু সম্পূর্ণ ভিন্ন কোটির কবি। তাঁর রচিত শ্লোকসংকলনটি *অমরুশতক* নামে বিখ্যাত। এতে প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে। কতকটা যেন অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই অমরু প্রেমের অবস্থাগুলি অবলম্বন করে শ্লোক রচনা করেছেন; তার মধ্যে পূর্বরাগ, উৎকণ্ঠা, মিলন, বিরহ, কোপ, ক্ষোভ, অভিমান সবই আছে। ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁর সংশোধিত পাঠের সংস্করণে *অমরুশতক*-এর প্রচলিত একশো সাতাশটি শ্লোকের মধ্যে মাত্র বাহাত্তরটিকেই প্রামাণ্য বলে ধরেছেন, বাকিগুলি প্রক্ষিপ্ত। এই বাহাত্তরটির মধ্যেই প্রেমের নানা অবস্থাই প্রতিফলিত। তরুণীকে তার প্রেমিক বলছেন, 'তোমার প্রেমপূর্ণ অর্ধমুকুলিত নেত্রের অলস দৃষ্টিপাত কখনও সরাসরি, কখনও বা তির্যক ভাবে প্রসারিত— যেন তোমার চিত্তে বিভিন্ন ভাবের আনাগোনা সূচিত করছে; বলত, প্রেয়সি, ওই দৃষ্টি তুমি কার উপরে নিক্ষেপ করছ?' (৪ নং) অভিমানিনীর সখী, অপরাধী নায়ককে বলছে, 'সখীকে তুমি একদা প্রেম দিয়েছিলে, দীর্ঘদিন তাকে আদর করেছ, সেই তুমিই আজ তাকে আঘাত করেছ, এই তার দুর্ভাগ্য। তার এই আঘাত ও অপমান শুধু তোমার মুখের কথায় যাওয়ার নয়। নিষ্ঠুর, দাও ওকে করুণ ভাবে, সরবে কাঁদতে দাও।' (৬ নং) যে প্রেমিকা বধূটি কল্পনা করতে পারে না যে, স্বামী তাকে ছেড়ে বেশি দিন বাইরে থাকতে পারেন আর জানে না যে স্বামীর এবারের যাত্রা কয়েক মাসের জন্যে, সে যাত্রার পূর্বে স্বামীকে বলছে, 'তুমি ফিরবে কখন, এক প্রহর পরে? দ্বিপ্রহরে না আরও পরে? একেবারে কি দিনের শেষে?' সাশ্রু নেত্রে বধূটি যখন এই প্রশ্ন করে তখন সে জানে না যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতেই স্বামীর একশো দিনের বেশি লাগবে।' (১২ নং)

দম্পতির জীবনের কতকগুলি চিত্র পাই অমরুর হাতে: তার মধ্যে অভিমান, ধীরে ধীরে পরস্পরের কাছ থেকে সরে যাওয়া, প্রেমের বিলোপ, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, পরুষ

ভাষায় আলাপ ও ভর্ৎসনা আবার কখনও-বা সহসা আবেগভরে পুনর্মিলন। মানিনী বধূটি স্বামীর আচরণে গভীর ভাবে ক্ষুব্ধ কিন্তু মুখে প্রকাশ করবে না সে কথা। স্বামী তাকে বলছে: 'দূর থেকে স্মিত হেসে তুমি আমাকে অভ্যর্থনা কর, যখন তোমাকে কিছু করতে বলি, নতশিরে শোন তা, সম্ভোগের চূড়ান্ত মুহূর্তেও কিন্তু তোমার দৃষ্টি আর আচ্ছন্ন হয়ে আসে না; কঠিন হৃদয়ে, একটিই জিনিস আমাকে নিষ্ঠুরতম আঘাত হানে, এই সযত্নে তোমার কোপ গোপন করা।' (১৩ নং)

সরলা বালিকাবধূর প্রথম বেদনার সুন্দর প্রকাশ: 'স্বামীর প্রথম অপরাধে বালিকাবধূটি জানে না কেমন করে শয্যায় পার্শ্বপরিবর্তন করতে হয় অথবা নিষ্ঠুরভাষায় ভর্ৎসনা করতে হয়, কেউ তাকে এ সব শেখায়নি। তাই পদ্মনেত্র হতে স্থূল স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ে তার চূর্ণকুন্তল সিক্ত করে তোলে। মেয়েটি (নীরবে) শুধু কেঁদেই চলে।' (২৮ নং) সব সংকাব্যের মতো এ কবিতারও অনুবাদে অনেকটা সৌন্দর্যহানি ঘটেছে। দীর্ঘ স্বরবর্ণ ও তরল ব্যঞ্জনবর্ণগুলির বিন্যাসে আকম্প্র এর ধ্বনিতে, আর ওই অশ্রুসিক্তকুন্তলা নতনয়নার অবিরল নীরব ক্রন্দনের চিত্রটিতেই তীব্র বেদনার ব্যঞ্জনা রয়ে গেছে। বিপ্রলব্ধা নায়িকাকে স্বামী বলছে: 'সুন্দরি তোমার মৌন ভঙ্গ করে তোমার পদানত এই আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ। তোমার কোপ তো আগে এমন ছিল না। স্বামী এই কথা বলতে বলতেই বধূর দুনয়ন হতে অশ্রুর স্রোত নেমে এল।' (৩৬ নং) মানিনী স্বামীকে বলছে: 'তবে তাই হোক্, বৃথা বাক্য থাক। তুমি যাও, প্রিয়তম, তোমার বিন্দুমাত্র দোষ নেই। ভাগ্য আমার প্রতি বিরূপ। তোমার সেই গভীর প্রেমেরই যদি আজ এই পরিণতি, তবে এই ভঙ্গুর জীবন আমাকে ত্যাগ করলে তা নিয়ে আর কি নালিশ থাকবে?' (২৯ নং) অন্য একটিতে যাত্রায় উদ্যত স্বামীর সম্বন্ধে নায়িকা 'তার বসনপ্রান্তও আকর্ষণ করল না, দুহাত দ্বারের দুপ্রান্তে রেখে তার যাত্রা রুদ্ধ করতেও প্রয়াসী হল না। আকাশে মেঘের ঘনঘটা কিন্তু নায়কের যাত্রায় বাধা পড়ল সেই তরুণীটির দুচোখ থেকে নেমে আসা অশ্রুনদীর ধারায়।' (৫৫ নং) সুন্দর একটি শ্লোকে দেখি, 'প্রেমিক ভাল করেই জানে তার প্রেয়সীর মধ্যে বহু জনপদ, কতশত নদী, পর্বত ও অরণ্যের ব্যবধান: সে জানে যে, নায়িকা (তার) দৃষ্টিপথের অগোচরে, তবু পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে সে চোখ রগড়ে প্রিয়ার অভিমুখে বারে বারে তাকিয়ে দেখছে।' (৭২ নং) মেঘদূতের যক্ষের কথা মনে পড়ে: 'যার আনন্দস্পর্শের লোভে অতি সহজ কথাও কানে কানে বলতাম আজ সে চোখের আড়ালে, শ্রবণের ওপারে।' (উত্তরমেঘ ৪০) শুধু নায়কের কটি ভঙ্গি বর্ণনা করে বর্ণিত হয়েছে সেই বিরহের তীব্রতা যা বুদ্ধির প্রবোধ মানে না।

ক্রোধ, অভিমান, ক্ষোভ ইত্যাদি নানা ক্ষণিক মনোভাবের অন্তরালে গভীর স্থায়ী প্রেমের ব্যঞ্জনা অমরুর কাব্যে। 'ভ্রুকুটি করলেও নায়িকা সাগ্রহে নায়কের দিকে চেয়ে আছে, ক্রোধে বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না, তবু সহসা স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হচ্ছে মুখমণ্ডল, হৃদয় কঠিন হয়ে উঠেছে তবু রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে তনুলতা, প্রেমিকের ওপরে তার যে ক্রোধ তা কেমন করে চরমে উঠবে যতক্ষণ সে নায়ককে চেয়ে দেখছে?' (২৭ নং) আহতা নায়িকার মান যেতে চায় না,

সে বলে: 'চিত্ত দীর্ণ হোক, মদন শীর্ণ করে দিক এ দেহকে, ঐ চঞ্চলচিত্ত মানুষটির সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই থাকবে না আমার, সখি।' মনের খেদে নায়িকা এ কথা বলল বটে কিন্তু উচ্চারণ শেষ না হতেই প্রিয়তমের পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। (৬১ নং)

প্রচণ্ড ভুল বোঝার সময়েও, যখন গভীর ভাবে আহত নায়ক নায়িকা দুজনেই, তখনও প্রেম যে কি বিচিত্র অচিন্ত্যপূর্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করে তা সত্যি বিস্ময়কর।

> একই শয্যায় শুয়ে তারা দুজন পরস্পরের কথায় উত্তর দেয় না আর। মনে মনে যদিও দুজনেই অনুতপ্ত এবং পরস্পরের কথাই ভাবছে তবু মান ত্যাগ করছে না। ধীরে ধীরে পরস্পরের তির্যক দৃষ্টি এসে মিলল, দোষারোপের হিমানী গলল, একটি স্মিতহাসি দেখা দিল এবং সবটারই অবসান ঘটল একটি আলিঙ্গনে। (২২ নং)

স্বামী ভাবছে বধূটির প্রতিক্রিয়া কী হবে:

> আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সে আমার দিকে ফেরে কিনা। সে-ও আহত হয়ে ভাবছে তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছি আমি এতই নিষ্ঠুর। এমনই এক মুহূর্তে, যখন দুজনেই চোবাচাহনিতে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে তখন আমার স্মিতহাস্য দেখেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ল, তাতে আমারও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। (২৩ নং)

দীর্ঘ বিরহের পর প্রেমিক প্রেমিকার মিলন; শাস্ত্রে যেমন লেখে তেমনটা কিন্তু ঘটল না, তখন তাদের নিজস্ব প্রতিক্রিয়াই দেখা দিল সে মুহূর্তে: 'দীর্ঘ বিরহ ও সতৃষ্ণ প্রতীক্ষার অবসানে প্রেমিকপ্রেমিকার দেহ শিথিল হয়ে আসে। দীর্ঘদিন পরে তারা যখন পরস্পরকে অভিবাদন করে তখন পৃথিবীটাই তাদের চোখে নতুন হয়ে দেখা দেয়। (মিলনের প্রথম) দীর্ঘ দিনটি কোনও মতে কাটে, রাত্রেও কামনা ততটা উদ্রিক্ত হয় না যতটা হয় অবিশ্রান্ত কথা বলে যাওয়ার বাসনা। (৪০ নং) ম্লান শীর্ণ নায়িকা নায়কের কাছে স্বীকার করবে না যে অদর্শনেই তার এই অবস্থা: 'কেন তোমার এই শীর্ণতা এই বেপথু, কপোলে ও আননে এই ম্লানিমা?' প্রেমিক এই প্রশ্ন করলে তন্বী নায়িকা জানায় এ সবই স্বাভাবিক আর মুখ ফিরিয়ে পক্ষ্মতলে সঞ্চিত অশ্রু ঝরিয়ে দেয়।' (৪৬ নং) .

আবার কখনও বা সত্যই প্রেমের মৃত্যু ঘটে, তখন বাকি থাকে নিষ্প্রতিকার বেদনা। অমরুর সংবেদনশীল লেখনীতে এ অবস্থার সার্থক প্রকাশ ঘটে:

> যেখানে ভ্রূকুটিরচনাই ছিল কোপ, মৌন যেখানে ছিল নিগ্রহ, পরস্পরের অভিমুখে স্মিতহাস্য যেখানে ছিল অনুনয়, দৃষ্টিপাতই ছিল প্রসাদ, সেই প্রেমের কেমন মৃত্যু ঘটেছে দেখ, তুমি পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত, তবু, খল আমি, আমার ক্রোধ তো এখনও যায় না। (৩৫ নং) 'প্রথমে আমাদের দেহ দুটি মিলিত হয়েছিল, তখন তুমি ছিলে প্রেমিক আর এই হতভাগিনী অমি তোমার প্রণয়িনী। এখন তুমি বর আমি বধূ, তবু আমি বজ্রের চেয়ে কঠিন এই জীবন বহন করে চলেছি, (অর্থাৎ তোমার প্রেমে বঞ্চিত হয়েও আমার মৃত্যু ঘটে না)।' (৪৮ নং)

ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতকে প্রেমের উপলব্ধি নির্বৈশিষ্ট্য, সাধারণীকৃত, অমরুর কাব্য কিন্তু যেন সত্যকার প্রেমিক প্রেমিকাকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও মনোভাবে চোখে দেখা যায়, তারা

যেন স্বতন্ত্র ও বাস্তব ব্যক্তি। এ কথা সত্যি যে অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশ এ ধরনের বর্ণনার পশ্চাতে সক্রিয়, তবু শ্লোকগুলিতে খাঁটি সুরটি বেজেছে। ভর্তৃহরির *শৃঙ্গারশতক*-এরও অধিকাংশ শ্লোকেরই আবেদন বুদ্ধিবৃত্তির কাছে, অর্থাৎ তারা যেন 'দীপ্তিকাব্য', সেখানে অমরুর মুখ্য আবেদন হৃদয়বৃত্তির কাছে, তাই তাঁর কাব্য 'দ্রুতিকাব্য', চিত্তকে দ্রব করে আনে। তাছাড়া স্থূল দেহবর্ণনায় অমরুর অরুচি, সম্ভোগশৃঙ্গার-এর বর্ণনায় বা নারীদেহের অনুপুঙ্খের বর্ণনা যা কালিদাসোত্তর কাব্যের মূলধন, তাতে অমরুর স্পষ্ট অনীহা। দেহ আছে, নারীদেহও আছে তার যৌবনের সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে, তবু অমরুতে সর্বদাই দেহের মন্দিরের বিগ্রহের মতো প্রতিষ্ঠিত একটি চিত্ত, যা নানা আবেগে নিয়তকম্প্র ও শিহরিত। তীব্র আবেগের রূপায়ণও যেমন সার্থক তাঁর লেখনীতে, তেমনই সার্থক সূক্ষ্ম সুকুমার আবেগগুলি। অমরুতে নরনারী উভয়েই প্রেমের জন্যে উন্মুখ, নারী অন্যত্র যেমন নিষ্ক্রিয় ভাবে চিত্রিত, অমরুতে তেমন নয়। অমরু প্রেম সম্বন্ধে কোনও তথ্য উপস্থাপিত করেননি যেমন করেছেন ভর্তৃহরি; প্রেমের কোনও মূল্যায়নও তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তাঁর কাব্য প্রেমকে তার নানা তীব্র ও সূক্ষ্ম আবেগের অনুষঙ্গে সার্থক ভাবে চিত্রিত করেছে। সহজ একটি প্রেমের অবস্থাও অমরুর উপস্থাপনায় জটিল ভাবে রূপায়িত হয়েছে, কারণ নানা অঙ্গরস ওই স্বল্প পরিসরের মধ্যেই কখনও অন্তঃস্রোতে কখনও-বা দৃষ্টিগোচর ভাবেই আনাগোনা করেছে। নানা সূক্ষ্ম আভাস দেখা যায়— দ্বিধা, উভয়াবেশ, দুটি তিনটি ভাবের মধ্যে দোলাচলতা, প্রেমের মধ্যেই যেন অবচেতনে সন্নিহিত আছে, বিদ্বেষ, ক্রোধ, করুণা, মমতা ও ক্রূরতা। এ সবই যেন প্রেমের পটে দ্রুত দেখা দিয়ে সরে সরে যায়, যেমনটি ঘটে জীবনে। একটি মূল আবেগের সঙ্গেই এই পরিস্রিয়মাণ বৃত্তিগুলি যেন গৌণ ভাবে সম্পৃক্ত। এ ভাবে চিত্রণ অনেক বেশি বাস্তবানুগ, সরলরেখায় একটি মুখ্য রসকে চিত্রিত করার চেয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকাংশ প্রেমের কাব্য যেখানে স্থূলরেখায় একটিমাত্র পরিচিত রসকে আঁকে সেখানে অমরুর কাব্যে আবেগের মুখ্য ও গৌণ অনুষঙ্গের জটিল মিশ্রণে কাব্য অনেক সমৃদ্ধতর হয়েছে।

অমরু পর্যন্ত শতককাব্যকাররাই এই কাব্যের ক্ষেত্রে প্রধান কবি। এর পরেও বেশ কয়েকজন অপেক্ষাকৃত অক্ষম কবি শতককাব্য রচনা করেছেন— নানা বিচিত্র বিষয়ে। রাজপুত 'টাকা' রাজবংশের রাজত্বকালে ধারা রাজ্যের এক নাগরাজ রচনা করলেন নিতান্ত নগণ্য এক *ভাবশতক*; এতে পাঠভেদে পঁচানব্বই থেকে একশো দুটি পর্যন্ত শ্লোক পাওয়া যায়। নারীর দিক থেকে প্রেমের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাই এর বিষয়বস্তু। মোটামুটি নৈপুণ্য থাকলেও শতকটি সম্পূর্ণই প্রেরণাহীন। প্রেরণার অভাব তিনি পূরণ করতে চেয়েছেন প্রচণ্ড অতিশয়োক্তি, ভাবালুতা এবং কামশাস্ত্রের নির্দেশগুলির প্রতি অন্ধ আনুগত্য রেখে শ্লোক রচনা করে। শ্লোকগুলি বেশ কতকটা দুর্বোধ্য এবং ভাষ্যের শরণ না নিলে অস্পষ্ট থেকেই যায়; ভাষ্যকার সম্ভবত স্বয়ং কবিই; তিনি শ্লোকে যা প্রকাশ করতে পারেননি ভাষ্যের মাধ্যমে সেটি সম্পূরণ করেছেন। 'বসন্তে কোনো পদ্মনয়না নায়িকা পুষ্পতরুর কাছে গিয়েও প্রশ্বাস রোধ করে থাকেন, মোচন করেন না।' (৪ নং) টীকাকার জুড়ে দিচ্ছেন 'পাছে মধুকররা তাঁর শ্বাসকে

পুষ্পগন্ধ মনে করে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ে!' এ-ধরনের রচনার অন্তর্নিহিত অসারতা আরও স্পষ্ট হয় যখন পড়ি: 'সূর্য দূর সমুদ্রে তার তাপ নিমজ্জি করে' তটের এক প্রাণীতে তা সঞ্চারিত করেন।' ধাঁধাঁর মতো এই শ্লোকটির উপসংহার ভাষ্যকারের কথায়: চক্রবাক রাত্রে চক্রবাকী থেকে বিযুক্ত তারই বক্ষে সেই তাপ! এ জাতীয় উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। অক্ষম কবি তাঁর কাব্যগত দেউলে অবস্থা গোপন করবার জন্যে এই ধরনের কলাকৌশলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। নবম শতকের কোনও এক ভল্লট একটি শতককাব্য রচনা করেন, সেটি *ভল্লটশতক*বলেই পরিচিত। অলংকারশাস্ত্রগুলিতে মাঝে মাঝে এর থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। এতে ১০৮টি শ্লোক পাওয়া যায়, জীবনের নানা দিক এর বিষয়বস্তু। মনে হয় ভল্লটের রচিত বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির সংকলনেই এর সৃষ্টি, বিষয়গত কোনও সংহতি এগুলিতে নেই। শ্লোকগুলি গুণগত দিক থেকেও সমান নয়। অধিকাংশ শ্লোকই জীবন সম্বন্ধে বহুপ্রচলিত সদুক্তি, নিতান্তই বৈশিষ্ট্যহীন। শুধু ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি অনাবশ্যক ভাবে জটিল। 'বিষ, কে তোমার স্থান নিরূপণ করেছিল? প্রত্যেকটি স্থানই পূর্বটির থেকে গৌরবের: প্রথমে সমুদ্রের মধ্যে, তারপর মহাদেবের কণ্ঠে এবং তারপরে খলের বচনে?' (৪ নং) 'স্বর্ণকার, তোমাকে নমস্কার! সূক্ষ্ম ওজন নিরূপণ করার জন্যে একা তুমিই সুবর্ণের সঙ্গেই তুলায় শিলাখণ্ড চাপিয়ে দাও।' (৭০ নং) 'কপোল বেয়ে যে গন্ধগজের মদস্রাব হচ্ছে সে যদি তার কাছে আসা মৌমাছিদের তাড়িয়ে দেয় তবে ক্ষতি হাতিরই, কারণ তারই অলংকার চলে গেল (মৌমাছির গুঞ্জন হাতির মদস্রাবের বিজ্ঞাপন), কারণ মৌমাছিরা গিয়ে প্রস্ফুটিত পদ্মের চারিদিকে ঘুরবে।' (১০৫ নং) ভল্লটের ভাবগুলি নেহাৎই সাধারণ, বৈশিষ্ট্যবর্জিত। একমাত্র 'বৈশিষ্ট্য' হল পাণ্ডিত্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত বা উল্লেখ, এই দিয়েই ভল্লট তাঁর প্রেরণার অভাব ঢাকতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর শতকটিও যে রক্ষা পেয়েছে এতে প্রমাণিত হয় সাধারণ পাঠক আর সংস্কৃত পড়েন না, যাঁরা পড়েন তাঁরা পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেলেই তাঁরা খুশি, কাব্যের কাছে তাঁরা আর কবিত্ব আশা করেন না।

কালানুক্রমে মুখ্য শতককাব্যের ধারায় ওরই মধ্যে বিখ্যাত শেষতম রচয়িতা নীলকণ্ঠ দীক্ষিত, যাঁর *সভারঞ্জনশতক*টি সপ্তদশ শতকের রচনা, এতে ১০৫টি শ্লোক আছে; সব কটিই অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। বিষয় অবশ্য বহুপ্রকার— কাব্য প্রশংসা, কবিকে দান করার প্রশংসা, শক্তি, দৈব, ধৈর্য, বিত্ত, সতী স্ত্রী ও সৎ রাজা। এ সব বিষয়ে নীলকণ্ঠ বিভিন্ন সময়ে যা কিছু রচনা করেছেন সব ক'টি সংকলন করে এ শতকটি নির্মিত। বিষয়গুলি মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা, সেইটিই এর বৈচিত্র্য। 'শত সূর্য, শত চন্দ্র উদিত হোক, মহিষীর বচন ব্যতিরেকে মনের তমিস্রা ঘোচে না।' (৩ নং) 'স্ত্রীর কাছে প্রেমিক স্বামী সুন্দর, গণিকার কাছে বিত্তবান সুন্দর।' (৪৯ নং) 'শ্রুতি ও স্মৃতি ধনের নিন্দা করে কেন, যখন ধন ছাড়া তারা এক পা-ও এগোতে পারে না?' (৫৯ নং) 'দাম্পত্য প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকলে কোনও কিছুরই সত্যিকার ক্ষতি হয় না।' (৯৩ নং) এই শ্লোকগুলির বৈশিষ্ট্য দুটি; প্রথমত এরা কোনও অসামান্যতার দাবি করে না। সবচেয়ে সাধারণ ও বহুব্যবহৃত অনুষ্টুপ ছন্দে, অনাবশ্যক

অলংকার, আড়ম্বর ও দুরূহতা বর্জন করে এরা সহজ ভাব স্বচ্ছন্দ সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছে। না আছে অপ্রচলিত প্রতিশব্দের ব্যবহার, না কৃত্রিম অলংকারের, না দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার। ফলে এগুলি সুখপাঠ্য ও প্রসাদগুণে সহজবোধ্য। ভাবগুলি প্রায়ই অতি সাধারণ, যদিও মধ্যে মধ্যে যথার্থ ভুয়োদর্শিতার নিদর্শনও আছে। সহজ ভাষা আঙ্গিকে ব্যক্ত বলে এগুলি ভল্লট বা নাগরাজের রচনার মতো বিরক্তি উৎপাদন করে না।

আরও কয়েক শতাব্দী পূর্বে ভল্লটের সমকালেই আনন্দবর্ধন রচনা করেন তাঁর *দেবীশতক*, এতে একশোটি শ্লোকে দেবীর স্তুতি। এটি বিষয়ের দিকে স্তোত্রকাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা, কিন্তু বিচ্ছিন্ন একশোটি শ্লোক থাকায় শতক বলেও বিবেচনা করা যায়। রচনার দিক থেকে *দেবীশতক*-এর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। ভারতবর্ষে স্তোত্র সাহিত্য এত সমৃদ্ধ বলেই স্বভাবত অন্যান্য স্তোত্র শতকের (*চণ্ডী* বা *চণ্ডীশতক*-এর) সঙ্গে পাঠক মনে মনে তুলনা করেন ও লক্ষ্য করেন। *দেবীশতক* স্থানে স্থানে দুরূহ কিন্তু কাব্যের ভাবও জটিল নয় এবং দীপ্তিকাব্য বা দ্রুতিকাব্য হিসেবে কোনও গোত্রেই এর আবেগে বা মননে কোনও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নেই। স্রগ্ধরা ছন্দে শংকরাচার্যের রচনা বলে পরিচিত *শতশ্লোক* নামের একটি শতক, এতে মোট একশো একটি শ্লোক। শংকরাচার্যের নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার একটিই কারণ, এর বৈদান্তিক বিষয়বস্তু। নিজগুণে এটিরও সহৃদয় পাঠকের চিত্তবৃত্তি বা বুদ্ধির কাছে কোনও দাবি নেই। আরও অনেক শতককাব্য গতানুগতিক বিষয়ে ও ভঙ্গিতে মধ্যে মধ্যেই রচিত হয়েছে। বিষয়ে, প্রেরণায় ও রসে তারা এমনই দীন ও অকিঞ্চিৎকর যে সাহিত্যের ইতিহাসে তারা উল্লেখের দাবি করতে পারে না। এগুলির মধ্যে পরবর্তী কালের রচনাই বেশি, যেমন পদ্মানন্দের *বৈরাগ্যশতক*, স্পষ্টই বোঝা যায় ভর্তৃহরিই এ-শতকের মূল, কিন্তু রচনা নিতান্তই দীন। তেমনই নরহরির *শৃঙ্গারশতক*। এরও মূল ভর্তৃহরির *শৃঙ্গারশতক*; জনার্দন ভট্টের *শৃঙ্গারশতক*ও অমনই একটি অনুকৃতিবিশেষ। অজ্ঞাত কবির *খড়্গশতক*, বীরেশ্বরের *অন্যোক্তিশতক* রচনায় অত্যন্ত নিকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণবল্লভের *কাব্যভূষণশতক* যমক ও অনুপ্রাসে উদাহরণ দেওয়ার জন্যই যেন রচিত। জৈনশতকও কয়েকটি আছে; জম্বুগুরুর *জিনশতক* একটি; ভূপালের *জিনচতুর্বিংশতিকা*-র একমাত্র সদ্‌গুণ হল এটিতে মোটে চব্বিশটি শ্লোক আছে। নাম ও পরিচয়েই বোঝা যায় ধীরে ধীরে এই নিতান্ত সাধারণ রচনাগোত্রটি কী ভাবে উত্তরোত্তর অবক্ষয়ের পথে নেমে যাচ্ছে।

ঠিক একশোটি না হলেও এমন কিছু সংকলন আছে যা এই জাতেরই, যেমন গোবর্ধনাচার্যের *আর্যাসপ্তশতী*, আর্যা ছন্দে সাতশোটি শ্লোকের সংকলন। এ শ্লোকগুলি শৃঙ্গাররসের। গোবর্ধনের উদ্দেশ্য ছিল শৃঙ্গাররসের নামে যে কুরুচিপূর্ণ রচনার প্রাদুর্ভাব ছিল তাঁর যুগে, তার থেকে সংস্কৃত সাহিত্যকে মুক্ত করা। অর্থাৎ এর রুচিগর্হিত দিকটিকে বর্জন করে শৃঙ্গাররসাশ্রিত কাব্য রচনা করা। গোবর্ধনাচার্যের কবিতা শক্তি রচনার মান এমন ছিল না যে, তিনি তাঁর কাব্য দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন; কিন্তু তৎকালীন কুরুচিকে তিনি নিজের কাব্যে স্থান দেননি এ কথা সত্য। তাঁর প্রভাবে কবি বিহারীলাল

হিন্দিতে *সৎসঈ* (সপ্তশতী) রচনা করেন; এ কাব্যের ওপরে হয়তো প্রাকৃত ভাষায় রচিত সাতবাহন রাজা হালের *গাহাসত্তসঙ্গৈরও* (গাথাসপ্তশতী) প্রভাব ছিল। বিহারীলালের প্রভাব পড়ে পরবর্তী কবি প্রেমানন্দের *শৃঙ্গারসপ্তশতিকা*-য় দেখা যাচ্ছে শৃঙ্গাররসকে আশ্রয় করে সাতশোটি শ্লোক রচনা জনপ্রিয় হয়েছিল, হয়তো হালের প্রাকৃত *গাহাসত্তসঈ* এর প্রবর্তক। কিন্তু হালের রচনার মতো কোনওটিই খ্যাতি পায়নি, কারণ উন্নতমানের কবিত্ব না থাকলে একই বিষয়বস্তুর একই রসের সাতশো'টি সার্থক শ্লোক রচনা করা সম্ভব নয়; সেই কারণে অন্য সপ্তশতীগুলিকে মানুষ বিস্মৃত হয়েছে। সপ্ত একটি পবিত্র সংখ্যা, সেই জন্য সপ্তশতীর এত প্রাদুর্ভাব।

একশো'র কম, অর্ধেক, শ্লোকে বিল্‌হণের রচিত *চৌরসুরতপঞ্চাশিকা* (স্বতন্ত্র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এ-ও শৃঙ্গাররসের। এছাড়াও আছে সাম্বপঞ্চাশিকা (নামান্তরে, পরমাদিত্যস্তোত্র বা ব্রহ্মাদিত্যস্তোত্র)। এর রচয়িতা নাকি শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব। সূর্যশতকের মতো *সাম্বপঞ্চাশিকা*-রও উপজীব্য সূর্যের মাহাত্ম্য। এর দ্বারা স্বল্পস্থায়ী এক সূর্য উপাসনার স্বতন্ত্র রীতি ও ধারা যে প্রবর্তিত হয়েছিল তা-ই প্রমাণিত হয়; *সাম্বপুরাণ* এই সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ। পঞ্চাশিকা যে শতকের ধারাতেই রচিত তা সহজেই বোঝা যায়; সম্ভবত *চৌরসুরতপঞ্চাশিকা*-য় বিল্‌হণ যে-খ্যাতি লাভ করেন তার দ্বারাই পরবর্তী পঞ্চাশিকা রচয়িতারা উদ্বুদ্ধ হন। সংখ্যার হিসেব খুব বড় কথা নয়, শতকের 'শত' শব্দ কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা ততটা সূচনা করে না যতটা করে সংখ্যা পূর্ণতাকে। মনে হয় *যজুর্বেদ*-এর শতরুদ্রিয়-ই এ দিকে পথিকৃৎ; সেখানেও সংখ্যা হিসেবে 'শত' নিরর্থক, পূর্ণ একটি স্তোত্রের পরিচয় বহন করে মাত্র। বৌদ্ধসাহিত্যেও দেখি একটি বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে পরস্পর অসংলগ্ন কয়েকটি গাথা গ্রথিত হয়ে স্তোত্রের আকার নিয়েছে, *সুত্তনিপাত*, *থেরগাথা*, *থেরীগাথা* ও *ধম্মপদ*-এ। *রামায়ণ মহাভারত*-এও এ রকম মূল আখ্যান থেকে কতকটা বিচ্ছিন্ন স্তোত্র অনেক আছে, পুরাণেও প্রচুর পরিমাণে আছে। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উদাহরণ *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*'র বিশ্বরূপদর্শন ও *মার্কণ্ডেয় পুরাণ*-এ দেবীমাহাত্ম্য অংশে যা 'চণ্ডী' নামে প্রখ্যাত এবং যার প্রভাবে *চণ্ডীশতক* রচিত। ক্রমে ক্রমে অষ্টোত্তরশত নামে দেবতার আহ্বান ও স্তবের প্রচলন হয় এবং স্তোত্রসাহিত্যে বহু স্তব এই ধারাতেই রচিত।

শতককাব্য খণ্ডকাব্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম সার্থক খণ্ডকাব্য *মেঘদূত*-এর সঙ্গে এগুলির অনেক পার্থক্য; *মেঘদূত*-এ শ্লোকগুলির পারম্পর্য আছে যার প্রভাব বেশ কিছু দূতকাব্যে কিছুদিন পর্যন্ত পড়েছিল। কিন্তু শতককাব্যে বহু বিচ্ছিন্ন শ্লোক বিষয়গত শিথিল এক সংহতিকে অবলম্বন করে একত্র গ্রথিত। শতককাব্যের অধিকাংশেই শ্লোকগুলি নানা ছন্দে রচিত। বিষয় সাদৃশ্যও দৃঢ় নয়, রস বা ভাবের বন্ধনসূত্রটিও ক্ষীণ। ফলে শতক, সপ্তশতী ও পঞ্চাশিকা সবগুলিই কোনও কবির কবিজীবনে নানা বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত বিচ্ছিন্ন শ্লোকের সংকলন। বোঝাই যায়, এ-জাতীয় সংকলনে সুভাষিতাবলী ধরনের গ্রন্থ রচিত হতে পারে, কিন্তু সংহত রচনার কাব্যপাঠে যে গাঢ়তা ও রস, ধ্বনি, ইত্যাদির ঐশ্বর্যে যে জাতীয় তৃপ্তি পাওয়া যায়

শতককাব্যে বা তার অনুকারী কাব্যে তেমন কোনও অবকাশই নেই।

সপ্তম শতকে চিন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যসম্পর্ক খুব বেশি ছিল এবং বণিকের মুখেমুখে বা পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের সাহিত্যের আদানপ্রদান হওয়াও খুব স্বাভাবিক। ওই সময়ে চিনে তাঙ্‌বংশীয় রাজাদের কালে যে অপূর্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়, যার মধ্যে গভীর জীবনবোধ বিধৃত আছে তার প্রভাবও এসে থাকা সম্ভব। এ প্রভাব আসা সম্ভব হল কারণ মহাকাব্যের সুস্থ ধারাটির প্রেরণা তখন নিঃশেষিত; কবিদের এমন শক্তি নেই যা পূর্ণাঙ্গ সার্থক কাব্য রচনা করতে পারে; অথচ কিছু শক্তি আছে যাতে ছোট ছোট সার্থক শ্লোক রচনা করা যায়। বর্ধন রাজবংশের পতনের পরে আর্যাবর্তে রাষ্ট্রিক সংহতি কিছুকাল বিপর্যস্ত ছিল, আর রাজসভাই ছিল কবিদের আশ্রয়, পৃষ্ঠপোষক ও প্রেরণার অন্যতম উৎস। মহাকাব্যের মহাযুগ অবসিত তখন খণ্ডকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হলেন অপেক্ষাকৃত হীন ক্ষমতার কিছু কবি। শতককাব্যে দায় সব চেয়ে কম; বিষয়গত বন্ধন এখানে শিথিল, ছন্দের সাম্যও আর অপেক্ষিত নয়। শতককাব্য যে ক্ষীণসূত্রে গ্রথিত তা-ও যখন শিথিল হয়ে এল তখন এল 'সুভাষিতাবলী' ধরনের সংকলন গ্রন্থ, যাতে বিভিন্ন কবির রচনা বিষয়সাদৃশ্য অনুসারে গ্রথিত।

ঋতুসংহার বা *মেঘদূত*-এর মধ্যে যে বিষয়সাম্য (ছন্দসাম্য ও) এবং পারম্পর্য আছে, *সূর্যশতক* ও *চণ্ডীশতক* ছাড়া অন্যান্য শতকে তা নেই। পরবর্তী শতককাব্যে প্রত্যেকটি শ্লোকই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। কাব্যে কোনও অন্তর্নিহিত প্রেরণার সাম্য নেই, কোনও গতি নেই, রসের ঐক্য নেই, পারম্পর্য নেই, আদি, মধ্য ও অন্ত নেই, পরিণতি নেই। তাই যদিও ভর্তৃহরিতে এক একটি অনুচ্ছেদে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য আছে, যেমন শ্রীপ্রশংসা বা কামিনীগর্হণ— তবু সেই অনুচ্ছেদের মধ্যে প্রত্যেকটি শ্লোকই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী শ্লোকের সঙ্গে কোনও ভাবেই সম্পৃক্ত নয়; ফলে সমগ্র শতকটি কখনও একক কাব্য হয়ে ওঠে না। এই ধরনের খণ্ড খণ্ড ছবির মতো শ্লোক সপ্তম শতকেই প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরে জনপ্রিয় থাকে। এই তিন শতক ধরে এই কাব্যের ধারার কাছে পাঠকের প্রত্যাশা ছিল যে শিথিলবন্ধনে গ্রথিত একটি খণ্ডকাব্যের আকৃতি যেন তার থাকে, বন্ধনসূত্র শুধু বিষয়সাম্য। পরে এটুকু প্রত্যাশাও আর রইল না, তাই পরবর্তী শতক বা শতকধর্মী (অর্থাৎ সপ্তশতী বা পঞ্চাশিকা) কাব্যগুলি একই কবির বহু বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন যুগে রচিত শ্লোকের সংকলনে পর্যবসিত হল, যেমন *ভল্লটশতক* বা *ভাবশতক*। শতককাব্যের পূর্ণবিকাশের যুগেও একই বিষয়ে বিভিন্ন মনোভাবের প্রকাশ অনুমোদিত ছিল শুধু রচনাটি একই কবির হওয়া চাই; কিন্তু নবম শতকের পরে বিষয়ে বৈচিত্র এসে সংহতিকে আরও শিথিল করে দিল।

আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও এই বিকেন্দ্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী শতকগুলিতে কালিদাস, বাণ বা ময়ূরের মতো ভঙ্গি, রীতি ও ছন্দের ঐক্য নেই। প্রায় সব মহাকাব্যের একটি সর্গ জুড়ে একই ছন্দ থাকত, ব্যতিক্রম দেখা গেল অষ্টম-নবম শতকের পর থেকে। এই ছন্দসাম্যের

নির্দেশ যেন কালিদাস, বাণ, ময়ূর তাঁদের খণ্ডকাব্যে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী শতককাব্যের রচয়িতারা দুই একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, এ নির্দেশ অস্বীকার করলেন; তাঁরা প্রত্যেক শ্লোকের বিবক্ষিত অনুসারে সে-শ্লোকের উপযুক্ত ছন্দ নির্বাচন করলেন। ফলে, বিবক্ষিতে যত বৈচিত্র্য আঙ্গিকে তা-ই প্রতিফলিত হল। সপ্তদশ শতকে *সভারঞ্জনশতক* যে আগাগোড়া অনুষ্টুপে রচিত তাই স্পষ্টতই মহাকাব্য বা প্রথম যুগের খণ্ডকাব্যগুলির অনুকরণে।

শতককাব্যের ইতিহাসে একটা সূচনা, বিকাশ ও অবক্ষয়ের ইতিহাস দেখা যায়। প্রথম দুটি, *সূর্যশতক* ও *চণ্ডীশতক*-এ বিষয় ও আঙ্গিকে অনেক বেশি সংহতি দেখা যায়, কারণ, মহাকাব্যের সুস্থ যুগের প্রভাব তখন সকল রচনার ওপরেই বিদ্যমান। ভর্তৃহরির *নীতিশতক* স্পষ্টতই *মহাভারত*-এর শান্তিপর্বের এবং অন্যত্রও যে সকল নীতিকথার অংশগুলি আছে তার দ্বারাই প্রভাবিত; সুভাষিত বা তত্ত্বাশ্রয়ী কাব্যের উদ্ভব বৌদ্ধ সাহিত্যে এবং মহাকাব্য দুটিতে নিহিত; অথবা বলা চলে, মুখে মুখে প্রচলিত গাথা-ও-সুভাষিতের একটি লোকায়ত ধারা ছিল যার থেকে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য উভয়েই বস্তু আহরণ করেছে। ভর্তৃহরির *নীতিশতক* ও *বৈরাগ্যশতক* এই ভ্রাম্যমাণ তত্ত্ব-সাহিত্যের কাছে বিশেষ ঋণী, যদিও *বৈরাগ্যশতক*-এর উপরে বেদান্ত ও সন্ন্যাস-সাহিত্যের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। অপর কোটিতে আছে ক্লাসিকাল সাহিত্য, যার মধ্যে শৃঙ্গাররসের প্রাবল্য। এদের উপরে *কামশাস্ত্র*, *নাট্যশাস্ত্র* ও *অলংকারশাস্ত্র*-এর (বিশেষত, *উজ্জ্বলনীলমণি* জাতীয় শাস্ত্রের) প্রভাব খুবই স্পষ্ট; *শৃঙ্গারশতক* ও *ভাবশতক* এগুলির দ্বারা প্রভাবিত।

মহাকাব্যের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখি কালিদাসের পরে আড়াইশো বছরের মধ্যেই প্রধান মহাকাব্যগুলির অধিকাংশই রচিত হয়েছিল। কালিদাস খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকের; তার অর্ধশতাব্দীর কিছু পরে, ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি ভারবি তাঁর *কিরাতার্জুনীয়* রচনা করেন। দক্ষিণে সিংহলে ওই সময়েই কুমারদাস তাঁর *জানকীহরণ* রচনা করেন, (৫১৭-২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে)। ভর্তৃমেণ্ঠের নির্দিষ্ট যুগ ঠিক জানা যায় না, তবে মনে হয় এরই কিছু আগে বা পরে তিনি *হয়গ্রীববধ* রচনা করেন। ভট্টির যুগ ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের পরে নয়, কাজেই এদের কিছু পরে তিনি তাঁর *রাবণবধ* রচনা করেন। রাজা বর্মলাতের রাজত্বকালে মাঘের বিকাশকাল; শেষ বর্মলাত ৬২৫ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি, কাজেই সপ্তম শতকের প্রথমার্ধেই মাঘ তাঁর *শিশুপালবধ* রচনা করেন। এই সব কবির মধ্যে যোগসূত্র একটিই; এঁরা সকলেই মহাকাব্যের মুখ্যধারার অন্তর্গত, অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজের নিজের শক্তি অনুসারে কালিদাসের বা তাঁর পরবর্তী ও নিজের পূর্ববর্তী কোনও মহাকবির অনুকরণ করেছে। এঁদের সিদ্ধি ও ব্যর্থতা নির্ভর করেছে তাঁদের প্রেরণা ও কলাকুশলতার উপরে, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক ছিল: রাজসভার কাব্যের যে মুখ্য ধারাটি তৎকালীন বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত ছিল সেই ধারাতে রচনা করা।

এই শ' দেড়েক বছরের অনুকরণের শেষ পর্যায়ে এটা প্রতিপন্ন হল যে মহাকাব্য রচনার জীবনীশক্তি কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে নিঃশেষিত। সিদ্ধি নিতান্তই সীমিত হয়ে পড়ল, ফলে

অনুকরণ স্পষ্টতর ভাবে প্রকট হয়ে উঠল। কবিরা উত্তরোত্তর অলংকার, দুরূহ প্রতিশব্দ ও আঙ্গিকবাহুল্য ও বাহ্য জটিলতার আশ্রয় নিতে লাগলেন, বিবিক্ষিতকে ভঙ্গীভণিতার দ্বারা আচ্ছন্ন করাই রীতি হয়ে উঠল। যে কোনও আঙ্গিকের কাব্য একবার প্রবর্তিত হলে তার থেকে সম্ভাব্য রসের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত নিংড়ে নিয়ে তবে তাকে বর্জন করা হয়; অর্থাৎ ভঙ্গির বিকল্প উপস্থাপিত করে যথাসাধ্য তাকে সরল করে পরিবেশনার দুশ্চেষ্টা চলতে থাকে যতক্ষণ না কবি ও শ্রোতার কাছে তার নিঃশেষিত জীবনীশক্তি পীড়াদায়ক ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ভাবে নানা আঙ্গিকের মকরধ্বজ ও মৃতসঞ্জীবনী সেবন করিয়ে দ্বাদশ শতকে শ্রীহর্ষের *নৈষধচরিত* পর্যন্ত চলল। কবির অভাবে কবিযশঃপ্রার্থীরা চেষ্টা করে গেছেন তার পরেও, কিন্তু সে চেষ্টা নিরতিশয় ব্যর্থ বলে আর তেমন স্বীকৃতি পায়নি বিদ্বৎসমাজে। কিন্তু মাঘের সময়েই মহাকাব্যের প্রাণরস বিশুষ্কপ্রায় এবং সহৃদয় পাঠক কাব্যরসের প্রত্যাশায় আর মহাকাব্যের দিকে তাকাননি। তখন কিছু কবিত্বশক্তি যাঁদের ছিল তাঁরা আঙ্গিক ও কাব্যধারার নূতন উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হলেন।

এই যুগসন্ধিক্ষণে বাণভট্ট দেখা দিলেন কাব্যদিগন্তে। বাণের পূর্বেও গদ্যসাহিত্য রচিত হত কিন্তু বাণের হাতে গদ্য এমন এক পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করল যে সে ধারায় নতুন কিছু উদ্ভাবন করা আর যেন সম্ভব রইল না। বাণের পরবর্তীরা যেন গদ্যে আর নতুন কিছু পরিবেশন করার অবকাশই পেলেন না— বাণের হাতে গদ্য এত পরিপূর্ণ ও রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছিল বলে। বাণের গদ্যে যতই কৃত্রিমতা, দীর্ঘসমাস, দীর্ঘবন্ধ, দুরূহ প্রতিশব্দ ও অলংকারবাহুল্য থাক না কেন, তিনি যে এক নতুন ভঙ্গির পথিকৃৎ এবং তীর্থংকর তাতে কোনও সংশয় ছিল না। ফলে শক্তিমান কবিরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অন্য ভঙ্গি, ধারা ও আঙ্গিক উদ্ভাবনের জন্যে। এই সময় *অলংকারশাস্ত্র*-এর বিকাশেরও যুগ। আলংকারিকরা ক্রমশই গুরুভার অলংকৃত শৈলীর পক্ষপাতি হতে থাকেন। দণ্ডী, বামন, ভামহ, রুদ্রট— এঁরা পরপর আবির্ভূত হন এবং অলংকারের অসংখ্য বৈচিত্র্য ও প্রকারভেদ স্বীকৃত হতে থাকে। মহৎ কাব্যসৃষ্টির যুগ— হয়তো সম্ভাবনাও— যেন ক্রমে অন্তর্হিত হয়ে গেল। কাব্য অন্তরঙ্গ থেকে বহিরঙ্গে নিষ্ঠা দেখাল। অভিজ্ঞতা, জীবনবোধের চেয়ে সমাস ও অলংকৃত বাগ্‌ভঙ্গি প্রাধান্য পেল। মুখ্য মহাকাব্য দুটির পরের কাব্যেও স্থানে স্থানে বৈশিষ্ট্য ও কাব্যগুণ দেখা দিয়েছিল; রোমান্টিক গদ্যও স্বল্পকালের জন্য পাঠককে চকিত করে অন্তর্হিত হল।

সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যে শতককাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ। প্রধান শতক কাব্যগুলির যুগ শেষ হলে কিছুকাল যেন নতুন কোনও ধারার সম্ভাবনা পর্যন্ত দেখা যায়নি; এই সময়ে চম্পূ'র বিকাশ। চম্পুর তবু স্বীকৃতি ছিল অলংকারশাস্ত্রে; দণ্ডী বলছেন 'গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীয়তে— গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে যে বাঁক্য তাই চম্পূ।' দশম শতকে ত্রিবিক্রমভট্ট রচনা করেন *নলচম্পূ* (৯১৫ খ্রিস্টাব্দ); সোমদেব রচনা করেন *যশস্তিলকচম্পূ* (৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ)। এর পরেও কিছুকাল চম্পূ রচনা চলতে থাকে, কিন্তু সে সব রচনা সাধারণ, বৈশিষ্ট্যবর্জিত। চম্পূ কিন্তু কোনও দিনই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি, এর পরমায়ুও স্বল্পকালের;

কিছুকাল পরেই চম্পূরচনা পরিত্যক্ত হয়। হয়তো এর গদ্যপদ্য সংমিশ্রণের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনও সাহিত্যিক যুক্তি ছিল না, ছিল শুধু প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুকরণ। কারণ যাই হোক, চম্পূর নিজস্ব কোনও জীবনীশক্তি ছিল না, কোনও শক্তিমান কবিই এ ভঙ্গিতে রচনায় প্রবৃত্ত হননি।

সপ্তম থেকে দশম শতকের মধ্যে নতুন গোত্রের (genre) রচনার উদ্ভাবনে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলে; শতক, সপ্তশতী, পঞ্চাশিকা, চম্পূ এই সব তার ফসল। এগুলির সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টির জীবনকাল হ্রস্ব; কিন্তু তার পরে বহুদিন ধরে চলে অনুকরণের যুগ— প্রেরণাহীন গতানুগতিক সৃষ্টি শুধু ভারাক্রান্ত করেছে সাহিত্যের ইতিহাসকে, সৎসাহিত্য দিতে পারেনি। কারণের সন্ধান করলে দেখি দশম-একাদশ শতকে, যখন থেকে নিষ্প্রাণ অনুকরণ চলতে থাকে— তখন থেকে কথ্যভাষায় সাহিত্যরচনার সূত্রপাত অপভ্রংশ ও কথ্যভাষার সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। কাজেই সংস্কৃত সাতিহ্য ধীরে ধীরে মজা নদীর খাতের মতো নীরস ও প্রাণহীন হয়ে গেল।

চম্পূর তুলনায় শতকের জীবনীশক্তি ও পরমায়ু দুই-ই বেশি ছিল। যে শতক ক'টি পাওয়া যায় সেগুলি পরস্পর থেকে ভিন্ন, কিন্তু কিছু কিছু সাধারণ চরিত্র সব ক'টিতেই আছে। মহাকাব্যের বিষয়বস্তু সম্ভবত নানা কারণে ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছিল, তাই খণ্ডকাব্যেই মনোনিয়োগ করলেন কবিরা। এগুলি মাঝে মাঝেই গীতধর্মী (লিরিক) ও রোমান্টিক। এ জাতীয় কবিতায় কবির ব্যক্তিগত আবেগ সহজে প্রকাশ পেতে পারে, যে-অবকাশ মহাকাব্যে ছিল না। শতক গোষ্ঠীর কাব্যই হোক বা সাধারণ স্তোত্র সাহিত্যই হোক, কবিরা প্রায়ই যেন উত্তমপুরুষে কথা বলেছেন, অন্তত বাণ ও ময়ূরের পর থেকেই। পুরাণের কাল থেকেই সাহিত্য ও সমাজে সাম্প্রদায়িক ও পারিবারিক দেবতার পূজা ও ব্যক্তিগত অর্থাৎ ইষ্টদেবতার বোধ ও পূজা দেখা দিয়েছিল; ফলে স্তোত্রসাহিত্যেও ব্যক্তিগত সুরটি লাগে— পুরাণ রচনার মধ্যযুগ থেকে অর্থাৎ অষ্টম শতক থেকেই। মাতৃকা, দেবী, সূর্য, ইত্যাদির উপাসনার প্রবর্তন হয়, পূজার ব্যাপক প্রচলন হয় ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দী থেকে: দেবতা ও ভক্তের সম্বন্ধের মধ্যে ভক্তি, ব্যক্তিগত আনুগত্য, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর ইত্যাদি ভাবের স্পর্শ লাগে। ফলে যজ্ঞ ও গোষ্ঠীগত উপাসনার স্থানে পূজা ও ব্যক্তিগত নিষ্ঠা প্রাধান্য পাওয়াতে বৈদিক সূক্তের অপেক্ষাকৃত নৈর্ব্যক্তিকতার স্থানে ব্যক্তিগত সংরাগ দেখা যায় স্তোত্রসাহিত্যে। বাণ ও ময়ূর মাতৃকা ও সূর্যপূজার এই নবপর্যায়ের প্রথম উদ্‌গাতা। এঁরা দুজনেই যে সমৃদ্ধিশালী বর্ধনসাম্রাজ্যে আবির্ভূত হন তা আকস্মিক নয়; এঁদের যুগই এঁদের প্রবর্তনা দেয় শতককাব্য রচনায়। ধীরে ধীরে বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভগ্নদশায় নানা বিপর্যয় ও সামাজিক বিক্ষেপ এবং বিক্ষোভ দেখা দিল; বর্ধনপরবর্তী সাহিত্য তার চিহ্ন বহন করে, আর শতককাব্যও সে চিহ্ন বহন করে। অষ্টম শতকে অমরুতেই মনে হয় শতককাব্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, তার পরেই শুরু হয়ে যায় ঊষর অনুকরণের যুগ। ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্লোকে এই মনোভাবের প্রকাশ, এ যেন সমাজের ব্যাপক সংহতির অভাবকেই প্রতিফলিত করে। বিষয়গাম্ভীর্য নেই, কাহিনির

আন্তঃসংহতি নেই, অঙ্গীরসের সঙ্গে অঙ্গরসের পরিপূণ-সম্পর্ক নেই, কাব্যব্যাপী একটি জীবনবোধ নেই, আছে শুধু বিচ্ছিন্ন একটি একটি উপলব্ধির চিত্রণ। পটও অপরিসর, সিদ্ধিও তেমনই। এই সময়ের মন্দির ভাস্কর্যের মতো মহৎ কোনও পরিকল্পনার স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বল্প-পরিসর চিত্র নিজ অপ্রশস্ত পরিসরে হয়তো সার্থক, কিন্তু সে এমন পরিসর যাতে মহৎ শিল্পের অবকাশ নেই।

কাব্যে অলংকারের সীমা

সংস্কৃত অলংকারসাহিত্যে নানা প্রস্থান; অলংকারের সংজ্ঞানিরূপণে এই প্রস্থানকর্তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ চোখে পড়ে। আপাত ভাবে সব প্রস্থানেরই লক্ষ্য হল কাব্যের আত্মার সন্ধান, অর্থাৎ ঠিক কোন বস্তুটি থাকলে কাব্য প্রাণ পায়, না থাকলে পায় না। কয়েকটি পরিচিত কাব্যসংজ্ঞা দিয়ে আরম্ভ করা যাক। প্রথম দিকের আলংকারিকদের মধ্যে অষ্টম শতকের বামন তাঁর *কাব্যালংকার*গ্রন্থে কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন: 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য— কাব্যের আত্মা হল রীতি।' (১:২:৬) নবমশতকে আনন্দবর্ধন *ধ্বন্যালোক*-এ বললেন: 'কাব্যসাত্মা ধ্বনিঃ— কাব্যের আত্মা হল ধ্বনি। (১:২) দশম শতকে কুন্তক তাঁর *বক্রোক্তিজীবিত*-এ বলছেন: 'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্— বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ।' ওই যুগেরই ক্ষেমেন্দ্র তাঁর *ঔচিত্যবিচারচর্চা*গ্রন্থে বলছেন: 'ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম্— রসসিদ্ধ কাব্যের স্থির প্রাণ হল ঔচিত্য।' (১:৫) চতুর্দশ শতকে বিশ্বনাথ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে বললেন: 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্— রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য।' (১:৩) তার অনেক পরে সপ্তদশ শতকে শেষ উল্লেখযোগ্য আলংকারিক জগন্নাথ তাঁর *রসগঙ্গাধর* গ্রন্থের সূচনাতে বলেন· 'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্— রমণীয় অর্থের প্রতিপাদন করে যে শব্দ তাই কাব্য।' তাহলে এ ক'জন আলংকারিকদের সংজ্ঞায় রথাক্রমে রীতি, ধ্বনি, বক্রোক্তি, ঔচিত্য হল কাব্যের প্রাণ অথবা রসযুক্ত বা রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক শব্দই কাব্য। এ পর্যন্ত সংজ্ঞা কটির মধ্যে অলংকারকে কেউই কাব্যের প্রাণ বা আত্মা বলেননি। তাহলে কাব্যে অলংকারের স্থান কোথায়? সপ্তম শতকের আলংকারিক দণ্ডী বলছেন: 'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলংকারান্ প্রচক্ষতে— কাব্যের যে ধর্ম কাব্যের শোভা সৃষ্টি করে তাই অলংকার।' (কাব্যাদর্শ ২:১) আনন্দবর্ধন বলছেন:

> রসবন্তি হি বস্তূনি সালংকারাণি কানিচিৎ।
> প্রায়েণৈব পরাং ছায়াং বিভ্রল্লক্ষ্যে নিরীক্ষতে॥

অর্থাৎ, কোনও কোনও রসযুক্ত কাব্যবস্তু অলংকৃত হয়ে প্রায়ই উৎকৃষ্ট কান্তি ধারণ করে কাব্যে লক্ষিত হয়। (২:১৭:১)

কুন্তক বলছেন:

> উভাবেতাবলংকার্যৌ তয়োঃ পুনরলংকৃতিঃ।
> বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে॥

শব্দ এবং অর্থ এ দুয়েরই অলংকরণ প্রয়োজন। এদের মধ্যে কুশল ভঙ্গির উক্তি যে বক্রোক্তি তা-ই অলংকার। (১:১০)

একাদশ শতকে মম্মট তাঁর *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থে বলেন:

উপকুর্বন্তি তং সন্তং যে অঙ্গদ্বারেণ জাতুচিৎ।
হারাদিবদলংকারাস্তো নুপ্রাসোপমাদয়ঃ।।

অর্থাৎ, কাব্যের যে প্রাণ বিদ্যমান তাকে অঙ্গরূপে কখনও কখনও হার ইত্যাদির মতো যা অলংকৃত করে সেই অনুপ্রাস উপমা ইত্যাদিই অলংকার। (৮:৬৭)

এই মম্মটই 'যঃ কৌমারহরেঃ, ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলছেন 'অত্র স্ফুটোং কশ্চিদল কারঃ/রসসৈব্য প্রাধান্যান্নালংকারঃ— এখানে স্পষ্ট কোনো অলংকার নেই; রসের প্রাধান্যের জন্যেই অলংকার নেই।' ক্ষেমেন্দ্রও অলংকারকে প্রাধান্য দেননি, বলেছেন:

কাব্যস্যালমলংকারৈঃ কিং মিথ্যাগণিতৈঃ গুণৈঃ।
যস্য জীবিতমৌচিত্যং বিচিন্ত্যাপি ন দৃশ্যতে।।

জগন্নাথের কাব্য সংজ্ঞার ওপরে নাগেশভট্ট বলছেন, 'লক্ষণে গুণালংকারদিনিবেশোপিন লক্ষ্যতে, বস্তুলংকারপ্রধানানাং কাব্যানামকাব্যত্বাপত্তঃ— রসগঙ্গাধর যেখানে রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক শব্দাবলীকে কাব্যসংজ্ঞা দিলেন সেখানে গুণ বা অলংকারেব উল্লেখই নেই (কারণ) যে কাব্যে বস্তু ও অলংকার প্রধান তা হল অকাব্য।' অন্যত্র অলংকারের প্রসঙ্গে নাগেশ বলেন, 'প্রাগভিহিতলক্ষণস্য কাব্যসাত্মনো ব্যঙ্গ্যস্য রমণীয়তাপ্রয়োজকা অলংকার। নিরূপ্যন্তে— অর্থাৎ ব্যঞ্জনালভ্য যে কাব্যের আত্মা অলংকারসমূহ তার রমণীয়তা বিধান করে। বিশ্বনাথ বলেন:

শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ।
রসাদীনুপকুর্বন্তোলংকারাস্তেঅঙ্গদাদয়ঃ।।

অর্থাৎ, শব্দার্থের শোভাসমৃদ্ধ যে অস্থির ধর্ম রস ইত্যাদির উপকার করে, তা হল অঙ্গদ ইত্যাদির মতো অলংকার। আনন্দবর্ধন ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাকে কাব্যের প্রাণ বলে অভিহিত করেছেন, সেই ধ্বনিপ্রধান কাব্যে অলংকারের স্থান নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন,

অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যঃ সোলংকারো ধ্বনৌ মতঃ।।

ধ্বনিকাব্যের সেই অলংকার পৃথক কোনও চেষ্টার দ্বারা নিষ্পন্ন হবে না, অর্থাৎ সে অলংকার আসবে অনায়াসে, তাকে সৃষ্টি করতে বা অনুধাবন করতে কোনও স্বতন্ত্র প্রয়াসের প্রয়োজন হবে না। (২:১৬) তিনি আরও বলেছেন:

মুখ্যা মহাকবিগিরিমলংকৃতিভৃতামপি।
প্রতীয়মানচ্ছায়ৈষা ভুষা লজ্জেব যোষিতাম্।।

অলংকারযুক্ত যে মহাকবিদের সৃষ্ট কাব্য তার মধ্যেও এই রসধ্বনিই হল মুখ্য একটি প্রতীয়মান কান্তি, তা-ই অলংকার, যেমন লজ্জা রমণীর ভূষণ। (৩:৩৭)

তাহলে দেখছি ব্যঞ্জনা এবং রসধ্বনি যখন থেকে কাব্যে প্রাণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে তখন থেকেই অলংকার গৌণ হয়ে গেছে। প্রথম যুগের আলংকারিকরা ভামহ, বামন, উদ্ভট, রুদ্রট— এঁরা কাব্যে অলংকারকে যত মর্যাদা দিয়েছেন পরবর্তী কালের আলংকারিকরা, বিশেষত আনন্দবর্ধনের পর থেকে যাঁরা প্রখ্যাত প্রস্থানকৃৎ যাঁরা তাঁরা অলংকারকে সেই মর্যাদা আর দেননি। শুধু তাই নয়, রীতি, বক্রোক্তি, ঔচিত্য, ধ্বনি, রস, ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুকে আলংকারিকরা কাব্যের আত্মা বলেছেন, একমাত্র অলংকারকেই কেউ তা বলেননি।

পাশ্চাত্য আলংকারিকদের কয়েকজনের কথা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের সিসেরো কাব্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক যে চারটি গুণের কথা বলেছেন তা হল Coorectness বা দোষরাহিত্য, clarity বা প্রসাদগুণ, propriety বা ঔচিত্য এবং ornamentation বা অলংকার। অলংকারের মধ্যে তিনি রূপককেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি অলংকারকে কাব্যে একপাদরূপে স্বীকার করলেন। তাঁর কয়েক বছর পরে এপল্লোডোরস্ অব্ পের্গামম্ অলংকার সম্বন্ধে আলোচনা করে বললেন এ হল incomprehensibilia, সংস্কৃতে যাকে বলা হয়েছে, 'অনন্তা হি বাগ্‌বিকল্পাস্তৎপ্রকারা এব অলংকারাঃ— বাক্যের (বা সাহিত্যের) বিকল্প অনন্ত, তার মধ্যে একটি বিকল্প হল অলংকার।' খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের কবি ডিওনিসস অব্ হালিকার্নেস্‌স কাব্যের অপরিহার্য গুণের প্রসঙ্গে বলেছেন সেগুলি হল melos (মাধুর্য), rhythmos (ছন্দোময়তা), metabole (বৈচিত্র্য বা বিস্থিতি) আর to prepon (ঔচিত্য)। ইনি সঙ্গে kalon (সৌন্দর্য) ও Hedone (আকর্ষণী শক্তি-র কথাও বলেছেন; এগুলি সৃষ্ট হয় কাব্যে ঐ চারটি থাকার ফলে। লক্ষণীয়, দিওনিসস্ অলংকারের উল্লেখই করেননি। প্রায় দেড়শো বছর পরে কুইন্টিলিয়ান বললেন schema হল dianoia বা চিন্তাগত বস্তুর Trope পরিবর্তনবিন্দু, আর lexis বা শব্দাবলীরও একটা পরিবর্তনবিন্দু যা জাগতিক সত্যের (বা তথ্যের) অনুরূপ নয়। অর্থাৎ, কাব্যের শব্দ এবং অর্থ (চিন্তাগত বস্তু-র মধ্যে এক সময় বাস্তব থেকে সরে যাওয়ার যে মুহূর্তটি— যা আসে কাব্যে শোভাসম্পাদন করার জন্যে) তাই হল অলংকার। লক্ষ্য করলে দেখি dianoia-তে অর্থালংকার ও lexis-এ শব্দালংকার স্বীকৃতি পেল, আর বাস্তব থেকে সরে যাওয়ার ব্যাপারে স্বীকৃতি পেল ভঙ্গীবণিতি বা বক্রোক্তি। এরও কিছু পরে লঞ্জিনস্ *On Sublimity* নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বললেন কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে hypsos বা চমৎকারিত্বের উপরে এবং সেটির মূলে পাঁচটি গুণ: thought (চিন্তা); emotion (আবেগ); figures, (অলংকার); diction, (শব্দসম্ভার) এবং exalted composition (উচ্চগ্রামে রচনা)। এগুলির মধ্যে প্রধান হল চিন্তা ও আবেগ: অতএব গৌণ হল অলংকার।

তাহলে দেখছি অলংকার যে কাব্যের বহিরঙ্গ তা নিয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে মতভেদ নেই; যদিও অন্তরঙ্গ কী তা নিয়ে, অন্তত আপাদদৃষ্টিতে, মতানৈক্য আছে। এ দেশে আমরা বলেছি,

অলংকার রসকে সাহায্য করতে পারে তার পরিপূর্ণ বিকাশে: 'রসাদুনীপকুর্বন্তঃ', কিংবা 'কাব্যাত্মনো ব্যঙ্গ্যস্য রমণীয়তাপ্রযোজকাঃ' অথবা 'কাব্যশোভাকরা ধর্মাঃ'। কিন্তু রসকে থাকতে হবে আগে, 'তং সন্তম্', তবে তো 'উপকুর্বন্তি'। এবং সেও 'অঙ্গদ্বারেণ', কারণ অঙ্গী তো রস; এবং তাও 'জাতুচিৎ' কখনও কখনও। অর্থাৎ কাব্যের আত্মার অপেক্ষায় গৌণ অলংকার— তার অধীন। অলংকারের উপযোগিতা অপরিহার্য নয়, কাব্যে তার সত্তা বা অধিকার আপেক্ষিক, একান্ত নয়। মম্মট তাঁর *কাব্যপ্রকাশ*-এ বলছেন, 'তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি।' (১:৪) অতএব দোষরহিত শব্দ ও অর্থ যা গুণযুক্ত, কিন্তু কখনও কখনও অলংকৃত, তাই কাব্য। আগেই দেখেছি জগন্নাথ তাঁর *কাব্যসংজ্ঞা*-য় অলংকারের উল্লেখই করেননি। এ প্রসঙ্গে টীকাকার নাগেশভট্ট বলছেন, 'কাব্যানামকাব্যত্বাপত্তেঃ'; বস্তু বা অলংকার যে কাব্যে প্রধান তা কাব্যই নয়, তা হল অকাব্য। 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটিতে অলংকার না থাকার প্রসঙ্গে নাগেশ বলছেন 'রসস্যৈব প্রাধান্যান্নালংকারঃ', অর্থাৎ রসেরই প্রাধান্য থাকার ফলে অলংকার নেই। জগন্নাথ বলছেন, 'কাব্যাত্মনো ব্যঙ্গ্যস্য রমণীয়তাপ্রযোজকা অলংকারাঃ', ব্যঞ্জনায় যে রসকে পাওয়া যায় তা-ই কাব্যের আত্মা আর সৌন্দর্যবিধান করতে পারে অলংকার; অর্থাৎ রস না থাকলে অলংকার সম্পূর্ণ নিষ্ফল। তাহলে অলংকার কাব্যের বহিরঙ্গই শুধু নয়, তা স্থানবিশেষে পরিহার্য; কাব্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক নয়, এ কথা ভারতীয় অঅলংকারিকরা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে গেছেন। মম্মট তো কাব্যের সংজ্ঞাতেই 'অনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি' বলেছেন।

এ প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য হল অলংকার কাব্যের কতটা শোভা সম্পাদন করতে পারে, কখন পারে, কখন পারে না। খুব সাধারণ একটা শ্লোক ধরা যাক: *রঘুবংশ*-এ দিলীপ ও সুদক্ষিণা রথে করে কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে চলেছেন, কালিদাস বর্ণনা করছেন:

কাপ্যভিখ্যা তয়োরাসীদ ব্রজতোঃ শুদ্ধবেষয়োঃ।
মেঘনির্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব।।

শুদ্ধবেশ এই রাজদম্পতির যাত্রাকালে কি শোভাই না হয়েছিল, যেন নির্মেঘ আকাশে চিত্রানক্ষত্রসমেত চন্দ্র। (১:৪৬)

উপমা অনুষঙ্গের দ্বারা পাচ্ছি ঊর্ধ্বলোকের ব্যঞ্জনা, নিত্যমিলিত একটি দম্পতির ব্যঞ্জনা এবং উজ্জ্বল দুটি জ্যোতিষ্কের গৌরব। শোনা যায় 'উপমা কালিদাসস্য', তার অর্থ এই নয় যে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য কালিদাসে অন্য কবিদের চেয়ে বেশি; তার অর্থ কালিদাসের উপমা অভিধাগত আক্ষরিক বিবক্ষিত বিষয়ের গৌরবকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জনার দ্বারা একটি অতিরিক্ত গৌরবের মাত্রা লাভ করে। অন্য দিকে ভারবির *কিরাতার্জুনীয়*-তে সেই বিখ্যাত শ্লোকটি দেখা যেতে পারে:

উৎফুল্লস্থল কমলিনীবনাদমুষ্মাদুদ্ধূতঃ সরসিজসম্ভবঃ পরাগঃ।
বাত্যাভির্বিয়তি বিবর্তিতঃ সমন্তাদাধত্তে কনকময়াতপত্র শোভাম্।।

সংক্ষেপে অর্থ হল, প্রবল বাতাসে স্থলপদ্মের বন থেকে পুষ্পরেণু মণ্ডলাকারে আবর্তিত হয়ে যেন স্বর্ণচ্ছত্রের শোভা ধারণ করছে। (৫:৩৯)

এখানে বিষয়গৌরব যৎসামান্য, তার ওপরে অলংকারে কষ্টকল্পনা, তাই এর দ্বারা কবি 'ছত্রভারবি' সংজ্ঞা লাভ করলেন, কিন্তু এটা সৎকাব্য হয়ে উঠল না।

অনেক আগের যুগে ফিরে গেলে *ঋগ্বেদ*-এ অলংকার প্রয়োগের একটা অন্য যুগ পাই। ঊষার বর্ণনা করছেন কবি; 'মাতৃমৃষ্টের যোষা', যে মেয়েটির দেহ তার মা যত্ন করে মার্জনা করে দিয়েছেন তার মতো। এখানেও স্নেহ কমনীয়তা আদর সবই উপমায় ধ্বনির দ্বারা এসেছে। বেদের উপমায় অন্য এক ধরনের বলিষ্ঠতাও দেখি:

যথা বিদ্যুদ্ধতো বৃক্ষ আমূলাদনুশুষ্যতি।
এবং স প্রতিশুষ্যতু যো মে পাপং চিকীর্ষতি।।

যেমন বাজপড়া গাছ মূল থেকে শুকিয়ে ওঠে তেমনই করেই সে শুকিয়ে উঠুক যে আমার অনিষ্ট করতে চায়।

দেবতার বর্ণনা, 'মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠা— প্রবল পাহাড়ি জন্তুর মতো' ঊষা পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করুক; 'জায়েব পত্যে উশতী সুবাশঃ— যেমন কামনাবতী সুসজ্জিতা বধূ তার স্বামীর কাছে নিজেকে প্রকাশ করে।' (১:১২৪:৭) শক্তির প্রকাশ একটি ঊষস্-সূক্তে কী প্রবলভাবেই না আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি বলতে চান প্রত্যেক ঊষাই মানুষের পরমায়ু একদিন করে নাশ করে দেয়; ঊষা নিজে চিরতরুণী অথচ মানুষকে সে জরা, অক্ষমতার দিকে ঠেলে দেয় প্রতিদিন, যেমন করে ব্যাধস্ত্রী পাখি ধরে তার ডানাদুটো ছিঁড়ে দেয়: শ্বঘ্নীব কৃত্নুর্বিজ আমিনানা। (১:৯২:১০)

এ সব জায়গায় অলংকার কাব্যার্থের গৌরব বৃদ্ধি করে, ব্যঞ্জনার দ্বারা অভিপ্রেত আবেগটিকে তীক্ষ্ণতর করে প্রকাশ করে— লক্ষণীয় বেদে শতকরা নব্বইটি অলংকারই উপমা। কাজেই অলংকার এখানে কাব্যশোভাকর ধর্ম। কিন্তু মনে রাখতে হবে মূল আবেগটি নিজের জোরে অভিভূত করবার ক্ষমতা রাখে বলেই অলংকার তার প্রকাশকে তীক্ষ্ণতর করে তুলতে পারে, তং সন্তং। রসটি খাঁটি বলেই রসাদীনুপকুর্বন্তি।

আদি মহাকাব্য দুটিতেও মাঝে মাঝে এমন শক্তিশালী অলংকারের দেখা পাওয়া যায়। রাবণ সীতাকে হরণ করবার সময়ে তাঁকে নিজের পট্টমহিষী করবার লোভ দেখায়, তুচ্ছ মানুষ রামের চেয়ে সে কত প্রতাপশালী তা বলে তাঁকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে; তখন সীতা বলেন:

আশীবিষস্য বদনাদ্ দ্রংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি।
মন্দরং পর্বতশ্রেষ্ঠং পাণিনা হর্তুমিচ্ছসি।।
কালকূটং বিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তুমিচ্ছসি।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যামধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি।।

সাপের মুখ থেকে দাঁত তুলে নিতে চেষ্টা করছ, হাত দিয়ে পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরকে তুলতে চাইছ, কালকূট বিষ পান করে স্বস্তিতে চলে যেতে চাইছ (ঠিক এই রকমই ব্যাপার হল) রামের প্রিয়বধূকে তুমি অধিকার করতে চাইছ। (অরণ্যকাণ্ড ৪৭:৩৯-৪০)

এখানে অলংকার শক্তিশালী করে তুলছে রাবণের সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় অবজ্ঞাকে এবং রামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাসকে। প্রকরণের মধ্যে এ আবেগ দুটি না থাকলে শুধু উপমায় তা আসত না।

মহাভারত-এ কাব্যগুণে অলংকারের স্থান নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি; তারই দু-একটি ব্যবহার করা যেতে পারে। ভীষ্ম শিখণ্ডির আড়াল থেকে অর্জুনের শরনিক্ষেপে বিদ্ধ হয়ে বলছেন:

অর্জুনস্য ইমে বাণা নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ।
কৃন্তন্তি মম গাত্রাণি মাঘমাং সেগাইব ।।

এ বাণ ত শিখণ্ডির নয় এ অর্জুনের, এ আমার দেহ ভেদ করে আসছে, কাঁকড়াবিছের ছানা যেমন মায়ের দেহ কুরে কুরে খায়। (১২:১১৯:৬৫ বঙ্গবাসী সংস্করণ)

এটা জনশ্রুতি: কিন্তু উপমার শক্তি তার গভীর ব্যঞ্জনায়: ভীষ্মের সঙ্গে শিখণ্ডির কোনও সম্পর্ক নেই; অর্জুন অপত্যস্থানীয়, তাই অর্জুনের শরে যে মরণান্তিক যন্ত্রণা সে হল অপত্যধর্ম পদদলিত হওয়ার যন্ত্রণা, মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়েও তা মর্মন্তুদ। *বেদ*-এ, *রামায়ণ-মহাভারত*-এর শ্রেষ্ঠ অলংকারগুলি গভীর হৃদয়াবেগকে গভীরতর করে প্রকাশ করেছে। রসকে সমৃদ্ধ করেছে, সে রস আগে থেকেই, প্রকরণেই ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে। অলংকার রসকে সৃষ্টি করেনি।

কালিদাসের সাহিত্যে অলংকারের সার্থক প্রয়োগ অগণিত। একে তো কবির অলংকার-প্রয়োগ সম্বন্ধে সহজাত সংযম আছে, কোথাও আতিশয্য নেই, তার ওপরে কোথায় কোন অলংকারটি কতটা উজ্জ্বল করে তুলবে বক্তব্যকে, সমৃদ্ধ করবে রসকে এ সম্বন্ধে তাঁর অভ্রান্ত একটি বোধ সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। সীতাকে বনে বিসর্জন দিয়ে এসে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে খবর দিলেন:

বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পস্তুষারবর্ষীব সহস্য চন্দ্রঃ।
লোকাপবাদেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বৈদেতীসুতা মনস্তঃ ।।

হঠাৎ রামের দু চোখে জল ভরে এল যেন পৌষ মাসের চন্দ্র হিম বর্ষণ করছে; লোকাপবাদে তিনি সীতাকে গৃহ থেকেই নির্বাসন দিয়েছিলেন, মন থেকে দেননি। (*রঘুবংশ* ১৪:৮৪)

এখানে চোখে হঠাৎ জল ভরে আসায় পৌষের ঝাপসা চাঁদের উপমানে রামচন্দ্রের মুখকান্তি এবং অশ্রুভরাতুর নেত্র দুটির সাদৃশ্যই শুধু নেই, শীতের রাতের আকাশে একা নীরব চাঁদের ওপরে একটা হিমেল আচ্ছাদন সহসা এসে পড়ার মধ্যে গোপন শোকের নীরব প্রকাশের ব্যঞ্জনাটিও আসছে। আরও লক্ষ্য করলে দেখি এ শ্লোকের অন্তর্নিহিত গভীরতর কবিত্ব কিন্তু এর অনলংকৃত শেষার্ধে যত উপমাসসম্বলিত প্রথমার্ধে তত নয়।

ম্যাক্‌বেথ নাটকে যখন ম্যাক্‌বেথ লেডি ম্যাক্‌বেথের মৃত্যুসংবাদ শুনলেন তখন প্রথমে একটি সহজ উক্তি করলেন She should have died hereafter/There would have been time for such a thing। কিন্তু মৃত্যু তো মানুষের সময় সুবিধা বুঝে আসে না, তাই হঠাৎ ম্যাক্‌বেথের মনে হল দিনের পরে দিন যত পেরিয়ে যাচ্ছে মানুষ অনিবার্য ভাবে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। যেন একটা মধ্যযুগীয় পুরনো প্রাসাদের সিঁড়ি দিয়ে মোমবাতি হাতে নিয়ে কেউ দোতলার শোবার ঘরের দিকে উঠছে। নিচের সিঁড়িতে ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে, সে তার অতীত দিনগুলো: ওপরের সিঁড়িগুলো, মায়াবী ভবিষ্যতের দিনগুলো, যেগুলো একে একে পেরোলে শেষে ক্লান্ত মুখটা পৌঁছবে তার মহানিদ্রার শয়নকক্ষে। নিভে যাবে বাতিটা, জীবন তো একটা চলন্ত ছায়ামাত্র, একটা ছোটখাট ভূমিকার নট মঞ্চে প্রচুর আস্ফালন করে সহসা মিলিয়ে যায় নেপথ্যে। একটা জরদ্‌গবের মুখে বলা একটা গল্প তাতে কত না আস্ফালন, কিন্তু আসলে সে গল্পটা সম্পূর্ণ নিরর্থক। এ বর্ণনায় পদে পদে উপমা এবং অতি সার্থক উপমা, জীবনের নিঃসারতা প্রতিপাদন করে মৃত্যুর অনিবার্যতার পটভূমিকায়। এমনই আর একটি দীর্ঘ স্বগতোক্তি হ্যামলেটের; তারও শুরুতে নেহাৎ আটপৌরে একটা মৌলিক প্রশ্ন: to be or not to be, that is the question— তার পরে দীর্ঘবিলম্বিত স্বগতোক্তি; উপমাশ্রেণির মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হচ্ছে জীবনের আত্যন্তিক নিরর্থকতা। কিন্তু মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে শেক্‌স্‌পীয়র কত অনলংকৃত ভাষায় বলছেন; হ্যামলেট বন্ধু হোরেশিওকে বলছেন, যদি আমাকে ভালবেসে থাকো, বন্ধু কয়েকটা দিন উৎসব থেকে সরে থেকো, এই কঠোর সংসারে কষ্টে শ্বাস নিতে নিতেই বোলো আমার কাহিনি। কোনও অলংকার নেই। তেমনই *কিং লীয়ার*-এ প্রিয়কন্যা কর্ডেলিয়ার মৃত্যুর পরে লীয়ার বলছেন: কেন একটা কুকুর, একটা ঘোড়া একটা ইঁদুরের প্রাণ থাকবে, অথচ, কেন তোমার একটু নিঃশ্বাসবায়ু জুটবে না। আরও কম শক্তিমান নাট্যকার ওয়েবস্টারও তাঁর *ডাচেস্ অব মাল্‌ফি* নাটকে নিজের ষড়যন্ত্রের ফলে মৃত বোনের দেহের সামনে দাঁড়ানো ভাইকে দিয়ে বলালেন: 'ঢেকে দাও ওর মুখ, আমার চোখে সইছে না, বড় অল্প বয়সে মৃত্যু হল ওর।'

কালিদাস বিরহের কাব্য রচনা করেছেন নানা স্থানে। প্রথম দিকের রচনা *কুমারসম্ভব*-এ রতি বিলাপ করছেন মদনের মৃত্যুর পরে; সে বিলাপে কত অলংকার:

> শশিনা সহ যাতি কৌমুদী সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
> প্রমদা পতিবর্ত্মগা ইতি প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি।।

চাঁদের সঙ্গেই জ্যোৎস্না মিলিয়ে যায়, মেঘের সঙ্গে বিদ্যুৎ, নারী যে পতিপথগামিনী এ তো অচেতনরাও প্রতিপন্ন করেছে। (*কুমারসম্ভব* ৪:৩৩)

কিংবা, মদন তুমি চলে গেছ— নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ— সেতু ভেঙে গিয়ে জলপ্রবাহ এসে যেমন করে পদ্মিনীকে ভাসিয়ে দেয়, তেমনই করেই। পুরুষের লেখনীতে নারীর বিরহের বর্ণনা, খাঁটি সুরটি যেন বাজেনি, যেমনটি বেজেছে পরিণততর রচনা *রঘুবংশ*-এ অজবিলাপে। কোথায় অলংকার সেখানে?

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং কিং ন মে হৃতম্।।

সদ্যোমৃত বধূ ইন্দুমতীর উদ্দেশে অজ বলছেন, '(তুমি ছিলে) গৃহিণী, সচিব, গোপনের সখী, ললিতকলায় ছিলে প্রিয়শিষ্যা। নিষ্করুণ মৃত্যু তোমাকে হরণ করে কীই না আমার নিয়ে গেল।' (*রঘুবংশ* ৮:৬৭)

এখানে সমস্ত কবিত্বটা ওই 'কিং ন মে হৃতম্'— এতেই আছে। আরও সহজ ভাষায় এই বিরহেরই বর্ণনা অজের মুখে:

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ।
গতমাভরণপ্রয়োজনং পরিশূন্যং শয়নীমদ্য মে।।

ধৈর্য শেষ হয়েছে, প্রেম নিরাশ্রয়, সংগীত থেমে গেছে, ঋতু উৎসববিহীন, অলংকারের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আমার শয্যা আজ শূন্য। (*রঘুবংশ* ৮:৬৬)

এরও আগে অজ বলছেন, 'ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ— তোমার প্রতি আমার প্রেমেরই আসক্তি।' (*রঘুবংশ* ৮:৫২) এত স্বল্প কথায় নিরলংকার ভঙ্গিতে লিখতে পারেন শুধুমাত্র মহাকবিরাই। কালিদাসে এটি বারেবারে দেখি: অলংকার-প্রয়োগে যিনি এত সিদ্ধহস্ত তিনিই আবেগের চরম মুহূর্তে সম্পূর্ণ নিরলংকার অভিব্যক্তির ওপরেই ভরসা রাখেন। সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফেরবার সময়ে রামচন্দ্র আকাশে রথ থেকে দেখাচ্ছেন নিচে অরণ্যবাসের স্মৃতিবিজড়িত অঞ্চলগুলি। সীতা নেই। অরণ্যে বর্ষা নেমেছে।

গন্ধশ্চ ধারাহতপল্বলানাং কাদমর্ধোদ্‌গত কেসরঞ্চ।
স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাং বভুর্বুর্যস্মিন্নসহ্যানি বিনা ত্বয়া মে।।

পুকুরে বৃষ্টি পড়ছে তার গন্ধ, আধফোটা কদমফুল, ময়ূরের স্নিগ্ধ কেকাধ্বনি— এ সবই এইখানে তোমার অভাবে আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। (*রঘুবংশ* ১৩:২৭)

কোনও অলংকারই নেই, কিন্তু বিরহের যন্ত্রণার তীব্রতা কত সহজে পৌঁছল পাঠকের মনে। অন্যান্য আবেগ ও রসেও এ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। *রঘুবংশ*-এরই চতুর্দশ সর্গে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা অযোধ্যায় ফিরেছেন, কৌশল্যা সুমিত্রা পুত্রের অদর্শনে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছিলেন (২য় শ্লোক), তাঁরা রামলক্ষ্মণকে কাছে পেয়ে 'রাক্ষসদের অস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন পুত্রদের অঙ্গে যেন এখনও (রুধিরে) আর্দ্র এমন কোমল ভাবে সে ক্ষতচিহ্নগুলি স্পর্শ করতে লাগলেন। ক্ষত্রিয়নারীর ঈপ্সিত বীরপ্রসবিনী সংজ্ঞাও আর তাঁর কামনা করলেন না।'

তে পুত্রয়োর্নৈঋতশস্ত্রমার্গানার্দ্রানিবাঙ্গে সদয়ং স্পৃশন্ত্যৌ।
অপীপ্সিতং ক্ষত্রকুলাঙ্গনানাং ন বীরসূশব্দমকাময়েতাম্।। (১৪:৪)

যা সব ক্ষত্রিয়নারীরই কাম্য সেই বীরপ্রসবিনী সংজ্ঞার জন্যে মর্মান্তিক মূল্য দিতে হয়েছে এ দুটি রাজবধূকে, চতুর্দশ বৎসরের অদর্শন, পুত্রদের সর্বাঙ্গে ক্ষত এবং তারা জীবিত অবস্থায়

ফিরবেন কিনা সে বিষয়ে সুদীর্ঘকালের অনিশ্চয়, এ মূল্যে ওই সংজ্ঞা পেয়েছেন তাঁরা; তাঁদের মনে হল এ অত্যধিক মহার্ঘ সংজ্ঞা।

বেণীসংহার বীররসের নাটক। সেখানে দেখি, যুধিষ্ঠির কৌরবদের প্রস্তাবে সন্ধি করতে উদ্যত জেনে ক্রোধে অধীর ভীমসেন বলছেন:

মন্থামি কৌরবশতং সমরে ন কোপাদ্দুঃশাসনস্য রুধিরং ন পিবাম্যুরস্তঃ।
সঞ্চূর্ণয়ামি গদয়া ন সুযোধনোরূ সন্ধিং করোতু ভবতাং নৃপতিঃ পণেন।।

আমি সক্রোধে শত শত কৌরব সৈন্যকে যুদ্ধে মন্থন করব না? দুঃশাসনের বক্ষ থেকে রুধির পান করব না? গদা দিয়ে দুর্যোধনের উরু দুটো চূর্ণ করব না? তোমাদের রাজা মূল্য দিয়ে সন্ধি করুন গিয়ে। (২:১৭)

এখানে ভীমসেনের সারা জীবনের ক্ষত্রিয়োচিত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার সব ক'টি স্বপ্ন যুধিষ্ঠিরের অক্ষত্রিয়সুলভ ক্ষমাবৃত্তির ফলে ব্যর্থ হতে চলেছে, উত্তাল হয়ে উঠেছে বীরের হৃদয় চরম ব্যর্থতাবোধে, তাঁর অসহিষ্ণু ক্রোধের ও প্রতিহিংসার নগ্ন ও অত্যন্ত শক্তিশালী প্রকাশ এ শ্লোকে— এবং এই তীব্রতা শ্রোতা বা পাঠকের কাছে পৌঁছবার জন্যে কোনও অলংকারেরই প্রয়োজন হয়নি; কটি প্রশ্নই যথেষ্ট হল। অথবা অশ্বত্থামার সেই উক্তি:

যো যঃ শস্ত্রং বির্ভর্তি স্বভুজগুরুমদঃ পাণ্ডবীনাং চমূনাং
যো যঃ পাঞ্চালগোত্রে শিশুরধিকবয়া গর্ভশয্যাং গতো বা।
যো যস্তৎকর্মসাক্ষী চরতি ময়ি রণে যশ্চযশ্চ প্রতীপঃ
ক্রোধান্ধস্তস্য তস্য স্বয়মিহ জগতামন্তকস্যান্তকোহম্।।

নিজের বাহুবলের গর্বে অতিশয় গর্বিত পাণ্ডবপক্ষে যে যে অস্ত্রধারণ করছে, পাঞ্চালগোত্রে যে যে শিশু, বৃদ্ধ বা মাতৃগর্ভস্থও (ভ্রূণের আকারেও) আছে, আমার পিতার বধের যে যে সাক্ষী আছে, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করছি এখনও প্রতিযোদ্ধা যারা আছে— ক্রোধে অন্ধ আমি তাদের সকলের, এমনকী স্বয়ং মৃত্যুরও, (আজ) হত্যাকারী। (৩:৩২)

পিতৃবধের ক্ষোভে ও নিরুপায় যন্ত্রণায় উন্মত্ত অশ্বত্থামার প্রচণ্ড ক্রোধ ও বিধ্বংসী প্রতিহিংসার এই জ্বলন্ত প্রকাশের জন্যে কোনও অলংকারের প্রয়োজন হয়নি, রসোত্তীর্ণ অভিধাগত অর্থই পর্যাপ্ত মনে হয়েছে কবির।

প্রিয়জন প্রিয় হয় প্রিয়কাজ করে বলে নয়, এমনিই হয়। *উত্তরামচরিত*-এ দু'বার শুনি কথাটা:

অকিঞ্চিদপি কুর্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখানপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ।। (২:১৯, ৬:৫)

কিছু না করেই আনন্দ দিয়ে দুঃখ দূর করে; যে যার প্রিয়জন সে যে তার কী বস্তু।

সমস্ত কবিত্বটাই আছে ওই অনির্বচনীয় 'কিমপি দ্রব্যম্' এর মধ্যে। যে যার প্রিয়জন সে যে ঠিক তার কী তা উচ্চারণ করে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করে বলা যায় না— কবির অভিপ্রেত

ভাবের গাঢ়তা এরই মধ্যে বিধৃত। এমনই আর একটি উদাহরণ পাই ওই নাটকেই রামচন্দ্র যখন সীতাকে বনে বিসর্জন দিয়ে জনস্থানের অরণ্যে একাকী ভ্রমণ করছেন, তখন বাসন্তী তাঁর ক্ষত থেকে পুনর্বার যেন রক্তক্ষরণের ব্যবস্থা করলেন, বললেন:

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োযোরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরুনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব— শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ।।

'তুমি আমার প্রাণ, আমার দ্বিতীয় হৃদয়, চোখে আমার জ্যোৎস্না তুমি, অঙ্গে তুমি অমৃত,' এই সব শতশত প্রিয়কথা সেই মুগ্ধা মেয়েটিকে বলে, তাকেই বলা— 'থাক, আর বাকিটা বলে কীই বা হবে!' (৩:২৬)

শ্লোকটি সম্পূর্ণ নিরলংকার। স্বামীর মুখে নানা প্রিয়বাক্য শুনে শুনে সীতা মুগ্ধ প্রেমে সবই বিশ্বাস করেছিলেন। সেই সব কথা বলার পর সীতাকেই বিসর্জন দিয়েছেন। প্রতারিতা সখীর মর্মান্তিক দুঃখে বিহ্বল বাসন্তী বাক্যটি শেষ না করে অতল বিষাদ এবং ধিক্কৃতির সঙ্গে বাক্যের মাঝপথে থেমে গেলেন। সমস্ত গভীরতা ওই নিষ্ফল উচ্চারণের অর্ধসমাপ্ত বাক্যটির মধ্যে অঙ্কুশের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে রামচন্দ্রকে বিদ্ধ করল। এ কাজ কোনও অলংকার কি এত সার্থক ভাবে করতে পারত?

অথবা *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এর ষষ্ঠ অঙ্কে যখন ধীবরের কাছে সেই হারানো অঙ্গুরীটি পাওয়া গেল তখন দুষ্যন্ত বলছেন:

কথং নু তং বন্ধুরকোমলাঙ্গুলিং করং বিহায়িসি নিমগ্নমম্ভসি।
অচেতনং নাম গুণং ন লক্ষয়েন্ময়েব কস্মাদেবধীরিতা প্রিয়া।।

অঙ্গুরীটিকে ভর্ৎসনা করে দুষ্যন্ত বলছেন, 'সেই কোমল বন্ধুর অঙ্গুলিযুক্ত হাতটি চেড়ে দিয়ে তুমি কেন জলে পড়েছিলে? অথবা এ অচেতন বস্তু না হয় গুণ লক্ষ্য করতে পারেনি, আমিই বা কি করে প্রিয়াকে অবহেলা করেছি।' (৬:১৬)

এখানে বিনা অলংকারে দুষ্যন্তের আত্মধিক্কারের সমস্ত তীব্রতা সঞ্চারিত হচ্ছে শ্রোতার মনে, তাৎপর্যপূর্ণ দুটি শব্দের মাধ্যমে। প্রথমত, 'অচেতন', অর্থাৎ সোনার আংটি তো জড় পদার্থ, গুণগ্রাহী নয়, শকুন্তলার হাত ছেড়ে চলে গেছে; আমি তো সচেতন, আমি কী করে তার হাত ছেড়ে দিলাম? দ্বিতীয়ত 'প্রিয়া'; আংটির সঙ্গে আঙুলের তো অন্তরের সম্পর্ক নয়, কিন্তু সে তো আমার প্রিয়া ছিল, আমি তাকে ত্যাগ করলাম কী বলে?

উত্তররামচরিত-এর প্রথম অঙ্কে সুপ্ত সীতাকে কোলে নিয়ে রামচন্দ্র প্রেমভরে বলেছেন:

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়োরসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যস্তু বিরহঃ।।

এ (আমার) গৃহের লক্ষ্মী, চোখে অমৃতের অঞ্জনশলাকা, এই ওর স্পর্শ দেহে (যেন) গাঢ়

চন্দনরস, আমার কণ্ঠে এই বাহু এ (যেন) স্নিগ্ধশীতল মুক্তামালা; কী-ই না এর প্রিয়, শুধু বুঝি এর বিরহই অসহ্য। (১:৩৮)

আসন্ন বিরহের পূর্ব মুহূর্তে এ উক্তির নাটকীয় শ্লেষ বাদ দিলেও এই কবিতার প্রেমিক হৃদয়ের সদাজাগ্রত শঙ্কাটি যেন অকম্পিত অনলংকৃত চতুর্থ চরণে। প্রথম তিনটি অলংকৃত চরণের মুগ্ধ উচ্ছ্বাসের চেয়েও এই আবেগকম্প্র উক্তিটি রসে অনেক বেশি সমৃদ্ধ।

বিক্রমোর্বশীয়-এর চতুর্থ অঙ্ক বিরহের আর্তিতে মুখর কিন্তু তার আগে তৃতীয়ে ছোট একটি দৃশ্যে যেখানে রাজবধূ ঔশীনরী জানতে পেরেছেন স্বামী বিক্রম (পুরূরবা) উর্বশীর প্রেমে আচ্ছন্ন। এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় রাজাকে ছাদে ডেকে পাঠিয়ে বললেন:

দেবী। এষাহং দেবতামিথুনং রোহিণীমৃগলাঞ্ছনং সাক্ষীকৃত্যার্যপুত্রমনুপ্রসাদয়ামি, 'অদ্য প্রভৃতি যাং স্ত্রিয়মার্যপুত্রঃ প্রার্থয়তে যা চার্যপুত্রস্য সমাগমপ্রণয়িনী তয়া সহ ময়া প্রীতিবন্ধেন বর্তিতব্যমিতি।

বিদূষক। ভবতি! কিং তাদৃশস্তে প্রিয়স্তত্রভবান্?

দেবী। মূঢ়! অহং খলু আত্মনঃ সুখাবসানেনার্যপুত্রং নির্বৃতশরীরং কর্তুমিচ্ছমি। এতাবতা চিন্তয় তাবৎ প্রিয়ো ন বেতি।

(দেবী। এই আমি রোহিণী ও চন্দ্র এই দেবতাযুগলকে সাক্ষী রেখে আর্যপুত্রের প্রসন্নতা বিধান করছি, আজ থেকে যে নারীকে আর্যপুত্র কামনা করেন, যে নারী আর্যপুত্রের সঙ্গে মিলনে অভিলাষিণী সেই নারীর সঙ্গে আমি প্রীতির সম্পর্কে থাকব।

বিদূষক। দেবি! আর্যপুত্র কি তোমার তেমনই প্রিয়?

দেবী: মুর্খ! আমি আমর সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে আর্যপুত্রের জীবন জুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এতেই বোঝ, তিনি ততটা প্রিয় কিনা।)

যখন ঔশীনরী চিরমিলিত চন্দ্ররোহিণীকে (সাতাশটি নক্ষত্রবধূর মধ্যে রোহিণীই চন্দ্রের প্রিয়তমা) সাক্ষী রেখে প্রিয়কে প্রসন্ন করার ব্রত উদ্‌যাপন করেন চূড়ান্ত এবং মর্মান্তিক আত্মত্যাগের মধ্যে, তখন এই অনলংকৃত অতিশয়োক্তিরহিত কথা ক'টির মধ্যে ঔশীনরীর মর্মমূলে রক্তক্ষরণটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কতকগুলি ব্যঞ্জনায়। প্রথমত, চন্দ্র রোহিণীকে সাক্ষী রাখা, এই সে দিন পর্যন্ত এই দেবদম্পতি উপমান ছিলেন পুরূরবা ও ঔশীনরীরই প্রেমের; আজ সেই প্রেমের প্রতীককে সাক্ষী রেখে প্রেমিককে দান করছেন অন্য এক রমণীকে। এই চরম দানের হেতু কী? প্রেমের যা প্রাথমিক শর্ত: পুরূরবা যাকে কামনা করেন এবং পুরূরবার সঙ্গে মিলন যাঁর কাম্য; সেখানে ঔশীনরী যে নিতান্তই তৃতীয় ব্যক্তি, তাই সসম্মানে সরে যাওয়া ছাড়া তাঁর আজ গত্যন্তর নেই। বিদূষকের প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুব্ধ এই মহীয়সী নারী বলছেন: নিজের মর্মমূল উৎপাটন করে প্রেমিককে উপহার দিলাম যেন তিনি শান্তি পান, সার্থকতা লাভ করেন প্রেমে; এর জন্যে নিজেকে চিরবিচ্ছেদে নির্বাসিত করছি, আর তুমি প্রশ্ন করছ এঁকে ভালবাসি কিনা। কত সহজে সম্পূর্ণ স্বভাবোক্তির মধ্যে দিয়ে এই আত্মবলিদান রূপ পেল ভাষায়। অলংকার এখানে বাহুল্য হত, বাধা হত, ক্ষুণ্ণ করত এর ঋজু মহিমাকে।

কুমারসম্ভব-এ পার্বতী তপস্যা করছেন মহাদেবকে পাওয়ার জন্য; না থাকতে পেরে মহাদেব তরুণ ব্রহ্মচারীর বেশে তপোবনের দ্বারে উপস্থিত। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে পার্বতীর সখী পার্বতীর তপস্যার বিবরণ দিচ্ছেন; এক সময়ে বললেন:

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক্ব নীলকণ্ঠ! ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা।।

ত্রিযামা রজনীর শেষ যামে চোখ দুটি বুঁজে আসে, সহসা জেগে ওঠেন: 'কোথায় চললে, নীলকণ্ঠ?' এই কথা বলে অসত্য কণ্ঠে বাহুবন্ধন অর্পণ করেন। (৫·৫৭)

পার্বতীর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল তৃতীয় সর্গে, তখন মহাদেব হিমালয়ের সে অঞ্চল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান তপস্যার জন্যে।— এখন সমস্ত রাত জাগেন পার্বতী, তপস্যায় এবং বিরহে। ভোররাত্রে যখন দুটি চোখ বন্ধ হয় স্বপ্নে দেখেন মহাদেব তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে কোথায় চলে যাচ্ছেন। সেদিন বাধা দিতে পারেননি, এখন দু হাতের আলিঙ্গনে তাঁকে বাঁধতে চান, কিন্তু কোথায় নীলকণ্ঠ? এ তো স্বপ্ন শুধু। এই দ্বিতীয়বারের বঞ্চনার তীব্রতা এমন করে কি কোনও অলংকারে প্রকাশ পেত? পেলে কালিদাস অলংকারের আশ্রয় অবশ্যই নিতেন। ঠিক তেমনই ছদ্মবেশী শিবের মুখে অনেক শিবনিন্দা শোনার পর পার্বতী বললেন

অলং বিবাদেন যথাশ্রুতস্ত্বয়া তথাবিধস্তাবদশেষমস্তু সঃ।
মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে।।

'বিবাদ নিষ্ফল; তুমি যেমন শুনেছ, (শিবের বিষয়ে) সে সম্পূর্ণ সেই রকমই হোক, আমার মন এখানে ভাবে একরস, যে নিজের ইচ্ছেমত চলে সে নিন্দাকে গ্রাহ্য করে না।' (৫·৮২)

অর্থাৎ শিব নিন্দনীয় মেনেও যদি নিই, তাহলেও আমি আমার সংকল্পে অটল থাকব, কারণ, আমার মন এ ব্যাপারে প্রেমের ভাবে একরস। অর্থাৎ তুমি শিবের সম্বন্ধে আমার জুগুপ্সা উৎপাদনের চেষ্টা করছ কিন্তু সে-ও তো একটা রস, আমার মন প্রেমে এমনই পরিপূর্ণ যে দ্বিতীয় কোনও রসের স্থানই নেই সেখানে। পার্বতীর প্রেমের গভীরতা ঐকান্তিকতা এমন করে কি অলংকারের মধ্যে দিয়ে পৌঁছত আমাদের কাছে যেমন পৌঁছেছে ওই 'ভাবৈকরস' শব্দটি দিয়ে?

অমরুশতক-এ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক সম্পর্ক যখন আর অবশিষ্ট নেই, তখনকার একটি বর্ণনা হল,

কোপো যত্র ভ্রুকুটিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনং যত্রান্যোন্যস্মিতমনুনয়ো
দৃষ্টিপাতঃ প্রসাদঃ।
তস্য প্রেম্ণস্তদিদমধুনা বৈশসং পশ্য জাতং ত্বং পাদান্তে লুঠসি ন চ মে
মন্যুমোক্ষঃ খলায়াঃ।।

যেখানে ভ্রুকুটিই (ছিল) ক্রোধ, মৌন (ছিল) অত্যাচার, পরস্পরের প্রতি স্মিতহাস্যই (ছিল) অনুনয় এবং চোখের চাহনি (ছিল) প্রসাদ, সেই প্রেমের এখন (কী ভাবে) মৃত্যু হয়েছে

দেখ, তুমি আমার পদতলে লুণ্ঠিত, আর খলস্বভাবা আমার ক্রোধ এখনও যায় না।

অর্থাৎ যে দম্পতির মিলিত জীবনে মান-অভিমান মিলিয়ে যেত সামান্য একটু স্মিতহাস্য দৃষ্টিপাতে আজ তাদের মধ্যে প্রেম এমনই একান্ত বিলুপ্ত যে, স্বামী পদতলে লুণ্ঠিত তবু স্ত্রীর ক্রোধ যায় না। প্রেমের মৃত্যু জীবনে ঘটলেও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রায় দেখা যায় না, এখানে সেই গভীর প্রেমের নিষ্করুণ মৃত্যুর এমন দুর্লভ মর্মস্পর্শী চিত্রটি নির্মিত হয়েছে কোনও অলংকারের প্রয়োগ ব্যতিরেকেই। এই অতলান্ত হতাশা ও বিষাদ অলংকৃতবচনে এমন করে প্রকাশ পেত না।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এর সপ্তম অঙ্কে দুষ্যন্ত ও সর্বদমনের যখন দেখা হল তখন দুষ্যন্ত যদি বা সবেমাত্র জেনেছেন যে সর্বদমন তাঁর পুত্র, সর্বদমন কিন্তু জানে না আশ্রমে এই নবাগত ব্যক্তিটি কে; সে মাকে জিজ্ঞাসা করছে 'ক এষঃ?' শকুন্তলা উত্তর দিচ্ছেন 'বৎস তে ভাগধেয়ানি পৃচ্ছ— 'বাছা, তোমার ভাগ্যকে প্রশ্ন কর।' অর্থাৎ পঞ্চম অঙ্কে একদিন তিনি বড় আশা করে রাজসভায় দুষ্যন্তের স্ত্রী বলে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ্রূপে জর্জরিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, আজ সন্তানকে পিতৃপরিচয় নিজের মুখে জানাতে তাই সাহস পাচ্ছেন না। ভাগ্য তাঁর সঙ্গে চরম বঞ্চনা করেছিল সে আশঙ্কা এখনও যায়নি, তাই ছেলেকে বলছেন সে তার ভাগ্যকে প্রশ্ন করুক। শকুন্তলার মর্মান্তিক লাঞ্ছনা ও ক্ষোভ যেন উদ্বেল হয়ে উঠেছে ওই আপাত সংযত ছোট বাক্যটিতে। বাক্যটি নিরলংকার তা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত।

এমনই এক অবস্থায় সদ্য বনে বিসর্জিত সীতাকে লক্ষ্মণ যখন রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করলেন ফিরে রামচন্দ্রকে তিনি সীতার কাছ থেকে কী কথা জানাবেন তখন সীতা বলেন:

বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্।
মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য।।

আমার কথায় রাজাকে বোলো, তাঁর চোখের সামনে অগ্নিতে শুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছি যে-আমি, লোকের নিন্দায় আজ সেই-আমাকে যে তিনি ত্যাগ করছেন এ কি তাঁর বিদ্যা বা বংশের উপযুক্ত কাজ হল? (*রঘুবংশ* ১৪:৬১)

অপমানিতা চিরদুঃখিনী নিরপরাধা নারীর মর্মবেদনা এখানে তীক্ষ্ণ একটি প্রশ্নের উপরে কাঁপছে যেন। এ প্রশ্নের উত্তর নেই; সমস্ত বঞ্চিতার হয়ে এই নিদারুণ অনুযোগ অনুত্তরিত রইল চিরকাল ধরে। অলংকারে বিড়ম্বিত হত এই ঋজুভাষণের গৌরব। এত অপরাধেও রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর প্রেম অবিচল তাই বলছেন:

সাহং তপঃ সূর্যনিবিষ্টদৃষ্টিরূর্ধ্বং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেহিপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ।।

(বোলো রামচন্দ্রকে) আমি সন্তনজন্ম পর্যন্ত সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তপশ্চরণে যত্নবতী হব যেন পরের জন্মে তোমাকেই স্বামী পাই, আর বিচ্ছেদ যেন না হয়। (১৪:৬৬)

এখানে সমস্ত কাব্যটি রয়েছে ওই চতুর্থ চরণে— 'আর বিরহ যেন না হয়।' এ জন্মের সবচেয়ে সুখ পেয়েছেন বনবাসের বছর ক'টিতে। অদর্শনের, বিচ্ছেদের দুঃখের মধ্যেই ছিল লোকনিন্দার সূত্র, পরজন্মে যেন নিত্য মিলিত জীবন পান এই আর্ত প্রার্থনা, এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে ওই কঠিন তপস্যা— এ সবই যেন একটি সংবাদ দেওয়ার ভঙ্গিতেই বলা, অথচ সীতার সম্পূর্ণ মর্মপীড়া কত তীক্ষ্ণ ভাবেই না প্রকাশ পেল এই শ্লোকে। এ-কাজ অলংকারে এমন করে হত না।

মেঘদূত-এ পূর্বমেঘে অলংকারের প্রাচুর্য, উত্তরমেঘে পরিমিত হলেও সুপ্রযুক্ত অলংকাবে কাব্যে দীপ্তি এসেছে বহুবার। মেঘের কাছে যক্ষ তার স্ত্রীর বর্ণনা করে বলেছে, সেই স্বল্পভাষিণী মেয়েটিকে আমার দ্বিতীয় জীবন বলে জেনো, আজ আমি দূরে, সে যেন রাতের চক্রবাকীর মতোই একা। উৎকণ্ঠায় গুরুভার এই দিনগুলো যাচ্ছে, সে যেন হিমে মথিতশোভা পদ্মসরোবরের মতো বিবর্ণ।' (উত্তরমেঘ ২০) এখানে অনুপ্রাস উৎপ্রেক্ষার দ্বারা যক্ষবধূর বিরহক্লিষ্ট অবস্থাটি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। যক্ষ তার বধূর বিরহিণী রূপটিকে সৃষ্টি করছে: সে হিমে দলিত পদ্মফুলের মতো, অথবা ভোরের পুব আকাশে প্রতিপদের চন্দ্রকলার মতোই ক্ষীণ তনুদেহটি। সম্ভবত এ উপমার ওপরে বাল্মীকির প্রভাব আছে; অশোকবনে সীতার বর্ণনাতেও এ উপমানটি আছে। (৫:১৫:১৯) 'দর্শ শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্ররেখামিবামলাম্— শুক্লপক্ষের শুরুতে নির্মল চন্দ্রকলার মতো দেখলেন' (উত্তরমেঘ ২৬) বা, মেঘলা দিনের স্থলপদ্মনিব মতো— ঠিক জাগ্রতও নয় প্রসুপ্তও নয় (২৭); এ সব নানা উপমায় তার বিরহদীন মূর্তিটি ফুটে উঠেছে। কিন্তু যক্ষ যখন তার নিজের বিরহের বর্ণনা করছে তখন সে অলংকার ব্যবহার করছে না। একবার বলছে:

> শব্দাখেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
> কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।
> সোহতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃষ্ট-
> স্তামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ ।।

যে কথা সখীদের সামনে অনায়াসেই উচ্চারণ করে বলা চলত সে কথাও যে কানে কানে বলবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠত তোমার আনন স্পর্শ করার লোভে, সে-ই আজ শ্রবণপথের বাইরে অতিক্রান্ত, চোখে দেখারও বাইরে, (তাই) তার উৎকণ্ঠায় পদ রচনা করে আমার মুখে এই কথা বলে পাঠিয়েছে। (উত্তরমেঘ ৪০)

এখানে সমস্ত কবিতাটির প্রাণকেন্দ্র হল একটা বৈসাদৃশ্য— কাছাকাছি থেকেও আরও কাছে এসে প্রিয়ামুখের স্পর্শ পাওয়ার লোভে অতি সহজ কথাও যে-মানুষ কানেকানে বলতে চাইত, সে আজ এত দূরে যে সেখানে চোখের দৃষ্টি পৌঁছয় না, কথার শব্দ শোনা যায় না। এই দুস্তর ব্যবধান স্পর্শলোভী যক্ষের কাছে কত যে দুর্বিষহ তা ব্যক্ত করার জন্যে অলংকারকুশল কবি কোনও অলংকারই ব্যবহার করলেন না। যক্ষ বধূকে বলে পাঠাচ্ছে:

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্।
অস্ত্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ।।

ধাতুর রঙে শিলাখণ্ডের ওপরে প্রণয়কুপিতা তোমাকে এঁকে যখনই নিজে তোমার পায়ে পড়তে যাই তখনই চোখে জল ভরে এসে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়: নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্য সেখানেও আমাদের মিলন সহ্য করে না। (উত্তরমেঘ ৪২)

সম্পূর্ণ অনলংকৃত একটি বিবরণ। এক বিরহাতুর যক্ষ বিরহবিনোদনের জন্যে রামগিরি পর্বতের নানারঙা পাথর দিয়ে শিলাখণ্ডের ওপরে প্রিয়ার চিত্র আঁকে। কেমন প্রিয়া? প্রেমের কলহে কুপিতা। কুপিতা বলেই যেন সে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, তাকে কাছে পাচ্ছে না যক্ষ। তাই সে আলেখ্যগতা প্রিয়ার পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে মানভঞ্জন করতে উদ্যত হয়, যদি প্রিয়া প্রসন্ন হয়ে কাছে আসে। কিন্তু প্রিয়াকে প্রসন্ন করাই হয় না, সহসা দুচোখ জলে ভরে ওঠে, যেন নিষ্ঠুর দুর্নিয়তি চিত্রগতা প্রিয়ার সঙ্গেও তার মিলন সইতে পারে না; অভিশাপ যে বিচ্ছেদের। সমস্ত করুণ ভাবটি আছে একটা অসম্ভব চেষ্টার ব্যর্থতায়, যে চেষ্টার পিছনে আছে যক্ষের বিরহোন্মাদ। *মেঘদূত*-এ যেমন অনাড়ম্বর শব্দসম্ভার, তেমনই অতি সহজ অন্বয়, তেমনই অলংকারবিরল এর রচনা। এখন, এই পরিণততম বিরহকাব্য রচনার ঋতুকে কালিদাস রসের আরও গভীরে প্রবেশ করতে বলেই অলংকার এখন তাঁর কাছে পরিহার্য বহিরঙ্গ। তাই কাব্য রসের গভীরতায় পৌঁছতে পেরেছে বলেই তিনি বিশুদ্ধ স্বভাবোক্তির দ্বারাই বোদ্ধাকে রসলোকের গভীরে উত্তরণ করে দিতে পারেন।

রামায়ণে সীতাকে দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে বলায় তিনি বললেন:

মনসা কর্মণা বাচা যথা রামমভ্যর্চয়ে
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।

যদি মনে, কাজে ও কথায় রামকেই অর্চনা করে থাকি তো পৃথিবী আমাকে বিবরে (আশ্রয়) দান করুন। (৭.৯৭:২৫)

রামায়ণ-এ এইটি সীতার শেষ উক্তি, রামচন্দ্র, সমাজ এবং জীবনের ওপরে প্রগাঢ় ক্ষোভ ও অভিমান নিয়ে উচ্চারিত কথা কটি। কোনও অলংকারের প্রয়োজন হয়নি, স্বভাবোক্তিই যথেষ্ট হয়েছে, কারণ সীতার বেদনা নিজের তীব্রতাতেই রসোত্তীর্ণ।

যেখানে উপলব্ধির মধ্যে জটিলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব বা মিশ্র আবেগ থাকে, সেখানে আপাতসরল অনলংকৃত বাক্যে এগুলি আরও সার্থক ভাবে প্রকাশ পায়. *মহাভারত*-এ যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে সপ্তদ্বীপা বসুমতীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বর্ণনা বিশেষ করে শুনতে চাইলেন:

যদিদং ভারতংবর্ষং যত্রেদং মূর্ছিতং বলম্

যতত্রব্দ্ধাতিমাত্রলুব্ধোহয়ং পুত্রো দুর্যোধনো মম ।।
যত্র গৃদ্ধাঃ পাণ্ডুপুত্রা যত্র মে সজ্জতে মনঃ।

'এই যে ভারতবর্ষ, যেখানে বলের প্রকাশ যেখানে আমার পুত্র দুর্যোধন অতিমাত্র লুব্ধ, যেখানে পাণ্ডুপুত্ররাও লুব্ধ, যেখানে আমার মন আসক্ত।' (৬:১০:১, ২)

বল এবং লোভের নগ্ন প্রকাশ যে ভারতবর্ষে, নিজের পুত্রের মাত্রা-ছাড়ানো লোভ, তার সঙ্গে পাণ্ডুপুত্রদের লোভের সংঘাতে যেখানে আগামী কাল থেকে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ শুরু হবে। এই কদর্য, রিপুপ্রাবল্যের পরিবেশ সূচনা করে ধৃতরাষ্ট্র ঘৃণা বা নির্বেদের ভরে যদি বলতেন, 'এ দেশে বাঁচতে আর রুচি নেই', তাহলে প্রত্যাশিত সংবেদনে জাগা সহজ হত, কিন্তু ওই কদর্যতার নগ্ন রূপ বর্ণনা করেই ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমার মন এখানেই, এই হতভাগ্য দেশেই আসক্ত। এখানে পরস্পর-বিরুদ্ধ আবেগের যুগপৎ বা আনুপূর্বিক সমাবেশ থাকায় উপলব্ধির জটিলতা আছে, এবং এই আবেগের বিরোধের মধ্যে জীবনবোধের এক ঋদ্ধ প্রকাশ আছে। যে প্রকাশ অনলংকৃত বাগ্‌ভঙ্গিতে যত শক্তিশালী, অলংকারে ততটা হত না। *রামায়ণ*-এ এবং বিশেষ করে *মহাভারত*-এ আপাতবিরুদ্ধ আবেগের নিকট সমাবেশে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আবেগের সংঘাতে সমৃদ্ধতর এক কাব্য স্পষ্ট হয়েছে, যা পরবর্তী যুগে ক্রমেই বিরল হয়ে এসেছে। *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*-এ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলছেন:

'যাজ্ঞবল্ক্য, কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষোহতি— যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্ জ্যোতিতে পুরুষ জ্যোথিষ্মান্?'

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'আদিত্যজ্যোতিঃ— সূর্যের জ্যোতি।'

আর আদিত্য অস্ত গেলে?

'চন্দ্রমা।'

'চন্দ্রমা অস্তে গেলে?'

'অগ্নি।'

'অগ্নি নির্বাপিত হলে?'

'বাক।'

'বাক্ শান্ত হলে?'

'আত্মা।' (*বৃহদারণ্যকোপনিষৎ* ৪:৩:২-৬)

বাইরের সমস্ত জ্যোতি নির্বাপিত হলে মানুষের অন্তরাত্মাই জ্যোতিষ্ক হয়ে তাকে আলো দেখায়, সেই অন্তরাত্মার অনির্বাণ দীপ্তিই সর্বতমিস্রার অন্তিম প্রতীকার। এত বড় এবং এত জটিল উপলব্ধির কী সার্থক প্রকাশ ঘটল বিনা অলংকারে। উপলব্ধির গাঢ়তাতেই অলংকার নিষ্প্রয়োজন হয়ে উঠল।

স্বভাবোক্তি অলংকার কী না এ নিয়ে বিস্তার আলোচনা হয়েছে। কারণ একটিমাত্র, স্বভাবোক্তি বারবার অলংকৃত বাক্যকেও পরাস্ত করেছে নিজের মহিমায়। স্বভাবোক্তি মাত্রই শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়, কিন্তু এমন অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে, যেখানে স্বভাবোক্তির দীপ্তি অলংকৃত বাক্যে পাওয়া যেত না। *মৃচ্ছকটিক* নাটকে আশৈশবের সহচরী মদনিকা শর্বিলককে বিবাহ

করে বসন্তসেনাকে প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছেন: বসন্তসেনা তাকে তুলে বলছেন 'ইদানীং ত্বমেব বন্দনীয়া সংবৃত্তা/গচ্ছ ইদানীং, আরোহ প্রবহণং স্মরমাম্— এখন তুমিই হলে বন্দনীয়া, এখন যাও, গাড়িতে ওঠ গিয়ে, আমাকে স্মরণ কোরো।' নিতান্তই আটপৌরে বাগ্‌ভঙ্গি, কিন্তু এর মধ্যে বসন্তসেনার একটি প্রবল চাপা দীর্ঘশ্বাস রয়ে গেছে। নিষ্ক্রয়মূল্যে না হোক বসন্তসেনার দাক্ষিণ্যে মদনিকা আর গণিকা নয়, সে শর্বিলকের বধূ হয়ে গণিকাত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কুলনারীর মর্যাদা পেল, আর যার আনুকূল্যে এটা সম্ভব হল সেই বসন্তসেনা নিজে গণিকাই রয়ে গেলেন। এর সমস্ত বেদনা প্রকাশ পাচ্ছে ওই কাটাকাটা বাক্যবিন্যাসে, যেন নিজের নিষ্পরিণাম প্রেমের বেদনা এবং আসন্ন সখীবিচ্ছেদের দুঃখে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে, এ মুহূর্তে দীর্ঘ বাক্যবিন্যাস সম্ভব নয়। কোন অলংকার এ দুঃখের তীব্রতাকে এমন করে স্পর্শ করতে পারত? (তুলনীয় *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এর চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলাকে বিদায় দিতে হবে, এ দুঃখে পালকপিতা কণ্বের সেই বিখ্যাত শ্লোকটি: যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া।' সম্পূর্ণ নিরলংকার, শুধু স্বভাবোক্তি দিয়ে এ বর্ণনা এত শক্তিশালী হয়ে উঠল।) এখানে বিবক্ষিত বস্তুটির নিজেরই এমন ঐশ্বর্য আছে যে, অলংকার এখানে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটাত। সপ্তম অঙ্কে শকুন্তলার বর্ণনা 'বসনে পরিধূসরে বসানা' সে কি প্রথম অঙ্কের ন প্রভারলং জ্যোতি-র থেকে কাব্যমূল্যে কোন অংশে হীন? মনে পড়ে মম্মটের কথা— 'রসস্যৈব প্রাধান্যান্নালংকারঃ।'

তাহলে দেখছি সুকবি, যিনি তাঁর কাব্যের অন্যত্র অলংকার প্রয়োগে সিদ্ধহস্ততার বহু প্রমাণ দিয়েছেন তিনিও স্থানবিশেষে অলংকারকে বাহুল্য বা বাধা জ্ঞান করে পরিহার করেন। তাঁরা জানেন উপলব্ধির এমন জ্বলন্ত রূপও আছে, যা তার আপন তেজে অলংকারকে পরিহাস করে। এ বোধ যতক্ষণ কবিদের থাকে ততক্ষণই কাব্যে অলংকারের প্রয়োগ সুপরিমিত থাকে; না হলে মাঘ ও নৈষধের উদয় হয়। এই পরিমিতি বোধের মধ্যেই মহাকবি ও হীনকবির পার্থক্য এবং এ বোধ আসে অলংকারের পরিহার্যতার স্থানকালপাত্রের বোধ থেকে। সৎকবি বহু অলংকার সার্থক ভাবে প্রয়োগ করতে জেনেও প্রয়োজন মতো ক্ষেত্রে সে লোভ সংবরণ করতে জানেন। শুধু যখন অলংকার তাঁর উপলব্ধি প্রকাশের একমাত্র বাহন হতে পারে তখন, এবং ঠিক যতটুকু এবং যে অলংকার প্রয়োগ করলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তখন ততটুকু সেই অলংকার প্রয়োগ করেন। কিন্তু এরও একটা শর্ত আছে সৎকাব্যে, তা হল অলংকারপ্রয়োগের পূর্বেই কাব্যটিকে তার উপলব্ধির স্তরে খাঁটি ও সজীব হতে হবে, নইলে সেটা শবদেহে অলংকার বিন্যাসের মতো নিরর্থক প্রয়াস হবে। এর ভুরি ভুরি উদাহরণ সপ্তম শতাব্দী থেকে বহু কাব্যে-নাটকে পাওয়া যায়।

আলংকারিকরা কখনো অলংকারকে কাব্যের আত্মা বা প্রাণ বলে অত্যধিক মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেননি, করেছেন, মন্দ কবিযশঃপ্রার্থীরা। কাব্যে যাঁদের মূলধন নেই, অর্থাৎ জীবনবোধে কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, তাঁরাই এই বড় ফাঁকিটা ঢাকবার জন্যে অত্যধিক অলংকারপ্রয়োগে তৎপর হয়ে উঠেছেন। রসবোদ্ধা পাঠকের কাছে এই অধম কাব্য নিরতিশয় পীড়াদায়ক হয়

ওঠে। এই অন্তঃসারশূন্য অলংকারবহুল রচনা সপ্তম শতাব্দীতে খুব বাড়তে থাকে। বাণভট্ট *হর্ষচরিত*-এ বলছেন,

'প্রায়ঃ কুকবয়ো লোকে রাগাধিষ্ঠিতদৃষ্টয়ঃ।
কোকিলা ইব জায়ন্তে বাচালাঃ কামকারিণঃ।।
সন্তি শ্বান ইবাসংখ্যা জাতিভাজো গৃহে গৃহে।
উৎপাদকা ন বহবঃ কবয়ঃ।।'

অর্থাৎ, 'রিপুতে আরক্তদৃষ্টি কুকবিরা কোকিলের মতোই বাচাল এবং স্বেচ্ছাচারী। নামেই কবি অসংখ্য গৃহে গৃহে আছে যেমন থাকে কুকুর, এরা সৃষ্টি করতে পারে না।' (১:৫, ৬) এ ব্যাপার সর্বদেশে সর্বকালেই ঘটেছে কিন্তু তেমন সমালোচনা না থাকার ফলে মুড়িমিছড়ির একদর হয়ে গেছে প্রায়ই, তাই কালিদাসের কাব্যও মহাকাব্য আর মেণ্ঠের হয়গ্রীববধ কাব্যও মহাকাব্য। শুধু তাই নয় এদের মতো অনুপ্রাণিত কবিদের জন্য *কবিশিক্ষা* গ্রন্থ রচনা হয়েছে যাতে প্রেরণার অভাব এরা পূর্ণ করতে পারে পাণ্ডিত্যে ও কৌশলে। এমনকী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে দণ্ডীও একটু স্থান রেখেছেন এদের জন্যে।

কাব্যের নানা অবান্তর ভেদের মধ্যেও অকবির সৃষ্টির জন্যে আসন রাখা আছে— *গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য*, *চিত্রকাব্য* ইত্যাদি। অলংকারশাস্ত্রের উদাহরণে যে বহুল পরিমাণ কুরুচিপূর্ণ প্রেরণাহীন অলংকারসর্বস্ব শ্লোক ইতস্তত ছড়ানো আছে— এবং সৎকাব্য থেকে কম উদাহরণ আছে— তাতেই প্রতিপন্ন হয় কাব্যের সংজ্ঞা না হোক কাব্য সম্বন্ধে বোধটা স্থূল ও সংবেদনাবর্জিত হয়ে উঠেছিল। তথাকথিত সহৃদয় কাব্যে কবি খুঁজতেন কৌশল এবং ভট্টিকাব্যের কবি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে বললেন:

ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া।।

(এই *রাবণবধ* কাব্যটি) ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝতে হবে। এতে পণ্ডিতের উৎসব, যারা মেধাবী নয় তাদের আমি এ কাব্যে হনন করেছি আমার বিদ্বৎপ্রীতির জন্যে। (*রাবণবধ* ২২:৩৪)

সুবন্ধু শ্লাঘাসহকারে বললেন, প্রত্যক্ষরশ্লেষময় তাঁর কাব্য। অর্থাৎ পরবর্তী কবিরা আর উদ্দেশ্য ঘোষণা করার প্রয়োজন বোধ করলেন না, সরাসরি বহিরঙ্গপ্রধান কৌশলনির্ভর কাব্য রচনা করতে লাগলেন এবং শ্রোতারা বাহবা দিতে লাগলেন।

কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখি অলংকারশাস্ত্র কাব্যকে পাঠকের মনোরঞ্জনের অমঙ্গলনাশের, উপদেশের, যশের, অর্থের উপায়ই বলেছেন (কাব্যং যশসেহর্থকৃতে শিবেতরক্ষতয়ে/সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।)

অর্থাৎ অনেক অবান্তর ফলপ্রাপ্তির কথা বললেও এঁরা কখনওই বলবেন না কাব্য জীবনকে বুঝতে সাহায্য করে, এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল জীবনের পুনর্মূল্যায়ন। জীবনের গভীরতম সমস্যা ও সংঘাতের প্রতিফলন ও তার মাধ্যমে জীবনের মূল্যবোধের যাচাই করাই কাব্যের প্রাথমিক করণীয়— এই সংজ্ঞা নিরূপণ করলে কাব্য বিনোদনমাত্র না হয়ে উচ্চতর স্তরে আরোহণ

করতে পারত। বিয়োগান্তকে কাব্যে স্বীকার করা হয়নি— সংস্কৃত কাব্য ও অলংকারশাস্ত্রে এ এক চূড়ান্ত অভিশাপ। *রামায়ণ-মহাভারত*-এর মূল সুরটি এবং প্রকৃত উপসংহার এদের আদিমতম মহাকাব্যকলেবরে বিয়োগান্ত, *রঘুবংশ*ও অবক্ষয়ের গ্লানিতে মলিন, বিষণ্ণ, খণ্ডকাব্য; *মেঘদূত* বিরহের আর্তিতে করুণ। *উত্তররামচরিত*-এ ভবভূতি ছুঁয়ে গেছেন সে গভীরতাকে, উচ্চারণ করে বলেওছেন, 'একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাৎ পৃথক পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্— রস একটিই, করুণ, প্রয়োজন অনুসারে নানা পৃথক রূপে তা বিবর্তিত হয় মাত্র।'

আর একটি কারণ হল কাব্যের আপেক্ষিক মান নির্ণয়ের কোনও সুস্থ সমালোচনার ধারা সমাজে বা আলংকারিক মহলে প্রবর্তিত হয়নি। কাব্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে অংশত ও/বা সম্পূর্ণত উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার হত না। এ-ও অবক্ষয়ের একটি কারণ। হয়তো এ ধরনের মানদণ্ড সৃষ্ট হওয়া সহজ ছিল না— এতগুলি বিভিন্ন অলংকার প্রস্থানের প্রাদুর্ভাব ও প্রসারের জন্যও। অনেক পরে সংহতি প্রবর্তনের চেষ্টা দেখা যায় বিশ্বনাথ, মম্মটে, কিন্তু অলংকার ততদিনে শবব্যবচ্ছেদে পরিণত হয়েছে, কারণ, সংস্কৃত কাব্য ততদিনে নিষ্প্রাণ। কালিদাসের পরে যখন ভট্টি, ভারবি, মাঘ, নৈষধকার কাব্য রচনা করছেন তখনও, কালিদাস কেন ভাল, এঁরা কোথায় দীদনতর, কেন হীনতর তার কোনও সার্থক আলোচনাই হল না। একটা প্রমাণ, অধিকাংশ আলংকারিক উদাহরণ সংকলন করেছেন অর্বাচীন অ-কবিদের গ্রন্থ থেকে অথবা স্বরচিত অ-কাব্য থেকে; কালিদাস থেকে উদাহরণ শোকাবহরূপে কম। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে সামগ্রিক ও আপেক্ষিক মূল্যবিচারের যে ধারাটি চলিত ছিল তাতে প্রায়শই সুস্থ সাহিত্য অভ্যর্থনা পেত এবং অসৎকাব্য অসৎকাব্য বলেই বিবেচিত হত। বিশুদ্ধ ভঙ্গিবৈচিত্র্য ও অলংকারের প্রাচুর্যে কাব্যের কাব্যত্ব সেখানে কখনওই নির্ভর করেনি, বোধহায় রোম সাম্রাজ্যের আমলে যাকে ল্যাটিন সাহিত্যের 'রজত যুগ' বলে অভিহিত করা হয় সেই শ'দুই বছর বাদে। যে সব শ্লোক শুধুই অলংকার শাস্ত্রে দোষের বা অ-কাব্যের উদাহরণ হতে পারত তাই পরিবেশিত হল কাব্যের নানা আলোচনায় সাহিত্যের ভূমিকায়।

তৃতীয় একটি কারণ মনে হয় সাহিত্য লঘু প্রমোদের অঙ্গন ছেড়ে জীবনের অন্দর-মহলে বিশেষ প্রবেশ করল না, যেখানে জীবনের তাৎপর্য সার্থকতা উদ্দেশ্য নিয়ে বিচিন্তা বা অন্বেষণা। মনে পড়ে কীটসের কাব্য The Fall of Hyperion-এ কবি এসেছেন কাব্যলক্ষ্মী মনেটার মন্দিরে, মহৎকাব্য রচনার গূঢ় তত্ত্বটি জানতে। দেবী প্রথমে তাঁকে ধিক্কার দিলেন পরে ব্যক্ত করলেন কবিত্বের চরম রহস্যটি:

> 'None can usurp this height,' returned that shade
> But those to whom the miseries of this world
> Are miseries, and will not let them rest.

'(কবিত্বের) এই (দুরারোহ) শিখরে কেউ সহজে উত্তরণ করতে পারে না, পারে শুধু তারা এ জীবনের আর্তি যাদের কাছে আর্তিই এবং তাতে যারা অস্থির হয়ে ওঠে।'

এই মানদণ্ডের সাক্ষাৎ সংস্কৃত অলংকারের কোনও গ্রন্থে পাই না। মহৎ কাব্য যশ অর্থ আনন্দ ছাড়াও যে আরও কিছু দিতে পারে বলেই তা মহৎ কাব্য, জীবনের দুরূহ ও জটিল নৈতিক মূল্যবোধের, আবেগের, প্রত্যয়ের সংঘাতেও দিশারী হওয়াই যে মহৎ কাব্যের যথার্থ ভূমিকা এ বোধ না পাই অধিকাংশ অলংকারশাস্ত্রে, না পাই কালিদাসোত্তর কাব্যে।

কাব্যের অবক্ষয়ের চতুর্থ একটা ঐতিহাসিক কারণও আছে। দশম একাদশ শতক থেকে কথ্যভাষাগুলির অভ্যুত্থান ঘটল, এবং সজীব, জীবনজিজ্ঞাসার কাব্য কথ্যভাষাতেই রচিত হতে লাগল। ফলে সংস্কৃত মজা নদীর শুকনো খাত হয়ে পড়ে রইল, বহতা নদীর স্রোতেই কাব্যপিপাসুর তৃষ্ণা মিটতে লাগল। কবীরের দোঁহায় দেখি: 'বহতা পানী নির্মলা, বদ্ধা গন্ধিলা জায়— যে জলে স্রোত আছে তাই নির্মল, বদ্ধ জলার জল দুর্গন্ধ।' আবার দেখি 'সংস্কৃত কূপজল, কবীরা, ভাসা বহতা নীর— সংস্কৃত হল কুয়োর জল, কবীর, ভাষা হল বহতা জল।' জনসাধারণও বুঝতে পারছে সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যপ্রকাশের অবকাশ আছে, প্রাণের উপলব্ধি প্রকাশের পক্ষে তা অব্যবহার্য, সে-কাজের জন্যে আছে কথ্যভাষা। দ্বাদশ শতকের পর থেকে প্রথম ক্রমে ক্রমে রাজসভার ভাষা হিসেবে সংস্কৃত অপসারিত হল, বিজয়ীদের ফারসি ভাষাই রাজকার্যের বাহন হয়ে উঠল। রাজসভায় সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা আর রইল না রাজসভায়। এ ভাষা তখন মুষ্টিমেয়ের চিত্তবিনোদনের মাধ্যম; এই মুষ্টিমেয় তখন জমিদারদের ও দেশীয় রাজাদের সভাপণ্ডিত ও সভাসদগণ— এঁরা বিদ্বান কিন্তু রসবোদ্ধা নন। কাজেই কাব্যের কাছে এঁদের প্রত্যাশা পাণ্ডিত্যের, রসসিদ্ধির নয়। দেহের অবয়বের ভঙ্গি ও বিন্যাসেই ভরতনাট্যম্ ও মণিপুরী, ইত্যাদি নৃত্যশিল্পকৃতির সৃষ্টি হয়, আবার দেহাবয়বের ভিন্ন প্রকারের সঞ্চালন ও বিন্যাসে সার্কাসও হয়। একটি রসোত্তীর্ণ, মানুষকে অভিভূত তন্ময় করবার ক্ষমতা রাখে, অন্যটিতে বিস্ময় ও চমক আছে কাজেই তা বাহাদুরি দেখিয়ে বাহবা পায়। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা কাব্যে ভঙ্গিবৈচিত্র্য ও অলংকারপ্রাচুর্য খুঁজলাম, একশো চৌষট্টি রকমে বলতে পারলাম তোমার মুখ চন্দ্রের মতো বা পদ্মের মতো; কিন্তু এর জন্যে কোনও উপলব্ধির প্রয়োজনই হয় না, কাব্য বা অলংকারশাস্ত্র পড়া থাকলেই চলে। কাব্যে রূপ পেলাম, সৌন্দর্য বা রমণীয়তা পেলাম না। অথচ আমরাই বলেছি, 'তদেব রূপং রমণীয়তায়া মুহুর্মুহুর্যন্নবতামুপৈতি— যা মুহুর্মুহু নূতন হয়ে প্রতিভাত হয় তা-ই হল রমণীয়তার রূপ।' কোথায় সে মুহুর্মুহু নবীনতা? তা,কেবল অলংকারবৈচিত্র্যে মুখ পদ্মের মতো বলার শ' দেড়েক ভঙ্গি। এর মধ্যে কাব্য যে দেউলে হয়ে গেছে সে বোধটা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে কোনও অলংকারগ্রন্থে নেই।

পরোক্ষ ভাবে আছে। যখন দেখি ব্যঞ্জনাপ্রস্থান আক্রান্ত হচ্ছে, বিদ্রূপের লক্ষ্য হচ্ছে তখন বুঝি এ হল প্রাণবানের সম্বন্ধে মুমূর্ষুর ঈর্ষা। তবু বলব, বিস্ময়ের বস্তু হল এই যে, কাব্যে যখন প্রাণ অন্তর্হিত তখনও আলংকারিকরা কখনও বলেননি অলংকার কাব্যের প্রাণ। একেবারে প্রথম দিকের ভামহ বামন প্রভৃতিরা ছাড়া অলংকারকে তত প্রাধান্য পায় কেউই

দেননি (পরে অবশ্য রুষ্যক ও রুদ্রটও দিয়েছিলেন); সম্ভবত অলংকারের চর্চা দিয়েই কাব্যালোচনার সূত্রপাত বলেই এর নাম অলংকারশাস্ত্র। কিন্তু দুটি ব্যাপার প্রণিধানযোগ্য: একটি হল রস-ও ধ্বনি প্রস্থানের মতো সুস্থ, সার্বজনীন ও সূক্ষ্ম আলোচনাপ্রসূত দুটি প্রস্থান যখন এসেছেন তখনও কাব্যে কোনও নতুন প্রাণসঞ্চার হল না, ভঙ্গিবৈচিত্র্য এবং অলংকারবাহুল্যের মর্যাদা হ্রাস পেল না। দ্বিতীয়ত, কাব্যের কাব্যত্ব সম্বন্ধে যতগুলি প্রস্থান সৃষ্টি হয়েছে তখনও সবগুলিকে সংহত করে একটি সুস্থ সর্বাঙ্গীন মানদণ্ড নির্মিত হল না কাব্যে সম্পূর্ণাঙ্গতা বিচারের জন্যে। সম্ভবত সংস্কৃত ভাষা বহু পূর্বেই শুধু বিদগ্ধজনের পরিশীলিত ভাষা হয়ে যাওয়ায় এবং প্রাকৃত ভাষাগুলি অবহেলিত থাকায় এই মারাত্মক অভাবগুলি সাহিত্য সমালোচক সমাজে থেকেই গেল।

কারণ যাই হোক, ফলটা শোচনীয় হল। শুধু যে সৎ, সুস্থ, গভীর এবং রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হল অবিরত অলংকার চর্চায় ও প্রয়োগে তা-ই নায়, অসৎ অসুস্থ কাব্যও কাব্যপদবাচ্য হয়ে উঠল। যে বাণভট্টে সত্যকার সৃষ্টিপ্রতিভার স্বাক্ষর আছে, তাঁর কাব্যে বারেবারে তিনিও বিকৃতরুচি অলংকারপ্রিয় রসবোধহীন পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যে লেখনী ধারণ করতে দ্বিধা করলেন না। স্বয়ং বাণভট্টেরই যখন এই অবস্থা তখন অন্যে পরে কা কথা।

কাব্যের মানদণ্ড, উদ্দেশ্য, বিচার, লক্ষ্য সবই অবনমিত হল। সে তখন চিত্তবিনোদনের বস্তু হয়ে উঠল। সচেতন ভাবে মানবিক, আবেগের, নীতির, প্রত্যয়ের সব বাস্তব সমস্যাকে পরিহার করতে লাগল। একটি সৌন্দর্যের কল্পলোক সৃষ্টির প্রয়াসে কাব্য জীবনকে বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করল না। এই সৌন্দর্যের উৎস কোথায়? দেহের, বিশেষত নারীদেহের এবং নিসর্গের বর্ণনার দ্বারা, ভোগবিলাসের নানা বর্ণনার দ্বারা অবাস্তব একটি কল্পলোক সৃষ্টি করে তার উপাদানকে নানা ভাবে বিন্যস্ত করে কাব্য নির্মাণ করতে লাগল। সমস্যা যেটা দেখা দিল তা হল: নিসর্গই হোক নারীদেহই হোক সবই বহুপরিচিত, তার দ্বারা নতুন কিছু— আপাত ভাবেও উপস্থাপিত করা খুবই কঠিন। কবিরা এ সমস্যার সমাধান করলেন অভিনব এক পন্থায়: পরিচিত বিষয়কে অপরিচিত ভঙ্গিতে পরিবেশন করে। এই ভঙ্গি হল মুখ্যত অলংকারবৈচিত্র্য। তাই দেখি সাহিত্যে ও অলংকারশাস্ত্রে অলংকারের প্রকারভেদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। অনুচ্চারিত হলেও সকলেই স্বীকার করছেন রসসৃষ্টির দেবদুর্লভ শক্তি আর নেই। সেই সর্বস্বান্ত অবস্থাকে ঢাকা দেওয়ার কাজে ডাক পড়ল অলংকারের। প্রবল ঘটা করে এল ভঙ্গিবৈচিত্র্য, এল অসংখ্য অলংকার। যা সৃষ্টি হল তাতে চমক প্রচুর, নেই শুধু উপলব্ধি, নেই প্রেরণা, জীবন সম্বন্ধে কোনও নতুন বোধ, প্রকৃতপক্ষে যা হল কাব্যের প্রাণ। দীর্ঘায়ত বর্ণনা, যত তার ঘটা তত ছটা, কিন্তু প্রকৃতি বর্ণনাই হোক আর রূপ বর্ণনাই হোক, যুদ্ধ বর্ণনাই হোক আর সূর্যাস্ত বর্ণনাই হোক— যতক্ষণ না তার প্রাণকেন্দ্রে থাকছে কোনও যথার্থ উপলব্ধি ততক্ষণ তা নিতান্তই বহিরঙ্গ। ওই যে মম্মট বললেন, 'উপকুর্বন্তি তং সন্তং', সেইখানেই ঠেকে গেল এই অবক্ষয়ধর্মী সাহিত্য রস। সার্থক কোনও উপলব্ধি, জীবনকে

দেখার নতুন কোনও দৃষ্টিকোণ যখন নেই, অর্থাৎ অঙ্গী যখন নেই তখন কার অঙ্গদ্বারেণ আসবে অলংকার? বিশ্বনাথের কথাও তো তাই ছিল 'শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ। রসাদীনুপকুর্বন্তোহলংকদ্ধারাস্তোহঙ্গদাদয়ঃ ॥' শব্দার্থময় কাব্যের শোভাবৃদ্ধিকারী 'অস্থির' যে ধর্মগুলি রসাদির উপকার করে। ক্রমে অস্থির ধর্ম শুধু যে স্থির হয়ে উঠল তাই নয় রসাদির অবর্তমানে তার উপকার করার প্রশ্ন যখন আর নেই তখন অলংকারই রসের স্থানে অভিষিক্ত হয়ে রাজত্ব করতে লাগল।

পরিশেষে একটি কথা: বর্ণনা— তা সে যত অলংকারবহুল যত মনোরমই হোক না কেন— কখনও মহৎ সাহিত্যের প্রধান উপাদান হয়ে উঠতে পারে না। মহৎ সাহিত্যের ভিত্তিই হল জীবনবোধ এবং তার প্রকাশে অলংকার থাকলেও তার উপলব্ধিগত জটিলতাও থাকবে; নিঃশেষ অর্থ পাওয়া যায় না। যেমন:

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং,
তত্ত্বে পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে। (*বৃহদারণ্যকোপনিষৎ* (৫:১৫:১)

এর অর্থ করা হয়: সোনার পাথর দিয়ে সত্যের মুখ ঢাকা আছে, পূষন্ সেই ঢাকা তোমার জন্যে খুলে দিন সত্যধর্ম দেখবার জন্যে। বলা বাহুল্য, অভিধাগত অর্থ ও অলংকার বুঝলেও এ কাব্য সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। কারণ এখানে কবির উপলব্ধির মধ্যেই দুরূহতা আছে, যা ভাবগতও নয় আবার সম্পূর্রত চিন্তাপ্রসূতও নয়, যে, কোনও দর্শন প্রস্থানের শরণাপন্ন হলে সুরাহা হবে। তাতে দার্শনিক ব্যাখ্যা মিলবে ঠিকই কিন্তু কবির উপলব্ধিটির যথার্থ পরিচয় মিলবে না। কিংবা অথর্ববেদের সেই, 'দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি— দেবতার কাব্যটি দেখ, তা মরেও না জীর্ণও হয় না'— এটা বললে কি পূর্ণ উপলব্ধিটি হৃদয়ঙ্গম করা যায়? 'দেবতার কাব্য' কি অলংকার না অভিধাগত অর্থেই বুঝতে হবে। অথবা 'যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ।' এর অর্থের জন্যে দেড় হাজার বছর পরের এক বিশিষ্ট দার্শনিক প্রস্থানের প্রবক্তা শংকরাচার্যের ওপরে ভার দিলে স্বভাবতই একটি প্রস্থানগত ব্যাখ্যাই মিলবে এবং সেটি কবির অভিপ্রেত অর্থ হবে না তা বলাই বাহুল্য। তার পরিবর্তে যদি এ কাব্যাংশটিকে কবির উপলব্ধিরূপেই গ্রহণ করি তাহলে লক্ষ্য করব আপাতবিরোধী (অমৃত/মৃত্যু) অনুভবের জটিলতাতে ও অন্তর্দ্বন্দ্বের গাঢ়তাতে এ-কাব্য সমৃদ্ধ। তেমনই:

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ (কঠোপনিষৎ ২:৩:৩)

এর মধ্যে মহাজাগতিক যে পরিবেশটি সৃষ্ট হয়েছে তার মধ্যে সক্রিয় উপাদান হল ভয়— একে কি আক্ষরিক অর্থে নিলে কোনও অর্থ পাওয়া যায়? তার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, সূর্য তাপ দেয়, ভয়ে ইন্দ্র চন্দ্র ও মৃত্যু ধাবিত হয়। এতে অলংকার নেই, না, সমাসোক্তিতেও এর অর্থ নিহিত নেই, এ কাব্য অলংকারকে অতিক্রম করে কাব্য হয়ে উঠেছে উপলব্ধির গভীরতায়। অথবা যখন শুনি:

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমো বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্ববিদং বিভাতি।। (কঠোপনিষৎ ২:২:১৫)

অর্থ, সেখানে সূর্য আলো দেয় না, বিদ্যুৎ দেয় না, এই অগ্নিই বা কোথায়? দীপ্যমান তার দীপ্তি অবলম্বনে অন্য সব কিছু দীপ্তি দেয়, তার উজ্জলতাতেই এই সব কিছু উজ্জ্বল। এখানে কোনও অলংকার নেই, কাব্যটি নির্ভর করছে উপলব্ধির মহিমার ওপরে। এখানেও সেই 'রসস্যৈব প্রাধান্যন্নালংকারঃ।' কাব্য যে অলংকারকে ছাড়াই সম্পূর্ণ রসের মহিমাতেই অনবদ্য হয়ে উঠতে পারে আনন্দবর্ধন ও জগন্নাথ ছাড়া এ কথা স্পষ্ট করে কেউই বলেননি। এবং দুঃখের বিষয় এঁদের কোনও সার্থক প্রভাব কবিদের ওপরে বা আলংকারিকদের ওপরে পড়ল না। অলংকারের প্রাধান্য ঘুচল না বরং ক্রমে ক্রমে অলংকারই হয়ে উঠল সর্বেসর্বা। উপরের শ্লোকটিতে যে নিরলংকার উক্তি তাকে স্বভাবোক্তি নাম দিলেও হয়তো ঠিক হয় না কারণ, এর অর্থ অভিধায় ধরা পড়ে না। ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ রসের গৌরবেই এর গৌরব সম্যক্ অনুভূত হয়। যে অনুভবের মধ্যে বিচিত্র অঙ্গ অনুভব আনাগোনা করে তা ওই অঙ্গী ও অঙ্গরসের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে মিশ্র জটিল এক উপলব্ধির রসায়নে পরিণত হয় এবং এইখানেই তার ঐশ্বর্য অর্জুনের রথে শিখণ্ডীকে দেখে ভীষ্ম যখন অস্ত্রত্যাগ করেন, তখন, 'গ্রীষ্মসন্তপ্ত মানুষ যেমন করে প্রথম বর্ষণের জলধারার প্রতীক্ষা করে তেমনই করেই ভীষ্ম শিখণ্ডীর শণধারা গ্রহণ করলেন।'

উষ্ণার্তো হি নরো যদ্বজ্জলধারাঃ প্রতীচ্ছতি।
তথা জগ্রাহ গাঙ্গেয়ঃ শরধারাঃ শিখাণ্ডিনঃ।। (৬:১২৭:২৩, ২৪)

উপমায় এর সবটুকু সৌন্দর্য নিহিত নেই, ব্যঞ্জনার দ্বারা জীবনের তাপে তপ্ত বৃদ্ধের মৃত্যুর মধ্যে মুক্তির প্রতীক্ষা ধ্বনিত হচ্ছে। সমস্ত দৃশ্যটির অন্তর্নিহিত গ্লানি ও ধিক্কার এবং মৃত্যুর মধ্যে এই পঙ্কিল জীবনকে ধুয়ে শুচি হয়ে চলে যাওয়ার, গ্লানিবর্জিত জীবনের স্বস্তি ফিরে পাওয়ার ব্যঞ্জনা— এর কাব্যমূল্য উপমানির্ভর নয়। যদিও এ উপমাটি নিরতিশয় সার্থক।

তবু বলব একেবারে তুঙ্গে পৌঁছে কবিতা নিরলংকারই হয়। পার্বতী যখন বলেন 'মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং', বা *কিং লীয়ার* নাটকের শেষে এডগার যখন বলে

The oldest have borne most; we that are young
Shall never see so much nor live so long.

তখন এই সম্পূর্ণ নিরলংকার বচনের মধ্যে উপলব্ধির যে গাঢ়তা তা কোনও অলংকৃত ভাষণে ধরা পড়ত না। সীতার জীবনের সমস্ত ক্ষুব্ধ বেদনা বঞ্চনা ও অভিমান যেমন প্রকাশ পেল এই শ্লোকে:

মনসা কর্মণা বাচা যথা রামভ্যর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।। (৭:৯৭:১৫)

ঠিক এই মুহূর্তে সীতার অন্তর্দাহ এত গভীর যে অলংকারের প্রয়োগটি রসসঞ্চারে বিঘ্ন ঘটাত। একটি স্তরে গিয়ে অলংকার প্রয়োগের নিপুণ কবিও বলেন, 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অহংকার'; একটি স্তরে কাব্য তার সোনার আবরণ উন্মোচন করে নিরঞ্জন উপলব্ধির সত্যের মহিমাতেই সহৃদয়চিত্তকে অভিভূত করে।

চুনি, পান্না, নীলা সবই হীরের জাত, নানা বর্ণের ছটায় সুন্দর তারা, কিন্তু হীরেই সবচেয়ে দামি। বৈজ্ঞানিক বলেন, যে প্রচণ্ড তাপ ও চাপে হীরে তৈরি হয়, এই মণিগুলির জন্যে ততটা প্রয়োজন হয় না। কবির উপলব্ধিতে যখন সেই তীব্রতা সেই প্রাবল্য থাকে, যার ফলে তার জীবনজিজ্ঞাসা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, কঠিন বেদনার ঘনীভূত চাপ ও তাপে কাব্য তখন নিরঞ্জন মহিমায় কমলহীরে হয়ে ওঠে। এবং এ স্তরের জীবনজিজ্ঞাসায় বেদনার উপলব্ধি কোথাও না কোথাও অন্তর্নিহিত থাকেই (Our sweetest songs are those that tell of saddest thought)। আমরাও ত বলেছি মাথুরেই পদকর্তার শক্তির শেষ স্বাক্ষর। সংস্কৃত কাব্যনাটক দুঃখান্ত পরিণতিকে বর্জন করে, জীবনজিজ্ঞাসাই যে মহৎকাব্যের অন্তিম অন্বেষা এ কথা কোথাও না স্বীকার করে কাব্যে জীবনের গভীরতম প্রকাশের অবকাশ অনেকটাই রোধ করেছে। ক্ষতিপূরণ করতে এসেছে অলংকার তার বিচিত্র চমক নিয়ে, কিন্তু কমলহীরের দ্যুতি সে পাবে কোথায়?

সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্লীলতা

সাহিত্যে সুরুচি, সুনীতি, ইত্যাদি সম্বন্ধে একান্ত ঔদাসীন্য যেমন অস্বাস্থ্যকর তেমনিই এ সব নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তাও অসুস্থ মনের লক্ষণ। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া একেবারেই অসম্ভব। দেশে এবং কালে শ্লীলতার সীমারেখা সংকুচিত ও প্রসারিত হতে থাকে। শরীর ও সম্ভোগের বর্ণনার অত্যধিক বাহুল্য ঘটলে সমাজের স্বাভাবিক সুরুচি যেমন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, তেমনই ওই প্রসঙ্গে অস্বাভাবিক কুণ্ঠা ও দ্বিধা থাকলে সাহিত্য সে কুণ্ঠাকে আঘাত করে তার সহজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। হয়তো এই ভাবেই শালীনতার একটা সীমা সাহিত্যে অনুক্ত ভাবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোনও সাহিত্য 'অশ্লীল' কিনা তার বিচারের মানদণ্ড কি দিয়ে নিরূপিত হবে। এর উত্তরে 'অশ্লীল' শব্দটির ইতিহাস সন্ধান করা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আর্যরা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে যখন মগধের কাছাকাছি আসে তার পরে কথ্য মাগধী ভাষার প্রভাব পড়ে বৈদিক সংস্কৃতে। সংস্কৃতে যেটা 'র', মাগধী প্রাকৃতে সেটা 'ল'; কাজেই বৈদিক 'শ্রীর' শব্দ মাগধী-প্রভাবিত 'শ্লীল' শব্দে পরিণত হল। 'শ্রীর' মানে শ্রীযুক্ত; কাজেই শ্লীলতা বিচারে মূল নিরিখ ছিল সৌন্দর্য। শিল্পে যা সৌন্দর্যের পরিপন্থী তা-ই অশ্লীল। পরিশীলিত মনের পাঠকের রসবোধে যা ব্যাঘাত জন্মায় তাই অশ্লীল।

আবার প্রশ্ন আসছে, কী ধরনের পাঠকের রুচির উপরে এত বড় দায়িত্ব ন্যস্ত করা চলে। তাছাড়া, শুধু পাঠকই কি শ্লীলতা নিরুপণে চূড়ান্ত অধিকারী? এ ব্যাপারে লেখকেরই কি প্রাথমিক দায়িত্ব নয়? বোধহয় এই দুটো মানদণ্ড যুগপৎ প্রয়োগ করলে বিচার অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। অর্থাৎ, কোনও রচনায় লেখকের উদ্দেশ্যই যদি হয় নগ্ন বর্ণনার দ্বারা সুরুচিকে আঘাত করা, এবং সে রচনা পড়ে স্বভাবত বাস্তবভীরু নয় এমন মার্জিতরুচি পাঠকের মন যদি রসগ্রহণে বাধা পায় তবে তাকে অশ্লীল বলতে বাধা থাকে না।

এদিক থেকে সাহিত্যকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথম, যে সাহিত্যে চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে শিল্পীর বিবক্ষিত বিষয় পরিস্ফুট হয় এবং এর জন্যে দেহবর্ণনাকে মোটের উপর গৌণ করে সম্পূর্ণ নেপথ্যে রাখা হয়; দ্বিতীয়, যে সাহিত্যে মন মুখ্য হলেও মনেরই গতি, বৈচিত্র্য, সংঘাত ও পরিণতি রূপায়িত করার প্রয়োজনে দেহবর্ণনাকে যথাস্থানে ও যথাপরিমাণে উপস্থাপিত করা হয়; তৃতীয়, যে সাহিত্য প্রাথমিক

ভাবে শরীরের ও সম্ভোগের বিচিত্র ও অনাবৃত বর্ণনাতেই নিয়োজিত। এই তৃতীয় শ্রেণীর রচনাই বাস্তবিক পক্ষে অশ্লীল এবং এ বিচারের নিরিখ হবে লেখকের উদ্দেশ্য ও পাঠকের উপলব্ধি, অর্থাৎ, রচনার সাধনা ও সিদ্ধি।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য শুধু বাস্তবের যথাযথ বা অকুণ্ঠ বর্ণনা নয়, জীবনের মূল্যমান সম্বন্ধে মানুষের বোধকে উন্নততর, সমৃদ্ধতর করাই সাহিত্যের মূল কৃত্য। এর জন্যে— এবং কেবলমাত্র এর জন্যেই— যদি শরীর বা শারীরিক বিষয় বর্ণনার প্রয়োজন হয় তবে সাহিত্য অবশ্যই তাকে স্বীকার করবে এবং সে সাহিত্য যে কোনও মার্জিত রুচির নিরিখে উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু যখন এ জাতীয় বর্ণনাই মুখ্য হয়ে ওঠে অথবা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বা অযথা দেখা দেয়, তখন তা সৎসাহিত্যরসিকের সুরুচি বা 'শ্রী'র সীমা লঙ্ঘন করেছে বলেই অশ্লীল।

সংস্কৃত সাহিত্যে *রামায়ণ*, *মহাভারত* প্রথম পর্যায়ের রচনা। দেহের সাধারণ সৌন্দর্য বর্ণনার বাইরে খুঁটিয়ে কোনও অবয়ব বা অবস্থা বর্রনা করার অবকাশ মহাকাব্যের বৃহৎ গতিশীল পরিসরে থাকে না। তাই পৃথিবীর সকল মহাকাব্যই এই অর্থে দেহ সম্পর্কে উদাসীন। একটা যুগের গণমানসের বিরাট আশা, আকাঙ্ক্ষা, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি যে রচনার উপজীব্য, কোনও বিশেষ চরিত্রের শরীরের খুঁটিনাটি বা সম্ভোগের নিপুণ বর্ণনায় কালক্ষেপ করবার অবকাশ তার থাকে না।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকাংশ শিল্পী— ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস, অমরু, শূদ্রক, বাণভট্ট, ভবভূতি এঁদের রচনায় মুখ্যত চরিত্রগুলির বিকাশ উদ্‌ঘাটিত করবার প্রয়োজনেই দেহ ও সম্ভোগের বর্ণনা করা হয়েছে। কালিদাসের *কুমারসম্ভব*-এ পার্বতীর আপাদমস্তক বর্ণনা করা হয়েছে, সে বর্ণনায় পাঠকের সৌন্দর্যবোধ পরিতৃপ্ত হচ্ছে, কামনার উন্মেষ ঘটছে না। *মেঘদূত*-এর যক্ষবধূ ও *রঘুবংশ*-এর সীতার রূপবর্ণনা এবং সন্তানসম্ভবা সুদক্ষিণা ও ইন্দুমতীর দেহবর্ণনাও এই শ্রেণির। বর্ণনাগুলি প্রাসঙ্গিক, কাব্যের নিজস্ব প্রয়োজনসিদ্ধির— অর্থাৎ চরিত্রচিত্রণ ও রসসঞ্চারের প্রয়োজনে এগুলির সৃষ্টি, এবং এইসব অংশে কাব্যের মূলরস পুষ্ট হচ্ছে। তাই কোথাও অসুস্থ সংকেতের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। চরিত্রবিকাশ বা রসসৃষ্টির প্রয়োজনের সঙ্গে এ অংশগুলির একটা প্রসঙ্গ ও পরিমাণগত সামঞ্জস্য আছে (কবির সুরুচিতেই সে পরিমিতিবোধ স্পষ্ট থাকে), তাই অস্থানে প্রযুক্ত হয়ে এ সব বর্ণনা রসহানি ঘটায়নি। *কুমারসম্ভব* অষ্টমসর্গে জগৎপিতা ও জগন্মাতা রূপে বন্দিত দেবদম্পতির সম্ভোগবর্ণনায় যে কুরুচি আছে তার কারণ খুব সম্ভব সপ্তম সর্গের পরবর্তী সর্গগুলি প্রক্ষিপ্ত, কালিদাসের রচনা নয়।

কিন্তু কালিদাসোত্তর সাহিত্যে এ জাতীয় উদাহরণ বিস্তর পাওয়া যায়। ভারবির *কিরাতার্জুনীয়* মহাকাব্যের উপজীব্য হল তপস্যার দ্বারা অর্জুনের দিব্যাস্ত্রলাভের চেষ্টা, তপস্যার অন্তে মহাদেব, কার্তিকেয় ও তাঁদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ ও অবশেষে মহাদেবের প্রসাদে পাশুপতাস্ত্রলাভ। এ কাহিনিতে রস হল বীররস। কিন্তু অলংকারশাস্ত্রে বলা আছে, অঙ্গীরস

অর্থাৎ মূলরস যদি বীররস হয় তবে অঙ্গরস হবে শৃঙ্গার বা হাস্য। মহাকাব্যে অঙ্গরস সঞ্চারের দায় এসেছে ততটা সাহিত্যের নিজস্ব প্রেরণায় নয়, যতটা অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশে। অতএব অঙ্গরসরূপে শৃঙ্গাররসের অবতারণা করতে হবে। কোথায়? তপস্যারত বা যুদ্ধোদ্যত অর্জুনের পক্ষে সম্ভোগে প্রবৃত হওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে, কাজেই অঙ্গরসের অনুরোধে গান্ধর্ব অপ্সরা ও ষড়্‌ঋতুকে নায়ক-নায়িকা রূপে আনা হল এবং চার সর্গ ধরে তাদের বিলাসের বর্ণনা চলল। এ বর্ণনায় কবি যতই শিল্পকৌশলের পরিচয় দিন না কেন মূল কাহিনির সঙ্গে আন্তরিক সংযোগে এ অংশ অসম্পৃক্ত বলে এতে পাঠকের রুচিকে পীড়িত করে। চরিত্রের বিকাশের জন্য এলে যা সহজ ভাবে কাহিনির মধ্যে অনুসৃত হতে পারত, তাকে শুধুই বহিরঙ্গের নির্দেশ পালনের জন্য আনতে হল বলে সাহিত্যের কোনও সত্য প্রেরণা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাই এ বর্ণনা অশ্লীল, 'শ্রী' ও সুরুচির সঙ্গে এর বিরোধ।

মাঘের *শিশুপালবধ*-এ এ ব্যাপার আরও বেশি প্রকট। যুধিষ্ঠিরের অভিষেক সভায় প্রধান অতিথির সম্মানের জন্যে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী। এ কাহিনিও বীররসাশ্রিত। নিজস্ব ধর্মে এখানেও শৃঙ্গাররসের কোনও অবকাশ নেই, কারণ মূল কাহিনিকে শৃঙ্গাররস সত্যিই কোনও ভাবে স্পর্শই করতে পারে না। তবু অলংকার শাস্ত্রকারদের নির্দেশে অঙ্গরসের অবতারণা করতে হয়েছে, তাই সপ্তম সর্গে সম্ভোগবর্ণনা, অষ্টমে জলবিহার বর্ণনা, নবমে চন্দ্রালোকবিহার, দশমে মধুপানোৎসব ও একাদশে প্রভাতকালীন সম্ভোগবর্ণনা— এই সমস্ত অংশটি মূলকাহিনির পরিপ্রেক্ষিতে একান্তই প্রক্ষিপ্ত। এখানে পাত্র-পাত্রী সকলেই এই কটি সর্গের জন্যেই সৃষ্ট ও তার পরে পরিত্যক্ত। কাব্যের নিজের প্রয়োজনে এ অংশটি রচিত নয়, কেবলমাত্র অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশেই এর সৃষ্টি এবং তৎকালীন পাঠকসমাজের রুচির তাগিদেই। তাই কাব্যপাঠের সময়ে এই সমস্ত শৃঙ্গার পরিক্রমাটি রুচিকে পীড়া দেয়। নগ্ন বর্ণনা— তাতে যত কলাকৌশলই থাক না কেন— যখন দীর্ঘ পাঁচ সর্গ ধরে সম্পূর্ণ অকারণে চলতে থাকে, তখন কৃত্রিম ভাবে প্রাধান্য লাভ করার চেষ্টার অপরাধে কাব্যবিচারে সেটাকে অশ্লীল বলে স্বীকার করতেই হয়; কারণ কাব্যে তার কোনও যথার্থ সার্থকতা নেই। এ অংশে শৃঙ্গাররস পরিবেশন করে কাব্যটি পাঠকের এমন বৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন করেছে যা কাব্যরস উপভোগের দ্বারা চরিতার্থ হয় না। কাব্যে এ অংশে পাঠকের যে সাহিত্যসম্মত প্রত্যাশা বা উপলব্ধি তার মধ্যে শিল্পগত সত্য বা 'শ্রী' নেই, তাই এ অংশ অশ্লীল। পরবর্তীকালে তথাকথিত মহাকাব্যে দেহবর্ণনা কাব্যের দীর্ঘ অংশ জুড়ে মুখ্য বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমনি কুরুচির নজির মেলে *হরবিজয়* কাব্যের দ্বাদশ থেকে অষ্টাবিংশ সর্গে, *কপ্‌ফ্‌ণাভ্যুদয়* কাব্যের অষ্টম থেকে পঞ্চদশে, *দ্ব্যাশ্রয়* কাব্যের সপ্তমে অথবা *কুমারপালচরিত*-এর চতুর্থে এবং বিল্‌হণের *চৌরসুরত-পঞ্চাশিকা* জুড়ে; যদিও তাতে কোথাও কোথাও সত্যকার রসও দেখা দিয়েছে।

কিন্তু বোধহয় এ জাতীয় কুরুচির প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় *নৈষধচরিত*-এর দ্বিতীয়, সপ্তম, ষোড়শ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ সর্গে। নলদময়ন্তী কাহিনির যে অংশটুকু শ্রীহর্ষের

উপজীব্য, মহাভারতে সেটা দুশোরও কম শ্লোকে বর্ণিত। নৈষধে তার পরিমাণ প্রায় ২,৮০০ শ্লোক, অর্থাৎ মহাভারতের প্রতি শ্লোক নৈষধে স্ফীতিলাভ করেছে গড়ে চৌদ্দটি শ্লোকে। এর মধ্যে কবির পাণ্ডিত্যপ্রকাশ, অলংকারপ্রয়োগের কৌশল ও বর্ণনাকে দীর্ঘায়িত করবার নৈপুণ্য বাদ দিলেও কলেবর বৃদ্ধির যেটি প্রধান কারণ তা হল দেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। নলদময়ন্তী কাহিনি মহাভারতের শ্রেষ্ঠ উপাখ্যানগুলির অন্যতম: প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে নল ও দময়ন্তী চরিত্র অপূর্ব মহিমা ও সৌন্দর্যে বিকশিত হয়েছে। এই অসামান্য কাহিনিটির মধ্যে শ্রীহর্ষের নিজস্ব সংযোজনা হল দেহবর্ণনায় নৈপুণ্য ও বহিরঙ্গের অলংকরণ। মনকে বাদ দিয়ে শরীর যেখানে একান্ত হয়ে উঠেছে সেখানে ভিন্ন এক ধরনের পাঠক উপস্থিত, যাদের কাছে কাব্যে জীবনবোধ বা রসোপলব্ধি প্রত্যাশিত নয় বরং সম্ভোগবাসনা উদ্রিক্ত করতে পারে এমন নগ্ন বর্ণনা বা তার চেয়েও অশালীন, বহুতর নিপুণ আদিরসের সংকেতই তাঁরা আশা করেন কাব্যে। এ বস্তুর স্রষ্টাও সু-সাহিত্যিক নয়, পাঠকও রসবোদ্ধা নয়। অতএব এ শালীনতাকে অনায়াসে বর্জন করেছে, শিল্পের অনুরোধে নয়, প্রবৃত্তিকে উদ্দীপিত করার দায়ে।

এই তৃতীয় শ্রেণির সাহিত্যে কামনার উন্মেষ ঘটানোই মুখ্য উদ্দেশ্য; দেহ ও সম্ভোগ বর্ণনাই এখানে মূল উপজীব্য; মন এখানে নিতান্তই গৌণ কিংবা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। শিল্পের বিচারে এ রচনা রসোত্তীর্ণ নয়; এর সাধনাও হীন, সিদ্ধিও হীন; তাই সাহিত্যে এর কোনও সত্য আসন নেই। সাহিত্যের নিজের প্রয়োজনের বিচারে যা গৌণ, তা যেন আপন অধিকার লঙ্ঘন করতে উদ্যত হয়ে শিল্পের পরিমিতিবোধ ক্ষুণ্ণ করেছে। বহিরঙ্গ যেন মূল উপজীব্যকে আচ্ছন্ন করতে গিয়ে নিজেকেই মর্যাদাচ্যুত করেছে। কালিদাসের কাব্যেও শরীর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবেই বিদ্যমান, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিকল্পনার অবয়ববিন্যাসের সঙ্গে কোথাও প্রসঙ্গত বা পরিমাণগত কোনও বিরোধ তার নেই; অতএব সে বর্ণনা সমগ্রের সৌন্দর্যের পরিপূরক; অযথার্থ অধিকারের লোভে উদগ্র ভাবে প্রগলভ হয়ে সমগ্রকে ও নিজেকে শ্রীভ্রষ্ট করেনি। বাণভট্টের *কাদম্বরী*-তে চণ্ডালকন্যকা, পত্রলেখা, কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার রূপবর্ণনা; কাদম্বরীতে সন্তানসম্ভবা বিলাসবতী ও *হর্ষচরিত*-এ সন্তানসম্ভবা যশোমতীর শরীর বর্ণনা এমনি করে সমগ্র কাহিনির অবিচ্ছেদ্য ও পরিপোষক অংশ হয়ে আছে বলেই এগুলি পাঠকের তৃপ্তিবিধান করে, কুণ্ঠা বা জুগুপ্সা জন্মায় না।

দেহ তার নিজের অধিকারেই সত্য এবং সত্য বলেই সাহিত্য তাকে বর্জন করবে না; প্রয়োজন মতো বর্ণনা করবে। যতটা খুঁটিয়ে বর্ণনা করলে নায়ক-নায়িকার মনের বিকাশ বা চরিত্রের রূপায়ণ দেখানো সম্ভব হতে পারে ততটাই খুঁটিয়ে বর্ণনা করবে, কিন্তু কেবলমাত্র শিল্পের অনুরোধেই। পরিশীলিত রুচির পাঠক যদি বোধ করেন যে, অনাবশ্যক বিস্তারে দেহ বা সম্ভোগ বর্ণনায় কামনার উন্মেষসাধনই একান্ত হয়ে উঠেছে এবং তার দ্বারা রসবোধের বিঘ্ন জন্মাচ্ছে, তবে তা শিল্পগ, কারণেই সাহিত্যে অনুত্তীর্ণ বলে মানতে হবে। সাহিত্যে

শিল্পেতর কোনও নৈতিক বা সামাজিক মানদণ্ড প্রযোজ্য নয়। বস্তুত রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের পাঠক ও যৌন সাহিত্যের পাঠক শিক্ষাদীক্ষা ও রুচিতে সম্পূর্ণ পৃথক দুই গোষ্ঠীর মানুষ। একটি রচনার দ্বারা অপরটির উদ্দিষ্ট পাঠকের পরিতৃপ্তি ঘটবে না। সাহিত্যের কাছে উভয়ের প্রত্যাশাও ভিন্ন। এই কারণেই দেহবর্ণনার প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও কালিদাস সৎ সাহিত্যের স্রষ্টা কিন্তু মাঘ বা শ্রীহর্ষের রচনায় প্রচুর কলাকৌশল ও পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও শিল্পগত সুরুচির বিচারে এঁদের রচনা হীন হয়ে রইল।

দুঃখান্ত পরিণতি ও সংস্কৃত সাহিত্য

বিয়োগান্ত বা দুঃখান্ত পরিণতি অলংকারশাস্ত্রে নিষিদ্ধ না হলেও সংস্কৃত সাহিত্যে তা একান্ত দুর্লভ। *রামায়ণ মহাভারত*-এর শেষ সুরটি বিষাদের; *রামায়ণ*-এর শেষ প্রক্ষিপ্ত অংশে রামের বৈকুণ্ঠে গমন থাকলেও সীতার পাতালপ্রবেশ ও লক্ষ্মণের সরযুর জলে দেহবিসর্জনে একটা করুণ সুদ্দর আছে। *মহাভারত* প্রথম পর্যায়ে শেষ হয় স্ত্রীপর্বে, সেখানে অন্ত্যভাগের মূলসুর অতলান্ত বিষাদের। পরের অংশ শেষ হয় মহাপ্রস্থানে, সেখানেও একে একে চার পাণ্ডব ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর পতন ও মৃত্যু এবং ধীরে ধীরে যুধিষ্ঠিরের নিঃসঙ্গতা ও একক অন্তিমযাত্রা বিচ্ছেদে করুণ। স্বর্গারোহণপর্বের অপেক্ষাকৃত দুর্বল রচনাতে এ সুর কাটে না। এর পরের দীর্ঘ ও বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও কোনও দুঃখান্ত পরিণতি নেই। ভাসের উরুভঙ্গ নাটকে মঞ্চে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ ও মৃত্যু দেখানো হয় বটে, কিন্তু সে মৃত্যু বীরের মৃত্যু, রথে আরোহণ করে স্বর্গারোহণ করার সুর দুঃখের নয় এবং সেটিই নাটকের অন্তিম ঘটনা। এ ছাড়া বাকি সব মহাকাব্য ও নাটকই মিলনান্ত বা হর্ষান্ত। এর কারণ কি, সেই আলোচনাই এ প্রবন্ধের বিষয়।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের অবস্থা প্রথম থেকেই অন্য রকম। গ্রিক সাহিত্যে হর্ষান্ত নাটক (কমেডি) যথেষ্ট থাকলেও সমধিক প্রখ্যাত নাটকগুলি সবই দুঃখান্ত এ কথা সুবিদিত। গ্রিক ধর্মের সঙ্গে নাটকের অঙ্গাঙ্গী যোগ ছিল; মন্দির চত্বরে প্রায় উপাসনার অংশ হিসেবেই অনুষ্ঠিত হত নাট্যাভিনয় এবং ধর্ম যদিও ঈশ্বরসান্নিধ্যে পৌঁছে সুখী হওয়ারই পথ নির্দেশ দেয় এবং নাটকে যদিও দেবতারা অপরিহার্য ভূমিকায় প্রায়ই অবতীর্ণ হন তবু বিখ্যাত নাটকগুলির অধিকাংশই দুঃখান্ত। ইহুদী খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসে ন্যায়বান্ ঈশ্বর মানুষের কৃত অপরাধের শাস্তি দেন নানাবিধ দুঃখে— ব্যাধি, অর্থহানি, যশোহানি, প্রিয়জনের মৃত্যু। এই সবের দ্বারা মানুষ তার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে মৃত্যুর মধ্যে শুচি হয়ে স্বর্গে যায়। *বাইবেল*-এর জোব্-চরিত্রটিই প্রথম ট্র্যাজিক বা বেদনাদিদ্ধ চরিত্র; এর পরে গ্রিক সাহিত্যে প্রোমিথিয়স্, ঈডিপাস, আগামেম্‌নন, মিডিয়া, ইলেকট্রা এবং অন্যান্য বহু চরিত্র এ ভাবে দেবতার নির্দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আর্ত ও উৎপীড়িত; মানসিক ভাবে ক্ষতবিক্ষত। পরে এলিজাবেথীয় যুগে শেক্‌সপীয়রের ওথেলো, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট্ ও লীয়ার এবং অন্যান্য নায়ককেও এই ধরনের যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সপ্তদশ শতকের সাহিত্যে নায়ক রাজা বা রাজন্য নয়, নাটকের পরিসরও পরিবারের মধ্যে সরে এসেছে কিন্তু বেদনার অভিজ্ঞতা সেখানেও নাটকের কেন্দ্রস্থলে। মানুষের উচ্চাশার সঙ্গে সংঘাত কোনও একটি অলঙ্ঘ্য নীতির; এ নীতি ধর্মীয়ও

হতে পারে, সামাজিক বা নৈতিকও হতে পারে; কিন্তু এই সংঘাতেই নায়কের যন্ত্রণার সূত্রপাত।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যে দেখি প্রলোভনে পড়ে নায়কের পতন ঘটছে এবং বাকি নাটকে যন্ত্রণা ও পীড়নে তার পতনের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে; অনুতাপে পাপক্ষয় হচ্ছে। দুঃখের মধ্যে এক ধরনের বোধ বা আত্মজ্ঞান জন্মাচ্ছে। (*মরালিটি, ফল্ অব্ প্রিন্সেস* ও *প্রাইড্ অব্ লাইফ* নাটকে এই বিষয়বস্তুই নানা প্রকারভেদ আছে। *মরালিটি*-তে কষ্ট এবং অনুতাপের মধ্যে নায়কের পাপক্ষয় ও মুক্তি ঘটে। *প্রাইড অব লাইফ* ও *ফল অব প্রিন্সেস*-এ অহমিকা ও দম্ভই নায়কের পাপ, প্রতিকূল ঘটনার প্রতিঘাতে সেই দর্প চূর্ণ হওয়ার কাহিনিই নাটকের বিষয়বস্তু। এ দুটি ধারায় ঈশ্বরের স্থানে যেন দৈবই মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ।) ষোড়শ শতকে নায়কের চরিত্রে দুঃখভোগের দায়িত্ব দেখানো হতে থাকে এবং এলিজাবেথীয় সাহিত্যেই এ বোধ সবচেয়ে স্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়; ব্যক্তিগত দায়িত্বকেই সুখদুঃখের নির্ণায়ক বলে প্রতিপাদন করা হয় এ সাহিত্যে। কিছুকাল *ফল অব প্রিন্সেস* এর ধারাও চলতে থাকে, যেমন চসারের *মাঙ্ক'স টেল*-এ, গাওয়ারের *কনফেসিও আমান্টিস*-এ অথবা লীডগেটের *ফল অব্ প্রিন্সেস*-এ; কিন্তু এলিজাবেথীয় সাহিত্যে নায়কের ভাগ্যবিধাতা নায়ককেই করা হল, বাইরের প্রতিকূল দেব বা ভগবানকে সে ভূমিকা থেকে অপসারিত করা হল। ইতালীয় নুভেলের মতো অবৈধ প্রণয়, হঠকারিতা ও অন্যায় আচরণ থেকে পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় আসছে এই ধারাটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এলিজাবেথীয় নাটকে একটি বোধ পাওয়া যায় যে দুঃখবিপর্যয় শুধু ব্যক্তিগত পরিসরেই সীমাবদ্ধ নয়, মহাবিশ্বের মধ্যে কোনও এক বিপর্যয়ের প্রতিভাসও আছে তার মধ্যে।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের একটি গ্রন্থ (*ট্র্যাক্টুস্ কইসিলিয়ানুস*) বলেছে, দুঃখান্ত নাটকের রসের উৎস দুঃখ, হর্ষান্তের হাস্য। হরেস্‌ও তাঁর *আর্স পোয়েটিকা*-তে এই মতের সমর্থন করেছেন। এই দুঃখ নানা ধরনের নানা কারণের হতে পারে। চসার তাঁর *মাঙ্ক'স্ টেল*-এ একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন দুঃখান্ত নাটকের:

> Tragedie is to seyn a certyn storie,
> As olde books maken us memorie,
> Of hym that stood in great prosperitie,
> And is yfallen out of high degree,
> Into myserie, and endeth wrechedly.

প্রাচীন গ্রন্থগুলি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে দুঃখান্ত উপাখ্যানের নায়ক (এমন একজন যিনি) অতি উন্নত ঐশ্বর্যময় অবস্থা থেকে দুঃখে পতিত হন ও অত্যন্ত গ্লানির মধ্যে অবসিত হন।

এই সংজ্ঞার আলোকে *রামায়ণ*-এর রাম ও *মহাভারত*-এর যুধিষ্ঠির দুজনেই দুঃখান্ত নাটকের নায়ক। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এর দুষ্যন্ত বাইরের দিকে না হলেও দীর্ঘ দুটি অঙ্কে বেদনার মধ্যে কাটান এবং *উত্তররামচরিত*-এর রাম প্রথম অঙ্ক থেকেই বেদনায় নিমজ্জিত।

তা হলেও এ নাটক দুটি এবং পরবর্তী কোনও সংস্কৃত নাটকই পাশ্চাত্য অর্থে দুঃখান্ত নয়। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এ দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার দুঃখের কারণ মুখ্যত দুর্বাসার শাপ। পরে অবশ্য *হংসপাদিকা*-র গানের মধ্যে দুষ্যন্তচরিত্রের দুর্বলতা দেখিয়ে কতকটা দায়িত্ব চরিত্রেও আরোপিত হয়েছে, যেমন দুষ্যন্তের চিন্তায়, অন্যমনা শকুন্তলার অতিথি আপ্যায়নে ত্রুটির দ্বারা শকুন্তলাকেও তাঁর দুঃখের জন্যে কতকটা দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, এ ত্রুটির সঙ্গে দুঃখের যোগ ক্ষীণ ও আপেক্ষিক গুরুত্বে প্রায়শ্চিত্ত অনেক তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী। তাছাড়া ত্রুটি ও দণ্ডের মিল যথেষ্ট নেই বলেই দুর্বাসার শাপকে ব্যবহার করতে হয়েছে। শকুন্তলার সামান্য বিচ্যুতি বা দুষ্যন্তর বহুবল্লভতা, যা তৎকালীন নায়কের পক্ষে ত্রুটি বলেই ধরা হত না, তার দণ্ড এত নিষ্করুণ। এই উপাদানে গভীর দুঃখান্ত নাটকের সৃষ্টি হতে পারত, কিন্তু সপ্তম অঙ্কে মিলনের মধ্যে সমস্ত দুঃখভোগ আনন্দে অবসিত হল। অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকেই দুঃখের ভূমিকা সংকীর্ণ ও অগভীর।

কীথ্ তাঁর সংস্কৃত নাটকের ইতিহাসে বলেছেন সংস্কৃত নাটকের আদিপর্বে সম্ভবত নিউ এপিক কমেডির প্রভাব পড়েছিল তার ওপরে পাশ্চাত্য নাটকের ইতিহাসের এই পর্বে যে গ্রিক ও গ্রিক প্রভাবিত রোমান নাটকগুলি রচিত হয় তা লঘু, ও হর্ষান্ত। দুঃখ তাতে নেই বললেই চলে, আছে বিপদ এবং বিচ্ছেদের সম্ভাবনা। ঘটনা দ্রুত ঘটে, জটিলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, নায়কের সখা প্যারাসাইট্ (বিদূষক জাতীয় চরিত্র) এবং নায়িকার হিতৈষী এবং হিতৈষিণীর প্রতিচক্রান্তে নিষ্ঠুর অভিভাবকের অনুশাসন পরিবর্তিত হয় এবং নায়কনায়িকার মিলনে নাটকের সমাপ্তি ঘটে। এই ছকটি মূলত দেখা দিয়েছে বেশ কিছু সংস্কৃত নাটকে নায়িকায় এবং প্রকরণে ভাণে, ব্যায়োগে ও সমবকারে। বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে *মালবিকাগ্নিমিত্র*, *বিক্রমোর্বশীয়*, *রত্নাবলী*, *প্রিয়দর্শিকা*, *মালতীমাধব*, *স্বপ্নবাসবদত্তা*, *প্রতজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ* ও *অবিমার*-কে দুঃখের ভূমিকা গৌণ এবং স্বল্পস্থায়ী। *মালবিকাগ্নিমিত্র*, *রত্নাবলী*, *প্রিয়দর্শিকা*-য় ঘটনা প্রায় একই ধরনের: রাজা বিবাহিত, অন্তঃপুরের সুন্দরী এক তরুণীর প্রতি আসক্ত, সে-ও তাই; বাধা হল পূর্বপরিণীতা মহিষী ও অন্য রাজবধূরা। এঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করছেন যাতে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন না ঘটে। বিদূষক ও কখনও-বা অন্য পার্শ্বচরিত্রের সহায়তায় রাজা গোপনে সাক্ষাৎ করছেন তরুণীটির সঙ্গে এবং শুরু হয়ে যাচ্ছে রানিদের ক্রোধ ও মান-অভিমানের পালা। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে প্রজাপতির নির্বন্ধই এমন যে তরুণীটি রাজার পত্নীরূপে উদ্দীষ্ট ছিলেন; রাজপ্রাসাদে আসবার পথে দৈবদুর্বিপাকের ফলে নিষ্পরিচয় আশ্রিতরূপে রাজপ্রাসাদে এসে ওঠে। অতএব রানিরা যখন জানতে পারেন যে দৈবজ্ঞের নির্দেশ হল এই তরুণীটিকে বিবাহ করলে রাজা রাজচক্রবর্তী হবেন বা অন্য ভাবে তাঁর শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে তখন তাঁরাই উদ্যোক্তা হয়ে বিবাহ ঘটান। অন্য যে নাটক ক'টির নাম উল্লেখ করা হল তাতেও প্রকারান্তরে এই ধরনেরই নাট্যবস্তু। দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনও জটিলতার অবকাশ নেই; চরিত্রের বিকাশ, নতুন কোনও জীবনবোধ বা জীবনের কোনও পুনর্মূল্যায়নেরও অবকাশ নেই। নায়ক নায়িকার মিলনের যে বাধাকে

অবলম্বন করে নাট্যবস্তু আবর্তিত হচ্ছে তা নিতান্তই বাইরের এবং সেই বাহ্য অন্তরায় অমনই আর এক আপতিক ঘটনার (দৈবজ্ঞের গণনা, ইত্যাদি) দ্বারা অপসারিত হয়ে অন্তে মিলন ঘটা সম্ভব হচ্ছে।

বিক্রমোর্বশীয়-তে এ বাধাকে কতকটা অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে: ঔশীনরী সম্বন্ধে বিক্রম উদাসীন নন; তাঁর প্রেমের চিতার অগ্নি থেকে, উর্বশীর সঙ্গে মিলনের দীপটি জ্বালাতে তিনি দ্বিধা বোধ করছেন। কিন্তু উর্বশীর প্রেম তাঁকে এত অভিভূত করেছে যে তিনি এ দ্বিধা কাটিয়ে ওঠেন শেষ পর্যন্ত। চতুর্থ অঙ্কে তাঁর বিরহের উন্মাদনা বর্ণিত হয়েছে। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এ চতুর্থ অঙ্কের শেষ থেকে সপ্তম অঙ্কের মাঝামাঝি পর্যন্ত দীর্ঘবিলম্বিত বিরহ। নাটকের বাধা ধীরে ধীরে চরিত্রের অন্তরে সংক্রমিত হয়ে তাকে পূর্বের লঘু কামনার উচ্ছলতা থেকে প্রেমের গভীরতায় উত্তীর্ণ করে দেওয়ার পরে আসছে মিলন।

এ মিলনও কিন্তু অপেক্ষিত ছিল; দুর্বাশার শাপের খণ্ডনের জন্যে যখন প্রিয়ংবদা ঋষিকে অনুনয় করেন তখন ঋষি বলেন, অভিজ্ঞান দেখলে রাজার বিস্মৃতি কেটে যাবে। অতএব ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথম থেকে আমাদের প্রত্যাশা জন্মায় নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটবে। কালিদাসের নাটকগুলিতে দেখছি মিলনের বাধা আগন্তুক বা আপতিক থেকে ক্রমে ক্রমে নাট্যবস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হয়ে যাচ্ছে। চরিত্রের গহনে তার মূল প্রোথিত হচ্ছে এবং দুঃখ স্বল্পস্থায়ী বা গৌণ ভূমিকা থেকে ধীরে ধীরে অধিক তাৎপর্য ও স্থায়িত্ব লাভ করছে। কিন্তু নাটক অনিবার্যরূপেই হর্ষান্ত।

মুদ্রারাক্ষস-এ নাট্যবস্তু পৃথক গোষ্ঠীর: রাজনীতির পটভূমিকায় দুটি মুখ্য চরিত্র চাণক্য ও রাক্ষসের অভীষ্ট এবং প্রযত্নের সংঘাতই এ নাটকের কাহিনি। এখানেও বাধা বহিরাগত এবং সমাধান ঘটছে চাণক্যের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা। দুটি চরিত্রই এক অর্থে নায়ক কারণ, রাক্ষস প্রচলিত অর্থে প্রতিনায়ক একেবারেই নয়; সংঘাত শ্রেয় এবং শ্রেয়স্তরের মধ্যে। ঘটনা প্রধানত যেন ঘটছে দুটি চরিত্রের চিত্তমঞ্চেই, এবং পরিণতি আসছে প্রবল আবেগ বা হর্ষের মধ্যে নয়, বরং আবেগের প্রশমনের মধ্যেই।

মৃচ্ছকটিক-এ চারুদত্ত ও বসন্তসেনার মিলনের বাধা বাইরে বটে কিন্তু সে বাধা সমাজের এবং আপাত ভাবে দূরপনেয় কারণ বসন্তসেনা গণিকা, একমাত্র ধনের সাহায্যে চারুদত্ত তাঁকে পেতে পারেন এবং নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকেই শুনি, চারুদত্ত দরিদ্র। কাজেই এ বাধা গুরুতর, এবং এরই সঙ্গে আর এক বাধা হল ধনী সংস্থানক বসন্তসেনাকে কামনা করে। এতে জটিলতা নাটকে বেড়েছে, কারণ সংস্থানক প্রবল প্রতিপক্ষ। কাজেই এ নাটকের বাধা সম্পূর্ণ ভাবে বহিরাগত নয়; সমস্ত নাটক জুড়ে নায়ক-নায়িকার প্রেম অন্ধ গলিতে মাথা ঠুকে মরে। সমাধান আসে দশম অঙ্কে কতকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে; কিন্তু সম্পূর্ণ প্রস্তুতিহীন নয় এ সমাধান, কারণ নেপথ্যে যে রাজপরিবর্তন ঘটছে তার প্রস্তুতি নাটকে দীর্ঘকাল ধরেই চলেছিল: শর্বিলক, রেভিল, দর্দুরক— এরা ধীরে ধীরে রাজা পালকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করে আর্যককে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। এই রাজপরিবর্তনের ফলে পূর্ব উপকার

স্মরণ করে আর্যক চারুদত্তকে সম্পত্তি ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বসন্তসেনাকে গণিকাত্ব থেকে মুক্তি দেন; তার ফলে চারুদত্ত তাঁকে বিবাহ করতে পারেন। এ নাটকের হর্ষান্ত পরিণতি দশম অঙ্কের একেবারে শেষ অংশটুকুতে: দীর্ঘ নয় অঙ্কেরও বেশি নায়ক-নায়িকার প্রেম নিষ্পরিণাম দুঃখে আচ্ছন্ন। কাজেই ঠিক দুঃখান্ত না হলেও প্রকৃত অর্থে এ নাটককে হর্ষান্তও বলা যায় না, বরং প্রতিহত দুঃখান্ত (averted tragedy) বলাই বোধহয় সংগত হবে। নাটকের মূল সুর করুণই ছিল শেষ অঙ্কের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। চসারের সংজ্ঞায় মৃচ্ছকটিক দুঃখান্ত নাটক, কিন্তু এব অন্ত্যভাগে মিলন ও হর্ষ।

তেমনই *উত্তররামচরিত*। এ নাটক প্রথম অঙ্ক থেকে শেষ অঙ্কের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ছিল দুঃখে মগ্ন; রামচন্দ্র ও সীতা দুজনের দুঃখই স্বতন্ত্র ভাবে অঙ্কের পর অঙ্ক জুড়ে দেখানো হয়েছে। সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার পর আর যে রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিলন হবে তার কোনও ইঙ্গিত নাটকে তো নেই-ই, মহাকাব্যেও ছিল না। ভবভূতি বলেছেন,

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাদ্
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্।
আবর্তবুদ্বুদতরঙ্গময়ান্ বিকারান্
অম্ভো যথা সলিলমের তু তৎ সমগ্রম্॥

এক করুণ রসই নিমিত্তভেদে ভিন্ন ভাবে পৃথক্ পৃথক্ রূপভেদকে আশ্রয় করে, জল যেমন আবর্ত, বুদ্বুদ ও তরঙ্গময় বিকারকে (আশ্রয় করে); কিন্তু সমগ্র ভাবে তা জলই। (৩:৪৭)

এই বাণী যে-নাটকের মর্মকথা তার স্বাভাবিক পরিণতি দুঃখান্ত; কিন্তু সপ্তম অঙ্কে অপেক্ষাকৃত দুর্বল নাটকীয় সংযোজনে তা হর্ষান্ত হয়ে উঠেছে। কেন? সম্ভবত যে নির্দেশ সমাজে চলিত ছিল— বিয়োগান্তং ন নাটকম্— তারই প্রভাবে।

কিন্তু কেন এ নির্দেশ অথবা এ মনোভাব? জীবনে যেখানে বিয়োগান্ত ও দুঃখান্ত ঘটনা প্রচুর দেখা যায়, অন্যান্য সাহিত্য যেখানে দুঃখান্ত পরিণতি'কে পরিহার করেনি সেখানে সংস্কৃত সাহিত্যে এ সম্বন্ধে এত কুণ্ঠা কেন? এর একাধিক কারণ থাকাই স্বাভাবিক। গ্রিক ধর্মে স্বর্গনরকের সঙ্গে পাপপুণ্যের যোগাযোগ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে জানা যায় না। এবং পরবর্তী পর্যায়ের 'মিস্ট্রি' অর্থাৎ গূঢ় ধর্মবিশ্বাসের প্রস্থানগুলির (ডিওনিসীয় ইলিউসিনীয় বা অর্ফিক্ ইত্যাদি) উত্থানের পূর্বে মৃত্যুর পর অনন্ত সুখভোগের ধ্রুব কোনও পন্থা উদ্ভাবিত হয়নি; কাজেই দুঃখান্ততার একটা বাস্তব ভিত্তি ছিল পরলোকতত্ত্বেও। খ্রিস্টধর্মে স্বর্গ-নরক নির্ভর করে পাপপুণ্যের ওপরে এবং দুটিই অনন্তকালের, অর্থাৎ অনন্ত দুঃখভোগের সম্ভাবতা ধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল। জন্মান্তরবাদ না থাকায় দুঃখের আত্যন্তিকতা এক ধরনের বাস্তব সম্ভাবনারূপে মানুষের মনে জাগরূপ ছিল; হয়তো তা আশঙ্কার, তার প্রতিকারের উপায়ও শাস্ত্র বলেছে, কিন্তু বেশ ক'টি মহাপাতকের (deadly sins) উল্লেখও আছে যার কোনও প্রতিকার নেই, কাজেই অনন্ত দুঃখের আতঙ্কটা বাস্তব ছিল।

ভারতবর্ষে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে পঞ্চম বা চতুর্থ শতকের মধ্যে উপনিষদের ভাবধারা ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মই এবং জৈন ধর্মও, জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ স্বীকার করে, অন্যান্য গৌণ সম্প্রদায়গুলিও করত। পাপের ফলে নরক, হীনজন্ম, প্রেতযোনি, ইত্যাদি নির্ধারিত ছিল ঠিকই, কিন্তু জন্মান্তরবাদের ফলে কোনও অবস্থাই চিরস্থায়ী বা আত্যন্তিক নয়। বহু জন্ম পরিক্রমার পরে একেবারে শেষ অবস্থাটি দুঃখের নয়, তা সে মোক্ষই হোক আর নির্বাণই হোক। ফলে দুঃখের একান্ততা দর্শন এবং প্রচলিত সমাজবোধ থেকে অন্তর্হিত হল। মানুষ এ জীবনে দুঃখ পেতে পারে, সে তার পূর্বজন্মে কৃত অপকর্মের ফল, কিন্তু পুণ্য অর্জন করতে করতে ধীরে ধীরে সে মোক্ষ বা নির্বাণের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। এই বৃহত্তর পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে দুঃখ একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র, অন্তিমে সুখভোগ অবধারিত; লক্ষবর্ষ পরে হলেও সেইটিই চূড়ান্ত পরিণতি। এই বোধ দুঃখান্ত পরিণতিকে অস্বীকার করবেই।

অ্যারিস্টটল্ দুঃখান্ত নাটকের যে সংজ্ঞানিরুপণ করেছেন তা হল:

'দুঃখান্ত নাটক' এমন নাট্যকর্মের অনুকৃতি যা গম্ভীর এবং সম্পূর্ণ... (যা) করুণা ও আতঙ্কের উদ্রেক ঘটায় এবং ওই আবেগগুলির প্রশমনও ঘটায়। (Tragedy, then is an imitation of an action that is serious and complete...exciting pity and fear, bringing about the catharsis of such emotions.) (ষষ্ঠ অধ্যায়)

মনে রাখতে হবে এই দুঃখান্ত নাটকেই অ্যারিস্টটল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর সংজ্ঞায় 'গম্ভীর' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ কবিদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, যাঁরা গম্ভীর শ্রেণির (কবি) তাঁরা নাটকে মহৎ কর্ম ও মহামানবদের কর্মের অনুকরণ করেন। (Those who were of a graver sort imitated aplendid deeds and actions of great men.) (চতুর্থ অধ্যায়) গম্ভীর বিষয় কী, সে সম্বন্ধে বলছেন, 'নাটকে চরিত্র থাকবে... যখন কথা বা কাজ স্পষ্ট সূচিত করবে একটি নৈতিক কর্তব্য নির্ণয় যার দ্বারা নির্ধারিত হবে চরিত্র কেমন ধরনের হবে, কর্তব্য নির্ণয় সৎ হলে চরিত্রটি সৎ হবে।' (There will be character...if speech or act clearly shows a moral choice indicating what sort of a peron the agent is; his character will be good if his choice is good) (পঞ্চদশ অধ্যায়) বিষয়ের গাম্ভীর্য, নৈতিক ইতিকর্তব্যতানির্ণয়ের দ্বারা মহৎ হয়ে ওঠা চরিত্রের নায়ক এবং তার গম্ভীর ও সম্পূর্ণ কর্মের দ্বারা দর্শকচিত্তে আতঙ্ক ও করুণার সৃষ্টি এবং নাটকের গতির মধ্যে ওই আবেগ দুটির প্রশমন— এ সংজ্ঞাটির মধ্যে জীবন সম্বন্ধে এমন একটি বোধের লক্ষণ আছে যা সংস্কৃত অলংকারসাহিত্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আতঙ্ক এবং করুণা— দুটির কোনওটিরই উল্লেখ সংস্কৃত কোনও অলংকারগ্রন্থে নাটকের সম্বন্ধে করা হয়নি। নৈতিক ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের মধ্যেই নাট্যবস্তু গম্ভীরতা অর্জন করে। সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রে নায়িকার প্রকারভেদ শুধু প্রেমের অবস্থাভেদ, আর নায়ক হয় ধীরোদাত্ত, নয় ধীরললিত, অথবা ধীরোদ্ধত, কিংবা নয় ধীরপ্রশান্ত। চারটিই সৎ, এবং অবস্থাবিশেষে

তারা কী ভাবে ইতিকর্তব্যতা স্থির করবে তা তাদের প্রকারভেদের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত।

সমগ্র সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে মহাকাব্য দুটি থেকে নেওয়া চরিত্র ছাড়া কবিকল্পিত কোনও মন্দ চরিত্র নেই, একমাত্র ব্যতিক্রম *মৃচ্ছকটিক*-এর সংস্থানক। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এ দুর্বাসা, *উত্তররামচরিত*-এ দুর্মুখ বা *মালতীমাধব*-এর কাপালিকও মন্দ, কিন্তু নাট্যকাররা এদের নাটকে সত্যকার চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করেননি। এরা নাট্যবস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন উপচরিত্র এবং দুর্দৈবের প্রতীক বা কর্মকর; কাজেই এদের মন্দত্ব নাটকের প্রাণকেন্দ্রের বাইরেই থেকে যায়, নাটককে স্পর্শ করে না।

মনে রাখতে হবে, সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের মতে নাটকও কাব্য। দৃশ্যকাব্য— কাজেই কাব্য সম্বন্ধে মৌলিক যে বোধ সেখানে পাই তা নাটক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোনও উদ্ভাবনের অবকাশ নাটকে নেই, 'নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ— নাটকের ঘটনা বিখ্যাত (অর্থাৎ সর্বজনবিদিত) হতে হবে।' কাব্যের যা উদ্দেশ্য মোটামুটি ভাবে নাটকেরও তাই, অর্থাৎ 'কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবতরক্ষতয়ে/সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে— কাব্য যশ ও অর্থের জন্যে, নীতিজ্ঞানের জন্যে অমঙ্গলনাশের জন্যে, তৎক্ষণাৎ পরম আনন্দলাভের ও বধূর মতো উপদেশ দেওয়ার জন্যে।' (কাব্যপ্রকাশ ১:২) এই উপদেশ দেওয়ার শাস্ত্রীয় ভঙ্গিও তিনটি: বেদাদি গ্রন্থে যেমন অনুশাসন থাকে, এটা কর, ওটা কোরো না; তা হল গুরুসম্মিত। অথবা মহাকাব্যে যেমন কাহিনি ও উপদেশের মাধ্যমে বলা হয়ে কি করা উচিত বা নয়; তা হল বন্ধুর মতো করে বলা, সখিসম্মিত। যেমন 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ— রামের মতো আচরণ করা উচিত, রাবণের মতো নয়।' আর কাব্য কোনও উপদেশই সরাসরি দেবে না। শুধু কাহিনিটুকু বলেই ক্ষান্ত হবে, তা হল কান্তাসম্মিত। নাটকে এ উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু নাট্যশাস্ত্রগুলি নীরব। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-তে ব্রহ্মা বলছেন, 'ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যঞ্চ যদ্ভবেৎ— একটি খেলনা চাই যা দৃশ্য ও শ্রব্য হবে অর্থাৎ মঞ্চে অভিনীত হলে যা শোনা ও দেখা যাবে।' (১:২) আর বলছেন, 'বিনোদকরং লোকে নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি।... ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ— পৃথিবীতে এই নাটক হবে বিনোদনের উপকরণ, ধনীদের বিলাস (হবে)।' (১:১১৯-২০; ১:১১) আরও স্পষ্ট করে বলা আছে, 'দুঃখার্তিশোকনির্বেদখেদবিচ্ছেদকারণম্। অপি ব্রহ্মপরানন্দাদিদমভ্যধিকং পরম/জহার নারদাদীনাং চিত্তানি কথমন্যথা॥— 'দুঃখ, আর্তি, শোক, নির্বেদ, খেদের অবসান ঘটায়, (নাটক), ব্রহ্মপরানন্দের চেয়েও অধিক এই (নাটক সঞ্জাত) পরম আনন্দ, না হলে (নাটক) নারদ-আদি (ঋষি)-দের চিত্তরহরণ করল কি করে?' (১:১১)

তাহলে মূল বিবক্ষিত দাঁড়াল এই দুঃখ শোক ও আর্তির জগৎ থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে নেওয়ার উপায় হল নাটক। তাই এটা খেঁলনা, ক্রীড়নক, যা দিয়ে লোকে শিশুকে ভোলায়; এ হল চিত্তবিনোদনের উপায়, এবং ধনীদের বিলাস। শুধু যে বাস্তব থেকে মনকে সরিয়ে দেওয়ার, ছেলে-ভোলাবার ক্রীড়নক তাই নয় এর শ্রেণিচরিত্রও স্পষ্ট: ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ— ধনীদের বিলাস। নিশ্চয়ই সমাজে অন্য রকম নাটকও ছিল যা সাধারণ মানুষ

রচনা করত, অভিনয় করত এবং দেখত। তা যে ছিল তার প্রমাণ হল বিংশতি ভেদ রূপক বা নাটকের, এবং তার মধ্যে আট দশ প্রকারই মাত্র পাওয়া যায়। বাকিগুলি নিশ্চয়ই শিক্ষিত ও ধনীদের বিলাসের পর্যায়ে উঠতে পারেনি তাদের দৈনন্দিন বা নিচুতলার জীবনযাত্রার অতিসাধারণতায় এবং অমার্জিত রচনাভঙ্গির জন্যে। হয়তো তা রসোত্তীর্ণও ছিল না সব সময়ে, কিন্তু এ কথা জোর করে বলা যায় না, কারণ অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল বহু ভাণ রক্ষা পেয়েছে নাগরকজীবনের বিলাসচিত্র বলে। এগুলির অধিকাংশেরই বিন্দুমাত্র সাহিত্যিক উৎকর্ষ নেই তাও। কাজেই যা রক্ষা পায়নি তা সাহিত্যিক কারণে নয় সামাজিক কারণেই হয়তো পায়নি এমন অনুমান অসংগত হবে না।

যা বিলাস যা ক্রীড়নক তা গম্ভীর বিষয় পরিহার করবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ। তা বিনোদনের জন্যে বাস্তবের রূঢ়তাকে এড়িয়ে যাবে, কারণ দুঃখ, খেদ, আর্তি এ সব থেকে চিত্তকে সরিয়ে আনাই তো তার উদ্দেশ্য। ফলে অ্যারিস্টটল যাকে গম্ভীর বিষয় বলেছেন, জীবন সম্বন্ধে মৌলিক জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের ওপরে যার ভিত্তি, প্রচলিত মূল্যবোধগুলির পুনর্মূল্যায়ন যার লক্ষ্য, তা সংস্কৃত নাটকের উপজীব্য হতে পারল না। 'কাব্যামৃতরসাস্বাদ' যদি 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' হয় তাহলে কাব্য এবং নাটক দৃশ্যকাব্য ঐহিক জীবনের সুখদুঃখ প্রশ্ন সমস্যাকে পরিহার করে তুরীয় ভাবের সন্ধান করবে। *অভিনয় দর্পণ*-এ নাটকের করণীয় কি তা বলা আছে: 'কীর্তিপ্রাগল্‌ভ্যসৌভাগ্যবৈদগ্ধ্যানাং প্রবর্ধনম্/ঔদার্যস্থৈর্যানাং বিলাসস্য চ কারণম্॥— কীর্তি, প্রগর্লভতা ও পাণ্ডিত্যের প্রবর্ধক, ঔদার্য, স্থৈর্য ও বিলাসের কারণ (নাটক)।' অর্থাৎ এ পণ্ডিত ও ধনীর দ্বারা ও জন্য রচিত সাহিত্য। প্রাচীন কালের ভরত থেকে অনেক পরের এই *অভিনয়দর্পণ* পর্যন্ত সকলেই বিলাসের উল্লেখ করছেন; এবং বিলাস আর যাই হোক জীবনজিজ্ঞাসা নয়। দশম শতকের সাগরনন্দী তাঁর *নাটকলক্ষণরত্নকোশ* গ্রন্থে নাটকের যে সংজ্ঞা দেন তা-ও এই ধরনেরই:

ধর্মাদিসাধনং নাট্যং সর্বদুঃখাপনোদকৃৎ।
অনুসেবধ্বমৃষস্তস্যোখানং তু নাটকম্॥

'ঋষিগণ, আপনারা ধর্ম ইত্যাদির সাধন এবং সকল দুঃখের নিবারক নাট্যের অনুশীলন করুন, নাটক তারই উৎকর্ষ।' (১:৪)

ভামহ কাব্যের সংজ্ঞানিরূপণে বলেছিলেন:

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্॥

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং কলাগুলিতে বিচক্ষণতা এবং কীর্তি ও প্রীতি লাভ করা যায় সৎকাব্য সেবনে। (কাব্যালংকার ১:১)

ধনঞ্জয় তাঁর *দশরূপক* নামের বিখ্যাত নাটকসম্বন্ধীয় গ্রন্থে এই সংজ্ঞার প্রতি শ্লেষ করে বললেন:

আনন্দনিষ্যন্দিষু রূপকেষু ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধুস্তস্মৈ নমঃ স্বাদুপরাঙ্মুখায়।।

আনন্দনির্ঝর নাটক থেকে ইতিহাসাদির মতো পাণ্ডিত্যমাত্র ফল (পাওয়া যায়) এমন কথা যে সাধু বলেন সেই স্বাদু (বস্তুতে) বিমুখ সাধুকে নমস্কার। (১:৬)

এখানে লক্ষণীয় যে, পূর্বতন গ্রন্থকার নাটক দর্শন ও শ্রবণের ফলগুলির মধ্যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, ইত্যাদি এনে যদিও এগুলি জীবনজিজ্ঞাসার অনুকূল নয় তবুও— এই সংজ্ঞার মধ্যে কিছু গম্ভীর তাৎপর্যের অবকাশ রেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থকার ধনঞ্জয় তা নিয়ে পরিহাসই করলেন, কারণ তাঁর মতে নাটক বিশুদ্ধ আনন্দেরই নির্ঝর। এই সংজ্ঞায় নাটকের পরিসর সংকীর্ণ ও অগভীর হয়ে রইল। শেক্‌স্‌পীয়রের ম্যাকবেথ, হ্যামলেট বা লীয়ারকে তো বিশুদ্ধ আনন্দের নির্ঝর বলা যাবে না যেমন সফোক্লিসের ঈডিপাস্ রেক্সকেও বলা যাবে না, অথচ পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের তালিকায় তো এদের স্থান শীর্ষভাগে। কাজেই ওই গম্ভীর বিষয় পরিহার করে, নৈতিক সংঘাতকে বর্জন করে, ক্রীড়নক ও বিনোদন নির্মাণেই যদি নাটক পর্যবসিত হয় তো মানুষ তা দেখবে, শুনবে বা পড়বে শুধু চিত্তবিনোদনের জন্যেই, জীবনকে নতুন করে বোঝবার বা জানবার জন্যে নয়। এটা সংস্কৃত নাটকের একটা অভিশাপ।

শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকগুলিতে বস্তুর (plot) বৈচিত্র আছে, শক্তিশালী আবেগের চিত্রণ আছে, প্রচুর চিত্তহারী বর্ণনা আছে মানুষের ও প্রকৃতির, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের যা প্রাণবস্তু, জীবনের পুনর্মূল্যায়ন, জীবনবোধের প্রসার— তা নেই। এর একটা কারণ হল, চরিত্রনির্মাণ সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রগুলি কোনও স্বতন্ত্র চিন্তার পরিচায় দেয়নি। নৈতিক সংঘাত প্রতিফলিত হবে তো চরিত্রকে অবলম্বন করেই, কিন্তু সে রকম কোনও নির্দেশ কোনও নাট্যশাস্ত্রে নেই। বিষয় যেখানে বহুলাংশে মহাকাব্যনির্ভর, সেখানে ছোটখাটো বৈচিত্র্যের চমক ছাড়া উদ্ভাবনের ক্ষেত্র নেই এবং নৈতিক সংঘাত সম্বন্ধে কোনও নির্দেশ না থাকায় তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেও শাস্ত্রমতে নাটকের অঙ্গহানি হয় না। তাছাড়া সৌন্দর্যসৃষ্টিই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে প্রচুর গীতিকাব্যধর্মী মনোজ্ঞ বর্ণনার সমাবেশ থাকলেই চলে। এ কথা ঠিক যে, চরিত্রকে নৈতিক সংঘাতের সম্মুখীন করে, বহু দুঃখের মূল্যে সে শ্রেয়কে বরণ করছে এমন ঘটনার অবতারণা করতে পারলে উন্নত এক স্তরে সৌন্দর্যসৃষ্টি করা যায়— পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি যা করেছে— কিন্তু তাহলে তা বিনোদন হয় না, ক্রীড়নক হয় না; ধনীর বিলাসর উপাদানও হয় না। যা হয় তারা কোনও সংজ্ঞাই নেই নাট্যশাস্ত্রে।

হেরোডোটাস বলেছেন, 'সকলের চেয়ে তীব্র দুঃখ যা মানুষ উপলব্ধি করে তা হল অনেক কিছু সম্পাদন করবার উচ্চাশা নিয়ে কিছুই না করতে পারা।' (৯ম খণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়) যে সব দুঃখের উপলব্ধির মধ্যে নায়ক বা নায়িকাকে অবলম্বন করে দর্শক বা পাঠক জীবনের নতুন অর্থের সন্ধান পায় হেরোডোটাস তার একটি সংজ্ঞা দিলেন। আধুনিক নাট্যসমালোচক জর্জ স্টাইনার বলেন, 'প্রাচ্য শিল্পে হিংস্রতা আছে, দুঃখ আছে এবং স্বাভাবিক বা পরিকল্পিত ভাগবিপর্যয় আছে... কিন্তু ব্যক্তিগত বেদনার ও শৌর্যের যে চিত্রণকে আমরা ট্র্যাজেডি বলি

তা হল প্রতীচ্যের শিল্পেরই বৈশিষ্ট্য।... ট্র্যাজেডির নায়ক যে শক্তির দ্বারা বিধ্বস্ত হয় তাকে সে সম্পূর্ণ বুঝতেও পারে না; চিন্তাপ্রসূত বিচক্ষণতার দ্বারা জয়ও করতে পারে না। আবার এইটিই হল ট্র্যাজেডির কেন্দ্রীয় বস্তু। যেখানে বিপর্যয়ের হেতুগুলি সাময়িক, সেখানে গম্ভীর নাটক হলেও হতে পারে কিন্তু (যথার্থ) দুঃখান্ত নাটক হতে পারে না।' (*দ্য ডেথ্ অব ট্র্যাজেডি*; ফেবার অ্যান্ড ফেবার; ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৩ ও ৮) করুণ রস থাকলে করুণরসপ্রধান নাটক হতে পারে কিন্তু তার দ্বারা কোনও নাটক যথার্থ দুঃখান্ত নাটক বা ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে না। করুণরস বা শোকদুঃখ তো বাস্তবে আছে, কাজেই সাহিত্যে তার প্রতিফলন থাকতেই পারে, তার দ্বারা নাটকটি করুণরসাশ্রিত হতে পারে, যেমন উত্তররামচরিত বা মৃচ্ছকটিক, এমনকী নাগানন্দও। কিন্তু যা সত্যকার দুঃখান্ত নাটক তার শুধু অন্তে দুঃখ নেই, তার জীবন-উপলব্ধির প্রতিক্রিয়াটির মধ্যেই দুঃখ ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত। যেখানে মর্মযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জীবনের এক নতুন বোধে উত্তরণ ঘটে নায়ক বা নায়িকার। নীট্‌শে বলেন, 'শিল্প বাস্তবের অনুকৃতি নয়, তার দার্শনিক উপসংহার, বাস্তবের পাশাপাশি তাকে সৃষ্টি করা হয়, যাতে তার দ্বারা বাস্তবকে জয় করা যায়।' (*দ্য বার্থ অব ট্র্যাজেডি*; ডাবলডে এঙ্কর; ১৯৫৬ ১৪২ পৃষ্ঠা) এরই পাশাপাশি মনে পড়ে 'রূপং দৃশ্যতয়োচ্যতে রূপকং তৎসমারোপাৎ— রূপের আরোপ হয় বলে রূপক (=নাটক)', অথবা 'অবস্থানুকৃর্তিনাট্যম্' (দশরূপক ১:৭) এই অনুকৃতি যদি শোকের হয় তবু তা একটি অনুকৃতিমাত্রই, তার দ্বারা জীবনবোধের কোনও প্রসার ঘটে না যদি না মৌলিক কোনও প্রশ্নও তার সঙ্গে উত্থাপিত হয়। যেমন হয়েছে কতকটা *মৃচ্ছকটিক* বা *উত্তররামচরিত*-এ যেখানে ভাগ্যবিপর্যয়কে বোঝবার জন্যে একটা অনুচ্চারিত আকৃতি নাটকটিকে কতকটা প্রশ্নকণ্টকিত করে রাখে।

বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মা হলেন রস-স্বরূপ, 'রসো বৈ সঃ'; এই রস 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'। এবং জীবন ব্রহ্মস্বরূপ। কাজেই জীবনের পরিকল্পনায় বেদনার আত্যন্তিকতার স্থান নেই। *ধ্বন্যালোক, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর*, ইত্যাদি প্রখ্যাত অলংকারশাস্ত্রগুলি সবই বেদান্ত নির্ভর, বেদান্ত অন্য সব দর্শনপ্রস্থানগুলিকে গ্রাস করে রেখেছিল। এখনও রেখেছে, কাজেই ভারতবর্ষ উচ্চাররণ করেছে এবং বিশ্বাস করবার সাধনা করেছে যে: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে/আনন্দেন জীতানি জীবন্তি/আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি।— আনন্দ থেকে জীব জাত হয়, আনন্দে বেঁচে থাকে, চলার শেষে আনন্দেই অভিপ্রবিষ্ট হয়।' (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ৩:৬) দুঃখের স্থান কোথায় এখানে? বাস্তবে দুঃখের যে অনুভূতি? খাঁটি বৈদান্তিক দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত দুঃখ মায়া, প্রতিভাস, রজ্জুতে সর্পভ্রম। অর্থাৎ দুঃখ অঙ্গ-রসের মতো নাটকে আনাগোনা করতে পারে প্রয়োজন মতো, কিন্তু নাটকের শেষে সেই সুর বাজবে না কোনও মতেই; শেষে উচ্চারণ করতে পারা চাই 'ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ'। বলতে পারা চাই *অথর্ববেদ*-এর ভাষায়, 'যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমিহ শমস্তু নঃ।।— এ পৃথিবীতে যা কিছু ঘোর, ক্রূর ও পাপ তা শান্ত হোক, মঙ্গল হোক, আমাদের সব কিছু শান্তিময় হোক।' (১৯:৯:১৪) প্রার্থনাটি অনাদিকাল থেকে সৃষ্টির বুক চিরে উঠছে,

কিন্তু সাহিত্য যখন প্রার্থিতকে লব্ধ বলে মনে করে তখনই তা যথার্থতার সীমা ছেড়ে যায়। এ দর্শনের প্রবল পরাক্রমকে অস্বীকার করবার মতো শক্তিমান শিল্পী ব্যাসবাল্মীকির পরে দেখা দেয়নি। শুধু একবার কালিদাস তাঁর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য *রঘুবংশ*-এ সাহস করে দুঃখ ও অবক্ষয়ের এমনই এক চিত্র আঁকলেন কাব্যের অন্তভাগে যে তার পরে আর 'ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' বলাও কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু নাটকে? সে যে দৃশ্যকাব্য; যেখানে নাটক দেখার শেষে প্রেক্ষকরা কোনও প্রশ্ন, কোনও গভীর সংশয় কোনও দ্বিধাব্যাকুলতা নিয়ে রঙ্গস্থল ত্যাগ করলে তো চলবে না। মনে রাখতে হবে, নাটকের যে কটি প্রকারভেদ সমধিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেমন নাটক নাটিকা প্রকরণ, ব্যায়োগ ভাণ, ইত্যাদি— এগুলির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজারা বা ধনী বণিকরা। গণিকালয়ের মদনমন্দিরের চত্বরে, রাজসভায়, অথবা মন্দিরপ্রাঙ্গণেই নাট্যাভিনয় হত, সর্বত্রই রাজা বা ধনীই পৃষ্ঠপোষক; এবং নাটক হল 'ঈশ্বরাণাং বিলাসস্তু'। তারা চিন্তার উপাদান বা জীবন সম্বন্ধে গভীর কোনও সংশয়ে জর্জরিত হওয়ার জন্যে অর্থব্যয় করত না, চাইত বিনোদন, পেতও তাই; কারণ নাটক সেই খেলানা যা তাদের ভোলাত।

অন্যান্য দেশেও রাজা ও ধনীর আনুকূল্যেই নাটক মঞ্চস্থ হত, কিন্তু সেখানে নাটকের ক্রীড়নক হওয়ার বা বিনোদন করবার দায় ছিল না তাই নাটকের কাছে প্রেক্ষকের প্রত্যাশা ছিল জীবনবোধের সম্প্রসারণ, নৈতিক সংঘাতের সম্মুখীন হয়ে নায়ক কেমন করে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষুদ্র স্বার্থকে অতিক্রম করতে পারলেন অশ্রুপাত ও মর্মের রক্তক্ষরণের মূল্যে, তা দেখে তাঁরা নিজেদের জীবনসংগ্রামে শক্তিসঞ্চয় করতে চাইতেন। তাই তাঁরা বলেছেন নাটককে হতে হবে গম্ভীর চরিত্র, নৈতিক সংঘাতে জয়লাভ করার দ্বারা এই গম্ভীরতার মর্যাদা অর্পণ করবে নাটককে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী: তাঁরা পেলেন কালজয়ী গম্ভীর, গভীর জীবনালেখ্য; আমরা পেলাম ক্রীড়নক।

চৌরপঞ্চাশিকা

চৌরপঞ্চাশিকা কাব্যটির মোট ৯৮টি পাণ্ডুলিপি এ যাবৎ পাওয়া গেছে (Barbara Stoler Miller: *Fantasies of Love thief*; Columbia University Press; 1971 দ্রষ্টব্য) এগুলিকে মোটামুটি দু ভাগে ভাগ করা যায়: উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতীয়। এই দ্বিতীয় পাঠটির দুটি অংশ: (ক) একশোটি কাহিনিমূলক শ্লোক ও মূল কাব্যের চারটি শ্লোক নিয়ে পূর্ব পঞ্চাশৎ; ও (খ) পরিচিত পাঠের পঞ্চাশটি শ্লোকে উত্তর পঞ্চাশৎ, এর অন্তে কয়েকটি অধিক শ্লোক সন্নিবিষ্ট। বিখ্যাত *ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগারাম*-এ *চৌরসুরতপঞ্চাশিকা* ও *চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা*, *বিল্হণপঞ্চাশিকা* ও *শশিকলা পঞ্চাশিকা* নাম ও কাব্যের উল্লেখ আছে। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক লাসেন ঈস্ট্ ইন্ডিয়া কোম্পানির গ্রন্থাগারে একখানি কাশ্মীরি পাণ্ডুলিপি পান ও অধ্যাপক পেক্রস্ ফন বোল্লেনকে দেন; তিনি গণপতির টীকাসমেত একটি জার্মান সংস্করণ ১৮৮৬ সালে প্রকাশ করেন। ওই বছরেই পরে একটি জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হয়। (Wilhelm Solf: *Die Kashmir Recension der Pancasika*) ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ৪৩৮:১৮৮৪-৮৭ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে তিনটি বিভিন্ন পাঠের সংকলন পাওয়া যায়; এতে *বিল্হণচরিত* কাব্যের পরে আরও ৯০টি শ্লোক আছে। তিনটি পাঠভেদের মধ্যে পাঁচটি শ্লোক সাধারণ— এগুলি আর্যাবর্ত পাঠের ১, ২, ১১, ১২ ও ৫০ সংখ্যক শ্লোক। *চৌরপঞ্চশিকা*-র টীকাকারদের মধ্যে গণপতি, মহেশ্বর, পণ্ডিত, রাম তর্কবাগীশ (রামোপাধ্যায়) ও রাধাকৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়।

আহ্মেদাবাদে চিত্রশালায় *চৌরপঞ্চাশিকা*-র আঠারোটি শ্লোকের চিত্রায়ণ সংরক্ষিত আছে, এগুলি পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রকলার রীতিতে ষোড়শ শতকে অঙ্কিত। পদ্মশ্রী মুনি জিনবিজয়জির সৌজন্যে এগুলি মেহ্তা সংগ্রহে স্থান পায় ও ১৯৬৭ সালে শ্রীমতী লীলা শিবস্বরকার নয়া দিল্লি থেকে এগুলির প্রতিলিপিও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন (*The pictures of the Caurapancasika: A Sanskrit Love Lyric*). এর আগে বার্লিংটন ম্যাগাজিনের নবতিতম সংখ্যায় এ ছবিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।)

অনুবাদ

১৮৪৮ সালে প্যারিসে চৌরকাব্যের ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, এইটিই প্রথম বিদেশি অনুবাদ। এর পরে ১৮৯৬ সালে স্যার এডউইন আর্নল্ড ইংরেজি ছন্দে একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ভারতীয় ভাষায় প্রথম গুজরাতি অনুবাদ (বিট্হলের) প্রকাশিত হয় *শশিকলাবিরহবিলাপ*

নামে ষোড়শ শতকের শেষে; মারাঠি অনুবাদ হয় ১৬৭১ সালে।

চৌরপঞ্চাশিকা-র বাংলা অনুবাদ ও ছায়ানুবাদ নানা ভাবে নানা সময়ে হয়েছে। গোবিন্দদাসের *কালিকামঙ্গল* কাব্যে চৌতিশায় (চৌত্রিশটি পদ্যে) সুন্দর বিদ্যাকে স্মরণ করছে। অন্য কবিরাও চৌতিশা লিখেছেন, এগুলিতে স্বর-ব্যঞ্জনক্রমে আদ্যাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে প্রত্যেক পয়ারের আদিতে। বাংলা অনুবাদে নায়িকার নাম কোথাও শশিকলা, যা যামিনীপূর্ণতিলকা নয় নায়কও চোর বা বিল্‌হণ নয়— সর্বত্রই নায়িকা বিদ্যা, নায়ক সুন্দর। এর কারণ মনে হয় *চৌরপঞ্চশিকা*-র প্রথম শ্লোকের শেষ চরণটি— 'বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি— মনে হয় সে যেন মোহাচ্ছন্ন বিদ্যা।' এর থেকেই নায়িকা বিদ্যা নাম পেয়েছে। বাংলায় তাই মঙ্গলকাব্যের এই অংশটি বিদ্যাসুন্দর নামেই পরিচিত। কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলে সুন্দর রাজার কাছে ন'টি শ্লোক পাঠ করছেন, এগুলি চৌরকাব্যের নটি শ্লোকের অনুবাদ। কাশীনাথ ব্রজবুলিতে কিছু কবিতা রচনা করেছেন (সুর-সংযোগে) যা *চৌরপঞ্চাশিকা*-র অনুবাদ বা ভাবার্থ নয়, বরং বিল্‌হণ কাব্যের অনুসরণে *বিদ্যাসুন্দর কাব্য*। বস্তুত *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যাংশগুলির আখ্যানভাগ বিল্‌হণ কাব্য থেকেই সংগৃহীত। অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরই সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানে সুন্দর রাজার সামনে *চৌরপঞ্চাশিকা*-র প্রথম ও শেষ শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করে ('ক' পুঁথি অনুসারে অবশ্য সমগ্র *চৌরপঞ্চাশিকা*-রই বাংলা অনুবাদ)। রাজা কন্যার রূপ ও সম্ভোগশৃঙ্গারের বর্ণনায় লজ্জিত হন, শ্মশানে সুন্দর পঞ্চাশটি পয়ারে কালিকার স্তব করেন। চৌতিশার মতো এগুলিরও আদ্যাক্ষর স্বর-ব্যঞ্জন-ক্রমে বিন্যস্ত। দেবী স্বয়ং অভয়দান করলে রাজার চেতনা হয় এবং বিদ্যা ও সুন্দর কৈলাসশিখরে যান। অষ্টাদশ শতকের শেষে (১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে) টীকাকার রাম তর্কবাগীশ দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেন যে চৌর কবি সুন্দর দেবী কালিকার উদ্দেশে শ্লোকগুলি রচনা করেন।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে কবীন্দ্র মধুসূদন চক্রবর্তী সম্পূর্ণ *চৌরপঞ্চাশিকা*-র অনুবাদ করেন পয়ার ছন্দে। ওই শতকেরই শেষার্ধে দ্বিজ রাধাকান্ত মিশ্রের *বিদ্যাসুন্দর*-এ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সুন্দর রাজার সামনে *চৌরপঞ্চাশিকা*-র প্রথম সাতটি ও শেষ দুটি শ্লোকের অনুবাদ করেন ও শ্মশানে চৌতিশায় কালীর স্তব করেন। ভারতচন্দ্রের সমকালীন কবি রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন তাঁর *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যে *চৌরপঞ্চাশিকা*-র প্রথম দুটি, আটাশ ও শেষ, শ্লোকের অনুবাদ করেন।

বররুচির প্রণীত বলে খ্যাত একটি *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য আছে, এটি সংস্কৃতে বিদ্যা ও সুন্দরের উক্তি— প্রত্যুক্তিক্রমে ৫৭টি শ্লোকে রচিত। (এটি শ্রীপ্রফুল্ল পালের অনুবাদে শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ বসুমতী সংস্করণে প্রকাশ করেন ১৮৭৩ সালে।) পরিশেষে, অনেক বাংলা মঙ্গলকাব্যে বিদ্যাসুন্দর অংশে সুন্দরের মুখে দ্ব্যর্থবোধক পঞ্চাশটি বাংলা কবিতা পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটির যুগপৎ বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে ব্যাখ্যা সম্ভব। কাশীনাথ সার্বভৌম *চৌরপঞ্চাশিকা*-র যে টীকা করেন এ ধরনের দ্ব্যর্থক অনুবাদ তারই ভিত্তিতে রচিত। অন্যান্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বিদ্যাসুন্দরের দ্ব্যর্থক অনুবাদে কোনও ভণিতা নেই বলে এগুলি ভারতচন্দ্রের বলে মনে করা হত; কিন্তু এখন

নিঃসংশয়ে জানা গেছে এগুলি নন্দকুমার কবিরত্নের অনুবাদ। (১৯৭৪ সালে বিশ্ববাণী থেকে প্রকাশিত শ্রীঅবন্তী সান্যাল সম্পাদিত *হাজার বছরের প্রেমের কবিতা*-য় শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদে *চৌরপঞ্চশিকা*-র ন'টি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ আছে। ইংরেজিতে প্রাগুক্ত বারবারা স্টোলার মিলার-এর বই ও *The Hermit and the Love Thief*, Columbia University Press, 1978, বইতে *চৌরপঞ্চশিকা*-র একই অনুবাদ সন্নিবেশিত আছে।

চৌরকবি ও কাহিনির পটভূমিকা

স্যার আর্নল্ড এডউইনের ধৃত পাঠে *চৌরপঞ্চাশিকা*-র পঞ্চাশটি শ্লোকের পূর্বে আরও চুয়াত্তরটি শ্লোক পাওয়া যায়; কাব্যমালার পাঠে এগুলি পূর্বপীঠিকা এবং এতে কবির পূর্ব জীবনী আছে, এখানে কবি বিল্‌হণই চোর। শেষের পঞ্চাশটি শ্লোক উত্তরপঞ্চাশৎ, এটিই *চৌরপঞ্চাশিকা*। বিল্‌হণের *পূর্বপীঠিকা* পড়ে জানা যায় মহিলাপত্তনে বীরসিংহ নামে এক চাপোৎকট রাজা ছিলেন, চম্পাবতী এঁর রাজধানী ছিল, ৯০২ খ্রিস্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। এঁর কন্যার নাম উত্তর ভারতীয় পাণ্ডুলিপিতে শশিকলা এবং কর্ণাটে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে মদনাভিরামের কন্যা যামিনীপূর্ণতিলকা। বিল্‌হণ তাঁর নিজের রচিত *বিক্রমাঙ্কদেবচরিত* গ্রন্থে আত্মকথা কিছু বলেছেন, সেখানে কিন্তু *চৌরপঞ্চশিকা*-র অনুরূপ কোনও অভিজ্ঞতার কথাই বলেননি। *বিক্রমাঙ্কদেবচরিত* ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিল্‌হণের পরিণত বয়সের রচনা। এখানে যে বিবরণ আছে সে অনুসারে তিনি ১০৬২-৬৫ সালের মধ্যে স্বদেশ পরিত্যাগ করেন ও একাদশ শতকের শেষ দিকে দেশভ্রমণ ও সাহিত্য রচনা করেন। *রাজতরঙ্গিনী*-র সপ্তম সর্গে দেখি রাজা কলশের রাজত্বকালে বিল্‌হণ তাঁর স্বদেশ কাশ্মীর পরিত্যাগ করে কর্শাটে যান; সেখানকার রাজা পরমাদি তাঁকে সভাপতিপদে বরণ করে বিদ্যাপতি উপাধি দেন (শ্লোক ৯৩৫-৩৮; এ উপাধিও কি নায়িকার নাম 'বিদ্যা' হওয়ার অন্যতম কারণ?)। বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে বিল্‌হণ বলেছেন, যারা সীমা মেনে চলে না, সর্বদা লজ্জাজনক অশুদ্ধ ভাষা বলে সেই গুর্জরদের পথে পড়ে যে সন্তাপ তিনি অর্জন করেছিলেন সোমনাথ দর্শন করে তা মোচন করেন; এখানে কি *চৌরপঞ্চাশিকা*-র অভিজ্ঞতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে?

বিল্‌হণকাব্যে পাই রাজা বীরসিংহ কন্যা শশিলেখার অধ্যাপকরূপে কবিকে নিযুক্ত করেন কিন্তু পাছে পরস্পরের প্রতি তাঁদের আসক্তি জন্মায় এই আশঙ্কায় তাঁদের বলেন যে রাজকন্যা কুষ্ঠরোগিণী ও বিল্‌হণ জন্মান্ধ। দারুযবনিকার দুই পারে থাকতেন ছাত্রী ও অধ্যাপক। এক পূর্ণিমা রাত্রে সহসা যবনিকা সরিয়ে পরস্পরকে দেখেন তাঁরা এবং অনুরাগের সঞ্চার হয়; গোপনে তাঁরা নিয়মিত মিলিত হতেন। কিছুদিন পরে রাজা জানতে পারেন ও কবির প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। ঘাতকেরা যখন তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে তখন অতীতের মিলনের স্মৃতি তাঁর মনে উদ্বেল হয়ে ওঠে এবং পঞ্চাশটি শ্লোকে তিনি শেষবারের মতো স্মৃতিচারণ করেন। তাঁর কাব্যনৈপুণ্য এবং আবেগের গভীরতায়, মুগ্ধ অভিভূত রাজা দণ্ড প্রত্যাহার করেন ও সসম্মানে তাঁর হাতে রাজন্যাকে সমর্পণ করেন।

বাংলা অনুবাদে এ-কাব্যের যে পরিণতি হোক না কেন *চৌরপঞ্চাশিকা*-য় শ্লিষ্ট অর্থ নেই, তার কোনও দ্যোতনাই নেই, এটি স্পষ্টতই শৃঙ্গাররসের কাব্য। প্রাক্‌কাহিনিটি ঐতিহাসিক সত্য কিনা সে গবেষণা নিষ্ফল; আসন্ন মৃত্যুর কালো যবনিকাখানি পশ্চাতে আছে মনে রেখে কাব্যটি পড়লে এর তীব্রতা অনুভূত হয় এবং এখানেই সম্ভবত ওই প্রাক্ কাহিনিটির উপযোগিতা ও সার্থকতা।

প্রভাব

বিল্‌হণ তাঁর *কর্ণসুন্দরী* কাব্যে বলেছেন যে তিনি কাব্যরচনায় কালিদাসের অনুগামী, একথা চৌরকাব্যে খুব স্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায়; *অজবিলাপ* ও *মেঘদূত*-এর বহু অনুকরণ এ কাব্যে পাওয়া যায়। এও এক ধরনের বিলাপকাব্য, কারণ কাহিনি অনুসারে কবি তো জানতেন না যে তাঁর আসন্ন মৃত্যু প্রতিহত হবে। বরং *মেঘদূত*-এর যক্ষ জানত যে চার মাস পরে তার বিরহের অবসান ঘটবে, চৌরকবি কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাশচিত্তেই প্রিয়তমার স্মৃতিটুকু পাথেয় নিয়ে মৃত্যুপথে অবতীর্ণ। দুই নায়কই নায়িকার ক্ষীণতা সুকুমারতা স্মরণ করে আশঙ্কিত যে এ বিরহ তাদের প্রিয়তমা সইতে পারবে না। এখানে *চৌরপঞ্চাশিকা*-য় তীক্ষ্ণতা বেশি, কারণ নায়ক প্রেমের জন্যে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

কাহিনি

সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশ কাব্যনাটকই *রামায়ণ-মহাভারত* থেকে আখ্যানভাগ সংগ্রহ করেছে, উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে প্রধান *উদয়নকথা*। *বৃহৎকথা*-য় এর উল্লেখ থাকলেও নিশ্চয়ই এর আগেই কাহিনিটি জনপ্রিয় হয়েছিল। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে নাট্যকার ভাস এ কাহিনি অবলম্বন করে একাধিক নাটক রচনা করেছেন ও পঞ্চম শতকে কালিদাস যে ভাবে 'উদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্' বলেছেন *মেঘদূত*-এ, তাতে মনে হয় গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সকলে ভিড় করে গাঁও-বুড়োর মুখে এই অপূর্ব প্রেম কাহিনিটি তন্ময় হয়ে শুনত। হয়তো দাক্ষিণাত্যে এমনই একটি কাহিনি ছিল চোর কবির এই গোপন প্রেমের কাহিনি। দুই কাহিনিতেই গুরু-শিষ্যার প্রেমই কাহিনির মূলবস্তু চৌরকবির কাহিনি এমন করেই স্থানীয় শ্রোতার মর্ম স্পর্শ করেছিল যে শুনতে পাই:

বসো শুভ্রমৃর্তুবসন্তসময়ঃ পুষ্পং শরণ্মল্লিকা।
ধানুষ্কঃ কুসুমায়ুধঃ পরিমলঃ কস্তুরিকাস্ত্রং ধনুঃ ।।
বাণী তর্করসোজ্জ্বলা প্রিয়তমা শ্যামা বয়ো যৌবনং।
মার্গঃ শাংকর এব পঞ্চমলয়া গীতিঃ কবির্বিল্‌হণঃ ।।

(বসনের মধ্যে (শ্রেষ্ঠ) শুভ্র বাস, ঋতু বসন্ত, ফুল শরতের মল্লিকা, ধনুর্ধর পুষ্পধনু মদন, প্রিয়তমা সদ্যযৌবনা নারী, বয়স যৌবন, ধর্মমার্গ শৈব, গান পঞ্চমলয়যুক্ত এবং কবিকুলে শ্রেষ্ঠ বিল্‌হণ।)

অত্যুক্তি বাদ দিলেও বিল্‌হণের আঞ্চলিক যশ এ শ্লোকে প্রতিষ্ঠিত। প্রসন্নরাঘবে জয়দেব কবিতা নায়িকা সম্বন্ধে বলেছেন:

যস্যাশ্চৌরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপুরো ময়ূরো।
ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণুসত্মস্তু বাণঃ।
কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায়।।

(চৌরকবি যাঁর কেশকলাপ, ময়ূর কবি যাঁর কর্ণাভরণ, ভাস হাসি, কবিকুলগুরু কালিদাস যাঁর বিলাস, শ্রীহর্ষ যাঁর আনন্দ, বাণভট্ট যাঁর চিত্তে মদনস্বরূপ এমন কবিতাকামিনী, বল, কার না কৌতুকের হেতু?)

এখানে সম্ভবত প্রচ্ছন্ন প্রেমের কবি বলেই বিল্‌হণকে অন্ধকার কেশকলাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চৌরকবির এই গোপন প্রেম, ধরা পড়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এবং মৃত্যুর ঠিক পূর্বাহ্নে তদ্‌গতচিত্তে কবিতায় প্রিয়ামিলনের স্মৃতিমন্থন এবং সে কাব্যের মহিমায় অভিভূত প্রসন্ন রাজার প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে কন্যাদান— এ সমস্ত ব্যাপারটির ঐতিহাসিকতা যত ক্ষীণই হোক না কেন মৃত্যুর মুখোমুখি এসে প্রেমিকার স্মৃতিতে বিহ্বল কবিচিত্তের এই উচ্ছ্বাস; এটি নিশ্চয়ই আপামর সাধারণের চিত্তজয় করেছিল— এর করুণ মাধুরী দিয়ে। এবং জনমানসে এ কাব্য যে অক্ষয় আসন লাভ করেছিল তা শুধু এর কাব্যমাহাত্ম্যে নয়, ওই আসন্ন মৃত্যুর ক্রূর পটভূমিকার মাহাত্ম্যেও বটে।

খণ্ডকাব্য চৌরপঞ্চাশিকা

চৌরপঞ্চাশিকা কাব্যটি খণ্ডকাব্যের অন্তর্গত অর্থাৎ এ কাব্যে শ্লোকগুলি পরস্পর সংবদ্ধ নয়, কোনও আখ্যান বিবৃত করে না, ন্যূনাধিক পঞ্চাশটি আপাতবিচ্ছিন্ন শ্লোকের সমাহারে কাব্যটি রচিত। এই যুগেই শতককাব্যগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর পূর্বযুগে ভর্তৃহরির শতকত্রয় (*নীতিশতক*, *বৈরাগ্যশতক* ও *শৃঙ্গারশতক*), অমরুর *অমরুশতক*, বাণভট্টের *চণ্ডীশতক*, ময়ূরকবির *সূর্যশতক*-ই সমধিক প্রসিদ্ধ শতককাব্য। এগুলির মধ্যে শৃঙ্গারশতক ও *অমরুশতক*-ই *চৌরপঞ্চাশিকা*-র সঙ্গে তুলনীয়। অপরপক্ষে শতককাব্য ছাড়াও শৃঙ্গাররসাশ্রিত কবিতার অনুরূপ সংকলন পাই; এগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কালিদাসের *মেঘদূত*, পরে এর অনুসরণেও কিছু শৃঙ্গাররসের দূতকাব্য রচিত হয়। সম্ভবত কালিদাসেরও পূর্বে মাত্র বাইশটি শ্লোকের একটি কবিতাগুচ্ছ *ঘটকর্পরকাব্য* (ইয়াকবি এটিকে প্রাক্‌কালিদাস রচনা বলেছেন)। এখানে বিরহিণী মেঘকে দিয়ে বিদেশে প্রেমিককে বার্তা পাঠাচ্ছে। (সম্ভবত এটি ও মেঘদূত দুটিরই ওপর চিনা এক মেঘদূতকাব্যের প্রভাব আছে)। পরবর্তীকালে গোবর্ধনাচার্যের *আর্যাসপ্তশতী* ৭০০টি আর্যা শ্লোকের সমষ্টি, তেমনই ময়ূরাষ্টকের আটটি শ্লোকে মিলনের অন্তে আসন্ন বিরহের বর্ণনা। বিষয়গত ভাবে *চৌরপঞ্চাশিকা*-র সঙ্গে কিছু মিল থাকলেও ময়ূরের কবিত্ব বিল্‌হণের তুলনায় দীন, তেমনই *সুভাষিতাবলী* বা *কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়*-তে পাণিনির নামে আরোপিত

শৃঙ্গাররসাত্মক শ্লোকগুলি চৌরপঞ্চাশিকার তুলনায় অপকৃষ্ট। কেবল *মেঘদূত*, *অমরুশতক* ও *শৃঙ্গারশতক*-এর কয়েকটি কবিতা *ঘটকর্পরকাব্য* ও *গীতগোবিন্দ*-এর কিছু শ্লোকের সঙ্গেই *চৌরপঞ্চাশিকা*-র তুলনা চলে। *মেঘদূত*-এর প্রভাবই এ কাব্যে বেশি; *মেঘদূত*-এর মতো একটি ছন্দেই সমগ্র কাব্যটি রচিত। কিন্তু মেঘদূতে শ্লোকগুলির বিষয়গত পারম্পর্য আছে, চৌরকাব্যে তাও নেই। আসন্নমৃত্যু প্রেমিকের স্মৃতিতে মিলনের বিভিন্ন লীলায় প্রেমিকার ভূমিকা, রূপ, আচরণ ও প্রতিক্রিয়া একে একে উদিত হচ্ছে, এইটি এর বিষয়গত যোগসূত্র। যেমন আঙ্গিকগত যোগসূত্র হচ্ছে প্রায় প্রত্যেক শ্লোকের শুরুতে 'অদ্যাপি তাং' এবং শেষ দিকে 'স্মরামি' বা 'চিন্তয়ামি'— আজও তাকে মনে পড়ে। এটি ধ্রুবপদের মতো এবং আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্লোকগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করে।

চৌরপঞ্চাশিকা-য় অলংকারপ্রয়োগ খুবই পরিমিত, উপমা রূপক ও উৎপ্রেক্ষাই মূলত ব্যবহৃত হয়েছে। এ কাব্যে আঙ্গিকগত কলাকৌশল বা দুরূহতা নেই বললেই হয়। বর্ণনার নৈপুণ্যে মিলনলীলার নানা দৃশ্য যেন চিত্রশালার পটের মতো একে একে উদঘাটিত হচ্ছে এবং শব্দেবর্ণেগন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে ইন্দ্রিয়গোচর হয়ে উঠছে— এ কাব্যের উৎকর্ষ এইখানেই। লজ্জা, মান, কোপ, দ্বিধা, আত্মসমর্পণ, বেদনা, ক্লেশ, খেদ, ক্রন্দন, তন্দ্রা, ঔৎসুক্য, শ্রান্তি, হর্ষ এ সব যেমন স্পষ্ট চোখে দেখা যায়। শৃঙ্গার এখানে স্থায়িভাব, আর এই যে নানা ব্যাভিচারিভাবের ঐশ্বর্য এর দ্বারা কাব্যটিতে যেন বিচিত্র বর্ণসমাবেশ ঘটেছে। আর আছে আড়ম্বরের বাহুল্য— তরুণী নায়িকার গৌর বর্ণ, সুকুমার অবয়বসংস্থান, তার মহার্ঘ বসন, অলঙ্কার প্রসাধনের বর্ণাঢ্যতা, তার কেশকলাপের বিস্তার, পুষ্পাভরণ, অগুরুচন্দনকস্তুরীকুঙ্কুমের গন্ধমদিরতা ও ওষ্ঠাধরে তাম্বুলরক্তিমা— এ সবের বর্ণনায় মনে হয় মিলনমন্দিরের বাতাসও যেন পুষ্পসজ্জার সম্ভারে ও ধূপের সৌরভে মন্থর। শুধুমাত্র নিপুণ শব্দগ্রন্থনার দ্বারা উদ্দীপনবিভাবের এমন একটি আবহ রচনা করা সহজসাধ্য নয়, এখানে বিল্‌হণের অবিসংবাদিত কৃতিত্ব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিল্‌হণের ঘনসন্নিবদ্ধ সমাস ও সুপ্রযুক্ত অনুপ্রাসের মাধ্যমে তাঁর উপলব্ধ অনুভবটি বারেবারেই যথাযথ ভাবে রূপায়িত হয়ে সার্থক ভাবে পাঠকচিত্তে সঞ্চায়িত হয়েছে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যায়: 'অদ্যাপি তাং সুরতজাগরঘূর্ণ্যমান-তিযগ্‌বলত্তরলতারকমায়তাক্ষীম।' (৫) একটি মাত্র সমাসে শুধু যে নায়িকার জাগরক্লান্ত চোখ দুটির বর্ণনা তা নয় মিলনান্তিক অনুভাবেরও বর্ণনা। শুধুমাত্র শব্দের ঝংকারে অনুপ্রাসের মাধুর্যে বিবক্ষিত বস্তু এক ভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বারংবার; যেমন প্রথম শ্লোকেই— 'অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিং...' এখানে শুধু যে নায়িকার গৌরবর্ণ ও সুন্দর মুখ বর্ণিত হলো তা নয়, দুটি ফুলের অনুষঙ্গে সৌকুমার্য সতেজতা ও কমনীয়তাও ব্যঞ্জিত হল। তেমনই,— 'অদ্যাপি তাং নয়নরুজ্জলমুজ্জ্বলাস্যং;' (৪০) এখানে অনুপ্রাসের মধ্যে সুন্দর একটি মুখে দুটি কাজলকালো উজ্জ্বল চোখ অতি সহজে ফুটে উঠেছে। নায়িকার বর্ণনায় অন্যত্র একটি সমাস প্রয়োগ করছেন— 'শৃঙ্গারবারিরুহকানন-রাজহংসীং';

(২২) প্রেমের পদ্মবনে সে যেন রাজহংসী। সমাসবদ্ধ এই রূপক অলংকারে গৌরাঙ্গী রাজকন্যার রাজহংসীর মতো চলার আভাস শৃঙ্গাররসের উদ্দীপক দেহকান্তি এবং পদ্মবনের অনুষঙ্গের মধ্যে সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতার ব্যঞ্জনা নিহিত আছে।

শিল্প-সমীক্ষা

যে প্রেমের চিত্র বিল্‌হণ এঁকেছেন মুখ্যত তা হল নবপরিণীতা দম্পতির প্রণয়চিত্র; গোপন মিলনের কাহিনিটি তাঁর সৌষ্ঠববৃদ্ধি করেছে। এ কাব্যে আছে— বাসকসজ্জা, পূর্বরাগ, মান, মানভঞ্জন, উৎকণ্ঠা, বিরহ, মিলন ইত্যাদি শৃঙ্গারের নানা বিচিত্র অবস্থার রূপায়ণ। প্রধানত সম্ভোগলীলার। এর পটভূমিকা করুণরসের, নায়কের আসন্ন মৃত্যু ও নায়িকার আসন্ন বিরহের। লক্ষণীয়, যে নায়ক জানে যে তার মৃত্যু আসন্ন, অনিবার্য, তবু কোথাও তা নিয়ে তার বিলাপ নেই, তার একমাত্র চিন্তা, তার বিরহে তার প্রণয়িণী কি করে বাঁচবে।

আজকের পাঠকের কাছে হয়তো এ কাব্য অত্যধিক দেহাশ্রয়ী মনে হবে। এ প্রেম যেন সম্পূর্ণই দেহনিষ্ঠ সম্ভোগশৃঙ্গারেই পর্যবসিত। দেহকে উপভোগ্য ও মনোহারী করে তোলার অপর্যাপ্ত উপকরণসম্ভার— বসন উত্তরীয় অলংকার অগুরু কুঙ্কুম চন্দন মুক্তামালা পুষ্পহার কবরী অলকাতিলকা কাজল ওষ্ঠরঞ্জনী তাম্বুলরাগ। সখীরা, গেহসজ্জা, যৌবন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও তৃপ্তি সব মিলে প্রথম প্রণয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে যেন অতিক্রম করতে পারেনি কাব্যটি! সেই সদ্য সঙ্গসুখলাভের উদ্দামতাই যেন এর সীমা নিরুপরণ করছে। তবু এই উচ্ছ্বাসই কখনও কখনও তার আপন তীব্রতাতেই নিজের লঘু ভঙ্গুরতাকে অতিক্রম করে কাব্যের অলকায় উত্তীর্ণ হয়।

গভীরতায় পরিনিষ্ঠিত প্রেমের দু-চারটি উদাহরণ দেওয়া যায়: 'আজও ফিরে ফিরে মনে আসছে সে দিন রাত্রে (প্রণয়কলহে) কুপিতা রাজকন্যা আমার হাঁচির পরে "দীর্ঘজীবী হও" এ কথা উচ্চারণ করেনি (বটে) কিন্তু নীরবে কানে তার সোনার মঙ্গলপল্লবটি ধারণ করেছিল।' (১১) '...আজ এই দিবসের অবসানেও যদি তাকে দেখতে পাই তবে পৃথিবীর রাজত্ব, স্বর্গ এমনকী মোক্ষও ত্যাগ করতে পারি।' (২৩) এই অতিশয়োক্তি প্রেমিকের, কিন্তু ওই বিশেষ উপলব্ধির তীব্রতার মুহূর্তে এটি আর অতিশয়োক্তি থাকে না, এবং সেই কারণেই কবিতাটি একানে বিশেষ ভাবে রসোত্তীর্ণ হয়। এমনই আর একটি আপাত-অত্যুক্তি হল 'আজও, এই অন্তিম মুহূর্তেও আমি এই দেখে বিস্মিত হচ্ছি যে সব কিছু জেনেও আমার বুদ্ধি দেবতাদের পরিত্যাগ করে 'কান্তা আমার, প্রিয়তমা আমার, একান্তই আমার তুমি', বলে প্রতি মুহূর্তে কেবল তারই দিকে ধাবিত হচ্ছে।' (২৭) এখানে তরুণ প্রেম তার চপলতা পরিহার করে অনুভবের গভীরতাকে স্পর্শ করেছে এবং এর দ্বারা কাব্যটি নতুন একটি মাত্রা লাভ করেছে। 'আমার যাওয়ার কথা কানে আসা মাত্র ভীরু হরিণীর মতো আর্ত হয়ে উঠল তার চোখ দুটি, বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরতে লাগল, মুখটি নত করে রইল সে— আজও মনে পড়ছে সে দৃশ্য।' (২৮) 'আমার প্রিয়ার মুখটির স্মৃতি দিনে-রাতে আমার চিত্তকে পীড়িত

করছে আজও; পূর্ণচন্দ্রের মতো সে মুখের লাবণ্য রতিকে পরাজিত করে, আজ সামনে এল প্রতিপদ, আর তাকে দেখতে পাব না।' (৩২) সংস্কৃত সাহিত্যে সুন্দর মুখের উপমানরূপে চন্দ্র ও পদ্ম বহু পুরাতন, কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদের সৌন্দর্য যে মুখে সেটি দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হলে বিরহের অন্ধকারের লগ্ন প্রতিপদ আসন্ন, এ কথা বিচ্ছেদের তীব্রতাকে এমনই স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছে যার তুলনা বিরল। কবি বলছেন... 'আমার জীবনের একমাত্র আশাস্থল সেই তরুণীটিকেই স্মরণ করছি... জন্মান্তরে সেই যেন আমার গতি হয়— স্বর্গ নয়, মোক্ষ নয়, যে প্রেমের অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে জন্মান্তরে যেন সেই প্রেম চরিতার্থ হয়। (৩৩) আসন্নমৃত্যু প্রেমিকের এই অন্তিমবাসনা কাব্যটিকে নতুন এক গৌরব দান করেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্র ও নারীর চিত্র: পঞ্চম থেকে একাদশ শতক

এক

সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত সমাজচিত্রের ছকটা নির্ণীত হয় শাস্ত্র সমাজকে যে অনুশাসন দেয় তার দ্বারা। অবশ্যই সাহিত্যিকের এ কাঠামোকে অতিক্রম করবার স্বাধীনতা আছে। স্বাধীন স্বপ্ন দেখবার, নির্দিষ্ট সামাজিক অনুশাসন বা পরম্পরাক্রমে আগত কাঠামোর সমালোচনা করবার স্বাধীনতাও তাঁর আছে। সীমিত এই স্বাধীনতা সংস্কৃত সাহিত্যেও কখনও কখনও দেখা গেছে। কিন্তু মোটের ওপরে সাহিত্য সামাজিক নিয়মকে লঙ্ঘন করেনি, তাকে প্রতিবিম্বিত করেছে মাত্র। অতএব প্রথমে এই কাঠামোকে সাধারণ ভাবে চিনে নেওয়া ভাল।

শূদ্রের ক্ষেত্রে ধর্মসূত্র থেকে ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থ পর্যন্ত সকলেই এককাব্যে বলেছে যে, তার স্থান অন্য তিন বর্ণের নিচে এবং তার একমাত্র কর্তব্য হল সর্বতো ভাবে এদের সেবা করা। পরবর্তীকালে জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের দ্বারা এই মতকে দৃঢ় করা হয়েছে এই বলে যে, পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলেই শূদ্রজন্ম এবং এ জন্মে যথোপযুক্ত ভাবে দ্বিজসেবা করলে পরজন্মে সে উচ্চতর বর্ণে জন্মাবে; এ জন্মে দ্বিজসেবায় ত্রুটি ঘটলে সে আরও হীন পশুযোনি প্রাপ্ত হবে। এই সব মত চালু থাকার ফলে শূদ্রের স্থান ছিল ত্রিবর্ণের পাদপীঠে। সব শূদ্র দাস নয়, শূদ্রদের মধ্যে অভাগ্যত যারা তারাই দাস, অন্যরা বৃত্তিজীবী। এই বৃত্তিজীবীদের দুটি ভাগ: 'অনিরবসিত' ও 'নিরবসিত' অর্থাৎ জলচল ও জল-অনাচরণীয়। এই দ্বিতীয় ভাগে আছে বৃষল, পুল্কস, শ্বপাক, ডোম্ব, চণ্ডাল।

সাহিত্যে দু রকম শূদ্রই পাই। কালিদাসের *রঘুবংশ*-এ আদর্শ রাজা দিলীপের বর্ণনায় জাতি সম্বন্ধে কালিদাসের কালের সমাজের যে বোধ ছিল তার একটি দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞা পাই: 'মনুর খুঁড়ে দেওয়া পথটি থেকে তাঁর প্রজারা এক চুলও এ-দিক ও-দিকে যেত না।' (১৪:৬৭) অর্থাৎ গুপ্ত সাম্রাজ্যের কালে *মনুসংহিতা*-র অনুশাসনই অলঙ্ঘ্য ছিল। *মনুসংহিতা*-য় জন্মভিত্তিক জাতি, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, দ্বিজের অধিকার ও শূদ্রের সর্বাত্মক হীনতা সুদৃঢ় ভাবে কীর্তিত ও অপ্রতিরোধ্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম*-এ এক জেলের দেখা পাই, প্রহরীরা যাকে বিদ্রূপ করছে তার বৃত্তি নিয়ে। তার ধরা মাছের পেটে দুষ্যন্তের আংটি পাওয়া গেছে এ কথা তারা বিশ্বাসই করে না, মনে করে সে আংটি চোর; তাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্যে তাদের হাত নিসপিস করছে। অবশেষে আংটি পেয়ে দুষ্যন্ত যখন তাকে অর্থ পুরস্কার দিলেন তখন সে নির্দোষ প্রমাণিত হল বটে, তবু সম্ভবত ভয়েই পুরস্কারের এক অংশ প্রহরীকে উৎকোচ দিল। এতে সমাজে তার সন্ত্রস্ত অবস্থান বেশ স্পষ্ট ভাবেই সূচিত

হয়। *রঘুবংশ*-এ *রামায়ণ*-এর শম্বুকবধ উপাখ্যানের পুনরাবৃত্তি আছে। রাম এখানে তপস্বী শূদ্রকে হত্যা করে দেশকে পাপমুক্ত করলেন; কিন্তু কালিদাস *রামায়ণ*-এর উপাখ্যানে যে খুব স্বস্তিবোধ করেননি তার দুটি প্রমাণ রেখে গেছেন। প্রথমত, 'তপঃশীর্ণ শূদ্রের মুখটি শুষ্করেণুযুক্ত পদ্মের মতো, রাম খড়্গের আঘাতে সেটিকে মৃণাল থেকে বিচ্যুত করলেন' (১৫:৫১-৫২)— এই উপমাটির মধ্যে। দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর পরে শম্বুক সদগতি লাভ করল— এই বৈপ্লবিক উক্তির মধ্যে। বৈপ্লবিক, কারণ বাল্মীকির মতে যে পাপিষ্ঠ, তার সদগতিলাভের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অষ্টম শতকে ভবভূতির *উত্তররামচরিত*-এ দেখি এই উপাখ্যানই নাট্যকারের স্পর্শকাতর চিত্তকে কতটা অস্থির করে তুলেছে। তাই *রামায়ণ*-এ যেখানে শম্বুকবধের পরে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে দেশে অনাচার নিবারণের জন্য রামকে অভিনন্দিত করেন, বলেন, শূদ্র কখনও স্বর্গভাক্ হতে পারে না, সেখানে *উত্তররামচরিত*-এ মৃত্যুর পরেই শম্বুক দিব্যপুরুষে রূপান্তরিত হন এবং রাম তাঁকে বলেন, 'তুমি তোমার কঠিন তপস্যার ফল ভোগ কর; যেখানে সুখ, আনন্দ, পুণ্য ও সমৃদ্ধি নিত্য বিরাজিত, বৈরাজ নামের সেই প্রশান্ত ও উজ্জ্বল লোকের অধিকারী হও।' (দ্বিতীয় অঙ্ক)। এই উক্তির মধ্যেই ধর্মশাস্ত্র, বাল্মীকি ও সমাজের অমানবিক বিধানের একটা সমালোচনা রয়ে গেছে।

ভারবির *কিরাতার্জুনীয়*-তে দেখা দিয়েছে এক কিরাত, যে তপস্যারত অর্জুনকে কঠোর কথা বলেছে; তার আচরণ বলিষ্ঠ, দৃপ্ত। কিন্তু সে শূদ্র নয়, কিরাত; বর্ণবিভক্ত সমাজের প্রান্তবাসী, যেমন নিষাদ বা শবর, কাজেই বর্ণবিন্যাসের ছকের বাইরে। মাঘের *শিশুপালবধ*-এ শূদ্রের শূদ্র পরিচয়ে কোনও স্বতন্ত্র ভূমিকা নেই।

প্রথম বিস্ময়কর ব্যতিক্রম বাণভট্টে। এখানে *কাদম্বরী*-তে শবরসেনাপতি তার শক্তিতে, দেহের বলিষ্ঠতায়, শিকারির নিষ্ঠুরতায় সত্যকার জীবন্ত একটি চরিত্র: 'যেন নতুন জন্ম নিয়ে এল একলব্য। কপালে তার তিনটি রেখা, যেন তার ভক্তিতে প্রীত হয়ে কাত্যায়নী, "এ আমারই লোক" বলে ত্রিশূল দিয়ে চিহ্নিত করেছেন তার ললাট।' কত অনায়াসে কবি চণ্ডালকে কাত্যায়নীর স্বত্ব ক্ষণে চিহ্নিত করলেন। এখানে তিনি সপ্তম শতকের সমাজের মূল্যবোধকে ছাড়িয়ে গিয়ে কবির চোখ দিয়ে দেখলেন: ওই বলিষ্ঠ পুরুষ মহিষমর্দিনীর আপন অধিকারের মানুষ। কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য চিত্র আছে: রাজা শূদ্রক সভায় বসে আছেন। এমন সময়ে প্রবেশ করল এক বর্ষীয়ান চণ্ডাল; ব্যায়ামপুষ্ট আঁট গড়নের দেহ তার, বিগতযৌবন, সৌম্যকান্তি। সঙ্গে এল একটি চণ্ডালকন্যা:

> সে যেন বিষ্ণুর মোহিনীমূর্তি, অসুরদের কাছ থেকে অমৃতহরণ করবার সময়কার সেই ছদ্মবেশ; সে যেন ইন্দ্রনীল মণিতে গড়া একটি সচল পুত্তলিকা, পরনে তার নীল কঞ্চুক, আরক্ত অবগুণ্ঠন, যেন নীলপদ্মের বনে এসে পড়েছে অপরাহ্নের রক্তছটা। ললাটে তার গোরোচনার চিহ্ন, যেন কিরাতবেশিনী ভবানী। সে যেন স্বয়ং লক্ষ্মী, নারায়ণের বক্ষোলগ্ন ছিল বলেই শ্যামবর্ণা... যেন বলরামের ভয়ে পলায়নে উদ্যতা যমুনা নদী... পা দুটি তার অলক্তরঞ্জিত, যেন মহিষাসুরের রক্তে রঞ্জিতচরণা দেবী কাত্যায়নী। নূপুরমণির ছটায় উজ্জ্বল তার দেহবর্ণ, যেন তার জাতটি শুধরে দেওয়ার জন্য অগ্নি স্বয়ং তাকে আলিঙ্গন করছেন।

লক্ষ্মীর মতো তারও হাতে ধরা আছে একটি পদ্ম। সে মূর্ছার মতো মনোহারিণী, নিদ্রার মতো লোচনগ্রাহিণী। সে যেন মধুমাসের পদ্মবন, তাই তাতে জাতি (অন্যার্থ জুঁইফুল) নেই।

লক্ষণীয় এ বর্ণনায় কবি চণ্ডালকন্যার বর্ণনায় বারে বারে উপস্থাপিত করছেন দেবতাদের; বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কাত্যায়নী, ভবানী, যমুনা, অগ্নি। কাদম্বরীতে চণ্ডালকন্যা এই একবারই উদিত হয়েছে, কিন্তু কি মমতা দিয়ে কবি তাকে গড়লেন! এবং, কোনও সংশয়ই রাখলেন না যে সমাজে তার অস্পৃশ্যতা নিয়ে তিনি অস্বস্তি কিংবা কুণ্ঠা বোধ করছেন। অথচ বাণভট্ট বর্ণবিভক্ত সমাজের প্রকাশ্য সমালোচনা কোথাও করেননি, বরং তাঁর বংশ পঙ্‌ক্তিভোজনের ব্যাপারে শুদ্ধাচারী এ কথা সগর্বে বলেছেন। তবু মনে হয় এই ব্রাহ্মণগর্বিত ধনী রাজকবির চেতনায় যে সুকুমার কল্পনাবৃত্তি ও সংবেদনা ছিল তা হয়তো তাঁর অবচেতনেই সঞ্চারিত করেছিল সমাজের অসমদৃষ্টির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ, যার তির্যক উচ্চারণ এই সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন চণ্ডালকন্যার সৃষ্টিতে।

সাধারণ শূদ্র শ্রমজীবীকে বাণভট্টে ইতস্তত দেখা যায়। হর্ষ চরিত-এ সপ্তম উচ্ছ্বাসের শেষ দিকে গ্রাম ও অরণ্যজীবনের একটি চিত্র আছে, যেখানে শ্রমজীবী শূদ্র নানা বৃত্তিতে দেখা দিয়েছে।

> একটি বনগ্রামে, অন্য গ্রাম থেকে কাঠুরেরা কাঠ কাটতে এসেছিল, বনপাল শুধু যে তাদের আটকেছে তাই নয়, তাদের কুড়ুলও কেড়ে নিয়েছে।... কোদাল নিয়ে গরিব চাষিরা ছোট ছোট ধানজমি আর ধানমাড়াইয়ের জায়গা ভাগাভাগি করে নিচ্ছে; এদের হাল বলদ লাঙল কিছু নেই, আছে শুধু কোদাল। পরিবার প্রতিপালনের জন্যে এরা শক্ত পতিত জমিতে চাষ করার চেষ্টা করছে, জমিতে দৃঢ়মূল আগাছা আর কাঁটাঘাস হয়েছে, সেগুলো উপড়ে ফেলা খুবই শক্ত; তা ছাড়া বন্য জন্তুর উপদ্রবও আছে। কাঠুরেরা জঙ্গলে সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করবে— সে জন্যে গায়ে হাতে পায়ে তেল মেখে নিয়েছে। তাদের কাঁধে বড় বড় ভারী কুড়ুল, দুপুরের খাবারটুকু পুঁটলি বেঁধে গলায় ঝোলানো আছে। জঙ্গলে ডাকাতের উপদ্রব, তাই এরা ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় পরে চলেছে। ব্যাধরা ঝোপের মধ্যে খাঁচা লুকিয়ে রেখে পাখি ধরার চেষ্টা করছে। বনের প্রান্তবাসীরা বন থেকে পণ্য সংগ্রহ করে চলেছে: শীধু গাছের বাকল, ধাতকী ফুল, তুলো, অতসী আর শণ দিয়ে তৈরি কাপড়, মধু, ময়ূরের পালক, মালা করে গাঁথা মোমের তাল। ঝুড়িভরা নানা রকম বুনো ফল মাথায় নিয়ে চলেছে মেয়েরা। পতিত জমিতে সার দেওয়ার জন্যে নড়বড়ে বলদের গাড়িতে এনেছে ধুলো, আবর্জনা ও গোবরের স্তূপ।

চিরদরিদ্র শূদ্র তার দারিদ্র্য, শ্রম আর বঞ্চনা নিয়ে উপস্থিত এই আলেখ্যে।

ওই সপ্তম উচ্ছ্বাসের প্রথমে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধযাত্রার আরম্ভে সেনাবাহিনীর বর্ণনা:

> হাতি ঘোড়া গাধা ও উটের পালক পরিচারক চেটক দাসের স্থানপাল ও ঘাসিক এরা সবাই চলেছে। এদের ওপর খবরদারি করছে গরিব গেরস্থবাড়ির ছেলেরা। সৈন্যদল চলছে ভারেভারে প্রয়োজন ও বিলাসের উপকরণ নিয়ে। ছোট ছোট কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আসছে সৈন্যরা, আত্মীয়রা বাইরে এসে বিদায় দিচ্ছে তাদের। হাতির পায়ের তলায় দলে

পিষে গেল কত কুঁড়েঘর, বাসিন্দারা কোনও মতে প্রাণ বাঁচিয়ে এসে মাহুতদের উদ্দেশে ঢিল ছুঁড়ছে। সৈন্যদের সঙ্গে চলেছে চুন্দী বা কুট্টনী, থপথপে মোটা বর্ষীয়সী; এদের দেখে হাসাহাসি করছে লোড়কেরা। গেরস্থবাড়ির বউরা চলেছে বাহনে চড়ে; তাদের চারদিকে ভিড় করেছে মন্দ লোকেরা, যাদের পাঠিয়েছে অভিজাত পুরুষরা ওই বউদের ফুসলে আনার জন্যে। সৈন্যদলের যাত্রাপথে হাতি ঘোড়ার দানাশস্য ছড়িয়ে পড়েছে। আশপাশের লোকেরা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দুস্থ কুলপুত্ররা সৈন্যযাত্রার নিন্দে করছে। গরিব গ্রামের লোকদের কাছ থেকে অনেক কষ্টে বলদ নিয়ে এসে তাদের পিঠে বোঝা চাপিয়েছে তারা, দুর্বল বলদগুলো ভার বইতে পারছে না বলে এরা নিজেরাও কাঁধ দিয়েছে বইবার জন্যে। বলছে, 'এই সৈন্যযাত্রা শেষ হলে বাঁচি। উচ্ছন্ন যাক এ সব। শেষ হোক এই অতিলোভ, চাকরিকে দণ্ডবৎ।'

শূদ্রই শুধু দাস নয়, সব চাকরিই দাসত্ব, এ সম্বন্ধে আমাদের কবি অবহিত ছিলেন তাই অপেক্ষাকৃত উচ্চপদস্থ এক রাজকর্মচারী প্রাগজ্যোতিষপুরের দূত হংসবেগকে দিয়ে বলিয়েছেন, 'মনস্বী মানুষ এক মুহূর্তের জন্যে হলেও মনুষ্যত্ব দেখাক; ত্রিভুবনের রাজ্যভোগের লোভেও মনস্বীর নত হওয়া উচিত নয়।'

ভট্টির *রাবণবধ* কাব্যে শূদ্র প্রায় অনুপস্থিত বললেই হয়; কাহিনি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত, কাজেই অবকাশও কম। দ্বিতীয় সর্গে গোপবধূদের দধিমন্থনের বর্ণনা আছে একটি শ্লোকে (১৬) কবি দৃশ্যটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ, মধুর সঙ্গীত ও নৃত্যের মতো তালে গোয়ালিনীদের দেহসঞ্চালনের মনোরম বর্ণনা। মাঘের শিশুপালবধে একটি ছোট উল্লেখ দৃষ্টি আকর্ষণ করে: কৃষ্ণ যখন সসৈন্যে যাত্রা করেছেন তখন তাঁর সৈন্যদল গ্রামবাসীদের ওপরে কোনও অত্যাচার করেনি বা কষ্ট দেয়নি। (১২:৩৬) এর পিছনের বাস্তব কী ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। মাঘে পঙ্‌ক্তিপাবনের উল্লেখ পাই (১৪:৩৩) এবং সদব্রাহ্মণের সম্বন্ধে শুনি: খাবার সময়ে তাদের বাসনে ছোঁওয়াছুঁয়ি হয়নি— অকৃতপাত্রসংকরৈর্ভোজনৈঃ (১৪:৫০), রৈবতক পাহাড় শ্রেয়ান (৪:৩৭)। অন্যত্রও বারে বারে দ্বিজের শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃসিদ্ধের মতোই উচ্চারিত, অর্থাৎ শূদ্র দ্বিজের পায়ের তলায়।

দণ্ডীর সমাজ সম্বন্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল, *দশকুমারচরিত*-এ সমাজের একটি বৃহৎ ব্যাসাংশ প্রতিফলিত, এতে শূদ্রের নানা বৃত্তি, নানা অবস্থা দেখা যায়। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে মাতঙ্গ নামে এক ব্রাহ্মণের দেখা পাই যে কিরাতদের মধ্যে বাস করেও ডাকাতি করে; ব্রাহ্মণ্য আচরণ সে বর্জন করেছে। রাজা রাজহংসের বন্ধু এক শবর রাজা— এ উল্লেখও আছে।

শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* পড়ে মনে হয় জাতি ও বৃত্তি যে চরিত্র নিরুপণ বা নিয়ন্ত্রণ করে না এ বোধ তাঁর ছিল। বহুতর বৃত্তির প্রতিবিম্বন এ নাটকে কিন্তু প্রায় সর্বত্রই মানুষকে বৃত্তিনিরপেক্ষ ভাবে ভাল বা মন্দ দেখানো হয়েছে। দুটি রাজপুরুষ (প্রহরী)— বীরক ও চন্দনক; বীরক যান্ত্রিক ভাবে কর্তব্য করে, চন্দনকের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ মানবিক। শ্মশানে দুটি চণ্ডাল, গোহ ও আহীন্ত, এদের মধ্যেও একই পার্থক্য। বরং শূদ্র দাসের ক্ষেত্রে *মৃচ্ছকটিক*-এ যেন বেশি সহানুভূতি। চারুদত্তের দাস বর্ধমানক, দাসী রদনিকা— এদের প্রভুভক্ত বললে ঠিক

হয় না। এরা চারুদত্তের গুণমুগ্ধ, এদের প্রতি তাঁর ব্যবহারেও সুবিচার ও মমতা প্রকাশ পেয়েছে। ধনমদমত্ত সংবাহকের আচরণ নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, অমানবিক; কিন্তু তার ভৃত্য স্থাবরকের আচরণে মহানুভবতা ও আদর্শবাদিতার পরিচয় মেলে, প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করে সে তার চরিত্রের মর্যাদা রক্ষা করেছে। এ নাটকে শূদ্র বা দুস্থের মধ্যে মানবিকতার অভাব কখনও ঘটেনি।

অষ্টম শতকে ভবভূতির *উত্তররামচরিত*-এ শম্বুকবধ ছাড়া স্বতন্ত্র ভাবে শূদ্রের কোনও চিত্র নেই; এ কাহিনির উল্লেখ পূর্বেই করেছি। নবম শতকে ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতারচরিত-এ সাধারণ প্রজা হিসেবে উপস্থিত শূদ্র। যেহেতু এ কাব্যের উপজীব্য, পৃথিবী উদ্ধারের জন্যে বিষ্ণুর মর্তে অবতরণ, সেহেতু পাপক্লিষ্ট পৃথিবীর রূপায়ণ এর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সপ্তম সর্গে পড়ি: প্রজার উপদ্রবকারী নীচ ধূর্তরা লোকের ধন হরণ করেছে, রাষ্ট্রপ্রধানেরা বিমুখ; প্রজাদের দুঃসহ ক্লেশের সংবাদ পেয়েও তারা ঘুমোচ্ছে। বিজয়ী কায়স্থ রাজাকে করায়ত্ত করেছে, লোকের কষ্ট অবর্ণনীয়; দুর্ভিক্ষ, অগ্নিকাণ্ড, চোর, কুমির— নানা উৎপাতে জর্জরিত। (৭:২৮০-৮২) ধনী বৈশ্য বিশেষ ভাবে প্রজাপীড়ক; বৃত্তিজীবী শূদ্র অসহায় ভাবে বলছে: 'বেতন নিতে হাত তুলতে হয় আমাদের, প্রভুসেবায় দীন ও কৃপার পাত্র আমরা কী করব?' (৮:৬৭৩) দশম সর্গে পড়ি, ব্রাহ্মণরা ভোগী, আত্মতৃপ্তিসর্বস্ব, ক্রোধলোভপরায়ণ, তমোমূঢ়। লোকে আত্মহত্যা করছে, রজ্জু, বিষ, শস্ত্র, অগ্নি, শিলাখণ্ড কণ্ঠে নিয়ে জলমগ্ন হয়ে। ধরণী অক্ষত্রিয়া অর্থাৎ আর্ত ত্রাণের জন্যে কেউ নেই। পৌরজনের যারা রক্ষক তারাই প্রাণ ও ধন হরণ করছে, নানা ভাবে প্রজাপীড়ন করছে। ক্ষমতাশালীরা দুঃখীর ক্রন্দনে বধির, মদান্ধ, ন্যায় বা বিচারের ব্যাপারে মৌনী। কায়স্থ বাড়বাগ্নির মতো। প্রজারা দস্যুদলিত, কোনও প্রতিকার নেই। মন্ত্রী, সেনাপতি, দৌবারিক, সভাপতি ও পুরোহিত সর্বদাই উৎকোচ গ্রহণের জন্য উত্থানপাণি। বৈশ্য নির্বিষ সর্প: কৃতান্তও করুণার্ত হতে পারে, বৈশ্য কখনও সদয় হবে না; কালকূট বিষ পান করে কিংবা খরিদকাষ্ঠের অগ্নিতে বা সন্নিপাতেও বেঁচে থাকা সম্ভব, কিন্তু বৈশ্য শত্রু থাকলে মৃত্যু অবধারিত। বৈশ্যের উৎপীড়ন স্বভাবতই শূদ্রের ওপরেই বেশি হত। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্রের আক্রোশ শূদ্রদের ওপরেও: তারা এখন কেউ ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করে, কেউ বৈশ্যের, কেউ বা ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণের মতো। ব্রাহ্মণ এখন শূদ্রের দাস, শূদ্রের পায়ে প্রণিপাত করছে ব্রাহ্মণ শিষ্য— এই হল কলিবিপর্যয়, যার অনিবার্য ফল হল বর্ণসংকর। (১০:৫-২২)

শেষ যে গ্রন্থকারের আলোচনা করব তিনি প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ, হয়তো বা একমাত্র, ঐতিহাসিক, কল্‌হণ। একাদশ শতকে রচিত এঁর *রাজতরঙ্গিণী*-তে সম্ভবত সপ্তম থেকে একাদশ শতকের কাশ্মীরের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। কারণ কল্‌হণের পূর্বপুরুষরা কয়েক শতক ধরেই বংশানুক্রমে কাশ্মীর রাজসভায় মন্ত্রিত্ব করে এসেছিলেন। পরম্পরাক্রমে আগত তাঁদের জ্ঞান ও স্মৃতিভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী কল্‌হণ। ইনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থায় ও ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজা মিহিরকুলের মৃত্যুর পরে দৈববাণী হল যে, 'তিনি তিন কোটি

মানুষকে হত্যা করার প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করে, তাই মৃত্যুর পরে তিনি পাপমুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করেছেন।' (১:৩১১) রাজা যশস্কর হীনজাতীয়া নারীর সন্তান, কিন্তু তিনি সৎ ছিলেন বলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা তাঁকে রাজা করেন। রাজা হয়ে তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম নতুন করে প্রবর্তন করেন। (৩:১০) রাজপ্রাসাদে আগুন লাগল; কল্‌হণের মন্তব্য: 'ডোমচণ্ডালের সংসর্গে দূষিত রাজাদের পাপ পুড়ে গেল।' (৬:১৯২) রাজা হর্ষদেবের অন্তঃপুরে ৩৬০টি অন্তপুরিকা, ডোম ও চণ্ডাল বাদে সব জাতের মেয়ে ছিল, অর্থাৎ শূদ্রাও বিস্তর ছিল। কঠোর বর্ণাশ্রমধর্ম থাকা সত্ত্বেও কল্‌হণের বিবরণে অপরাধী ব্রাহ্মণের দণ্ড মধ্যে মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে, সম্ভবত ব্রাহ্মণকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করবার উদ্দেশে। রাজা যশস্করের আমলে এক অপরাধী ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় দণ্ডের কথাও আছে: তার কপালে কুকুরের পায়ের ছাপ দেওয়া হয়। অবশ্য দণ্ডিত ব্রাহ্মণের আত্মীয়রা অচিরেই অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা রাজার প্রাণনাশ করে। ব্রাহ্মণের ইষ্টসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মশাপ, ইত্যাদি বারে বারে ব্যবহৃত হয়েছে। কল্‌হণের লেখনী সবচেয়ে বিষাক্ত কায়স্থদের বিবরণে: তারা হীনজন্মা, স্বার্থসর্বস্ব, কুটিল, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর।

সাধারণ প্রজা অর্থাৎ শূদ্র, কিছু বৈশ্যও হয়তো, কল্‌হণের বিবরণে বেশ স্পষ্ট ভাবেই প্রত্যক্ষ। রাজার প্রাথমিক কর্তব্য যে এই উৎপাদক শ্রেণির রক্ষণাবেক্ষণ এ বিষয়ে তিনি সতত অবহিত। এক অত্যাচারী রাজা নিষ্ঠুর শোষণ ও রাজস্ব আদায়ের দ্বারা তিন বছরের মধ্যেই প্রজাকে সর্বস্বান্ত করে দিলেন, যেমন শীতকাল গাছের সমস্ত ফল হরণ করে। (৪:৬২৮) চণ্ডালীর কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে সুষ্য রাজা হলে বিতস্তা নদী কাদায় মজে গেল; রাজা এক এক করে নদীতে মোহর ছুঁড়তে লাগলেন, লোক কুড়িয়ে নিতে নামল— উঠে এল সারা গায়ে প্রচুর কাদা মেখে, নদী আবার স্রোতস্বিনী হল। তারপর থেকে রাজা নিয়মিত জলনিঃসরণের ব্যবস্থা করলেন যেন আশপাশের চাষিদের খেতগুলো জল পায়। কাশ্মীরি তাঁতির তাঁতশিল্প এবং পশুবাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও খ্যাতির কথা পড়ি (৫:১৬২); অনুমান করা অসংগত হবে না যে, তখনও তাঁতির নিজস্ব সমৃদ্ধির মান নিচুই ছিল, মধ্যবর্তী বণিকই নিত প্রায় সবটা। অগ্নিকাণ্ডে সমস্ত সঞ্চিত শস্য পুড়ে যাওয়ার ফলে যে দুর্ভিক্ষ হয় তার বিবরণ আছে। (৮:১২০৬) অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হলে পর খারি ধান বিক্রি হতে লাগল ১০০০ দিনারে। মন্ত্রীরা উত্তরোত্তর ধনী হল গরিবদের কাছে চড়া দামে ধান বিক্রি করে। (৫:২৭৪) আর একটি দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গে বলেছেন খারিধান, দ্রাক্ষারস, পশম, নুন, গোলমরিচ ও হিংয়ের দাম সাংঘাতিক বেড়ে গেল (৭:১২২০-২১); এগুলি সবই সাধারণ লোকের নিত্যব্যবহার্য বস্তু। কাশ্মীরের ইতিহাসে রাজপরিবারে বর্ণসংকর বারে বারেই ঘটেছে, কল্‌হণ সখেদে তার উল্লেখ করেছেন। এক গানের জলসায় এল দুটি ডোম্বী, রাজা প্রেমে পড়লেন, ঘটল বর্ণসংকর। সভায় নীচজাতীয় গায়ক 'রঙ্গ' অশ্লীল গানে রাজার চণ্ডাল রানি ও রক্ষিতাদের নামে গান বেঁধে গাইল। (৫:৩৯১) ডোম্বীগমনের পাপ খণ্ডাতে রাজা শুদ্ধাচারিণী এক ব্রাহ্মণীকে ধর্ষণ করলেন। (৫:৪০২) অধম ব্রাহ্মণেরা সে রাজার দান ও অন্ন গ্রহণ করত। রাজা কলশের

মৃত্যুর পরে মহিষী কষ্যা সহমরণে গেলেন না, হীনজাতীয় এক শ্রমিকের প্রতি আসক্ত হলেন। কল্‌হণের মন্তব্য, 'তাতে আমাদের দুঃখ হয়— অতো দুঃখাকরোতি নঃ।' (৭:৭২৭)

কাশ্মীরে এক বিশেষ ধরনের রক্ষণশীলতা ছিল; উপত্যকার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা থেকে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও যেমন এসেছিল, তেমনই উত্তরপশ্চিম বাণিজ্যপথ ধরে বহু জাতির আনাগোনা ছিল বলে বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্পর্কে এক সদাসতর্ক মানসিকতাও ছিল। ব্যতিক্রম ঘটত বিস্তর, কল্‌হণ অপ্রসন্নচিত্তে তার বিবরণ দিয়েছেন; কিন্তু বারে বারেই বিলাসী স্বার্থসর্বস্ব রাজার নিন্দা করেছেন যাঁরা দুঃখী প্রজার কথা ভাবেননি। ধর্মকর্ম করা, অর্থাৎ মঠমন্দির, কূপপুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করেছেন যখন রাজা সাধারণ প্রজার দুঃখ দূর করেছেন। তারা যে কত অসহায়, কত নিঃস্ব, তার বহু চিত্র 'রাজতরঙ্গিণী'তে পাই। রাজসভাসদ মন্ত্রীপুত্র কল্‌হণ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য কাশ্মীর উপত্যকা পর্যটন করেছেন, এই পর্যটনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাজ্য জুড়ে দুঃখী প্রজার আর্তি।

নারীর ক্ষেত্রে সাহিত্য শিল্পীর ব্যক্তিগত কল্পনার স্বাধীনতা হয়তো কিছু বেশি ছিল, কারণ নারী প্রত্যক্ষ ভাবে উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তবে অন্য দিকে নারীর স্থান সমাজে ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। নারী সম্বন্ধে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ছকটি হল: তার প্রাথমিক পরিচয় গৃহিণী ও জননীরূপী, পুত্রের জননীরূপই তার সার্থকতা। তার সামাজিক মূল্য বংশপরিচয়, বশংবদতা, সেবাপরায়ণতার ওপরেই নির্ভর করত। কিন্তু সাহিত্যে এবং জীবনে তার ব্যক্তিগত মূল্য নিরুপিত হত তার রূপ ও যৌবনের দ্বারা। যা তার কাছে প্রত্যাশিত নয় বরং যা সমাজের দৃষ্টিতে দোষাবহ তা হল তার বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বতন্ত্র চিন্তার ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব। এই ছকটি বেদাঙ্গ থেকে মহাকাব্য ও পুরাণগুলিতে পরিব্যাপ্ত; দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এর ব্যত্যয় নেই বললেই চলে।

কালিদাসের কিছু পূর্বেই হয়তো ভর্তৃমেণ্ঠ তাঁর *হয়গ্রীববধ* কাব্য রচনা করেন। সেখানে অন্ধ্র নারীর বর্ণনা হল, সে মধুরবচনা, নীবীবিস্রংসিনী, কম্পিতভ্রূলোচনা (৫৬৪); গ্রাম্য নারী মধুরবদনা, পল্লবাধরা, স্বতঃস্ফূর্ত তার উচ্চহাসি, যার বিনিময়ে গোটা রাজ্যই দিয়ে দেওয়া যায়। (৫৭৬) ওই সময়ের নাট্যকার ব্রহ্মযশার *পুষ্পদূষিতক*-এ একটি উপাখ্যান আছে:

> বণিক সমুদ্রদত্ত বিদেশে ছিল, অল্প সময়ের জন্যে দেশে ফিরে গোপনে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়। তার পিতা সাগরদত্ত শুনলেন পুত্রবধূ নন্দয়ন্তী সন্তানসম্ভবা এবং গোপনে কোনও পুরুষ তার সঙ্গে দেখা করেছিল। শ্বশুর তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। এক শবর সেনাপতি তাকে আশ্রয় দেয়। দেশে ফিরে সমুদ্রদত্তের সন্তানের পিতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ যায় না; অবশেষে শবর সেনাপতির দৃঢ় যুক্তিতে সংশয়ের নিরসন হল।

দুটি মূল ব্যাপার এ কাহিনিতে বিধৃত: সম্পত্তিমানের সন্তানের পিতৃত্ব সম্বন্ধে সংশয় এবং এর ফলে নারীকে অসতী সংজ্ঞা দিয়ে নির্যাতন করা। মনে রাখতে হবে, এ দেশে সতীর কোনও সমার্থক পুংলিঙ্গ শব্দই ছিল না।

ঋতুসংহার সম্ভবত কালিদাসের কিশোর বয়সের রচনা, নারী এখানে নিতান্তই গৌণ,

তার সাধারণ চিত্রটি ভোগ্যবস্তুরই চিত্র। *কুমারসম্ভব*-এ প্রেমের সাধনা, কিন্তু সে আমাদের শিবরাত্রিরই এক বিলম্বিত কৃচ্ছ্রসাধনের সংস্করণ; মনের মতো স্বামী পাওয়ার সাধনা, যার বহু উপাখ্যান মহাকাব্যে ও পুরাণে মেলে। পার্বতীর সাধনায় শিবের টনক নড়ল ঠিকই, কিন্তু পার্বতীকে পাওয়ার জন্যে তাঁর দিকে কোনও তপস্যার প্রয়োজন ঘটেনি। এর মর্মবস্তু যে প্রেমের আলেখ্যটি, কাব্য বিচারে সেটি অত্যন্ত মূল্যবান, কিন্তু এর উপজীব্যটি চিরাচরিত সংস্কারেরই অনুগামী। *মেঘদূত*-এ প্রেমিক প্রেমিকা দুজনেই দুঃখভোগ করেন; যদিও এখানে দুঃখের নিমিত্ত পুরুষ, ফলভাগিনী নিরপরাধা যক্ষবধূও। প্রেমে এখানে দেহমন দুয়েই স্থান আছে, যদিও দেহই মুখ্য। *মালবিকাগ্নিমিত্র*-এ প্রৌঢ় রাজা অগ্নিমিত্র যাঁর পিতা ও পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে, তিনি কন্যার বয়সিনী এক সুন্দরী তরুণীকে দেখে আকৃষ্ট হলেন। ইরাবতী ও ধারিণী দুই সপত্নী প্রাণপণে ষড়যন্ত্র করে চললেন যাতে রাজা মালবিকার সঙ্গে মিলিত হতে না পারেন। অবশেষে জানা গেল, মালবিকা রাজকন্যা, মহিষী ধারিণীর আত্মীয়া এবং এর সঙ্গে মিলনে রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল হবে। তৎক্ষণাৎ ধারিণী নিজে উদ্যোগ করে বিয়েটা দিয়ে দিলেন; অর্থাৎ প্রেমের প্রতিবন্ধকতা ভেসে গেল জ্যোতিষীর গণনার সামনে। প্রেমের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গৌণ হল রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের কাছে; নারীর সেই পণ্যদ্রব্য পরিচয়ই মুখ্য হল। তবে নাট্যকার তো স্বয়ং কালিদাস, তাই এ নাটক প্রথম দিকের রচনা হলেও এর মধ্যে মুন্সিয়ানা যথেষ্ট এবং মালবিকার অসহায় প্রেম মাঝেমাঝে পাঠককে অভিভূত করে।

বিক্রমোর্বশীয়-তে সমস্যা জটিলতর। রাজমহিষী ঔশীনরী ও রাজা পুরূরবার প্রেমের দৃঢ় ভিত্তি ছিল। হঠাৎ দেখা দিল স্বর্গের স্বপ্নসুন্দরী উর্বশী। গৌণ হয়ে গেল পুরাতন প্রেম যা গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। কালিদাস কোথাও ঔশীনরীর রূপবর্ণনা করেননি, কেবল একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্যে উদঘাটন করেছেন তাঁর চরিত্র। রাজা উর্বশীতে আসক্ত জেনে তিনি এক জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় রাজাকে প্রাসাদশীর্ষে ডেকে পাঠালেন প্রিয়-প্রসাদন ব্রত উদযাপন করবেন বলে। মাঙ্গল্য উপাচার সামনে রেখে বললেন, 'রোহিণী ও শশাঙ্ককে সাক্ষী রেখে আর্যপুত্রকে প্রসন্ন করতে বলছি: আজ থেকে যে নারীকে আর্যপুত্র কামনা করবেন এবং যে নারী আর্যপুত্রের সমাগমপ্রার্থিণী হবেন তার সঙ্গে আমি প্রীতি বন্ধনে যুক্ত থাকব।' এক দিন ছিল যখন যে নারীকে আর্যপুত্র কামনা করতেন তাঁর নাম ছিল ঔশীনরী। সেদিন গেছে, আজ ঔশীনরীর আত্মসম্মানবোধ তাঁকে দিয়ে এই কথা বলাচ্ছে, যেমন গোপন প্রেমের অনাবশ্যক জটিলতা ও গ্লানি থেকে মুক্ত পান পুরূরবা। সম্পূর্ণ নেপথ্যে চলে গেলেন ঔশীনরী, নাটক থেকে মুছে গেলেন। রয়ে গেল কালিদাসের হাতে-আঁকা অনাদৃতা নারীর আত্মসম্মান রক্ষার এক আলেখ্য।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এ সমস্যা গম্ভীরতর। শকুন্তলা আশ্রমে লালিতা, কিন্তু তাঁর বিবাহ হয়েছে রাজার সঙ্গে, অতএব সমাজ তার কাছে প্রত্যাশা করে যে সাধারণ কুলবধূর ভূমিকাতেই তাকে দেখা যাবে। তাই কন্যা বিদায়ের মুহূর্তে কণ্ব তাঁকে আশীর্বাদ করে উপদেশ দিচ্ছেন: 'গুরুজনদের শুশ্রূষা কোরো, সপত্নীদের সঙ্গে প্রিয়সখীর মতো আচরণ কোরো। স্বামী রেগে

গেলেও তুমি কখনও রেগে তার বিরুদ্ধ আচরণ কোরো না... এই পথেই নারীরা গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হয়, এর অন্যথা যারা করে তারা বংশের ব্যাধিস্বরূপিণী।' (৪:১৮) বুঝতে অসুবিধা নেই, এ উপদেশ শুধু শকুন্তলার প্রতি নয়, পঞ্চম শতক ও পরবর্তীকালের তাবৎ নারীর প্রতিই এটি উদ্দিষ্ট। কণ্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে বলছন, 'কন্যা হল পরের ধন, তাকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে, আজ মনটা শান্ত। যেমন মন শান্ত হয় গচ্ছিত ধন ফেরত দিয়ে।' (৪:২২) পিতৃকুলে নারী পিতার কাছে গচ্ছিত স্বামীর সম্পত্তি, বিবাহের পরে স্বামীর ব্যক্তিগত এবং শ্বশুরকুলের পরিবারগত সম্পত্তি; নিজের ওপরে তার কোনও অধিকারই নেই। এই কথাই শুনি শার্ঙ্গরবের মুখে; দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করলে পর সে দুষ্যন্তকে বলছে, 'একে পরিত্যাগই করুন আর গ্রহণই করুন, এ হল আপনার পত্নী, স্ত্রীর ওপরে, স্বামীর সর্বতোমুখী প্রভুত্ব আছে।' (৫:২৬) কিন্তু কবি কালিদাস সমাজের মন রাখার পরে, ছোট একটি কথায় শকুন্তলাকে কিছু মর্যাদা দিয়েছেন। শকুন্তলা যখন নিশ্চিন্ত জানলেন যে দুষ্যন্ত তাঁদের প্রেম, গান্ধর্ব বিবাহ ও নিজের অঙ্গীকার সবই অস্বীকার করছেন তখন বললেন, 'সেই প্রেমের যখন এই পরিণতি তখন আর (রাজাকে) স্মরণ করিয়ে দিয়েই বা কী হবে? তথাপি নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করতে হবে।' আর আর্যপুত্র সম্বোধন করলেন না, বললেন, 'পৌরব' অর্থাৎ 'পুরুবংশীয় রাজা'। তোমার কাছে তার মর্যাদার অনুরূপ আচরণ অপেক্ষিত।' এই নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করার প্রয়োজনবোধটিই কালিদাসের গৌরবময় সংযোজন: সমাজ, রাজা, প্রেমিক, স্বামী— কেউই যার মর্যাদা দিল না তারও অধিকার এবং প্রয়োজন আছে আত্মপক্ষ সমর্থনের। *মেঘদূত*-এ যেমন, এখানেও তেমনই পুরুষের দোষে দুঃখ ভোগ করল নারী। কিন্তু এটি কালিদাসের পরিণততর রচনা, তাই এখানে কালিদাসের শিল্পী দৃষ্টি সত্যতর। ষষ্ঠ অঙ্কে আত্মগ্লানি, অপরাধবোধের জ্বালা ও অতলান্ত বিরহে ক্লিষ্ট দুষ্যন্তের যে ছবিটি কবি এঁকেছেন তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: নারীও সাধনার ধন, তাকেও পেতে হয় দুঃখের মূল্যে।

রঘুবংশ একটি অসামান্য মহাকাব্য। এখানে অনেক নারী, সকলের আলোচনা সম্ভব নয়, দু' একজনের কথাই বলব। পুরুষের বহু পত্নীত্ব উপমাও এ কাব্যে বারংবার উপস্থিত। লক্ষ্মী বিষ্ণুর পদসেবা করেন। (১০:৮, স্মরণীয়, গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যেই প্রথম লক্ষ্মী বিষ্ণুর পদসেবা করেন।) নারীর অভিসারের বহু উল্লেখ এ কাব্যে এবং অন্যত্র পাওয়া যায়। অভিসারের সমস্ত ঝুঁকিটা নিতে হয় নারীকেই; অন্ধকার রাতের সাপখোপ, বর্ষা রাতের বজ্রবিদ্যুৎবর্ষণ এবং জ্যোৎস্না রাত্রে আত্মগোপন করার দায়— সবটাই নারীর। সাহিত্যে 'অভিসারী' নেই, যে নিরাপদে সংকেতস্থলে বসে থাকে, শিরে সংক্রান্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নারীই, যেন গরজ তার একারই। রঘুবংশের শেষ সর্গে ইন্দ্রিয়পরায়ণ রাজা অগ্নিবর্ণের অবক্ষয়ের জন্যে কালিদাস রাজাকেই দায়ী করেছেন, অন্তঃপুরিকাদের নয়। ইন্দুমতীর মৃত্যুর পরে অজ বলছেন, 'করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমাকে হরণ করে আমার কী-ই না নিয়ে গেল— গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ/করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং কিং ন মে হৃতম্।।' (৮:৬৭) লক্ষণীয়, এই বিখ্যাত শ্লোকটিতে কোথাও রূপবর্ণনা নেই, বরং

বধূর মানসিক সাহচর্যের কথা আছে যা সংস্কৃত সাহিত্যে একান্তই দুর্লভ। বিরহক্লিষ্ট অজের কাছে জীবন এমনই দুর্বহ বোধ হল যে, তিনি ধীরে ধীরে যেন মৃত্যুবরণ করলেন। এর পূর্বে বা পরে একমাত্র বাণভট্ট ছাড়া আর কোনও কবিই নারীকে এতটা মূল্য দেননি। শুধু হর্ষচরিত-এর প্রথম উচ্ছ্বাসে দেখি সরস্বতী স্বর্গে ফিরে গেলে দধীচ বনে গেলেন— জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে এবং পুত্রের ব্যবস্থা করে অকালে প্রাণত্যাগ করলেন।

সীতার চরিত্রচিত্রণে কালিদাসের যেন অভীষ্টই ছিল বাল্মীকির মূল্যবোধের সমালোচনা করা। অযোধ্যায় সীতাবিসর্জনের ব্যাপারে বাল্মীকির রাম দুঃখিত, কালিদাসের রামের নৈতিক বোধ দ্বিধাগ্রস্ত; বলছেন '(প্রজাদের মধ্যে) এই আত্মনিন্দা উপেক্ষা করব, না নির্দোষ সীতাকে ত্যাগ করব।' (১৪:৩৪) শেষ পর্যন্ত নির্দোষ জেনেও ত্যাগ করলেন (১৪:৪০) লক্ষ্মণের কাছে বনে বিসর্জনের কথা শুনে সীতা বললেন, সেই রাজাকে বোলো, অগ্নিশুদ্ধ আমাকে প্রত্যক্ষ করেও লোকাপবাদে আমাকে যে ত্যাগ করলেন এটা কী তাঁর বংশের অনুরূপ হল, না তাঁর পাণ্ডিত্যের?' (১৪:৬১) পরেই অবশ্য বলছেন, 'এ নিশ্চয়ই আমার পূর্বজন্মকৃত পাপের ফল।' (১৪:৬২) বাল্মীকির বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর পূর্বজন্মই বা কোথায়, পাপই বা কোথায়? কিন্তু এ হল কালিদাসের মানবী সীতা। লক্ষ্মণের কাছে সীতা বিসর্জনের সংবাদ পেয়ে 'রামের চোখে সহসা জল ভরে এল, যেন পৌষ রাতের কুয়াশা-ঢাকা চাঁদ; লোকাপবাদে তিনি সীতাকে গৃহ থেকেই নির্বাসনি দিয়েছেন, মন থেকে নয়।' (১৪:৮৪) এ রাম একান্তই কালিদাসের সৃষ্টি, যে-কবি বোঝেন যে প্রেমের মূল্য দিতে হয়, শুধু নারীকে নয়, নারীর জন্যে পুরুষকেও।

সম্পূর্ণ অন্য এক জগৎ পঞ্চম শতকের শ্যামিলকের *পাদতাড়িতক* নাটকে। এক গণিকা বিট তৌণ্ডিকোকির মস্তকে পদাঘাত করায় বিটদের সভা বসল: প্রায়শ্চিত্ত কী হবে? কেউ বলে, 'আর একবার পদাঘাত করুক মদনসেনিকা'; কেউ বলে 'আহা, তৌণ্ডিকোকি হল যজ্ঞের পশু, ওর মাথায় পদাঘাত করাটা ঠিক হয়নি। তৌণ্ডিকোকিই বরং প্রায়শ্চিত্ত করুক মদনসেনিকার পা ধুইয়ে দিয়ে।' কেউবা বলে 'সেই পা-ধোওয়া জলে ও নিজের মাথাটা ধুয়ে নিক।' কেউ বলে, 'মাথার ওই অশংটা কামিয়েই ফেলুক।' এই কথাটা তৌন্ডিকোকির মনে ধরে, কিন্তু তার মনে হয় কামিয়ে ফেলা যথেষ্ট নয়, মাথাটা কেটে ফেলাই বিধেয়। শেষ পর্যন্ত সভাপতি বিধান দেন: মদনসেনিকা ওর সুন্দর পা দুটি দিয়ে পুনর্বার আঘাত করুক তৌণ্ডিকোকির মাথায়! দেখা যাচ্ছে গণিকালয়ের পরিবেশে অনেকটা যেন স্বাভাবিক ভাবে দেখা হয়েছে নারী পুরুষের আপেক্ষিক সম্পর্ক অর্থাৎ নারীমাত্রই পুরুষমাত্রের চেয়ে হীন, এ বোধটা নেই। অবশ্য গণিকার এক নামই স্বতন্ত্রা।

অমরুতশতক-এ নারী প্রেমিকারূপে নানা ভাবে চিত্রিত। প্রেমে নারীর কিছু স্বতন্ত্র স্থান দেখানো হয়েছে, কখনও বা পুরুষ অসহায় তার সামনে। মান ও মানভঞ্জনের কটি পদে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু মনে হয় অমরুর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হল প্রেমের মৃত্যু দেখানো; শীলা ভট্টারিকার একটি পদ এবং সংকলন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত কিছু শ্লোক বাদ দিলে আর কোনও

কবির লেখনী এটা দেখাতে সাহস পায়নি। অমরুতে নায়িকা বলছে, 'আমাদের সেই প্রেমের এ কী করুণ মৃত্যু! সেই তুমিই পায়ে ধরে সাধছ, আমার মন তাও গলছে না তো!'

শীলা ভট্টারিকার সেই অমর শ্লোকটিতে নারী বলে, 'যে আমার কৌমার হরণ করেছিল, সে-ই আজ আমার বর; সেই চৈত্ররজনী, তেমনই ফুটে আছে মালতী ফুল, কদমের সুরভি নিয়ে তেমনই বইছে বাতাস। সেই আমিই আছি, তবু আজ প্রিয়মিলনের ক্ষণে রেবাতটের বেতসকুঞ্জে প্রাণ কেন উৎকণ্ঠায় ভরে ওঠে?'

দুই

ষষ্ঠ শতক থেকে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে সাহিত্যে নারীর চিত্র স্থূল রেখায় আঁকা, এ চিত্র ভোগ্যবস্তুর। ভারবির *কিরার্তাজুনীয়*-তে ষষ্ঠ, সপ্তম সর্গে নিতান্ত অনাবশ্যক ভাবে অপ্সরাদের আনা হয়েছে। এদের ছলাকলা হাব-ভাব সবই বাৎস্যায়ন-বর্ণিত গণিকার আচরণ: জলকেলি, বনবিলাস সবই এতে আছে, অর্থাৎ অপ্সরাদের অন্য নাম যেন স্ববেশ্যা সেটাই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এ ছবির রং চড়া এবং নারী দেহ ও বিলাসবিভ্রমের বর্ণনাই মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু। এই শতকেরই শেষে এক অত্যন্ত অপকৃষ্ট রচনা সুবন্ধুর গদ্যকাব্য *বাসবদত্তা*। বাসবদত্তা ও কন্দর্পকেতু পরস্পরকে স্বপ্নে দেখে ব্যাকুল হলেন। নায়ক বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন স্বপ্নদৃষ্টার সন্ধানে, নায়িকা তমালিকা নামে এক সারিকাকে পাঠালেন নায়কের খোঁজে। ক্রমান্বয়ে অবাস্তব ঘটনাবলির অন্তে দুজনের যখন দেখা হল তখন নায়ক নায়িকার সঙ্গে একটি কথাও না বলে তাকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নায়িকার আচরণ আগাগোড়াই সম্পূর্ণ যান্ত্রিক: সুপ্রচুর হা-হুতাশ, আত্মহত্যার সংকল্প, নির্দিষ্ট সময়ে মূর্ছা, ইত্যাদি— অলঙ্কার শাস্ত্রে যেমনটি নির্দেশ দিয়েছে ঠিক তেমনই। বলে রাখা ভাল, অধিকাংশ নায়িকাই হুবহু এই ছকেই নির্মিত।

সপ্তম শতকে বাণভট্টের *কাদম্বরী*-তে কাদম্বরী ও মহাশ্বেতাও এই ছকে নির্মিত। বাণভট্টে বরং দৃষ্টি আকর্ষণ করে অন্য নারীরা। নায়িকা বা রাজ-অন্তঃপুরের গণিকারা ছাঁচে ঢালা চরিত্র; কিন্তু নারী বিলাসবতীর সহচারিণী বৌদ্ধ প্রব্রাজিকা একটু অন্য রকম; তিনি বই পড়েন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন; অবিবাহিতা শিক্ষিতা এই স্বাধীন রমণীর আসন অন্তঃপুরিকাদের শ্রদ্ধায়। আর আছে কুলূতরাজকন্যা পত্রলেখা। এই একটিবার মাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে তরুণ কুমার রাজপুত্রের একটি কুমারী তরুণী বান্ধবী ও সহচরী। রানি বিলাসবতী চন্দ্রাপীড়কে বলছেন, 'দেখিস, এর যেন অনাদর করিসনে। এ আমার বড় আদরের মেয়ে। একে বালিকাদের মতো আদর করবি, নিজের চিত্তবৃত্তির মতো চাপল্য থেকে রক্ষা করবি, শিষ্যার মতো দেখবি, বন্ধুর মতো সমস্ত গোপন কথা জানাবি।' এই মেয়ে দিনেরাত্রে রাজপুত্রের কাছে কাছে থাকে; দুজনের পরস্পরের প্রতি গভীর সম্প্রীতি জন্মাল। অকুণ্ঠ বর্ণনা সেই প্রীতির, সত্যিই 'কামগন্ধ নাহি তায়'। অথচ পত্রলেখা রাজকন্যা, নবযৌবনা। এই চিত্রটিতে বাণভট্টের লেখনী অদ্ভুত এক সংযমের পরিচয় দিয়েছে। পত্রলেখা চন্দ্রাপীড় অভিন্নহৃদয়া, তাঁর দেহবহির্ভূত

নিঃশ্বাসবায়ু, দ্বিতীয় প্রাণ। রাজপুত্র প্রেমে পড়লে সে তাঁর দূতী হয়ে কাদম্বরীর কাছে যায়। দুজনকে আশ্বাস দেয়, মিলনে সহায়তা করে। কাদম্বরীর সংবাদ নিয়ে, সে যখন প্রাসাদে এল তখন চন্দ্রাপীড় তাকে জড়িয়ে ধরলেন, সকলকে সরিয়ে তার হাত ধরে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। অথচ বর্ণনাটি নিতান্তই সখা ও সখীর, মনেরই সম্পর্ক। মহাশ্বেতা পুন্ডরীকের আচরণের মধ্যেও পর্দার কোনও আভাস নেই। পুন্ডরীকের বন্ধু কপিঞ্জল নির্জনে একা মহাশ্বেতার সঙ্গে দীর্ঘকাল আলাপ করে, মহাশ্বেতা সখী তরলিকাকে সঙ্গে নিয়ে একা অভিসারে বনের মধ্যে নিরালা এক মন্দিরে যায় এবং সেই সরসী তীরের মন্দিরে একা অনাত্মীয় চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে গল্প করেন। ক্লান্ত হলে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েন পল্লবশয্যায়। চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতার সঙ্গে সখীর কাছে গেলে পর কাদম্বরীর পিতৃগৃহে কন্যান্তঃপুরে গীতবাদ্যশিল্পের পরিবেশে পরিহাসে কৌতুক আলাপ জমে ওঠে। অন্তঃপুরকাননেরই রত্নহর্ম্যে চন্দ্রাপীড় রাত্রিযাপন করেন।

ভাবতে অবাক লাগে সপ্তম শতকের রক্ষণশীল সমাজের রাজকবি নির্ভয়ে এমন বর্ণনা পড়ছেন রাজসভায় বসে: নারীপুরুষের সখ্য; সহজ, মুক্ত আলাপ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য। সৌন্দর্যের রম্য পরিবেশে যৌবন ও প্রেমের স্ফূরণের অকুণ্ঠিত, নির্মল ও অম্লান ক'টি আলেখ্য। *হর্ষচরিত*-এ রাজকুমার দধীচের দূতী কুমারী তরুণী মালতী এক ঘোড়ায় চড়ে শোণ নদী পেরিয়ে আসে সরস্বতীকে রাজপুত্রের প্রেম ও আগমনবার্তা শোনাতে। এ কি সপ্তম শতকের ভারতবর্ষ, না রাজার প্রিয় কবি তাঁর সমস্ত স্বাধীনতা প্রয়োগ করে একটি চিরন্তন আদর্শ কল্পলোক নির্মাণে উদ্যত? অথচ অন্যত্র সামাজিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে সতর্ক নিষ্ঠা ছিল বাণভট্টের: বিধবা হওয়ার ভয়ে রানি যশোমতী আত্মহত্যা করেন। বিধবা রাজ্যশ্রী মালবরাজের কারাগার থেকে পালিয়ে যান বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দিবাকরমিত্রের আশ্রয়ে। বারাঙ্গনারা রাজসভার অলঙ্কার; তারা রাজাকে স্নান করিয়ে দেয় ও নানা ভাবে পরিচর্যা করে। খণ্ডকাব্য চণ্ডীশতক-এ বাণভট্টের প্রতিপাদ্য হল, পুরুষ দেবতারা মহিষাসুরের সামনে নিষ্প্রভ, নিষ্পরাক্রম, পরাজিত ও হৃতদর্প; চণ্ডিকা একক বিক্রমেই মহিষাসুরমর্দিনী। সমস্ত বাণভট্ট পড়ে মনে হতে থাকে নারীপুরুষের সামাজিক স্থানবিন্যাসে তাঁর সংবেদনশীল কবিচিত্ত স্বস্তি পায়নি, তাই তিনি আরও সহজ আরও স্বাভাবিক এক সমাজকে এঁকে গেলেন। যা ঘটছিল তাকে উপস্থাপিত করার পর বললেন, 'কী হওয়া উচিত, কী হতে পারত তাও দেখ— অপারে কাব্যসংসারে কবিরে প্রজাপতিঃ।'

এই শতকেরই শেষ দিকে রচিত রাজা শ্রীহর্ষের তিনটি নাটক— *রত্নাবলী*, *প্রিয়দর্শিকা* ও *গানানন্দ*, এগুলিতে নারী প্রচলিত সব ভূমিকাতেই দেখা দিয়েছে— নায়িকা, দূতী, গণিকা, সখী, সপত্নী— কিন্তু সব কটি নারীরই আচরণ যান্ত্রিক, বৈশিষ্ট্যবর্জিত। তেমনই ভট্টানারায়ণের *বেণীসংহার*; সেখানে অন্তঃপুরে মহিষী ভানুমতীর করস্পর্শ দুর্যোধনকে বিচলিত করে তোলে, যুদ্ধক্ষেত্রে তখন যুদ্ধ চলছে। অর্থাৎ সেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রলোভিকার ভূমিকা। ভর্তৃহরির *শতকত্রয়* (বা *ত্রিশতী*)-এও, বিশেষত, *শৃঙ্গারশতক*-এ সেই ছবিটিই পাই: স্মিতহাসিতে, লজ্জাভয়ে,

মুখ ফিরিয়ে অর্ধকটাক্ষের চাহনিতে, কথায়, ঈর্ষাকলহে ও লীলায়— সমস্ত ভাবেই নারী পুরুষের বন্ধন। (১) নারী নরকের দ্বার, প্রলোভন ও পতনের হেতু। কিন্তু ভর্তৃহরি নারীকে মোহিনী ও সুন্দরী ছাড়াও অন্য ভাবেও দেখেছেন। প্রকৃত প্রেম অমৃতনিষেকে জীবনকে সঞ্জীবিত করে, নারীর ভূমিকা সেখানে আশীর্বাদের মতোই। 'মিলনে যে অমৃতলতা, অপ্রসন্ন হলে বিষবল্লরী।' (৪৪) 'এ সংসারে কুনৃপতির ভবনদ্বারে প্রভু সেবায় নিরত মনকে মনস্বী কেমন করে ধারণ করত, যদি জ্যোৎস্নাপুঞ্জের মতো এই পদ্মনেত্রা নারীরা না থাকত?' (৩১) 'সংসার, তোমার প্রান্তদেশ অনেক দূরে— মধ্যের ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠত যদি এই মদিরেক্ষণারা না থাকত।' (৩৮)

মাঘের *শিশুপালবধ* কাব্যে কিন্তু নারী শুধুই সুন্দরী যুবতী এবং প্রকৃষ্ট ভোগ্যবস্তু। সেখানে নায়িকা, প্রতিনায়িকা (বা প্রতিযুবতী), দূতী, বারাঙ্গনা, জলকেলি, কাননবিহার, ইত্যাদির সুদীর্ঘ প্রথাসিদ্ধ বিবরণ আছে বাৎস্যায়নের নির্দিষ্ট ছকে। নারী সুরাপান করে— কপিশায়ন, পরিস্রুৎ, বারুণী, মৈত্রী, হালা, মৈরেয়, ইত্যাদি সুরার বহু নাম পাই। সহমরণের যুক্তি দেওয়া হয়েছে: সহমৃতা না হলে পরজন্মে ওই পতি পাওয়া যাবে না। (৯:১৩) গণিকাকেও বারবার দেখা গেছে মাঘে, তার ক্রুর, লুব্ধ ভূমিকায়। এই একই চিত্র পাই দণ্ডীর *দশকুমারচরিত*-এ, নারী সেখানে কুলকন্যা, কুলবধূ বা গণিকা। দণ্ডীর দৃষ্টি বাস্তবমুখী, মোহবিমুক্ত, তাই নানা সামাজিক পরিবেশে এদের দেখা পাওয়া যায়।

শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক*-এ নারী কুলবধূ ও গণিকা এই দুই ভূমিকাতেই আছে। কুলবধূ নেপথ্যচারিণী ধৃতা স্বামীগর্বে গর্বিতা, সামাজিক পরিচয়েই তাঁর আসন দৃঢ়। সেখান থেকে তিনি গণিকা বসন্তসেনার প্রদত্ত মুক্তমালা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আর্যপুত্রই আমার আভরণ।' নাটকের শেষে চারুদত্তের প্রেম এবং বসন্তসেনার মহত্বে অভিভূত হয়ে এবং কতকটা নিরুপায় হয়েও বসন্তসেনাকে সপত্নীরূপে স্বীকার করেন। বসন্তসেনা গণিকা, চারুদত্তের প্রতি গভীর প্রেমে তাঁর জীবনে নবজন্ম ঘটেছে, সেখানে তিনি গণিকা থেকে প্রেমিকার ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি চারুদত্তের গুণমুগ্ধা; চারুদত্ত তাঁর রূপে মুগ্ধ, তবু তাঁর দৃষ্টি রূপকে অতিক্রম করে বসন্তসেনার মনটিকেও দেখতে পেয়েছিল। কাহিনি প্রাচীন, সেখানে শূদ্রকের কৃতিত্ব গণিকার প্রেমকে তাঁর চরিত্রের মহিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করায়।

নারীচরিত্র চিত্রণে বোধহয় ভবভূতির বৈশিষ্ট্যই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। *মালতীমাধব* নাটকে রাজাকে তুষ্ট করবার জন্যে মালতীর পিতা তাকে অপাত্রে সম্প্রদান করতে উদ্যত শুনে মালতী বলে, 'বাবার কাছে রাজার তুষ্টিই বড় হল, মালতী কিছু নয়?' যুগে যুগে অসংখ্য মেয়ের এই নালিশ একবার তো ভাষা পেল সাহিত্যে। *উত্তররামচরিত*-এ ভবভূতি সচেতন ভাবে বাল্মীকি রামায়ণে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধগুলির পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। এখানে দ্বিতীয় অঙ্কে সীতা রামের বিষয়ে স্পষ্টই বলেন, 'যিনি অকারণে আমাকে পরিত্যাগ করেছেন', 'অন্যায় ভাবে আমাকে বনে পাঠিয়েছেন।' তাঁর সখী বাসন্তী রামকে বলেন, লোকে বলে, যশ আপনার প্রিয়, কিন্তু যশোবিরোধী এমন ভয়ঙ্কর কাজ আর কী হতে পারে?' (৩:২৭)

তমসা সীতাকে বলেন, 'তিনি (রাম) নিজেই যখন তোমাকে ত্যাগ করছেন, তখন শুধু অশ্রুবর্ষণে তাঁর সান্ত্বনা পাওয়া কঠিন।' রামচন্দ্রকে সীতার অরণ্যসহচরী সীতা পরিত্যাগ নিয়ে ধিক্কার দিয়ে বলেন: 'তুমি তাকে বলতে— তুমি আমার প্রাণ, আমার দ্বিতীয় হৃদয়, নয়নের জ্যোৎস্না তুমি, অঙ্গের অমৃত। এই সর্ব শতশত প্রিয়বচনে সেই মুগ্ধাকে অভিভূত করে, তাকেই— থাক, আর বলেই বা কি হবে?' (৩:২৬) শুধু অন্যান্যদের ভর্ৎসনাই নয়, ভবভূতি স্বয়ং রামকে তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হতে দিয়েছেন। সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোলে নিদ্রিতা সীতার দিকে চেয়ে রামচন্দ্র বলছেন, 'শৈশব থেকে লালন করেছি যে প্রিয়াকে, বন্ধুত্বে যার সঙ্গে আমি অভিন্নহৃদয়, সেই প্রিয়াকে ছলনা করে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিচ্ছি, এ যেন গৃহপালিত বিহঙ্গীটিকে নিয়ে চলল শিকারী।' (১:৪৫) বলছেন, 'অস্পৃশ্য আমি, সীতাকে স্পর্শ করে দূষিত করছি।' কোলে নিদ্রিতা সীতার উদ্দেশে বলছেন, 'অকর্ম করায় পটু চণ্ডাল আমি, অয়ি মুগ্ধে ত্যাগ কর আমাকে; চন্দনতরুভ্রমে তুমি দুর্বিপাক বিষদ্রুমকে আশ্রয় করেছ।' (১:৪৬) এ নাটকে ভবভূতি অনেক নারীচরিত্র উদ্ভাবন করেছেন: তমসা, মুরলা, ভাগীরথী, পৃথিবী, আত্রেয়ী, বাসন্তী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি। এঁদের সকলেরই সহানুভূতি সীতার প্রতি; ফলে রামের নিষ্ঠুরতা নানা ভাবে সমালোচিত হয়েছে। নাটকের শেষ অঙ্কে রামসীতার পুনর্মিলন হয়তো শুধু 'বিয়োগান্তং ন নাটকং'— এ নির্দেশের বশেই নয়; হয়তো সমাজের কাছে বারে বারে দুর্বিচার পেয়েছেন যে সীতা তাঁকে ফিরে কিছু সুখ দেওয়ার বাসনায় বাল্মীকির কাহিনিকে তিনি অন্য ধারায় প্রবাহিত করেছেন। নাটকের শুরুতেই সূত্রধার বলছেন, 'যেমন নারীর, তেমন ভাষার সাধুত্ববিষয়ে মানুষ দুর্জন।' (১:২) নট শুধরে দিয়ে বলছেন, 'বল, অতি দুর্জন!' এই চিরাচরিত অন্যায়ের কিছু প্রতিকার যেন এ নাটকের একটি উদ্দেশ্যে। নাটকের অন্তে ভরতবাক্যে ভবভূতি বলছেন, 'জগতের মাতার মতো, গঙ্গার মতো মাঙ্গলিক ও মনোহরা এই কথা, যার রূপ অভিনয়ে বিন্যস্ত হল। এই কথা পাপ থেকে উদ্ধার করুক, শ্রেয়কে বর্ধিত করুক। পরিণতপ্রজ্ঞ শব্দব্রহ্মবিৎ বাল্মীকির এই বাণী পণ্ডিতেরা বিশেষ ভাবে চিন্তা করুন।' (৭:২০) রামায়ণকাহিনি প্রাচীন, পরিণতপ্রজ্ঞ কবি এখানে ভবভূতি, 'স্বয়ং সরস্বতী যাঁকে দাসীর মতো অনুগমন করেন।' (১:২) তাঁরই লেখনীতে এই প্রাচীন কাহিনি যে নবরূপ পরিগ্রহ করেছে তার প্রতিই কবি পাঠক ও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। রামসীতার কাহিনি যে সামাজিক দুর্বিচারের চিহ্ন বহন করে, পরিমার্জনার দ্বারা তার একটি মনন-শোধিত রূপ এ-নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে, তাই এ-কাহিনি মাতার মতো, গঙ্গার মতো, মাঙ্গলিক ও মনোহরা।

কল্‌হণের *রাজতরঙ্গিণী*-তে নারী ভাল মন্দ দুই রূপেই চিত্রিত, সেখানে নারীর নানা পরিচয়: রাজ্ঞী, উপপত্নী, গণিকা, কুট্টনী, দেবদাসী, অবরুদ্ধা (বা রক্ষিতা) কুলবধূ, মাতা। সমাজের মূল্যবোধ রক্ষণশীল: পতিই নারীর দেবতা, সতীত্ব একটি পবিত্র ব্যাপার। সতীর তেজও বিঘোষিত হয়েছে সরবে: সতী, দেবতা ও ব্রাহ্মণের কোপে ত্রৈলোক্যেও বিপ্লব হয়।' (১:২৭২) নারী ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্যেই (৩:৫১); নারী স্বভাবতই চঞ্চল, কে তাকে

নিয়ন্ত্রণ করবে? (৩:৫১৮, ৫১৯) নারী সুরাপান করে, অত্যাচারী রাজা নিরপরাধা নারীর অঙ্গহানি ও গর্ভপাত ঘটায়, রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ইষ্টসিদ্ধির জন্যে প্রয়োজন মতো নারীকে ডাইনি বলে অত্যাচার করা হয়। থেকে থেকেই কলহণ নারীনিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। রাজা ডোম্বীর প্রতি আসক্ত হওয়াতে রাজ্য অশুচি হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য বণিক গোন্‌পা-র স্ত্রীকে কামনা করলে বণিক স্ত্রীদান করতে চান। রাজা অসম্মত হলে বলে, 'মন্দিরে দেবদাসীরূপে দান করছি, সেখান থেকে নিয়ে নিন।' (৪:৩৬) নারী ক্রয়ের সংবাদ শুনি: তুরস্ক বণিক বহু দেশ থেকে নারী সংগ্রহ করে বিক্রি করত। (৭:৫২০) কল্‌হণ অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে সহমরণে সতী হওয়ার বিবরণ দেন; এক স্ত্রী সহমরণে যাননি, তার প্রভূত নিন্দাও তিনি করেন। (৮:২:৩৪৩) কল্‌হণ ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতির যুগের মূল্যবোধকেই সমর্থন করেছেন; তবে কোনও রাজা ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে অনাচারী হলে কলহণ রাজাকেই দোষ দিয়েছেন, নারীকে নয়। যেমন বর্ণসংকর সম্বন্ধেও তিনি নারীকে দায়ী করেননি, যেমন করেছে *ভগবদ্‌গীতা*।

তিন

এ যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে নারীকে প্রেমের বাতাবরণে ছাড়া অন্য ভাবে দেখা হয়নি। সে-ও যে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি, পারিবারিক ভূমিকার বাইরে সে-ও যে একজন নাগরিক, তারও যে একটা চিন্তা কল্পনা ও স্বপ্নের জগৎ থাকতে পারে যেখানে তার নিজস্ব সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতাবোধ থাকতে পারে এ সম্বন্ধে এ সাহিত্যে কোনও চেতনাই নেই। এই দিক থেকে বসন্তসেনার চরিত্রে শূদ্রক অন্য একটি মাত্রা আনতে পেরেছেন; সে শুধু প্রেমিকা নয়; সে প্রভু, নাগরিক, গৃহকর্ত্রী ও সখী। অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে নারী প্রেমিকা ছাড়া অন্য পরিচয়েও দেখা দেয়, যেমন গ্রিক নাটকে; অবশ্য রোমান নাটকে বিশেষত নিউ অ্যাটিক কমেডিতে নারীর মুখ্য ভূমিকা প্রেমিকারই। এ কথাও সত্য যে অন্য যে ভূমিকাতেই নারী অবতীর্ণ হোক না কেন সেটিও পুরুষ পরিকল্পিত পূর্বনিরূপিত একটি ছক, তার সীমার মধ্যেই নারীর সঞ্চরণ। তবু সেখানে তার প্রসার কিছু বেশি, তার সত্তার অন্য কিছু দিক স্বীকৃত; শুধু দেহমাত্রসার নায়িকার যান্ত্রিক ভূমিকাতে ভোগ্যবস্তু রূপে সে দেখা দেয়নি। সংস্কৃত ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যে কিন্তু প্রেমই তার একমাত্র বাতাবরণ; তাই গুপ্তপ্রণয়, দূতী, সংকেতস্থল ও অন্তঃপুরের কুঞ্জকাননের মধ্যেই তার বিচরণ। নায়িকার শ্রেণিবিভাগও প্রেমের অবস্থা অনুসারেই: পূর্বরাগ, মান, মিলন ও বিরহ। প্রকারভেদও তাই: অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, মানিনী, খণ্ডিতা, স্বাধীনভর্তৃকা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, বত্মাবলোকিনী, ইত্যাদি। দেহ অনুসারে তার ভাগ শঙ্খিনী, পদ্মিনী, হস্তিনী, ইত্যাদি। গৃহে সে স্বামী সন্তান ও শ্বশুরকুলের সেবায় একনিষ্ঠ থাকবে এই-ই প্রত্যাশিত। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবে যেমন প্রেমিকারূপে তার প্রতিষ্ঠা, শাক্তসাহিত্যের প্রভাবে তেমনই তার মাতৃরূপ বিঘোষিত। সেখানে তার প্রতি সমাজের আচরণের ক্ষতিপূরণ হয়েছে দেবী ও শক্তিরূপে তার স্তবের দ্বারা। তখন আদর্শায়িত সেই নারী হয় অসুরদলনী বিশ্বজননী, নয় পরমা নায়িকা শ্রীরাধা। সাংখ্যে ও তন্ত্রে সে পরমা

প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি। এই কল্পরূপের অন্তরালে বাস্তবে যে নারী ছিল, সে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সব মৌলিক মানবিক অধিকারে বঞ্চিত, ভোগ্যবস্তু ও সেবিকা মাত্র।

খ্রিস্টিয় পঞ্চম থেকে একাদশ শতকের ভারতবর্ষ হল হিন্দু ভারতবর্ষ। এক দিকে যেমন বৌদ্ধ জৈন প্রভাব সমাজ থেকে অন্তর্হিত, অন্য দিকে তেমনই মুসলমান রাজত্বের সূচনা তখনও হয়নি। এই ভারতে শূদ্র ও নারী একেবারে নিচের তলার বাসিন্দা; খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের বেদাঙ্গ সাহিত্য থেকেই এদের নাম একনিঃশ্বাসে উচ্চারিত। খ্রিস্টিয় প্রথম দ্বিতীয় শতকে মোটের ওপর *ভগদ্গীতা* ও *মনুসংহিতা*-র স্বার্থপ্রণোদিত প্রভাবে তাদের স্থান তৎকালে ও উত্তরকালের জন্যে স্থিরীকৃত হয়ে গেল। পঞ্চম ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সমাজে কিছু স্থিতিস্থাপকতা ও সজীবতা ছিল, তখনও পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। নানা নতুন চিন্তার ও ধারণার ঘাতপ্রতিঘাত এসে দেশের মনোজগতে পৌঁছত। সপ্তম শতকের পরে ইয়োরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল, রইল শুধু দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে, সেখান থেকে ভারতবর্ষ নতুন কোনও চিন্তা বা ধারণা পায়নি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরে আর্যাবর্তে অত বড় সাম্রাজ্য আর গড়ে ওঠেনি, আর্যাবর্ত ক্রমে খণ্ডিত হয়ে গেল ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্যে। সংকীর্ণ দ্বৈপায়ন মনোবৃত্তির প্রসার ঘটল; বিজ্ঞানের কিছু উন্নতি ঘটলেও চিন্তার জগতে আর নতুন ঢেউ এসে লাগল না। গতানুগতিকের চর্চা, টীকাভাষ্য ও স্মৃতিরই বিস্তার ঘটল। অষ্টম থেকে দশম শতকে অর্ধমাগধী থেকে অবহট্টের বিকাশ ঘটল, দশম-একাদশ শতকে কথ্য ভাষা ও লিপির প্রবর্তন হল ধীরে ধীরে। আঞ্চলিকতার স্বল্পসলিল পঙ্কিলতার মধ্যে স্রোতহীন জীবন আবর্তিত হতে থাকল। আর্যাবর্তে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক সভ্যতার মুক্ত বায়ু গতি হারাল; বিচ্ছিন্ন, সংকীর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ এক সভ্যতার উদ্ভব হল যার প্রভাবে সমাজ ক্রমেই বেশি রক্ষণশীল হয়ে উঠল। এ রক্ষণশীলতার সবচেয়ে বেশি করে দণ্ডিত হয়েছে নারী ও শূদ্র। পুরাণ, স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রের যুগ এটা, এ সব গুলিই দৃঢ় করে তোলে এই রক্ষণশীলতাকে।

পরিশেষে ভেবে দেখা উচিত এই যুগে কারা লিখছে ও কাদের জন্য লিখছে? ব্যাপক গণশিক্ষা তখন ছিল না, ফলে লেখক ও পাঠক একই শ্রেণির লোক: শিক্ষিত, মোটামুটি অবস্থাপন্ন ও দ্বিজ! অল্প কিছু বিত্তবান শূদ্র শিক্ষার সুযোগ হয়তো পেত, তারা পড়তে পারত কিন্তু সেই সম্পত্তিমান শূদ্রের শ্রেণিচরিত্র তত দিনে বদলে ওই পূর্বের শ্রেণির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত। ফলে সাধারণ ভাবে শূদ্র অবজ্ঞাত; সাহিত্যে তার প্রতিবিম্ব হল সে মূর্খ, বুদ্ধিহীন, অতএব শ্লেষ বিদ্রূপ ও কৌতুকের লক্ষ্য। ব্যতিক্রম কদাচিৎ আছে, যেমন মৃচ্ছকটিকে ব্রাহ্মণ বিদূষক মৈত্রেয় মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে, শূদ্র স্থাবরক তার চেয়ে বুদ্ধিমান। অন্যত্রও ব্রাহ্মণ বিদূষক মাঝে মাঝেই নির্বুদ্ধির ভূমিকায় দেখা দিয়েছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে বিদূষক একটি পূর্বনির্ধারিত ছাঁচ, সেখানে তার নির্বুদ্ধিতা ততটা ব্যক্তির নয়, যতটা প্রতীকী। *রাজতরঙ্গিনী*-তে শূদ্র অশিক্ষিত, রুচিহীন; ডোম্বী বর্বর; কিন্তু কল্‌হণ বড় শিল্পী এবং সৎ ঐতিহাসিক; তাই অপক্ষপাত চিত্রণে দেখি দ্বিজ ব্রাহ্মণও বহুবার ওই রূপে চিত্রিত। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও মন্ত্রী

স্বার্থসর্বস্ব; ক্ষত্রিয় রাজা ইন্দ্রিয়পরায়ণ; কায়স্থ কুটিল, অসৎ; বরং সাধারণ শূদ্র সৈন্য সৎ ও প্রভু ভক্ত। অসৎ রাজার রাজত্বে সাধারণ শূদ্রগরিষ্ঠ প্রজাবৃন্দের দুর্গতির বিবরণের মধ্যে এবং সে দুর্গতির দায়িত্ব রাজাকে অর্পণ করে কল্‌হণ শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেছেন, কবি-ঐতিহাসিকের সততা রক্ষা করেছেন। নারী সম্পর্কে বহু নিন্দাবাদ করেও তিনি বারে বারেই নিঃস্বার্থ, প্রজাহিতৈষিণী, আত্মত্যাগে অকাতর বহু নারীকে চিত্রিত করেছেন। তেমনই ভবভূতি যে-সমাজে বাস করতেন তা নারী সম্পর্কে নিষ্ঠুর, কিন্তু কবি ভবভূতির ক্রান্তদর্শিতা তাঁকে এমন একটা লোকোত্তর বোধে উত্তীর্ণ করেছিল যেখানে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল যে, 'নারী সমাজে কখনও সুবিচার পায়নি— যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ।' সামান্যতম স্খলনে এবং অস্খলনেও নারীনিন্দায় সমাজ পঞ্চমুখ। কবির পরিশীলিত সংবেদনা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে সীতা চরিত্রে, সমাজকে সমালোচনা করেছে রামচরিত্রে। কালিদাসের ঔশীনরী, সীতা ও শকুন্তলাতেও এ প্রতিবাদ মুখ্য বা গৌণ ভাবে ভাষা পেয়েছে। যেমন *রঘুবংশ*-এর ও *উত্তররামচরিত*-এর অনুতপ্ত বেদনার্দীর্ণ রামের রূপায়ণে সহস্রাব্দের সামাজিক মূল্যবোধ পুনর্মূল্যায়িত।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজের মুখপাত্র উত্তম কবিরা যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও বোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে রচনায় প্রবৃত্ত হন তার দাবি হল: শুধু নিজের ও শ্রোতার শ্রেণিচরিত্রের প্রবক্তা হলেই চলবে না, সেই শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সমালোচকও হতে হবে এবং আগামীর পথিকৃৎও হতে হবে, কারণ কবি ক্রান্তদর্শী। সাধারণত, কোনও নতুন উৎপাদনব্যবস্থা ও সম্পর্কগুলি যখন একটা যুগে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে তখন তার প্রথম দিকের কবিরা সমাজের শ্রেণিবিন্যাস ও শ্রেণিচরিত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে অবচেতনের আভাসে অবহিত থাকেন, তার চিত্রণ ও সমালোচনা করেন, কখনও বা পুনর্বিন্যাসের পথ দেখাবার চেষ্টা করেন। পরবর্তী কবিরা সে সম্বন্ধে আর তত সচেতন থাকেন না; তাঁরা পূর্বনির্ধারিত কাঠামোকে মেনে নিয়ে তার মধ্যেই নানা আঙ্গিকের কসরৎ ও মুন্সিয়ানা দেখাবার চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকেন। এই যুগে শূদ্রের শোষণ ও উৎপীড়ন দ্বিজ ও বিত্তবান-শাসিত সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার পক্ষে সুবিধার ছিল। নারীকে সেবিকা ও ভোগ্যবস্তুর ভূমিকায় রেখে পদানত রাখাও পুরুষ ও তার পরিবারের পক্ষে বিশেষ সুবিধার ছিল; তাই এ দুজনের সম্পর্কে কবি-নাট্যকাররা ধর্মশাস্ত্রকারদের সঙ্গে সর্বদাই একমত। কিন্তু সংবেদনশীল স্বপ্নদর্শী সাহিত্যশিল্পীই শুধু এর ব্যতিক্রম। এঁরাই এক বিশেষ অর্থে বৈপ্লবিক সমাজচেতনায় আগামীর পথিকৃৎ।

প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৯৪
প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু চাকী
প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
উৎসর্গ মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে
মূল্য: ৩০·০০

প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন

এ গ্রন্থে যে ক'টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে তাদের যোগসূত্র হল প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বোঝাবার জন্যে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রয়াস। প্রশ্ন ওঠে নিজের মনে: আলোড়িত করে বুদ্ধি ও মননকে; প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের আকুতিতে, সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির টানাপোড়েনে গড়ে ওঠে চিন্তার একটি কাঠামো— তারই প্রকাশ এ প্রবন্ধগুলিতে। এগুলিতে কোনও বিষয় সম্পর্কেই শেষ কথা বলার ধৃষ্টতা নেই; চিন্তার একটি স্তরই মাত্র বিধৃত আছে; চিন্তা চলছে এখনও।

'*ঋগ্বেদ*-এর যুগের মানুষ' ও '*ঋগ্বেদ*-এর সৌরসূক্তে কাব্য' প্রবন্ধ দুটিতে ওই দুটি প্রসঙ্গে পাঠক সাধারণকে সহজ কথায় একটু আভাস দেওয়ার চেষ্টা আছে। 'বৈদিক সাহিত্যে নারী' স্বভাবতই ঋগ্বেদের কালকে ছাড়িয়ে অনেক পরের যুগ পর্যন্ত— বেদাঙ্গ সাহিত্যের শ্রৌত ও ধর্মসূত্র পর্যন্ত পৌঁছেছে; অর্থাৎ খ্রিস্ট পূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত কালে তা ব্যাপ্ত। বলা বাহুল্য, এই দেড় হাজার বছরের মধ্যে সমাজে নানা কারণে নানা বিবর্তন এসেছে যার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ক্ষুদ্র পরিসরের একটি প্রবন্ধে করা কঠিন; তাই এই রচনাটিতে মোটামুটি একটা দিগ্‌দর্শনের চেষ্টাই করা হয়েছে। 'যাজ্ঞবল্ক্য ও উপনিষদের যুগ' প্রবন্ধে প্রধানত শংকরাচার্যের ভাষ্যের আবরণ থেকে মুক্ত করে উপনিষদকে দেখবার চেষ্টা আছে এবং মনীষী হিসেবে যাজ্ঞবল্ক্যের একটি দিক দেখবার প্রয়াস এতে আছে। যে-যাজ্ঞবল্ক্য জন্মান্তরবাদের প্রবক্তা, তিনি অবশ্যই ক্ষমতায় আসীন সমকালীন শ্রেণিস্বার্থের মুখ্য মুখপাত্র। এ শ্রেণির মধ্যে ধনিক, ঋত্বিক, দার্শনিক— তিনটি সম্প্রদায়ই আছে। জন্মান্তর ও কর্মবাদ পরবর্তী সমাজে আড়াই হাজার বছর ধরে কায়েমি স্বার্থকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখবার একটি কুটিল কৌশলরূপে নিপুণ ও সার্থক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এবং এই দুটি তত্ত্বের প্রধান উদ্ভাবক যাজ্ঞবল্ক্য। অপর পক্ষে এই যাজ্ঞবল্ক্যেরই অন্য দুয়েকটি দিকও ছিল, যেখানে তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং যেখানে তাঁর বাণী হয়তো ততটা ক্ষতিকর হয়ে ওঠেনি তখনও। সেই দিকগুলি উদ্‌ঘাটন করার জন্যে এই প্রবন্ধ।

'প্রাচীন ভারতে গণিকা' একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। এখানে প্রাচীন ভারতকে ঋগ্বেদের যুগ থেকে খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত কালের পরিসরে গ্রহণ করা হয়েছে। 'বৈদিক সাহিত্যে নারী' প্রবন্ধটির পরিপূরক এই প্রবন্ধটি। প্রায়ই শোনা যায়, প্রাচীন ভারত নারীকে সম্মানের আসনে রেখেছিল। কৌমগত বা যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে যার স্থান, আদি সামন্ততান্ত্রিক বা

সেই গোত্রেরই এক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্থান কেমন করে সম্মানের হতে পারে, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে শাস্ত্র থেকে যে তথ্য চোখে পড়ল তা-ই উপস্থাপন করা গেছে এ প্রবন্ধে। বলা নিষ্প্রয়োজন, বহু অনুসন্ধানেও নারী-কে সেকালের সমাজে সম্মানের আসনে দেখতে পাইনি। অশিক্ষার অন্ধকারে নির্বাসিত, স্বাধীন অর্থকরী বৃত্তি থেকে বঞ্চিত নারী আপন রূপ-যৌবন ও শ্রমের বিনিময়ে যেখানে অধিষ্ঠিত ছিল তা আর যাই হোক, সম্মানের নয়। ঐ সমাজে একমাত্র স্বাধীন নারী ছিল গণিকা। সন্ন্যাসিনী, পরিব্রাজিকা ইত্যাদি যাঁরা শিক্ষিত ছিলেন তাঁরা সমাজের প্রত্যন্তদেশে বিচরণ করতেন, তাঁদের সংখ্যাও যেমন নগণ্য ভূমিকাও তেমনি গৌণ। মূল সমাজে শিক্ষায় অধিকার ছিল একমাত্র গণিকারই এবং রাষ্ট্রের ব্যয়ে তার শিক্ষা নির্বাহ হত। উপার্জিত অর্থ এবং নিজের দেহের উপরেও তার কতকটা অধিকার ছিল, যা কুলবধূর ক্ষেত্রে অনেক বেশি সীমিত ছিল, অথবা ছিল না। এ অবস্থা যে শোচনীয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যান্য দেশের প্রাচীন সমাজেও ঠিক এই রকমই ছিল সমাজ ব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা সর্বাংশে না হলেও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত সেখানে নারীর ভূমিকা, স্থান, অধিকার, দাবি ও দায়িত্ব মোটের ওপর একই রকম ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রাচীন সমাজেও নারী নির্যাতিত ছিল; পার্থক্য একটাই সে সব দেশের পণ্ডিতেরা আজ দাবি করে না যে তারা নারীকে মাথায় করে রেখেছিল। বলে না 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে প্রীয়ন্তে তত্র দেবতাঃ' বা নারীরা 'পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ'। গণিকা প্রাচীন ভারতীয় সমাজে, অন্য সব সমাজের মতোই, একান্তরূপে ভোগ্যবস্তু ছিল, কিন্তু এ সমাজ তার সম্বন্ধে মন স্থির করতে পারেনি। তাকে প্রবঞ্চনা করে আত্মরক্ষা করতে শিখিয়েছে গ্রন্থের পর গ্রন্থে, আর গ্রন্থের পর গ্রন্থে তার প্রতি অপর্যাপ্ত কটূকাটব্য করেছে ঐসব নির্দেশ মেনে আচরণ করার জন্যে। এ প্রবন্ধে এই দ্বৈধতা ও গণিকার সামাজিক অবস্থিতিই আলোচ্য বিষয়।

'মহাকাব্য মহাভারত' প্রবন্ধটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'নবীনচন্দ্র সেন স্মারক' বক্তৃতা দুটির সংকলন। মহাভারতই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, এ মতের প্রতিপাদনে অন্যান্য প্রাচীন মহাকাব্যগুলির সঙ্গে তুলনায় মহাভারতের সাহিত্যিক উৎকর্ষ প্রতিপাদনের চেষ্টা এ প্রবন্ধে। এই সূত্রে স্বতন্ত্র ভাবে এ মহাকাব্যটির বৈশিষ্ট্য কোথায় তার কিছু অনুসন্ধান আছে এর কাব্যগত উৎকর্ষ ও জীবনবোধের আলোচনার মধ্যে। মহাভারত জীবনের মূল্যবোধগুলির যে ভাবে পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করেছে, চরিত্রচিত্রণ ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে তার বিশ্লেষণ করে এর কাব্যগত বৈশিষ্ট্যের উচ্চমানের প্রতি বাঙালি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস আছে এতে।

ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের পর্বে 'দুঃখান্ত পরিণতি ও সংস্কৃত সাহিত্য' প্রবন্ধটিতে সংস্কৃতে কেন দুঃখান্ত বা বিয়োগান্ত সাহিত্য নেই তার কারণের অনুসন্ধান করা হয়েছে। সংস্কৃত অলংকার গ্রন্থে সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে, সেটিতে তৎকালীন সমাজের সাহিত্য সম্বন্ধে মনোভাবের প্রতিফলন আছে ধরে নিয়ে তার থেকে এবং যে মুখ্য দার্শনিক চিন্তার পটভূমিকায় সাহিত্য রচিত হয়েছে তার প্রভাবের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যের উৎস সন্ধান

করা হয়েছে। 'কাব্যে অলংকারের সীমা' প্রবন্ধে অলংকার প্রয়োগের সার্থকতা ও তার সীমা নির্ণয়ের চেষ্টা আছে। অর্থাৎ কাব্যে কেন ও কোথায় অলংকার প্রয়োগ সার্থক, কোথায় কাব্য অলংকার-নিরপেক্ষ হয়েই তার চূড়ান্ত সার্থকতা অর্জন করেছে সেই সীমারেখাটি নিরূপণের উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধটি রচিত।

কালিদাস সম্পর্কে একটিই প্রবন্ধ, 'কালিদাস কাব্যে কয়েকটি আদিকল্প'। এতে যে সব আদিকল্প (archetype) কালিদাসের অসামান্য চিত্রকল্প এবং কিছু উপাখ্যানের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল সেগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা রয়েছে। চিত্রকল্পগুলির উৎস সন্ধান করে দেখাতে চেয়েছি যে কোনও কোনওটি দীর্ঘযুগ ধরে গণ-মানসের গভীরে প্রোথিত থেকে ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কালিদাস তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিপুণ প্রয়োগে এগুলিকে কী ভাবে ব্যবহার করেছেন গভীর ব্যঞ্জনার দ্যোতকরূপে— তাই দেখানো এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত সাহিত্যে একটি অনন্য সৃষ্টি; দেশে এবং বিদেশে এ নাটক বহুল পরিমাণে সমাদৃত। কী কী কারণে এ নাটক এমন বৈশিষ্ট্য ও সমাদর অর্জন করেছে তারই কিছু বিশ্লেষণ '*মৃচ্ছকটিক*' প্রবন্ধে। এ নাটকে চরিত্রগুলির আলেখ্য, সমাজ ও মানুষ সম্বন্ধে নাট্যকারের বোধ, তাঁর কবিত্বের বিশেষ চরিত্র কী এবং নাটকের মধ্যে কয়েকটি প্রচলিত মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নের দ্বারা তিনি তাঁর জীবন বোধকে কী ভাবে রূপায়িত করেছেন— এ সবই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু। 'সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্লীলতা' একটি বহু-আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনা। অশ্লীলতার সংজ্ঞা ও সীমা নিরূপণ এবং সাহিত্যে তার স্বরূপ কি সে সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার বাইরে কিছু চিন্তার অবকাশ রয়েছে এতে।

'সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্র ও নারী: পঞ্চম থেকে একাদশ শতকে' প্রবন্ধটি 'রণজয় কার্লেকার স্মারক' বার্ষিক বক্তৃতারূপে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত। প্রবন্ধটির কালসীমা নিরূপণের হেতু হল গুপ্তসাম্রাজ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থান ঘটে; বৌদ্ধ, জৈন ও আর্জীবিক প্রভাব তখন একান্তই গৌণ হয়ে এসেছে এবং একাদশ শতকে মুসলমান আক্রমণ তখনও হয়নি। এ দুই যুগের অন্তর্বর্তী এই সাহিত্যযুগটিকে খাঁটি হিন্দু মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে হিসেবে দেখা চলে। নারী ও শূদ্র শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে সমাজের একেবারে নিচের তলার জীব; দ্বিজ ও পুরুষশাসিত সমাজে তাদের কোনও রকম কৌলীন্য ছিল না— এই অবস্থার প্রতিবিম্বন তৎকালীন সাহিত্যে কি ভাবে ঘটেছে, কিছু প্রখ্যাত সাহিত্যশিল্পীর রচনা থেকে বেছে নিয়ে তার থেকে অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা এ প্রবন্ধে। অধিকাংশ কবি ও নাট্যকারই ধর্মশাস্ত্র-অনুমোদিত মনোবৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত, তবু দু-চারজনের রচনায় নতুন, হয়তো-বা কতকটা যুগাতিবর্তী বোধের পরিচয় পাওয়া যায়, এঁরা বিশেষ এক অর্থেই তাই তাৎপর্যপূর্ণ।

সংস্কৃত সাহিত্যে 'শতককাব্য' একটি বিশেষ গোত্রের সাহিত্যের আলোচনা। যার উদ্ভব ও অবসান একটি অনতিবিস্তীর্ণ যুগের সীমাতে বিধৃত। মহাকাব্যের দৈর্ঘ্য, তার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য বর্জন করে অল্প কয়েকজন কবি খণ্ডকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই

সাহিত্যপ্রস্থানটির সূত্রপাত কালিদাসের *ঋতুসংহার* ও *মেঘদূত*-এ। দীর্ঘ বিবর্তনের পরে সূত্রগত ঐক্য এবং পারম্পর্য রক্ষার দায় এড়িয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু শ্লোক বিষয়গত সূত্রে গ্রথিত হতে থাকে শতক কাব্যগুলিতে। এগুলির শ্লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক একশত হত, তাই এই নামকরণ; যদিও সংখ্যাগত তারতম্য বিস্তর চোখে পড়ে। কয়েকটি প্রখ্যাত শতককাব্যের আলোচনা করে তাদের কাব্যগত মান নির্ণয় করার চেষ্টা ছাড়াও কোন্ বিশেষ সাহিত্যিক ও সামাজিক অবস্থায় শতককাব্য রচিত হয়েছিল, এ কাব্যের ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্যে তারই বিশ্লেষণ আছে।

এ গ্রন্থে বিষয়গত ঐক্য নিতান্তই ক্ষীণ: প্রাচীন ভারতে সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি মাত্র চিন্তাই সেই অন্তর্লীন ঐক্যসূত্র। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে রচিত, সে জন্যে বেশ কিছু পুনরুক্তি অনিবার্য ভাবেই রয়ে গেল। পণ্ডিত বা গবেষক এ রচনার উদ্দিষ্ট পাঠক নয়; সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ সাধারণ কৌতূহলী বাঙ্গালি পাঠক-পাঠিকা— ভাষার ব্যবধানে যাঁরা তাঁদের অতীত ঐতিহ্য থেকে বহুলাংশে বঞ্চিত— মুখ্যত তাঁদের উদ্দেশ্যেই এগুলি উপস্থাপিত করা গেল। প্রবন্ধগুলির দ্বারা কারও চিন্তা যদি সামান্য ভাবেও উদ্রিক্ত হয় বা কেউ যদি প্রাচীন ভারত ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ হন তাহলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করব। এই আশাতেই জ্ঞান ও চিন্তার দৈন্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও এগুলি প্রকাশে সাহসী হয়েছি।

সুকুমারী ভট্টাচার্য